"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

উজ্জ্বলভারত

নব পর্য্যায়

মাঘ ১৩৫৯—পৌষ ১৩৬০

সম্পাদক

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

৬ষ্ঠ বর্ষ

নরনারায়ণ আশ্রম
৮এ রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা ২৬

বর্ষসূচী

উজ্জ্বল ভারত

বর্ষসূচী

৬ষ্ঠ বর্ষ (১৩৫৯ মাঘ হইতে ১৩৬০ পৌষ পর্যন্ত)

বর্ষসূচী

উজ্জ্বলভারত

৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা

মাঘ ১৩৫৯

নববর্ষের প্রণতি

পাঁচ বৎসর পূর্বে জাতির জনক মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণের দিন উজ্জ্বলভারত পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই মাঘ হইতে ইহার ষষ্ঠ বর্ষ আরম্ভ হইল। ভগবান শ্রীনিত্যগোপালের আশীর্বাদে ও আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা আমাদের সেবা কার্যে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিতেছি। বর্তমানের সমস্যাসংকুল জীবনপথ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবন-পথ, বহু সমস্যা জর্জরিত, সকল দিকের সকল সত্যের স্বীকৃতির দাবী উত্থাপিত এই বর্তমানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের একমাত্র সহায় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনচেতনা আজ একই সংগে মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছে। উজ্জ্বলভারত এই উভয়ের স্বীকৃতিকে জীবনের মূল্যে প্রস্থাপন করিতে চায়। মহাত্মাজীই অতীত ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে বর্তমান জগতের রাজনীতি বা জীবন নীতির সংগে সম্বন্ধ স্থাপিত করিবার প্রথম কার্যকরী প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘকাল পূর্বে এই জীবনদর্শনই রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাই তিনি ব্রহ্ম হইয়াও চতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। এই সামগ্রিক জীবনদর্শন বর্তমান কালের শ্রীনিত্যগোপাল আমাদের সামনে দার্শনিকভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। উজ্জ্বলভারত এই জীবন-দর্শনকেই মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছে। তাহার এই প্রয়াসে সে সকলের প্রাণভরা সহযোগিতা পাইবে এই ভরসা লইয়াই সে রওনা হইয়াছিল, আজ এই ষষ্ঠ বর্ষারম্ভেও সেই ভরসাই তাহার পাথেয়।

এই যাত্রার দিনে আমাদের প্রাণের ঠাকুর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালকে আমরা প্রাণ ভরিয়া স্মরণ করিতেছি, আমাদের সকল সত্তাদ্বারা বার বার নমস্কার করিতেছি। এই নমস্করণের ভিতর দিয়া নিজেদেরকে তাঁহাদের পায়ে পৌঁছাইয়া দিয়া আমাদের সকল প্রাণ নূতন শক্তি লাভ করুক। জাতির আত্মসম্বিত যিনি ফিরাইয়া আনিয়া ছিলেন, সেই মহাত্মাজীর পায়েও আমাদের প্রাণের নমস্কার, বার বার নমস্কার। উজ্জ্বলভারতের সংগে যে কেহ যে ভাবে যতটুকু যুক্ত ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন, তাঁহাদের সকলকেও আজ আমরা প্রাণ ভরিয়া স্মরণ করিতেছি, আমাদের প্রীতি জানাইতেছি।

বর্তমানের এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আমরা যেন আমাদের সেবাকাজে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারি, ষষ্ঠ বৎসরের এই নূতন যাত্রা দিনে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের নিকট আমরা এই প্রার্থনাই জানাই। পরস্পরের প্রাণ-খোলা সহযোগিতায় আমরা যেন অগ্রসর হইয়া যাই।

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ মা বিদ্বিষাবহৈ।

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

বিশ্বসংঘ রচনায় গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'কাল'-চক্র ও চক্রী-'পুরুষে'র সমন্বয় করিয়া দিব্য একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষপ্রধান ভারতীয় ঋষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে, পাশ্চাত্যের কালপ্রধান সভ্যতা চঞ্চল বাহিরে মজদুররাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও একটিই একান্ত সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথাস্থানে ও যথামানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব সংঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোঠে মাঠে স্বরাজসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজ-মূর্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজেই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষী রাজা জনক। ভারতের মাটীতেই চাষী-রাজর্ষি-ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শের আগুনে কমিউনিজম হজম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-সংঘাবৃত। কৃষিক্ষেত্র-বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ'-ধাতু হইতে 'কৃষ্টি' 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত্ত হইবে হলধরেরই দেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা—

'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা।'

উজ্জ্বলভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে।

আমাদের কথা

আমাদের নূতন বছরের নূতন দিনে আমাদের কথা আবার নূতন করিয়া স্মরণ করিতেছি।

আমাদের কথাটা কি? আমরা এই বাস্তবজীবন ও জগৎটাকে স্বীকার করি, ইহার বাস্তবিকতার অতীত সত্তাকে লইয়াও। বাস্তব কাহাকে বলিব? তুমি আমি যাহা আমাদের এই স্থূলে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিতে পারি, আমাদের সেই বিচ্ছিন্ন বোধগুলিকেই শুধু বাস্তব বলা যায় না। খালি চোখে যাহা দেখিতে পাই না, আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি দ্বারা তাহা দেখিতে পাই। শুধু কাণে যাহা শুনিতে পাই না, যন্ত্র সাহায্যে তাহাও শুনিতে পাই। রেডিও যন্ত্রের কাণ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আমরা সমস্ত পৃথিবীকে শুনিতে পাইয়া থাকি। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আমি আমার সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু বোধ করিতেছি তাহা যেমন আছেই, আবার সেইটুকুতেই বস্তুর সবটুকু শেষ হইয়া যায় না। শুধু চোখে যাহা দেখি, মাইক্রোসস্কোপ সাহায্যে তাহা অপেক্ষা বেশী দেখি, তাই বলিয়া কি সবটুকুই দেখি? তাহা নয়—আমরা কিছু দেখি, কিছু দেখি না, কিছু জানি, অথচ সবটুকু জানি না, কিছু বুঝি অথচ সবটুকু বুঝি না। বাস্তব বলিতে জানা-নাজানার, বোঝা-না বোঝার, দেখা-না দেখার এই দুইটি রাজ্যকেই বুঝায়। আমরা এই বাস্তবকেই জীবনে স্বীকার করিতে চাই। আমি যাহা জানি আর আমি যাহা জানি না—এই দুইটিরই বাস্তবিকতা আছে।

এই দুইটিকে মিলাইয়া যে বাস্তবিকতা—সেই বাস্তবকে স্বীকার করা সহজ নহে। বিশ্বটার দিকে চাহিলেই দেখি কি ব্যক্তিগত জীবনে কি পারিবারিক কি সামাজিক কি রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ এই দেখা লইয়া, বাস্তবকে কে কি দৃষ্টিতে দেখিল, যতটুকু দেখিল আর যতটুকু দেখিল না সেই সব খানিকেই স্বীকার করিতে পারিল কি না—ইহার উপরেই মানুষের বাদ বিবাদ বিসম্বাদ। আমেরিকা যাহা দেখিতে পাইল, রাশিয়া তাহা দেখে না অথচ তাহার না দেখা অংশটুকুকে কোন মান মর্যাদা বা স্থানও দেয় না। আবার রাশিয়া যাহা দেখে তাহাকেই সে সত্য বলিয়া জানে, তাহার না-দেখার মধ্য দিয়া কি কথার ইঙ্গিত আছে, তাহার সংবাদ লইবার জন্য তাহার এতটুকু মাথা ব্যথা নাই। তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ যে তাহার সত্যের অপরার্ধই বলে—এ কথা মানিয়া লইতে হইলে যে প্রচণ্ড বীর্যের দরকার, সাধারণতঃ তাহার সাক্ষাৎ মেলে না। ধনিক যে রকম যতটুকু দেখিল, তাহার মধ্যে শ্রমিকের জীবনের কথা বাদ পড়িয়া গেল, আবার শ্রমিকও ধনিককে একেবারেই দেখিতে না চাহিয়া জগৎটাকে দেখিতে চায়। পুরুষ যতটুকু দেখিতে পায় তাহাতে নারীর সবটুকু কথা থাকে না, খাওয়াপরা শিক্ষা দীক্ষা অনেককিছুই যদিও থাকে, তবুও থাকে না

শুধু নারীর বিশেষ স্বতন্ত্র সম্মানটুকু। এমনি করিয়া এ সংসারে একের দেখার সঙ্গে অপরের দেখার মিল না হইয়া সমস্ত সংসারটা যেন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বসিয়া আছে। সেই বিভক্ত দুইভাগ দূর হইতে পরস্পরের দিকে পরস্পর অসহায়ের মত চাহিয়া আছে মিলিবার ইচ্ছা আছে, অথচ কিছুতেই মিলাইতে পারে না নিজেদের।

কিন্তু এমন করিয়া কোনদিনই কোন কিছুর সত্যকার সমাধান পাওয়া যাইবে না। এই দুইটিকে মিলাইয়াও একটা দেখা আছে। উজ্জ্বলভারত সেই মিলিত দেখাটার, সমগ্র দেখাটার সন্ধান করিয়া থাকে এবং তাহাকেই জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে।

এ কাজ বড় সহজ নহে। যে দুইটি বস্তুকে বিপরীত বলিয়া বুঝিতেছি, তাহাদের আবার মেলান যায়, ইহা কি সম্ভব? স্পষ্টতই দেখিতেছি উহারা মেলেনা— আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার মেলে না, ধনিকের সঙ্গে শ্রমিকের মেলে না, নরের সঙ্গে নারীর মেলে না। যাহা-কিছু মিল বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার অন্তরে অন্তরে অনেক অমিল অনেক গোঁজামিল পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। উহাকে কি মিল বলে? ইহাদের মিল বলে না। তবু মিলাইবার চেষ্টা?

খাতাপত্রে কাগজে-কলমে যাহাকে মেলান যায় না, জীবনের দিকে তাকাইলে দেখি তাহা একই সঙ্গে অস্তিত্ববান—একই সঙ্গে একই ক্ষেত্রে। অর্থাৎ যাহাকে একদিক হইতে মেলান যায় না বলিয়া দেখি, তাহাকে আর একদিক হইতে মেলান যায়। ভালবাসা ও বিদ্বেষ আপাতঃ বিরুদ্ধ—কিন্তু একই সময়ে একই মানুষের মধ্যে তাহাদের সাক্ষাৎ মেলে। যুক্তিতে দেখি আলো ও অন্ধকার পরস্পর বিরোধী—আলো মানেই যাহা অন্ধকার নয়, অন্ধকার মানেই যাহা আলো নয়—অতএব উহাদের একত্র অবস্থান সম্ভব নহে। কিন্তু বাস্তব জগতে তাকাইয়া দেখি অতি প্রত্যুষে ও গোধূলি সময়ে আলোও আছে, অন্ধকারও আছে; কে অস্বীকার করিবে? বিজ্ঞান যে ফটো তোলার তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহা লাইট ও সেডের সম্মিলনে উদ্ভূত। হাফটোন উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জীবনের ক্ষেত্রে এই স্তরটি প্রাণের স্তর। মনের স্তরে পরস্পরবিরোধী দুই বস্তুর মিল নাই, সেখানে তাহারা চিরদিন পরস্পর হইতে পরস্পর পৃথক। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে এইখানে আসিয়াই শেষ করিব না। এমনও একটি অবস্থা জীবনের মধ্যে আছে, যেখানে উহারা মিলিয়া মিশিয়া একত্র অবস্থান করিয়া জীবনকে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে। মনের পরস্পর অসহিষ্ণুতার স্তর ডিঙ্গাইয়া এই প্রাণের স্তরে আজ বিশ্ব সভ্যতা পৌঁছাইতে চাহিতেছে।

এই প্রাণের স্তরে পৌঁছাইতে পারিলে কোন একটি দেখাতেই মানুষের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হইয়া যায় না, একটি দেখাতেই মানুষ আসক্ত হইয়া পড়ে না। তখন সে পূর্বে যাহা দেখিতে পাইত তাহাও যেমন দেখে, তেমনি পূর্বে যাহা দেখিতে পাইত না বলিয়া মিথ্যা বলিয়া মানিত, তাহাও দেখিতে পায়। এবং এই দুই দেখাকে মিলাইয়া

একটি তৃতীয় দৃষ্টি—উহাই প্রাণের নিজস্ব—তাহার খুলিয়া যায়। তখন আমেরিকার দৃষ্টিকোণে আমেরিকার সত্যকেও বুঝি, রাশিয়ার দৃষ্টিকোণে রাশিয়ার সত্যকেও বুঝি এবং দুইয়েরই সত্যিকারের স্বার্থ রক্ষা করিয়া পথচলার একটি ধারাকেও খুঁজিয়া পাই। সেখানে কাহারও স্বার্থ নষ্ট হয় না, কিন্তু কাহারও অপরকে বঞ্চিত করিয়া নিজের অর্থকে অনন্তায়িত করিবার বুভুক্ষাও তৃপ্ত হয় না। সেখানে নর তাহার স্বার্থ বজায় রাখিয়াই নারীর স্বতন্ত্রতার পূর্ণ মর্যাদাটুকু দিতে পারে, ধনিক শ্রমিকের সুখদুঃখের ক্লেশটুকু নিজের বুকে অনুভব করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অস্ত্রত্যাগের পূর্বে অর্জুনকে এই স্তর লাভের জন্যই উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তাই অর্জুন বলিতে পারিলেন 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।' উভয় সেনার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া অর্জুন নিজ পক্ষ ও অপর পক্ষের সকল কিছু নিরীক্ষণ করিবেন। এই নিরীক্ষণ হইতেছে cross examination, critical study. এখানে দাঁড়াইয়া অর্জুন স্বপক্ষের পক্ষে বিপক্ষে এবং বিপক্ষের পক্ষে বিপক্ষে যাহা কিছু দেখিবার তাহা দেখিবেন।—এই নিরীক্ষণ, যেখানে নিজের সঙ্গেও নিজে আসক্ত হইয়া পড়া চলিবে না, নিজের পক্ষের ও বিপক্ষের সব কথাই দৃষ্টিপথে আসিবে আবার অপর পক্ষের প্রতিও বিদ্বিষ্ট হইয়া এমন আসক্ত অবস্থা আমার আসিবে না যেখানে তাহার পক্ষের কথাগুলি আমার দৃষ্টিপথে আসিতে বাধা হয়—এই যে নিরীক্ষা ইহাই পরম মুক্তি—'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।' জীবনটাকে যতদিক হইতে দেখা যাইতে পারে, যত রকমভাবে ইহার নিরীক্ষণ চলিতে পারে, তাহার সবগুলিকেই উপস্থিত রাখিব, কোনটাকেই বাদ দিব না, কোনটাকেই চাপা দিয়া রাখিব না—অথচ কোনটার সম্বন্ধেই আমার আসক্তি বা বিদ্বেষ থাকিবে না।

উজ্জ্বলভারত ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এই মুক্তির খবরই জনসাধারণের জীবনের দুয়ারে পৌঁছাইতে চায়। এই পরা মুক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তত্ত্বমূর্তি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার জীবনকে বহু পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিকোণ হইতেই সার্থক ব্যাখ্যা করা যায়—তাই তাঁহার জীবন একটি জীবন্ত জীবন। একটি সত্যকেই যাহারা একমাত্র সত্য বলিয়া জানে, শ্রীকৃষ্ণজীবন তাই তাহাদের কাছে প্রহেলিকা বিশেষ। তাহারা গোষ্ঠের কৃষ্ণের সঙ্গে রাস-বিহারী কৃষ্ণকে মিলাইতে পারে না, রাস-বিহারী কৃষ্ণের সঙ্গে রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণকে মিলাইতে পারে না। কিন্তু বর্তমানের জটিলতাপূর্ণ জীবনের একমাত্র সমাধান শ্রীকৃষ্ণজীবনই। তাই তিনিই উজ্জ্বলভারতের রথের সারথী। ওগো সারথী, তোমার পায়ে চলার পথে আমাদের তুমি চালাইয়া লও, আমরা যেন তোমার পথ হইতে দূরে সরিয়া না পড়ি, তুমি আমাদের রথরজ্জু ধরিয়াছ—আমরা চলিবই। বন্দেমাতরম্

মেঘ

নিশিকান্ত

আকাশের অন্তরালে নির্জনে বসিয়া
　　　　সারাবেলা
কে যেন আনন্দ রসে ভাসিয়া হাসিয়া
　　　　করে খেলা
আলোকের মেঘে আর আধো আলো আধেক ছায়ায়
　　　　বিচিত্রিত মেঘের মায়ায়;
নীলরঙে, লালরঙে, সোনালীতে, সবুজে, সাদায়,
বাতাসের স্রোতে ভাসে জলদের বর্ণময় ভেলা।

ওই মেঘে মেঘে কোন্ নিমগ্ন স্বপ্নের
　　　　ফুল ফোটে,
অতল-সমুদ্রে যেন মূর্ত বুদ্বুদের
　　　　রঙ্গ ওঠে,
মন্থিত মুক্তার মত ঝলকিয়া দোলে আর নাচে,
　　　　চিরদিন একছন্দে সাজে,
বার বার তবু তারা নিত্যই নূতন রূপে রাজে,
মুক্তির বৈচিত্র্য আনি' কালের বন্ধন-জাল টোটে।

ওই সূর্য বিকশিল কোন্ অচেনার
　　　　অন্তরের
প্রোজ্জ্বল রক্তের বিন্দু, জাগ্রত-বিভার
　　　　আলোকের
জলদের মত সে যে এ নিখিল বিচ্ছুরিয়া ভাসে:
　　　　কোথা যায়, কোথা হতে আসে
কে জানে?—কাহার বক্ষে নিস্পন্দিত সম্বিত-প্রশ্বাসে
বিনিস্তব্ধ সঙ্গোপনে জন্ম লয় ওই ভাস্বরের

নির্বিচল শক্তি-জ্বালা তেজে উদ্দীপিত
　　　　চলমান
প্রগতির আবর্তন? হীরক-ছুরিত
　　　　অভিযান

তারকার, তমিস্রায় নিত্য আনে দীপ্তির দীপালি,
স্ফটিক-মেঘের শিখা জ্বালি'
প্রস্ফুটায় কোন্ চির-প্রশান্তির বহ্নির শেফালি:
অদৃশ্য মঞ্জুষা হতে কাহার ঐশ্বর্য করে দান।

যামিনীর কৃষ্ণমেঘ নিবিড়-কুন্তলা;
মধ্যাহ্নের
জলদে স্বচ্ছতা; তারা নিত্য দেয় দোলা
রহস্যের
যবনিকা, আলো আর অন্ধকার মগ্ন দুই পাশ,
সন্ধ্যা আর ঊষার উদ্ভাস
অর্দ্ধস্ফুট কমলের মত আসে রাঙিয়া আকাশ
হাসিয়া অস্পষ্ট হাসি কোন্ চিরন্তন-শৈশবের।

ওই চন্দ্র ভেসে এলো কোন্ অচিন্ত্যের
মর্ম্ম হতে
রজত-মেঘের মত; স্নিগ্ধ-লাবণ্যের
শুভ্র স্রোতে
বিপ্লবিয়া ভুবনের রূপতৃষ্ণা, কৌমুদী আসবে
মাতাল করিয়া দিল সবে
উদ্ভাসিত আনন্দের অতন্দ্রিত মাধুরী-উৎসবে;
গগনকাব্যের গ্রন্থে রূপায়িত উজ্জ্বল মন্ত্রতে।

অমৃত অঙ্কুর সম উঠিল সে ফুটি।
বসুধার
মৃন্ময়-মেঘের মূর্ত্তি পড়িয়াছে লুটি
নীলিমার
আনত-দৃষ্টির তলে দিকে দিকে ঊর্দ্ধ্বে আঁখি তুলি;
তাহারি মলিন মৌন-ধূলি
স্বপ্নময় বাসনার মর্ম্মলোকে আপনায় ভুলি'
রঙিন হইয়া ওঠে জীবনের চিন্ময়-লীলার।

মেঘের মঞ্জরীদলে, কোন্ খেয়ালীর
খেয়ালের
তুলির রেখার মত সে আনে সৃষ্টির

লিখনের
জন্মমৃত্যু হারা বাণী, দুলিয়াছে এ বিশ্বভুবন
কার মেঘ-মালার মতন।
এ ধরণী সে-মালার একখানি মেঘের রতন;
মেঘে মেঘে ছবি আঁকা কোন্ মেঘ-মুক্ত অনন্তের।

নূতন শিক্ষার ভাবধারা

গৌরী সেনগুপ্ত

বুনিয়াদী শিক্ষাই বা কি এবং বুনিয়াদী শিক্ষার ধারাই বা কিরূপ হবে, সে কথা আজ সকলের মনেই প্রশ্নের আকারে এসে দেখা দিয়েছে। আজ এতদিন পর্যন্ত শিক্ষার যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, সেই শিক্ষার বদলে যে কোন একটী বিপরীত পন্থী শিক্ষা যে আমাদের জীবনের যাত্রাপথে কার্যকরী হবে, সে কথা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও মনকে বুঝিয়ে এসেছি মন্দই বা কি হবে, অন্ততঃ এর চেয়ে ত ভাল হবে। তারপর শুনেছি শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন মন্ত্র বুনিয়াদী শিক্ষা। বুনিয়াদী শিক্ষাকে সঠিক বুঝতে না পারলেও তাকে আঁকড়ে ধরেছি, কারণ বুঝতে পেরেছি ওটা গতানুগতিক মামুলি শিক্ষা নয়। মনে হয়েছে রুসোর কথা— 'Do the opposite of what is customary and you will nearly always be right.' তাই বিপরীতের চিন্তা করতে করতেই আমরা এমন একটা জায়গায় এসে ঠেকে গিয়েছি যে, বাঁধা আমাদের জীবনে মংগলের সৃষ্টি করেছে।

জীবন সম্পূর্ণ স্থিতিধর্মী নয়, জীবন গতিধর্মীও বটে। আবার জীবন সম্পূর্ণ গতিধর্মীও নয়, স্থিতিধর্মীও বটে। জীবনের এই স্থিতি গতির সমন্বয়ই হচ্ছে জীবনের আসলরূপ। গতানুগতিক নিশ্চল অবস্থা আমাদের জীবনে জগদ্দল

পাথরের মত ভারের সৃষ্টি করেছিল, আজ সে পাথরকে সরিয়ে আমাদের পথের সন্ধানে বেরুতে হবে। পথও সৃষ্টি করে গন্তব্যস্থলকে, এই পরসত্যকে আজ ভাল করে স্পষ্ট করে বুঝে নিতে হবে। তাইত রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন

"পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা
আনন্দে তাই এক হোল তার পৌঁছান আর চলা।"

"পথগুলি যদি টুকরো টুকরো না থেকে সর্ব পথ-সমন্বয় সিদ্ধ হয় তখন গন্তব্য-স্থলই পথ, পথই গন্তব্যস্থল", জীবন হয় জীবনের জন্য প্রস্তুতি, জীবনের জন্য প্রস্তুতিই হয় জীবন। তখন পৌঁছান আর চলা এক হয়ে যায় চলার আনন্দে। তাইত কবি গেয়েছেন "চলার বেগেই পথ কেটে যায় করিসনে আর দেরী।"

জীবনের এই চলার বেগ জীবনকে সমস্ত ক্ষেত্রে সুন্দর ও সুমহান করে তুলবে তবেই ত হবে সুন্দর সমন্বিত জীবন। দ্রুত পরিবর্তনশীল আবেষ্টনীতে সম্পূর্ণ স্থিতি ও সম্পূর্ণ গতি জীবনের সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। সর্বক্ষেত্রে যেমন একটা দ্রুত পরিবর্তনের ছাপ, তেমনি জীবনের স্থিতিসূচক অভিব্যক্তি—এই দুইএর কোনটিকেই একান্তভাবে জীবনে গ্রহণ করলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। স্থিতিজ্ঞাপক কেন্দ্রকে উপলক্ষ করেই জীবনের গতিশীল পরিধিকে নমনীয় করে যথাসম্ভব জীবনকে চালিয়ে যেতে হবে, তবেই হবে সমস্ত বিরোধ ও সমস্যার মীমাংসা।

তাই যদি হয় তবে সমন্বিত জীবনের আদর্শ হবে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে সেই স্তরে পৌঁছান। এখন প্রকৃত শিক্ষা কি ভাবে হবে তাই হচ্ছে সমস্যা। প্রকৃত শিক্ষা বলতেও বুঝতে পারা যায় দুইটী পরিপূরক সমস্যার কথা। মানুষের যে জাতিগত উত্তরাধিকার, তাকে ক্ষুণ্ণ করতে দেওয়া কিছুতেই চলে না। কারন তাকে ক্ষুণ্ণ করলে মানুষ খণ্ড মানুষে পরিণত হবে, তার অখণ্ডত্ব আর বজায় থাকবে না। আর দ্বিতীয়তঃ মানুষকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। অভিজ্ঞতা ও জাতিগত উত্তরাধিকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই প্রকৃত শিক্ষা গড়ে উঠবে।

শিশুর জীবন বিদ্যালয় ও গৃহের নানা অভিজ্ঞতার ফলেই বৃদ্ধিলাভ করে। বিদ্যালয়ে শিশু যা শিক্ষা করে, তাই শিশুর মনে দানা বেঁধে ওঠে শিক্ষার রূপ নিয়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরে গৃহ ও আবেষ্টনীর প্রভাবের ফলেও এক প্রকার শিক্ষা শিশু লাভ করে, তার কি মূল্য শিশুর জীবনে নেই? আছে বইকি, তার স্বয়ংমূল্য শিক্ষা-ক্ষেত্রে দিতেই হবে না হলে শিশুর জীবন পূর্ণতা লাভ করবে না। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের বাইরের যে শিক্ষা এই দুই শিক্ষার ফলে শিশুর মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে কিনা তাই হচ্ছে সমস্যা। বিদ্যালয়ের কাজ হচ্ছে পরিকল্পিত কাজ যার ফলে ব্যক্তিগত সত্তার পূর্ণ বিকাশ হয়। ' কিন্তু শিশুর বিদ্যালয়ের বাইরে বিচরণের ফলে যে শিক্ষালাভ হয় তাহার বিকাশ ক্ষমতা কতটুকু? যতটুকুই হোক না কেন অপরিকল্পিত হলেও তার প্রভাব কম নয়। দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দ্বন্দ্ব অর্থ কি সকল সময়ই বিরোধ? দ্বন্দ্ব অর্থ মিত্রতাও বটে। অতএব ঘর ও বাহির, বাহির ও ঘর এই দুইই দুইএর পরিপূরক হিসাবে শিশুর শিক্ষাকে

সহায়তা করে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তবে বিদ্যালয়ের পরিকল্পিত শিক্ষার প্রভাব কিছু পরিমাণে বেশী বলে মনে হয়। তার কারণ সে শিক্ষার মূল নিবন্ধ রয়েছে একটা বিরাট কৃষ্টিমূলক কেন্দ্রে, যা শিশুর বাইরের জীবনকেও প্রভাবান্বিত করে চলার পথে বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিশুর জীবনে যে এই গণতান্ত্রিকতার প্রভাব এই প্রভাব যদি বিদ্যালয়ে অন্যান্য কাজের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাহলে শিশুর ঘর ও বাহির একাকার হয়ে যায়। বিদ্যালয়রূপী শিশুর জীবন ব্যাপক অর্থে শিশুর সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তোলে। শিক্ষামন্দিরে শিশুর জীবন কেবল পরবর্তী জীবনের জন্যই প্রস্তুত হয় না, শিশুর জীবনের প্রতিস্তরকেই উহা মহিমান্বিত করে তোলে। শিশুর জীবনকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তুলতে হলে শিশুর যেমন সামাজিক জীবনেরও প্রয়োজন আছে, তেমনি ব্যষ্টিগত জীবনেরও পরিপূর্ণ বৃদ্ধি প্রয়োজন। ব্যষ্টিগত জীবনের বৃদ্ধি সম্ভব হয় ব্যক্তিগত শিক্ষার মাধ্যমেই।

ব্যক্তিগত শিক্ষাকে যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে সাথে সাথে এর সাথে দর্শনগত যে সব প্রক্রিয়ায় মিল বর্তমান রয়েছে, তাকেও মেনে নিতে হবে, অর্থাৎ পূর্বের পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে পরিহার করে কর্ম ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে জাতিগত উত্তরাধিকারকে স্বীকার করতেই হবে, না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মকেই শুধু আঁকড়ে ধরে চলার বিপদ রয়েছে—এটা অনেকটা [illegible] oneway **ladder to heaven** -এর মত, উঠবার পথ জানা রইল অথচ পরিক্রমা সম্পূর্ণ হল না। কিন্তু জাতিগত উত্তরাধিকারের দাবী শিশুর থাকলেও সেটাকে অপ্রধান করে রাখতে হবে শিশুর একটা বিশেষ বয়সের জন্য, কারণ কার্যের দ্বারা দেহের অণুপরমাণু গঠিত হলেই একটা বিশেষ বয়সে এসে শিশু উত্তরাধিকারের দাবী করতে পারে। তখন অবশ্য হবে কর্মই অপ্রধান, জাতীয় উত্তরাধিকার প্রধান। কিন্তু শিশু যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রাপ্তবয়স্ক হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কর্মের ভিত্তিতেই জীবনে এগিয়ে চলতে হবে। তা ছাড়া শিশুর মধ্যে আদিম বর্বর মন শিশুকে কর্মের জন্য যে প্রেরণা যোগাচ্ছে তারও পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজন রয়েছে। সে প্রেরণার নিয়ন্ত্রিত বিকাশই হচ্ছে শিক্ষার সহায়ক কিংবা উহাই প্রকৃত শিক্ষা।

তাহলে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে, শিশু কর্মের মাধ্যমেই প্রধানতঃ শিখবে এবং এই শিক্ষাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। কর্মকে যখন স্বীকার করা হোল তখন কর্মের রূপকে বিচার করে দেখতে হবে। কর্ম হবে শিশুর কাছে অর্থসূচক, উদ্দেশ্যমূলক ও মনোগ্রাহী। কর্ম এই তিনের সমন্বয়ের ফল কিংবা যে কোন উদ্দেশ্যদ্বারা উদ্বুদ্ধ যে কর্ম, তাহাই শিশুর পরিকল্পিত কর্ম সে কথা বিচার করে দেখা যেতে পারে। উদ্দেশ্য যেখানে তিন উদ্দেশ্যের সমন্বয়, সেখানে কর্মের শক্তি প্রভূত অর্থাৎ শিশুর পক্ষে বিশেষভাবে গঠনমূলক, সেকথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু শিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে, শিশু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যে কাজ করবে, সেই কাজই

শিশুর কাছে অর্থসূচক, উদ্দেশ্যমূলক এবং মনোগ্রাহী। বয়স্কমন যে কর্মকে অবহেলা করেছে, শিশুমন তাকে হৃদয়গ্রাহী বলে আঁকড়ে ধরেছে। অতএব শিশু-মনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে, যে কর্ম শিশু আগ্রহসহকারে করবে সেটাই হবে শিশুর শিক্ষার মাধ্যম। যে কাজে শিশু আগ্রহ প্রকাশ করবে, সেই কাজের মধ্যে শিশু তৃপ্তি বোধ করবে এবং তৃপ্তি ও অভিনিবেশের ফলে শিশুর দেহমন ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে একটা নূতন ছাঁচ নিয়ে গড়ে উঠবে।

একটা কথায় অনেকেই হয়ত সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন সেটা হচ্ছে, শিশু ইচ্ছা করে করবে এমন সমস্ত কাজই যে উদ্দেশ্যমূলক হবে এমন কি কথা আছে। কথাটা ভাববার বিষয় সন্দেহ নাই। শিশুর কতকগুলি বিধ্বংসী মনোবৃত্তি আছে যেগুলি শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর। এই বিধ্বংসী মনোবৃত্তিকে গঠনমূলক মনোবৃত্তিতে পরিণত করাই হচ্ছে শিক্ষকের কাজ। শিশু হয়ত কতকগুলি জিনিষপত্র ভেঙ্গে ফেলল, এ অবস্থায় নেতিবাচক উপদেশ শিশুর পক্ষে কল্যাণপ্রদ হবে না। নেতিবাচক উপদেশের ফলে শিশুর কর্মের সাবলীল ছন্দ ও গতি নষ্ট হয়ে যাবে। যে কর্ম শিশুর দৃষ্টিভঙ্গীতে উদ্দেশ্যমূলক অথচ শিক্ষকের দৃষ্টিকোণে বিধ্বংসী—এই আপেক্ষিক অবস্থাটার সমন্বয় সাধন করতে হবে শিক্ষকের সুচিন্তিত পরিকল্পনার দ্বারা। অপরিচালিত কর্মে শিশুর স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু শিশুর অলক্ষে সে স্বাধীনতার পরিধিকে খর্ব করতে হবে শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই। শিক্ষকের ইঙ্গিত শিশুর জীবনগঠনে প্রতিনিয়ত সাহায্য করবে, তবেই হবে প্রকৃত শিক্ষা। এই ত গেল ছোট শিশুর কথা, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর উদ্দেশ্য এবং শিক্ষকের উদ্দেশ্য অনেকটা সমপর্যায়ে এসে পড়বে। শিশু ছিল এতদিন আত্মকেন্দ্রিক এবং তার সমস্ত কিছু কাজই ছিল ব্যষ্টিকে নিয়ে, এখন তার কাজ হবে সমষ্টিকে কেন্দ্র করে।

শিশু জীবনে সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বড় হবে এই হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং তাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার সমস্ত কর্ম ব্যষ্টিকে ছাড়িয়ে একটী ব্যাপকতর ক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াবে। বুনিয়াদী শিক্ষার শিশু ও সমাজ উভয়ে পারস্পরিকভাবে তাদের গতির ছন্দ মিলিয়ে নেবে, তবেই শিশুর জীবন সম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা। সমষ্টিগত কর্মের মধ্যে সহযোগিতার ভাব বর্তমান, ব্যষ্টির আদর্শ সেখানে সমষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। অতএব শিশুর সমস্ত কর্ম এমনিভাবে স্থিরীকৃত হবে যাতে শিশু সকলের মধ্যে নিজের স্বয়ংমূল্য স্থাপনা করে এবং সমষ্টির মঙ্গলের জন্যও বদ্ধপরিকর হয়। তা সম্ভব হবে যদি শিশুর সমস্ত কর্মগুলি সুপরিকল্পিত, সুউদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়।

যে কোন কর্ম শিশুরা করবে সে কর্ম যদি প্রোজেক্ট-এর আকার ধারণ করে তবেই সে কাজ শিশুর ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে বিশেষ উপকার সাধন করতে পারবে। প্রোজেক্ট-এর ভিতর কর্মের কেন্দ্র স্থির করা, পরিকল্পনা করা, কর্ম উদযাপন করা

এবং শেষ পর্যন্ত সেই কর্মের বিচার করা এই সমস্ত ব্যবস্থাই রয়েছে। একটু স্থিরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এই প্রোজেক্ট-এর মধ্যে নিজের সত্তাকে সমষ্টির প্রয়োজনের মধ্যে বিলীন করবার যে ব্যবস্থা রয়েছে এমন ব্যবস্থা আর কোন কিছুতে নেই। কর্মের কেন্দ্র স্থির করা, পরিকল্পনা করা, কর্ম উদ্‌যাপন করা এবং বিচার করা এসকল কাজের মধ্যেই সকল শিশুর পূর্ণ সহযোগিতা বর্তমান, তা না হলে পরিকল্পনার কোন অংশই সাফল্যমণ্ডিত হবে না। কর্মের কেন্দ্র ও পরিকল্পনা শিশুরা সকলে মিলে স্থির করে, ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সে পরিকল্পনা দানা বাঁধে, তারপর বিভিন্নদলে শিশুরা বিভক্ত হয়ে কর্মের সর্বাঙ্গীন উদ্‌যাপনে বদ্ধ পরিকর হয়ে কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করে। পরে আবার সকল শিশুরাই নিজেদের কাজের বিচার করে থাকে। কর্মের কেন্দ্র যখন ক্ষুদ্র তখন যেমন শিশুরা সমষ্টির উদ্দেশ্যকে কর্মে রূপদান করে ঠিক তেমনি কর্মের উদ্দেশ্য যখন ব্যাপকতর সেখানেও শিশুরা সমাজের দিক থেকে বিচার করে কর্মে অগ্রসর হয়। গ্রামসেবা, পল্লী উন্নয়ন, কৃষক সমিতি গঠন, বিজ্ঞান সমিতি গঠন ইত্যাদি কাজেও শিশুরা সমষ্টিগতভাবে সহযোগিতার মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জন্য প্রস্তুতি এবং জীবন যাপন উভয় কর্মই শিশুদের দ্বারা উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

যে জাতীয় সহযোগিতামূলক কর্মের কথা উল্লেখ করা গেল, সেই জাতীয় কর্মের সঙ্গে আর একটী বিশেষ দর্শন যুক্ত। সে কথা বিবেচনা করে না দেখলে আমাদের সকল কথাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে পুরাতন শিক্ষক আরোপিত শিক্ষাকে আমরা বদলে নূতন পথে চলতে যাচ্ছি। তাহলে শিক্ষাদর্শন সম্পূর্ণভাবে আমাদের বদলাচ্ছে। অর্থাৎ শিশুকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে আমরা প্রেরণা যোগাচ্ছি। কিন্তু এই স্বাধীনতার পরিপোষণ শিশুর পক্ষে উপযুক্ত হবে কিনা এবং কতটা স্বাধীনতা শিশুকে দেওয়া হবে সেটাই হবে বিচার্য। রুশো, পেস্তালজি, ফ্রয়েবেল, মন্টেসরি, ডিউই, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি সকলেই শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অনেকে মনে করেন শিশুকে যদি স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাহলে শিশু নিজের ইচ্ছামত কাজ করবে, যা তার জীবনের পথে পরিপন্থী হবে। একথা আমরা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি, যেখানে শিশুর বিধ্বংসী মনোবৃত্তিও শিক্ষকের ইঙ্গিতে জীবন গঠনে সাহায্য করবে। অতএব শিশুর স্বাধীনতা লাইসেন্স বলে মনে করা কখনও সংগত হবে না একথা বহু শিক্ষাবিদই মনে করেন। শিশু যদি কর্মে লাইসেন্সই পাবে তবে আর শিক্ষকের প্রয়োজন কি? শিক্ষক শিশুর সকল কর্মের সময় উপস্থিত আছেন, ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে শিশুর সমস্ত কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। মণ্টেসরী ডিরেক্ট্রেস শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকেন অথচ প্রত্যক্ষভাবে শিশুর কর্মে কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মান না, তার অর্থ কি এই যে শিশু যা ইচ্ছা তাই করে যাবে অথচ শিক্ষক

নির্বিচারে চুপ করে থাকবেন? নিশ্চয়ই তা নয়। শিক্ষক শিশুর প্রয়োজনীয় সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত করবেন এই হচ্ছে উদ্দেশ্য।

তাহলে বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বোধহয় অসংগত হবে না যে শিশু সমাজের চাহিদার দিক থেকে স্বাধীনভাবে জীবনকে পরিচালিত করবার সুযোগ পাবে এবং জীবনের জন্য প্রস্তুতি এবং জীবন ধারণ উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতা লাভ করবে।

এখন কথা হচ্ছে আমরা যখন শিশুর স্বাধীনতা ও কর্ম উভয়কেই স্বীকার করে নিয়েছি তখন কি পদ্ধতিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চলবে তা বোধহয় স্থির করার প্রয়োজন। Sancier বলেছেন, অবশ্য নিজে ঠিক না বললেও ডিউইর কথাই পুনরুক্তি করে বলেছেন যে, শিশুর সমস্ত শিক্ষা গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। গণতান্ত্রিকতা বলতে কি বোঝা যায় সেটাই হচ্ছে বড় কথা। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় শিশুর পূর্ণ নাগরিক জীবন যাপনের এবং শিশুর বর্তমান জীবন যাপনের জন্য যে সকল মনোবৃত্তি গঠনের প্রয়োজন আছে, সে মনোবৃত্তি গঠনে শিশুর এবং শিক্ষকের পরিপূর্ণ অধিকার থাকবে। কেউ কেউ বলতে পারেন মনোবৃত্তি গঠনে শিশুরা কি করবে? করবে বইকি, শিশুর দেহমনের চাহিদা যে শিক্ষা পরিকল্পনা মেটাতে পারে, সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেই শিশুর মনোবৃত্তি গঠিত হবে।

শিশুর ক্ষমতা কতটুকু, কি তার শারীরিক ক্ষমতার সীমা, সমস্তই শিশুরা তাদের কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। কিন্তু শিশুরা নিজেদের পরিমাপ করতে পারে না, সে হিসাব করবেন শিক্ষক। অতএব শিশু ও শিক্ষকের সহযোগিতার এবং গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে শিশুর সর্বাংগীণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয় 3 R অন্য সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের সংগে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। 3 R সেখানে অতি অল্প স্থানই অধিকার করে আছে যদিও মোটেই উপেক্ষণীয় স্থান নয়। অতএব ৩ R বিষয়ক শিক্ষা নিছক গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে না হলেও শিশুর প্রয়োজন ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে স্থিরীকৃত হবে, কিন্তু অন্যান্য জীবনকেন্দ্রিক কাজ সবই শিশুর ইচ্ছা ও অনিচ্ছার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। কর্মের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনাকালে সে সকল কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়েছে।

সে যাক্ এখন কথা হচ্ছে সকল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ হবে?

শিক্ষাপদ্ধতি হবে এই জাতীয় যাতে শিশুর 3 R ও তৎসংলগ্ন নানাবিষয়ও শিক্ষা হয় এবং শিশুর মনোভাব, অভ্যাস, জীবনের সুদৃষ্টিভংগী ইত্যাদিও গঠিত হয়।

তাহলে পুনরালোচনার ভিত্তিতে আমরা পুনরায় শিক্ষাপদ্ধতিকে আর একবার বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

প্রথম অবস্থায় শিশু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত গ্রহণ করবে। রুশো বলেন যে, যেহেতু সমস্ত বাহ্যবস্তু শিশু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করবে সেই হেতু শিশুর প্রাথমিক জ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতিপ্রসূত। ইহাই হচ্ছে প্রজ্ঞাপ্রসূত জ্ঞানের ভিত্তি। শিশুর প্রথম জ্ঞান স্থূল পদার্থের সাহায্যে লাভ হয়। এবং দ্বিতীয় জ্ঞান যার সঙ্গে যুক্তি ও বিচার ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার প্রকাশ বা শিশুমনে জাগরণ বয়স বৃদ্ধি না হ'লে সম্ভব হয় না। অতএব শিশুকে শুধু পুস্তকে বর্ণিত জ্ঞানের সন্ধান দিলে সে ঐরূপ জ্ঞানলাভে বিশেষ কৃতকার্য হবে না একথা বলাই বাহুল্য। পুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তু পাঠে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ হবে, কিন্তু মূল জ্ঞান লাভ করা হবে না। অতএব শিশুকে যদি মূল জ্ঞান লাভ করতে হয় তবে তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করে সমস্ত জিনিষ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সমস্ত বস্তু পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে যে ছন্দ আছে, সেই ছন্দজ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ হবে যখন শিশু নিজেই কর্ম করে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। শিশুদের নিজেদের কর্মকে কেন্দ্র করে শিক্ষার কথা অবশ্য পেস্তালজিই প্রথম প্রবর্তন করেন। কামেনিয়াস, রুশো ইত্যাদি শিশুশিক্ষায় কর্মের কথা বলেছেন, কিন্তু সে কাজের মধ্যে শিশুর দিক থেকে কাজের ব্যবস্থা তেমন ভাল করে হয়নি। কর্ম বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করেছে মাত্র কিন্তু শিশু হাতেকলমে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এই হচ্ছে উদ্দেশ্য। হাতে কলমে কাজ না করলে কর্মের অন্তর্নিহিত সত্তা শিশুমনে থিতিয়ে যায় না, যার ফলে জাতিগত উত্তরাধিকারও শিশুমনে দানা বাঁধে না। অতএব শিশুকে কাজ করতে দিতে হবে। নিজে গুছিয়ে সে কাজ করবে তবেই অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে।

শিশু কি জাতীয় কাজ করবে এবং কিভাবে কাজ করবে এই হচ্ছে সমস্যা। শিশুকে দুরকম কাজ করতে দিতে হবে—অপরিচালিত কর্ম এবং পরিচালিত কর্ম। অপরিচালিত কর্মের মধ্যে শিশুর সমস্ত সত্তা ফুটে উঠবে, যাকে নিয়ন্ত্রিত করবেন শিক্ষক, আর সুবিন্যস্ত জ্ঞানদানের জন্য আবশ্যক হচ্ছে পরিচালিত কর্মের। কোনটাই এককভাবে শিশুর জীবনে কার্যকরী হবে না। শিশু কোন্‌টাতে রস পাচ্ছে এবং কিভাবে কোন্‌দিকে তার মতিগতি যাচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে, বর্তমান জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবন উভয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে তবে শিশুকে কর্মে প্রবৃত্ত করতে হবে। জীবন যাপনের যেমন প্রয়োজন আছে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতিরও প্রয়োজন। শুধু প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য রাখলে জীবনকে হজম করা যায় না। আবার শুধু জীবন যাপন করলে জীবনের প্রস্তুতিও হয় না। দেহমনকে কর্মের জন্য উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন, তার অনুশীলনও প্রয়োজন কিন্তু সুবিন্যস্ত জ্ঞানের জন্য তার নিয়ন্ত্রণও তেমনি প্রয়োজন। শুধু কর্মকেন্দ্রিক হলেই চলবে না, জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্যে শিশুর অজানিতে শিশুর উপর কর্মের ভার চাপিয়ে দেওয়া হলে তবেই শিশুর শিক্ষা ব্যষ্টি ও সমষ্টির জন্য উপযুক্ত হবে।

শিশুকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য প্রয়োজন শিশুমনে আগ্রহের সৃষ্টি করা ও প্রেরণা যোগান। এই দুইএর ফলে শিশু কাজ করতে আগ্রহ বোধ করবে, এবং শিশুকে স্বীয় উদ্দেশ্যের পথে পরিচালিত করতে হলে শিশুকে নানারকম ইংগিত-দ্বারা প্রভাবান্বিত করতে হবে। শিশুমনে প্রাচুর্যের অভাব। সেই অপ্রাচুর্যকে পূরণ করবে শিক্ষক তার মনের প্রসারতা ও জ্ঞানের প্রাচুর্য দিয়ে, তবেই শিশুর শিক্ষা ঠিকপথে পরিচালিত হবে।

শিশুর সংগে শিক্ষক কর্মে নিযুক্ত থাকবেন। শিশুর পরিকল্পনায়ও তিনি অংশ গ্রহণ করবেন, এবং কোনরকম বিধ্বংসী বা অসামাজিক পরিকল্পনাকে ইংগিত দ্বারা অন্যপথে পরিচালিত করবেন। তা ছাড়া শিশুদের দলীয় কর্মে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে শিশুদের অজানিতে শিশুদিগকে পরিচালনা করবেন। যে সকল শিক্ষাবিদ্ শিশুশিক্ষায় কর্মকে সকলের উপর স্থান দিয়েছেন, তাঁদের বোধহয় একটা ভুল হচ্ছে, অন্ততঃপক্ষে এটা আমাদের বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে। যে দেশে বাড়ীর শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষার ছোট সংস্করণ মাত্র সেখানে শিশুদিগকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে যান্ত্রিক প্রচেষ্টার স্থান নেই, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা কি? এখানে গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান। এ ব্যবধানকে ঘুচাবার জন্য শিক্ষকের সক্রিয় প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। অতএব কর্মের দর্শন যাইই হোক্ না কেন, বর্তমান পশ্চিম বাংলার গৃহের আবেষ্টনীগত শিক্ষা যতদিন পর্যন্ত সংস্কৃত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত শিশুদের উপর কর্মকে আরোপ করতে হবে এবং আরোপিত কর্মের উপর নির্ভর করে শিশুর জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

শিশুকে যথাসম্ভব সৃজনাত্মক কর্ম করতে দিতে হবে, তাহলেই শিশুর অসামাজিক মনোবৃত্তি দমিত হবে, কর্মের ও নূতন সৃষ্টির মোহে শিশু সামাজিক জীবে পরিণত হবে, স্বীয় দলের স্বার্থে নিজের স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে সহযোগিতা-মূলক কাজে প্রবৃত্ত হবে। ক্রমে সে শিক্ষার ফলে পূর্ণ নাগরিক হ'তে পারবে।

স্বাধীনতা

প্রতিভা রায়

মানুষের প্রাণের স্বাধীন সত্তা আজ জাগ্রত হইবার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, বর্তমানে যে সর্বত্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের হুড়াহুড়ি সে তাহারই অভিব্যক্তি। কিন্তু মানুষ কি জানে সে কোথায় পরাধীন? রাষ্ট্রক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা আসিয়াছে সত্য, কিন্তু স্বাধীন কি আমরা হইয়াছি? ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীনতা আসিয়াছে সত্য, কিন্তু স্বাধীন কি আমরা হইয়াছি? ব্যক্তিগত জীবন আজ নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত। এই অন্ধকারময় ভারাক্রান্ত জীবনের সমষ্টি লইয়া বর্তমান পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবই বিপন্ন। ইহাই কি স্বাধীনতার পরিচয়? তাহা তো নয়। ইহার মূলে রহিয়াছে চিন্তাধারার এক মহা অনর্থ। জীবনের অর্থ আজ কাল সমুদ্রে হারাইয়া গিয়াছে, নিপুণ ডুবুরীর ন্যায় জীবনের মাঝে ডুব দিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে জীবনের কি অর্থ, কোথায় আমাদের জীবনপথে চলার ছন্দের গোলমাল ঘটিয়া গিয়াছে।

এই প্রবন্ধে মেয়েদের দিকটারই একটু আলোচনা করিব। দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছে বলিয়া নারী সমাজ যদি মনে করিয়া থাকেন আমাদেরও স্বাধীনতা আসিয়াছে, এ ধারণা হইবে তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল। তাহাদের স্বাধীনতা আসে নাই, তাহারা পরাধীনতার যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছেন। নারী সমাজ বহু শতাব্দী হইতে পুরুষতন্ত্র সমাজের বিধিনিষেধের কঠিন পাশে আবদ্ধ ছিল, আজও রহিয়াছে। দীর্ঘদিন তাহারা নিজের অস্তিত্ব বোধকেই পুরুষতন্ত্রের মাঝে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহারা পুরুষের মাঝে নিজের অস্তিত্ব খুঁজিয়াছে, পুরুষের মানকেই নিজের মান বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, আজিও তাহাদের মনোবৃত্তি সেইভাবেই গঠিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহারও যে একটা নিজস্ব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে তাহা সে পুরুষতন্ত্রের চাপে ভুলিলেও তাহার স্বাধীন সত্তা তাহা মানিয়া লইতে পারে নাই। তাহারই বিকৃত রূপ আজ নারী প্রগতিরূপে সমাজ জীবনকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছে। পুঞ্জীভূত অনাদর লাঞ্ছনা ও অস্বীকৃত অস্তিত্ববোধের প্রেরণাই নারীকে ঘরের কোণ হইতে টানিয়া রাস্তায় বাহির করিয়াছে। নারী আজ ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু বাহিরে আসিয়াই কি সে স্বাধীন হইয়াছে, নিজের মূল্যে নিজকে খুঁজিবার, যাচাই করিবার চিন্তাধারা সে পাইয়াছে? তাহা সে পায় নাই, আজও সে তাই পুরুষের মুখের দিকে তাকাইয়া চলিয়াছে। সেইজন্য বাহিরে আসিয়া তাহাদের লাঞ্ছনা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। ভারতের বুকে লক্ষ লক্ষ নারী অসহায়, পথভ্রষ্ট, আত্মসম্মান বর্জিত। ইহার পরিণাম যে কি ভয়াবহ হইতে

চলিয়াছে তাহা কি নারী সমাজ উপলব্ধি করিতেছেন? কে ইহার প্রতিরোধ করিবে, নারী জাতি নয় কি? কিন্তু কোথায় তাহারা?

নারী জাতিকে প্রকৃত স্বাধীন হইতে হইলে, স্বাধীনতার আন্দোলন তাহাদিগকে করিতেই হইবে। এ আন্দোলন কাহারও বিরুদ্ধে নহে, এ আন্দোলন হইবে নিজেদের বিরুদ্ধে, নিজের জাতির বিরুদ্ধে। নিজেদের স্বাধীন সত্তার বোধকে জাগ্রত করিবার জন্য হইবে তাহার এই অভিযান। নারী শুধু একান্ত নারীই তো নয় সে যে মানুষ এই অনন্ত প্রবাহমান কাল-সমুদ্রের বুকে সে এক একটি মুক্ত মুক্ত জীবন প্রবাহ। সে কেন বিধিনিষেধের এত নিগড়ে আবদ্ধ রহিবে? সে কেন ভাবিবে পুরুষ ছাড়া সে চলিতেই পারে না, পুরুষ নিরপেক্ষ যে তাহারও একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা রহিয়াছে এ বোধ তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিতেই হইবে। ভারতবর্ষে আড়াইশত বৎসর ইংরেজের অধীনতা পাশে বদ্ধ থাকায় তাহার নৈতিক জীবনে যে অধঃপতন আসিয়াছিল, যাহার ভয়াবহ চিত্র সেদিন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার অভিব্যক্তি কংগ্রেসের আন্দোলন, হাজার হাজার প্রাণ বিনিময়ে রাষ্ট্রক্ষেত্রে সে আজ মুক্ত। আর বহু শতাব্দী ধরিয়া শাস্ত্রের কঠিন ভিত্তির উপর নারী জাতিকে সমাজ যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহাতে তাহারা আত্মসম্বিতহারা। এই গভীর আত্মবিস্মৃতি হইতে জাগ্রত করিতে হইলে তাহাদের স্বস্থানে, স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নারী জাগরণ আন্দোলন করা ছাড়া ইহাদের ঘুম ভাঙ্গানো অসম্ভব। শুধু আর্থিক সমস্যা সমাধানে ইহার মীমাংসা হইবে না, জীবনের জাগরণ ব্যতীত।

বর্তমান নারী সমাজ আজ কত স্তরে কত ভাবে বিপন্ন একটু চিন্তা করিলেই তাহার চিত্র ফুটিয়া উঠিবে। দারিদ্র্য পীড়িত দেশ, ইহার এক তৃতীয়াংশ দারিদ্র্যের নিপীড়নে নিষ্পেষিত। এই সকল পরিবারে নারী জাতির লাঞ্ছনার পরিসীমা নাই, না পায় শিক্ষা, না আছে স্বাস্থ্য, উপরন্তু স্বামীত্বের শাসন, সমাজের নানা প্রকার আইনের বাঁধন, জীবন তাহাদের প্রতিনিয়তই দুর্বহ, অথচ নিরুপায়। বর্তমানে আর একদল মেয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা, যাহাদের স্বামীত্বের কোন যোগ্যতাই নাই অথচ স্বামী সাজিয়া কতকগুলি জীবনকে ব্যর্থতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া পলাতক। কি করিবে এই অভাগিনী মেয়েরা, বর্তমান সমাজে কি তাহাদের কোন স্থান আছে? যে সমাজে কোন ব্যাপকতার আদর্শ নাই, শুধু স্ত্রী-পুত্র-কন্যাতেই সীমাবদ্ধ যাহাদের দৃষ্টি, সেই সমাজে ইহাদের লাঞ্ছনার কি পরিসীম আছে? আর একদল মেয়ে বিধবা, পুরুষতন্ত্র সমাজে যাহাদের কোনই মূল্য নাই, তাহাদের জীবন প্রেরণাহীন, অসার ব্যর্থ। সমাজ তাহাদের উপর সর্বপ্রকারের শাসন দণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, পদে পদে কেবল তাহারা শুনিতে পায় তাহাদের ত্রুটির কথা তাহাদের ব্যর্থতার কথা, আর তাহারা যে সংসারের এক অমঙ্গলের প্রতীক তাহারই কথা।

ইহারা শুধু সমাজের অবহেলিত হইয়া ঘরে ঘরে বেদনাপূর্ণ জীবন বহন করিয়া চলিয়াছে কে তাহাদিগকে বুঝাইবে যে তাহারাও মানুষ? কি অধিকার আছে সমাজের তাহাদের জীবনকে এমন করিয়া ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার? আর একদল অবিবাহিতা মেয়ে রহিয়াছে যাহারা অর্থের অভাবে শিক্ষার অভাবে, বিবাহের সময়েও এই অর্থাভাব নৈতিক কোন আদর্শ খুঁজিয়া পায় নাই, বর্তমান সমাজের উচ্ছৃঙ্খল আবেষ্টনে কামনার বহ্নি সঙ্গে লইয়া তিলে তিলে দগ্ধ হইয়া যৌবনে শুষ্ক পত্রের ন্যায় মলিন জীবন যাপন করে। ইহাদেরই এক অংশ শিক্ষা না থাকিলেও অর্থের চাপে বাধ্য হইয়া পতিত হইয়া পড়িয়াছে এবং পদে পদে পুরুষ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইতেছে। অপর একদল অবিবাহিতা মেয়ে শিক্ষিতা হইয়াছে বটে কিন্তু আত্মসম্মান বোধ তাহাদেরও ফুটিয়া উঠে নাই। পুরুষের বাহুপাশের মোহ তাহাদের কাটে নাই তাই প্রতি নিয়ত পথভ্রষ্টের ন্যায় যাচাই হইতেছে বিবাহিত জীবন যাপনের জন্য। ইহারা শিক্ষা পাইয়াছে কিন্তু জীবনের আলো, জীবনের পথ পায় নাই। ইহার উপর রহিয়াছে হাজার হাজার মুসলমান কর্তৃক ধর্ষিতা মেয়েদের সমস্যা। মেয়েদের সমস্যা যে জটিল পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই গভীর অন্ধকারের মধ্যে একস্তরের উচ্চশিক্ষিতা নারী আছেন কেহ বিবাহিতা, কেহ অবিবাহিতা, পথহারা অসহায় নারী সমাজকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব ছিল তাঁহাদেরই; ইঁহারা ছিলেন সমাজের কঠিন পাশ হইতে কিছুটা মুক্ত এবং চিন্তা জগতে কিছুটা অগ্রসর। কিন্তু কি বেদনার কথা ইঁহারাও আত্মবিস্মৃত, নানারূপ উপাধির মোহগ্রস্ত। নিজেদের স্থান কোথায়, নারী সমাজের কি ভয়াবহ পরিণতি ঘটিতে চলিয়াছে এ সম্বন্ধে ভাবিবার বা বেদনাবোধ করিবার মত মনোবৃত্তি তাঁহাদেরও জাগ্রত হয় নাই।

মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন, আত্মশুদ্ধির আন্দোলন একদল মেয়েকে লইতেই হইবে, নতুবা এই জটিল পরিস্থিতি হইতে নারী সমাজকে মুক্ত আলোকে আনা সম্ভব হইবে না। সম্বিতহারা নিশ্চল নিথর নারী জীবনে চিন্তার রাজ্যে এক বিপ্লব আনিয়া দিতে হইবে। তাহাদের স্বরূপ কি, স্থান কোথায়, শাস্ত্র এবং সমাজ কোথায় কেমন করিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যত্ব হইতে, অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া তাহাদের সামনে ধরিতে হইবে, যেমন একদিন কংগ্রেস পরাধীন দেশের জনসাধারণের সামনে ইংরেজ শাসকের দুরভিসন্ধির চিত্র আঁকিয়া তাহার আত্মসম্বিত ও পরাধীনতার জ্বালা জাগ্রত করিয়াছিল। নারী যদি স্ব মহিমায় আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাধ্য হইয়াই পুরুষ নিজের ত্রুটির অন্বেষণ করিবে, যোগ্য হইবে। পুরুষ ব্যতীত নারীর যেমন চলে না, নারী ব্যতীত পুরুষেরও সেইরূপ চলে না, কেননা একেরই অপরার্ধ অপরে, পুরুষ প্রকৃতি মিলিয়াই এই সংসার রচিত।

পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়েই মানুষ, এই বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে উভয়েই অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বস্তু এবং উভয়েই উভয়ের ক্ষেত্রে স্বয়ং মূল্যবান, নিজ স্বাতন্ত্র্যে

প্রতিষ্ঠিত। এই স্বয়ং মূল্যবান পুরুষ ও স্বয়ং মূল্যবান প্রকৃতি যেদিন উভয়কে উভয়ে মর্যাদা দান করিয়া, প্রাণ খুলিয়া মিলিতে পারিবে সেইদিন হইবে বিশ্ব সমস্যার সমাধান। মুক্ত দুইটি প্রাণের মিলনে যে বিশ্ব রচিত হইবে, সেই বিশ্বই স্বাধীন, মুক্ত। বিপ্লবময়ী শ্রীরাধা বিশ্বের নারী সঙ্ঘের বুকে জাগ্রত হউন, জয়যুক্ত হউন, তাঁহার স্পর্শে উচ্ছৃঙ্খল বিশ্ব সুশৃঙ্খল হউক, সুস্থ হউক।

মনের গহনে

সুবোধ সেনগুপ্ত

মানুষের মন! আপাতদৃষ্টিতে কে তাকে বুঝতে পেরেছে! অতীতকালের মুনিঋষিরা দৈবশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা পূর্বাহ্নে বুঝতে পারতেন মানুষের মন, সেই অন্দরের বিভেদ করে তাঁরা দান করতেন; কিন্তু বর্তমান যুগে সে শক্তির অধিকারী কে আছেন? মনস্তত্ত্ববিদ্ মনঃসমীক্ষণবিদ্ আজ মনের খবর রাখেন শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু তার জন্য কত বিষয়বস্তু, অবস্থা ও আপেক্ষিকতার অবতারণা প্রয়োজন হয় কিন্তু তাও সত্যিকারের সুরের পর্দায় ঘা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। মনের সংঘাত ও দ্বন্দ্বের দোলায়মান অবস্থায় এক সামান্য চিত্তের খেই ধরতে পারা মনঃসমীক্ষণবাদীদের স্থূল বৈজ্ঞানিক মনের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই অবচেতন মন আজও অবচেতন অবস্থায়ই রয়ে গেছে, কোন কূল কিনারা তার হয়নি।

মনীষের মনটা আজ ভারী খারাপ, কেন খারাপ সে বলতে পারে না। দূরদেশ মুসৌরীতে সে যাচ্ছে, তাই কি? দূরদেশে কত লোকই ত যাচ্ছে, সেও কতবার গেছে, কই তার মনের এমনি অবস্থা ত কোনদিন হয়নি। সন্ধ্যায় তার গাড়ী। সারাটা দিন শুয়ে বসে সে কাটিয়ে দিলে, কোন কিছু তার ভাল লাগছে না। ভাবছে কখন সন্ধ্যা হবে, কখন সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়বে। তাহলে কি

যাত্রার আনন্দের জন্যই তার এ অধীরতা? অধীরতার আনন্দ তবে মনীষের মনটাকে এমনিভাবে বিকল করে দিলে কেন?

এলোমেলো অনেক কথাই এসে মনীষের মনের মণিকোঠায় আঘাত করতে লাগল, কিন্তু কোনটিকেই সে তার মনের অস্বাচ্ছন্দ্য অবস্থার কারণ বলে নির্দেশ করতে পারলে না। তার মন কি যেন চাইছে, কিন্তু কিইবা সে চাইতে পারে? মনীষ উমাকে ভালবাসে। তার দিক থেকে কোন অভিযোগ নেই, এবিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। দু'দিন আগে মনীষের সঙ্গে উমার দেখা হয়েছে। বাধা দেওয়া ত' দূরের কথা তার মুসৌরী যাত্রার কথা শুনে উমা খুশীই হয়েছে। বলেছে, "তুমি যে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবার অবসর পেয়েছ এতে আমি সবচেয়ে খুশী হয়েছি। কিন্তু কথা দিয়ে যেতে হবে আমাকে একটি বিষয়ে।"

মনীষ বলেছে, "কি কথা দেব?"

উমা হেসে বলেছে, "ভাল থাকবে কথা দাও।" মনীষের কাছে উমার এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে যাওয়াটা মোটেই ভাল লাগেনি। সে ভেবেছিল উমা অনেক করে বিচ্ছেদের কথা তুলে তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করবে, আর সেও বিনিয়ে বিনিয়ে কথার প্রতিধ্বনি তুলে শেষটায় উমার মত চেয়ে নেবে। কিন্তু উমা মনীষের মনের বিকল অবস্থার ধার দিয়েও যায়নি, সোজাসুজি চলে যাওয়ার খবরে অনুমতি ত' দিলই, আনন্দও প্রকাশ করল। যখন দুজনের পক্ষে এক হয়ে যাবার সম্ভাবনা, তখন উমার একি ব্যবহার? তবে কি—মনীষ ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠেছিল। না না তাও কি হয়? তবে তার এ রকম হৃদয়হীনতা কেন? শেষ পর্যন্ত উমা কি দূরে সরিয়ে দিতে চায়?

মনীষকে নির্বাক দেখে উমা আবার বলেছিল, "কি, জবাব দিচ্ছ না যে বড়।"

"কিসের জবাব?"

"যে কথা আমি তোমার কাছ থেকে চেয়েছি?"

মনীষ অভিমানভরে জবাব দিয়েছিল, "আমার ভাল থাকায় তোমার কি আসে যায়?"

"আসে যায়, না যায় না, সে আমি বুঝব, কিন্তু তুমি এমনভাবে চুপ করে গেলে কেন? কি হয়েছে? ভাবছ, আমি তোমাকে এমন করে যেতে দিতে চাইলাম কেমন করে? আরও যা ভেবেছ তা আর মুখে এনে তোমাকে বিব্রত করতে চাই না। কিন্তু কেন এম্নি করে ভাব বলতে পার? যে মানুষকে চিনতে চেষ্টাও করবে না তাকে আবার ভালবাসতে যাওয়া কেন? ভালবাসাকে ও রকম করে গণ্ডীভূত করতে যদি চাও তাহ'লে তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হবে, একথা আমি আগেই বলে রাখছি—একীভূত হবার কথা তুমি অনেকদিন বলেছ, কিন্তু এই তার রূপ? কাছে টেনে রাখতে চাইলেই কি তা সব সময়ে পারা যায়? আর কাছে থাকলেই কি ব্যবধান শূন্য হয়ে গেল? স্থূলে দূরত্বই কি মিলন বিচ্ছেদের শেষ কথা? তোমাকে

আমি কি বোঝাব? তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তোমার কাছে ত' এসব কথা নূতন কথা নয়।"

মনীষ লজ্জা পেয়েছিল, কথার ফাঁকে কথাকে আটকে দিয়ে নিজের ত্রুটীও স্বীকার করতে পারছিল না। সে আমতা আমতা করে বলেছিল, "মনের চিন্তার গতিকে অস্বীকার করে আমার ত্রুটীর মাত্রা বৃদ্ধি করতে চাই না উমা। তুমি যা বলেছ আমি সব বুঝি তবে নিজের বেলাই আমার যা একটু বুঝতে দেরী হয়, কিন্তু অপরের ক্ষেত্রে আমি ঠিকই বিশ্লেষণ করতে পারি।"

উমা হেসে বলেছিল, "মাষ্টারী করিনি তবু আমাকে বক্তৃতায় কেন পেয়েছিল বুঝে উঠতে পারিনি, হয়ত তোমাকে সাময়িকভাবে হারাব সেই চাঞ্চল্যই প্রাণপণে দমন করেছিলাম। আচ্ছা, বুঝতে পারছ না তোমার শরীরের অবস্থা কি হয়েছে? একটু পরিবর্তন দরকার, একমাসের জন্যই ত যাচ্ছ, তারপর শরীর ভাল করে ফিরে এলে আমরা সবাই কত খুশী হব বলত।"

"আমার বহুবচন?"

"হ্যাঁ বহুবচন। বহুর মধ্যে আমিও একজন, তোমার বাবা মা ভাইবোন সকলের মধ্যেই আমি একজন। দুঃখ করোনা শরীর সারিয়ে এসে তোমার উমাকে তুমি আগের মতই পাবে, সামান্য ব্যতিক্রমও দেখতে পাবে না।'

সময়ের ব্যবধান?"

"সময়ের ব্যবধান আমার কাছে হেরে যাবে।"

"হিসেবে তোমার ভুল আছে উমা।"

"কখনও নয়, হিসেবে আমার ভুল হয় না।"

মনীষ হেসে বলেছিল, "হয়, যেমন এবার হয়েছে, সময়ের ব্যবধানে যদি তোমার মুখে কুঞ্চনের সৃষ্টি করে, যদি কালো কেশদামের মধ্যে একটি চুলের রং পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে, যদি 'এই দোকানে সুদৃশ্যভাবে দাঁত বাঁধান হয়' একথাটা লক্ষ্য করে তার উপরই আকৃষ্ট হয়ে পড়?"

উমা মনীষের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিল "এবার বুঝি ফাজলামো আরম্ভ হল। কিন্তু জবাবও দিয়ে দিচ্ছি, পুরুষ মানুষের মন বাইরের চটকে ভুলে যায়, এ স্বতঃসিদ্ধ কথাটা মনে রেখেও তোমাকে মুসৌরী যেতে সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি; ভয়ের সম্ভাবনা আমার দিক থেকে নেই তবে লজ্জা ও বেদনা পাবার সম্ভাবনা মুসৌরীর দিক থেকে একেবারে যে নেই সে কথা জোর করে বলতে পারছিনা।"

মনীষ উমার মুখ চেপে ধরেছিল, বলেছিল, "থাক্ থাক্ ঝগড়ায় আর কাজ নেই।" উমা হেসে বলেছিল, "তুমিই ত কথা বাড়ালে, আমি শুধু বলেছিলাম— ভাল থাকবে কথা দাও।"

মনীষ উমাকে কথা দিয়ে এসেছিল সে ভাল থাকবে। তারপর দুদিন তাদের দেখা হয়নি। ইচ্ছে করেই শেষ মুহূর্তের দেখাশুনাকে তারা বন্ধ করে দিয়েছিল।

প্রয়োজন ছিল মনের দিক থেকে, প্রয়োজন ছিল সমাজের দিক থেকেও।

এবার উমার দিক থেকে তার মন স্বচ্ছ, তবে মন তার ভারাক্রান্ত কেন? মনীষ আর ভাবতে পারে না। সে বিছানা ছেড়ে উঠে জিনিষপত্র গোছাতে চেষ্টা করল। গোছানো আছেই। সুটকেসের জিনিষগুলি এলোমেলো করে আবার গুছিয়ে নিল সময় কিছু কাটবে ভেবে।

ছোটভাই আর বোন সে ঘরেই ছিল। বোন ছোটভাইকে বলল, "দেখছিস, দাদার কি রকম মুখোবেশী মনো কিনা তাই আমাদের সাথে কথাও বলছেন না।"

ছোটভাই বলল, "হবে না কেন? তুই যদি যেতিস তাহলে তোরও এমনি অবস্থা হত। ওটা দেমাক নয়রে, ওটা হচ্ছে নার্ভাসনেস।"

বোন ভাইয়ের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "নার্ভাসনেস না ছাই, যাবার সময়কে এগিয়ে আনবার জন্য অনর্থক কাজ নিয়ে সময় কাটানো, পাছে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তাই জিনিষ গোছানো।"

হাসি ঠাট্টায় মনীষের মনটাও একটু হাল্কা হয়ে এল। ভাইবোনদের সঙ্গে কতক্ষণ হৈচৈ করে কাটিয়ে দিল। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। যাবার সময় উপস্থিত।

পাঞ্জাব মেল। মধ্যম শ্রেণীর কামরা। এই কামরার সবগুলি আসনই সংরক্ষিত। মনীষের আসনের নম্বর ৭, অর্থাৎ মধ্যের বেঞ্চিতে একটা আসন। প্রায় ৩০ ঘণ্টা ঐ মাঝের বেঞ্চিতে গরমে স্যাণ্ডুইচ্‌ট্ হয়ে কাটাতে হবে ভেবে সে একটু ভাবান্বিত হ'ল যাক্, কি আর করবে। কিন্তু ভগবান সদয়। ১২ নম্বর আসনের অধিকারী বাঙ্কের ওপর জায়গা করে নিয়ে জানালার পাশের ১২ নম্বর আসন মনীষকে দিয়ে দিল। বলাবাহুল্য মনীষ খুব আনন্দিত হল। সেই ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে সে আসনে এসে পড়ল।

বসবার স্থান সম্বন্ধে যে উত্তেজনা তার মনের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে এসেছিল, সে উত্তেজনা বিলীন হবার সাথে সাথে মনীষের মন আবার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। দিনের মানসিক ভাব তাকে আবার পেয়ে বসল। সে জানলার মধ্য দিয়ে প্ল্যাট-ফর্মের দিকে রইল তাকিয়ে। অগুন্তি মানুষের মাথার উপর দিয়ে তার চোখ যেন কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। তার সজ্ঞান মন চাইছে কোন পরিচিত লোককে, কিন্তু অবচেতন মন কি তাই চাইছে? হঠাৎ মনীষ বুঝতে পারল সে চাইছে উমাকে, পৃথিবীর আর কাউকে নয়। উমার স্টেশনে আসবার কোন সম্ভাবনাই নেই। বিচ্ছেদের যে বাইরের রূপকে এড়াবার জন্য তারা দু'দিন দেখা করেনি সেই অবস্থাকেই সে মনে মনে চাইছে একথা মনে করে সে নিজের মনেই হেসে উঠল। দিনের ভারাক্রান্ত মনের হিসেব মিলে গেল। অদ্ভুত মন আর অদ্ভুত তার প্রকৃতি! মনে মনে যাকে সে একান্তভাবে চাইছে, তাকেই সে কতবার নিষেধ করেছে সে যেন কোন কারণে স্টেশনে না যায়। মনীষ বুঝতে পারে উমা তাকে কত ভালবাসে, কত সহজভাবেই না তার নির্দেশ ও যুক্তি গ্রহণ করেছিল, দু'দিন সে দেখা পর্যন্ত

করেনি। স্টেশনে দেখা করার বিপক্ষ যুক্তিও সে সহজ ভাবেই বুঝতে পেরেছিল। অথচ এদিকে মনীষের নির্জ্জন মন উমার সংগে দেখা হতে পারে আশা করে বসে আছে. এমন কি ঐ মনের প্রভাবের ফলেই ভাইবোন স্টেশনে আসতে চাইলে নানা অজুহাতে তাদের নিরস্তও করেছিল।

নির্জ্জন মনের খবর যখন সজ্ঞানে এসে যায় তখন মনের দ্বন্দ্ব স্তিমিত হয়ে যায়, মন সাধারণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মনীষের মন তৎক্ষণে সুস্থ হয়ে এসেছে। সুস্থ মন নিয়ে সে বিচার করে দেখল পূর্বের যুক্তিগুলো সবগুলোই ঠিক আছে। বিপরীতমুখী মনের চিন্তাধারার সমন্বয়ে সে সুস্থবোধ করল. মনের প্রফুল্লতা ফিরে পেল।

কামরাটিতে কারা এসেছে. কারা বসেছে. কে কোথায় যাবে মনীষ কিছুই জানে না. জানবার ঔৎসুক্য তার কিছুমাত্র নেই. সেজন্য ইচ্ছা প্রকাশও সে করেনি, সে সময়ও তার ছিল না। এতক্ষণে তার সময় হল। সে জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কামরার ভিতরের লোকগুলির দিকে একবার তাকিয়ে নিলে। সে ছাড়া এগারজন যাত্রী। তার মধ্যে বাংগালীর সংখ্যা ছয় আর বাকী সব নানা প্রদেশের অধিবাসী। বাংগালী যাত্রীর মধ্যে তিনজন পুরুষ, তিনজন মহিলা। তাদের কথাবার্তার মধ্যে জানা গেল বাংগালীর দল সকলেই যাচ্ছেন অমৃতসর। তারপর সেখানে ২।৪ দিন থেকে যাবেন ভূস্বর্গ শ্রীনগরে। বাংগালী যাত্রীর মধ্যে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। কথাবার্তায় বোঝা গেল তিনিই দলের নায়ক নাম রাজেনবাবু, কলকাতার কোন কলেজে অধ্যাপনা করেন, সংগে বর্ষীয়সী স্ত্রী। অপর দুজন পুরুষ যাত্রীকে যুবক বলে অভিহিত করা যায়, বয়স ২৭।২৮ এর মধ্যে। রাজেনবাবুর স্ত্রী ছাড়া আরও যে দুটী মহিলা আছেন তারা বর্ষীয়সীর প্রায় কন্যা-স্থানীয়া বলে মনে হ'ল, তবে কন্যা নয়। মেয়েদের বয়স অনুমান করা কঠিন আর সমীচিনও নয়, তবে তারা যুবতী, এসম্বন্ধে নিঃসন্দেহে মত প্রকাশ করা চলতে পারে।

মনীষ যে বেঞ্চটায় বসেছিল সেই বেঞ্চের শেষের দিকের কোনে বসেছেন বর্ষীয়সী মহিলা বীণাদি। তারপর আর দুজন মহিলা, মনীষ বসেছে শেষের দিকে। মনীষ একবার সকলকে ভাল করে দেখে নিয়ে আবার জানলা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিলে। পূর্বে যখন প্ল্যাটফর্মের দিকে সে তাকিয়েছিল, তখন সে অগুন্তি মানুষের দিকে দেখেনি। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত লক্ষ্য ছিল কালোপেড়ে শাড়ীখানার অধিকারিনী কখন এসে জীবন্ত হয়ে দেখা দেবে সেই দিকে। এবার বাস্তবে ফিরে সে জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল। লোকজন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলাফেরা করছে, যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মুখেও ব্যস্ততার ভাব। গাড়ী ছাড়বার মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকী। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এ দরজায়, ও জানালায় উঁকি মারতে মারতে এসে দাঁড়ালেন প্রায় তারই কাছে। ঠিক তারই

পাশে যে মেয়েটি বসেছিল তারই মুখোমুখী হয়ে সেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটীর দিকে তাকিয়ে থেকে ভদ্রলোক বল্লেন, 'তুমি চলে যাচ্ছ রিণি?' একটু চুপ করে থেকে রিণি উত্তর করল "হ্যাঁ।"

"আমাকে ত একদিনও বলোনি রিণি" ভদ্রলোক ব্যথিত কণ্ঠে বললেন।

রিণি চুপ করে রইল।

মনীষ সব শুনছিল। অপরের কথা শুনতে চেষ্টা করা তার স্বভাব নয়, কিন্তু তার উপায় ছিলনা। তার কারণ রিণি তার পাশের মেয়েটীকে এড়াবার জন্যই হয়ত মনীষের গা ঘেঁষে বসে ভদ্রলোকের কথার জবাব দিচ্ছিলেন। মনীষ একবার অনিচ্ছা সহকারে দুজনের দিকে তাকাল, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল। এক দৃষ্টিতে সে যতটুকু দেখেছে তাতে তার মনে হ'ল ভদ্রলোক একটু বয়স্ক, কিন্তু সুপুরুষ। রিণির বয়স ভদ্রলোকের তুলনায় যথেষ্ট কম। যে দুটী কথা মনীষ শুনতে পেয়েছে তাতে সে ভদ্রলোকের মনের আবেগের পরিচয়ই পেয়েছে। অতএব উভয়ের সম্পর্ক যে খুব একটা সহজ এবং শুধু পরিচিতের পর্যায়েই পড়ে একথা মনীষের মনে হ'ল না। মনীষ উভয়ের কথাবার্তা এড়াবার জন্যই কামরার ভিতরের দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু কথাগুলো অনিচ্ছা সত্বেও মনীষের কাণে প্রবেশ করেছিল।

"রিণি চুপ করে আছ যে?" ভদ্রলোক আবার ব্যথিত কণ্ঠে বললেন।

"কি বলব বিনয়দা, বলবার কি আছে?"

"বলবার কিছুই কি নেই? আচ্ছা বেশ, কিন্তু একবার শুধু বলে যাও কেন না জানিয়ে চলে যাচ্ছ? আমি তোমাকে কখনও বাধা দিতুমনা সেকথা ত জান।"

"হ্যাঁ জানি তবুও বলিনি।"

"কেন বলোনি" ভদ্রলোক অধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

"বলিনি আপনি ব্যথা পাবেন বলে।" রিণি রুদ্ধ কণ্ঠে বল্লে।

"আমি ব্যথা পাব, তাই তুমি আমাকে না জানিয়ে চলে যাবে? একথাই যদি মনে ভেবে থাক তবে একথাটাও কি ভাবলে না, আমাকে না জানিয়ে অনিশ্চিত কালের জন্য যে তোমার এই যাত্রা, এই যাত্রা আমাকে কতখানি ব্যথা দিতে পারে।"

"সেই কথা জানি বলেই ত, না জানিয়ে চলে যেতে চাইছি।"

"তার ফল কি হবে ভেবেছিলে?"

"ভেবেছি।"

"কি?"

"ভেবেছিলুম আপনি আমার মত মেয়েকে ভুলে গিয়ে নূতন করে জীবন আরম্ভ করবেন।"

ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন, "দুঃখের মধ্যেও হাসালে রিণি, নূতন করে জীবন আরম্ভ করতে উপদেশ দেওয়া সহজ কিন্তু সবাই সব কাজ পারে না। যাক্ আমার কথা; তোমার গাড়ী ছাড়বার সময় হয়েছে। আমার নিজের দিক থেকে তোমাকে

কিছু বলবার নেই, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমার সর্বপ্রকার মঙ্গল করুন।"

রিণি চুপ করে রইল। গাড়ী ছাড়ার সময় পার হয়ে গিয়েছিল। গাড়ী তবু ছাড়েনি। বোধহয় কোন যান্ত্রিক গোলযোগ।

বিনয়বাবু বললেন "কেমন থাক মাঝে মাঝে চিঠি দিও রিণি।"

রিণি যেন সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে বলে উঠল, "না দেবনা। আমায় মাপ করবেন বিনয় দা।"

"কেন দেবে না?"

"আপনি কি কিছুই বুঝতে পারছেন না, আমি কেন চলে যাচ্ছি।"

"না।"

"যাচ্ছি আপনার ভালর জন্য, আপনি সুখী হোন তাই আমি চাই।"

"রিণি, উপদেশ দিয়ে দায়িত্ব এড়ান চলে, আর কিছুই তাতে হয় না। আমার কঠোর মন্তব্যকে তুমি এই যাত্রাক্ষণে মাপ করে নিও। তোমাকে আঘাত দিতে একথা বলিনি। বলেছি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য। যদি দায়িত্ব কখনও নাও তাহ'লে এভাবে এড়িয়ে যেওনা।"

"একটা কথা বলব বিনয়দা?"

"স্বচ্ছন্দে বল।"

"যদি আঘাত পান?"

"উপায় নেই তবুও তুমি বল।"

"যদি গাড়ী ছেড়ে দেয়, কথা না শেষ হয়?"

"তবুও বল, তোমার না বলা কথার রেশটুকুর অর্থকে আমি ভুল ব্যাখ্যা করব না, কথা দিচ্ছি।"

রিণি চুপ করে রইল। বিনয়বাবু বল্লেন, "সময় বড় কম, চুপ করে থেকো না।"

রিণি একবার ঢোক গিলে বল্ল, "আমি ভাবছিলাম, আমাদের উভয়ের জীবনের এক মস্তবড় প্রশ্নের কথা।"

"কি সে প্রশ্ন?"

"আমাদের উভয়ের বয়সের পার্থক্য আমাকে অতিমাত্রায় ভাবিয়ে তুলেছে বিনয়দা। এ কখনও সুখের হতে পারেনা। বয়সের পার্থক্য আমাদের মধ্যে একদিন না একদিন ছেদ টেনে দেবে, তাই আগে থাকতেই সাবধান হচ্ছি।"

"সাবধান হওয়াটা একান্তভাবেই স্থির করেছ তাহ'লে?"

"হ্যাঁ, তাত দেখতেই পাচ্ছেন। তাই আমি চলেও যাচ্ছি।"

"মানুষ এম্নিভাবেই ভুল করে, যাক্, তোমার চিন্তাধারার ভুল ত্রুটী ধরে তোমাকে বিব্রত করতে চাইনা। আর আজ সে ভুল ত্রুটীকে তুমি স্বীকারও করতে

পারবে না, যদি না সময় একদিন এসে মীমাংসা করে।"

"ভবিষ্যতের আশায় থাকবেন না বিনয়দা, তাতে দুঃখ বাড়বে বই কমবে না।"

বিনয়বাবু হেসে বললেন, "যে দুঃখ তাতে পাব সেটা আজকের দুঃখ থেকে মোটেই বেশী হবে না। অতএব সে অনাগত দুঃখের জন্য তুমি চিন্তিত হয়ো না।"

বিনয়বাবু প্ল্যাটফর্মের দিকে একটু সরে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে তারপর রিণির কাছে এসে হেসে বলেন, "তোমাদের গাড়ী দেখছি আজ ছাড়বে না, এখনও আনলোডিং রয়েছে।"

"আপনি যেমন চাইছেন গাড়ী তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিক?"

"আমি চাইছি কিনা বলতে পারব না, তবে গাড়ী ছাড়ার সময় পার হয়ে ১৫ মিনিট হয়ে গেছে।"

রিণি চুপ করে রইল। দু'মিনিট সময় কাটল উভয়পক্ষই চুপচাপ। রিণি প্রথমে কথা বলে "চুপ করে আছেন যে বিনয়দা।"

"যে কটা মিনিট আছে, আর কথা কাটাকাটি করতে ইচ্ছে করছে না। অতীতে উভয়ে বহু ঝগড়া করেছি অনেক কথা কাটাকাটি আমাদের হয়েছে কিন্তু সেই সময়ের সঙ্গে আজকের এই মুহূর্তের পার্থক্য যথেষ্ট। তাই বৃথা কথার জাল ছড়িয়ে এই মুহূর্তটাকে অসুন্দর করতে ইচ্ছে করে না।"

"পার্থক্য কেন ?"

"পার্থক্য বুঝতে পারছ না? আশ্চর্য! অতীতে উভয়ের মন ছিল একই সুরে বাঁধা, আজ আমার সুর তোমার কাণে বেসুরো বাজছে, আজ আমার আন্তরিক আশীর্বাদও তোমার কাছে সহজ অভিনন্দন দাবী করতে পারবে না, অথচ অতীতের কথা স্মরণ করে দেখো প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকারের কথা, তর্কের স্রোতে দু'জনে ভেসে গেছি, আঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দেখাশুনা শেষ হয়েছে তবু বিদায়ের পূর্বক্ষণে উভয়ের মন স্বচ্ছ নির্মল আকাশের মতই প্রতিভাত হয়েছে। যাক সে কথা, যে কারণ তুমি দর্শিয়েছ, সে যুক্তিকে খন্ডন করি এমন সামর্থ্য আমার নেই। মানুষ অনেক কিছুই চেষ্টা করে সফলকাম হতে পারে, কিন্তু পারে না সময়কে থামিয়ে রাখতে। রক্তচক্ষু দেখিয়ে মনকে শাসন করতে পারব কিন্তু বয়সকে পেছন দিকে সরিয়ে নিয়ে আসা অসম্ভব।

"বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের যে ক্রম পরিণতি হতে থাকে, তা কি আপনি স্বীকার করেন না?"

"করি বইকি, ডাক্তার আমি, মনোবিদ্ আমি, স্বীকার আমি করব না ত করবে কে? তবে তার মধ্যেও কথা আছে, সে কথা আজ থাক।"

"থাকবে কেন?"

"বুঝবে না বলে। বুঝবার মত মনের অবস্থা নেই বলে।"

"এ কথার মানে?"

"একদিন তুমিই বুঝতে পারবে, তখন হয়ত আমি বেঁচে থাকব না—খুব মেলোড্রামাটিক্যালি বলেছি বলে মনে করো না, প্রকৃতির নিয়মকে মেনে নিয়ে তোমার কথাকেই আমি সমর্থন করে যাচ্ছি মাত্র।"

হঠাৎ গাড়ী নড়ে উঠল। দুজনে তন্ময় হয়ে কথা বলছিল, গার্ডের বাঁশী যে বেজেছে তা কেউ খেয়াল করেনি। মনীষ সব কথাগুলিই শুনছিল, বেদনার অনুভূতিতে তার মনটা মুষড়ে গিয়েছে। গার্ডের বংশীধ্বনী সে শুনেছিল, ইচ্ছে হয়েছিল উভয়ের কথার স্রোত বন্ধ করে দিয়ে উভয়ের বিদায়ের ক্ষণটিকে একটু প্রীতিপূর্ণ করে তোলে, কিন্তু তার কি অধিকার। সে ত সম্পূর্ণ অনাহূত, সে চুপ করে রইল।

গাড়ী ছেড়ে দিল। বিনয়বাবু রিণির হাতখানা ধরে বলল, "ভিক্ষা তোমার কাছে চাইনা না, কারণ সে সম্পর্ক কোনদিন আমাদের ছিল না। তবুও যাবার প্রাক্কালে অনুরোধ রইল যদি আমাকে জীবনে প্রয়োজন হয় তুমি নিঃসংকোচে তোমার মনোভাবের যে কোন স্তরে এসো, আমার বন্ধুত্ব তুমি কখনই হারাবে না।

গাড়ী দ্রুতবেগে চলতে আরম্ভ করল। বিনয়বাবু পিছিয়ে পড়লেন। গাড়ী প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে চলে গেল। মনীষ রিণির দিকে তাকিয়ে দেখলে না, সে তাকিয়ে রইল ফেলে আসা আলোকসজ্জিত হাওড়া স্টেশনের দিকে। যে প্রাণ সেখানে রেখে এসেছে, তারই উদ্দেশে শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করল।

কামরার ভিতরে তখন বিছানা পাতবার তাড়া লেগে গেছে। কারও শীগ্গীর নামবার কথা নয়। সবচেয়ে প্রথমে যিনি নামবেন তিনি নামবেন ১৯ ঘণ্টা পরে লক্ষ্ণৌএ। অতএব যে ভাবে পারা যায় নিজেকে গুছিয়ে নেওয়াই যুক্তিসংগত। প্রায় সকলেই ব্যস্ত, ব্যস্ত নয় শুধু মনীষ আর রিণি। রাজেনবাবু আর দলের অপরেশবাবু মাঝের বেঞ্চেতে জায়গা করলেন। বীরেনবাবু মেঝেতে বিছানা পাতলেন। তার কাছেই বিছানা পড়ল রিণির সংগী ও সমবয়সী মেয়েটীর, নাম তার গীতা। বীণাদি অর্থাৎ রাজেনবাবুর স্ত্রী দুই বেঞ্চির মাঝখানের স্থানটিকে কাজে লাগালেন। রিণির ভাগে রইল বেঞ্চির তিনটী আসন অর্থাৎ বিছানা পাতবার মত যথেষ্ট স্থান, আর মনীষ রইল তার নির্দিষ্ট ১২ নম্বর আসনে।

রাত্রি বেশী হয়নি। সকলেই কথা বলছিল। বীরেন ব্যবসায়ী, সে এক সহযাত্রী মাড়োয়ারীকে ধরে ব্যবসার কথা ফেঁদে বসল। রাজেনবাবু আর গীতা দর্শনশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। অপরেশ চুপ করে আড় হয়ে শুয়েছিল। বীণাদি রিণিকে ডেকে বললেন, "স্টেশনে ঐ ভদ্রলোক কে রে রিণি?"

"ডাক্তার রায়" রিণি জবাব দিল।

"কি রকম ডাক্তার? চিকিৎসক না অধ্যাপক?"

"চিকিৎসক এবং মনোবিদও বটে।"

"তোর সাথে পরিচয় কি করে হোল?"

"সে অনেক কথা মাসীমা, আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আমি শুয়ে পড়ছি।" বলেই রিণি শোবার জোগাড় করতে লাগল। মনীষের দিকে পা দিয়ে শোয়া অশোভন, তাই সে বালিশটা মনীষের দিকে রেখে শুয়ে পড়ল।

কথা বার্তায় তর্কে অনেকক্ষণ কাটল। মনীষের সঙ্গে এক রিণি ছাড়া সকলেরই পরিচয় হয়ে গেল। অপরেশবাবু ত মনীষকে নিমন্ত্রণ করেই ফেললেন, "চলুন না মনীষদা শ্রীনগরে, তার পর মুসৌরী এসে বিশ্রাম নেবেন।"। গীতাও আব্দার করেই বল্ল, ছোটবোনের কথা রাখবেন বলুন।'

মনীষ হেসে বল্ল, "আপনাদের আতিথ্য লাভ করা সৌভাগ্য বলে মনে করব, কিন্তু এখনও ত বর্দ্ধমান ছাড়িনি, যাত্রা সবে সুরু মাত্র, যাত্রা শেষে আমন্ত্রণ প্রস্তাব ঠিক থাকবে ত?"

গীতা উত্তর দেবার পূর্বেই বীরেন বল্ল "ব্যবসা করে খাই, কথা ঠিক রাখাই আমাদের ব্যবসার অঙ্গ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যে প্রস্তাব আমরা করেছি, আপনি সাহায্য করলে সে প্রস্তাব পালনে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

রাজেনবাবু বল্লেন, "বেশী দিন থাকতে না চাও, মোটে দু'দিন ভূস্বর্গে কাটিয়ে আসবে, এই আমাদের অনুরোধ।"

বীণাদিও অনুরোধ জানালেন, কিন্তু একটা কথাও বল্লেন না রিণি দেবী। সেই যে তিনি পাশ ফিরে শুয়েছিলেন, জাগ্রত কি ঘুমন্ত কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না। মনীষের বেদনাতুর মন একবার বিনয়বাবু আর একবার রিণিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার কি কোন সমাধান হয় না? কিন্তু কি করে হবে, পথ কোথায়—অলক্ষ্যে মনীষের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। হঠাৎ সে ঠিক করল সে রিণিদের সঙ্গে শ্রীনগরে যাবে, যদি রিণির সঙ্গে পরিচয়ের ফাঁকে মীমাংসার পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

অফুরন্ত চিন্তা। চিন্তার হাত থেকে কে কবে রেহাই পেয়েছে। চিন্তার ধরোয় হয়ত মানুষে মানুষে প্রভেদ রয়েছে, কিন্তু চিন্তাকে মানুষ লয় করতে পারেনি। মনীষ জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। বিনয় রিণির কথাগুলো উল্টে-পাল্টে বিশ্লেষণ করে দেখতে পেল রিণির আপত্তি রয়েছে শুধু বয়সের পার্থক্যের দিক থেকে, তারপর আর যতটুকু বিপরীত মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে তা ঐ পার্থক্যজনিত। কিন্তু তা ছাড়া কি আরও কোন কারণ থাকতে পারে না? ঈশপের সেই নেকড়ে ও মেষশাবকের কথা মনে পড়ে গেল। মানুষের মন যখন কোন কিছুকে যথার্থ বলে প্রমাণ করতে চায়, তখন সে চায় অন্যের উপর কিছুটা আরোপ করতে, যেটা অর্থহীন সেটা অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বিনয় রিণির দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে যে অবস্থাকে তারা খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, যে প্রশ্ন তাদের জীবনে শুধু হাসি ঠাট্টার ছলেই উঠেছিল, তাকেই আজ রিণি আঁকড়ে ধরে বিনয়কে বিদায় দিতে চাইছে। এই অর্থহীন আঘাতের তলায় আরও কিছু ত রিণির মনে দানা বেঁধে ওঠেনি? হয়ত

দানা বেঁধেছে, হয়ত বাঁধেনি। আচ্ছা, অপরেশ ছেলেটি কে? অল্পভাষী বলে মনে হল না, কিন্তু অবস্থার চাপে যেন তার মুখে একটা শুষ্কতার আবরণ এসে ঢাকা পড়েছে। মনীষ মুখ ফিরিয়ে অপরেশের দিকে তাকাল। অপরেশ তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে রিণির দিকে। এ দৃষ্টির অর্থ মনীষের কাছে অপরিচিত নয়।

সমস্যার জট ছাড়তে সবে সুরু হয়েছে মাত্র। মনীষ মুখ ঘুরিয়ে নিলে। যে দৃষ্টির সংগে মনীষের পরিচয় আছে বলে মনীষ ভাবলে, সেখানে তার ভুলও হতে পারে, কিন্তু যদি......যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে? আচ্ছা, কেন এমন হয়! আজ যদি রিণি বিনয়কে না ভালবাসতে পারে, যদি প্রায় সমবয়সী বন্ধুর প্রতি স্নেহ ভালবাসার পর্যায়েই উন্নীত হয়ে থাকে, তবে সে কথা বলবার সাহস রিণি হারিয়ে ফেলল কেন? রিণি যে সেদিকেও মন স্থির করতে পারেনি, সে বিষয়ে মনীষের সন্দেহ নেই। তবে কতদূর অগ্রসর হয়েছে? রিণি বিনয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, এ অবস্থায় বিপরীত শক্তি যে বিশেষভাবে সক্রিয় সেটা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়, কিন্তু যে দেহকে নিয়ে রিণি পালাচ্ছে তার ভেতরের যে মন, তাকে যে রিণি পেছনে রেখে যাচ্ছে, তাও ত অসত্য নয়। তাই যদি হয় তাহলে রিণি নিজেকে খাপ খাওয়াবে কি কি করে? মনীষ কিছুই বুঝে উঠতে পারে না, মনের সামান্য বিচ্যুতির জন্য কত বড় গভীর খাতের সৃষ্টি মানুষের মনে হয়ে যায়। মনীষ আর ভাবতে পারে না। হঠাৎ বিরক্তিতে মনীষের মন ভরে যায়, সে কেন এদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। পরের ব্যাপারে মাথা গলান তার যেন একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে মানুষের কতটুকু উপকার করতে পারে, কতটুকু তার ক্ষমতা! কিন্তু উপকার করার কথা ত নয়, এ যে সমাজের, তথা মানবহৃদয়ের মস্তবড় সমস্যা। কত মন ভেংগে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, কত জীবন বিফলতায় পরিসমাপ্তি ঘটছে। তাদেরও জীবন ত সুন্দর হতে পারত, এ ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত, দ্বন্দ্ব থেকে কি মানুষ উদ্ধার পাবে না? জীবনে জটিলতা না দেখা দিলে, জীবন সুন্দর হয় না, বৃদ্ধি পায় না, জীবনে ট্রাজেডি না এলে মহৎ কিছু সৃষ্টি হয় না, ভালবাসা না হারালে ভালবাসার মহানরূপকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, এসব কথা সুধীজন বলে থাকেন। কিন্তু কেন এসব নেতিবাচক ব্যবস্থা, ইতিবাচক ব্যবস্থাপ্রসূত সুন্দর জীবন কি একেবারেই লাভ করা যাবে না? হয়ত যাবে না, কারণ মন যেখানে সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে, সেখানে অন্যান্য ভাবধারা মনদ্বারা প্রভাবান্বিত হতে বাধ্য। আর সে আদিম বর্বর মনকে হয়ত শিক্ষিত করে তোলা যায় কিন্তু তার আদিম বর্বরতাকে বিনষ্ট করা যায় না।

মনীষের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল অপরেশের কথায়। "মনীষদা কি ঘুমের চেষ্টা করবেন না?" মুখ ফিরিয়ে মনীষ জবাব দেয় "জীবনে ভ্রমণ করতে বের হওয়া খুব কম সময়েই ঘটে থাকে, সেই ভ্রমণের প্রধান অংগ এই পথটুকু। এটুকুকে বিফলে কাটতে দিতে মন সরে না, অপরেশবাবু।"

"কিন্তু জানালা যে খোলা রয়েছে, ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে।"

"কার অসুখ করবে? আমার, না, রিণিদেবীর?" "না না আপনার কথাই বলছি, রিণিদেবীর দিকের জানালাগুলো ত সবই বন্ধই আছে।"

"আমার অসুখ করবে না অপরেশবাবু, বরং গরমে বসে থাকলে অসুস্থ বোধ করতে পারি। তা ছাড়া যদি অসুস্থও হই, তাহলেও এই গতিশীল আমির সঙ্গে সুন্দর রাত্রির প্রতি প্রহরের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।"

"বড় বেশী কাব্য হয়ে গেল মনীষদা, অসুস্থ হলে কিন্তু একাব্য ভাল লাগবে না।"

"ভাল লাগতেই হবে, মানুষের জীবনে কাব্য না থাকলে জীবন শুষ্ক হয়ে যায়, কাব্য জীবনে সরসতা আনে, সহজ জীবন আসে সরসতাকে আশ্রয় করে। সহজ জীবন যদি লাভ করা যায় তবেই জীবন সুন্দর ও সুস্থ হয়।"

"আপনার কথা ঠিক বুঝলুম না, তবুও ডাক্তার হিসেবে অনুরোধ করব শুয়ে পড়তে। বালিশ একটা মাথায় দিয়ে দরজার কাছের এই বড় ট্রাংকটার উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ুন, জানালা খোলা থাকুক তাতে অসুবিধা হবে না, কিন্তু যদি বাইরে মুখ নিয়ে বসে থাকেন তাহলে বিভিন্ন স্থানের রাত্রির বিভিন্ন আবহাওয়া আপনাকে সুস্থ থাকতে দেবে না মনীষদা।"

রাত্রি ১২টা বেজে গিয়েছিল, মনীষ অপরেশবাবুর কথামত অর্ধবিছানায় পা ঢেলে দিল, দেহের কিছুটা অংশ রইল শূন্যে। রিণিদেবী পূর্বেই কিছুটা সরে গিয়েছিলেন, তাই এভাবে শোওয়া সম্ভব হল, তা না হলে শুধু নিজ আসনে এভাবে শুয়ে পড়া সম্ভব হোত না। অপরেশবাবু বিছানা ছেড়ে উঠে কামরার বাতিগুলো নিবিয়ে দিলেন। অন্ধকার কামরায় ধীরে ধীরে সকলেই ঘুমিয়ে পরেছে শুধু নিদ্রা আসেনি মনীষের চোখে, আর কারও চোখে হয়তো আসেনি, কিন্তু তা বোঝবার উপায় ছিল না।

চলবে

জীবে দয়া

সুধাংশুশেখর মজুমদার

শ্রীগুরু ও বৈষ্ণব-মুখে শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

"জীবে-দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন
ইহাপেক্ষা ধর্ম নাই শুন সনাতন।"

এই নির্দেশের প্রথম সন্দেশ 'জীবে-দয়া'। ইহা মহাপ্রভুরই যোগ্য বাণী, কারণ তিনি নাম ধরিয়াছিলেন "বিশ্বম্ভর" এবং স্বয়ং বলিয়াছিলেন,—

"(প্রভু কহে) আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্বভরি।" চৈঃ চঃ, আদি, নবম

তাঁহার ভুবন-পাবন সাঙ্গোপাঙ্গগণ জ্ঞান-ভক্তির সন্ধানী আলোকে দেখিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে কৃষ্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মাধুর্যের ভজন জগৎকে জানাইতে অবতীর্ণ হইলেও তিনি আসলে কারুণ্য ও ঔদার্যের অবতার (জৈব ধর্ম ৩০৭ পৃঃ) এবং এই ঔদার্যের অনুরূপই হইয়াছে বৈষ্ণব-জগৎকে দেওয়া তাঁহার প্রথম নির্দেশ "জীবে-দয়া"। প্রেমই প্রয়োজন এবং এই অবতারে প্রেম দিবার আয়োজনই মুখ্য কিন্তু সর্ববিধ কল্যাণ বর্ষণ তজ্জন্য নিরাকৃত হয় নাই। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে—

"বোলেন বিদ্বান সব করিয়া বিচার
এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার॥
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্বদেশে দেশে
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে।
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে
পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে॥
অতএব ইহান শ্রীবিশ্বম্ভর নাম। চৈঃ ভাঃ আদি, ৩য়)

* * *

এই বিশ্বম্ভর নামের সার্থকতা দেখাইতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত-কার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতেই আমরা তাঁহার 'জীবে-দয়া'র পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই অর্থাৎ জীবে-দয়া বলিতে মুখ্যতঃ বুঝায় পারমার্থিক দয়া ও গৌণতঃ বুঝায় জীবের সর্ববিধ দুঃখ-দূর!

নামে যাহাতে রুচি জন্মে তজ্জন্য বলা হইয়াছে "নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার"; কারণ শাস্ত্র ত্রি-সত্য করিয়াছেন যে কলিতে "হরের্নামৈব কেবলম্।" বৈষ্ণবের সাধন-ভজনই 'নাম'; তাহার সহিত "বৈষ্ণব-সেবন" সংযুক্ত হইলে পরম

সংকৃতির ফলে তত্ত্ববেত্তা ও পরম কৃপালু বৈষ্ণবের কৃপায় জীব পথ ও পাথেয় পায়। নাম-জপ করিলেও সংসার-চক্রে ভ্রাম্যমান জীবের নূতন কর্মও আছে। কারণ যতক্ষণ না কর্মক্ষয় হয় ততক্ষণ কর্মের হাত হইতে নিস্তার নাই,—ক্ষণকালও না (ন তু ক্ষণমপি); প্রকৃতি জীবকে অবশ করিয়া (অবশাৎ) কর্ম করায়। জীব স্বভাব-কর্ম করিবেই, সেই কর্ম যাহাতে 'জীবে-দয়া' এই বাণী দ্বারা অণুরঞ্জিত ও অনুপ্রাণিত হয়, তাহাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের নির্দেশ!

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোচ্চারিত গীতার অধ্যাত্ম সাধনায় দেশ, কাল ও পাত্রের স্থান সর্বাগ্রে বিবেচ্য। জীবের স্বভাবধর্মকে জানিয়া ও মানিয়া, তার অনুল্লঙ্ঘ্য পরিবেশকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহারই উপর দাঁড়াইয়া নিত্যের প্রতিষ্ঠা ও নিত্য সত্যের প্রকাশ গীতা চাহেন ও তাহাই গীতার সাধন। তাই বৈষ্ণবগণ জগৎকে উপেক্ষা করেন না; তাহাকে ও তাহার সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্মকে ভগবদ্ভক্তি ও সেবায় প্রোজ্জ্বল করিতে তাঁহারা চাহেন। তাঁহারা বলেন, "হাতে কর গৃহ কাজ মুখে বল হরি।" সহজ বা স্বভাবজ কর্ম জীব করিবেই, যাহাতে সে কর্ম আত্মস্বার্থকে কেন্দ্র না করে তাহারই জন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব-সাধারণকে গৌণে নির্দেশ দিয়াছেন "জীবে-দয়া"।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য জীবকে দিতে আসিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্য ও দিয়া গিয়াছেন বিনা মূল্যে প্রেম! তাঁহার পার্ষদগণ 'বাঞ্ছাকল্পতরু', কৃপাসিন্ধু ও পতিতপাবন, এবং তাঁহারা প্রত্যেকে 'ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে হেন শক্তি' ধরেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রেম-দানই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম এবং চরম ও পরম কর্ম। 'জীবে-দয়া' বলিতে প্রেমদানই মুখ্য ও গূঢ় অর্থ বুঝিতে হইবে; কিন্তু মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণব 'জীবে-দয়া' বলিতে কি বুঝিবেন? তাহাদের পক্ষে এই 'দয়ার' অর্থ 'প্রেম' হইতে পারে না কারণ তাঁহাদের শক্তিই নাই, সম্বলই নাই ত' এই জাতীয় পারমার্থিক দয়া করিবেন কি করিয়া? যাঁহার যাহা সম্বল তিনি তাহাই দিতে পারেন। এই দান সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে দান ত্রিবিধ,—ধর্মদান, বিদ্যাদান ও অন্নবস্ত্রাদি দান এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দান যে অন্নাদি দান তাহাও বলিয়াছেন। কিন্তু দাতা ত' আপন সম্বল অনুসারেই দান দিবেন! অভাবীর পক্ষে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বিচারে লাভ নাই। যথাসাধ্য দানই দাতার পক্ষে কল্যাণ-প্রসূ। যাহা আছে তাহাই পরার্থে ত্যাগ করিবে ও সেবায় দিবে, ইহাই নির্দেশ। ত্যাগের গভীরতাই মেয়। দত্ত দ্রব্যের মূল্য মূল কথা নহে। দানের মাহাত্ম্য মূল্য দিয়া নিরূপিত হয় না। ধনী 'কনক-রতনে' রাজ-পথ ভরিয়া দিল কিন্তু ভিক্ষুর মন ভরিল না। শেষে ভিখারিণী নারীর জীর্ণ চীর শিরোধার্য হইল—সেই হইল শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা। এই ত্যাগ-দীক্ষাই ধর্মের মূল-শিক্ষা। "সব ধর্ম-মাঝে ত্যাগ ধর্ম সার ভুবনে"।

সার্ধ চারিশত বর্ষ পূর্বে যে কীর্তন রঙ্গ রুদ্ধদ্বার শ্রীবাসঅঙ্গনে গৌরাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন তাহার তরঙ্গ-মালায় যে শুধু সেদিন "শান্তিপুর ডুবু ডুবু", ও নদে ভাসিয়া গিয়াছিল তাহা নহে আজিও বাংলার প্রতি পল্লীতে প্রতি সন্ধ্যায় সেই হরি-

নাম বর্ণিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে—সে তরঙ্গের যেন বিরাম নাই। কিন্তু হায়! তাঁহার দত্ত "জীবে-দয়া" এই বাণীর ত' সেইরূপ দয়া হয় নাই; তাহা যদি হইত তবে বাংলার হরিসভাগুলিতে "হরি-ধ্বনি"র মধ্যে 'জীবে-দয়ার' সেবাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিত। ভুবন-পাবন বৈষ্ণবগণ গূঢ়ার্থ গ্রহণ ও পালন করিলেন কিন্তু সাধারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'জীবে-দয়ার' দায় এড়াইয়া গেলেন। সংকীর্তনে যেমন অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ বিচার আছে তেমনি অধিকারী ভেদে যে "জীবে-দয়ার" তারতম্য হইতে পারে, এ কথা উপেক্ষিত হইল। কুলীনগ্রামী ভক্তগণকে মহাপ্রভু স্বয়ং বৈষ্ণবের তারতম্য শিক্ষা দিয়াছেন।

"ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর মন্ত্র বৈষ্ণবতম। (চৈ চঃ মধ্য ষোড়শ)

বৈষ্ণবের তারতম্য অনুসারে 'জীবে-দয়ার' অর্থ-বিচার অবশ্যম্ভাবী। মহাপ্রভুর শক্তিগর্ভবাণী ব্যর্থ হইবার নহে। তাই আজ গৌড়জন রামকৃষ্ণ মিশন মারফৎ গৌরাঙ্গ-বাণী গ্রহণ করিয়াছে; চৈতন্য-নির্দেশ চেতনা পাইয়াছে কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশে চৈতন্যের গণ মহাপ্রভুর এই শক্তি ক্রিয়াকে আপন জ্ঞানে চিনিতে পারিতেছেন না। গৌরাঙ্গের গণ আজও ইহার অর্থের পূর্ণাঙ্গতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন না। সেবায় সঙ্গ দেওয়া ত' দূরের কথা কেহ কেহ ইহার প্রসঙ্গ পর্যন্ত চাহে না। রামকৃষ্ণ মিশনের 'জীবে-দয়া' বা সেবাধর্মকে কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্প্রদায়-বুদ্ধিতে দয়া ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। কখন কখন বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য শুনিবার দুর্ভোগ ঘটে। গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত কোন গ্রন্থে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম পড়িয়া আমরা মর্মাহত হইয়াছি। তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :—

"এক কুষ্ঠরোগী পথপ্রান্তে পড়িয়া আর্তনাদ করিয়াছে। তখন এক তথাকথিত জীবপ্রেমবাদী (কর্মী) সেই আর্তনাদ শুনিয়া অতি যত্নে নিজেকে বিপন্ন করিয়াও কুষ্ঠরোগীকে হাসপাতালে লইয়া গেলেন ও তাহার ব্যাধির চিকিৎসা করাইলেন। সে রোগমুক্ত হইল বটে কিন্তু "শরীরং ব্যাধি-মন্দিরং"। কাজেই আবার সে অন্য ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইল। পরিণাম ফল কি দাঁড়াইল?"

লেখক তারপর পাড়িলেন শাক্যসিংহের অনুগত একজ্ঞানীর প্রসঙ্গ। তিনি কুষ্ঠরোগী দেখিয়া ভাবিলেন, "অহো! এই ত মানব দেহ। যেখানে চেতন সেখানে ক্লেশ।" সুতরাং তিনি আর্তনাদ উপেক্ষা করিয়া বোধিবৃক্ষতলে বসিয়া গেলেন; চেতন ধর্ম বিলোপ করিতেই হইবে।

তারপর বক্তা তুলিলেন চৈতন্য-ভক্তের কথা। কর্মবীরের মত তিনি উত্তেজিত হইলেন না। তিনি রোগের নিদান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন এ ব্যক্তি এমন কি করিয়াছে যাহার জন্য এই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি?

এই সূত্রে লেখক উল্লেখ করিলেন কুষ্ঠরোগী বাসুদেবের কথাও, বলিলেন যে

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চরক-সংহিতার কোন ব্যবস্থা বাসুদেবকে দিলেন না অথবা ভস্ম-তাবিজ কিছু দিলেন না। তিনি জানেন এই রোগী শ্রীবাসঠাকুরের চরণে অপরাধী, তাই তাঁহার কাছে বাসুদেবকে পাঠাইয়া দিলেন। সর্বশেষে বক্তা মন্তব্য করিতেছেন—তখন "তস্যেহনুকম্পাং"এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে বিপ্রলম্ভে ও কৃষ্ণপ্রেমে আসক্ত যে এইরূপ বিচারণার ফলে গৌর-ভক্তের প্রেম আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠে ও তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন।

এই বিচারণা ভাল। কিন্তু রোগী বেচারী বৃক্ষতলে আর্তনাদ করিতেই রহিয়া গেল। গৌর-ভক্তের কি শুধু বিচারণায় কর্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটে? মহাপ্রভু কি 'জীবে-দয়া' বলিয়া কোন নির্দেশ বৈষ্ণবগণকে দেন নাই? তিনি কি বলেন না?—

ভারত ভূমেতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার
জন্ম সার্থক করি করে পর উপকার। (চৈঃ চঃ আদি, ১০ম)

মহাপ্রভু স্বয়ম্ ভগবান, অন্তর্যামী! তাই তিনি তদনুরূপ কর্ম করিয়াছিলেন। ঐ ক্ষেত্রেও তিনি আচরণ করিয়া যথাকর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন,—শুধু বিচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বাসুদেবের রোগ-মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রোগীকে হাসপাতালে না পাঠাইয়া পাঠাইয়াছিলেন শ্রীবাসের কাছে যেখানে বাসুদেবের একাধারে দেহ-রোগ-মুক্তি ও ভব-রোগ-মুক্তি দুইই হইতে পারে। আমরা সাধারণ বৈষ্ণব, আমাদের ভবরোগ আরোগ্যের যোগ্যতা নাই আর সে অন্তর্দৃষ্টিও নাই। মহাপ্রভু অথবা উত্তম বৈষ্ণব যে আর্তীয় জীবে দয়া দেখাইতে সমর্থ, আমাদের সে শক্তি নাই। আমরা আমাদের দৃষ্টি ও সাধ্যমত মাত্র কাজ করিতে পারি—ফল যাহাই হউক।

বাসুদেবের রোগমুক্তির সূত্রে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করিয়া বলেন,—

ধনং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপ-পুষ্টং ভক্তি-তুষ্টং চকার যঃ॥ চৈঃ চঃ, মধ্যম। ৭।১

এই শ্লোক ও বর্ণিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে মহাপ্রভু বাসুদেবকে শুধু প্রেম ভক্তি দিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি রোগমুক্তিও দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে ভক্তিপুষ্ট ও তৎসঙ্গে নষ্ট-কুষ্ঠ ও রূপ-পুষ্ট করিয়াছিলেন, এমনই তিনি দয়ার্দ্রধী। ইহাতেই রহিয়াছে দয়ার পূর্ণ অর্থ ও দয়ার্দ্রধীর পরিপূর্ণ কার্য। আর আমরা এরূপ ক্ষেত্রে কি করিতে পারি? ঐ তিনটির কোনটিই নয়,—দয়ার নির্দেশক্রমে শুধু করিতে পারি সেইরূপ কর্ম— ফল ঠাকুর জানেন।

এই শ্রেণীর বৈষ্ণব প্রচারককে বলিতে শুনিয়াছি যে বদ্ধজীবের মায়া পাশ ছিন্ন করাই প্রকৃত দয়া; ক্ষুধায় অন্ন না হয় আজ দিলাম, কাল ত আবার সে ক্ষুধায় আর্ত হইবে। সুতরাং জীবের সর্ব দুর্গতির মূলানুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধান বিধেয়, অন্নদানাদি নিষ্ফল কার্য। তবে কি ক্ষুধাকাতর অন্ধআতুর "হা অন্ন" বলিয়া

আর্তনাদ করিলে সাধু-বৈষ্ণবগণ সম্ভব হইলে অন্নদান করিবেন না? ইহাই কি মহাপ্রভুর নির্দেশ? কিন্তু তিনি আচরণ করিয়া কি দেখাইয়াছেন শুনুন—

"প্রভুসে পরমব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যাভার।
দুঃখীতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার।।
দুঃখীতে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি
অন্নবস্ত্র কপর্দক দেন গৌরহরি॥" চৈঃ ভাঃ আদি দশম

অর্থাৎ গৃহী শ্রীগৌরাঙ্গ দুঃখীকে অন্নবস্ত্র ও অর্থ দিতেন এবং 'আপনি-আচরি' তিনি গৃহী বৈষ্ণবকে এই আচরণের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাস জীবনেও দেখি—

প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইলা ভোজনে।। চৈঃ চঃ ২।১৪

তিনি কাঙ্গালী ভোজন করাইলেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

মানী হঞা বৃক্ষ হলাম এই ইচ্ছাতে
সর্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হইতে।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত বিগ্রহ। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

পশ্যৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্ত জীবিতান্।
বাতবর্ষাতপাহিমান্ সহন্তো বরয়ন্তি নঃ।। ১০।২২।৩২
অহো এষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ।। ১০।২২।৩৩
পত্রপুষ্পফলছায়া-মূল-বল্কলদারুভিঃ।
গন্ধনির্যাসভস্মাস্থি ন তোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে॥ ৩৪
এতাবজ্জন্ম সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় বাচরেৎ সদা॥ ৩৫

তোমরা একমাত্র পরোপকারের জন্য জীবনধারী মহাভাগ্যবান এই বৃক্ষ সকলকে দেখ। ইহারা স্বয়ং বাত, বর্ষা ও রৌদ্র সহ্য করিয়া আমাদের তজ্জনিত কষ্ট নিবারণ করিতেছে। ইহারা সমস্ত জীবের জীবিকা-স্বরূপ, অতএব ইহাদের জীবন ধন্য। সজ্জনগণের ন্যায় ইহাদের নিকট হইতেও যাচকগণ কখন বিমুখ হইয়া নিবৃত্ত হয় না। ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল বল্কল, কাষ্ঠ, পুষ্পাদি-গন্ধ, নির্যাস, ভস্ম, অস্থি এবং পল্লবাদির অঙ্কুর প্রদানে সকলের অভিলাষ পূরণ করিতেছে। ইহলোকে প্রাণ, ধন, বুদ্ধি এবং বাক্যদ্বারা সর্বদা প্রাণীগণের মঙ্গলসাধনই জীবের জন্ম-সাফল্য বলিতে হইবে।

এখানে শ্রীভগবানের নির্দেশ সুস্পষ্ট,—সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

ধর্মোপদেশ ও প্রেমভক্তিদান যে শ্রেষ্ঠ দান তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু তাহারও কাল আছে এবং তাহা দিবার সামর্থ্যও সবার নাই। পথে রোগজর্জর, ক্ষুধাকাতর, অন্ধ,

আতুরকে দেখিলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাওয়া বৈষ্ণবতা নহে। এই নিত্যক্ষুধা নিবারণের আয়োজন, সংসারাশ্রমে অথবা সাধুর আশ্রমে, কোথায় নাই? তাঁহারা অনিবেদিত অন্ন গ্রহণ করেন না এইমাত্র পার্থক্য। এই নিত্যক্ষুধা ও নিত্যতৃষ্ণা এবং লজ্জা নিবারণের প্রয়াস যাবৎ দেহধারণ তাবৎ জীবকে অনুসরণ করিবেই,—পরিত্রাণ নাই। পথে চলিয়াছি, এমন সময় তরুলতাশ্রয়ী কোন পথিক কাতর নয়নে আমার পানে চাহিয়া চাহিল তৃষ্ণার জল অথবা ক্ষুধার অন্ন। আমি তাহাকে অন্নজল দিলে কি স্বয়ং ধন্য হইব না? মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "জন্ম সার্থক করি করে পর উপকার"। এখানে দয়া কোন পক্ষে থাকে? কে কাহাকে দয়া করে? দাতা দয়া করেন কিংবা দাতা স্বয়ং দিয়া কৃতকৃতার্থ হন? আছি বিষয়মগ্ন; এমন সময় আর্তের কাতরানি কর্ণগোচর হইল,—ও অন্তরে জাগিল 'দয়া'। কে ইনি? ইনি যে জগন্মাতা 'দুর্গা'।

"যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেন সংস্থিতা"

সেই দেবীর দর্শন যাঁহার কৃপায় পাওয়া গেল তাঁহার কাছে কি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত আছে? 'প্রাপ্তি' যাহা হইল তাহার তুলনায় আমরা আর্তিমোচনে কতটুকুই বা দিতে পারি? কৃতার্থ হইল কে?—আর্ত না দাতা? মূল বিচার ঐখানেই। দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে 'দেওয়া উচিৎ' এই জ্ঞানে অনুপকারীকে যে দান তাহাই সাত্ত্বিক দান।

দিবার অভিমান লইয়া ত' আমি কুষ্ঠরোগীটিকে খুঁজিয়া বাহির করি নাই। ঘটনাচক্রে পথে দর্শন ও কর্ণে আসিল আর্ত আবেদন। তাহা নিবারণের আহ্বান কি ভগবানের নিকট হইতে পাইলাম না? আমি নিমিত্ত মাত্র হইতেছি এই বোধে কি নিজেকে ধন্য মানিব না? সেই বিশেষ মুহূর্তের আত্যন্তিক দৈহিক ক্লেশের যথাশক্তি উপশম আমার কার্য ও বিচার্য; তাহার জন্মজন্মান্তরের পারমার্থিক ভুল দেখিবার বা বুঝিবার সময় সে নহে। জীবনের যে ভুলের জন্য তার এই বর্তমান দুর্গতি, সে ভুলের দায়িত্ব আমার নহে বা তাহার সহিত আমার কোন পারমার্থিক সংস্রব না থাকিতে পারে। এই যে হঠাৎ দেখা ও সেবার আহ্বান, ইহাতে বুঝিতে হইবে যে ঠাকুর আমায় নিমিত্ত-মাত্র করিয়া তাঁহার কার্য তিনি করিতেছেন। এই দেওয়া ও লওয়ার সম্পর্কে দাতার বা গ্রহিতার কোন সাক্ষাৎ নৈতিক ত্রুটি না থাকিলেই হইল। বরং দাতার সুকৃতি যে তিনি বিধাতার কার্যে নিমিত্তমাত্র হইলেন।

(ক্রমশঃ)

যুগান্তর

শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

দিকে দিকে জাগে অই জ্যোতির্ময়ী নব সম্ভাবনা,
কাননের জীর্ণ শাখে মঞ্জরিছে যেন কিশলয়!
নবীন বসন্ত আসে ধরিত্রীর পূরাতে কামনা,
রক্তিম দিগন্তে জাগে প্রভাতের নব সূর্যোদয়!

নূতন জীবন স্রোত উচ্ছ্বসিয়া বহে অবিরাম,
স্বপ্নের বাস্তব রূপ জীর্ণতায় করিছে নির্মূল!
আদর্শে আদর্শে আজ চারিধারে বেঁধেছে সংগ্রাম,
তরংগে তরংগে ভাঙে সমুদ্রের ভগ্ন-শীর্ণকূল!

হৃদয়ে হৃদয় মেশে. বুকে বুকে প্রীতির স্পন্দন,
মানবের সাথে আজ মিলিবারে চাহিছে মানব !
খুলে যায় ক্রমে ক্রমে কীর্ণতার নিবিড় বন্ধন.
মুক্তির নূতন ছন্দ ঘোষিতেছে বিশ্বের গৌরব!

আজ কেহ নহে হেয়. নহে ঘৃণ্য. নগণ্য জীবন,
সবাই পাংক্তেয় আজ মানুষের সম অধিকারে!
উচ্চ-নীচ, ধনী-দীন—শুধু মিথ্যা বিভেদ-সৃজন,
কে রহিবে বন্ধ আজ ক্ষুদ্রতার সংকীর্ণ প্রাকারে?

জীবনের জয় ধ্বনি অই শুনি মহা বিশ্বময়.
নিকটে এসেছে আজ যারা ছিল এতদিন দূরে!
প্রাণের সম্পদ দিয়ে হবে আজ প্রেম-বিনিময়,
আকাশ বাতাস ভ'রি সেই গান বাজে সুরে সুরে!

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা

(পূর্বানুবৃত্তি)

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

প্রশান্তাত্মা বিগতভী র্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ৬।১৪

(কিন্তু কোন ধ্যানই যে বাস্তব পুরুষোত্তম আমির সঙ্গে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়ায় না, তাহাই বলিতেছেন) প্রশান্তাত্মা [প্রশান্ত হইয়াছে আত্মা (অন্তঃকরণ ও দেহ যাহার) বিগতভীঃ [আত্মা-অনাত্মার ভেদ কাটিয়া যাওয়ায় অভয় প্রাপ্ত] ব্রহ্মচারি-ব্রতে [পুরুষোত্তম-ব্রহ্মজীবনের আচরণে আচরণ মিলাইয়া চলেন যিনি, তিনিই ব্রহ্মচারী ; তাঁহার ব্রতে, একান্ত বাহ্যিক ব্রহ্মচর্য দ্বারা সত্য বাস্তব ব্রহ্মচর্য রক্ষিত হয় না] স্থিতঃ [পরিনিষ্ঠিত] মনঃ সংযম্য [মন সংযম করিয়া] (কিন্তু এ সমস্তই সম্ভব হয়, বাস্তবিকতার রূপ ধারণ করে, যখন সে মচ্চিত্ত হয়] মচ্চিত্তঃ [আমি-পুরুষোত্তমেই যাহার দুকদুশ্যোপরক্ত সর্বার্থ চিত্ত, সে-ই মচ্চিত্ত] (অতএব) যুক্তঃ আসীত [সমাহিত হইয়া উপবেশন করিবে]—(এই প্রকারে যিনি) মৎপরঃ [আমি-'পর' (জীবনে সবটুকু ব্যাপিয়াও জীবনের অতীত) যাহার, তিনিই মৎপর। মচ্চিত্ত হইয়াও পুরুষ মৎপর না হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত যোগী মচ্চিত্ত ও মৎপর দুই-ই।]।

প্রশান্ত চিত্ত, অভয়, ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত, মচ্চিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া মনঃ সংযমপূর্বক উপবেশন করিবে। ৬।১৪

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ৬।১৫

(এইবার যোগফল বলিতেছেন) যুঞ্জন্ [সমাধান করিয়া] এবং [যথোক্ত বিধান দ্বারা] সদা আত্মানং [দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি আত্মা পর্যন্ত সব] যোগী নিয়তমানসঃ [নিয়ত (নিরুদ্ধ) মানস (চিত্ত) যাহার, তিনি] শান্তিং [জীবনের সব কিছুর সামঞ্জস্যময়ী শান্তি] নির্বাণপরমাং [আমার ভিতরে নিভিয়া যাওয়াই হইতেছে পরমা নিষ্ঠা যাহার, তাহাই নির্বাণপরমা] (কিন্তু সেই নির্বাণ-পরমতা কি করিয়া সম্ভব হয়, তাহাই বলিতেছেন) সংস্থাং [আমিই হইতেছি সম্যক স্থান যাহার, তেমন নির্বাণ পরমা শান্তি] অধিগচ্ছতি [প্রাপ্ত হন]।

এই প্রকারে সংযতচিত্ত হইয়া যোগী সর্বদা আমাতে মন সমাধান করিলে মৎ-সংস্থ নির্বাণপরমা শান্তি অধিগত হন। ৬।১৫

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতোনৈব চার্জ্জুন॥ ৬।১৬

(এখন যোগীদের আহারাদির নিয়ম কথিত হইতেছে) ন অত্যশ্নতঃ [আত্মপরিমিত অন্ন হইতে অধিক ভোজনকারীর] যোগঃ ন অস্তি [যোগ হয় না] ন চ একান্তম্ [একেবারেই] অনশ্নতঃ [অনশনকারীরও]; ('যদু হ বা অাত্মসম্মিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি যদ্ভূয়ো হিনস্তি যৎ কনীয়ো ন তদবতি' ইতিশ্রুতি। অথবা যোগীর পক্ষে যোগশাস্ত্রে যেরূপ পরিমাণের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে অধিক ভক্ষণকারীর যোগ হয় না—'অর্ধমশনস্য সব্যঞ্জনস্য তৃতীয়মুদকস্য তু। বায়োসঞ্চরণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ)' ন চ অতি স্বপ্নশীলস্য [অতিশয় নিদ্রালুর যোগ হয় না] জাগ্রতঃ ন এব [এবং অতিশয় জাগরণকারীরও নয়; মাত্রা ছাড়াইয়া কোন কিছু করাই পুরুষোত্তম যোগশাস্ত্রে ব্যভিচার] হে অর্জুন।

হে অর্জুন, যে অতিশয় ভোজন করে, তাহার যোগ হয় না, যে একেবারে অনশন করে, তাহারও যোগ হয় না; অতিশয় নিদ্রালুর যোগ হয় না, অতিশয় জাগরণকারীরও যোগ হয় না। ৬।১৬

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।। ৬।১৭

(তাহা হইলে কোন প্রকারের পুরুষের 'যোগ' হয়?) যুক্তাহারবিহারস্য [আহার এবং বিহার যাহার যুক্ত অর্থাৎ নিয়তপরিমাণ, মাত্রার মধ্যে স্থিত। যাহা আহরণ করা যায় তাহাই আহার (অন্ন), বিহার অর্থ গতি] যুক্তচেষ্টস্য [যুক্তা (নিয়তা) চেষ্টা যাহার] কর্মসু [কর্মসমূহে: কর্ম নিয়াও যে মাত্রা ছাড়াইয়া হুড়াহুড়ি বা হৈ চৈ করেন না কিম্বা একেবারে কর্মত্যাগও করেন না] যুক্তস্বপ্নাববোধস্য [যুক্ত (মাত্রার মধ্যে স্থিত) স্বপ্ন (নিদ্রা) ও অববোধ (জাগরণ) যাহার, সেই যোগীর] যোগঃ ভবতি দুঃখহা [সর্ব দুঃখহননকারী]।

যাহার আহার ও গতিযুক্ত কর্মে চেষ্টা যাহার নিয়ত পরিমাণ, নিদ্রা ও জাগরণে যিনি যুক্ত, তাহার যোগই দুঃখ হনন করিয়া থাকে। ৬।১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।। ৬।১৮

(অনন্ত এক্ষণে কোন সময়ে যোগী যুক্ত হয়, তাহ ই বলিতেছেন) বিনিয়তম্ [বিশেষভাবে স্ব পুরুষোত্তম-মাত্রায় সংযত] চিত্তম্ [চিত্ত] (দৃক্‌দৃশ্য ভেদ দর্শনের বুকে সমন্বয় স্থাপন করিয়া) আত্মনি [পুরুষোত্তম-আত্মা কেবল 'আমির' মাঝে নিজের মাঝে] অবতিষ্ঠতে [স্থিতি লাভ করে] নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যঃ [রাগদ্বেষ যুক্ত স্তরের সর্ববিধ দৃষ্ট কাম হইতে নির্গত স্পৃহা যাহার, সেই] যুক্তঃ [সমাহিত] ইতি উচ্যতে [বলা হয়] তদা (সেই সময়ে)।

যে সময়ে সংযত চিত্ত নিজের মধ্যেই স্থিতিলাভ করেন এবং যে সময়ে যোগী

সর্বপ্রকার কাম হইতে স্পৃহাহীন হন, সেইকালে তাহাকে যুক্ত বলা হয়। ৬।১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।। ৬।১৯

(যোগীর সমাহিত চিত্তের উপমা দেওয়া হইতেছে) যথা দীপঃ [প্রদীপ] নিবাতস্থঃ [বাতবর্জিত দেশে স্থির থাকিয়া] ন ঈঙ্গতে [বিচলিত হয় না] সা [তাহাই] উপমা [দৃষ্টান্ত ; যাহার সঙ্গে উপমিত হয়, তাহাই উপমা] স্মৃতা [চিত্ত-প্রচারদর্শী যোগীগণ দ্বারা স্মৃত (চিন্তিত) হইয়া থাকে] (সেই উপমেয়টী কি?) যোগিনঃ [যোগীর] যতচিত্তস্য [সংযতান্তঃকরণ] যুঞ্জতঃ যোগম্ [সমাধি-অনুষ্ঠান-কারীর] আত্মনঃ [নিজের]।

বাতবর্জিত দেশে দীপ যেমন বিচলিত হয় না, আত্মার যোগানুষ্ঠানকারী যতচিত্ত যোগীর তাহাই উপমা স্মৃত হইয়া থাকে। ৬।১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ৬।২০

সাড়ে তিনটি শ্লোকদ্বারা যোগের স্বরূপ লক্ষণ বলিতেছেন)। (এইরূপে যোগাভ্যাস বলে নিবাত প্রদীপের মত একাগ্র হইয়া) যত্র [যে অবস্থায়] উপরমতে [উপরত হয়] চিত্তং [চিত্ত] নিরুদ্ধং [রাগদ্বেষযুক্ত স্তরের সর্ব বিষয়ে নিবারিত-প্রচার এবং পুরুষোত্তম-আত্মায় নিশ্চিতরূপে, নিশ্চিন্তরূপে রুদ্ধ; যোগশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধ ;] যোগসেবয়া [যোগসেবাদ্বারা, কর্মকে তাহার নিজস্ব মূল্য দানে গৌরবদান করিয়া অনুষ্ঠান করাই সেবা] যত্র চ [এবং যে অবস্থায়] আত্মনা [নিজের দ্বারা, পুরুষোত্তমের দ্বারা] আত্মানং [নিজেকে পুরুষোত্তমকে] পশ্যন্ [উপলব্ধি করিয়া] আত্মনি [নিজের মধ্যে, পুরুষোত্তমের মধ্যে] তুষ্যতি [তুষ্টির ভজনা করেন]।

যোগসেবাদ্বারা নিরুদ্ধচিত্ত যে অবস্থায় উপরতি লাভ করেন এবং যে অবস্থায় নিজকে নিজের দ্বারা নিজের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তুষ্ট হন, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। ৬।২০

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।। ৬।২১

(আরও) সুখং আত্যন্তিকম্ [অন্তকে অতিক্রম করিয়া যাহার সত্তা তাহাই আত্যন্তিক, অনন্ত] যত্তৎ [অনির্বচনীয়] বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ [কেবলা বুদ্ধির দ্বারা যাহাকে গ্রহণ করা সম্ভব, তাহাই বুদ্ধিগ্রাহ্য] [অতীন্দ্রিয়ম্ [রাগদ্বেষযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে অতিক্রম করিয়া পুরুষোত্তমস্তরে লব্ধ সুখই অতীন্দ্রিয়] বেত্তি [ঈদৃশ সুখ অনুভব করেন] ; যত্র [যে অবস্থায়] ন চ এব অয়ং [এই বিদ্বান্] স্থিতঃ [পুরুষোত্তম-আত্ম-স্বরূপে স্থিত থাকিয়া] ন চলতি [বিচলিত হন না, অচ্যুত থাকেন] তত্ত্বতঃ [পুরুষোত্তম তত্ত্ব হইতে]।

যে অবস্থায় অনির্বচনীয়, কেবলা বুদ্ধির দ্বারা গম্য, অতীন্দ্রিয়, অনন্ত সুখ

প্রাপ্ত হয়, এবং যে অবস্থায় তিনি পুরুষোত্তম তত্ত্ব হইতে বিচলিত হন না (তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে)। ৬।২১

যং লব্ধ্বাচাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।। ৬।২২

(প্রকারান্তরে প্রকৃত যোগের বিশেষণ দিতেছেন) যং [যাহাকে] লব্ধ্বা চ [লাভ করিয়া] অপরং লাভং [এই যোগের বাহিরে 'অপর' লাভ] ততঃ [তাহা হইতে] অধিকম্ [অধিক কিছু আছে এইরূপে] ন মন্যতে [মনে করেন না], যস্মিন্ [পুরুষোত্তম তত্ত্বে] স্থিতঃ দুঃখেন গুরুণা অপি [যে দুঃখ রাগদ্বেষযুক্ত স্তরে পুরুষের কাছে অসহ্য, এমন তীব্র দুঃখ দ্বারাও] ন বিচাল্যতে [বিচলিত হন্ না ; বিচলিত হইয়া পথ-চলা ছাড়েন না, দুঃখের আঘাত লাগিলেও তিনি চোখের জল মুছিয়া পুরুষোত্তম গতিপথে ধীরস্থির পাদবিক্ষেপে চলিয়া যান। পুরুষোত্তম-যোগী নিষ্ঠুর পাষাণও নন, আবার দুঃখে বিহ্বলতাও তাঁহার নাই। বরং দুঃখ যোগায় তাহার জীবনে পথ-চলারই রস)।

যে অবস্থাবিশেষ লাভ করিয়া তাহা হইতে অন্য কোনও লাভ অধিক মনে করেন না, যে অবস্থায় স্থিত হইয়া গুরুতর দুঃখেও তাঁহার পথ চলার বিরাম নাই, (তাহাকেই যোগ শব্দবাচ্য জানিবে)। ৬।২২

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা।। ৬।২৩

(যত্রোপরমতে 'শ্লোক' হইতে আরম্ভ করিয়া যত যত বিশেষণের দ্বারা যে-বিলক্ষণ আত্মাবস্থাবিশেষকে 'যোগ' বলা হইয়াছে) তং [সেই অবস্থাকে] বিদ্যাৎ [জানিবে] দুঃখসংযোগবিয়োগং [দুঃখ-সংযোগের সঙ্গে যুক্ত দুঃখ-বিয়োগ যাহার, পুরুষোত্তম, তাঁহার শক্তি ও জগৎ সম্বন্ধে মিথ্যা জ্ঞান হইতে জাত 'রাগদ্বেষ, রাগদ্বেষ-জাত ধর্মাধর্ম, ধর্মাধর্ম-জাত জন্ম, জন্ম হইতে উৎপন্ন দুঃখের সঙ্গে যে সংযোগ এবং তাহার সহিত বিয়োগ যে অবস্থার, তাহাই দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগ স্তর অর্থাৎ পুরুষোত্তম স্তরের আনন্দ যাহা সুখ দুঃখ বিষামৃতে একত্র মিলন। 'এই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন'—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। 'সুখ দুঃখ সমান হ'ল, আনন্দসাগর উথলে—কমলাকান্ত। রাগদ্বেষ স্তরের দুঃখও যেমন এই স্তরে নাই, সেই দুঃখের বিপরীত সুখও সেখানে নাই ; রহিয়াছে দুই-ই একাধারে, দুঃখ-সংযোগ এবং দুঃখ-বিয়োগ] যোগ সঙ্গীতম্ ['যোগ' এই সংজ্ঞায় সঙ্গীত বলিয়া] (যোগফলের উপসংহার করিয়া আবার তাহার আরম্ভ করিয়া যোগের কর্তব্যতা বিষয়ে নিশ্চয় এবং অনির্বেদ রূপ দুইটি যোগসাধন বিধানের জন্য উপদেশ দিতেছেন) সঃ [যথোক্ত লক্ষণ যোগ] নিশ্চয়েন [অধ্যবসায়ের সহিত] যোক্তব্যঃ [যোগ করিতে হইবে] যোগঃ (যদি শীঘ্র সিদ্ধি না মিলে তথাপিও) অনির্বিণ্ণচেতসা [নির্বিণ্ণ নয় চিত্ত যাহার; 'ডুবলো না' ডুবায়ে বা ওরে মন নেয়ে। হাল ছেড় না ভরসা বাঁধ পারবি যেতে বেয়ে।।'

সেই দুঃখসংযোগের সঙ্গে দুঃখবিয়োগকেই যোগ বলিয়া জানিবে। নির্বেদশূন্য চিত্ত দ্বারা অধ্যবসায়ের সহিত সেই যোগকে অভ্যাস করিতে হইবে। ৬।২৩ (ক্রমশঃ)

অথর্ববেদের উপযোগ

যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বেদই জগতের আদি ও উত্তম গ্রন্থ

বেদই জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ। কেহ কেহ মিশরের পপিরাস পত্র অথবা পারস্যের কীলকলিপিকে বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই অনুমান যুক্তিসহ নহে। পরন্তু তাঁহাদের অনুমান সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, পপিরাস পত্র এবং কীলক লিপি [illegible] মাত্র—সুসম্বন্ধ গ্রন্থ নহে। বেদই যে প্রাচীনতম গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই।

বেদ সর্বোত্তম গ্রন্থও বটে। ধর্মজীবনের [illegible] সমূহ পাওয়া যায় উপনিষদে এবং তাহাদের সার-সংগ্রহ ভগবদ্-গীতায়। [illegible] উপনিষদ ও গীতার জননী। অতএব বেদকে সর্বোত্তম গ্রন্থও বলা যাইতে পারে।

বেদ কয়টি ?

আমরা ছেলেবেলায় পাঠশালায় নামতা প[illegible]—

একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে [illegible] বেদ।।

বেদ যে চারিটি, ব্রহ্মা যে চারি মুখে চারিটি [illegible] করিয়াছেন এই শ্রুতচর সমাচার আমাদিগকে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা [illegible] বড় হইয়া আমরা গীতাতে পড়ি—

বেদ্যং পবিত্রং ওঙ্কারঃ ঋক্-সাম [illegible] চ। ৯—১৭

এখানে অথর্ব বেদের নাম করা হইল না।

কেবল ইহাই নহে, ইহার পরে বেদকে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইল ত্রয়ী।

এবং ত্রয়ীধর্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ, গতাগতং কামকামা লভন্তে। ৯—২১

তবে কি বেদ তিনখানা ?

কঠিন সমস্যা। কারণ বেদের অপর নাম শ্রুতি—তাহা শ্রুতিতেই আমরা রাখি। পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কদাচিৎ বেদকে চক্ষে দেখেন। ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ বর্জন করিয়াছেন, পাছে বা শূদ্র হঠাৎ শুনিয়া ফেলে। মীমাংসা করিবে কে?

সামাজিক কাণ্ডজ্ঞান এই সমস্যার একটা সমাধান করিয়া লইল; বলিল অথর্ব-বেদ বেদই নহে, উহা ম্লেচ্ছদিগের বেদ—ব্রাহ্মণের অপাঠ্য। ম্যাকডোনেল সাহেব তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এই দণ্ডকথার উল্লেখ করিয়াছেন।*

কিন্তু বিদ্যাধরদের মনে প্রবোধ মানে না। তাঁহারা খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। মনীষী সত্যব্রত সামশ্রমী বিশদ আলোচনা করিয়া নিপুণ নিবন্ধ লিখিলেন "কো অসৌ বেদঃ"—বেদ বলিতে কি বুঝা যায়?

তিনি দেখাইয়া দিলেন যে আচার্য জৈমিনি পূর্বেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে গদ্যের নাম যজুস্, পদ্যের নাম ঋক্ এবং গানের নাম সাম।

তেষং ঋক্ যত্র অর্থবশেন পাদব্যবস্থা (পূর্ব-মীমাংসা ২-১-৩২)
গীতিষু সামাখ্যা (পূর্ব-মীমাংসা ২-১-৩৩)
শেষে যজুস্ শব্দঃ (　　ঐ　　২-১-৩৪)

অতএব রচনার প্রণালী হিসাবে বেদ তিনখানা যজুস্ ঋক্ ও সাম। পরন্তু সংহিতা (সংকলন) হিসাবে বেদ চারিখানা—যজুস্, ঋক্ সাম এবং অথর্ব। অথর্ব বেদের যে গদ্য ভাগ আছে তাহা যজুস্, যে পদ্য ভাগ আছে তাহা ঋক্, এবং যে গান আছে তাহা সাম—এরূপও বলা যাইতে পারে।

তথাপি সমস্যা যায় না। কারণ অথর্ববেদের গদ্যভাগকে যজুস্, পদ্যভাগকে ঋক্ এবং গান ভাগকে সাম বলিয়া যদি মনেও করি, তথাপি অথর্বদেবের পৃথক সংকলনের হেতু বুঝা যায় না। অথর্ববেদে যে সকল গদ্য পদ্য কিম্বা গান আছে তাহাদিগকে যথাক্রমে যজুস্ ঋক্ ও সাম বেদের অন্তর্ভুক্ত করিলেই তো লেঠা চুকিত। তাহা না করিয়া ঐ সকল গদ্য পদ্য ও গান লইয়া পৃথক্ একখানি সংহিতা কেন রচিত হইল? তবে কি অথর্ববেদ পরবর্তী যুগের রচনা? অথর্ব নামটাও একটু পৃথক রকমের। যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ ও সামবেদ এই তিনটি নাম বাক্য-রচনা প্রণালীর পার্থক্য অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে। অথর্ব বলিতে গদ্য পদ্য ও গানের অতিরিক্ত চতুর্থ কোন রচনাপ্রণালী বুঝা যায় না। অথর্ব শব্দের অর্থ কি?

কেহ কেহ বলেন অথর্বা নামক মুনি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়াই এই সংহিতার নাম অথর্ব-সংহিতা। আবার কেহ বলেন "অথর্বন্" শব্দের অর্থ পরবর্তী। অথ শব্দের উত্তর ঋ ধাতুতে বনিপ্ প্রত্যয় যোগ করিয়া (অথ+ঋ+বনিপ্) অথর্বন্ পদ সিদ্ধ হয়। "অথ" অর্থ অনন্তর, "ঋ" অর্থ গমন

* Macdonell—History of Sanskrit Literature—p. 194.

করা। যাহা পরে যায়, অনুসরণ করে, অর্থাৎ যাহা পরে আসিয়াছে তাহার নাম অথর্ব-বেদ।

অথর্ব নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি যে ছিলেন, তাহা আমরা মুণ্ডক উপনিষদ্ হইতে জানিতে পারি।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্ম-বিদ্যাং সর্ব-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং
অথর্বায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় প্রাহ॥ —মুণ্ডক—১।১।১

প্রগাঢ় ব্রহ্মবিৎ ছিলেন বলিয়া অথর্বকে এখানে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র (নরশ্রেষ্ঠ) বলিয়া বলা হইয়াছে। সর্বোত্তম বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা তিনিই লাভ করিয়াছিলেন।

অথর্ব কর্তৃক সংকলিত হওয়ার দরুণই এই সংহিতার নাম যদি অথর্ব-সংহিতা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহা পরবর্তী কালের রচনা, এই অনুমানই স্বাভাবিক। কারণ অন্যথা অথর্ব-বেদের মন্ত্রগুলি যজুস্ ঋক্ ও সাম বেদের অন্তর্ভুক্ত হইবার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। আর অথর্ব অর্থ যদি "অনন্তর" হইয়া থাকে, তবে অথর্ব-বেদ যে পরবর্তী কালের রচনা তাহা তো স্পষ্টই বলা হইল। তাহা হইলে অথর্ব-বেদের অর্থ দাঁড়ায় বেদ-পরিশিষ্ট কিংবা খিলবেদ অর্থাৎ বেদের উপসংহার।

বহুতর পণ্ডিতই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন যে, বেদ—যজুস্ ঋক্ ও সাম এই তিন সংহিতাতে বিভক্ত হইবার পর অথর্ব-বেদ সংকলিত হইয়াছে। অতএব বেদের সংখ্যা হয় চার—যজুস্, ঋক্, সাম এবং অথর্ব।

অথর্ব বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—ভার্গব শাখা ও আঙ্গিরস শাখা। তাই গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ব-বেদকে ভৃগ্ব-আঙ্গিরো-বেদ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(১) এতদ্ বৈ ভূয়িষ্ঠং ব্রহ্ম যদ্ ভৃগ্ব্-অঙ্গিরসঃ (১—৩—৪)

(২) এষ হ বৈ বিদ্বান্ সর্ববিদ্ ব্রহ্মা যদ্ ভৃগ্ব্-অঙ্গিরো-বিদ্ (১—২—১৮)

অথর্ব-পরিশিষ্টেও অথর্ববেদকে ভৃগ্ব্-অঙ্গিরো-বেদ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

ভৃগ্ব্-অঙ্গিরো-বিদম্ গুরুম্ বৃণীয়াদ্ (৩—১)

ভৃগ্ব্-অঙ্গিরো-বিদম্ কুর্য্যাৎ পুরোহিতম্ (৩—৩)

অথর্ব বেদে যে দুইটি স্পষ্ট বিভাগ আছে—একটি শান্ত ও একটি ঘোর, একটি ভার্গব ও একটি আঙ্গিরস,—সায়ন তাঁহার ভাষ্যের উপোদ্ঘাতে তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

তা আপঃ স্বিরূপা অভবন্। তত্রৈকতঃ ভৃগুর্ নাম মহর্ষির্ অভবৎ।

অবশিষ্টাভ্যঃ অদ্ভ্যঃ অঙ্গিরা নাম মহর্ষির্ অভবৎ।

অতএব বেদের সংখ্যা আমরা বলিতে পারি পাঁচ—যজুস্, ঋক্ সাম, ভার্গব এবং অঙ্গিরস বেদ।

তাই উদ্যোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্র সনৎ-সুজাত মুনিকে প্রশ্ন করিয়াছেন, বেদ একটি, না দুইটি, না তিনটি, চারিটি, না পাঁচটি?

আখ্যানপঞ্চমৈর্ বেদৈর্ ভূয়িষ্ঠং কথ্যতে জনঃ।
তথা চান্যে চতুর্বেদাস্ ত্রিবেদাশ্চ তথাপরে॥
দ্বিবেদশ্চৈকবেদশ্চা অপ্যা অনৃচ-শ্চ তথাপরে।
তেষাং তু কতরঃ স স্যাদ্ যম্ অহং বেদ বৈ দ্বিজম্॥

উদ্যোগ—৪৩—৪১।৪২

কেহ বেদ মানেনই না। কেহ বলেন বেদ এক, কেহ বলেন দুই, কেহ বলেন তিন, কেহ বলেন চার, আবার কেহ বলেন আখ্যান অনুসারে বেদ পাঁচ। ইহার মধ্যে কোন্ বেদটি পাঠ করিলে আমি সেই ব্রাহ্মণকে (পাঠককে) বেদবিদ্ বলিব?

যাহা হউক আখ্যান (tradition) অনুসারে বেদ যে পাঁচটি হইতে পারে তাহা আমরা দেখিলাম।

অপৌরুষেয় (অলৌকিক) গ্রন্থ হিসবে বেদ মাত্র একটি। দ্বিতীয় একটি অপৌরুষেয় গ্রন্থ আর নাই। প্রাচীন (যজুস্ ঋক্ সাম) ও অর্বাচীন (অথর্ব) হিসাবে বেদ দুইটি। বাক্য রচনা হিসাবে বেদ তিনটি। সংহিতা (collection) হিসাবে বেদ চারিটি—যজুস্, ঋক্, সাম এবং অথর্ব। সর্বসাকুল্যে গণনা করিতে হইলে বেদ পাঁচটি—যজুস্, ঋক্, সাম, ভার্গব এবং আঙ্গিরস।

অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্য

বেদের সংখ্যা একই মনে করি কিম্বা পাঁচই মনে করি, বেদ এবং অথর্ববেদ এই দ্বিধা বিভাগই তন্মধ্যে প্রবল। একদিকে বেদ-ত্রয়ী (যজুস্, ঋক এবং সাম) এবং অপর দিকে অথর্ববেদ (ভার্গব এবং আঙ্গিরস)। এই দ্বিধা বিভাগকে অবলম্বন করিয়াই অন্যান্য বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। অথর্ব বেদের একটা নিজস্ব সত্তা আছে, যে জন্য ইহা বেদ-ত্রয়ীর সহিত মিলিত হইয়া যায় নাই।

অথর্ববেদ হয়ত পরবর্তী যুগের রচনা সেইজন্য ইহার একটা পৃথক্ সত্তা রহিয়াছে ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ইহা ব্যতীতও অথর্ববেদের অন্য কোনও বৈশিষ্ট্য আছে কি না, তাহাও অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

অথর্ববেদের একটি নাম ব্রহ্ম বেদ

ক্ষত্র-বেদ-বিদাং শ্রেষ্ঠঃ ব্রহ্ম-বেদ-বিদাম্ অপি।
ব্রহ্ম-পুত্রো বশিষ্ঠো মাম্ এবং বদতু দেবতাঃ॥

রামায়ণ—আদিপর্ব—৬৫।৩

যাজ্ঞিকগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যজ্ঞের পৌরহিত্যকে আশ্রয় করিয়া অথর্ববেদের এই নামকরণ হইয়াছে। যজ্ঞের পুরোহিত চারিজন, হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্ম; তন্মধ্যে ঋগ্বেদ হোতার, সামবেদ উদ্গাতার এবং যজুর্বেদ অধ্বর্য্যুর অবলম্বন। এবং ব্রহ্মা নামক চতুর্থ পুরোহিতের অবলম্বন বলিয়াই

অথর্ব বেদকে বলা হয় ব্রহ্মবেদ। ইহা স্বীকার্য বটে, পরন্তু ইহাও লক্ষণীয় যে অথর্ব বেদেই ব্রহ্মবাদের বিলক্ষণ বিকাশ। আঙ্গিরস বেদের স্কম্ভসূক্তে (১০—৭) বিশ্বের মূল কারণ অখণ্ড-চৈতন্য-মাত্র ব্রহ্মের যে প্রশস্তি আছে, বেদ-ত্রয়ীর কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। জ্ঞান-যোগের উদ্দিষ্ট যে নির্বিশেষে নির্গুণ ব্রহ্ম, বেদত্রয়ীতে তাহার উল্লেখ কদাচিৎ পাওয়া যায়। পরন্তু আঙ্গিরস বেদের দুইটি সূক্তেই (১০—৭ এবং ১০—৮) স্কম্ভের মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে। স্কম্ভ অর্থ স্তম্ভ বা খোঁটা। যিনি বিশ্বজগতের আশ্রয় তিনিই স্কম্ভ বা ব্রহ্ম। ইহাই অথর্ব বেদের ব্রহ্মবেদ নামের সার্থকতা। ব্রহ্মবাদ অথর্ববেদের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অথর্ব-বেদের অপর একটি নাম ক্ষত্র বেদ।* রাজার অভিষেকের বিবরণ আঙ্গিরস বেদের একটী সূক্তে (৩—৪—৭) বর্ণিত আছে, ইহাই "ক্ষত্র-বেদ" নামকরণের হেতু অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষত্র বেদ নামকরণের হেতু আরও গভীর বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মণের লক্ষণ ক্ষমা, ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ প্রতিঘাত। কেহ এক গালে চপেটাঘাত করিলে ব্রাহ্মণ যীশুর ন্যায় অপর গাল পাতিয়া দেয়, ক্ষত্রিয় মুশার ন্যায় তাহার দুইগালে দুই চপেটাঘাত করে। ক্ষমা-প্রধান ব্রাহ্মণই বেদ-ত্রয়ীর আদর্শ, আর প্রতিহিংসা-প্রধান ক্ষত্রিয়ই অথর্ববেদের আদর্শ। এই জন্য লৌকিক গণনায় অথর্ব-বেদ মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন প্রভৃতি ক্রূর কর্মের আকর বলিয়া কথিত হয়। প্রতিঘাত-প্রধান ক্ষত্রিয়ের আচারের সমর্থক বলিয়াই অথর্ব বেদের অপর নাম ক্ষত্র-বেদ। আত্ম-প্রতিষ্ঠা self-assertion অথর্ব-বেদের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

ব্রহ্ম-বাদ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা অথর্ব বেদের বিশিষ্ট লক্ষণ বটে, পরন্তু এই বেদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার জাতীয়তাবাদ। অথর্ব বেদের সময়েই প্রাচীন আর্য জাতি হিন্দু ও পার্শী এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। হিন্দু কৃষ্টির যাহা মূল বীজ অথর্ব বেদেই তাহা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বেদ-ত্রয়ীর সাধনাকে বিশ্ব-ব্যাপী ধর্ম world. Religion এবং অথর্ব-বেদের সাধনাকে জাতীয় ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিলে বেশী ভুল করা হইবে না।

হিন্দু-সাধনার আদি নাম দেবযান এবং পার্শী সাধনার আদি নাম পিতৃযান।

পূর্ব-পুরুষগণের যে কৃষ্টি—পার্শীগণ তাহা রক্ষা করিল, ইহাই পিতৃযান নামের সার্থকতা। অপরপক্ষে হিন্দুগণ সাধনার একটা পৃথক্ প্রণালী আবিষ্কার করিয়া লইল। এই পন্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দেবপূজা অর্থাৎ মূর্তিপূজা। এইজন্য এই অভিনব পন্থার নাম দেওয়া হইল দেবযান। জেন্দ্-সাহিত্যে ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে যথাক্রমে মরুদা-যস্ন এবং দেব-যস্ন। মরুদা-যস্ন অর্থ মরুদার অর্থাৎ একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা। দেব-যস্ন অর্থ দেবের অর্থাৎ সাকারের উপাসনা। যাহা নিরাকার তাহা একটিই মাত্র হইতে পারে। যাহা সাকার রুচি ভেদে তাহার বিভিন্ন আকার প্রতিভাত হইতে পারে। নিরাকারোপাসনায়

* Winternitz—Indian Literature—Vol. 1, p. 130.

বহুদেব-বাদের সম্ভাবনা অংকুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

সাকারোপাসনা যেমন দেবযানের বৈশিষ্ট্য, সেইরূপ ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা।

মহাভারতে একটি শ্লোক আছে—

কামঃ ক্রোধঃ ভয়ং লোভঃ শোকশ্ চিন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ।
সর্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্ বর্ণো বিভিদ্যতে॥ শান্তি—১৮৬।৭

আমরা সকলেই কাম ক্রোধ ভয় লোভ দ্বারা সমানভাবে অভিভূত হই, অতএব বর্ণ-বিভেদের সার্থকতা কি?

আবার এই মহাভারতেই বলিয়াছেন—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্যাংসো বিদ্যৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্ম-বেদিনঃ॥ উদ্যোগ—৬ই

সৎকর্মপরায়ণ ঈশ্বরনিষ্ঠ মানুষই (ব্রাহ্মণই) মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠ ফল। মনুষ্যত্বের আদর্শ তাহাদের মধ্যেই পূর্ণ বিকশিত।

সাম্যবাদের উপদেশ দিয়া গীতা বলিয়াছেন—

বিদ্যা-বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্ব-পাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।। ৫—১৮

কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন ব্যাধ ইহারা উভয়ে যদি সর্বথা সমকক্ষই হইত, তবে গীতার এই উপদেশের আর কোনও প্রয়োজন থাকিত না। বিনা উপদেশেও স্বাভাবিক ভাবেই লোকে উভয়কে সমান চক্ষেই দেখিত। বেদনা (feeling) বিষয়ে উভয়কেই সমকক্ষ মনে করিতে হইবে—কাহারও অন্তকরণে দুঃখ দিবে না, সে জন ব্রাহ্মণই হউক অথবা নিষাদই হউক। কিন্তু চেতনার (knowing) রাজ্যে উভয়ে সমান নয়,—উভয়কেই সমান মর্যাদা দেওয়া চলে না।

গীতার এই উপদেশ যিনি অক্ষরে পালন করেন, সেই ব্রাহ্মণ, আর গীতার এই উপদেশকে যিনি প্রতিনিয়ত পদ-দলিত করেন, সেই ব্যাধ, এই উভয়ে যদি সর্বদা সমতুল্যই হয়, তবে গীতার উপদেশ পালনের কোনও মূল্য থাকে না। অতএব ব্রাহ্মণত্বের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই যে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, সেই ব্যবস্থার কোনও উপযোগ নাই একথা বলা চলে না। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" পিতার গুণ পুত্রে সংক্রামিত হয়। অতএব উহাকে একেবারে নির্বাসিত না করিয়া, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাকে সংশোধিত করিয়া লওয়া যায় কি না, তাহাও বিবেচনার বিষয়।

সে যাহাই হউক, দেবযানে সাকারোপাসনা এবং বর্ণশ্রমব্যবস্থা আছে, পিতৃযানে তাহা নাই।

এখন হইতে হিন্দুগণ ও পার্শীগণ পৃথক্ পৃথক্ পথে চলিতে লাগিলেন।

একদল চলিতে লাগিলেন দেবযানে, একদল চলিতে লাগিলেন পিতৃযানে। বেদত্রয়ীতে যাহা অস্পষ্টভাবে ছিল, সেই সাকারোপাসনা ও বর্ণাশ্রমব্যবস্থাকে হিন্দুগণ পরিস্ফুট করিয়া লইল। বেদত্রয়ীতে যাহা স্ফুটভাবে উপলব্ধ, সেই নিরাকারোপাসনা ও বর্ণ-সাম্যকে পার্শীগণ আঁকড়াইয়া রহিল।

অথর্ববেদ এই শাখাবিভাগের ইতিহাস। অতঃপর আর্যজাতি হিন্দুশাখা ও পার্শীশাখা এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ইহারই নাম দেবাসুর সংগ্রাম। বেদ-ত্রয়ীরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া অথর্ববেদকে অমৃত মন্থন করা গেল। দেবগণ ও অসুরগণ একত্রে আহার করিতে বসিয়া গেলেন। বিষ্ণু হইলেন পরিবেশন কর্তা। রুচিভেদে পার্শীগণ গ্রহণ করিলেন ভার্গবরস আর হিন্দুগণ গ্রহণ করিলেন আঙ্গিরস রস।

প্রারম্ভে যাহা ছিল রুচিভেদ, একটি শাখার প্রতি অধিক আকর্ষণ, পরিশেষে তাহাই হইল বুদ্ধিভেদ, পরমতসহিষ্ণুতা, অপর শাখার প্রতি বিদ্বেষ। সুস্থ প্রতি-যোগিতা ক্রমে অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইল। দেবগণ ও অসুরগণ যুদ্ধে মাতিয়া গেলেন। সিন্ধুনদকে সীমানা করিয়া মাতৃভূমিকে ভাগ করিয়া লইলেন। ফল ক্রমাগত মাতৃভূমি আর্যবিশ, (জেন্দ-অইরাণাং বিজো), আর্যায়ণ (ইরাণ), এবং আর্যাবর্ত (ভারতবর্ষ) এই দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এমন দিন কি আসিবে, যখন এই দুই দেশ একত্রিত হইয়া আবার অখণ্ড আর্যবিশের প্রতিষ্ঠা করিবে?

সে যাহাই হউক, দেবাসুর সংগ্রামের যথার্থ ইতিহাস, হিন্দু ও পার্শী বিভেদের প্রকৃত কারণ, এই অথর্ব বেদেই লিখিত আছে। ইহাই অথর্ববেদের গুরুত্বের হেতু।

একদিক হইতে দেখিতে গেলে যাহা দেবাসুর সংগ্রাম, হিন্দু ও পার্শীজাতির বিচ্ছেদ, অপরদিক হইতে দেখিতে গেলে তাহাই জাতীয়তার সূত্রপাত। হিন্দু-জাতীয়তার এবং পার্শী-জাতীয়তার প্রাথমিক পত্তন। অতএব জাতীয়তাবাদের পক্ষে অথর্ববেদ অপরিহার্য গ্রন্থ। ভার্গববেদই পার্শীর আদিম জাতীয় সংগীত আর আঙ্গিরস বেদই হিন্দুর প্রথম জাতীয় সংগীত। ইহাই অথর্ববেদের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় প্রগতির পটভূমিকা

(৫)

রেণু মিত্র

শনিবার, ১৪ই আষাঢ়, ১৩৫৯ তারিখের যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'দুর্নীতির ব্যবসা' বলে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনাটা এইরকম, 'দক্ষিণ কলিকাতায় চিকিৎসা ও অঙ্গ সম্বাহনের নামে স্থাপিত একটি ক্লিনিকে গোপনে পতিতাবৃত্তির ব্যবসা চালাইবার অপরাধে উক্ত ক্লিনিকের মালিক ও ম্যানেজারকে আলিপুর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ছয় মাস হিসাবে কারাদণ্ড এবং পাঁচ শত টাকা হিসাবে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আর তাঁহাদের এই ব্যবসায়ে সহযোগিতা করার অপরাধে তিনটি তরুণীকে একশত টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে তিন মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ......এই প্রসঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধী-দের সম্বন্ধে যে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বলিয়াছেন, সৎ নাগরিকের দম্ভবেশে আসামীরা স্ত্রীলোক আমদানি করিয়া যেভাবে তাহাদের দিয়া পতিতাবৃত্তি করাইত এবং এই নারীদের ব্যক্তিগত জীবনে অধোগতি ও সমাজ জীবনে দুর্নীতির প্রসার ঘটাইত, তাহা গুরুতর অপরাধ—এজন্য তাহাদের উপর বেত্রদণ্ড প্রয়োগই সমীচীন হইত, তথাপি তাহাদিগকে সংশোধনের সুযোগ দিবার জন্যই লঘুতর দণ্ড ব্যবস্থিত হইল।'

সমাজের এই যে চিত্র উপরে উদ্ধৃত হল, এ নিয়ে যদি আমাদের কোন ভাবনা না থাকে, তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমরা? এর গতিকে রুদ্ধ করবার পথ কি? অনেকেই বলে থাকেন যে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো যেখানে ভেঙ্গে গেছে, মানুষকে খেতে পরতে দিতে যখন রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবারের অভিভাবক অপারগ, সেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ যদি তার নীতিবোধকে না মেনে বেরিয়ে পড়ে যা খুশী তাই করতে, তাহলে সমাজরক্ষকগণ নিষেধ করতে পারেন কোন্ যুক্তিতে? অর্থাৎ এ ব্যাপারের মূল কারণটা রয়েছে অর্থনীতির মধ্যে। কিন্তু নারী এইভাবে নিজের দেহ-মনের শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে, আর পুরুষ তার সুযোগ নিয়ে টাকা খাটিয়েছে—এ কি শুধু আজকের দিনেই ঘটেছে? অনেকেই বলেন, 'গত দশ বছর ধরিয়া বঙ্গলার সমাজ জীবনের উপর দিয়া যে বিরামবিহীন বিপর্যয়ের স্রোত চলিয়াছে—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু আগমন, কালোবাজার একের পর এক করিয়া যে ভাবে সামাজিক স্থিতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাহার অনিবার্য পরিণতিরূপেই দেশে ঝড়তি-পড়তি নরনারীর সংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। জীবনধারণের অনতিক্রমনীয় তাগিদেই ইহারা আজ অন্যায় ও অনাচারের পথে পা বাড়াইয়াছে।' যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ প্রভৃতিতে এ সকল ঘটনা বর্তমানে

কিছুটা বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু এই কি এর মস্ত বড় কারণ? ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রফেসন্স্ নামক নাটকের ভূমিকায় বার্ণাড শ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'জিজ্ঞাসা করি স্বতন্ত্র উপার্জন যার আছে, সে নারী যতই কামুক হোক, কখনো কি গণিকালয়ে নাম লেখায়?' তিনি লিখেছেন, '......পাপ সেই সমাজের, যে তার জীবনে এই দুটি মাত্র পথ খোলা রেখেছে। কারণ তাকে বাছাইয়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে সুনীতি আর দুর্নীতির মধ্যে নয়, দুরকমের দুর্নীতির মধ্যে। যে মানুষ বোঝে না যে অনাহার, অতি পরিশ্রম, রোগ, অপরিচ্ছন্নতা বেশ্যাবৃত্তির মতোই সমাজ বিরোধী, জাতির দুর্ভাগ্য নয়, জাতির অপরাধের ফল—সে (ভদ্রভাষায়ই বলি) অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি।'

অপরাধ যে ব্যক্তি বিশেষের নয়, অপরাধ যে সমগ্র ভাবে সমাজের এতে সংশয় নেই এতটুকু। তাই যে কোন পাপের জন্যই হোক না কেন, কোন ব্যক্তিকে অথবা পাপ যারা করে এমন কোন দলকে গালাগালি দিয়ে কোন লাভ নেই এ কথা যাঁরা না বোঝেন, তাদের সে কথা বোঝাতে সাহিত্যিকরা যে কোন ভাষাতেই চেষ্টা করুন আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বার্ণাড শ মিসেস ওয়ারেন্স্ প্রফেসন্স লিখেছিলেন, সে সময় ইংলণ্ডের তথা পৃথিবীর অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পড়ে নারীকে যদি পতিতাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়, তবে সে অবস্থা আজও তো প্রায় সেই রকমই রয়ে গেল—অর্থনৈতিক সামগ্রিক সাম্য তো আজও আসল না, আজও বলতে হচ্ছে 'জীবনধারণের অনতিক্রমনীয় তাগিদেই ইহারা আজ অন্যায় ও অনাচারের পথে পা বাড়াইয়াছে', তাহালে কবে অর্থনৈতিক সাম্য আসবে সেই ভরসাতে ও সেই অপেক্ষাতেই কি একে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হবে কিম্বা এটা শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাই নয়, অন্যান্য ভাবের বা চিন্তাধারার আন্দোলনও এর প্রতিকারের জন্য দরকার —একথা ভেবে দেখতে হবে? অর্থনৈতিক সমস্যাই যদি এক এবং একমাত্র কারণ হতো তাহলে মিসেস ওয়ারেনের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান যেদিন হয়ে গিয়েছিল, সেদিনও সে এ ব্যবসা ছাড়লো না কেন? আর সার জর্জ ক্রফ্‌টস্, ডিউক অব বেলগ্রেভিয়ার বা আর্চবিশপ অব ক্যাণ্টারবারিই বা এ ব্যবসায়ে টাকা খাটায় কেন? তাদের কাছেও কি মাত্র দুটি পথই খোলা ছিল? দুর্নীতি অথবা অনাহারে মৃত্যু? অর্থনীতির কৈফিয়ৎ মিসেস ওয়ারেন দিয়েছিল বটে কিন্তু কন্যা ভিভি যখন তার মাকে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার তো আর ব্যবসা না করলেও চলে, তবু এখন তুমি চালাচ্ছ কেন?' তখন মিসেস ওয়ারেন অনেক কথার মধ্যে সোজাসুজি জবাব দেয়, '...এ ছাড়া কি-ই বা আমি করব বলো? যা করছি তাই আমার ভালো, এই আমার পোষায়, আর কিছু আমাকে দিয়ে হবে না। ধর আমি না হয় ছাড়লাম, আর কেউ তো করবে, তাহলে আমার করতে দোষ কি? আর তা ছাড়া এতে টাকা আসে অনেক, আর অনেক টাকা আমার ভাল লাগে। না, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, এ আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না—কারুর জন্যেও না। ......'

ভিভি যখন জেনেছিল যে এ পথ নিতে হয়েছিল তার মাকে অনাহারের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে, তখন ভিভির অন্তঃকরণ তার মাকে ক্ষমা করে নিয়েছিল। কিন্তু আজ যখন তার মায়ের ব্যাংকে আছে একটা মোটা রকমের অংক, তখনও যখন তার মা এই ব্যবসাই চালিয়ে যাচ্ছে, নিজের জীবনের ওপর দিয়ে নয় কেবল, বহু মেয়ের সর্বনাশ করে, তখন আর তাকে ক্ষমা করতে পারা ভিভির পক্ষে সম্ভব হলো না। মাকে সে বলেছিল, 'হাতের মুঠোয় পেয়ে আমিই বোধ হয় একমাত্র মেয়ে যার তুমি সর্বনাশ করনি।'

তাই প্রশ্ন, এ কি শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা? শতবর্ষ পূর্বেও এ চলেছে, আজও চলছে—টাকার অংক যখন ব্যাংকে বেশ ভারী হয়ে জমে ওঠে, তখনও মানুষ এ ব্যবসা ছাড়ে না। কোনদিনই যাদের অনাহার বা অর্ধাহারের মুখ দর্শন করতে হয় নি, তারাও এই ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে বেশ দিন চালাচ্ছে—তাই একথা স্বতঃই মনে হয় অনাহারই কি এর একমাত্র কারণ? আজকের যারা তথাকথিত ক্লিনিকে গিয়ে নিজেদের দেহ মনকে শিথিল করে দিচ্ছে—যে প্রসঙ্গ যুগান্তর উল্লেখ করেছে—তারাও দোহাই দিচ্ছে নাকি ঐ অর্থনীতিরই। অনেকেই তা সমর্থন করেও থাকেন। কিন্তু আমরা স্পষ্ট করেই বলব বার্ণাড'শ যতই বলুন না কেন যে স্বতন্ত্র উপার্জন থাকলে কোন নারী পতিতালয়ে নাম লেখায় না, একথা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না যে, পুরুষ যখন নারীকে দিয়ে অসামাজিক কাজ করিয়ে নিয়ে অর্থোপার্জন করে আর নারী যখন নিজের দেহ-মনকে এমনি করে শিথিল করে দিয়ে অপরের হাতের ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার মূল শুধু অর্থনীতিতেই; তার মূল আরও গভীরে।

অনাহার আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ যদি অসামাজিক কাজ করে, তবে সেটা হয় সাময়িক আপৎকালীন ব্যবস্থা, কিন্তু কোন স্থায়ী ব্যবসা যখন বহুকাল ধরে চলতে থাকে তখন বোঝা যায় ভিতরের কোন দুর্বলতার সুযোগই আত্ম-প্রকাশ করছে অর্থনীতির মুখোশ পরে'। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে কোন কাজ করা আর সে পরিবেশ যখন বদলে যায়, তখনো তা-ই চালিয়ে যাওয়া—এ দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান যে অনেক। এক পরিবেশে যাকে মেনে নেওয়া চলে, ভিন্নতর পরিবেশে তা' একেবারেই অসম্ভব। উপনিষদ লিখছেন, দুর্ভিক্ষের সময় অখাদ্য খাওয়া চলে—সূত্র দিচ্ছেন 'সর্বান্নানু মতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শণাৎ' ব্রহ্মসূত্র। প্রাণের অত্যয় উপস্থিত হলে মানুষ যে কোন অন্ন গ্রহণ করতে পারে। দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে থরে থরে সাজানো দোকানের কাঁচ ভেঙে খাবার খেয়ে জীবন বাঁচানোই তখন ধর্ম। সেখানে নীতি-ধর্ম রক্ষা করে মৃত্যু বরণ করা ক্লৈব্যের লক্ষণ বৈ কি। দেহ-মন-প্রাণের যে নমনধর্মশীলতা থাকলে মানুষ যে কোন অবস্থার মধ্যে দিয়ে উতরে এসে তার আত্মধর্মে স্থিত হতে পারে, সে নমনধর্ম জীবিত মানুষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। কোনমতে কোন অবস্থাতেই যে মানুষ নিজের পরিচিত চলার ধারাকে বদলে নূতন পথে চলেও নিজের স্বধর্ম রক্ষা করতে পারে না, সেই জড়ধর্মী ব্যক্তি তথা জাতি

জীবিত নেই, সে মরে গেছে।

কিন্তু এতো গেল বিশেষ অবস্থার কথা—বিশেষ আবেষ্টনে নিজেকে মানুষ কি করে পার করিয়ে নেবে তারই নিশানা। কিন্তু এর নির্দিষ্ট সীমারেখা দৃঢ়ভাবে মেনে না নিয়ে একে চলতে দিলে সমাজ যে মনুষ্য সমাজ থাকবে না, একেবারে পশুর সমাজে নেমে যাবে, একথা মনে না রাখলে নিজেদেরকে আমরা রক্ষা করব কেমন করে? শুধু অর্থনৈতিক নয় বলেই যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় নারীকে দিয়ে পুরুষ তার স্বার্থপর উদ্দেশ্যকে সমাধান করিয়ে নিতে পারে, আর নারীও নিজেকে এমনি করে বলি দেয়, আর তা আপৎকালীন সাময়িক ব্যবস্থা নয়, তা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসতে পারে। বার্ণার্ড'শ যখন লেখেন, 'মিসেস ওয়ারেনের কাহিনীতে চোর কোন ব্যক্তি নয়, সমাজ', 'মিসেস ওয়ারেনের পেশার পাপটা মিসেস ওয়ারেনের ঘাড়ে চাপাতে পারলেই ইংরেজ সমাজ সব চেয়ে নিশ্চিন্ত হয়। আমার নাটকের গোটা উদ্দেশ্য হল এই বোঝাটা ইংরেজ সমাজেরই ঘাড়ে চাপানো,' তখন সমাজের এই চৌর্যবৃত্তি কেবল অর্থের ভাগ আত্মসাৎ করতে নয়। অধিকার, মর্যাদা, সম্মান প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই নারীকে সমাজ যে মূল্য দিয়ে রেখেছে, এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনার মূলে অনেকখানি আছে সেই সামাজিক ব্যবস্থার অন্তরালে, আমাদের বক্তব্য এইটেই। তাই আজ জীবন সম্বন্ধে—ব্যক্তিগত জীবন ও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সমষ্টিজীবন—এই উভয় জীবন সম্বন্ধেই নূতন ধারণার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মাকে ভিভি ক্ষমা করতে পারেনি। নিজের জীবনে সে যে পথ নিয়েছিল সেটা স্বভাবজ নয়, সেটা প্রতিক্রিয়ার ফল সন্দেহ নেই এবং তার মার মত মানুষকেও যে ক্ষমা করার মত স্তর আছে তা ভিভি না জানলেও যে জায়গায় দাঁড়িয়ে সে তার মায়ের পথ থেকে নিজের জীবন পথ আলাদা করে নিতে বাধ্য হয়েছিল, সেইখানে আছে একটা নূতন জীবনধারার ইঙ্গিত। ভিভি বলছে মাকে, 'কুসংস্কারকে, নীতিবাদকে তোমার চেয়ে আমি যে খুব বেশী মানি তা ভেব না। তোমার চাইতে বরং কমই হবে তবে সস্তা ভাবালুতায় নিঃসন্দেহে আমি তোমার চাইতে কম যাই। সমাজে সৌখিন নীতিবাদ যে নিছক একটা ভণ্ডামি এ আমি ভালো করেই জানি; আর এও জানি তোমার কাছ থেকে নিয়ে বাকি জীবনটা ফ্যাসানেবল মহিলার মতো টাকা উড়িয়ে, একটা মেয়ে যতটুকু অপদার্থ আর বাজে হতে পারে সেই রকম একটা কিছু হয়ে, নিন্দের কথা একটিও না শুনে, অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারতাম। কিন্তু অপদার্থ হবার আমার সাধ নেই। পার্কে পার্কে আমার দরজীর, আমার ফিটন মিস্ত্রীর জীবন্ত বিজ্ঞাপন সাজা কিংবা শো-কেশ ভর্ত্তি হীরের জৌলুষে তাক লাগিয়ে অপেরাতে বসে হাই তোলা—এ সব আমার ধাতে সইবে না।'

মাকে রূঢ় কথা বলে ভিভি ভাল করে নি, তবু ফ্যাসানেবল মহিলা না হতে চাওয়ার যে মনোবৃত্তি তারই মধ্যে আছে পুরুষের হাতের পুতুল হয়ে পড়ে দেহ মনকে শিথিল হতে না দেওয়ার পথ। অর্থনীতির যারা দোহাই দেন, তারা এ কথাটা

ভুলে গেছে যে শাড়ী গয়না পরার কিংবা একটা 'লিভিং স্টাণ্ডার্ড' বজায় রাখতে চাওয়ার মনোবৃত্তি, পরিশ্রমবিমুখতা ও অনায়াসে দিন কাটানর মনোবৃত্তিই অনেক খানি তাদের যে কোন কাজ বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে প্রেরণা জোগায়। এর ওপরে আছে সস্তা ভাবালুতা। এ গুলোই যে অপরের হাতের ক্রীড়নক করে তোলে মেয়েদের—মেয়েরা এ কথাটা জানে না। মেয়েরা যদি জাতশুদ্ধ সত্যিকারের কর্মী হতো, অসামাজিক বৃত্তি গ্রহণ করার আগে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চারদিকে আর কি পথ আছে, নিজেকে কতখানি নারীজনোচিত না করে মনুষ্যোচিত করে তুললে অনেক দুর্ভাগ্যের দায় এড়ানো যায়, এ যদি তারা জানত, তবে অসামাজিক বৃত্তি গ্রহণ থেকে অনেকখানিই নিজেদেরকে তারা বাঁচাতে পারতো। পরের দ্বারা চালিত হয়ে হয়ে মেয়েদের আত্মশক্তি এমনই বিশ্রীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যে তারা এত লজ্জাজনক ভাবে সস্তা হয়ে যেতে পেরেছে।

যে সময়ে সমাজ মেয়েদের জন্য দুটো পথের বেশী খোলা রাখে না, যখন হয় তাকে স্বামীর ঘর করতে হয় নয় তাকে অসামাজিক বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়—মাঝখানে আর কোন পথ থাকে না, সে সময়টা মেয়েদের বড় কঠিন সময়। কিন্তু স্বামীর ঘর করব না অসামাজিক বৃত্তিও নেব না—এমন কঠিন পণ করে কি বের হতে পারে না কেউ পথে? নারী যদি মানুষ হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই এমন বিপ্লব বুকের মধ্যে নিয়ে মেয়েদের পথে বের হয়ে পড়া উচিত ছিল। আজ ইচ্ছে করে না হলেও কালের গতিকে মেয়েদের সামনে জীবনধারণের জন্য বহু পথ বের হয়ে গেছে। আজকের এই খোলা বাতাসে অর্থনৈতিক দুর্গতি যতই থাক, মেয়েরা যদি একটা দৃঢ় মনোভাব ও সুস্থ জীবনচেতনার খোঁজ পায়, তাহলে কিছুতেই তাদের অসামাজিক বৃত্তি নেবার প্রয়োজন হয় না—এ কথা জোর করে বলা চলে। সমাজ যে সময়ে তাদের সামান্যতম স্খলনের জন্যও তাদের পতিতা বলে ত্যাগ করেছে, সে সময়ে মেয়েরা যে এ পথ নিতে বাধ্য হয়েছিল তার পেছনে অর্থনীতির কারণই ছিল না। পরের বাড়ীর গৃহিণীপনা করা ছাড়া নারীর সামনে তখন আর পথ নেই, অথচ সামান্যতম ত্রুটিতেও সমাজ তাকে গৃহিণী হওয়ার সৌভাগ্য থেকে চিরকালের মত বঞ্চিত করেছে, তখন সে নারীকে তো সমাজই পতিতাবৃত্তির মুখে হাতে ধরে ঠেলে দিয়েছিল; তার পেছনে তো অর্থনীতির কারণ ছিল না।

যাক, আজ দেখতে পাচ্ছি আজকের দিনে মেয়েরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে তার সামনে মাত্র দুটি পথ নেই—অনেকখানি মুক্ত আকাশ তার মাথার ওপর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আজও দাসত্বসুলভ মনোবৃত্তি থেকে নিজেকে সে মুক্ত করতে পারে নি। এ জন্য চাই একটা উদার বলিষ্ঠ ও সামগ্রিক জীবনচেতনাবোধ মেয়েদের সামনে তুলে ধরা। অসামাজিক বৃত্তি গ্রহণ করে মেয়েরা কি ভাল আছে? অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও দেহমনের শিথিল ব্যবহার নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজেকে তার প্রাণপণ লড়াই করতে হচ্ছে না কি? উত্যক্ত দেহমনের শ্রান্তিতে তাদের যে অবস্থা

হয়, তা সুন্দর তো নয়ই, সোয়াস্তিজনকও নয়।

আজকের মেয়েদের সামনে যদি একটা বলিষ্ঠ, সুস্থ ও উদার জীবন-চেতনা-বোধ তুলে ধরতে পারি, তা হলে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে সাময়িকভাবে কেউ যদি অসামাজিক বৃত্তি নিতে বাধ্যও হয়ে থাকে, তবু তার ফেরবার পথ বা প্রবৃত্তি বন্ধ হয়ে যায় না। মিসেস ওয়ারেন যখন ফিরতে চায় না, যেমন চায় না আজকেরও বহু মেয়ে, তখন বুঝতে হবে জীবনের মূল থেকে সৌন্দর্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। স্বাধীন হওয়ার বা প্রগতির মোহে এবং অর্থনীতি সমাধানের অত্যাগ্রহে কতকগুলি কথা আমরা বিস্মৃত হতে চলেছি যা আমাদের বিপদে ফেলেছে। নারীর জীবনকে, তার সমস্ত দেহমনকে যা কেবল বিক্ষিপ্ত করেই দিচ্ছে, কোন সংগঠনই যার ফল নয়, এমন কোনো চলাফেরাকেই স্বীকার করে নেওয়া যাবে না। কোনো একটি ঘটনাই জীবনকে নষ্ট করে দেয় না সত্য, কিন্তু জীবনকে যা স্থিতি দেয় না, যে গতিবেগ জীবনকে সুন্দর করে না, উদার করে না, কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী করে না, আবার কমনীয় ক্ষমাশীল করে' ব্যষ্টির সাথে সমষ্টির যোগসাধন করিয়ে দেয় না, সে গতিবেগকে যেন না আমরা জীবনে বরণ করি। আজকের মেয়েরা যখন বাইরে পথ পেল, তখনই তাদের জানান দরকার যে, বাইরেটা সত্য কিন্তু উচ্ছৃংখলতা সত্য নয়। জীবনের স্থিতি ও গতি উভয় দিককে মিলিয়ে যে সামগ্রিক জীবন-চেতনা তাই-ই আজকের মানুষের একমাত্র স্থিতিভূমি—এ কথাটা যটি মেয়েরা উপলব্ধি করতে পায় তাহলেই অসামাজিক হবার প্রবৃত্তিও যেমন কমে যাবে, তেমনি গিয়ে পড়লেও ফিরে আসবার প্রবৃত্তি তার নষ্ট হয়ে যাবে না, পথও থাকে,আসবার। ফিরে আসবার প্রবৃত্তি যখন মানুষ হারিয়ে ফেলে, ব্যষ্টি বা সমষ্টির মৃত্যু সেইখানে।

তাই মেয়েদের অসামাজিক বৃত্তি গ্রহণের পশ্চাতে অর্থনৈতিক খোঁচা যতটুকুই থাকুক না কেন, বহু বাধা নিষেধের অন্তরালের জীবনযাপন থেকে বাইরে এসে স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা অথচ অপরের হাতের ক্রীড়নক হয়ে থাকার যে দীর্ঘকালের অভ্যাস, তারও হাত থেকে মুক্ত না হওয়ার একটা প্রতিক্রিয়ার ফল এর জন্য অনেকখানিই দায়ী একথা অস্বীকার করবার জো নেই। আর তার সঙ্গে আর যা যুক্ত হয়েছে তা আগেই উল্লেখ করে এসেছি—শাড়ী গয়না পরার কিংবা একটা তথাকথিত 'লিভিং স্টাণ্ডার্ড' বজায় রাখার, পরিশ্রমবিমুখতা ও অনায়াসে দিন কাটানোর মনোবৃত্তি আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সস্তা ভাবালুতা। এই সব মিলিয়ে আজকের এই যে সমস্যা, এর সমাধান ঐ কারণগুলি দূর করবার মূলেই রয়েছে—আর রয়েছে গোড়া থেকে একটা বলিষ্ঠ, উদার, সুস্থ ও সুন্দরতর জীবন চেতনা বোধ মেয়েদের সামনে তুলে ধরার মধ্যে। সেই সঙ্গে চলুক অর্থনৈতিক সাম্য আনবার প্রচেষ্টা। মেয়েরা সুস্থ হোক, পুরুষের তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করবার ক্ষমতা তার ওপর থেকে দূর হোক, এইটেই আজ মানুষ ভিতরে ভিতরে চাইছে।

বাঙ্গলার মানব ধর্ম ও বাউল

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

ধর্ম এবং দর্শন একই জিনিষ। দর্শন হচ্ছে বাইরের মতামত—এই মতামত জীবনে গেলেই হয় ধর্ম। আমাদের দেশে দর্শন দুই ধারায় হয়ে এসেছে। একটি বড় বড় পণ্ডিতদের, অপরটি নিরক্ষর মূর্খদের। আমি এই মূর্খদের ধারাটির কথাই বলব। এই পর্যায়ে হচ্ছেন মধ্যযুগীয় সন্তরা এবং বাংগলার বাউলরা। এঁদের কথা আলোচনা করলে অবাক হয়ে ভাবতে হয় যে, নিরক্ষররা কি করে এই রকম সব সত্য ও তত্ত্বের কথা বলে। ভারতে বাইরের বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি এবং ধর্মের সংগে হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন হয়েছে, কিন্তু মুসলমানরা যখন এলেন তাঁদের সংগে মিলন করে কে? অন্য সব ক্ষেত্রের মিল পণ্ডিতরা করেছেন; কিন্তু এখানে পণ্ডিত ও কাজীর দ্বন্দ্ব। তাই নিরক্ষররা এলেন এগিয়ে। তাঁরা বললেন, আমরাই মেলাব। তাঁরা বললেন যে, এটা পণ্ডিতদের কাজ নয়, কারণ 'ইট ইটা আগ লাগে' অর্থাৎ ইটের সংগে ইটের সংস্পর্শে আগুন জ্বলে আর কাদায় কাদায় মিলে যায়। আমরা অশিক্ষিত কাদার মত, আর পণ্ডিতরা লিখে পড়ে ইটপাথর হয়েছেন, তাঁদের হৃদয়ে প্রেম নাই। কবীর বলেছেন আমি কাগজ কলম চাই না—সহজ দৃষ্টি চাই।

কি সহজ দৃষ্টি ছিল এই সন্তদের। পণ্ডিতরা কবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন ভগবান দ্বৈত কি অদ্বৈত। কবীর পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন ভগবানের গুণ সত্তা প্রভৃতি কি? পণ্ডিতরা বললেন, তিনি সবেরই অতীত। তখন কবীর বললেন যে, ভগবান যখন সবেরই অতীত তখন সংখ্যারও অতীত। তিনি সব পার হয়ে শুধু সংখ্যায় আটকাবেন কেন? পণ্ডিতরা আবার কবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রহ্মকে পাবার পথ কি? কবীর বললেন তাঁকে পাবার পথ নেই, কেননা পথ আঁকতে হলেই দূরত্ব থাকবে। দূর না থাকলে পথ কি? 'দূর নেহি ত পন্থ নেহি'। ব্রহ্মতে আমাতে দূর নেই বলেই পথ নেই। আমাদের বাউলরা বলেছেন ভিতরে আছেন বললে জগৎ লজ্জা পায়, আর বাহিরে আছেন বললে মিথ্যা কথা হয়। তিনি ভিতর বাহির দুই নিরন্তর। কাগজের যেমন এপিঠ ওপিঠ নিয়ে কাগজ হয়, সেইরকম তিনিও। 'এপিঠ ওপিঠ উল্টো কথা দু'য় মিলে সত্যি কথা'।

আমার বাংগলার বাইরে জন্ম এবং সেখানেই মানুষ; কাজেই বাউলদের কথা কিছু জানতাম না। কাশীতে আমার সর্বপ্রথম আলাপ হয় নিতাই বাউলের সংগে। সে নিরক্ষর ছিল; কিন্তু এমন বিষয় নাই যে সে বুঝত না। সে বলত 'বাবা মানুষ পেয়েছিলাম'। এরা মানুষে ব্রহ্ম দেখেছেন। এই মানুষ-ধর্ম ভারতে অতি পুরাতন। মহাভারতে ভীষ্মদেব বলছেন, 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরো হি কিঞ্চিৎ'। চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' ত সকলেই জানেন। নিতাই বলত মানুষকে পেলেই তাঁকে

পাওয়া হবে। এই নিতাইয়ের সংগে আলাপের পরে বাউলদের সম্বন্ধে খেয়াল হল। এর পর আমার স্বদেশ ঢাকা জেলার সোণারং আসি। এখানে গ্রামের কৈবর্তদের গুরু দাসু বৈরাগীর সংগে আলাপ হয়। পরে কৃষ্ণকান্ত পাঠক, যাঁর গান 'যাঁর রূপ সাগরে ডুব দিয়ে সে গৌর হয়েছে' ও তাঁর দুই শিষ্য বল্লভ আর দুর্লভের সংগে পরিচয় হয়। এ'রা দুজন ছিলেন জাতিতে কৈবর্ত। অতি সাধারণভাবে থাকতেন—প্রথমে কিছুতেই ধরা দেন না—সত্যাগ্রহ করলাম—তখন একদিন রাত্রিতে পদ্মার চরে বসে এ'রা ভিতর খুলে দিলেন। এ'দের গুরু কৃষ্ণকান্ত এ'দের সম্বন্ধে বলতেন—আমি ঠাকুর ঘরের তামার পাত্র আর এ'রা (শিষ্যরা) হলেন ঠাকুরের চরণপদ্ম। দুর্লভ বললেন, তাঁর দীক্ষা কন্যার কাছে। একমাত্র কন্যা অল্পবয়সে মারা যায় তখনই চোখ খোলে। আমরা এক পয়সা দিয়ে তার বিনিময়ে হিসাব করে জিনিষ নিই, আর এমন মহামূল্য বস্তু তাঁকে দিয়ে বিনিময়ে কিছুই নেব না? সন্তানের বিনিময়ে দরজা খুলল। তাঁদের এক গান শুনলাম কন্যার মৃত্যু নিয়ে, কি অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গি—

'তুই ছিলি তাঁর চরণের ফুল
বুঝি তাঁর পূজার সময় হইয়াছে।
তুই ছিলি আমার ঘরে
আভায় শোভায় গন্ধে ভরে
(আমি) ভেবেছিলাম আপন করে
এখন যাহার ধন সেই লইয়াছে।
ফুলে গেল হইল না ফল
কেন কেঁদে মরি বিফল
(এখন) শ্রীচরণের চরণকমল
দেইখা আমার সব সইহাছে।
তোমার রতন দাসীর ঘরে রাইখা ছিলে
ক্ষণেক তরে
ওগো প্রেমের সিন্ধু প্রেমের বিন্দু দাসী
আজ সব সইপাছে।

[এই গানখানি শ্রীমতী সুধা নন্দী ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষ গাহিয়া শোনান।'

এরপর হঠাৎ আর একজন বাউলের গান শুনি একদিন, তাঁর নাম গগন। গান শুনেই তাঁর সংগে দেখা করবার জন্য ইচ্ছা হল—শুনলাম তাঁর বাড়ী শিলাইদহে। চললাম সেখানে। সংগে দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সেখানে গিয়ে শুনলাম তিনি মারা গেছেন। পরে খোঁজ নিয়ে তাঁর এক বন্ধুর সংগে দেখা করলাম। তিনি একজন মাঝি। আমার এক সংগী এ'কে জিজ্ঞাসা করলেন, গগন এত অল্প বয়সে মারা গেলেন কেন? সেই মাঝি বাউল জবাব দিলেন, তাঁর জীবনদীপ তেল ও সলতেতে পরিপূর্ণই ছিল; কিন্তু তিনি মিটমিট করে আলো জ্বালেন নি—জ্বেলে-

ছিলেন এক সংগে অনেকগুলি সলতে দিয়ে, কাজেই তেল তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। দেখুন অজ্ঞ মাঝির দার্শনিক জ্ঞান!

গগন বাউল ছিল একজন ডাক হরকরা। তাঁর একটা গান ছিল 'ঘরে ঘরে বিলাই চিঠি—আমার চিঠি পাব কবে'। 'ডাকঘর' নাটকে এর অনেক প্রভাব আছে। অনেকে 'ডাকঘরের' তত্ত্ব খুঁজতে জার্মাণী, ফ্রান্স যান; কিন্তু মূল-তত্ত্ব এখানে। গগনের আর একখানা খুব চলিত গান—

আমার মনের মানুষ যেরে
　　কোথায় পাব তারে
(হায়রে) সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

কাশী থাকতেই বাউলের সংগ করার জন্য কেন্দুলি আসতাম, পরে শান্তি-নিকেতন এসে প্রত্যেক বছরই যেতাম। একবার খোঁজ পেয়ে দীনু ঠাকুর, অজিত চক্রবর্তী, নেপাল রায় প্রভৃতি আমার সংগ নেন। সেবার এখানে নিত্যানন্দ দাস নামে এক বিখ্যাত বাউল এসেছিলেন। তাঁর একটা গান 'পাতকী চরণ রেণু শোভে তোমার গায়'—কি সাহস আর কি ভাব দেখুন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই গানটির ইংরাজী করেছেন: 'Dust kicked by sinners adore your body'. দিনের বেলায় নিত্যানন্দের গান শুনে রাতে আবার তাঁর জমায়েতে গেলাম; তখন তিনি ক্লান্ত—হরিদাস বলে আর একজন বাউলকে ডেকে পাঠালেন। হরিদাস এসে অনেক গান গাইলেন। একবার আমার সংগী নেপাল বাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন আপনি গেরুয়া পরেন না

এমনি হরিদাস গেয়ে উঠলেন—

'ভিতরে রস না হইলে কি
বাইরে কি রে রং ধরে,
ফলে কি অমৃত নামে
বাইরে তারে রং করে'।

নেপাল বাবুকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি প্রশ্ন করে উঠলেন, তোমার গুরু কে? অমনিই হরিদাস বলল, যে প্রেরণা দেয় সেই আমার গুরু। গুরু ত ২৪ জন আছেন, কাকে বলব? অমনিই সে গেয়ে উঠল—

'অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন,
গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন?
গুরু যে তোর বরণ ডালা
গুরু যে তোর মরণ জ্বালা
গুরু যে তোর হৃদয় ব্যথা
　　যে ঝরায় দু'নয়ন'।

নেপাল বাবু আবার প্রশ্ন করে উঠলেন, কবে তোমার দীক্ষা হয়েছে? হরিদাস গেয়ে

উঠল আবার। কারণ বাউলরা গানে ছাড়া জবাব দেন না। বলেন, আমরা পাখীর জাত, হেঁটে চলার ভাও জানি না। হরিদাস গাইলেন—

'যেদিন জনম সেদিন আমি দীক্ষা পেয়েছি,
এক অক্ষরের মন্ত্র মায়ের ভিক্ষা পেয়েছি।
দীক্ষা বিনা বহে না যে একটি প্রাণের শ্বাস
এই কথাটি গভীর আমার রয়েছে বিশ্বাস।
মায়ের নীর পেয়েছি ক্ষীর পেয়েছি পরাণ পেয়েছি,
তার সাথে সাথে মায়ের শিক্ষা পেয়েছি।

নেপাল বাবুকে আর ঠেকান গেল না—তিনি আবার প্রশ্ন করে উঠলেন, সাধন ভজনের পথ কি? অমনিই হরিদাস আবার গেয়ে উঠলেন—

'কাজলে আর করবে কত
(যদি) তোর নয়নে নজর না থাকে।
(তোর) প্রেম যদি না মিলল, ক্ষ্যাপা,
(তবে) ভজন সাধন কদিন রাখে।'

[গত ৪ঠা জানুয়ারী কুলটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনায় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন যে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার যে রিপোর্ট গত ১৪ই জানুয়ারীর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা তাহা হুবহু প্রকাশিত করিলাম। সঃ উঃ ভাঃ]

পুস্তক পরিচয়

দিশারিকপোত—কালীকিংকর সেনগুপ্ত। ৩৩-এ, মদনমিত্র লেন, বর্তমান প্রকাশনা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—দুই টাকা।

শেষের গান—কালীকিংকর সেনগুপ্ত। ডি এম লাইব্রেরী কলিকাতা। মূল্য—১৷৷৹

ওপরের দুখানি বইই কবি কালীকিংকর সেনগুপ্তের কবিতার দুটি সংকলন। কালীকিংকর বাবু অতি আধুনিক যুগের কবি নন। বরং তাঁর রচনাভঙ্গী ও ভাবধারায় রবীন্দ্রানুসরণের পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রত্যেকটি কবিতাই ছন্দে গ্রথিত ও মধুর। এমনকি তাঁর ছন্দপ্রীতি অনেকসময় ভাবকে অতিক্রম করে চলেছে। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে এক বিস্মৃত ও কল্পনার ভাবজগতে প্রবেশ করতে হয়। এ পৃথিবী ছাড়িয়ে এমনকি পৃথিবীর পরিবেশকে অস্বীকার করে সে পরিবেশ গড়ে উঠেছে। তাই সময়ের কোন ইংগিত মেলেনা তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতা পড়ে আধুনিক মনের চিন্তাধারার বিপ্লবের পরিচয় পাইনা। যেমন পাইনা যুগের রক্তাক্তসংঘাতের ইতিহাস। তবু বাক্য যদি রসাত্মক হলে তাকে কাব্য বলা চলে তাহলে নিশ্চয়ই কালীকিংকর বাবু ভালো কবি। তাঁর কবিতা অবসর সময়ে আবৃত্তি করা চলে; এমনকি এক ভাববিলস মুহূর্তে তন্ময় হয়ে যাওয়া যায়। রবীন্দ্রানুসরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ দেখা যায় যে এই কবিতা এমন এক রসঘন মনের, যে মন বাস্তবজগতে বাস করে না। কবিতার ভাবকল্পনায় বিভোর কবি যখন বলেন

"তোমার দুখানি হাত
তব শুভ দৃষ্টিপাত
অপাঙ্গে কৌমুদী ঝরঝর—
স্বচ্ছলঘু কেশপাশ
মেঘ সম রাশে রাশ
চূর্ণালক শিরীষ কেশর
পল্লবিত স্বর্ণ-লতা
গৌর-কণ্ঠ-তট-গতা
থরে থরে বৈদূর্য্যের মালা,
নয়নে কজ্জলরেখা
অধরে প্রবাল লেখা
সোহাগের পদ্মরাগে ঢালা" (দিশারিকপোত)

কিম্বা

ওই কালো জলে পরিয়া কাজল
জল নয় যেন আঁখি ঢল ঢল,
আঁখি নয় যেন ফুটেছে কমল
ছলছল অভিমান,
বিরহী প্রিয়ার ব্যথিত হিয়ার—
ক্ষুব্ধ মথিত প্রাণ। (দিশারিকপোত)

তাই কালীকিংকর বাবু আধুনিক নন বা প্রগতিশীলও নন কিন্তু তবুও তিনি কবি ও ভালো কবি। তাঁর কবিতায় শুধু এক ভাব-মধুর হৃদয় নয় এক প্রেমিক মনের ও দার্শনিক অনুভূতির মিলন লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতই কবি তাঁর মানস-সুন্দরীকে রক্তমাংসের স্পর্শের অতীতে এক কল্পনার জগতে অধিষ্ঠিত করতে চান।

আর কতদূর? আরো কতদূর?
সুদূর দূরান্তরে—
কোন রসাতলে গহীন সে পুর
লোকলোচনের ডরে,
তোমার মনের স্বর্ণ-ভ্রমরী
ঘুমাইছে মণি-মঞ্জুষা ভরি,
তৃষ্ণায় মোর কৃষ্ণ-ভ্রমর
ডুব দিয়ে দিয়ে মরে, (দিশারিকপোত—পৃঃ ৭)

আর একটি কথা—কবি জীবনকে ভালোবাসেন ও পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে চান। কিন্তু সে ভোগের ক্ষেত্র স্থূল কামনার ক্ষেত্র নয়। তাই জীবনের স্বর্ণমাধুরী কবির মনে রমণীয় হয়ে থাকলেও মনকে ভরিয়ে তোলেনা। কালীকিংকর বাবুর কবিতায় তাই দুঃখ আছে বেদনা আছে এবং সে দুঃখ বেদনা মানুষকে বিভোর করে কিন্তু আঘাত করে না।

"দিশারিকপোত" বইখানির মুদ্রন ও প্রচ্ছদপট-পারিপাট্য প্রশংসাযোগ্য।

—সন্তোষকুমার অধিকারী

সাময়িকী

শিক্ষায় প্রাণ-স্পর্শ—জীবনের সর্বক্ষেত্র আজ শৃঙ্খলাবিহীন, বিগতশ্রী। কেন? ইহার সংক্ষেপ ও একমাত্র উত্তর—জীবনের সব কিছুতে আজ প্রাণের স্পর্শ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাণহীন বুদ্ধির দীপ্তির সন্ধান মেলে, কিন্তু এই সভ্য সমাজের মধ্যে প্রাণ কোথায়? শিক্ষাক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা—বিশ্ববিদ্যালয়, কত ইস্কুল, কত কলেজ, কত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থার কথা, শিক্ষাপর্ষৎ—কত কিছু; —কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে প্রাণ কোথায়, সত্যিকারের শিক্ষা কোথায়? আজ চাই প্রাণ—প্রাণের স্পর্শ ব্যতীত শিক্ষায় সৌন্দর্য কিছুতেই রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। ধর্মঘট আজ বিদ্যালয়ের অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। ছাত্ররাও ধর্মঘট করে, শিক্ষকেরাও ধর্মঘট করে—এগুলি কি একটা সুস্থ অবস্থা? প্রাণের মধ্য দিয়া ছাড়া বিদ্যা কেহ কাহাকেও দিতেও পারে না, কেহ কিছু লইতেও পারে না। 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা আদি কবয়ে'—ভগবান আদি কবি ব্রহ্মার কাছে হৃদয় দিয়া বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন। আজ চাই একটু হৃদয়—রাজায় প্রজায়—বড়য় ছোটয়—শিক্ষকে ছাত্রে—সকলের মধ্যে, একটু হৃদয়ের স্পর্শ।

অদ্বৈত সাধনাই সমগ্র সাধনা। শিক্ষা ক্ষেত্রেও সেই একই সাধনা। ছাত্র ও শিক্ষক এই দুই-এ মিলিয়া একটি সমগ্র বস্তু। এই সমগ্র বস্তুর দুইটি অংশ ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যখন প্রাণের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখনই শিক্ষার স্বাভাবিক বিকাশ। বর্তমান প্রচলিত শিক্ষায় ছাত্র ও শিক্ষক মিলিয়া যে একটি সমগ্র বস্তু এই কথাটি ভুল হইয়া গিয়াছে। আজিকার এই সমস্ত শিক্ষাই তাই মূল কাটিয়া আগায় জল দেওয়ার মত।

উপনিষদ এই দুই-এ মিলিয়া এক হওয়ার কথা কেমন মনোজ্ঞ করিয়াই না বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 'ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ'॥—'ব্রহ্ম-পুরুষোত্তম 'সহ'-ভাব বজায় রাখিয়া আমাদিগকে (গুরু-শিষ্যকে) রক্ষা করুন। আমাদের উভয়কেই সহ-ভাবে ব্রহ্মবিদ্যা-দানে পালন করুন। আমরা যেন সহভাবেই বীর্য লাভ করি। আমাদের উভয়ের অধীত বিদ্যা তেজস্বিনী হউক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। বিশ্বের সব আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ শান্ত হউক। গুরুশিষ্য যখন পরস্পরের মধ্যে সহভাবে নিজের অস্তিত্ব, চৈতন্য ও রস উপলব্ধি করেন, যখন গুরু-শিষ্য এক অদ্বৈত, তখনই উভয়ের অস্তিত্ব সার্থক, ভোগ সার্থক, বীর্য্য সার্থক, এবং তখনই বিশ্ব শান্ত।' শিক্ষা যখন এই মনোবৃত্তির মধ্য দিয়াই প্রদত্ত ও গৃহীত হইবে, তখনই শিক্ষা সার্থক,আর হৃদয়ের সম্পর্ক এমন মনোবৃত্তি হইলেই সম্ভবপর হইতে পারে।

এই কথাগুলিই উজ্জ্বলভারত সম্পাদক গত ২রা জানুয়ারী শুক্রবার ১০ গুলু ওস্তাগার লেনস্থ চন্দ্রকান্ত ইন্‌স্‌টিটিউশনের চতুর্দশ 'প্রতিষ্ঠা দিবসে' বলিয়াছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রকান্ত ইন্‌স্‌টিটিউসনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সভাপতি মহাশয়ের প্রাক্তন ছাত্র। সভাপতি মহাশয় এই বলিয়া তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, 'আজ দীর্ঘদিন পরে আমার ছাত্র শ্রীমান নগেনের প্রাণ দিয়া গড়া তাহার এই প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারিয়া আমার খুব আনন্দ হইতেছে। এই নীরস মহানগরীর মধ্যে প্রাণকে তো পাওয়া দুষ্কর। তাই প্রাণের স্পর্শ যেখানেই পাই, সেখানেই প্রাণ আনন্দিত হয়। শ্রীমান নগেন তাহার ছাত্রদের প্রাণ দিয়া ভালবাসে, তাহাদের সুখে সুখী হয়, দুঃখে বেদনা পায়—নিজে বহু পরিশ্রম করিয়া ছাত্রদের সঙ্গে আত্মীয়ের মত, পিতার মত মিশিয়া থাকে। আজ আমার ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়িতেছে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র আমরা—সেখানে শিক্ষক-ছাত্রে ছিল কি গভীর প্রীতি, কি পারস্পরিক সহযোগিতা। কেবল যে বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়টুকুতেই তাহাদের সম্পর্ক ছিল তাহা নয়—ছাত্রদের সমগ্র জীবনের প্রতিই ছিল শিক্ষকের দৃষ্টি। আজকের দিনে নগেনের মধ্যে সেই প্রাণের পরিচয় পাইয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। তাহার শিক্ষাদানের বাহিরের উপকরণের অভাব আছে স্কুলে স্থানের অভাব সব চাইতে বেশি, আধুনিক নিয়মানুযায়ী অন্যান্য উপকরণেরও অভাব আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু নগেন যে প্রাণ দিয়া তাহার ছাত্রদের জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে যান্ত্রিক নিয়মকানুনের স্থান নাই—একটা সহজ স্নেহ আছে, শুভ ইচ্ছা আছে, আদর আছে, যত্ন আছে—কিন্তু কৃত্রিমতা নাই। নগেন, তুমি ইহাই করিতে থাক—সান্দীপনি মুনির পাঠশালা খুলিয়া রাখ, কোন্ দিন কৃষ্ণ তোমার ছাত্র হইয়া আসিবেন—সেই অপেক্ষায় কাজ করিয়া যাও।

আরও একটা কথা তোমাকে জানিতে হইবে। মানুষকে তুমি ভালবাসিতে চাহিতেছ—কিন্তু এ সংসারের কঠিন পাথরে সেজন্য যে তোমাকে ক্ষত-বিক্ষত হইতেই হইবে, এ কথা কখনও যেন ভুলিয়া অসহিষ্ণু হইও না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা তুমি লাভ কর, ইহা আমি প্রাণ ভরিয়াই ইচ্ছা করি। কিন্তু না-ও যদি পাও, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমর্থন বা স্বীকৃতি যদি না-ও পাও এবং সে না-পাওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশি, তবুও তোমাকে চলিতে হইবে। তোমার কাজ হইবে জনসাধারণের হৃদয়ের আঙিনায়। প্রাণপূর্ণ জনমনের সেই হৃদয়ের মধ্যে তুমি কাজ করিয়া যাও—তুমি যদি প্রত্যক্ষভাবে ইহার ফল না-ও পাও, তথাপি সমাজ সমগ্রভাবে ইহার ফল ভোগ করিবে, সেই ফলের চেহারা আজ দেখা না না গেলেও ভবিষ্যতে দেখা যাইবে।'

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণের পূর্বে সভার কার্য আরম্ভ হইয়াছিল কুমারী বাণী ভট্টাচার্যের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত দ্বারা। ষষ্ঠ বর্ষীয় শ্রীমান প্রদীপ চক্রবর্তী

ইংরাজী 'দি বুক' ও বাংলা 'আমরা' কবিতা আবৃত্তি করে। কুমারী মনা চক্রবর্তী ও কুমারী ঋদ্ধি ভট্টাচার্যের বাংলা ও সংস্কৃত আবৃত্তির পর স্কুলটির বৈশিষ্ট্য ও প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কর্মনিষ্ঠার উল্লেখ করিয়া কয়েকজন বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য মহাশয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের পাড়ার লোক। তিনি গত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া নগেনবাবুর কর্তব্য-নিষ্ঠা ও ছাত্রদের প্রতি পিতার ন্যায় আচরণ দেখিয়া আসিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'শ্রদ্ধেয় সভাপতি স্বামীজী ও ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও নগেনবাবুর শিক্ষক শ্রীযুত শৈলেশচন্দ্র সেন তাঁহাদের প্রিয় ছাত্র নগেনবাবুকে তাঁহারা বাল্যকালে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর পূর্বে জানিতেন আর আমি গত ১৪।১৫ বৎসর তাঁহাকে দেখিতেছি। ছাত্রের অসুখে কাঁদে, ছাত্রের ব্যথা বুঝে এরূপ আমার চক্ষে দ্বিতীয় পড়ে নাই। তাই আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই স্কুলে ভর্তি করি। তিনি ছাত্র দেখিয়া বলিলেন, এ ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যত, ইহাকে এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিব না। আমি তথাপি নিখিলেশকে চন্দ্রকান্ত ইনস্টিটিউসানেই ভর্তি করিলাম। নগেনবাবুর উদ্যোগেই নিখিলেশ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ৮ম স্থান অধিকার করিয়াছে। এবারেও প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এস সি পরীক্ষায় ফার্ষ্টক্লাশ ফার্ষ্ট হইয়াছে। স্কুলের ক্ষুদ্রতার দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না, আমি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষকের আদর্শ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আজ বুঝিলাম আপনাদের সুশিক্ষার ফল নগেনবাবুর উপর যথার্থই প্রতিফলিত হইয়াছে।'

ইহার পর সরকারী প্রচার বিভাগের ভূতপূর্ব জেলা প্রচারক শ্রীযুত শৈলেশচন্দ্র সেন মহাশয় কিছু বলেন। তিনি অনুষ্ঠানের সভাপতি মহাশয়ের ছাত্র এবং নগেন-বাবু শৈলেশবাবুর ছাত্র। তাই তাঁহার অভিভাষণে শৈলেশবাবু বলিলেন, 'আজ আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে এইজন্য যে আজ এই সভায় দৈবক্রমে আমরা শিক্ষকদের তিন-পুরুষ একত্রিত হইয়াছি। অদ্যকার শ্রদ্ধেয় সভাপতি আমার শিক্ষক এবং আমি নগেনের শিক্ষক। আজ এইখানে দাঁড়াইয়া আমার বাল্যকাল ও বাল্যের শিক্ষা-কেন্দ্র পুণ্যশ্লোক অশ্বিনী দত্ত মহোদয়ের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কথা মনে হইতেছে। শিক্ষার অর্থই হইতেছে মানুষের সহজাত-বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ও ভিতরে সুপ্ত পূর্ণতার প্রকাশ। একজন মনীষী বলিয়াছেন শিক্ষার অর্থ হইতেছে 'to draw out the perfection already in man. এইরূপ শিক্ষিত পূর্ণাংগ মানুষই সমাজসেবায় ও সমাজ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে সক্ষম। তৎকালে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০ জন আদর্শ শিক্ষক সেইভাবেই ছাত্রদের গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কোন কোন প্রসিদ্ধ বিদেশী ভ্রমণকারী এই শিক্ষায়তনকে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড ও কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়তনগুলির সহিতও তুলনা করিতেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকের স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক মিলনের ও সাহচর্যের ভিতরে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ই গড়িয়া উঠিত। প্রাণের প্রাচুর্য ও আদর্শের

অনুরাগে শিক্ষকরা দারিদ্র্যপীড়িত জীবনকেও মধুময় করিয়া তুলিতেন। 'Poverty freezes the genial current of the soul এ কথা কখনও তাঁহাদের জীবনে সত্য প্রমাণিত হয় নাই। আদর্শবাদ তাঁহাদের জীবনে আলোক ও উত্তাপ বিকীর্ণ করিয়াছে। আমরা এই রকম শিক্ষকদের চরণে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম। আজিকার সভার সভাপতি সেই শিক্ষকদেরই একজন। হৃদয় মন ও প্রাণ দিয়া ছাত্রদের অভাব অভিযোগ সুখদুঃখের অনুভূতি পূর্ণ হৃদয় লইয়া ইঁহারা শিক্ষাদানে ব্রতী হইতেন।

আজ বাল্যের একটি ঘটনা মনে পড়িল। আমার বাল্যকালে আজিকার সভাপতির নিকট একদিন আমি কোন বিষয়ের শিক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন অপরাহ্ন সময়। শিক্ষক মহাশয় আমাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে আমি ক্ষুধার্ত। পাঠ বুঝাইবার আগেই আমাকে কিছু পয়সা দিয়া কিছু খাবার আনিতে বলিলেন। আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভাবিয়াছিলাম শিক্ষক মহাশয় কিভাবে আমার ক্ষুধার কথা জানিতে পারিলেন। প্রাণভরা এই অনুভূতি শিক্ষক ও ছাত্রের জীবনকে সার্থক করিতে পারে। এই নগেনবাবুর কাছে ছাত্ররা এমন প্রাণের স্পর্শই পাইতেছে। এই মহানগরীতে শিক্ষা সমস্যা বহু কণ্টকবেষ্টিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রহসনে পরিণত। ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক ব্যবসাবুদ্ধি প্রণোদিত ও অসরল। শ্রদ্ধা-বর্জিত এই শিক্ষার ধারা মরুপথে হারানো ধারার ন্যায় অর্থহীন। এই বিদ্যায়তন ক্ষুদ্র হইলেও সার্থক কারণ এখানে শিক্ষকদের পরিচর্যায় গড্ডালিকা স্রোতের বাহিরে শিশুরা মানুষ হইবার সুযোগ পাইতেছে, তাহারা out in the city নয়। শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের সাহায্য সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিক্ষা পীঠের বৃদ্ধি ও সার্থকতা লাভ হউক, ইহাই কামনা করি। ছাত্রেরাও 'শ্রদ্ধয়া', 'সেবয়া' এই মন্ত্রে দীক্ষিত হউক এবং সত্য শিব ও সুন্দরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করুক।'

ইহার পর সভাভঙ্গ হয়। তখন সমবেত সকলকে কিছু জলযোগ করান হয়।

কলিকাতার মত মরুভূমির মধ্যে এইরূপ প্রাণের দরদ পূর্ণ শিক্ষায়তন দেখিয়া বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি। বন্দেমাতরম্

লোক-সেবক প্রেস—৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৫৯

নিরক্ষর মূর্খ ও বড় বড় পণ্ডিতদের দর্শন

উজ্জ্বল ভারত পত্রিকার ১৩৫৯-এর মাঘ সংখ্যায় গত ৪ঠা জানুয়ারী কুলটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনায় আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন যে ভাষণ দিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—'আমাদের দেশে দর্শন দুই ধারায় হয়ে এসেছে। একটি বড় বড় পণ্ডিতদের, অপরটি নিরক্ষর মূর্খদের। আমি এই মূর্খের ধারার কথাই বলব। এই পর্যায়ে হচ্ছেন মধ্যযুগীয় সন্তরা এবং বাঙলার বাউলরা। এদের কথা আলোচনা করলে অবাক হয়ে ভাবতে হয় যে, নিরক্ষররা কি করে এই রকম সত্য ও তত্ত্বের কথা বলে। ভারতে বাহিরের বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি এবং ধর্মের সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন হয়েছে; কিন্তু মুসলমানেরা যখন এলেন তাদের সঙ্গে মিলন করে কে? অন্য সব ক্ষেত্রের মিল পণ্ডিতরা করেছেন; কিন্তু এখানে পণ্ডিত ও কাজির দ্বন্দ্ব। তাই নিরক্ষররা এলেন এগিয়ে। তাঁরা বললেন, আমরাই মেলাব। তাঁরা বললেন যে, এটা পণ্ডিতদের কাজ নয়, কারণ 'ইটা ইটা আগ লাগে' অর্থাৎ ইটের সঙ্গে ইটের সংস্পর্শে আগুন জ্বলে, আর কাদায় কাদায় মিলে যায়। আমরা অশিক্ষিত কাদার মত, আর পণ্ডিতেরা লিখে পড়ে ইট পাথর হয়েছেন, তাদের হৃদয়ে প্রেম নাই। কবীর বলেছেন, আমি কাগজ কলম চাই না—'আমি চাই সহজ দৃষ্টি'।

সন্তগণ ও বাঙলার বাউলগণ প্রাণ-সাধনারই প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা কাদার মহিমা জানেন, এবং সকল বিরোধের মধ্যে মিল আনয়ন করিবার দুঃসাহসও রাখেন। তাঁহারাই বলিতে পারেন—'ইটা ইটা আগ লাগে'। সত্যই পণ্ডিতরা ইট পাথর। নইলে ব্রহ্মসূত্রের এতগুলি পণ্ডিতী ভাষ্য কি পরস্পরকে খণ্ডন করিবার জন্য এত ব্যস্ত হয়? ইটের মত কঠিন এই সব পণ্ডিতদের ভাষ্য কিছুতেই মিলিতে পারিল না। কিন্তু যাহারা কাদার স্বভাব লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কি ইহাদের মধ্যে মিল আনিতে পারিলেন, পণ্ডিতদের হৃদয় গলাইয়া একহৃদয় স্থাপন করিতে পারিলেন? পণ্ডিতগণ ইষ্টকধর্মী অর্থাৎ প্রজ্ঞাবাদী, আর সন্তগণ ও বাউলরা ছিলেন কর্দমধর্মী অর্থাৎ প্রাণবাদী।

প্রাণপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত অর্জুনকে 'প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে' বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একান্ত প্রাণই প্রচার করেন নাই, তিনি প্রাণ-প্রজ্ঞাসমন্বিত জীবনবাদই প্রচার করিয়াছিলেন।

সন্তগণ ও বাউলগণ মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের মিল আনিবার সংকল্প লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের সিদ্ধ হয় নাই। মহাত্মা কবীর কিছু মুসলমানকে নিজ জীবনের ছায়ায় সার্থক করিয়াছেন, বহু মুসলমান বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত আছেন। কিন্তু সমগ্র মুসলমান সমাজকে কি তাঁহারা নিজেদের জীবন দ্বারা প্রভাবান্বিত করিতে পারিয়াছেন? পারেন নাই। পারিলে আজ পাকিস্থানের সৃষ্টি হইতে পারিত না। যে কারণে ইঁহারা মুসলমান সমাজকে আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, এবং হিন্দুদের মুসলমান হওয়া আটকাইতে পারেন নাই, সেই একই কারণে তাঁহারা পণ্ডিতদের মধ্যেও কোন মিল আনিতে পারেন নাই। তাঁহারা পণ্ডিতদের এড়াইয়া চলিয়াছেন, পণ্ডিতেরাও তাঁহাদের অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। প্রজ্ঞার কাছে প্রাণ চিরদিনই অপাংক্তেয়। বর্ণাশ্রম ধারার উপর এই সব সন্ত ও বাউল কোনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ইট পাথর ইট পাথরই রহিয়া গেল, কাদা কাদাই রহিয়া গেল। কিন্তু কাদা বা একান্ত ইট দ্বারা যে ইমারত প্রস্তুত হয় না, ইমারত প্রস্তুত করিতে হইলে যে ইট ও কাদা দুই-ই দরকার, তাহা আজ স্পষ্টই ধরা পড়িয়াছে। প্রজ্ঞা দিতে পারে কাঠামো, প্রাণ দিতে পারে সেখানে রক্ত ও মাংস। সিমেণ্ট সাহায্যে ইটের সঙ্গে ইট গাঁথিয়া ইমারত প্রস্তুত হয়। পণ্ডিত-নিরক্ষর একদেহ, একপ্রাণ, একমন হইয়া সমাজসেবায় না লাগিলে সমাজ রক্ষা পায় না। পণ্ডিতরা দিয়াছিলেন বর্ণাশ্রম, আর এই সব সন্তগণ ও বাউলরা দিয়াছেন ভাগবত ধর্ম। পণ্ডিতদের অবদান কনষ্টিটিউসন, আর এই সব নিরক্ষরদের অবদান হইতেছে তাহার মধ্যে বিপ্লবের অনুপ্রবেশ, প্রাণ সঞ্চার। পণ্ডিতদের ব্রহ্ম স্থিতিধর্মী, তাই সেখানে সিঁড়িতন্ত্রের ছাঁচে সমাজ গড়িয়া উঠিল। নির্গুণের নীচে সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণের নীচে রজোগুণ, তমোগুণ হইল সিঁড়ির সর্বনিম্ন ধাপ। কাজেই সত্ত্বগুণ ও সত্ত্বগুণী হইল অধিকতর কুলীন, রজোগুণ ও রজোগুণী হইল তাহা হইতে কম কুলীন এবং তমোগুণ ও তমোগুণীরা রহিল সকলের পদতলে অস্পৃশ্য অবস্থায়। এইভাবে সমাজ-দেহে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রে পারস্পরিক সংঘর্ষ সুরু হইল। এই সংঘর্ষের হাত হইতে সমাজকে বাঁচাইবার জন্য সন্তগণ ও বাউলগণ প্রাণের উপর শাস্ত্র ও সমাজ গড়িতে চাহিলেন। তাঁহাদের ব্রহ্ম গতিধর্মী, তাঁহারা চাহিলেন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রকে ভাগবত ধর্মের মাঝে সমস্তরে দাঁড় করাইতে। পণ্ডিতগণ তর-তম বিভাগ স্থাপন করিয়া সমাজ গড়িলেন, আর ইহারা চাহিলেন সাম্যবাদের উপর সমাজ কাঠামোকে প্রতিষ্ঠা করিতে। পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ জমিয়া উঠিল। ইঁহারা রহিলেন ইঁহারা, উঁহারা রহিলেন উঁহারা। এমন কোনও দর্শন প্রবর্তিত হইল না, যাহার ফলে ইট-কাদায় সমন্বয় সম্ভব হয়।

সমাজের এক ধারায় প্রবর্তিত হইল বর্ণাশ্রম, অপর ধারায় তাহারই পাশাপাশি রহিতে লাগিল সহজিয়ারা, আউল-বাউল-কর্তাভজারা। এই দুই ধারার সমন্বয় যে কত দুরূহ, অথচ কত বড় প্রয়োজনীয়, আজ তাহা অনুধাবন করিবার দিন আসিয়াছে। বর্ণাশ্রম ছাড়া চলে না, কিন্তু একান্ত বর্ণাশ্রমেও তো কুলাইবে না। বর্ণাশ্রমের সত্ত্ব-কৌলীন্য ঘুচাইবার জন্য প্রয়োজন আছে ভাগবত ধর্মের মাঝে একই পুরুষোত্তমের সামনে সর্বগুণকে সমান মূল্য দিয়া প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া দাঁড়াইবার। বর্ণাশ্রমের সত্ত্ব-রজঃ-তম ইট-পাথরের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে। সত্ত্ব তাই রজস্তমকে বরদাস্ত করে না—'রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।' কিন্তু সত্ত্বগুণ যদি প্রাণবাণ হইত, সন্ত ও বাউলদের প্রাণ ধর্মে দীক্ষিত হইত, সত্ত্ব সত্ত্ব থাকিয়াও রজস্তমের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হইতে পারিত।

পক্ষান্তরে বর্ণাশ্রমকে এড়াইয়া একান্ত প্রাণবাদী সহজিয়ারা কি চলিতে পারিতেছেন? তাঁহারা পণ্ডিতসমাজের বাহিরে কোনও রকমে আত্মরক্ষা করিয়া আছেন মাত্র। সমাজ সংগঠনে তাঁহাদের আহ্বান আসিল কৈ? ইট-কাদা মিলিলেই না সমাজ সংঘবদ্ধ হয়? পণ্ডিত-মূর্খ মিলিয়াই তো সমাজ। আজ পণ্ডিত-নিরক্ষরের ভেদ তুলিয়া দিয়া এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা দাঁড় করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যাহার ফলে নিরক্ষরের প্রাণ পাইবে পণ্ডিত, আর পণ্ডিতের প্রজ্ঞার অধিকারী হইবে নিরক্ষরেরা।

নিরক্ষরদের সাধনা সেই দিনই পূর্ণ হইবে, যে দিন তাঁহারা ইট-পাথরদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিবেন, প্রাণের আগুনে তাঁহাদের গলাইয়া পুরুষোত্তম সমাজের ইমারত গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। পণ্ডিত দার্শনিকদের জন্য রাসমঞ্চ প্রস্তুত করিবার দায় লইয়াই এই সব প্রাণোপাসক সন্ত ও বাঙ্গলার সহজিয়াগণ এ দেশের মাটীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের সাধনা এখনও সিদ্ধ হয় না। তবে তাঁহাদের সাধনা যে সিদ্ধ হইবে, তাহার লক্ষণ চতুর্দিকে ফুটিয়া উঠিতেছে।

সহজ 'সহজ' বলিয়াই পণ্ডিতদের কাছে এবং তদনুবর্তী জনসাধারণের কাছে কঠিন। সহজকে পাণ্ডিতী ভাষায়, পণ্ডিতী যুক্তিতর্কের ভাষায় উপস্থাপিত করিতে না পারিলে সহজ কিছুতেই সহজ হইবে না। 'সহজকে সহজ রাখতে হলে কঠিন হতে হয়।'—রবীন্দ্রনাথ। প্রজ্ঞা যখন প্রাণচুম্বিত হয়, তখন তাহাই সমাজের মধ্যে বিপ্লব আনিতে সক্ষম হয়। সন্তদের বাণীকে বেদান্তের ভাষায়, চুলচেরা মনস্তাত্ত্বিক বিচারের ভাষায় প্রচার না করিলে কিছুতেই তাহা সমাজ নিবে না। প্রাণের ভাষা mystic-দের ভাষা, যাহা আপাততঃ বোঝা গেল মনে করা হইলেও মোটেই বোঝা হয় না। কেন না, বুদ্ধি থাকে সেখানে উপবাসী। বুদ্ধিকে উপবাসী রাখিয়া একান্ত মানিয়া নেওয়ার দ্বারা মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব কখনও থামিতে পারে? মানুষ যে একান্ত প্রাণও নয়, একান্ত প্রজ্ঞাও নয়। তাহাকে বিশ্বাস করিয়া বিচার করিতে হইবে, বিচার করিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। পরমহংসদেবের গিরিশটের বহুবার রঙ

পরিবর্তনের ঘটনার উল্লেখ দ্বারা অতি সহজে ব্রহ্মের বহুরূপী হওয়ার মীমাংসা হইয়াছে ভাবিলে ভুল করা হইবে। মানুষ ভাবে, বোধ হয় বেশ বুঝিলাম। কিন্তু কিছুই সে বোঝে নাই। সহজ দ্বারা মানুষ এইভাবে আত্ম-প্রতারিতই হয়। তাই পণ্ডিতদের সঙ্গে সহজ কিছুতেই পারিয়া উঠে নাই। পণ্ডিতদেরই বুদ্ধিপ্রধান সমাজে জয় জয়কার। প্রাণ আজ কোণ ঠেঁসা। প্রাণকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া আজ পণ্ডিতদের দরবারে পেঁছাইতে হইবে। সন্তগণ ও বাংগলার বাউলগণ যে মতবাদ সহজ ভাষায় দিয়া গিয়াছেন, তাহা যে প্রজ্ঞারও চরম প্রজ্ঞা সেখানে যে বর্ণাশ্রমের সিদ্ধান্তগুলি ঘন হইয়া উঠিয়াছে, আমরা আচার্য্য ক্ষিতিমোহনের ভাষণ অবলম্বনে এই প্রবন্ধে তাহার কিছু দিগ্‌দর্শন করিব।

আচার্য্য ক্ষিতিমোহন বলিয়াছেন—'পণ্ডিতরা কবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান দ্বৈত কি অদ্বৈত। কবীর পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবানের গুণ সত্তা প্রভৃতি কি? পণ্ডিতরা বললেন, তিনি সর্বেরই অতীত। তখন কবীর বললেন যে, ভগবান যখন সর্বেরই অতীত তখন সংখ্যারও অতীত, তিনি সব পার হয়ে শুধু সংখ্যায় আটকাবেন কেন?' বর্তমান যুগদর্শন-প্রবর্তক শ্রীনিত্যগোপাল এই সুরে সুর মিলাইয়া এই কথাই পরমহংস শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত 'আত্মবোধ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তৎ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ'—শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া তাঁহার 'সিদ্ধান্ত দর্শন' গ্রন্থে লিখিতেছেন—'বহু সংখ্যার মধ্যে 'একম্' একটি সংখ্যা। সেই জন্য 'একম্' প্রাকৃত। সেই জন্য 'একম্' অনাত্মারই এক প্রকার বিকাশ। সেই জন্য ব্রহ্ম 'একম্' নহেন।......তুমি এক-ব্রহ্ম বলিলেই কি তিনি বাড়িবেন? কারণ সেই এক ত কেবল তাঁহাকেই বলা হয় না। এক-চন্দ্র এক-সূর্য এক-আকাশ প্রভৃতিও বলা হয়।' ব্রহ্মকে একান্ত (static) একরূপে যুক্তিতর্ক দ্বারা স্থাপন করিতে গিয়া বুদ্ধির কি কশরতই না পণ্ডিতেরা করিয়াছেন! তাঁহারা বুদ্ধির শাণিত ছুরিকাঘাতে অনাদি অনন্ত জীবন্ত বহু প্রসবিনী প্রকৃতিকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহার অনিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন, জগৎ মিথ্যাবাদকে সাড়ম্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, সংসারময় একটি সিঁড়িতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া সত্ত্বগুণকে সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ এবং তমোগুণকে সর্ব-নিম্ন স্থান দান করিয়া, এবং এইভাবে গুণত্রয়ের মধ্যে একটি পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষ আনিয়া ফেলিয়াছেন এবং এই পথে তাহাদের মিথ্যাত্ব প্রচারিত করিয়াছেন। পণ্ডিত-দের মতে একই সত্য, বহুই মিথ্যা; অথচ দুই-ই সংখ্যার অন্তর্গত। বহু যদি মিথ্যা, তবে একই বা মিথ্যা হইবে না কেন? পক্ষান্তরে একই যদি সত্য, তবে বহুই বা সত্য হইবে না কেন? শ্রীনিত্যগোপাল মতে নিত্য একও সত্য, অনিত্য বহুও সত্য। শ্রীনিত্য-গোপাল তাঁহার দিব্য দর্শনে ও দিব্য জীবনে এক ও বহুর সত্যই আস্বাদন ও প্রচার করিয়া উজ্জ্বল যুগের সূচনা দিয়া গিয়াছেন। তিনিই লিখিতে পারিলেন : 'তিনি এক বলিয়া অদ্বৈতবাদীরা তাঁহার একত্ব স্বীকার করেন। আমাদের বিবেচনায় তিনি এক ও বহুর অতীত, তিনি একত্বে ও বহুত্বে লিপ্ত নহেন'।—নিত্য ধর্ম পত্রিকা—

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৬৪ পৃঃ।

শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্ম বস্তুকে এক ও বহুর অতীত রাখিয়াই এক হইতে বহুর হওয়ার একটি পারমার্থিক সূত্রের খোঁজ দিয়াছেন। বুদ্ধিতে যাহা এক তাহা একত্বে লিপ্ত নিছক একই; সে 'এক' কখনও 'বহু' হয় না। কাজেই একের বহু-হওয়াকে অদ্বৈত-বাদীরা মিথ্যা বলিতে বাধ্য। কিন্তু এক-বহুর অতীত ব্রহ্মের এক হইতে বহু-হওয়া মিথ্যা নয়; উহা একেরই মত সত্য। শ্রীনিত্যগোপালের মতে এক ও বহুর অতীত যিনি এক, তিনি সর্বসংখ্যাতীত এবং সর্বসংখ্যাসমন্বিত 'এক', Living Unity; পক্ষান্তরে প্রচলিত অদ্বৈতবাদীদের এক Dead Unity -জীবন্ত একের মধ্যে একও যেমন সত্য, বহুও তেমনি তুল্যভাবেই সত্য। যে মানুষটি মাতার দৃষ্টি-কোণে পুত্র, সে-ই স্ত্রীর দৃষ্টি-কোণে স্বামী, সে-ই কন্যার দৃষ্টি-কোণে পিতা। তাহাকে এক বলিব না বহু বলিব? পুত্র-স্বামী-পিতা হিসাবে সে নিশ্চয়ই বহু, কিন্তু মানুষ হিসাবে সে একই। হৃদয়ের এক নমনধর্মশীল এক; বিমূর্ত বুদ্ধির এক, পণ্ডিতদের এক যান্ত্রিক এক। এই 'এক' হইতে যাত্রা আরম্ভ করিলে যে জগৎ মিলিবে, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা। তাহাতে জীবনের কোন সাড়া থাকিতে পারে না। সন্তগণ ও বাউলরা জীবন্ত একের উপাসনায় বিভোর।

এই 'এক' অদ্বৈতবাদীদের 'এক'-এরও পর। এই অদ্বৈতবাদের খোঁজ দিয়া শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার সিদ্ধান্তদর্শন গ্রন্থের উপসংহারে লিখিতেছেন: 'এই সিদ্ধান্তদর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদীদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্তদর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সকল অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে এবং এক ও বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে'। শ্রীনিত্যগোপালের এই 'প্রকৃত' অদ্বৈতবাদে বিশ্বের সব দার্শনিক সংঘর্ষ থামিয়া যাইতে পারে।

আচার্য্য ক্ষিতিমোহন তাঁহার ভষণে অন্যত্র বলিয়াছেন: 'পণ্ডিতরা আবার কবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রহ্মকে পাবার পথ কি? কবীর বললেন, তাঁকে পাবার পথ নেই, কেন না, পথ আঁকতে হলেই দূরত্ব থাকবে ও দূর না থাকলে পথ কি? 'দূর নেহি ত পন্থ নেহি'। ব্রহ্মতে আমাতে দূর নেই বলেই পথ নেই। আমাদের বাউলরা বলছেন ভিতরে আছেন বললে জগৎ লজ্জা পায়, আর বাহিরে আছেন বললে মিথ্যা বলা হয়। তিনি ভিতর বাহির দুই নিরন্তর। কাগজের যেমন এপিঠ ওপিঠ নিয়ে কাগজ হয়, সেই রকম তিনিও। এপিঠ ওপিঠ উল্টো কথা দুয়ে মিলে সত্য কথা'।

কি অদ্ভুত এদের দর্শন! বর্তমান যুগ এই দর্শন অনুবর্তন করিয়াই চলিতে

চায়। মায়াবাদীরা নিজকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিয়া, দূরে মনে করিয়া না পাওয়াকেই সত্য মনে করিয়া তাঁহাকে পাওয়ার জন্য ছুটিয়াছেন। কিন্তু যিনি 'দূরে অন্তিকে' তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিয়া পাওয়ার জন্য রওনা হওয়াই তো ভুল পথ, (wrong step)। প্রথমে ভুল পথে রওয়ানা হওয়ার পর যতই পাইবার জন্য ব্যগ্র হওয়া যায়, ব্যবধান আরও বাড়িয়াই যায়। সন্তগণ ও বাউলগণ রওয়ানা হইয়াছেন অবিচ্ছেদ হইতে, পাওয়া হইতে। তাঁহারা নিত্য-পাওয়া ধন, নিত্য জানা-শুনা ধন ভগবানকে পাইয়াই না-পাওয়ার রাজ্যে পাওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উন্মাদের মত ছুটিয়াছেন। পাওয়া দিয়া না-পাওয়াকে পরিপাক করিবার সাধনাই ইঁহাদের সাধনা। সত্য কথা, ইহাদের সিদ্ধি আগে, সাধনা সিদ্ধিরই ঘন আস্বাদন। প্রাণ সাধক রবীন্দ্রনাথও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিতেছেন ঃ

পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা।
আনন্দে তাই এক হল তার পৌঁছানো আর চলা॥

পৌঁছানো আর চলা এই সন্তদের ও বাউলদের কাছে 'এক' হইয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রতি পদবিক্ষেপে ইহাদের কাছে বাঁশী বাজিয়াছিল। বাঁশী পথের শেষে নয়, বাঁশী বাজে পথের পায় পায়। পায় পায় যাহাদের বাঁশী বাজে তাঁহাদের কাছেই উপলব্ধ হয়, 'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে চ'। পথ ও গন্তব্যের ভেদ প্রাণ দর্শনে নাই। সাধনার পরাকাষ্ঠা এইখানেই।

কিন্তু এই দর্শনকে জীবনে আস্বাদন করিতে হইলে চাই ধরার ধূলিতে, প্রত্যক্ষ এই জগতের বুকে ব্রহ্মকে মানুষরূপে প্রত্যক্ষ পাওয়া। এইখানেই 'মানুষ'-ভজনের প্রবর্তন ইঁহারা করিয়াছেন। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন বলিয়াছেন ঃ 'এরা মানুষকে ব্রহ্ম দেখেছেন।......চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' সকলেই জানেন। নিতাই বলত মানষকে পেলেই তাঁকে পাওয়া হবে'। শ্রীকৃষ্ণ 'ব্রহ্মণঃ হি প্রতিষ্ঠা অহম্'-বাণী দ্বারা নিজের মানুষ রূপের মধ্যেই ব্রহ্মের ঘনীভূত রূপের আস্বাদন দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মঘন, সচ্চিদানন্দ ঘন। একজন মানুষ এই বিশ্বের বুকে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'বিষ্টভ্যাহম্ ইদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ', 'ময়ি প্রোতং ইদম্ সর্বম্ সূত্রে মণিগণা ইব'।

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নর বপু তাঁহারই স্বরূপ।

নারায়ণ ঘন হইয়াই এই মাটীর দেশে ব্রহ্ম-মানুষ হইয়াছেন। তিনি নর-নারায়ণ। একান্ত নারায়ণকে দিয়া সৃষ্টির সব ঘটনার মীমাংসা হয় না, জীবের জৈব প্রয়োজনের সুষ্ঠু মীমাংসা নারায়ণকে দিয়া হয় না, সেখানে জৈব আশা-আকাঙ্খার নিরোধ করিয়াই তাঁহাকে পাইতে হয়, কিন্তু নর যখন নারায়ণের সঙ্গে যুক্ত হয়, একাত্ম হয়, যখন নরের ভাষায় নারায়ণের ব্যাখ্যা সম্ভব হয়, তখন জীবের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি sublimation সেখানে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার বাউলরা এই

sublimation -এর একটি ছবি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু অতি মাত্রায় নরকে আশ্রয় করিয়া এবং একান্তভাবে নারায়ণকে এড়াইয়া চলায় মানুষ-ভজনায় মধ্যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার ফলে তাঁহারা বর্ণাশ্রমের একান্ত বাহিরে পড়িয়া রহিলেন।

মানুষের কি মহিমা ও মাধুর্যই না ইহারা আঁকিয়াছেন। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন বলিয়াছেন, 'নিত্যানন্দ দাস নামে এক বিখ্যাত বাউল ছিলেন। তাঁর গান 'পাতকী চরণ রেণু শোভে তোমার গায়'—কি সাহস আর কি ভাব দেখুন'! এমন করিয়া পাতকীর মর্যাদা কি কোন পণ্ডিত দিতে পারিয়াছেন, না পারিবেন? পাপীর পাপ নিয়া কি ঘাটাঘাটিই না পণ্ডিতরা শাস্ত্র দিয়া করিয়াছেন! পাতকীও যে মানুষ, পাতকীও যে 'মমৈবাংশ', ইহা ইহাদের গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের পাইয়া মানুষের প্রাণ জুড়াইয়াছে, ধরার বুক ভরা জ্বালা ঘুচিয়াছে। ধরার বুকে আজ সচ্চিদানন্দের সকল মহিমা ও মাধুর্য্য ঘনীভূত।

এই প্রাণদর্শনকে সমস্ত বেদ ও উপনিষদের মধ্য দিয়া যুক্তিতর্কের সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিবার দিন সমাগত। যে দিন পণ্ডিত ও মূর্খ গলাগলি ধরিয়া শাস্ত্র লিখিবেন, সেই দিনই বর্ণাশ্রম ও সহজিয়া একাত্মা হইবে, ভারতবর্ষ উজ্জ্বল ভারতে গড়িয়া উঠিবে। একা পণ্ডিতরা কিছু করিতে পারিবেন না, একা সহজিয়াও কিছু করিতে পারিবেন না। চাই উভয়ের সমন্বয়। জগন্নাথের রথরজ্জু যখন ইঁহারা ধরিবেন, তখনই সে রথ আবার চলিবে, বিষয়ের বুকে ব্রহ্মানন্দের ঘন আস্বাদন জমিয়া উঠিবে, আকাশস্থ ব্রহ্ম ধরার মাটীতে উদ্ভাসিত হইবেন। ঐ যে সে দিন অদূরে। বল জয় জগদীশ হরে। বন্দেমাতরম্

'আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।' তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।...সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করছে, তাঁকেই বলছে, 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা।' সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছে।'

—রবীন্দ্রনাথ

শেফালি

অনিল মার ভট্টাচার্য

শেফালি কিশোরী শিশির প্রভাতে বসি'
ধরণী-ধূলোয় ধবল অঙ্গ রাখি'
দেখিল ঃ সবুজ বন্ধন পড়ে খসি';
সজল আননে অরুণ-কিরণ মাখি
কনক-কণ্ঠে গোপন-পুলক-ভাষা
নব নব রূপে মধুর আবেশে ওঠে—
তারি সুরে জাগে দেবতা' মিলন আশা,
নূতন ভাবের বিহ্বল আঁখি ফোটে।
বিগত রাতের কৌমুদী রজ-রেখা
সুষমা বিলাসে অতনু-প্রণয় ধরি
লিখিয়া কাননে রজত-স্বপন-লেখা
আবরিয়া ছিল নিশার আঁধার হরি'।
ঊষার বাতাসে জাগিয়া শেফালিবালা
সবিতা চরণে নিবেদিল তনু-মালা॥

ভারত-পথিক রবীন্দ্রনাথ

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির মূলে যে-প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে ভারতবর্ষের যুগযুগান্তরের ইতিহাসের ধারাকে অনুধাবন করে তার সুপ্রাচীন সভ্যতা ও চিরন্তন ধর্ম সাধনাকে এবং তার বিবর্তনশীল সংস্কৃতির শাশ্বত বস্তুটিকে পুনরাবিষ্কার করা এবং তাকে নতুন যুগের উপযোগী করে রূপায়িত করা। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি তাঁর জীবনের প্রারম্ভকাল থেকেই ভারতের আত্মানুধ্যানে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং তাঁর ধ্যানলব্ধ সত্যকে অকৃপণভাবে উজাড় করে দিয়ে গেছেন। কবির একটি কাব্য থেকেও আমরা একথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। সেই কাব্যের অংশবিশেষ এই ঃ

"মনে আজ পড়ে সেই কথা
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া,
স্খলিয়া স্খলিয়া,
চুপে চুপে,
রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে;
নিশীথে প্রভাতে,
যা কিছু পেয়েছি হাতে,
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে
গান হতে গানে।" (চঞ্চলা—বলাকা)

বস্তুতঃ এই অংশে রূপকের আশ্রয়ে কবি তাঁর সুদূরপ্রসারী কল্পনাকে অনাদি অতীত থেকে অনাগত কালের সীমানায় পোঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কবিমানসও যেন প্রজ্ঞাতরণীর যাত্রীরূপে সৃষ্টির বিরাট অদৃশ্য নদীর অবিচ্ছিন্ন জলধারায় ভেসে চলেছে এবং সেই চলার বেগে, নানা ছন্দের স্পন্দনে, পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং নিখিল মানবজীবন তার সম্পূর্ণ সত্তা নিয়ে কবির রসচেতনায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে।

সভ্যতার আদি পীঠ ভারতবর্ষ তার বিভেদের মধ্যে ঐক্যের বৈচিত্র্য নিয়ে স্মরণাতীত কাল থেকে অগ্রসর হচ্ছে। বাইরের পৃথিবীতে যে-সংঘাত যে-হানাহানি এক সভ্যতাকে গ্রাস করে আর এক সভ্যতার সৃষ্টি করেছে ভারতবর্ষে এসে তার বিধ্বংসী শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। এখানে কোনও সভ্যতার বিনাশ হয়নি। সবাই আপনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে সম্মিলিত হয়েছে উন্নততর এক সভ্যতার সংগে এবং আদর্শ ধর্মের ভিত্তিতে। রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতাটি এই মিলন যজ্ঞেরই স্মারক। ভারতবর্ষে আর্যগণের আগমনের পূর্বে যে সভ্যতা ছিল তা যেমন উন্নত তেমনি বলিষ্ঠ প্রাণ সম্পদে সমৃদ্ধ। ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা এই সভ্যতার যে সব প্রামাণ্য নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। তবে আর্যগণের সভ্যতার নিকট এই

সভ্যতার পরাজয়ের কারণ কি? কারণ আর্যগণের সংহতি এবং যাগযজ্ঞময় কর্ম-পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি এবং বৈদিক শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল তার তুলনায় প্রাচীন সভ্যতা শুধু অনগ্রসর নয়, বহুলাংশে বৃহত্তর জীবনধর্ম বিরোধীও বটে।

বৈদিক ধর্মের প্রবর্তনে ভারতীয়গণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম, নিষ্কামধর্মসাধন. ইহলোক পরলোকের কামনা স্বরূপ ধনজন ও স্বর্গের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হলেন। এই আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রনে প্রেমভাব, ভক্তিভাব, তীর্থধর্ম, ব্রতউপবাস. যোগসাধনা, বৈরাগ্যসাধনা প্রভৃতি মহত্তর আদর্শ ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হল। বৈদিক ঋষিগণের শ্রুতিস্মৃতি, আরণ্যক ব্রাহ্মণ ও বৈদিক তপোবনের কর্মকান্ড মানুষকে চিরন্তন সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করিয়ে দিল। জীবন সম্বন্ধে যে মূল্য-বোধ জাগল তা সেদিনকার মানুষ নানাভাবে প্রকাশ করল। একটি দৃষ্টান্ত দিলে আশা করি বিষয়টি ভালভাবে বোধগম্য হবে।

আজকের দিনে আমরা অনেকসময় গতিবাদের কথা উল্লেখ করি। আমাদের দেশের বিদগ্ধব্যক্তিগণ ছাড়া পাশ্চাত্ত্য দেশেরও অনেক মনীষী ও দার্শনিক এই তত্ত্বের সাহায্যে সৃষ্টির অনেক গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন। কিন্তু এই মতবাদে প্রাচীন আর্যগণও যে কেমন বিশ্বাসী ছিলেন তা 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' বিশেষভাবে বোঝা যায়। পথশ্রান্ত বিশ্রামকামী রাজপুত্র রোহিতের উদ্দেশে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশী ইন্দ্রের উপদেশ এবং প্রত্যেকবার—'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—এই ধুয়া কর্ণকুহরে প্রবেশলাভ করে এক অপূর্ব সুর মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রবাহের মধ্যে যে চলতাধর্মী মননকল্পনা আমাদের মুগ্ধ করেছে তার বীজমন্ত্রটি যে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণের' ঐ সূত্র হতে গৃহীত তা সহজেই অনুমেয়।

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র আর্য ঋষিদের এই একটি সত্যকে উপলব্ধি করেই ক্ষান্ত হননি। বস্তুতঃ ঔপনিষদিক সত্যের সম্পূর্ণ ও অখণ্ডরূপ বলতে যা বোঝায় তা তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন। তিনি একথাও জেনেছিলেন যে, যে-ধর্মের সরল আদর্শ ভারতবর্ষের সবচেয়ে গৌরবময় সম্পদ এবং তার অন্তর্নিহিত আত্মার অভিব্যক্তি তার নিরঙ্কুশ পরিচয় উপনিষদেই বর্তমান। তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : "এই বিচিত্র সংসারকে উপনিষদ ব্রহ্মের অনন্ত সত্য, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকল প্রকারে জটিলতা সকল প্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়াছেন।...যাহা নাই তাঁহারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না—ছুটোছুটি যে চরম সার্থকতা, একথা ভারতবর্ষের নহে। যাহা অন্তরে বাহিরে চারিদিকেই আছে, যাহা অজস্র, যাহা ধ্রুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়। কারণ তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য। যিনি অন্তরে আছেন,

তাঁহাকে অন্তরেই লাভ করিতে ভারতবর্ষ বলে, যিনি বিশ্বে আছেন তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যে উপলব্ধি করা ভারতবর্ষের সাধনা।...যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখা প্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিধির আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমান করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে।" (ধর্মের সরল আদর্শ—ধর্ম)

উপনিষদের যুগে আমাদের দেশে আর একটি বিষয়ের প্রাচুর্য ছিল যা হচ্ছে সত্যকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মত মনের উদার অবকাশ। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়, "ভারতবর্ষ একদিন সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং অলাভের উপরকার সবচেয়ে বড়ো ফাঁকায় দাঁড়িয়ে সেই সত্যকেই সুস্পষ্ট করে দেখেছিল, 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'।" (বাতায়নিকের পত্র—কালান্তর)

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সাধনার সংগে তার ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশের মানুষ জড়বাদকে আশ্রয় করে জীবনের যাত্রাপথে অগ্রসর হয়নি। আধ্যাত্মিকতা ও আস্তিক্য বুদ্ধিই তার পাথেয়। তাই আমাদের দেশের মানুষ ব্যবহারিক জগৎ অপেক্ষা অপর জগৎ অর্থাৎ অনুভূতির জগতে অধিকতর উন্নতি সাধন করেছে। এই কথা বুঝাতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে, তাহা পলিটিক্স হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিস্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে।...ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনার জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্ম সাধনের জন্য।...এই জন্য ভারতবর্ষীয় আর্য সমাজে শিক্ষার কালকে ব্রহ্মচর্য্য নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ জানিত ব্রহ্মলাভের দ্বারা মনুষ্যত্বলাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থ তনয় গৃহী, রাজপুত্র রাজা হইতে পারে না। কারণ গৃহকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মলাভ, রাজকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভারতবর্ষের লক্ষ্য।" (ধর্মপ্রচার—ধর্ম)

আমাদের ধর্মের ক্ষেত্রে যে কথাটি সত্য সমাজের ক্ষেত্রেও তা অনুরূপ সত্য। কারণ দেশের সর্বাংগীণ কল্যাণশক্তির উপর আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত। এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের প্রাচীন মনীষীরা শাস্ত্রের কঠিন অনুশাসন দিয়ে সমাজের কাঠামো প্রস্তুত করেছেন। তাঁদের সামনে যে আদর্শ ছিল তা হল এই যে, প্রত্যেক মানুষ তার আত্মার মুক্তিকে একমাত্র শ্রেয়ঃ মনে করে, কর্মের দ্বারা কর্মকে ক্ষয় করে জীবন অতিবাহিত করবে। এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্যঃ "ভারতবর্ষ একদিন নিয়মের দ্বারা সমাজকে খুব কষিয়া বাঁধিয়াছিল। মানুষ সমাজের মধ্য দিয়া সমাজকে ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়াই বাঁধিয়া ছিল ...ভারতবর্ষ জানিত, সমাজ মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে, মানুষের চির অবলম্বন নহে—সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। সংসারের বন্ধন

ভারতবর্ষ বরঞ্চ বেশি করিয়াই স্বীকার করিয়াছে তাহার হাত হইতে বেশি করিয়া নিস্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে।...আর ভারতবর্ষ চারি আশ্রমের মধ্য দিয়া মানুষের জীবনকে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়বয়স ও বার্ধক্যের স্বাভাবিক বিভাগের অনুগত করিয়া অধ্যায়ে অধ্যায়ে যেরূপ একমাত্র সমাপ্তির পথে লইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশাল বিশ্বসঙ্গীতের সহিত মানুষের জীবন অবিরোধে মিলিত হয়। বিদ্রোহ বিরোধ থাকে না, অশিক্ষিত প্রবৃত্তি আপনার উপযুক্ত স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যে-সকল গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহারই মধ্যে বিভ্রান্ত ও নিখিলের সহিত সহজ সত্য সম্বন্ধ ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীর মধ্যে উৎপাত স্বরূপ হইয়া উঠিতে হয় না।" (ততঃ কিম্-ধর্ম)

প্রাচীন সংহিতাকার মানুষের জীবনের যে আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা বিশেষ দেশের বিশেষ কালের এবং বিশেষ জাতির পক্ষে পালনীয় নয়। পরন্তু এ আদর্শ একমাত্র সত্য আদর্শ এবং সকল যুগের মানুষের পক্ষে কল্যাণকর। অর্থাৎ যে-জীবনদর্শন সর্বকালের সর্বস্বীকৃত ও বহু পরীক্ষিত সত্য, উপনিষদের ঋষিগণ তাহাই ধ্যান দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে, তারই মন্ত্রে আমাদের দীক্ষিত করে গেছেন। উপনিষদের সেই সত্যের পূজারী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সেই মন্ত্রকে গ্রহণ করে ছিলেন, তার তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তার দিব্য আলোক জ্যোতির্ময় মূর্তি নিয়ে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল এবং কবি তাঁর অমৃতনিষ্যন্দী বাণী দিয়ে সেই অনুভূতিকে অভিব্যক্ত করেছেন : "মানুষ আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একান্ত। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।" তা ছাড়া "কিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করছে তুচ্ছ, দুঃখকে করছে বরণ, অন্যায়ের দুর্দান্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করছে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্ছে অবিচারের দুঃসহ মৃত্যু শেল। তার কারণ, মানুষের মধ্যে কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার মহিমা। আর সে একথাও জানে যে, জীবন দেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।" (মানুষের ধর্ম)

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র উপনিষদের ভাবধারাগুলিকে আপনার অন্তরে গ্রহণ করে সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট করেননি তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের নিজস্ব ও শাশ্বত বাণীটিকে আমাদের শ্রুতিগোচর করিয়েছেন। তাঁর সেই বাণীতে ভারত-বর্ষের প্রাণপুরুষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎলাভ হয়। সেই ধীরোদাত্ত ধ্বনিমন্ত্রে আমাদের মানসিক জড়তা দূরে অপসৃত হয়। আমরা [illegible]ীত মনে স্মরণ করি।" মানুষ যেহেতু মানুষ এই হেতু বস্তুর দ্বারা সে বাঁচে না, সত্যের দ্বারাই সে বাঁচে। এই সত্যকে দান করিবার জন্য আমাদের উপর আহ্বান আছে। আমাদের পিতামহরা অমরলোক হইতে আমাদের আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন : "তোমরা অমৃতের পুত্র এই কথা জানো এবং এই কথা জানিও। মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে

এই সত্য দান করো যে, কোন কর্মপ্রণালীতে নয়, রাষ্ট্রতন্ত্রে নয়, বাণিজ্য ব্যবস্থায় নয়, যুদ্ধ অস্ত্রের নিদারুণতায় নয়, তমের বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি; নানা পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"—(স্বাধিকার প্রমত্ত—কালান্তর)

আমাদের স্মৃতিপথে একই সঙ্গে একথাও উদিত হয়ঃ "ভারতবর্ষের যে-বাণী আমরা পাই সে-বাণী শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়, ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা—সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করেনি।...ভারতবর্ষ যে কোন্‌খানে সত্য, নিজের লোহার সিন্দুকের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায়নি। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয়নি তাতেই তার পরিচয়।" (বৃহত্তর-ভারত—কালান্তর)

ভারতাত্মার সাধক রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন: "বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে, স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।... ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষপাতী নহে—ভারত-বর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার বিরাট একের মধ্যে সকলেরই স্ব স্ব প্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদ-নিরত-ব্যবধানসংকুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।" (স্বদেশী সমাজ—আত্মশক্তি)

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের এই বাণী আশার বাণী, বিশ্বাসের বাণী। তাঁহার প্রজ্ঞাদৃষ্টি মননশীল রস-চেতনায় ভারতবর্ষের যে-রূপ প্রত্যক্ষ করেছে, তাকে তিনি অনবদ্যভাবে ও অপূর্ব প্রসাদগুণে সমন্বিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর জীবন-লব্ধ সত্যকে এই কথায় প্রকাশিত করেছেনঃ "ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম চির-দিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারত-বর্ষের উপরে আমি বিশ্বাস স্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনই এই মুহূর্তেই ধীরে ধীরে নূতনকালের সহিত আপনার পুরাতনের আশ্চর্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি—জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি।" (স্বদেশী সমাজ-আত্মশক্তি)।

ভারত-পথিক রবীন্দ্রনাথের এই আশ্বাস ও সাবধান বাণীই যেন আজ আমাদের ভবিষ্যত কর্মজীবনের পথ নির্দেশ করে—আজকের দিনে তাই আমাদের একমাত্র কাম্য এবং প্রার্থনীয়।

ভালবাসি

শান্তশীল দাশ

ভালবাসি আমি এই ধরণীরে
ভালবাসি আপনারে ;
হাসি-আনন্দে ব্যথা-বেদনায়,
আলোক অন্ধকারে।

হাস্যমধুর সুমধুর গান,
অশ্রুজলের সকরুণ তান ;
আমার জীবন বীণার মাঝারে
সমভাবে ঝংকারে।

যখন যা' পাই দু' হাতে কুড়াই,
ভরে নি' আমার ডালা;
গাঁথি সযতনে যূথিকার সনে
ঝরা বকুলের মালা।

দুঃখ-সুখের পাত্র দু'খানি,
নিয়েছি আমার অন্তরে টানি
আলোক আঁধার মিশেছে আমার
জীবনের পারাবারে।

অথর্ব বেদের উপযোগ

[illegible] চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

উপস্থাই ভার্গব বেদ

অথর্ববেদ দুই ভাগে বিভক্ত—ভার্গব বেদ ও আঙ্গিরস বেদ। তন্মধ্যে আঙ্গিরস বেদ ভারতবর্ষে এবং ভার্গববেদ ইরাণে প্রচলিত। আঙ্গিরস বেদের লোক প্রসিদ্ধ নাম অথর্বাঙ্গিরস সংহিতা এবং ভার্গব বেদের লোক প্রসিদ্ধ নাম (ছান্দস উপস্থা অথবা) জেন্দ্ আবেস্তা।

পার্শীদিগের গুরুগ্রন্থের প্রচলিত নাম আবেস্তা। আবেস্তা শব্দটি প্রাচীন পারশিক ভাষার শব্দ। লৌকিক সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতের যে সম্পর্ক, বৈদিক সংস্কৃতের সহিত প্রাচীন পারশিকের সেই সম্পর্ক। অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষা যেমন লৌকিক সংস্কৃতের অবিশুদ্ধ রূপ, প্রাচীন পারশিকও তেমন বৈদিক সংস্কৃতের অবিশুদ্ধ রূপ। প্রাচীন পারশিককে বৈদিক সংস্কৃতের ভ্রষ্ট (Degraded form) রূপ বলা যাইতে পারে। বৈদিক সংস্কৃতির "উপস্থা" শব্দটিই প্রাচীন পারশিকে "আবেস্তা" রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থখানার যথার্থ নাম আবেস্তা। জেন্দ্ শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন পুরাতন পারশিক ভাষার সংক্ষিপ্ত নাম জেন্দ্। জেন্দ্ ভাষায় লিখিত আবেস্তা গ্রন্থ বলিয়া পুস্তকখানার নাম হইয়াছে জেন্দ্ আবেস্তা। কেহ কেহ বলেন জেন্দ্ শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা অথবা ভাষ্য। সাধারণতঃ ভাষ্য সহ-ই গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইত, এই জন্য ইহার নাম ছিল "আবেস্তা বা জেন্দ্" অথবা ভাষ্য সহ আবেস্তা; তাহাই সংক্ষিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে জেন্দ্ আবেস্তা।

পরন্তু "আবেস্তা" শব্দ যেমন সংস্কৃত "উপস্থা" শব্দের রূপান্তর, সেইরূপ "জেন্দ্" শব্দটি-ও সংস্কৃত "ছন্দস্" শব্দের রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। ছন্দস্ শব্দের অর্থ বেদ;—মেদিনী কোষে আছে "ছন্দঃ বেদে চ পদ্যে চ স্বৈরাচারাভি-লাষয়োঃ"। ছন্দস্ উপস্থা অর্থ উপস্থা নামক বেদ।

উপস্থা শব্দটি বর্তমানকালে কতকটা অপরিচিত হইলেও বৈদিক যুগে ইহার বহুল প্রয়োগ ছিল। ব্রাহ্মণ বালক আহ্নিক সন্ধ্যায় মন্ত্র পড়ে "সূর্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ"—অর্থাৎ সূর্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। উপস্থান অর্থ উপাসনা। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন "উপান্ মন্ত্রকরণে" (১-৩-২৫) অর্থাৎ উপাসনা অর্থে উপ পূর্বক স্থা ধাতু আত্মনেপদ হয়। উপস্থা শব্দের অর্থ যে উপাসনার গ্রন্থ তাহাতে কোন সংশয় নাই। ছন্দস্ উপস্থা অর্থ বৈদিক উপাসনার গ্রন্থ অর্থাৎ বেদ।

ছন্দস্ শব্দটি সাধারণভাবে সকল বেদের উপর প্রযুক্ত হইলেও ইহা বিশেষ করিয়া অথর্ববেদকেই বুঝায়। পুরুষ-সূক্তে আমরা দেখিতে পাই—

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্ তস্মাদ্ অজায়ত॥ ১০-৯০-৮

এখানে ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের উল্লেখ করিয়া পুনরায় ছন্দাংসি বলিয়া পৃথক্ উল্লেখ করাতে, ছন্দস্ দ্বারা অথর্ব বেদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে এরূপ বলা হইয়া থাকে।

মহাভারতে দেখিতে পাই—

ছন্দাংসি নাম ক্ষত্রিয় তান্যথর্বা
পুরা জগৌ মহর্ষিসংঘ এষ।
ছন্দোবিদস্তে যে উত নাধীতবেদাঃ
ন বেদ-বেদস্য বিদুর্হি তত্ত্বম্॥

উদ্যোগ—৪৪-৫০

হে ক্ষত্রিয়!

মুনিশ্রেষ্ঠ অথর্বা যে বেদ প্রকাশ করেন, তাহার নাম ছন্দস্। যে জন এই ছন্দোবেদ না পড়ে, অপর বেদ পড়িয়াও সে বেদের তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারে না।

ছন্দস্ বলিতে যে অথর্ব-বেদকেই বুঝা যায়, এখানে তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইল।—

অতএব ছন্দস্ উপস্থা অথবা জেন্দ্ আবেস্তা যে অথর্ব বেদের-ই অংশ, তাহাতে সন্দেহের কারণ কমই আছে।

গো-পথ ব্রাহ্মণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে অথর্ব বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, ভার্গব বেদ এবং আঙ্গিরস বেদ। তন্মধ্যে অথর্ব-বেদের যে অংশ ভারতবর্ষে প্রচলিত তাহার নাম আঙ্গিরস বেদ। আর যাহা ভারতবর্ষে প্রচলিত নাই, আর্যজাতির অপর শাখাভুক্ত ইরাণ দেশে প্রচলিত, তাহার নাম ভার্গব বেদ। অর্থাৎ জেন্দ্ আবেস্তাই ভার্গব বেদ।

আঙ্গিরস এবং ভার্গব নামের সার্থকতাও এইভাবেই সুতরাং বুঝা যাইতে পারে। আঙ্গিরস অথবা বৃহস্পতি দেবগুরু অর্থাৎ দেবপূজার সমর্থক। ভৃগু অথবা শুক্র অসুরগুরু অর্থাৎ অসুর পূজার সমর্থক। ভারতবর্ষ দেবোপাসক, অতএব ভারতে প্রচলিত (অথর্ব) বেদ আঙ্গিরস বেদ। ইরাণ অসুরোপাসক (অহুর মজদার উপাসক)। অতএব ইরাণে প্রচলিত (অথর্ব) বেদ ভার্গব বেদ।

জেন্দ্ আবেস্তার সংস্কৃত রূপ ছন্দস্ উপস্থা। ভার্গব বেদ বলিতে ছন্দস্ উপস্থাকেই বুঝিতে হইবে। ভার্গব বেদই জেন্দ্ আবেস্তা, জেন্দ্ আবেস্তাই ভার্গব বেদ।

পারস্যদেশে বিহিস্তানের পর্বতগাত্রে যে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে

গ্রীক-বিজেতা পারস্য-সম্রাট দর্যাবাহু (Darius) নিজকে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিতেছেন—

"অদেম্ দর্যাবাউস্ ক্ষয়ন্তিয়ো বর্জকো ক্ষয়ীতিয়ো ক্ষয়তিয়ানাম্ আর্য্যো আর্য্যানাম্।"

(আমি দর্যাবাহু শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ক্ষত্রিয়, আর্য্যদের মধ্যে আর্য্য)।*১

জেন্দ্ আবেস্তার রচয়িতা ধর্মরাজ জরথুস্ত্রকে ফ্রবরদিন যস্ত 'অথর্বা' বলিয়া অভিবাদন করিতেছে—"উস্তা নো জাতো অথবা যো স্পিতমো জরথুস্ত্রো।"*২

(আমাদের সৌভাগ্য যে যিনি অথর্বা সেই স্পিতম জরথুস্ত্র আজ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন)।

স্বয়ং গাথা নিজেকে "শ্রুতি" এবং "মন্ত্র" বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন।

(১) কে বা প্রশ্রুদ্যাই বস্তি (যস্নঃ ৪৬-১৪)

(২) যো ইম্ কে নো ইৎ ইথা মন্ত্রেম্ বরেষেন্তি (যস্নঃ ৪৫-৩)

'অথর্বা' কর্তৃক রচিত যে 'মন্ত্র' নিজকে 'শ্রুতি' বলিয়া দাবী করে, তাহাকে 'বেদ নহে' বলিবার অধিকার কাহারও নাই। বৈদিক কৃষ্টির পরিবেশ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ত্ব দাবীর আকাঙ্ক্ষাই জন্মিতে পারে না।

হয়ত কেহ বলিবেন জেন্দ্ আবেস্তাই যে ভার্গব বেদ ইহা এখন-ও অনুমান মাত্র, প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইঁহারা শুষ্ক তার্কিক, হৃদয়ের আবেগের কোন মর্যাদাই ইঁহারা দিতে চান না।

কিন্তু সভ্যতার বিকাশে কেবল কি ন্যায় তর্কেরই মূল্য আছে; হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার কি কোন মূল্যই নাই?

বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায় এতই সুলভ?

যাহা মূলে এক ছিল সেই হিন্দু ও পার্শী সাধনা পুনরায় মিলিত হইয়া আর্যজাতিকে জগদ্বরেণ্য করিয়া তুলুক, পঞ্চনদ ও গান্ধারে প্রসারিত সপ্তসিন্ধুর সাপ্তবাহু আবার কলকলনাদে বৈদিক সূক্ত গান করিতে থাকুক, সহস্রাব্দীর বিবাদ বিসম্বাদকে দুঃস্বপ্নের ন্যায় ভুলিয়া গিয়া হিন্দু ও পার্শী পরস্পরকে সহোদর ভ্রাতা জ্ঞানে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করুক, এই আকাঙ্ক্ষাকে "দুরাগ্রহ" বলা চলে না। জেন্দ্ আবেস্তাকে ভার্গব বেদ বলিয়া গণ্য করিয়া লওয়াই এই মিলন সাধনের সহজতম উপায়। তাই আমি বিশ্বাস করি যে জেন্দ্ আবেস্তাই ভার্গব বেদ। যাহার উপহাস করিতে হয় করুন। হিন্দু-পার্শী-মিলনের আকাঙ্ক্ষা যাহার হৃদয়ে জন্মিয়াছে, তিনি আমার মতই বিশ্বাস করিবেন যে জেন্দ্ আবেস্তাই ভার্গব বেদ।

---

*১ (i) Ahl—Outline of Persian History—P 33

(ii) Taraporevale—Religion of Zara Thustra—P. 1

*২ ফ্রবরদিন যস্ত—১৩-৯৪

গোপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন অথর্ববেদ দুই ভাগে বিভক্ত—ভার্গব ও আঙ্গিরস। একদিকে "ছন্দস্ উপস্থা" (Zend Avesta) শব্দের অর্থ আথর্বণিক মন্ত্র, অতএব ইহা অথর্ববেদের অংশ। অপরদিকে জেন্দ্ আবেস্তাতে যদি ভার্গব বেদ দেখিতে না পাই, তবে ভার্গব বেদকে কোথাও গিয়া খুঁজিয়া পাইব না। কেবল আঙ্গিরসাত্মক অসম্পূর্ণ বেদকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে আমি চাই না। ভার্গব ও আঙ্গিরস এই উভয় অঙ্গে সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ অথর্ববেদই আমি পাইতে চাই। দক্ষিণ ও বাম এই উভয় চক্ষু মিলিয়াই দর্শনেন্দ্রিয়, দক্ষিণ ও বাম ইহার কোন হস্তকেই আমি পরিত্যাগ করিতে চাই না। ভার্গব ও আঙ্গিরস এই উভয় বেদই আমার আধ্যাত্মিক জীবনের আহার। ভার্গব বেদের লক্ষণ সমন্বিত উপস্থাই আমার নিকট ভার্গব বেদ। উপস্থাকে বর্জন করিলে আমাদের জাতীয় জীবন সমৃদ্ধ হইতে পারে না। ইহাই অথর্ববেদের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। একদিকে আঙ্গিরস বেদ হিন্দু জাতীয়তার এবং ভার্গব বেদ পার্শী জাতীয়তার সূত্রপাত বলিয়া যেমন বিচ্ছেদের নিদান, অপরদিকে ভার্গব-আঙ্গিরসাত্মক সম্পূর্ণ অথর্ববেদ হিন্দু ও পার্শীর পুনর্মিলনের প্রতীক। যদি হিন্দু ও পার্শী উভয়েই সম্পূর্ণ অথর্ববেদকে নিজের গুরুগ্রন্থ বলিয়া মনে করে, তবে অথর্ববেদই হইবে হিন্দু-পার্শী মিলনের ভিত্তিভূমি। "যৈ রেব সসৃজে ঘোরং তৈ রেব শান্তির্ অস্তু নঃ" (আঙ্গিরস বেদ : ১৯-৯-৫), যাহাই বিচ্ছেদের হেতু, তাহাই মিলনের সেতু হউক।

হিন্দু ও পার্শী, দেবযান ও পিতৃযান, বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত এই দুইটি বিভিন্ন সাধনার ধারার পুনর্মিলন দ্বারা বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠার পথ যেমন পরিষ্কৃত হয়, অন্য কিছুর দ্বারাই তাহা তেমন হইতে পারে না। অতএব ভার্গব বেদ এবং আঙ্গিরস বেদের আলোচনার প্রচুর প্রয়োজন আছে।

আঙ্গিরস বেদের বৈশিষ্ট্য

আঙ্গিরস বেদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য দুই প্রকার। প্রথমতঃ আঙ্গিরস বেদ অথর্ববেদের অঙ্গ বটে। অতএব অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্য আঙ্গিরস বেদেও প্রতিফলিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আঙ্গিরস বেদ দেবযানের গুরুগ্রন্থ। অতএব হিন্দুসাধনার যাহা বিশিষ্ট লক্ষণ, আঙ্গিরস বেদই তাহার আকর।

অথর্ববেদের প্রধান লক্ষণ জাতীয়তাবাদ। বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার সকলেরই আছে। "নিজেও বাঁচিবে অপরকেও বাঁচিতে দিবে"—(live and let live), ইহাই জাতীয়তার মূল কথা। আত্মপ্রতিষ্ঠাই (self-assertion) জাতীয়তার মূলনীতি, আত্মবিলোপ (self-denial) জাতীয়তার পথ নহে। আত্মপ্রতিষ্ঠা আর স্বার্থপরতা এক কথা নহে। প্রথমতঃ সকলের সমান অধিকার অস্বীকার করার নামই স্বার্থপরতা। পরন্তু 'অপরের-ও যেমন (বাঁচিয়া থাকিবার) অধিকার আছে, আমারও সেইরূপ অধিকার আছে'—ইহার নাম আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয়তঃ স্বার্থপরতায় আত্ম-ত্যাগের (প্রেমের) কোনও অবকাশ নাই। আত্ম-প্রতিষ্ঠা আত্ম-ত্যাগ দ্বারাই গঠিত। "নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ কিছুই থাকিবে না, কিন্তু জাতির স্বার্থ এক তিলও ছাড়িয়া দিব না", ইহারই নাম আত্মপ্রতিষ্ঠা। জাতির ভিতর নিজকে বিলুপ্ত করিয়া দিবে, এইজন্য ইহার নাম আত্মত্যাগ। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের এক বিন্দুও ব্যতিক্রম হইতে দিবে না, এইজন্য ইহার নাম আত্ম-প্রতিষ্ঠা। ইহা ভাল কি মন্দ তাহা আমি বলিতে চাই না, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এই আত্ম-ত্যাগ-মূলক আত্ম-প্রতিষ্ঠার যে একান্ত প্রয়োজন আছে, তাহা মুসলমান জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে। এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার শিক্ষাই পুনর্ আনয়ন করিয়া গুরু গোবিন্দ সিংহ আর্যজাতিকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন, বেদের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। সকল শক্তির ন্যায় ইহা নিজে ভাল-ও নহে মন্দ-ও নহে। সদ্ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলে ইহা ভাল, অসদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলে ইহা মন্দ। কিন্তু জাতীয়তাই যে শক্তির উৎস, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতীয়তা-মূলক আত্ম-প্রতিষ্ঠাই অথর্ববেদ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। তাই অথর্ব-বেদ বলিয়াছেন—(জাতীয়) শত্রুর নিকট নতি স্বীকার করিবে না, শত্রুকে দমন করিবে।

বাচং ক্ষ্ণুবান্ দময়ন্ত্ সপত্নান্।
সিংহ ইব জেষ্যন্ অভি তং স্তনীহি॥ ৫।২০।১

উল্লাসের সহিত শত্রুকে দমন কর, সিংহ-বিক্রমে গর্জন করিয়া আক্রমণ কর।

(অথর্ববেদের অংশ বলিয়া) আত্মপ্রতিষ্ঠা আঙ্গিরসবেদের একটি প্রধান লক্ষণ। ইহা ভার্গব বেদ ও আঙ্গিরস বেদ উভয়েরই সাধারণ লক্ষণ। ভার্গব বেদ-ও বলিয়াছেন—

আস্তেং অম্মাই যে নাও আংস্তাই দইদিতা। যস্নঃ ৪৬-১৮

যে আমাকে ক্লেশ দিবে, আমিও তাহাকে ক্লেশ দিব।

সাধারণ লক্ষণের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন অসাধারণ অথবা বিশিষ্ট লক্ষণের আলোচনা করা যাউক।

আঙ্গিরস বেদ দেবযানের গুরুগ্রন্থ। অতএব হিন্দু সাধনার যাহা বিশিষ্ট ধারা, তাহা আঙ্গিরস বেদেই পাওয়া যাইবে।

হিন্দু সাধনার বৈশিষ্ট্য বলিতে মানসপটে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা এবং মূর্তিপূজার চিত্রই ফুটিয়া উঠে আর আঙ্গিরস বেদেই আমরা এই প্রথাগুলির নির্দিষ্ট রূপ সুস্পষ্ট দেখিতে পাই।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু ব্যক্তিগত জীবনের এই চারিটি অবস্থার কথা বেদ-ত্রয়ীতে তেমন স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হয় নাই। আঙ্গিরস বেদে (১১-৫) ইহার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। অপি তু নিয়মনিষ্ঠ বলিয়া প্রত্যেক আশ্রমের লোককেই

এই সূত্রে ব্রহ্মচারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম অর্থ নিয়ম, ব্রহ্মচারী অর্থ নিয়ম-নিষ্ঠ।

ছাত্রজীবনের কথা আঙ্গিরস বেদ বলেন, উপনয়ন সংস্কার দ্বারা ছাত্র যেন নূতন গর্ভে বাস করিয়া নূতন জীবন লাভ করে। [আচার্য্য ছাত্রকে গর্ভে ধারণ করেন।]

আচার্য্য উপনয়মানঃ ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভম্ অন্তঃ।

—আঙ্গিরস বেদঃ ১১-৫-৩

তাহার পর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া মানুষটি সাগ্নিক হইয়া গৃহস্থোচিত পঞ্চ মহাযজ্ঞ দৈনিক অনুষ্ঠান করে।

ব্রহ্মচারী এতি সমিধা সমিদ্ধঃ।
কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ॥

—আঙ্গিরস বেদঃ ১১-৫-৬

বাণপ্রস্থ নর ব্যক্তিগত জীবনের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে—পরন্তু সংসার ছাড়ে নাই, জাতির জন্য বাঁচিয়া আছে। জাতীয় ঐক্যের সংরক্ষক হইয়া জাতীয় পতাকা বহন করিয়া সে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করে।

অভিক্রন্দন স্তনয়ন্ অরুণঃ শিতিঙ্গঃ।
বৃহৎ শেকো অনুভূমৌ জভার॥ —আঙ্গিরসবেদ ঃ ১১-৫-১২

আর যিনি ভিক্ষু সন্ন্যাসী, তাঁহার নিজের বলিতে কিছুই নাই। ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন বলিয়া তিনি ভিক্ষু নহেন, পরন্তু ইহলোক ও পরলোক তিনি ভিক্ষা-স্বরূপ দান করিতে পারেন, সকলই ত্যাগ করিতে পারেন বলিয়া তিনি ভিক্ষু।

ইমাং ভূমিং পৃথিবী ব্রহ্মচারী।
ভিক্ষাম্ আজভার প্রথমো দিবং চ॥ —আঙ্গিরসবেদঃ ১১-৫-৯

চারিটি আশ্রমের কথাই আঙ্গিরসবেদ ব্রহ্মচারি-সূক্তে (১১-৫) সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। বেদ-ত্রয়ীতে এরূপ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে যেমন আশ্রম-বিভাগ, জাতীয় জীবনের পক্ষে সেইরূপ বর্ণবিভাগ হিন্দু-সাধনার বিশিষ্ট পদ্ধতি। চারিটি বর্ণ মিলিয়া এক জাতি; ইহারা একই কলেবরের বিভিন্ন অঙ্গ।

ঋগ্বেদের একটি মাত্র স্থলে পুরুষ-সূক্তের একটি মাত্র ঋকে, আমরা চারিটি বর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই (ঋগ্বেদ ঃ ১০-৯৭-১২)—কিন্তু তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্মের কথা ঋগ্বেদ কিছু বলেন নাই। আঙ্গিরস বেদে তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্মের উল্লেখ-ও কিছু কিছু করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ হোম করিবেন—

ত্বাম্ অগ্নে বৃণতে ব্রাহ্মণা ইমে। (আঙ্গিরসবেদঃ ২-৬-৩)

ক্ষত্রিয় রাজ্যশাসন করিবেন—

ইমং বিশাম্ একবৃষং কৃণু ত্বম্। (আঙ্গিরসবেদঃ ৪-২২-১)

বৈশ্য বাণিজ্য করিবেন—

ইন্দ্রম্ অহং বাণিজ্যং চোদয়ামি। (আঙ্গিরসবেদঃ ৩-১৫-১)

এই তিনটি দ্বিজ বর্ণ হইতে যিনি পৃথক্ তিনিই শূদ্র।

তস্মাহং সর্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্রঃ উতার্য্যঃ। (আঙ্গিরসবেদ ঃ ৪-২০-৪)

কেবল এই চারিটি বর্ণের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়াই আঙ্গিরসবেদ ক্ষান্ত রন নাই, বর্ণগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণই যে শ্রেষ্ঠ বর্ণ, ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহাও অকুণ্ঠিতভাবে রটনা করিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ এব পতির্ ন রাজন্যঃ ন বৈশ্যঃ।

তৎ সূর্য্যঃ প্রব্রুবন্ন্ এতি পঞ্চভ্যঃ মানবেভ্যঃ॥

আঙ্গিরসবেদঃ ৫ ১৭-১৯

ব্রাহ্মণের এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন ঋগ্বেদের কোথাও পাওয়া যায় না। ইহার কারণ আঙ্গিরস-বেদই বিশেষ করিয়া দেবযানের (হিন্দু-সাধনার) গুরুগ্রন্থ।

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার পর প্রতিমা পূজা। প্রতীকোপাসনার বিধান আঙ্গিরস বেদই স্পষ্ট ভাবে দিয়াছেন। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, জল, ইহাদিগকে পূজায় প্রতীকরূপে গ্রহণ করিবে।

অগ্নৌ সূর্য্যে চন্দ্রমসি মাতরিশ্বন্।

ব্রহ্মচারী আপ্সু সমিধম্ আদধাযিত॥ আঙ্গিরস ঃ ১১-৫-১৩

পরন্তু ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে সাকার দেবতাই আমার প্রিয়। সূক্ষ্ম নিরাকার দেবতা আমার (দেবযানের) ভাল লাগে না।

বালাদ্ একং অনীয়স্কং উতৈকং দৃশ্যতে।

ততঃ পরিষ্বজীয়সী দেবতা সা মম প্রিয়া॥

আঙ্গিরসবেদঃ ১০-৮-২৫

অতএব হিন্দুধর্মের বিশিষ্টতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, বর্ণাশ্রমব্যবস্থা এবং প্রতিমা পূজা, তাহার স্পষ্ট নির্দেশ আঙ্গিরসবেদেই আমরা দেখিতে পাই।

হিন্দু-ধর্মের আর একটি বিশিষ্টতা মাতৃভাবে ঈশ্বরারাধনা।

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।

সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বুঝবে মন ঠারে ঠোরে॥

অন্যত্র সর্বত্রই পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করা হয়। কেবল হিন্দুই তাঁহাকে মাতা বলিয়া ডাকে। ইহার মূলও আমরা আঙ্গিরস-বেদেই দেখিতে পাই। আঙ্গিরসবেদ ইন্দ্রের পূজা অতিক্রম করিয়া ইন্দ্র-জননীর পূজা আরম্ভ করিয়াছেন।

'ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান।

সা ন এতু বর্চসা সংবিদানা॥ আঙ্গিরসবেদঃ ৬-৩৮-১

হিন্দুধর্মের বিশিষ্টতা বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহার অঙ্কুর আঙ্গিরস বেদেই পাওয়া যায়। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে আঙ্গিরস বেদই দেবযানের (হিন্দু-সাধনার) গুরুগ্রন্থ। এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টি থাকিলে অথর্ব-বেদ পাঠে আমরা একটা আগ্রহ পাইব, ইহা 'শ্রুতি মাত্রে' পর্যবসিত না থাকিয়া দৃষ্টির গোচরেও আসিতে পারিবে—ইহার বিশিষ্ট শ্লোক স্বাধ্যায় রূপে গৃহীত হইতে বাধা থাকিবে না।

ফুল তরু তারা

শশাঙ্কমোহন চৌধুরী

আমার গবাক্ষ-পথে বার বার চেয়ে চেয়ে দেখি
চেয়ে দেখি তরুদলে—ফুল তরু তারা
আমারি আবাসলগ্ন নয়নাভিরাম
নিত্য নব ঐশ্বর্যের আহরণে আগ্রহ-চঞ্চল।

করেছিনু একদিন তাদেরে রোপন।
নবাঙ্কুর ক্রমে ক্রমে শাখা-প্রশাখায় পল্লবে পল্লবে
আপনারে প্রসারিত করি দিল দীপ্ত মহিমায়।
আমি দেখিয়াছি সেই ক্রমান্বয়—ঊর্ধ্বগ আবেগ।
সূর্যকরধারা সনে মিলায়েছি মোর স্নেহধারা,
আমিও যে করেছি লালন এই তরুদলে
আজ যারা প্রদীপ্ত-যৌবন,
অঙ্গে ধরি কুসুমের বিচিত্র বরণ সমারোহ
ছড়ায়িছে আনন্দ-সৌরভ।

দেখি চেয়ে আসিয়াছে বুলবুল;
বিথারিয়া বর্ণছটা প্রজাপতিদল
কুসুমে কুসুমে দোলে বায়ুর হিল্লোলে।
নূতনের নব পরিচিতি
তাহাদেরে করেছে বিভোল।
অন্তর্গূঢ় রসাভাসে কাহারো বা
নিমীলিত হয় দুটি পাখা;
চাঞ্চল্যের মাঝে আসে অকস্মাৎ স্তব্ধতার অলস বিলাস।

আমি ভালোবাসি এই ফুলতরুদল,
আমার লালিত তারা নিত্য মোর দৃষ্টিপথে থাকে।
তাহাদের মাঝে আমি সৃষ্টির রহস্য পাঠ করি—
রূপ হতে রূপান্তরে নব রূপায়ন।

লক্ষ যুগ কেটে গেছে,
হয়তো বা কেটে যাবে আরো লক্ষ যুগ;
তবু পড়িবে না যতি স্রোতমুখে এই রহস্যের।
আদি কাল হতে আসি এই আমি ধরিয়াছি কায়া,
আমার ফলিত রূপ আর কোথা ছড়াইবে ছায়া
নবীন আগ্রহে?

আমার মানসলোক পল্লবিত হলো কি অমনি
তাই চেয়ে দেখি।
চেয়ে দেখি দৃষ্টি মেলি দূর চিত্ততলে
রয়েছে যে পরিমল তাই;
তারি গন্ধ বহি ফুটিবে কি মোর ফুলদল
অমনি আবেশে একদিন?
দূরাগত পথিকের নয়নে বিস্ময়
করিবে কি তাহারে আকুল নব পরিচয় ভরে?
তারপর?
তারপর নূতনের হোক পরিশেষ
নবতর সম্ভাবনা লাগি।

জীবে দয়া

সুধাংশুশেখর মজুমদার

(পূর্বানুবৃত্তি)

পূর্বে উল্লিখিত সুন্দরানন্দ ঠাকুরের গৌরভক্ত-সম্পর্কিত বিচার বা চিন্তাধারায় আমাদের কোন আপত্তি নাই। জীবের দুর্গতি দেখিয়া বর্ণিত গৌরভক্ত আপন মতে আরও সুদৃঢ় হউন ইহা কাম্য কিন্তু তাহার সংগে যদি তথাকথিত কর্মীর কর্মধারা অনুসৃত হয় তাহা হইলে কি সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না? গৌরসুন্দরের জীবে-দয়ার নির্দেশ অনুসরণ করিয়া এবং গীতায় কথিত, 'কর্মে অধিকার ও ফলে অনধিকার' মনে প্রাণে জানিয়া ও মানিয়া মনে হরি-স্মরণ ও মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরি-নাম-গান করিতে করিতে যদি গৌর-ভক্ত এই কুষ্ঠরোগীর সেবা-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন অথবা স্বয়ং পরিচর্যা করেন ত ক্ষতি কি? প্রত্যেক জীবই ত স্বরূপতঃ নিত্যকৃষ্ণদাস—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণে নিত্য দাস।" চৈঃ চঃ মধ্য—বিংশ। যদিও অধুনা জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া দুর্গতিগ্রস্ত। সাধারণ জীব এই তত্ত্ব জানুন আর নাই জানুন গৌর-ভক্ত বৈষ্ণব জীবের পরিচয় জানেন। বৈষ্ণব এই আত্মবিস্মৃত কৃষ্ণদাসের সেবায় বিমুখ থাকিবেন কেন? তিনি বিচারক সাজিবেন কেন? সেবক সাজিয়া যাচিয়া ত তিনি সেবায় ধাবিত হইতেছেন না! "সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী" হইয়া পথ চলিতে চলিতে যদি রোগজর্জর ও আর্ত আত্মবিস্মৃত কৃষ্ণদাসের করুণ কান্নায় আকৃষ্ট হইয়া, কেহ মৃত্যু ও ব্যাধিভয় তুচ্ছ করিয়া প্রেমভরে তাহাকে বুকে ধরে ও হরি-স্মরণ ও নামগান করিতে করিতে তাহার সেবায় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে অথবা নিজ আশ্রয়ে লইয়া গিয়া নিরন্তর নাম-গানের সংগে পরমানন্দে তাহার সেবা করিতে থাকে তাহাতে মহাপ্রভু কখন বিমুখ হইবেন না। ইহাতে বরং ভক্ত-বাঞ্ছিত সুফলও ফলিতে পারে। তাহা এই যে কৃষ্ণদাস রোগীকে নাম শুনাইবার সুকৃতি লাভ করেন। আর নিঃস্বার্থ উপকার পাইয়া স্বভাবতঃ এই গৌরভক্তের প্রতি রোগীর সকৃতজ্ঞ অনুকূল মনোভাবের উদয় হইবে। এইরূপে উৎপন্ন স্বাভাবিক শ্রদ্ধায় নামগান শ্রবণের ফলে রোগী সুকৃতিবান্ হইবেন। আবার সেবাক্রমে সময় ও সুযোগমত রোগীকে পারমার্থিক জ্ঞান দিবার অবসরও এই গৌর-ভক্ত পাইতে পারেন। সেবাকারীর প্রতি তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণের ফলে এই সদুপদেশ প্রাণবন্ ও ফলপ্রসূও হইবার সম্ভাবনা। এই কার্য-ক্রমের মধ্যে সাধারণ জীব একটা জীবন্ত আদর্শ পাইবে ও রোগীও হয়ত জীবনে পথ পাইবে। সবার উপর, ভক্তকর্মী জীবের দুর্গতি মনে-প্রাণে অনুভব করিয়া আরও আগ্রহভরে ও অনুরাগযুক্ত হইয়া ভগবৎ-ভজনায় নিজেকে নিযুক্ত করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই পথই সর্ববিধ কল্যাণের পথ। এড়াইয়া গেলে কাহার কোন লাভ হয় না।

'জীবে-দয়ার' পূর্ণ অর্থ বুঝিতে হইবে,—সংসার চক্রে ভ্রাম্যমান জীবের অনর্থ-নাশ ও পারমার্থিক কল্যাণ-সাধন এবং তাহা উত্তম-বৈষ্ণবেই সম্ভবে। কিন্তু সাধন মার্গের প্রথম অবস্থায় বৈষ্ণবেরও যে 'জীবে-দয়া' আচরণীয় তাহার প্রমাণ আমরা এই ভাবে পাই—

দিগ্বিজয়ী যখন পরাভব মানিয়া পরদিন প্রভাতে গৌরহরির নিকট প্রপন্ন হইলেন তখন মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"এতেক ছাড়িয়া বিপ্র! সকল জঞ্জাল
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল॥"
প্রভু বোলে, "বিপ্র! সব দম্ভ পরিহরি
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি॥"

এখানে প্রথম প্রবৃত্ত বৈষ্ণবের পক্ষে 'জীবে-দয়ার' সংগে দম্ভপরিহারপূর্বক অভিমান-শূন্য চিত্তে কৃষ্ণ ভজনের নির্দেশ সুস্পষ্ট। তিনি বলিতেছেন, "সর্ব্বভূতে দয়া করি"। "করি" অর্থে বুঝায় "করিয়া" অথবা "করিতে করিতে"। তিনি দিগ্বিজয়ীকে জীবে দয়া করিতে তাহার সংগে কৃষ্ণ-ভজন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রবর্ত বৈষ্ণবের পক্ষে এই অবস্থায় প্রেমদান অনর্থ-নিবৃত্তির কথা উঠিতে পারে না।

এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক, 'জীবে-দয়া' করিবার সার্থকতা কোথায়। কবি গাহিয়াছেন—

"দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া
নিত্য কল্যাণ কাজে হে,
ফিরিব আহ্বান মাগিয়া
তোমারি রাজ্যের মাঝে হে।"

এই সেবার আহ্বান আসে কোথা হইতে? জগতে যেখানে ব্যথা, যেখানে দুঃখ, যেখানে অভাব, যেখানে গ্লানি, যেখানে রোগ, যেখানে শোক—সেবার আসন সেখানেই পাতা! সেবকের নিমন্ত্রণ সেইখানেই যেখানে আছে দুঃখ-শোক-জরা-ব্যাধি। তাই সেবক দেখেন জগতের ব্যথাময়রূপ, সন্ধান পান জীবের অনন্ত দুর্গতির ও পরিচয় পান ক্লেশ-ক্লেদপূর্ণ নশ্বর সংসারের। তাঁহারা দেখেন যে এই সংসার "অনিত্যম্ অসুখম্"। তাই তাহার সংগে যদি সংযুক্ত থাকে "বৈষ্ণব-সেবন" তবে সোনায় সোহাগা হয়। বাস্তব জীবনে কর্মক্ষেত্রে সেবক দেখেন জীবনের অসারতা ও সংসারের তিক্ততা ও তাহার সংগে বৈষ্ণব সেবনের ফলে পান পারমার্থিক জ্ঞান ও সত্যদৃষ্টি। এই জন্যই আত্মকল্যাণকামী জীবের প্রয়োজন "জীবে-দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন"।

বিচার ও আন্তরিকতার সহিত সেবাকার্য করিতে করিতে আর একটি অমূল্য জ্ঞান জীব লাভ করেন। তাঁহারা দেখেন—যেমনটী আমরা চাই তেমনটী হয় না; যাহা চাই নাই তাহাই হইয়াছে; ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া বসিয়াছি। এই তত্ত্ব সেবক ঠেকিয়া শেখেন আর বুঝেন কাহার ব্যথায় দুঃখ কে কুড়ায়, কাহার

দুঃখের বোঝা কে বহন করে? সেব্য না সেবক? মানুষের কর্মশক্তি কতটুকু? কর্মফলে মানুষের হাত কোথায়?" এই জ্ঞান পারমার্থিক ক্ষেত্রে পরম মূল্যবান। ঠিক্ ঠিক্ সেবা করিলে "প্রভু মালিক, আমি কেহ নহি, কিছু নহি; তাঁহার কর্ম তিনি করিয়া চলিয়াছেন", এই বুদ্ধিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়!

সেবায় স্বার্থত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। কোন প্রকার ত্যাগ না করিলে সেবা হয় না। সেবায় চাই অর্থ ত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, আরামত্যাগ; সেবায় হয় সময় নাশ, শক্তিনাশ, স্বাস্থ্যনাশ। রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বিনিদ্র রজনী কাটাইতে গেলেই সুখ-স্বার্থ বলি পড়ে, স্বাস্থ্য নাশ হয়, আরামের বিরাম ঘটে। পলে পলে স্বাস্থ্যকে অর্থাৎ নিজেকে নাশ না করিতে পারিলে অপরকে বাঁচাইয়া বা সারাইয়া তুলিবার চেষ্টা সম্ভবে না। সেবা নিরবচ্ছিন্ন ত্যাগেরই পথ ও ত্যাগেরই সাধন এবং নিজেকে বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ নিজেকে ভুলিবার অন্যতম পন্থা। তাই এই পথের এত মহত্ত্ব।

সব পথের মত এই পথেও সাধকের বিঘ্ন আসে। সাধক কর্মীর সত্যকার ভাব হওয়া চাই "আমি কৃতার্থ হইতেছি"। আমি জীবের দুঃখকষ্ট দূর করিতেছি এই অভিমান মনে জাগিলে সুকর্মও অকর্ম হইয়া যাইবে। দয়ার পাত্র হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা কর্তৃত্বাভিমান রাখা সাধকের পক্ষে সর্বনাশকর। তাই মহাপ্রভু সাবধান করিয়াছেন "সব দম্ভ পরিহরি, ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে দয়া করি"। এই হস্তিতুল্য অভিমান ভক্তি-লতাকে গ্রাস করে। কিন্তু আমার মনে হয় বৈষ্ণবের সে ভয় কম। কারণ "জীবে-দয়ার" সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছে "নামে রুচি" এবং কি ভাবে "নাম" লইতে হইবে তাহাও মহাপ্রভু স্বরচিত শ্লোকাষ্টকে জানাইয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥
তৃণ হতে দীন হও, তরুসম সহ
অমানী মানদ—গাও "হরি" অহরহ।

যিনি এই নির্দেশমত নিজেকে তৃণ হইতেও দীন জ্ঞান করিয়া নিজে অমানী হইয়া, "কৃষ্ণ্যোন্ত করি" অপরকে মান-দান করিয়া অহরহ নাম-গান করিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহার মনে অভিমানের সম্ভাবনা কম। গীতা-জয়ন্তী উৎসবের দিন কোন বৈষ্ণব-সমাজে গিয়া মহাপ্রভুর "জীবে-দয়ার" প্রসঙ্গ তুলিবামাত্র কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মন্তব্য করিয়াছিলেন যে জীবে দয়া অভিমানের কথা। সর্বক্ষেত্রে তাই কি? গীতার যে অংশে 'অভিমান'কে আসুরী সম্পদ বলিয়া গণনা করা হইয়াছে (১৬।৪) সেইখানেই "ভূতেষু দয়া"কে দৈবী সম্পদের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে (১৬।২)। সুতরাং অভিমান-মুক্ত দয়া সম্ভবে। প্রকৃত বৈষ্ণবেরাই এই দৈবী সম্পদের অধিকারী এবং বৈষ্ণবের প্রণাম মন্ত্রে ঝঙ্কৃত হইয়াছে—"কৃপাসিন্ধুভ্যঃ এবচ"! 'দয়া' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে 'দয়্' ধাতু হইতে এবং ইহার অর্থ 'গলিয়া যাওয়া'। পরের দুঃখ দেখিয়া প্রাণ গলিয়া যাওয়াই 'দয়া'। নিজেকে উত্তম জ্ঞান করিয়া সেব্যকে অধম বুদ্ধিতে

কৃতার্থ করিবার হীন বুদ্ধির স্থান সেখানে নাই। কিন্তু এইরূপে অর্থে দয়া শব্দটীর সাধারণ প্রয়োগ থাকায় এবং পাছে সাধারণ সেবকগণ এই ভাবেই প্রণোদিত হইয়া সেবাকার্য করেন সেই আশঙ্কায় সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীশ্রীপরমহংস দেব সমাধি-মুখে বলিয়াছিলেন—

জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না,—জীবে দয়া নয়—শিব-জ্ঞানে জীবের সেবা।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৭) শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের এই সাবধান বাণী সময়োচিত হইয়াছে কারণ তিনিই মহাপ্রভুর এই ভুলিয়া-যাওয়া বাণী জগতে জাগাইয়াছেন। 'দয়া' শব্দের প্রয়োগের ফলে বর্তমান যুগের জীবগণ পাছে ভুল বুঝেন, সেই ভয়ে তিনি 'দয়া' শব্দের পরিবর্তে প্রয়োগ করিলেন 'সেবা' শব্দটি এবং 'জীব' স্থানে বসাইলেন 'শিব'। ইহাই শাস্ত্র-দৃষ্টি কিনা তাহা পরে দেখাইব। কোন কোন বৈষ্ণব-প্রচারক জীবে-দয়া কথাটি মানেন কিন্তু জীব সম্পর্কে 'সেবা' শব্দটির প্রয়োগে তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি। তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র সেব্য বস্তু। আমরাও বলি "তথাস্তু"। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্পর্কে সেবা শব্দটি প্রয়োগ ছাড়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে সেবা শব্দের প্রয়োগ দেখি। তাঁহারা বলেন, "বৈষ্ণব সেবন"। গৌরসুন্দর রামপণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিতেছেন :

* "জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসেরে তুমি সর্ব্বথায়।
সেবিবে ঈশ্বর-বুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায়" (চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য খণ্ড ৫ম অঃ)

আবার—

মকরধ্বজ কর প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্র।
বলিলেন "সেবিহ রাঘবপদপদ্ম॥" (চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য খণ্ড ৫ম অঃ)

বৈষ্ণব-সেবা পাইলাম। কারণ—

"বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়।" চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৪ অঃ-এ আর একটি কথা আছে—'অতিথি সেবা'। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত বলিতেছেন—

"গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম॥

আরও বলিতেছেন—

অকৈতবে চিত্ত-সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি "অতিথির ভক্তি॥ (আদি/শ ১০ম)

আমরা জানি, "সর্ব্বদেবময়োতিথি"! যাঁহারা 'জীবসেবা' কথাটির প্রচারক তাঁহারা জীবকে শিব-জ্ঞান করিতে উপদেশ দেন। তাঁহারা বলেন—

* চৈতন্য চরিতামৃতে দেখিতেছি (মধ্যলীলা, ২৪ অঃ)
গুরু-সেবা উর্দ্ধপুণ্ড, চক্রাদি ধারণ
এবং "সাধু লক্ষণ, সাধু সঙ্গ সাধুর সেবন॥

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার প্রসঙ্গে প্রভু বিশ্বম্ভর জানাইলেন—

"সর্ব্ব দেহে মুঞি কাঁরা, বোলোঁ চালোঁ, খাঙ
তবে দেহ-পাত, যবে মুঞি চলি যাঙ।" চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ

গীতা বলিয়াছেন—ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভাগবতে রহিয়াছে—স্থাবর-পদার্থ হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত উত্তমাধম জীবসমূহে ও ভৌতিক বিকার-সমূহে সেই এক পরব্রহ্মই আত্মা, ভগবান্ বা ঈশ্বর। (৭।৬।২০-২৩)।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্।
ভাবমানুরমুস্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ॥ ২৪॥

"সুতরাং যে কার্যের দ্বারা ভগবান অধোক্ষজ পরিতুষ্ট হন, তোমরা দ্বেষাদি পরিত্যাগপূর্বক সর্বভূতে সেই দয়া এবং মৈত্রী বিধান কর।" সুতরাং দেখিতেছি জীবে দয়া দেখাইয়া ভগবান্ অধোক্ষজকে তুষ্ট করা যায়। কারণ—

সর্ব্বাণি মদ্বিষ্ণ্যতয়া ভবদ্ভি
শ্চরাণি ভূতানি সুতা ধ্রুবাণি
সম্ভাবিতব্যানি পদে পদে বো
বিবিক্তদৃগ্‌ভিস্তদু হার্হণং মে॥ ৫।৫।২৬

"হে পুত্রগণ, স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে আমার অধিষ্ঠান জানিয়া মাৎসর্যাদি পরিত্যাগপূর্বক পদে পদে তাহাদের সম্মানই আমার পূজা"। এই শ্লোকে আমরা পাইতেছি যে জীবকে পদে পদে সম্মান দেখানই পূজা। সুতরাং এই শ্রদ্ধা-বুদ্ধিতে জীবের সেবা শাস্ত্রসম্মত এবং তাহা ভগবানের পূজারই তুল্য।

এই বিশ্ব অনিত্য কিন্তু মিথ্যা নয়। ইহা ভগবানেরই প্রাকৃত রূপ এবং সমগ্র জগৎ ভগবদভিন্ন। (৫।১৮।৩২)

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥ ১০।১৪।৫৬

বস্তুতঃ যাঁহারা কৃষ্ণ-তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের মতে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের রূপ। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই।

শ্রীভগবান্ সর্বজীবের আত্মস্বরূপ (১০।১৪।৫৫)। তিনি ভূতগণের আত্মা। (১০।৮৬।৩১)। তাই এক শ্রেণীর ঈশ্বর-সন্ধানী জীব-সেবার মধ্য দিয়া প্রতি জীবের মধ্যে সেই সত্য, শিব, সুন্দরের দর্শন খুঁজিতেছেন এবং এই ভাবেই ঈশ্বর-সেবা করিয়া তাঁহারা ভগবতী কৃপালাভ করিতে চাহেন। এবং ইহাও এক বিশিষ্ট পন্থা।

সেবা কোন্ বুদ্ধিতে করণীয়? তাহার ইঙ্গিত আমরা উপনিষদে পাই। কি ভাবে দান দেয়?

"ধীয়া দেয়ম্ ভীয়া দেয়ম্ হ্রিয়া দেয়ম্, সংবিদা দেয়ম্।" জলকতুল্য শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম কথা "ধীয়া দেয়ম্" অর্থাৎ বিচারপূর্বক দেয়। গ্রহীতা পয়সা লইয়া গাঁজা খাইবে কিনা এ বিচার আমার নহে; এই বিচার করিতে হইবে যে যিনি চাহিতেছেন তিনি কে? আমি কে? কাহার জিনিষ কাহাকে দিতেছি?

"ভীয়া দেয়ম্"—ভয়পূর্বক দেয়, পূজার আয়োজন যেমন ভয়। আমার মনে 'তম' আসে নাই ত? অশ্রদ্ধা জাগে নাই ত? কারণ 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'।

'হ্রিয়া দেয়ম্'—লজ্জাপূর্বক দেয়। পিতা চাহিতেছেন পুত্রের কাছে, জগৎ-পতি তাঁহারই জিনিষ আমার কাছ হইতে হাত পাতিয়া লইতেছেন। তাই লজ্জা।

"সংবিদা দেয়ম্"। দিয়া উপশম হয় না কেন এই ভাবনা। দান বা সেবা ধর্মের এমন গভীরতম ও উচ্চতম আদর্শ জগতে অন্যত্র নাই। এইরূপ দান পরম তপস্যা অথবা তপস্যার পূর্ণতম ফল। মহাপ্রভু যখন "জীবে-দয়া" বলিয়াছিলেন তখন তিনি এই উচ্চতম আদর্শকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই জীবে-দয়ার উপদেশ সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পরে ফলে-ফুলে পল্লবিত হইতে চলিয়াছে। শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণদেব মহাপ্রভুর এই বাণীতে কিরূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন এবং কেমন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ জগতে এই বাণীর সুপ্রচার করিয়া সেবার বন্যা বহাইবার প্রেরণা পাইলেন তাহা জানা প্রয়োজন। সেইজন্য কথঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও, সেবাধর্মের ইতিহাস ও দর্শন হিসাবে স্বামী সারদানন্দ-লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ হইতে নিম্ন-লিখিত বিবরণটী উদ্ধার করা হইল। (৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৭-২৬৯)

"কথা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের কথা উঠিল এবং ঐ মতের সারমর্ম সমবেত সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব বলিলেন "তিনটি বিষয়ে নিরন্তর যত্ন-বান থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে-দয়া, বৈষ্ণবপূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর, নাম নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান্, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধুভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজীবে দয়া—(প্রকাশ করিবে)। "সর্বজীবে দয়া" পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্দ্ধ বাহ্যাবস্থায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জীবে-দয়া—জীবে-দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না,—জীবে-দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।"

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ কথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু তাহার গূঢ় মর্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাব-ভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্ত-জ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন

করিলেন। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি-ভালবাসা প্রভৃতি কোমলভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ-সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত একথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ,—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপ শিব-জ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে 'শিব-জ্ঞানে' জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।

ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরা ভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে। শিব কি নারায়ণজ্ঞানে জীবের সেবা করিবে, ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্পকালেই কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বাহুল্য। কর্ম বা রাজ যোগ অবলম্বনে যে সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ, কর্ম না করিয়া দেহী যখন এক দণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন 'শিবজ্ঞানে' জীব সেবা-রূপ কর্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য এবং করিলেই তাহারা লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইবে, একথা বলিতে হইবে না। যাহা হউক ভগবান যদি কখনও দিন দেন, আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুৎ সত্য সংসারের সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।" এমনিভাবে পরমহংসদেব চৈতন্য-বাণীর প্রাণশক্তি বিবেকানন্দে সঞ্চারিত করলেন। পরমহংসদেবের মর্মী ভক্তগণ মানেন যে ইনি নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্য।

মনের গহনে

সুবোধ সেনগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

গাড়ীর অবিশ্রান্ত গতি ও তার চলার ছন্দ ও শব্দে মনীষ কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা সে জানে না, হঠাৎ বালিশের মৃদু ঝাঁকুনীতে সে জেগে গেল। গাড়ীর ঝাঁকুনীতে সে ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এ ঝাঁকুনী গাড়ীর নয়, ঝাঁকুনী কারও ইচ্ছাকৃত হবে হয়ত। মনীষ অন্ধকারে উঠে বসল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল রিণিদেবী উঠে বসে আছেন। মনীষ উঠে বসতেই রিণিদেবী ধীর অথচ মৃদু-কণ্ঠে বললেন, "আমিই ডাকছিলাম মনীষবাবু।"

"আপনি ডাকছিলেন?" বিস্ময়ের সুরে মনীষ বলল।

"হ্যাঁ আমিই; ওদের সকলের সংগে আপনার কথাবার্তা সব শুনেছি, পরিচয় আপনার যা পেয়েছি, তাতে আপনাকে ডেকে তুলে কথা বলা বোধহয় অসংগত ও অশোভন হচ্ছে না।"

"অসংগত ও অশোভন আমি মনে করছি না আমার দিকে থেকে এটা আপনাকে বলতে পারি, তবে অন্য যাত্রীরা কে কি ভাববেন, সে কথা আমি কি করে বলব রিণিদেবী।"

"সে ভাবনার প্রয়োজন নেই মনীষবাবু। না না আপনাকে বাবু বলে আপনাকে অনাত্মীয়ের পর্যায়ে ফেলব না, আপনাকে আমি দাদা বলেই ডাকব।"

"আমি তোমার চেয়ে যথেষ্ট বড় রিণি, দাদার দাবী ও দায়িত্ব গ্রহণে আমি ত্রুটী করব না বোন।"

"হঠাৎ দাবী ও দায়িত্বের কথা তুললেন কেন দাদা?"

"যে কারণে রাত দুটোর সময়ে আমাকে ডেকে তুলেছ, সেই কারণেই আমি ওকথা বলে তোমাকে অভয় দিচ্ছিলাম মাত্র।"

রিণি চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, "তাহলে আপনি সব শুনেছেন?"

"হ্যাঁ শুনেছি, এবং শুনেছি সে কথা জান বলেই আমার সংগে সে সব কথা আলোচনা করতেই চাচ্ছ।"

"এ আপনি কি করে বুঝলেন?

"বুঝতে পারা খুব সহজ না হলেও, জটিলতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি কিন্তু সে কথা যাক্, বুঝেছি এই কথাটাই ধরে নাও না?"

"কিন্তু আপনি কি মনে করেন, যার সাথে জীবনে প্রথম আলাপ হচ্ছে তাকে

জীবনের সব কথা বলতে উন্মুখ হয়েছি, একথা বিশ্বাস করা যায়?

"হয়ত যায় না, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাই সম্ভব হচ্ছে, আর যাতে নিঃসঙ্কোচে বলতে পার তারজন্য আমি অপরিচয়ের বাধ ভেঙ্গে তোমাকে অত্যন্ত আপন করে ভগ্নির পর্যায়ে এনে ফেলেছি, আর ত কোন বাধা থাকতে পারে না।

"না আর বাধা থাকতে পারে না সেকথা সত্যিই দাদা কিন্তু প্রয়োজনের চাপও আমার কাছে নিতান্ত কম নয়, তাই আরও বলতে উন্মুখ হয়েছি, তা ছাড়া যোগাযোগের সৃষ্টি হয়েছে আমাদের কথোপকথন আপনার অনিচ্ছাকৃত শ্রবণে।"

"সেই যাই হোক না কেন, যোগাযোগ হয়েছে একথা অনায়াসে বলতে পারা যায়। আচ্ছা বোন, তুমি বলার চেয়ে আমি তোমাকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞেস করছি, তুমি নিঃসঙ্কোচে জবাব দিও। হয়ত তোমাকে সাহায্য করতে পারব, আর সাহায্য যদি নাও করতে পারি, তোমার মনকে হাল্কা করতে কিছু সাহায্য অন্ততঃপক্ষে করতে পারব ত?

"বেশ সেই হোক দাদা, আপনি আমাকে প্রশ্ন করুন।"

"আমি তোমাদের কথা সব শুনেছি, একটা বিশেষ কথা আমার মনে হয়েছে। যে কারণে তুমি বিনয়ের সঙ্গে ছেদ টেনে দিতে চাও, সে কারণ আজকে সৃষ্টি হয়নি, সে কারণ পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে বর্তমান ছিল, সেটা এতদিন লক্ষ্যের মধ্যে তোমার আনোনি, আজকে কেন হঠাৎ এল, এই কথাটাই আমার আজকে বিশেষ করে মনে হচ্ছে বোন।"

রিণি একটু চুপ করে থেকে বলল, "জানিনা আপনি আমাকে কি মনে করবেন, কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে পারি মানুষ যখন মানুষকে ভালবাসে তখন বিচার করে ভালবাসে না, মানুষের যে কোন আস্পেক্টকে ভালবেসে ভালবাসতে সুরু করে, তারপর ধীরে ধীরে সমগ্র মানুষটিকে চিনতে পারে এবং সমগ্রভাবে ভালবাসে। আমি যখন বিনয়বাবুকে দেখি তখন তার স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, ঔদার্য, নিরঙ্কুশ মন আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, তারপর ধীরে ধীরে তাকে ভালবেসেছি, কিন্তু এখন সমগ্রভাবে মনে মনে বিনয়দাকে গ্রহণ করতে পারছি না।"

"কারণ তুমি বলেছ বয়সের ব্যবধান, তাই কি একমাত্র কারণ?"

"হ্যাঁ, তাই; বয়সের ব্যবধানে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক হয়ে যায় এবং চিন্তাধারার আরও ব্যবধান ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়। তখন জীবন হয় দুঃখপূর্ণ ও অসহনীয়।"

"যথার্থ প্রমাণ কিছু পেয়েছ কি তার?"

"না, এখনও বিশেষভাবে পাইনি।"

"তবে ভয়ই বা কেন আর এরূপ কল্পনা করবারই বা মানে কি?"

"কল্পনা নয়, এই সত্যি; পৃথিবীকে আমি যে দৃষ্টি দিয়ে দেখছি, সে দৃষ্টি কি ওর আছে, না থাকতে পারে, একি আপনি বুঝতে পারেন না?"

"নির্দিষ্ট অভিযোগ যখন নেই, তখন তুমি যা বলছ তার অর্থ আমি বুঝতে পারি না। আমি ২০ বৎসর বয়স্ক যুবককে বৃদ্ধত্বের পর্যায়ে আসতে দেখেছি, ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে যুবার মত যুদ্ধ করতে দেখেছি। আমি কাকে বলব যুবক, কাকে বলব বৃদ্ধ, বলত বোন?"

"আপনি বলবেন ৬০ বৎসরের যুবক এইত, এ আমি বিশ্বাস করি না, কারণ ওটা ৬০ বৎসরের আসল রূপ নয়, ২০ বৎসরের বৃদ্ধত্ব তেমন ডেঁপোমি, ৬০ বৎসরের যুবকের তেমনি ছেলেমানুষি।"

"তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত। তোমার কতকগুলি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে, আর......"

অধীর হয়ে রিণি বলল, "আমার উন্মুক্ত মন দাদা, তর্ক করে বোঝান, আমি নিশ্চয়ই বুঝব।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে মনীষ রিণির দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার এরূপ অধীরতার কারণ বুঝতে পারলাম না, বোন।"

রিণি লজ্জিত হয়ে বলল, "আমি আর অধীরতা প্রকাশ করব না দাদা, বলুন কি বলবেন।"

"আচ্ছা, তুমি আর কাউকে ভালবাস, কিংবা কেউ তোমাকে ভালবাসে কি?"

"কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন?"

"আপত্তি থাকলে বলবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তোমার আসল তুমিকে প্রকাশ না করলে তোমার আসল অভিযোগকে বিশ্লেষণ করব কি করে।"

রিণি চুপ করে রইল।

মনীষ বলল, "তোমার আপত্তি থাকলে থাক।"

"যদি না বলি তবে কি আমাদের এ প্রসঙ্গের আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"অন্ধকারে হাঁতিড়ে বেড়াব, মীমাংসার পথে আসা যাবে না তাই।"

"বললেই কি মীমাংসা হবে?"

"মীমাংসার পথে অন্ততঃ পক্ষে এগোনো যাবে তো।"

রিণি কোন কথা বল্লে না, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। অবিশ্রাম গতিতে গাড়ী চলেছে, রাত্রি তখন তিনটে। কিউল পার হয়েছে অনেকক্ষণ, মোকামা আসতে বাকী নেই।

রিণিকে নিরুত্তর দেখে মনীষও চুপ করে গেল। কথা বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। আর কথা নিয়ে এগোনো চলে না। নিজের কাছেই মনীষের লজ্জা বোধ হল। কেন সে এসমস্ত কথার মধ্যে গিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। কিন্তু বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন। কথা শেষ হ'ল না, সুরু হ'ল মাত্র।

ক্ষীণ কণ্ঠে রিণি বল্ল, "আপনি প্রশ্ন করুন মনীষ-দা।" "প্রশ্ন করব? দুঃখ পাবে না, লজ্জা বোধ করবে না ত?" "না পাব না, আমার বক্তব্যকে গুছিয়ে নিতেই সময় নিয়েছিলুম দাদা, আপনার কাছে লজ্জা পাব সেই আশংকায় নয়।"

"অনুমতি যখন দিচ্ছ, তখন পূর্ব প্রশ্ন বহাল রেখেই জিজ্ঞেস করছি। তুমি আর কাউকে কোন দিন ভালবেসেছ?"

"হ্যাঁ বেসেছি।"

"কে সে?"

রিণি পুনরায় নির্বাক।

মনীষ বলল, "অপরেশবাবু কি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম।"

বিস্মিত হয়ে রিণি বলল, "আগেই বুঝতে পেরেছিলেন? কি করে?"

মনীষ উত্তর এড়িয়ে গেল। বলল, "তোমাদের ভালবাসার সূত্রপাত?"

"যখন কলেজে এক সংগে পড়ি তখন থেকেই।"

"একজনকে ভালবেসে বিনয়কে ভালবাসলে কি করে?"

"অপরেশকে ভালবাসতুম কিন্তু তার রূপ কি জানতাম না। ভেবেছিলাম, এমনি তার প্রতি একটা সাধারণ আকর্ষণ, অন্তরের সংযোগ তার সাথে কম। তাই যখন বিনয়দাকে দেখলাম, তার সংগে পরিচয় হল, তখন তাকে আনন্দে বরণ করে নিলাম।"

"নিজের মনকে একবারও যাচাই করে দেখনি?"

"না দেখিনি।"

"কেন?"

"তার উত্তর পূর্বেই দিয়েছি, অন্তরের সংযোগ আছে বলে উপলব্ধি হয় নি, তাই অপরেশের কথা মনে হয় নি।"

"আজ কেন মনে হচ্ছে?"

"আজও অন্তরের সংযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু মনে প্রশ্নের উদয় হয়েছে।"

"কেমন করে?"

"বিনয়দার সংগে ব্যবহারে।"

"কোন ত্রুটি লক্ষ্য করে কি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সে ত্রুটি অন্যের কাছে ত্রুটি বলে নাও হতে পারে।"

"তবুও উদাহরণ দাও।"

"বিনয়দার কথায়বার্ত্তায়, ব্যবহারে যে সনাতনী ভাব ফুটে ওঠে, তার সংগে আমার প্রগতিশীল মন খাপ খাচ্ছে না। তাই হচ্ছে আমার প্রথম ও প্রধান অভিযোগ।

যদি তাঁর বয়স কম হ'ত তাহ'লে হয়ত তিনি এমন ভাবে সনাতনী হতে পারতেন না।"

"আরও বুঝিয়ে বল।"

"জীবনের যে কোন বস্তুর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য, আর তাঁর দিক থেকে আমার মতবাদের সংগে মিলবার ইচ্ছাও তেমন দেখতে পাই না।"

"কিন্তু তোমার দিক থেকে কোন চেষ্টা তুমি করেছ কি?"

"কিসের চেষ্টা?"

"তোমার মতবাদকে তার সংগে merge করবার।"

"তা কেন করব? আমি হচ্ছি বর্তমানের প্রতীক, আমার সংগেই তাঁর মিলতে হবে, আমিত অতীতের সংগে মিলতে পারি না।"

"আচ্ছা, বিনয়ের কথা থাক, অপরেশের কথাই জিজ্ঞেস করছি। অপরেশ এমন কিছু কারণ দর্শিয়েছেন কি, যার ফলে তুমি বুঝতে পেরেছ যে তিনি তোমার বর্তমানের সংগে তাল রেখে চলতে পারবেন?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি।"

"কি প্রমাণ?"

"সব চেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে তার বয়স। এই বয়সে সব কিছু ভেংগে চুরে নূতন করে গড়া যায়।"

"ভুল করলে রিণি, এ বয়স ভাংগা গড়ার বয়স নয়। তবু ভাঙ্গা গড়া চলে, যদি সে নিজের প্রয়োজনে ভেংগে গিয়ে গড়ে উঠে, অন্যের প্রয়োজনে যদি তাই সে করে, তবে সে হবে মেকি, তার সামর্থ্যকে সে হারিয়ে ফেলবে। রক্তে মাংসে গড়া মানুষটিকে পেলেও, তার ভিতরকার আসল মানুষটিকে তুমি কখনই ফিরে পাবে না।"

"আপনিও ভুল করছেন মনীষদা, সে আমার প্রয়োজনে নিজেকে ভাংগবে কেন? সে ভাংগবে সময়ের প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে।"

"হ'তে পারে, নাও হ'তে পারে, কিন্তু তুমি যে পিছনে আর একটি শক্তি, সে শক্তির কথাও সে ভুলতে পারবে না, অতএব অনিচ্ছাকৃত ভুলের মধ্যে সে যে জড়িয়ে পড়বে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি?"

"আপনি বলতে চান দাদা যে, অপরেশ আমাকে ভালবাসে না?"

"বড় মোটা করে কথাটা বল্লে বোন, এমনি কথা তোমার কাছ থেকে আশা করিনি। আমি বলছি না যে, অপরেশ তোমাকে ভালবাসে না, সে বাসে, কিন্তু সেটা স্বতঃস্ফূর্ত কিনা সেটাই আমি জানতে চাই।"

"নিশ্চয়ই স্বতঃস্ফূর্ত।"

"কি করে?"

"সে বলেছে, সে অনেক মেয়েকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে শুধু আমারই জন্য।"

"অনেক মেয়েকে দূরে সরিয়েছে সেটা সত্যি হতে পারে, কিন্তু তোমারই জন্য,

একথা কি তুমি নিশ্চয় করে বলতে পার? তুমি নিজে তার প্রমাণ পেয়েছ?"

"না পাইনি, তা দেখবার অবসরও আমার হয়নি, তার কথাকে অবিশ্বাস করিনি।"

"তাকে অবিশ্বাস করতে বলিনি, কিন্তু নিজের জীবনে যখন মস্তবড় দ্বন্দ্ব ও জটিলতার সমাবেশ হয়েছে তখন সব কথা যাচাই করে দেখতে বলি বোন। বিনয়ের আবির্ভাব এখানে না হ'লে, অপরেশের সমস্ত কথাগুলোকে হীরের টুকরো বলে আমি তোমার কাছে সুপারিশ করতুম। কিন্তু এখন তা করতে পারছি না।"

"তার কারণ?"

"স্বার্থের সংঘাতের কথা মনে হয় বলে।"

"আপনি কি বলছেন অপরেশের ঈর্ষা?"

"তুমি যে নাম ইচ্ছা তার দিতে পার, কিন্তু ব্যাপারটা ঐ ধরণেরই। আবার আমি বিনয়ের কথায় ফিরে যেতে চাই বোন, তুমি বলেছ তুমি বর্তমানের প্রতীক, অতীতের সঙ্গে মিলতে পার না। কিন্তু বর্তমানই কি সব? অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে কি তার কোন সংযোগই নেই? অতীতের সমস্ত গ্রন্থির মধ্য দিয়েই তুমি বর্তমানে এসেছ। আর আজ তুমি বর্তমানে ভবিষ্যতের জন্যও প্রস্তুত হচ্ছ।"

"তা হতে পারি, কিন্তু অতীতের গ্রন্থির মধ্যে পরতে পরতে ভাজে ভাজে যে অচল অবস্থার ইঙ্গিত, তারই মাঝে ত আমি বর্তমানকে পেয়েছি।"

"বিনয়ও ত তাই পেয়েছে, সেও ত অতীতের মধ্য দিয়ে বর্তমানে এসেছে।"

"তা এসেছে, কিন্তু আমার সঙ্গে বয়সের ব্যবধানে বড় বেশী ভবিষ্যতে চলে গিয়েই ত সনাতনী হয়ে পড়েছে।"

"অর্থাৎ রিএকশন হয়েছে বেশী এইত বলতে চাও?" মনীষ হেসে বলল।

"আপনি হাসবেন না দাদা, এ আমার জীবন-মরণ সমস্যা।"

"আমিও কি তাই বলছি না, আমিও তাই বলছি। তাই বলেইত এত কথার অবতারণা। আমি যা বলতে চাই, তা আমি পরিষ্কার করে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করছি বোন, মন দিয়ে শোন। অপরেশ ও বিনয় উভয়েই আমার কাছে প্রায় অপরিচিত। বিনয়ের জন্য বেদনাবোধ করেছি, অপরেশের জন্যও আমার বেদনাবোধ কম নয়। দু'জনের একজনকে তোমার হারাতে হবে, অতএব তোমার জন্যও আমার দুঃখ যথেষ্ট। কিন্তু সব কিছুর সামঞ্জস্যের প্রয়োজন তোমার দিক থেকে। তুমি যদি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পার, তবে সকলদিকেই সুখের হয়। আপাতবেদনা সুখেরই ইঙ্গিত তাতে করবে। তবে তার পূর্বে তোমাকে আর একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"বেশ করুন।"

"সঠিক জবাব চাই।"

"পাবেন, কথা দিচ্ছি।"

"তুমি কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছ?"

"না দিইনি।"

"আকারে, ইঙ্গিতে, কোনরকম ব্যবহারে বা কথাচ্ছলে?"

"না, সেদিক থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।"

"কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে কথায় মনে হয়, তুমি তাকে কিছু বুঝতে দিয়েছিলে।"

"আমার যে তাকে খুব ভাল লাগত একথা তাকে আমি বুঝতে দিয়েছি, কিন্তু মুখে বলিনি সেকথা। ভাললাগাকে ভালবাসা মনে করলে আমি কি করতে পারি বলুন।"

"বিনয় মুখ ফুটে তোমাকে কিছু বলেছে?"

"বলেছেন।"

"প্রতিবাদ করেছ?"

"করিনি, কিন্তু আমার সম্পূর্ণ সমর্থনও জানাইনি।"

"আর অপরেশের কাছে?"

"কিছুই বলিনি।"

"সে তোমাকে বলেছে?"

"বহুবার।"

"উত্তরে কি বলেছ?"

"আমি এড়িয়ে গেছি।"

"অর্থাৎ, ভবিষ্যতের জন্য শেল্‌ভ করে রেখেছ। খুব মডার্ন মেয়ে দেখছি যে," হেসে মনীষ বলল।

"আবার ঠাট্টা করছেন দাদা?"

"না না ঠাট্টা নয়।"

"আমি কি খুব অন্যায় করেছি?"

"না, খুব করোনি, তবে কিছুটা করেছ। দু'জনের মধ্যে কেউই যখন একান্তভাবে অনুপযুক্ত নয়, তখন একজনের বিরুদ্ধে বিপরীত মনোবৃত্তিগুলি নিজের মতবাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে তাকেই গ্রহণ করা তোমার উচিত ছিল এবং আর একজনকে বুঝিয়ে বল্লেই বোধহয় সবকিছু মিটে যেত। দু'জনের মধ্যে একজনও বোধহয় villain নয়, যে তোমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে তোমার জীবনকে বিষময় করে তুলবে। যাক্, তা যখন করোনি, সে স্থিতবুদ্ধির পরিচয় যখন দাওনি তখন তোমাকে কিছু কষ্ট পেতে হবে বইকি।"

"আমিত তাই করতে যাচ্ছিলাম দাদা, আমিত বিনয়দার কাছ থেকে চলেই যাচ্ছিলাম।"

"বল পালিয়ে যাচ্ছিলে, তাকে সমস্ত কথা খুলে বলে বুঝবার অবসর দাওনি, তাহ'লে তিনি হয়ত তোমার বৃহত্তর সুখের আশায় তোমাকে ছেড়ে দিতে বেদনাবোধ

করলেও, অসম্মতি জানাতেন না। সাধারণ ভালবাসার বিশ্রী একটী রূপ আছে, ছেদ পড়লেই উভয়ে উভয়ের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়; ভাবতে কষ্টবোধ হয় না যে যাকে তুমি একদিন ভালবাসতে, তার সমস্ত ত্রুটিগুলিকে মূলধন করে তাকেই আঘাত করছ।"

"কই আমিত কাউকে আঘাত করিনি।"

"একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে করেছ। যাক্ সে কথা, এখন তুমি কি করবে, সে নির্দেশ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে আরও দুই একটী কথা তোমার অবগতির জন্যই বলব। ভালবাসা বয়সের ব্যবধানের উপর নির্ভর করে না। সেদিন কাগজে পড়েছ এক দার্শনিক অশীতি বৎসর পার করেও যুবতী স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। দেহের মিলন এ নয় এ আপাতদৃষ্টিতেই বোঝা যায়, সে উদ্দেশ্য থাকলেও অন্ততঃপক্ষে খুবই ক্ষুদ্র তার স্থান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে মিলন কিসের জোরে? মানসিক level-এ, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তা স্বীকার না করলে এক মুহূর্তও সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখা যায় না। সেই level-এ দুজনে এলো কি করে? ভেবে দেখত? স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয় এরূপ মিলন অসম্ভব। কিন্তু মানসিক plane-কে যদি উন্নীত করে একটা higher plane-এ নিজেদের এনে ফেলা যায়, তবে সে plane-এ উভয়ের মিলন সম্ভব। Higher plane বলতে শুধু মানসিক নয়, উভয়ের সমগ্র জীবনের সমগ্ররূপ যেখানে সমন্বিত হতে পারে তারই ল, সা, গু হচ্ছে সেই plane. সেই plane-এ যদি উভয়ে উঠতে পার, তবে বিনয়কেও সুখী করতে পারবে, আর যদি না উঠতে পার তবে অপরেশকেও সুখী করতে পারবে না। কর্ম ও ভাবের ভেতরে মানুষের পরিচয়। স্বামীস্ত্রীর ক্ষেত্রেও plane-এর বৈপরীত্যে সম্পর্ক অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়, আবার জীবনে চলবার ছন্দ জানলে কর্ম ও ভাবের মধ্যে নিঃসম্পর্কীয় বন্ধুত্বও অত্যাশ্চর্য শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। চাই জীবনে চলবার ছন্দ, চাই জীবনে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ, জীবন আনন্দপূর্ণ হবে, ভাব ও কর্মে প্রেরণা বোধ করবে। তোমাকে আমি কি আর পরামর্শ দেব। তুমি নিজে চিন্তা করো, তাড়াতাড়ি কিছু করতে যেওনা। স্থির ও ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে সমস্ত কিছু ভেবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ো, জগৎ তোমার কাছে অতি ক্ষুদ্র হলেও কিছু আশা করে, একথা একেবারে ভুলে যেও না।"

মনীষ চুপ করল। তখন ভোর হয়ে এসেছে, সকলে এখনই উঠে পড়বে। রিণি আর একটী কথা বলল না, সে শুয়ে পড়ল, মনীষও নিজের বিছানায় আড় হয়ে গা এলিয়ে দিল। একবার মাথা তুলে চেয়ে দেখল তখনও সে আর রিণি ছাড়া প্রত্যেকটী প্রাণী গভীর নিদ্রায় অচেতন। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসের রেশটুকু মাঝে মাঝে এসে মনীষের গায়ে লাগছিল। সেও অচিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

(৪)

বীরেনের ঠেলাঠেলিতে মনীষের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে সে উঠে বসে

হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বল্ল, "ওরে বাবা এযে ৭টা বাজে, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি দেখছি।" গীতা ঠাট্টা ক'রে বল্লে, "কাল কিন্তু মনীষদা এমনি ভাবটা দেখিয়েছিলেন যে সারারাত জেগেই কাটাবেন। তা অমন ত্রিভঙ্গ হয়ে শুয়েই এই, আমাদের মত সটান ঢালা বিছানা পেলে কি জানি কি করে বসতেন।"

বীরেন বল্লে, 'কি আর এমন তিনি করতেন, "আজ রাত ১২টায় লক্ষর জংসনে তুলে দিতে হোত।"

বীণাদি মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। রাজেনবাবু মনীষের পক্ষ নিয়ে জবাব দিলেন, "তোমরাই বা এমন কি আগে উঠেছ, আধঘণ্টাও হয়নি বিছানা গুটিয়ে নিজ নিজ আসনে এসে বসেছ।"

ততক্ষণে মনীষের নিদ্রার ঘোর কেটে গিয়েছিল, দিনের আলোয় গতরাত্রির সমস্ত ঘটনা যেন মনীষের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল। মনীষ একবার রিণির দিকে তাকিয়ে দেখল। রিণি ঠিক তারই পাশে বসে আছে, বাইরে তার দৃষ্টি, হাসি ঠাট্টা, কথাবার্তা তাকে যেন কোনভাবেই নাড়া দিচ্ছিল না, এমনি তার জড়-কঠিন ভাব। রিণির পাশে গীতা, তার পাশে বীণাদি।

গীতা অপরেশের দিকে চেয়ে বল্ল, "অপরেশদা এবার বোধহয় চা'খাবার জোগাড় করতে পারা যায়, সকলেরই হাতমুখ ধোয়া সারা হয়েছে শুধু হয়নি মনীষদার।"

অপরেশের উত্তর দেবার পূর্বেই বীরেন হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্ল, "বক্সার ষ্টেশন এল বলে। কেলনারের লোক এসে চায়ের জন্য অনুরোধ জানাবে এখন।"

গীতা বল্লে, "এইখানে বসে চা খাব?"

রাজেনবাবু বল্লেন, "কেন, তাতে দোষ কি?"

অপরেশবাবু বল্লেন, "দোষ কিছু নেই, কিন্তু জায়গার অল্পতায় ভাল করে বসে চা খাওয়া যাবে না। তার চেয়ে আমি বলি কি সকলে রেঁস্তোরা কারে যাওয়া যাক।"

বীণাদি, বল্লেন, "সবাই মিলে? সে হয় না, সবাই চলে গেলাম, আর সব জিনিষ লোপাট হয়ে যাক; তা হবে না। তার চেয়ে আমি বলিকি তোমরা সবাই যাও, আমি জিনিষপত্র আগলে থাকি।"

মনীষ এতক্ষণ কথা বলেনি। সে বীণাদির দিকে তাকিয়ে বল্ল, "তার চেয়ে আপনারা সবাই যান, আমি জিনিষ রক্ষণাবেক্ষণ করি।"

রাজেনবাবু বল্লেন, "সেও কি হয়, তোমরা হচ্ছ ছেলেমানুষের দল, তোমরা সবাই যাও, আমিই জিনিষ পাহাড়া দেব।"

গীতা অসহিষ্ণু হয়ে বল্ল, "আপনারা সব বিষয়ে শুধু তর্ক করেন, স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না। বক্সার ষ্টেশনত এলো বলে, সবাই চলুন রেঁস্তোরা কারে, সহযাত্রীরা রয়েছেন ত।"

কিন্তু গীতার কথা রইল না। শেষপর্যন্ত মনীষ, বীণাদি ও রাজেনবাবু রয়ে গেলেন, আর অপরেশ রিণি, গীতা ও বীরেনবাবু চলে গেল রে'স্তোরা কারে, সাথে মনীষ অবশ্য গেল। তারা গাড়ীতে উঠে বসতেই মনীষ প্ল্যাটফর্মের কলতলায় গিয়ে মুখ হাত ভালকরে ধুয়ে নিজ কামরায় ফিরে এল। ততক্ষণে রাজেনবাবু ও বীণাদি চা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, মনীষ এসে চায়ে যোগদান করল।

[চলবে]

প্রাচীন ইরাকের পুরাণ কাহিনী

[illegible]নাথ চট্টোপাধ্যায়

দেবতাদের নিয়ে পুরাণ কাহিনী রচিত হয়েছে সকল প্রাচীন দেশে—যেমন মিশর ও সুমেরু দেশে, তেমনি গ্রীসে ও ভারতবর্ষে। পুরাণ-কাহিনী রূপকথা নয়, রূপকও নও। রূপকথার উপভোগ্য রসবস্তুটি হল অলীক কল্পনা। পুতুলের বিয়ে একটি অলীক কল্পনা মাত্র, শিশু সেই কল্পনাকেই জড়িয়ে ধরে' প্রচুর আনন্দ লাভ করে। তেমনই যখন কতকগুলি অসম্ভব ব্যাপার নিয়ে একটি কথাচিত্র অঙ্কিত ক'রে শিশুর মনের সামনে ধরা যায়, তখন সেটা হয় একটি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা যার সঙ্গে সত্য-মিথ্যার কোন সম্পর্ক নেই। পুরাণ-কথা যে রূপকথা নয় তা বোঝা যায় এই থেকে যে, পুরাণ-কথা মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরী হয় নি যেমন হয়েছে রূপকথা। তেমনি আবার রূপকও কল্পনা, ছদ্ম হলেও অলীক নয়। রূপকের মধ্যে আমরা পাই সত্যের প্রচ্ছন্ন অনুভূতিকে বোধগম্য আকারে প্রকাশ করবার প্রচেষ্টা। পুরাণের কল্পনাকে রূপকের পর্যায়ে ফেলা চলে না। রূপকের বাইরের আবরণটিকে খুলে যেমন ফেলা হল, অমনি ভিতরকার সত্যরূপের সন্ধান মেলে। অন্তর বাহির এক নয় রূপকের, বাইরে এক জিনিস ভিতরে আর একটি। পুরাণ কথা তেমন নয়—ঘরে বাইরে তার একই জিনিস, বাইরের রূপ আর ভিতরের বস্তু বলে' আলাদা দুটি পদার্থ নেই। আসলে, পৌরাণিক কল্পনাকে চিন্তাধারার প্রকৃত রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সভ্যতার শৈশবে মানব-মনে যেসব ছাপ এ'কে রেখে গেছে অভিজ্ঞতা নানারকম নৈসর্গিক অবস্থার, সেই ছাপগুলিই কল্পনার আকারে বেরিয়ে পড়েছে পুরাণ কথার মধ্যে, যেমন বেরোয় কবির কাব্যে। কল্পনাকে আশ্রয় করে কাব্য রচনা করেন কবি, তাঁর কাব্যে থাকে উচ্ছ্বসিত আবেগ ও অতিশয়োক্তি। কোন নির্জীব পদার্থকে কবি যখন 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন, তখন তিনি ভালই জানেন যে

বস্তুটির চেতনা নাই, তার প্রশস্তি একটা কল্পনা-বিলাস মাত্র। পুরাণের কল্পনা কিন্তু এ-ধরণের কল্পনা-বিলাস নয়। পুরা-রচয়িতার চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গিকে বুঝতে হলে সেই রচনার যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। জীবন-পথের কঠোর সংগ্রামের মধ্যে মানুষ তখন প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে দেখতো সজীব রূপে—তার কতগুলি মিত্রশক্তি আর কতগুলি করে মানুষের অপকার। এই শক্তিগুলির জন্ম ও জীবন-লীলা নিয়ে যে কল্পনা জেগে উঠতো তার মনে, সেই কল্পনাকে সত্যের জীবন্ত রূপ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতো না সে। তার এই কল্পনায় না ছিল দার্শনিক চিন্তার বাঁধাধরা যুক্তির গ্রন্থি, না ছিল সত্যাসত্য বিচার। নৈসর্গিক শক্তির বিচিত্র অনুভূতিগুলি তার কল্পনায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই কথারূপের আকারে ফুটে উঠতো, যেমন ফোটে রামধনু আকাশের গায়ে। রামধনু একটি নৈসর্গিক সত্য, পুরাণের কথা-রূপও ছিল তাই, কল্পনাকে রাঙিয়ে দিত, নিজেও ফুটে উঠতো সত্য হয়ে।

পুরাণ কথার যে-সংজ্ঞা এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হল, সর্বদেশের সর্বকালের পৌরাণিক কাহিনীগুলি যে এই সংজ্ঞার আওতায় পড়বে না, তা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশে পৌরাণিক যুগে যে-সব পুরাণ রচিত হয়েছিল, যেমন বিষ্ণু-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ, ভাগবত-পুরাণ—এই পুরাণগুলিকে 'মিথ' (Myth) বলা চলে না। 'মিথ'ই খাঁটি পুরাণ কথা। ভারতীয় পুরাণ-শাস্ত্রে দেবতার জীবন-লীলার বৃত্তান্তগুলি থাকলেও, মূলতঃ এই সব গ্রন্থ দর্শনতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, অধ্যাত্ম-জ্ঞানের আধার বলে মনে করা হয় পুরাণগুলিকে। অবশ্য সৃষ্টি-তত্ত্ব, সমুদ্র-মন্থন প্রভৃতি বিবরণের মধ্যে 'মিথ' বা খাঁটি পুরাণকথার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্-বেদের, উর্বশী-পুরূরবা উপাখ্যানটি কাব্য যেমন, তেমনি আবার ওটিকে 'মিথ'ও বলা যায়। ফল কথা, ভারতের পুরাণ-যুগের তত্ত্ববিচার ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যে আসল 'মিথে'র স্থান নেই, অতি প্রাচীন কালের কয়েকটি 'মিথ' তখনো টিকে ছিল মাত্র। পক্ষান্তরে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকার অধিবাসীদের কল্পনা কতগুলি সহজ আখ্যায়িকা রচনা করেছিল, মানুষের মনে আদিকাল থেকে জীবন-মরণ সম্বন্ধে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে যে-সব প্রশ্ন উঠেছে তারই জবাব স্বরূপে। সেই কথা-গুলির মধ্যে কোন দর্শনতত্ত্ব বা আধ্যাত্মিকতা নেই—আছে, বিশ্ব-রাষ্ট্র কল্পনার পটভূমিকায় বিবিধ প্রাকৃতিক দেবদেবীর লীলার মধ্যে একটুখানি মানবিক মন-স্তত্ত্বের খেলা। সহজ সরল ভাষায় বলা হয়েছে রাখাল বালক এটানার (Etana) আশ্চর্য অভিযানের কথা। তার মেষপাল যখন বন্ধ্যাত্ব দোষযুক্ত হয়ে আর শাবক প্রসব করলে না, তখন জীবনের মূল কোথায় তার সন্ধানে সে উঠেছিল আকাশপথে একটি ঈগল পক্ষীর পৃষ্ঠে চড়ে। কিন্তু তার ব্রত সফল হল না। আকাশ থেকে ঠেলে ফেলা হয়েছিল তাকে ধরণীতলে। মৃত্যু-রহস্য নিয়ে রচিত হয়েছে আর একটি কাহিনী—ধীবর আদাপার (Adapa) উপাখ্যান। দক্ষিণ-বায়ুর

অধিষ্ঠাত্রী দেবী দিলেন আদাপার নৌকাখানা উল্টিয়ে। ক্রোধান্ধ আদাপা করলেন তখন দেবীর পক্ষচ্ছেদ। আকাশদেবতা তলব করলেন আদাপাকে তাঁর দরবারে, কিন্তু ধীবর তাঁকে এমনিভাবে তোয়াজ করে খুশী করলে যে তিনি তাকে দিলেন রুটি-জল, যা খেলে মানুষ অমর হয়। সেই রুটি জল যদি খেত ধীবর তাহলে মানুষ অমরত্ব লাভ করতো। মানুষের দুর্ভাগ্য, আদাপার মনে সন্দেহ জেগেছিল—তাই রুটি জল সে খায়নি। ফলে সে নিজে ও মনুষ্য জাতি—উভয়ই অমরত্বরূপ অমূল্য নিধি হারিয়ে বসলো।

জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে একশ্রেণীর আখ্যায়িকা দেখা যায় সুমেরীয় পুরাণ-কথায়, যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, টিলমান উপাখ্যান। কাহিনীটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া গেল, তাই থেকে অকৃত্রিম পুরাণ-কথার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে।

টিলম্যান উপাখ্যানঃ জলদেবতা ও পৃথ্বীদেবীর যোগাযোগের ফলে কিরূপে বিবিধ দেব-শক্তির জন্ম হল, সেই কথা বলা হয়েছে এই কাহিনীটিতে। পারস্য উপসাগরের কূলে বাহ্রিন (Babrein) বলে যে দ্বীপ আছে তারই প্রাচীন নাম টিলমান (Tilmun)। দেবতারা যখন পৃথিবীকে বণ্টন করেছিলেন তখন এই দ্বীপটি পড়েছিল জলদেবতা এনকি (Enki) এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিন্হারসাগা (Ninhursaga)-র ভাগে। এই দুই দেবদেবীকে উদ্দেশ করেই কাহিনীটির মুখবন্ধে বলা হয়েছেঃ "দেবগণ সহ তোমরা যখন পৃথিবীকে বণ্টন করছিলে, টিলমান-দেশটি ছিল তখন শুদ্ধ নির্মল উজ্জ্বল। দাঁড়কাক ডাকতো না, মোরগও ডাকতো না। সিংহ হত্যা করতো না, নেকড়ে বাঘ মেষ শাবককে ধরতো না।......চক্ষুর ব্যাধি বলতো না আমি চোখের ব্যাধি। মাথাধরা বলতো না আমি শিররোগ। বৃদ্ধা বলতো না আমি বৃদ্ধা। বৃদ্ধও বলতো না আমি বৃদ্ধ।" এমনি যখন পৃথিবীর অবস্থা—অর্থাৎ পৃথিবীর সেই আদিকালে যখন কোন প্রাণী বা পদার্থ নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেনি, পৃথক প্রকৃতিও তাদের মধ্যে দেখা দেয়নি, যুগ-প্রভাতের সেই সন্ধিক্ষণটিতে পৃথিবী ছিল একটি ফুলের কুঁড়ির মত, ফুটি-ফুটি করছে, কিন্তু ফোটেনি। পৃথ্বী দেবীর কথামত জলদেবতা টিলমান-দ্বীপকে জলসিক্ত করলেন, তারপর পৃথ্বীদেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। তাদের জন্মালো একটি দেবকন্যা—নাম নিনসার (Ninsur) এই দেবকন্যাটি আর কেউ নয়, উদ্ভিদের চারা। নদীর জল দুকূল প্লাবিত করে নেমে যায়, তারপর জন্মায় তটভূমির ওপর উদ্ভিদ। ঠিক এই চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে পুরাণ-কথায়, একটু চিন্তা করলেই তা বেশ বোঝা যায়। জলদেবতা ছিলেন লম্পট প্রকৃতির, কন্যা নিনসারের জন্ম পর্যন্ত পৃথ্বী দেবীর সঙ্গে মিলিত থাকেন নি তিনি, পূর্বেই উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। বসন্তকালে উদ্ভিদ নেমে আসে যেমন নদীর জল-প্রান্তে তেমনি এসে দেখা দিয়েছিল একদিন উদ্ভিদের

দেবী নিনসার নদীর ঘাটে। জলদেবতা এনকি দেখলেন এই কিশোরীকে, সহস্র বাহু মেলে আলিঙ্গন করলেন তাকে। এই মিলনের ফলে উদ্ভিদ্‌দেবী জন্মদান করলেন আঁশের (Fibra) দেবীকে। আঁশের দরকার হয় কাপড় বোনার জন্য। আঁশের দেবীকে নিয়ে পূর্বের ব্যাপারের পুনরাভিনয় ঘটলো, এবং তার গর্ভে তখন জন্মালো রংএর দেবতা। রংএর প্রয়োজন হয় সুতোকে রং করতে। তারপর রংএর দেবতাকে নিয়ে যে কান্ডটি ঘটলো তার ফলে জন্মালো বস্ত্র ও বয়নের দেবী—উটু (Uttu)। এখন আর জলদেবতার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি কারু অজানা রইলো না। উটুদেবী দাবী করে বসলো জলদেবতার কাছে, তাকে বিবাহ করতে হবে। অগত্যা এনকি রাজি হলেন এবং প্রচুর উপহার এনে হাজির করলেন তার কাছে। কিন্তু সকল পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল যখন অতিরিক্ত মদ্যপান করে উটু বে-সামাল হয়ে পড়েছিল আর সেই অবস্থায় জলদেবতা তার সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন। এনকির উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে পৃথ্বীদেবীর ক্রোধের ও ঘৃণার অবধি রইলো না। জলদেবতাকে তিনি ভয়ংকর অভিশাপ দিলেন—জল যেন ভূগর্ভের অন্ধকার মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে এবং গ্রীষ্মকালে যখন নদী, নালা, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি শুকিয়ে যায় তখন যেন তার ধীরে ধীরে মৃত্যু ঘটে। এনকির ওপর এই যে কঠোর অভিসম্পাত হলো, তা দেখে সকল দেবতাই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাদের অনুরোধে পৃথ্বীদেবী জলদেবতাকে আংশিকভাবে শাপমুক্ত করে তার ঔরসে আটটি দেবতার জন্মদান করলেন। এই দেবতাদের কার্য ও স্থান নির্ণয় করে আখ্যায়িকা শেষ করা হয়েছে।

সাবলীল ছন্দে প্রাঞ্জলভাবে পৃথিবীর আদিকাল থেকে সুরু করে উদ্ভিদের জন্ম, সুতা ও বস্ত্র প্রস্তুত পর্যন্ত সব বৃত্তান্ত এই আখ্যায়িকায় বলা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্যের বস্তু আছে। পৃথিবীর আদি অবস্থায় 'দাঁড় কাক ডাকতো না', 'সিংহ নেকড়ে বাঘ হত্যা করতো না'—কথাগুলি আমরা বেশ বুঝি। কিন্তু যখন বলা হয়, 'চোখের ব্যাধি বলে না আমি চোখের রোগ', 'মাথাধরা বলে না আমি শিরোরোগ, তখনই মনে ধাঁধাঁ লাগে,—সত্যি কি এগুলি কথার কথা? না, সিংহ ব্যাঘ্রের মত ব্যাধিকেও মনে করা হত শুধু জীবন্ত পদার্থ নয়—দস্তুরমত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ যে অনুভব করতে পারে আমি অমুক রোগ। এক কথায় এই প্রশ্নের জবাব এই যে, আদিম মানব বস্তুগুলিকে দেখে 'এটা' 'ওটা' 'সেটা' বলে নয়, নিজের সঙ্গে বস্তুগুলির সম্বন্ধকে বিচার করে সে 'আমি-তুমি' ভাবে—অর্থাৎ সে নিজে যেমন একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, যাকে বলে সে 'আমি', পদার্থগুলিও তেমনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যাকে বলা যায় 'তুমি'। এমনি করে জগতের যাবতীয় পদার্থকে গ্রহণ করা হয়েছে নিতান্ত সহজভাবে। দর্শন-শাস্ত্রের বিশ্লেষণাত্মক যুক্তিতর্কের কোন স্থান নেই এইরূপ চিন্তাধারার মধ্যে।

(ক্রমশঃ)

গণতন্ত্র

রেণু মিত্র

আজকাল আমরা যারা লেখাপড়া শিখেছি বলে মনে বুঝি, তারা সাধারণতঃ মনে করি যে, গণতন্ত্র বস্তুটি নিতান্তই আধুনিক এবং তা পাশ্চাত্য থেকে আমদানী। আরও ভাবি যে, গণতন্ত্র বস্তুটি শুধুই অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক। আমরা ভারতবর্ষকে জানি না অথবা যে ঘটনাকে যেরকমভাবে জানি তা ঐ ঘটনার সবটুকু কথা নয়। ভারতবর্ষ ব্যক্তিগত মুক্তির সাধনা করেছে, এই বিশ্বজগৎ, এই বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত ঘটনাকে ডিঙিয়ে গিয়ে সে চেয়েছে আলোর থেকে অধিকতর আলোর রাজ্যে যেতে। তার আত্মসাধনার অভিযানে সে সমস্ত কিছু পেছনে রেখে এগিয়ে যেতে চেয়েছে—সেখানে কেউ নেই তার সঙ্গে, তার আগে, তার পিছে—সে একা, কেবল একা। সে রূপকে ছাড়িয়ে গেছে, রসকে ছাড়িয়ে গেছে, শব্দজগৎ অতীত হয়ে গেছে, স্পর্শজগতের বাইরে নিয়ে ফেলেছে নিজেকে—সমস্ত সংসার পেছনে পড়ে রয়েছে সাধক চলছে ব্যক্তিগত আনন্দের স্রোত বেয়ে ওপরে, আরও ওপরে—এই ছিল তার অধ্যাত্মসাধনার চরম পরিণতি। এরই আবেশ তাকে মুগ্ধ করে রেখেছে কত শত শত বৎসর। আজও এ সাধনার শেষ হয় নি।

কিন্তু এ হল ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার এক দিক। কিন্তু এই ব্যক্তিগত মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক এক চিন্তাধারা এই ভারতেরই বুকে রূপ পেয়েছিল আজ নয়, কাল নয়, কয়েক হাজার বৎসর আগেই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন-আলেখ্য শ্রীমদ্ভাগবতে একটি মনোজ্ঞ উপাখ্যান আছে।

মহারাজ রন্তিদেবের রাজ্যে দুর্ভিক্ষ—দিকে দিকে হাহাকার—মানুষ মৃত্যুর সাথে যুঝছে। মহারাজ তাঁর ধনভাণ্ডার জনসাধারণের জন্য খুলে দিয়েছেন—কিন্তু তাতেও মৃত্যু ঠেকান যাচ্ছে না। রাজ পরিবার ও রাজা নিজেও উপবাসী। উপবাসক্লিন্ন রাজাকে প্রজারা আহার এনে দিলে, বললে, মহারাজ, আপনি এই অন্ন-গ্রহণ করুন—আপনি সুস্থ হোন। প্রজাদের প্রাণপূর্ণ আবেদনের জন্য রাজা অন্ন-গ্রহণ স্থির করলেন। স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে ঐ অন্ন ভাগ করে রাজা যখন তা গ্রহণ করতে যাবেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে বললেন, মহারাজ, সপ্তাহকাল অন্ন পাই নি, অন্ন দিন। রন্তিদেব ঐ অন্ন ব্রাহ্মণকে দিলেন। এর পর আরও দুই এক জনকে বাকি আহার্য ভাগ করে দিলে জলটুকু খেতে যাবেন, তখন এক পুক্কস এসে কাতরকণ্ঠে বললে, মহারাজ জল জল। প্রজাদুঃখকাতর মহারাজ স্বয়ং পিপাসায় ম্রিয়মান হয়েও জলটুকু পুক্কসকে দিয়ে দিলেন।

তখন উপবাসক্লিষ্ট মহারাজ রন্তিদেব ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন,—

ন কাময়েঽহম গতিমীশ্বরাৎ পরাম্ অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাং অন্তঃস্থিতঃ যেন ভবত্যদুঃখাঃ॥

ম্রিয়মান মহারাজ বিশ্বেশ্বরের কাছে কি চাইলেন? তিনি বললেন, আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে অষ্টৰ্দ্ধিযুক্ত পরা গতি কামনা করি না কিংবা পুনরায় না-হওয়াও চাই না। আমি অখিলদেহভজনকারীদের আর্তির প্রপন্ন হচ্ছি—তাদের অন্তরে স্থিত হয়ে আমি যেন তাদেরকে অদুঃখ করতে পারি।

—রন্তিদেবের এই যে প্রার্থনা—এ কী অপূর্ব—এর কি তুলনা আছে? রন্তিদেব একজন সাধক, রন্তিদেব ভারতবর্ষের মানুষ। ম্রিয়মান রন্তিদেবের প্রার্থনা করা উচিত মুক্তির জন্য, ভগবানকে পাওয়ার জন্য। তেমন কিছুই তো রন্তিদেব চাইলেন না। তিনি চাইলেন মানুষের দুঃখকে নিজের বুক দিয়ে শুষে নিতে। নিজের ব্যক্তিগত মুক্তি তো তাঁর আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল না। মানুষের দুঃখকে দূর করবার আকাঙ্ক্ষা থেকে বড় গণতন্ত্র আর আছে কি? মহারাজের রাজ্যের দুর্ভিক্ষে কেবল প্রজারাই দুঃখ পায় নি, রন্তিদেব নিজেও অনাহারে ছিলেন এবং দুর্ভিক্ষের জন্য যাতনা তিনিও কম পান নি। প্রজার সঙ্গে রাজা সমভাগ্য বণ্টন করে নিয়েছে—এর চেয়ে বড় গণতন্ত্র আর কী হতে পারে? আজকের দিনে যত দেশে যত গণতন্ত্র আছে সেখানে কি প্রজার প্রতিনিধি প্রজার সঙ্গে এমনি সমভাগ্য বণ্টন করে নিয়ে যাতনা ভোগ করে?

ভারতবর্ষে শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছিল না, এ গণতন্ত্র জীবনগত। ভাগবতের ঐ কাহিনীতে রন্তিদেব দেশের রাজা হয়ে প্রজার সঙ্গে সমভাগ্য ভোগ করার পথ বেছে নিয়েছেন বলে এ অর্থনৈতিক গণতন্ত্রও বটে। আবার সাধক রন্তিদেব ম্রিয়মান অবস্থায় ব্যক্তিগত মুক্তি বা ভগবৎ সান্নিধান কামনা না করে চাইলেন সমষ্টির দুঃখমোচনের শক্তি—তাই এ আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রও বটে। ভাগবতের ভারতবর্ষ জীবনের উপাসক—তাই অধ্যাত্মতত্ত্ব আর অর্থনীতিকে তাঁরা পৃথক করে জীবন যাপন করেন নি। তাই তাঁদের জীবনের সৌন্দর্য তৃপ্তিকর।

এর পরই মনে পড়ছে বিশ্বনাগরিক প্রহ্লাদের কথা। প্রহ্লাদের প্রাণের ঠাকুর নরহরিদেব প্রহ্লাদের প্রার্থনায় স্তম্ভের মধ্যের থেকে বেরিয়ে তাঁর পিতাকে—প্রহ্লাদের ঠাকুরকে যিনি অবমাননা করেছিলেন—সেই পিতাকে সংহার করলেন। প্রহ্লাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে নরহরিদেব বললেন, প্রহ্লাদ, বর নাও। প্রহ্লাদ বলেন, ঠাকুর তোমায় পেয়েছি, কোন্ বর আর আমার প্রার্থনীয় থাকবে বল? ঠাকুর বলেন, তা হয় না প্রহ্লাদ, তুমি বর নাও। তখন প্রহ্লাদ প্রথমেই চাইলেন, পিতার মুক্তি। হোন পিতা তাঁর প্রাণের ঠাকুরের বিরোধী—অনেক নিন্দাই না-হয় তিনি করেছেন প্রহ্লাদের ঠাকুরের, প্রহ্লাদ তাঁর পূজো করে বলে সন্তান হলেও প্রহ্লাদকে মেরে ফেলবার বহু প্রয়াসও না-হয় তিনি করেছেন, তবু তাঁরই কথা প্রহ্লাদের মনে পড়ল সকলের আগে। তিনি যে পিতা, তাঁরই জন্য তো প্রহ্লাদ এ দেহের অধিকারী হয়েছেন—তাই নরহরি দেবকে বললেন, বর যদি দেবে তবে আমার যে-পিতা তোমার বিরোধী, তাঁর মুক্তি হোক—এই বর।

—এরও মধ্যে আছে গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের ধারা। যে আমার বিরোধী, যে আদর্শের বিরোধী—তার কাছে মাথা নত করে আদর্শকে খোয়াব না—তার শত অত্যাচারেও আমার আদর্শ থেকে আমার পথ থেকে বিচ্যুত হব না তথাপি তার সম্বন্ধে রাখব না এতটুকু বিদ্বেষ বিরক্তি বরং প্রীতির এতটুকুও হানি হবে না। এইটেই গণতান্ত্রিক পথ চলার ধারা।

এর পরে প্রহ্লাদ জানালেন নিজের মুক্তি তিনি চান না, তাঁর প্রার্থনা সে জন্য নয়। যতদিন পর্যন্ত একজন লোকও পড়ে থাকবে এই জগতের মধ্যে, ততদিন পর্যন্ত তাকে ফেলে নিজের মুক্তি প্রহ্লাদের কাম্য নয়। তিনি বলছেন,—

প্রায়েন দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামাঃ
মৌনং চরন্তি বিজনে নৈতে পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষে একঃ
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোহনুপশ্যে॥

—প্রহ্লাদ বলছেন, হে দেব, প্রায়ই মুনিরা স্ববিমুক্তিকামী হন; তাঁরা বিজনে মৌন আচরণ করেন। তাঁদের পরার্থনিষ্ঠা নেই। কিন্তু আমি এইসব কৃপণদের পরিত্যাগ করে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করি না।

অর্থাৎ প্রহ্লাদ কোনদিনই ব্যক্তিগত মুক্তি চান না। কোনদিন এমন হবেই না যে, এই বিশ্বের শেষ লোকটি পর্যন্ত মুক্ত হয়ে যাবে—সৃষ্টি তো তাহলে নিঃশেষ হয়ে যায়—তাই প্রহ্লাদ শেষ পর্যন্ত আছেন। আজও তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে—মুক্তিকামী প্রত্যেকটি আত্মার সঙ্গে তাঁর আত্মার আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে আছে।

কী বিচিত্র এই ভারতবর্ষ দেশটা—অবাক লাগে এ কথা ভাবতে যে, একই আকাশের নীচে বসে, একই বাতাস সেবন করে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কি বিভিন্ন চিন্তাধারা পাশাপাশি চলে আসছে। মহারাজ রন্তিদেবের মত প্রহ্লাদ বললেন, বিশ্বে একটি প্রাণকেও রেখে আমি যেতে পারব না! অথচ এরই পাশাপাশি রয়েছে ব্যক্তিগত মুক্তির চিন্তাধারা—যা সমাজের পরতে পরতে অনুস্যূত হয়ে আছে! জীবন সম্বন্ধে ওসব কত বড় গণতন্ত্র ভাবতে বিস্ময় লাগে! এ কোন বিশেষ দল, বিশেষ সম্প্রদায়, শুধু শ্রমিক বা শুধু কোন বিশেষের জন্যই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নয়—এ প্রতি মানুষের অস্তিত্বকে হৃদয়ের মধ্যে জ্বলন্ত অনুভব। এইটেই ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ ও রূপ। এ গণতন্ত্রে বিদ্বেষ নেই, বিরক্তি নেই, আক্রমণ নেই, অপরকে অভিযোগ নেই, নিজের সম্প্রদায় বা দলের মুক্তি আনতে অপরের মুক্তি কেড়ে নেবার প্রয়োজন নেই,—এতে আছে শুধু নিজের জীবনকে বাড়িয়ে নেবার প্রচেষ্টা অপর প্রত্যেকের সঙ্গে গলাগলি করে। এই-ই সত্যিকারের গণতন্ত্র।

ব্যক্তিগত মুক্তির বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ছিল বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের জন্য অথবা গোটা কয় সম্প্রদায়ের জন্য। সে মুক্তিতে কোন অধিকার নেই মুচি মেথর হাড়ি ডোমের, কোন অধিকার নেই নিম্নশ্রেণীর। তাই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা গণতন্ত্রের বিরোধী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই মুক্তিকে জনসাধারণের দুয়ারে পেঁছে দিলেন, হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলেন জনসাধারণের প্রত্যেককে সমান অধিকার দিয়ে প্রত্যেকেরই মুক্তির অধিকার ঘোষণা করলেন। ঘরে ঘরে স্থান পেল শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আর তুলসী মঞ্চ। সকলেই নিজেকে দেখতে পেলে একটি আত্মসম্মানের মুক্তির মধ্যে। বর্ণাশ্রমশাসিত ও পরিত্যক্ত জনসাধারণকে যিনি আত্মসম্মানের মুক্তি এনে দিলেন, তিনি কত বড় গণতন্ত্রের সংস্থাপক সে কথা কি আমরা ভেবে দেখি? গণতন্ত্রের জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে কিংবা বিদেশীর রকম করে এদেশে গণতন্ত্র চালাবার চেষ্টা না করে আমরা যদি ভারতীয় গণতন্ত্রের রূপ ও স্বরূপটাকে চিনে নিয়ে তাকে জাতীয় জীবনে গ্রহণ করতে পারতাম তা হলে অপরের শোষণ থেকে আমরা যেমন মুক্তি পেতাম, অপরকে শোষণ করবার নিজের মনোবৃত্তি থেকেও মুক্তি পেতাম।

যুগাবতার শ্রীনিত্যগোপাল এই গণতন্ত্রের দর্শন সংস্থাপন করে লিখলেন, 'আমি বিশ্বনাগরিক'। ব্যক্তি ও বিশ্বকে পরস্পরবিরোধী না করে এমন এক বিশ্ববোধের মধ্যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে স্থাপন করা যায় যেখানেই গণতন্ত্রের সত্যিকারের সার্থকতা। সংখ্যার আধিক্য দিয়ে গণতন্ত্র হয় না—দেশের মধ্যের প্রতিটি প্রাণসত্তার স্বতন্ত্র মান ও মর্যাদা স্বীকার করে প্রত্যেকের স্বরাট হওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে আছে গণতন্ত্র। নিজের অন্তর্নিহিত দীপ্তি-দ্বারা যিনি বিরাজ করতে পারেন, তিনিই স্বরাট। প্রত্যেকেরই অন্তরে আছে আলো —সেই আলোকে, সেই দীপ্তিকে প্রত্যেকেই ফুটিয়ে তুলবে—তাইতেই হবে তার পরিচয়—সেইটেই হবে গণতন্ত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ এই দরিদ্র জনগণের সেবাকেই ধর্ম বলে বলে গেছেন। তিনি বলছেন, 'আমি যেন বারম্বার জন্মগ্রহণ করি, জন্মে জন্মে অনন্ত দুঃখ ভোগ করি, যদি আমি একমাত্র ঈশ্বর, যে ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি, সেই সর্বভূতে বিরাজিত আত্মাকে সকলের মধ্যে পূজা করিতে পারি। সর্বোপরি আমার ঈশ্বর দুশ্চরিত্র, রুগ্ন, অপমানিত সর্বদেশে সর্বজাতির দরিদ্র।'

এমনই যদি হয় ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ ও রূপ তাহালে কম্যুনিজমের প্রয়োজন কি?

এ প্রশ্ন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বই কি। এতই যদি ভারতের বুকের মধ্যেই ছিল, তবে আজ কম্যুনিজম আসেই বা কেন আর তার সম্বন্ধে আমাদের শংকিত বা চিন্তিত হবারই বা প্রয়োজন কি?

শংকিত বা চিন্তিত হবার কারণও তো ঘটেছে—দেশের মধ্যে কম্যুনিজমের অনুপ্রবেশ, জনসাধারণের চিত্তবৃত্তির উচ্ছৃংখল আত্মপ্রকাশ তো দিকে দিকে স্পষ্ট।

কম্যুনিজম কোন ছিদ্রপথে প্রবেশ করল তাহলে? সে ছিদ্র আমাদের সমাজদেহে স্পষ্ট। সে ছিদ্র প্রচলিত বর্ণাশ্রমের। প্রাণধর্মের এমন একটি ধারা সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে চলে আসলেও, এত বড় বড় ব্যক্তিত্ব ভারতের জনগণের আত্মাকে

নিজ প্রাণে অনুভব করলেও ভারতীয় প্রচলিত বর্ণাশ্রমের যে অত্যাচার জনসাধারণের আত্মাকে অস্বীকার করে আসছিল, সেই ফাটল দিয়ে প্রবেশ করল বিদেশী কম্যুনিজ ভারতের বুকে। গুণ ও কর্ম কৌলীন্য ব্যবস্থা যেদিন থেকে ভারতের সমাজদেহে স্থান পেয়েছে, সেদিন থেকে গণ-আত্মা পদে পদে যে অপমান ও অস্বীকৃতি ভোগ করে আসছে তারই বেদনায় পীড়িত হয় রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী উচ্চারণ করে লিখলেন,

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।

* * *

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।

গুণ ও কর্ম কৌলীন্যময় যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা—তাতে গণ-আত্মার স্বীকৃতি নেই; সম্মান নেই—তাই যে-কম্যুনিজম এই গণ-আত্মাকে স্বীকৃতি দিতে চাইল, সেই কম্যুনিজম সেখানে প্রবেশ করতে চাইবে—এতে আর আশ্চর্য কি? শ্রীকৃষ্ণ গুণ ও কর্ম বিভাগের কথাই গীতাতে বলেছিলেন, কিন্তু এ কথা কোনমতেই বলেননি যে এই গুণ ও কর্মের মধ্যে কোনোটা কুলীন ও কোনোটা হেয়। কিন্তু ঋষি-সংস্থাপিত বর্ণাশ্রম সত্ত্বগুণকে কুলীন করে পরপর তমোগুণকে একেবারে অকুলীন করে রেখেছে। গুণ ও কর্ম যদি কুলীন ও অকুলীন হয়, তাহলে সেই গুণ ও কর্মের অধিকারী যারা তারাও কুলীন ও অকুলীন হয়ে পড়েছে। তাই কেউ দেবত্বের সম্মান পেয়েছে, কারো ভাগ্যে মানুষ নামের সাধারণ সম্মানটুকুও লাভ হয়নি। সে অসম্মান যে কি নিবিড়, আর কি হৃদয়বিদারক, আমরা আহম্মক বলেই তা ভুলে যাই।

কাজেই যে ফাটল ছিল, সে ফাটল আজ বন্ধ করতে হবে, আর যে গণতন্ত্রের সামগ্রিকতা ভারতের বুকে অনেক মহাপ্রাণের মধ্য দিয়ে এসে ছড়িয়ে আছে আকাশে-বাতাসে, তাকেই আজ সংগ্রথিত করে সমাজ দেহে সংস্থাপিত করতে হবে। ভারতীয় এই গণতন্ত্রে, আগেই বলেছি, প্রত্যেকের আত্মবিকাশের মধ্যে দিয়ে সকলের প্রাণ-খোলা স্বীকৃতি আছে—কিন্তু নেই এক দলকে স্বীকার করে অপর দলকে দমন করবার মনোবৃত্তি। আজ এই সামগ্রিক গণতন্ত্র ভারতবর্ষ নিজ দেহে সংস্থাপন করুক, বিশ্বের দরবারেও পৌঁছিয়ে দিক—ভারতআত্মার কাছে এইটেই আজ সকলের দাবী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

(পূর্বানুবৃত্তি)

সংকল্প-প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ৬।২৪

(কোন্ ক্রম অবলম্বনে যোগ করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন) সংকল্প-প্রভবান্ [সংকল্পের (ক্রতু) প্রভব (উৎপত্তি) যাহা হইতে; যথাকামো ভবতি তৎ ক্রতুঃ ভবতি—শ্রুতি] কামান্ [কামসমূহকে] ত্যক্ত্বা [ত্যাগ করিয়া] সর্ব্বান্ অশেষতঃ [নিঃশেষে; পুরুষোত্তমস্তরে আসীন হইলে, পুরুষোত্তম সংকল্প-সন্ন্যাসী না হইলে, অশেষতঃ কাম-ত্যাগ হয় না] মনসা এব [পুরুষোত্তমার্পিত মনদ্বারা] ইন্দ্রিয় গ্রামং [ইন্দ্রিয়-সমূহ] বিনিয়ম্য [নিয়মন করিয়া] সমন্ততঃ [সকল প্রকারে]।

সংকল্পের উৎপত্তি স্থল ঐ কামসমূহকে অশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদয়কে সকল প্রকারে নিয়মিত করিয়া। ৬।২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ৬।২৫

(কাম-ত্যাগ দ্বারা ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করিলেও যদি প্রাক্তন কর্ম্ম-সংস্কার দ্বারা মন বিচলিত হয়, তবে ধারণা দ্বারা স্থির করিবে, ইহাই বলিতেছেন) শনৈঃ শনৈঃ [ধীরে ধীরে, সহসা নয়, প্রকৃতির উপর কোনও চাপ দিয়া সংক্ষেপে কার্য হাসিল করিবার মত হটকারিতা অবলম্বন করিয়া নয়] উপরমেৎ [উপরতি অবলম্বন করিবে]। (কিসের দ্বারা?) বুদ্ধ্যা [বুদ্ধি দ্বারা] (কিরূপ বুদ্ধি দ্বারা?) ধৃতিগৃহীতয়া [প্রাণ-প্রজ্ঞা সমন্বয়ের ফল স্বরূপ ধৈর্য্যদ্বারা গৃহীত (যুক্ত)] আত্মসংস্থম্ [পুরুষোত্তম-আত্মাতে এই যা-কিছু সর্ব্ব সম্যক্‌রূপে স্থিত, অর্থাৎ তিনি ছাড়া আর কিছু নয়—এইরূপ ভাবনাযুক্ত] মনঃ কৃত্বা [মনকে গড়িয়া তুলিয়া]। (পুরুষোত্তম-আত্মা ব্যতীত তাঁহার বাহিরে) ন কিঞ্চিৎ অপি [আর কিছুই] ন চিন্তয়েৎ [চিন্তা করিবে না]।

ধীরে ধীরে ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে উপরতি অবলম্বন করিবে; মনকে আত্মসংস্থ করিয়া অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। ৬।২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ৬।২৬

(দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের মধ্যে অন্য-বুদ্ধি, মিথ্যা জ্ঞান থাকার ফলে রজোগুণের বশে যদি মন চঞ্চল হয়, তাহা হইলে কি করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন) যতঃ যতঃ [যে যে বিষয়রূপ নিমিত্তের বশে] নিশ্চরতি [নির্গত হয়, ছুটিয়া থাকে] মনঃ চঞ্চলং [স্বভাব চঞ্চল] অস্থিরং [বার্য্যমান হইলেও অস্থির] ততঃ ততঃ [সেই সেই বিষয় হইতে] নিয়ম্য [বিষয়ে পুরুষোত্তম বুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক ধর্ষণময় ভোগলালসার চাপ হইতে

বিষয়কে মুক্ত করিয়া, ভোগলালসা হইতে গুটাইয়া আনিয়া] এতৎ [এই মনকে] আত্মনি এব [নিজ পুরুষোত্তমেই] বশং নয়েৎ [বশীভূত করিবে]।

স্বভাব-চঞ্চল অস্থির মন যে যে বিষয়রূপ নিমিত্তের বশে ছুটিয়া যায়, সেই সেই বিষয় হইতে গুটাইয়া আসিয়া মনকে আত্মাতে বশীভূত করিবে। ৬।২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ৬।২৭

(এইরূপ প্রত্যাহারাদিদ্বারা মনকে পুনঃ পুনঃ বশীভূত করার ফলে রজোগুণের ক্ষয় হইলে যোগ সুখ-প্রাপ্তি হয়—ইহাই বলিতেছেন) প্রশান্তমনসং [কেবল ইন্দ্রিয় এবং কেবল মনের নিরবদ্য সংযোগ প্রতিষ্ঠার ফলে প্রশান্ত অর্থাৎ সংঘর্ষ মুক্ত হইয়াছে মন যাহার, এমন] হি [নিশ্চয়ই] এবং [এই] যোগিনং [যোগীকে] সুখম্ অত্যন্তং [নির্ম্মল নিরতিশয় সুখ] উপৈতি [আশ্রয় করে]। (কিরূপ যোগীকে?) শান্ত-রজসং [শান্ত হইয়াছে সত্ত্ব ও তমকে দাবাইয়া রাখিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল রজোগুণের বৃত্তি যাহার] (অতএব) ব্রহ্মভূতং [দেহ হইতে আত্মা পর্য্যন্ত সবটুকু লইয়াই ব্রহ্ম বনিয়া গিয়াছেন যিনি, তাঁহাকে] (আর কিরূপ?) অকল্মষম্ [ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ প্রবৃত্তি-বর্জ্জিত]।

প্রশান্তমন, শান্ত-রজোবৃত্তি নিষ্পাপ, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দৃষ্টিযুক্ত এই যোগীকে পরম সুখ আশ্রয় করে। ৬।২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ৬।২৮

(তাহার পর কৃতার্থ হন্—ইহাই বলিতেছেন) যুঞ্জন্ [পরমাত্মাতে যুক্ত করিতে করিতে] এবং [যথোক্তক্রমে] সদা আত্মানং [নিজের বলিতে দেহ-ইন্দ্রিয়াদি যত সব আছে, কাহাকেও বাদ না দিয়া] যোগী [যোগান্তরায় বর্জ্জিত যোগী] বিগতকল্মষঃ [বিগত হইয়াছে দ্বন্দ্ব পাপ রূপ কল্মষ যাহার, সে] সুখেন [অনায়াসে, সকল ক্ষেত্রে বাধা রহিত হইয়া] ব্রহ্মসংস্পর্শম্ [ব্রহ্ম-পুরুষোত্তম সম্বন্ধীয় মিথ্যাজ্ঞান-নিবর্ত্তক দিব্যজ্ঞানের সম্যক্‌স্পর্শ আছে যাহাতে, এমন] অত্যন্তম্ [অন্তকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান, এমন দিব্য, পূর্ণ] সুখম্ [আনন্দ] অশ্নুতে [লাভ করেন]।

এই প্রকারে সর্ব্বদা দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি নিজের সবটুকুকে পুরুষোত্তমে যুক্ত করিয়া, বিগতপাপ হইয়া যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শময় দিব্য আনন্দ লাভ করেন। ৬।২৮

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬।২৯

(ব্রহ্মসংস্পর্শের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন) সর্ব্বভূতস্থং [সর্ব্বভূত রূপ আধারে স্থিত; এখানে 'সর্ব্বভূত' অধিকরণ কারকে প্রযুক্ত হইয়াছে] আত্মানং [কর্ত্তার ঈপ্সিততম কর্ম্ম ঐ আত্মাকে; 'আত্মা' কর্ম্মকারকে প্রযুক্ত হইয়াছে] সর্ব্বভূতানি

চ [এবং কর্ত্তার ঈপ্সিততম সর্ব্বভূতকে; এখানে 'সর্ব্বভূত' কর্ম্মকারক] আত্মনি [আধার স্থানীয় আত্মার; এখানে 'আত্মা' অধিকরণ কারকে প্রযুক্ত। এইভাবে পরস্পরকে পরস্পরের সমানভাবে অধিকরণ রূপে স্থাপন করিয়া সামানাধিকরণ-রূপ ব্যাপ্তি অর্থাৎ উপাধিবিধুর সহজ সম্বন্ধে আত্মা ও সর্ব্বভূতকে] ঈক্ষতে [দর্শন করেন; সর্ব্বভূতে আত্ম দর্শন হইতেছে কৈবল্য দর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন হইতেছে লীলা দর্শন। একান্ত আত্মাও উপাধি, একান্ত সর্ব্বভূতও উপাধি। দুইয়ের সমন্বয়ই নিরুপাধি। ঈপ্সিততম কর্ম্ম-হিসাবেও দুই-ই সম] যোগযুক্তাত্মা [আত্মা-সর্ব্বভূতে সমত্ব দর্শন রূপ যোগে যুক্ত যাহার আত্মা, তিনি] (অতএব) সর্ব্বত্র [ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত বিষম সর্ব্বভূতে] সম দর্শনঃ [সম হইয়াছে দর্শন যাহার, প্রতি বিশেষত্বটীর মাঝে স্বয়ম্পূর্ণ 'সম' ব্রহ্ম দর্শন, এবং বিশেষগুলির মধ্যে প্রত্যেকের সংগে প্রত্যেকের এবং পুরুষোত্তমের সংগে প্রত্যেকের সম সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-দর্শন যাহার লাভ হইয়াছে, তিনি সমদর্শন; ঐ পুরুষোত্তম-দর্শনের বাহিরে একান্ত আত্মদর্শন ছায়াদর্শন, একান্ত সর্ব্বভূত দর্শনও ছায়াদর্শন; আত্মদর্শন ও সর্ব্বভূত দর্শনের সমন্বিত পুরুষোত্তম-দর্শনই সত্য বাস্তব সচ্চিদানন্দঘন দর্শন]।

যোগযুক্তাত্মা যোগী সর্ব্ব বস্তুতে সমদর্শন লাভ করিয়া সর্ব্বভূতে স্থিত আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিয়া থাকেন। ৬।২৯

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৬।৩০

(এইবার পুরুষোত্তম 'আমি'র সংগে 'বর্ত্তমান' ভাষায় আত্ম-সর্ব্বভূতের সমানাধিকরণময় ব্যাপ্তি দর্শন ও তাহার ফল প্রদর্শন করিতেছেন) যঃ [যিনি] মাং [চোখের সামনে দাঁড়ানো সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ, ঈপ্সিততম পুরুষোত্তম আমিকে; এখানে 'মাং' পদটী কর্ম্মকারক] পশ্যতি [দেখেন] (কোন্ আধারে দর্শন করেন?) সর্ব্বত্র [সর্ব্বভূতে; সর্ব্বভূত এখানে অধিকরণ কারকে প্রযুক্ত] সর্ব্বং চ [এবং ঈপ্সিততম সর্ব্বভূতকে; এখানে 'সর্ব্বম্' কর্ম্ম কারকে প্রযুক্ত] ময়ি [আধার স্থানীয় আমাতে; এখানে 'অহম্' অধিকরণ কারকে প্রযুক্ত] পশ্যতি [দর্শন করেন; 'সর্ব্বে আমি এবং আমিতে সর্ব্ব'—এই সামানাধিকরণময় ব্যাপ্তি দর্শন করেন এবং ঈপ্সিততম হিসাবে আমি ও সর্ব্বের সম দর্শন দর্শন করেন; দুই-ই যাহার জীবনে সমান-অধিকরণ, সমান-কর্ম্ম] তস্য [এইরূপ সমদর্শী পুরুষের নিকট] অহম্ [তত্ত্বরূপে অহম্] ন প্রণশ্যামি [পরোক্ষতা প্রাপ্ত হই না] সঃ চ [এবং সে তত্ত্বস্বরূপে] মে [আমার কাছে] ন প্রণশ্যতি [পরোক্ষীভূত হন না; যিনি অহম্ ও সর্ব্বকে সমান-অধিকরণকারক রূপে দর্শন করেন, তিনি আমার ভিতর নির্ব্বাণ লাভ করিয়াও পুরুষোত্তম 'আমি'র কাছে প্রত্যক্ষ থাকেন, পক্ষান্তরে আমি তাঁহার ভিতর আত্মগোপন করিয়াও আমি তাঁহার কাছে হারাইয়া যাই না, সদা প্রত্যক্ষই থাকি। ভক্ত-ভগবান দুই-ই দুইয়ের ভিতর হারাইয়া, তত্ত্বে আবার পরস্পরকে ফিরাইয়া পাইয়া, দুইয়ে এক হইয়াও দুই রূপে

থাকেন—'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ'—আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাকরণ না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে নিরাকরণ না করেন]।

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন, এবং সর্ব্বকে আমাতে দেখেন, আমি তাহার নিকট অদৃষ্ট হই না, তিনিও আমার নিকট অদৃষ্ট হন না। ৬।৩০

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৬।৩১

(এবম্ভূত পুরুষ যে বিধির কিংকর না হইয়াও পুরুষোত্তমেই বর্ত্তমান থাকেন—'চরেদবিধিগোচর'—ভাগবত, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন) সর্ব্বভূতস্থম্ [সর্ব্বভূতে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে, সমানাধিকরণ রূপ ব্যাপ্তি-যোগে অবস্থিত] যঃ [যে জন] মাং [পুরুষোত্তম-'অহম্'কে] ভজতি [ভজনা করেন]একত্বম্ [এক-বহুর অতীত একের ভাবকে। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন—'আমাদের বিবেচনায় শ্রীভগবান্ এক ও বহুর অতীতও বটেন। পুরুষোত্তমের বাহিরে একও বিকল্প, বহুও বিকল্প; পুরুষোত্তমে একও নির্ব্বিকল্প, বহুও নির্ব্বিকল্প] আস্থিতঃ [আশ্রিত] সর্ব্বথা [সর্ব্ব-প্রকারে] বর্ত্তমানঃ অপি [অবিধিগোচরভাবে বিচরণ করিয়াও প্রকৃতির সকল অংগে সকল স্তরে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াও] সঃ [সম্যক্‌দর্শী] যোগী ময়ি বর্ত্ততে [আমাতে বর্ত্তমান থাকেন; প্রকৃতির সকল অংগ স্পর্শ করিলেও অনংগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কেন না, আমি আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়, অহম্-সর্ব্ব-সমন্বয়, প্রকৃতি-পুরুষ সমন্বয়]।

সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে যে ব্যক্তি একত্বের আশ্রয় করিয়া ভজনা করে, সে যোগী প্রকৃতির যে-কোনও স্তরে বর্ত্তমান থাকিয়াও আমাতে বর্ত্তমান থাকে। ৬।৩১

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২

(এইরূপে আমাকে ভজনকারী যোগিগণের মধ্যে সর্ব্বভূতানুগামীই শ্রেষ্ঠ, তাহাই বলিতেছেন) আত্মৌপম্যেন [পুরুষোত্তম-আত্মার উপমা দিয়া দিয়া; উপমাই ঔপম্য; যিনি আত্মা অথচ ঔপম্য, তিনিই আত্মৌপম্য। তেমন আত্মৌপম্য দ্বারা; ভাগবত পুরুষোত্তমের উপমা দিয়াই শরৎ বর্ণনা করিতেছেন—ব্যোম্নাব্দং ভূতশাবল্যম্ ভুবঃ পংকমপাং মলম্॥ শরজ্জহার আশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাশুভম্॥—কৃষ্ণভক্তি যেমন আশ্রমীদের মল দূর করেন, ঠিক সেইরূপ শরৎকাল আকাশের মেঘ, বর্ষাকালে ভূত সকলের জড়াইয়া থাকা, পৃথিবীর কর্দ্দম, জলের মল হরণ করিয়াছে। যাহা দৃষ্ট, তাহা দ্বারাই অদৃষ্টের উপমা দেওয়া হয়। ভাগবতের দৃষ্টিতে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণভক্তির সাহায্যে আশ্রমের মল দূর করিবার শক্তিই সাক্ষাৎ, উপমেয়; প্রকৃতি তাহার পরোক্ষ উপমেয়। ইহাই পুরুষোত্তম দর্শনের বৈশিষ্ট্য। পুরুষোত্তম যোগসূত্রেই 'সর্ব'কে আস্বাদন করিতে হইবে; পুরুষোত্তম সূত্রের বাহিরে কাহারও সংগে কাহারও কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই] সর্ব্বত্র [সর্ব্বভূতে] সমং পশ্যন্তি [সমদর্শন

করেন] যঃ [যিনি] হে অর্জ্জুন। (পুরুষোত্তম-উপমায় দেখিলেই সত্য বাস্তব রূপে দেখা যাইবে কাহার কোথায় স্থান, কতটুকু তাঁহার মর্য্যাদা, কাহার দ্বারা কি প্রয়োজন বিশ্বের ও বিশ্বেশ্বরের সাধিত হইবে। পুরুষোত্তমের সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ সম সাক্ষাৎ হওয়ায় প্রত্যেকের স্থান কেবল, অন্য-সাপেক্ষ নয়। পুরুষোত্তম-হৃদয়ে যে স্থান তিনি অধিকার করিয়া আছেন, সে স্থানের অধিকারী তিনিই কেবল। প্রত্যেকেই পুরুষোত্তম-হৃদয়ে পুরুষোত্তমেরই মত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—'ন তৎ সমঃ অধিকশ্চ দৃশ্যতে'—তাঁহার স্থান তাঁহারই, তাঁহার মর্য্যাদা তাঁহারই, তাঁহার সহিত পুরুষোত্তমের যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহাও তাঁহারই। এইভাবে দর্শনের ফলে সর্ব্বভূতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভক্তি-আদর-সোহাগ গঙ্গাধারার মত প্রবাহিত হইয়া বিশ্বকে আপ্লাবিত করে। এইরূপে পুরুষোত্তমের মাপকাঠিতে সব মাপিবার কৌশল শিখিয়াছেন যিনি, তাহার জীবনে) সুখং বা যদি বা দুঃখং [যিনি সুখ বা দুঃখকে 'সম' রূপে দেখেন অর্থাৎ নিজের সুখকে বিশ্বসুখের সঙ্গে এক করিয়া জীবনের ভাবুকতা বাড়াইবার উপযোগীরূপে এবং নিজের দুঃখকে বিশ্বের দুঃখে পরিণত করিয়া জীবনের রসের দিকটাকে বাড়াইবার সমান উপযোগীরূপে দেখেন] সঃ যোগী পরমঃ মতঃ [সেই যোগী বলিয়া আমার অভিমত] কেন না ইনিই বিশ্বকে পুরুষোত্তম ছাচে গড়িয়া তুলিবার মত শক্তির অধিকারী হইয়াছেন]।

হে অর্জ্জুন, পুরুষোত্তম-আত্মার উপমা দ্বারা যিনি সর্ব্বভূতের সুখ বা দুঃখকে সম দর্শন করেন, সেই যোগীই পরম যোগী বলিয়া অভিমত। ৬।৩২

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৬।৩৩

(উক্ত-লক্ষণ যোগকে অসম্ভব মনে করিয়া) অর্জ্জুনঃ উবাচ [অর্জ্জুন বলিলেন] যঃ অয়ম্ [এই যে] যোগঃ ত্বয়া [তোমা দ্বারা] উক্তঃ [বলা হইল] সাম্যেন [সাম্যরূপে]; হে মধুসূদন এতস্য [এই যোগের] অহং ন পশ্যামি [আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না] চঞ্চলত্বাৎ [মনের চঞ্চলতা বশতঃ] স্থিরং [অচলা] স্থিতিম্ [মর্য্যাদা]।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন, তুমি এই যে সাম্যরূপ যোগের উপদেশ দিলে, মনের চঞ্চলতা বশতঃ আমি ইহার স্থির মর্য্যাদা দেখিতে পাইতেছি না। ৬।৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৬।৩৪

(পূর্ব্ব শ্লোকার্থই পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন) হি [যেহেতু] চঞ্চলং মনঃ [মন সদা চঞ্চল] হে কৃষ্ণ-ব্রহ্ম; "কৃষতের্বিলেখনার্থস্য রূপং ভক্তজন পাপাদিদোষা কর্ষণাৎ কৃষ্ণঃ" শঙ্কর] প্রমাথি [প্রমথনশীল, দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকর—যাহা শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রকৃষ্টরূপে মন্থন করে, বিক্ষিপ্ত করে ও পরবশ করে] বলবৎ [যাহাকে বিচার দ্বারা জয় করা অসম্ভব] দৃঢ়ম্ [স্বকার্য্য-সাধনে দৃঢ়] তস্য [এবম্ভূত মনের] অহম্ নিগ্রহং [নিরোধ] মন্যে [মনে করি] বায়ুঃইব [বায়ুকে নিগ্রহ করা যেরূপ দুষ্কর

সেইরূপ] সুদুষ্করম্ [অতিশয় দুষ্কর]।

হে কৃষ্ণ, যেহেতু মন চঞ্চল, শরীরেন্দ্রিয়ের বিক্ষোভক, সবল ও দৃঢ়, আমি বায়ুর ন্যায় ইহার নিগ্রহ সুদুষ্কর মনে করি। ৬।৩৪

শ্রীভগবান্ উবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৬।৩৫

অসংশয়ং [তুমি মন সবন্ধে যাহা বলিয়াছ, তাহা নিঃসন্দেহে সত্য] হে মহাবাহো; মনঃ দুর্নিগ্রহম্ চলম্ [মন দুর্নিগ্রহ এবং চঞ্চল]; (কিন্তু) অভ্যাসঃ ['অভ্যাসঃ নাম চিত্তভূমৌ কস্যাঞ্চিৎ সমানপ্রত্যয়াবৃত্তিশ্চিত্তস্য'—শঙ্কর। যে কোনও চিত্ত ভূমিতে সমান জাতীয় বৃত্তির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিই অভ্যাস: মন যখন মনোমোহন মদন-মোহনের নাম-রূপ-গুণ-লীলার মধ্যে সমান জাতীয় মননবৃত্তির স্ফুরণ করিয়া নিজের মধ্যে তাঁহাকে এবং তাঁহার মধ্যে নিজকে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত করে, তখনই হয় মনের অভ্যাস সাধনা। ভাগবতী লীলা জীবের দেহ হইতে আত্মা পর্য্যন্ত সবটুকুরই সমজাতীয়] বৈরাগ্যেণ চ [এবং পুরুষোত্তমে বিশেষ রূপে রাগই বিরাগ; বিরাগই বৈরাগ্য। পুরুষোত্তমে যাহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে নাই, রাগ দ্বেষের স্তরে তাঁহার বীতরাগ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। শ্রীভগবানে অনুরাগ হইলেই মনের সঙ্গে বিষয়ের সাক্ষাৎ যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়; বিষয়ের সঙ্গে তাহার সংযোগ হয় পুরুষোত্তমের মধ্যবর্ত্তিতায়। সেই সংযোগের মাঝে বিষয় সংযোগের মূলীভূত কারণ মিথ্যাজ্ঞান আপনা আপনি দূরীভূত হয়। তখন বিষয় হয় প্রসাদে পরিণত; তখন সেই বিষয়-সংযোগ নিরবদ্য নির্ম্মল সংযোগ হওয়ায় তাহা আর বন্ধনের হেতু হয় না। সর্ব্বেন্দ্রিয় তাহাদের ভরপেট খাদ্য সেখানে পায়, অথচ তাহা দিব্য জ্ঞানেরই ঘন আস্বাদন। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি রণ্যত্র ত্রিকঃ এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুঃ তুষ্টিঃ পুষ্টি ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্"॥ ভক্তি, পরেশানুভব ও অন্যত্র বিরক্তি—এই তিনটী শরণাগতের এককালেই হয়, যেমন ভোজন পানীয় একই সময়ে তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি আনে। ক্ষুন্নিবৃত্তিই হইতেছে বৈরাগ্য স্থানীয়। যখন পুরুষোত্তমার্পিত মনের ক্ষুধা পুরুষোত্তমে মিটিয়া যায়, তখনই হয় তাহার দ্বন্দ্ব-পাপবিদ্ধ রাগদ্বেষস্তরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের বিয়োগ—ইহাই বৈরাগ্যের অর্থ।] গৃহ্যতে [পুরুষোত্তমে মরিয়া-বাঁচিয়া নিজকে সর্ব্বতোভাবে হারাইয়া ও পাইয়া নিশ্চিতরূপে, নিশ্চিন্তরূপে অনায়াসে, বিনা বল প্রয়োগে মন বশীভূত হয়]।

শ্রীভগবান বলিলেন হে মহাবাহো, মন যে চঞ্চল ও দুর্নিগ্রহ, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। ৬।৩৫

[ক্রমশঃ]

পুস্তক পরিচয়

সাধনা—শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে শ্রীঅমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত) ১৩৫৯। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব মাননীয় বিচারপতি স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম বি, বি এল, মহাশয় লিখিত অবতরণিকা সম্বলিত। মূল্য তিন টাকা।

নাম দেখিয়া ঠিক বুঝা যাইবে না বইটি কিসের। 'সাধনা' সাধনের সহচর—'প্রধানতঃ একখানি স্তোত্র এবং ধর্ম-সঙ্গীতের সঙ্কলন গ্রন্থ।' বইটিতে প্রাচীন ভারতের বৈদিক মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক নানাবিধ গানও সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাতটি উপনিষদ হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। গীতা ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত ও চৈতন্য-চরিতামৃতকে পুরাণ নামক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। স্তোত্রাবলী অধ্যায়ে নানা দেবদেবীর স্তোত্র আছে। সঙ্গীতমালা অধ্যায়ে বাণীবন্দনা, আগমনী, শ্যামা সঙ্গীত, হিন্দী ভজন, জাতীয় সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতও আছে।

বইটিতে কি কি আছে তাহার যে সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতেই ইহার উপযোগিতা স্পষ্ট হইবে। হাতের কাছে এত বিভিন্ন ও প্রয়োজনীয় মন্ত্র, শ্লোক, স্তোত্র, সঙ্গীত এক সঙ্গে পাওয়া বিশেষ সুবিধা-জনক হইয়াছে। যে যে-ভাবের উপাসকই হোন না কেন, বেদ উপনিষদ গীতা ভাগবত এবং রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক অন্যান্য ভক্ত-প্রাণের গাণগুলি সকলের পক্ষেই কোন না কোন সময়ে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। 'সাধনা' সে সময়ে আমাদের বিশেষ কাজে আসিবে। আমরা আশা করি বইটি রসজ্ঞ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আদৃত হইবে।

সাময়িকী

২৬শে জানুয়ারীর সংকল্প ঃ

একদিন কংগ্রেস ২৬শে জানুয়ারী 'ভারত মুক্ত' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। সেই মুক্তি-ঘোষণাকে কার্যে রূপ দিবার জন্য লক্ষ লক্ষ সেবক নিজের বুকের রক্ত দিয়াছেন; আজ তাই ভারত ব্রিটিশ-কবল-মুক্ত। মুক্ত ভারত এইবার মুক্তি আস্বাদন করিবার পরিপূর্ণ সুযোগ পাইল। মুক্ত হইলেই মুক্তির আস্বাদন লাভ হয় না। 'পাওয়া'র সাধনা শেষ হইয়াছে; 'আস্বাদন করিবার' সাধনা সুরু হইয়াছে। যাহা ছিল মুক্তির পূর্বে মুক্তি-লাভের সাধনা আজ তাহাই হইবে সিদ্ধির আস্বাদন। যে গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি ছিল মুক্তির পূর্ব্বে সাধনা, আজ তাহাই হইবে মুক্তির ঘন আস্বাদন। মহাত্মাজী যে কর্ম্মপদ্ধতি এদেশের সামনে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা তখন ব্রিটিশশাসনের দ্বারা পদে পদে ব্যাহত হইত। আজ সে বাধা অপসারিত হইয়াছে। মুক্তির পূর্ব্ব ও পরের কর্ম্মপদ্ধতি একই রহিয়াছে; তফাৎ হইয়াছে এইখানে যে, ইহা পূর্ব্বে হইত ব্যাহত, এখন তাহা চলিতে পারে অব্যাহত গতিতে; বাধা দিবার কেহ আর নাই। এখন জাতি নিজ ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মপদ্ধতিকে জাতির-জীবনে সঞ্চারিত করিতে পারিবে। ধরা যাক হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা। ব্রিটিশ কিছুতেই ইহা সম্ভব করিতে দেয় নাই। তাহার হাতে ছিল সব সুযোগ; তাই সে কখনও হিন্দুর কাছে সুযোগের প্রলোভন দিয়া হিন্দুকে মুঠার ভিতরে রাখিতে চাহিত, আর কখনও বা মুসলমানদিগকে সুযোগের প্রলোভন দিয়া বশীভূত করিতে চাহিত। এইভাবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে জীয়াইয়াই সে রাখিয়াছিল, যাহার ফলে আজ পাকিস্থান সৃষ্টি হইতে পারিয়াছে। সকল গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কেই ইহা সত্য। আজ তাহা অব্যাহত ভাবে চালাইবার দিন আসিয়াছে। কিন্তু বাধা এখনও অপসারিত হয় নাই। বাহিরের বাধা তাহার গিয়াছে সত্য; কিন্তু বাহিরের কাছে এতদিন মস্তক অবনত থাকার ফলে যে-বিষ জাতির জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাই আজ সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে সালফার প্রয়োগে চাপা-পড়া রোগের মত। যাহা কিছু ঘৃণ্য পাপ, পরাধীন জাতি পরাধীনতার পাপের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া অর্জ্জন করিয়াছে, যে-পাপকে ব্রিটিশ সুকৌশলে শাসনযন্ত্রের নিষ্পেষণে প্রকাশিত হইতে দেয় নাই, আজ তাহা 'মুক্ত' আবহাওয়ার সুযোগ পাইয়া বীভৎস রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যাহা ছিলাম

আমরা ইংরেজ-রাজত্বে ভিতরে ভিতরে, আজ তাহাই আমরা প্রকাশ্যে হইয়াছি। তবে ইহা নিশ্চিত যে, যাহা আজ লোক-চক্ষুর সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহা ধীরে ধীরে জাতির সাধনা দ্বারা দূরীভূত হইবেই। আজ তাই নূতন করিয়া মুক্তির আস্বাদনের জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। এই উদ্বুদ্ধ হইবার জন্যই জাতি ২৬শে জানুয়ারীকে বৎসরে বৎসরে উদ্‌যাপন করিতেছে।

'মুক্তিঃ হিত্বা অন্যথারূপং যথাস্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ—'

ভাগবত। অন্যথারূপ ত্যাগ করিয়া যথাস্বরূপে ব্যবস্থিতিই মুক্তি। ভারতের কাছে ব্রিটিশের রূপ ছিল অন্যথারূপ; সেই অন্যথারূপকে ত্যাগ করিয়া আজ ভারতবর্ষকে যথা স্বরূপে ব্যবস্থিত হইতে হইবে। এই অন্যথারূপকে ভারতবর্ষ বাহিরে ত্যাগ করিলেও তাহা প্রারব্ধের মত তাহাকে অন্তরে অন্তরে আজিও বিব্রত করিতেছে। তাই ভারতবর্ষের আজ তাহার যথাস্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে অবহিত হওয়া দরকার, যাহাতে সে পজিটিভ আত্মস্বরূপে ব্যবস্থিত হইয়া অন্যথারূপের নেশা কাটাইবার পরিপূর্ণ সুযোগ পায়। কিন্তু সে কি জানে, এই বিশ্বের মাঝে কোন্ মিলন লইয়া সে আসিয়াছে, এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে? একটু ভিতরের দিকে দৃষ্টি দিলেই সে বুঝিবে যে, ভারতের প্রাণ-পুরুষ তাহার বুকে প্রাণসাধনার প্রেরণা রাখিয়া গিয়াছেন; তাই সে যুগে যুগে অখণ্ডের উপাসক। সে জীবনের 'water-tight compartment' মানে না। শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ইহারই দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একাধারে জড়বাদী ও অজড়বাদী। তিনি ছিলেন অর্জ্জুনের রথে সারথি, রাজনীতিজ্ঞ ও বেদান্তকৃৎ। তিনি বৃন্দাবনে, মথুরায়, দ্বারকায়, কুরুক্ষেত্রে। তিনিই সর্ব্বরসকদম্ব মূর্ত্তিমান। তিনি ছিলেন সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি আর্য্যের দেবতা, অনার্য্যের দেবতা, তাঁহারই শ্রীচরণতলে ভারতবর্ষ দীক্ষা লাভ করিয়াছে। ইহাই ভারতবর্ষের যথাস্বরূপ, আত্মস্বরূপ। পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে গড়িয়া উঠিবার জন্যই ভারতীয় সভ্যতা বিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনই ছিল তাহার গম্যস্থল; অথচ সে ঐ জীবনের জড়বাদের দিকের রক্তের দাবীর মর্য্যাদা দিতে পারে নাই, এ-দেশের অজড়বাদী সভ্যতার চাপে। তাই বিশ্ব প্রকৃতির অমোঘ বিধানে ভারতবর্ষ মূলতঃ জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার কবলে পতিত হইল।

জড়বাদও পরিপূর্ণ কৃষ্ণ জীবনের কাছে অর্দ্ধ সত্য ছাড়া আর কিছু নয়। জড়বাদ অজড়বাদেরই অপরার্দ্ধ, এই দুই মিলিয়াই এক পরসত্য। পরসত্যের এক অর্দ্ধকে একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরার ফলেই অপর অর্দ্ধ

ক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া অজড়কে পদানত করিয়া রাখিয়াছিল প্রায় দুই শত বৎসর। দীর্ঘ দিন জড়-অজড়ের সম্মেলনের ভিতর দিয়া এ-দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি চলিয়া আসার ফলেই আজ ভারতবর্ষ একান্ত জড়বাদীর সংস্রব কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে। জড়-অজড়ের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা সে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। ব্রিটিশের প্রয়োজনও তাই আজ ফুরাইয়াছে। প্রাকৃতিক বিধানেই সে তাই আজ দূরে সরিতে বাধ্য হইয়াছে।

জড়-অজড় সমন্বয়মূলক সংস্কৃতি ভারতের অন্তরে ছিল বলিয়াই 'রামধুন' গান গাহিয়া লবণ আইন অমান্যের ডাণ্ডিযাত্রী মহাত্মাজীর আন্দোলনে সমস্ত হিন্দুস্থান উথলিয়া উঠিয়াছিল। মহাত্মাজীর জীবনের এক অর্দ্ধ অধিকার করিয়াছিলেন 'রাম', অপর অর্দ্ধ ছিল রাজনৈতিক মুক্তি-কামনা। দুই-ই মহাত্মাজীর জীবনে তুল্য মূল্যে ছিল বলিয়াই সারা হিন্দুস্থান তাঁহার ডাকে এমন সাড়া দিয়াছিল। ইহা যে ভারতের পরিচিত সুর। এই সুরের মাধুর্য্য সে একদিন ব্রজধামে আস্বাদন করিয়া-ছিল, ব্রজের বাঁশী আজ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে। ব্রজের বাঁশী পোষণের সুরে বাজিত, সে সুরের মাঝে শোষণের রেশ নাই। সারা বিশ্বের স্বরাজ-গানই বাঁশীর সুরে বাজিয়াছে।

এমনই একটি স্বরাজের গান ভারতের আকাশে বাতাসে বাজিতেছে। যাহারা বলেন—'ভারতের মুক্তি ঝুটা হ্যায়',—তাঁহারা সত্যের এক অর্দ্ধ বলিতেছেন। মুক্তির আস্বাদন সে জাতীয় জীবনের পরতে পরতে, অন্ন-বস্ত্রে, শিক্ষায় সভ্যতায় আজিও পায় নাই ইহা সত্য; কিন্তু মুক্তির আস্বাদন লাভ করিবার প্রথম সোপান-স্বরূপ রাজনৈতিক মুক্তিকে নিশ্চয়ই পাইয়াছে। যাহাদের অভিসন্ধি আছে, যাহারা এ-দেশে রাশিয়ার মুক্তি আমদানী করিতে চান, কিম্বা যাহারা এ-দেশে নিজ সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব কায়েম করিতে চান, তাঁহারাই শুধু বলেন—'যহ্ আজাদী ঝুটা হ্যায়।' এ আজাদী না হইলে লক্ষ বৎসরেও অন্নে বস্ত্রে আজাদী আসিত না। মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া নিজ দলে আকর্ষণ করিবার গূঢ় অভিসন্ধি লইয়াই ঐ রূপ শ্লোগান দেওয়া হয়। স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি। আজ সৃষ্টি করিবার সুযোগ আসিয়াছে, আমরা দেশকে সৃষ্টি করিব, নেতৃত্বকে সৃষ্টি করিব, শাসন যন্ত্রকে সৃষ্টি করিব, অন্নক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্রকে সৃষ্টি করিব। বৃটিশ আমলের বিদ্বেষ-সর্ব্বস্ব হইয়া 'আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলিয়া চিৎকার করিলে কোনও দিনই আজাদী আসিবে না। যে বীর্য্য লাভ হইলে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তাহা শুধু শ্রদ্ধাবানদেরই লভ্য। একটা জাতি কি 'অশ্রদ্ধার' ভিতরই না হাবুডুবু খাইতেছে! কিছুর উপরেই কি ইহাদের শ্রদ্ধা আছে?

'গদী ছোড়'—বলিলেই কি কেহ গদী ছাড়ে? যোগ্য হও, গদী তোমাদের হইবে। এ-দেশ যখন যোগ্য হইয়াছিল মুক্তির বাস্তব সাধনার ভিতর দিয়া, তখনই ব্রিটিশ গদী ছাড়িয়াছিল। যে জাতি ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছিল নিজ সাধনার ভিতর দিয়া, সে কি দিল্লী কলিকাতার নেতৃত্বকে সৃষ্টি করিতে পারিবে না? নারায়ণ নরের সাধনায় নরের সকল অঙ্গ নিংড়াইয়া নন্দন-রূপে বিশ্বের বুকে নরের সমকক্ষ হইলেন। দিল্লীর নেতৃত্বও তেমনই জনগণের সাধনার ভিতর দিয়া জনসাধারণের আঙ্গিনায় পুত্ররূপে দাঁড়াইবেন। হিংসা বিদ্বেষের ভিতর দিয়া সৃষ্টি করা যায় না।

সমগ্রের উপাসক ভারতবর্ষ কোনও দিনই শ্রেণীদ্বন্দ্ব মানে না। একদিন কুরুক্ষেত্রের বুকে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উভয় সেনার মাঝ-খানে রথ রাখিতে সারথি শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। আজ নেহরু-নেতৃত্বও সেই পথের খোঁজ পাইয়া ভারতবর্ষকে রাশিয়া বা আমেরিকা কোন ব্লকেই যোগদান না করাইয়া দাঁড় করাইয়াছেন, ইহা বিশ্ব রক্ষার এক অভিনব কৌশল। ভারতবর্ষই একটী মাত্র দেশ, যে এমন দুঃসাহসিক পন্থা অবলম্বন করিতে পারে। সে যদি এই মাঝখানে অচ্যুত থাকিতে পারে, সারা বিশ্বের যুদ্ধোন্মাদনা থামিয়া যাইবে, সারা বিশ্ব ভারতের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। Either—or -এর মাঝখানে যে কিছু থাকিতে পারে এবং সেই মধ্যমই যে পরস্পর বিরুদ্ধের মধ্যে সাম্য আনিতে পারে, ভারতবর্ষ যদি তাহার সাধনায় অচ্যুত থাকিতে পারে, তবে ভারতবর্ষ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবে। নির্ম্মধ্যমনীতি (Law of Excluded Middle) আজ দার্শনিক ক্ষেত্রে অচল হইয়া পড়িয়াছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উহা অচল হইতে বাধ্য। হয় রাশিয়া, নয় তো আমেরিকা—ইহা আজ অচল। ভারতবর্ষই শুধু সাহস রাখে এই মধ্য পন্থায় চলিবার। এই পন্থার খোঁজ বিশ্বের আর কেহই জানে না। হয় ধণিক, না হয় শ্রমিক—ইহা নির্ম্মধ্যম নীতিরই চিন্তাধারা, ইহাও চলিবে না। কোন্ প্রাণসাধনায় ধনিক-শ্রমিক, রাজা-প্রজা এক সমগ্র জীবনের সাথে সমন্বিত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ দিবে। এই পন্থার খোঁজ যে শ্রীনেহরু পাইয়াছেন, সেজন্য তিনি জীবন দর্শনের মূর্ত্ত বিগ্রহ পুরুষোত্তমের আশীর্ব্বাদ পাইবেন। শ্রীনেহরুর সমস্ত রাজনৈতিক কর্ম্ম প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া এই নির্ম্মধ্যম নীতিরই প্রতিবাদ জমিয়া উঠিয়াছে। তাই হয় এটা না হয় ওটার উপাসক দল কিছুতেই তাঁহার কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে বুঝিতে পারেন না।

কিন্তু এই সাধনায় অচ্যুত থাকিতে হইলে সারা ভারতের অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলির সত্বর সমাধান প্রয়োজন! বেকার-সমস্যা, কৃষকদের ভিতর

জমিবণ্টন-সমস্যা যত শীঘ্র সম্ভব মিটাইয়া ফেলা প্রয়োজন, যাহাতে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের কর্ম্ম প্রচেষ্টার মূলোচ্ছেদ হয়। সঙ্ঘবদ্ধ এক ভারতবর্ষ ছাড়া কোনও ব্লকে যোগদান না করিবার নীতি রক্ষা সম্ভব হইবে না। সবে মাত্র ৫ বৎসর হইল ব্রিটিশ চলিয়া গিয়াছে; আর চলিয়া গিয়াও কত জটিল সমস্যার সৃষ্টিই না করিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে সব দিক সামলানো কঠিন ব্যাপার হইলেও বিশ্বে যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব দিনের পর দিন হইতেছে, তাহাতে বেশী সময়ও তো তাহার হাতে নাই, শত বৎসরের সাধনা ভারতবর্ষকে এক বৎসরে করিতে হইবে, তাহাকে এই সাধনায় সিদ্ধ হইতেই হইবে, নহিলে বিশ্ব যে ধনেপ্রাণে সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেন বাস্তবে গড়িয়া উঠিতে কোনও রূপে বাধা প্রাপ্ত না হয়। যাহারা এদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, তাহারা শত ভাল হইলেও কোন পরিকল্পনাকে মর্য্যাদা দিবে না। যে-কোন পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিলেই দেশবাসী তাহা মানিয়া লইবে, কোনও পরিকল্পনাই নিখুঁত হয় না, 'সর্ব্বারম্ভাঃ হি দোষেণ আবৃতাঃ'—নির্দ্দোষ পরিকল্পনা হয় না। প্রাণ দিয়া পরিকল্পনাকে যেন অনুসরণ করা হয়—সে দিকে নেতৃগণ সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন।

২৬শে জানুয়ারীর সংকল্প ইহাই হউক। আমরা ভারতকে, ভারতের নেতৃত্বকে গড়িয়া তুলিব, গোষ্ঠে গোষ্ঠবিহারীকে স্থাপন করিব, ভারতের এই প্রাণ সাধনা সমগ্র বিশ্বকে এক করিবে, রাশিয়া-আমেরিকার হানাহানি ভারতের প্রাণ সাধনার সামনে স্তব্ধ হইবে, পাকিস্থান ইঙ্গ-আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হইলেও ভারতের ভীত হইবার কিছু নাই। প্রাণকে আঘাত করিতে আসিয়া যেমন বাক্ চক্ষু প্রভৃতি প্রাণের মাঝে প্রাণ বনিয়া গিয়াছিল, তেমনি ভারতকে জব্দ করিতে আসিয়া বিশ্বের সব শক্তি ভারতময় হইবে, ইহাই ভারতীয় প্রাণ সাধনার ভবিষ্যৎ। ভারতের প্রাণ পুরুষ জয়যুক্ত হউন। বন্দেমাতরম্।

লোকসেবক প্রেস—৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

৬ষ্ঠ বর্ষ   ৩য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৫৯

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল জন্ম-শতবার্ষিকী

স্মৃতিপূজার প্রস্তুতি*

আগামী ১৩৬০ সালের বাসন্তী অষ্টমী পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল দেবের আবির্ভাবের শুভ শততম বর্ষারম্ভ তিথি। তাঁহার আবির্ভাব ১২৬০ সন, ১৩ই চৈত্র রবিবার বাসন্তী অষ্টমীতে; তিরোভাব তাঁহার ১৩১৭ সন, ৭ই মাঘ শনিবার কৃষ্ণা সপ্তমীতে। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ২৪ পরগণার অন্তর্গত পানিহাটী গ্রামে মাতুলালয়ে। তাঁহার পিতা ছিলেন মহাত্মা জন্মেজয় বসু, মাতা পুণ্যশীলা গৌরীমণি। মহাত্মা জন্মেজয়ের পিতার নাম মহাত্মা রামকানাই বসু। তাঁহার পিতামহ ছিলেন প্রসিদ্ধ দেওয়ান রামকান্ত বসু। তিনি একজন পরম ভক্ত ছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগরে তিনি নিজ নামে রামকান্তেশ্বরী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহাদের বাসভূমি ছিল কলিকাতা আহিরীটোলায়।

শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন শুধু তাঁহার আশ্রিতজনদের জন্যই নয়, তিনি আসিয়াছিলেন বিশ্বের জন্য, বিশ্ব-সভ্যতার রূপান্তর বা বিপ্লব বিধানের জন্য। তিনি নিজ শ্রীমুখে প্রায়ই বলিতেন—'I am a cosmopolitan'— আমি বিশ্বনাগরিক। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সমাধির ভাষায় শ্রীনিত্যগোপালকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই এসেছিস? আমিও এসেছি।' সমগ্র বিশ্বকে মনের স্তর হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রাণের স্তরে উন্নীত, উৎ-আসীন করাইবার গুরুভার লইয়াই রামকৃষ্ণ-নিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়াছেন প্রাণপ্রচুর সমন্বয়ের পূর্ব পর্যায়; শ্রীনিত্যগোপাল দিলেন পরপর্যায়। সত্যই তাঁহারা আসিয়াছেন; তাঁহাদের এই 'আসা' যুগ-প্রয়োজনে। আজ আমরা প্রাণ উপাসনার পরপর্যায়েরই আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

বর্তমান বিশ্বের প্রতিটী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবন নিজ নিজ সমগ্রতা হারাইয়া যুযুৎসু মনোবৃত্তি লইয়া আজ দ্বিধা-বিভক্ত। এই বিভাগদ্বয়

*আগামী ৮ই চৈত্র রবিবার (ইং ২২শে মার্চ, ১৯৫৩) কালীঘাট মহানির্বাণ মঠে শ্রীনিত্যগোপালের জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

হইতেছে—আত্মা-অনাত্মা বিভাগ, চৈতন্য-অচৈতন্য বিভাগ, মায়া-ব্রহ্ম বিভাগ, এক বহু বিভাগ, আদর্শ-বাস্তব বিভাগ। দ্বিধা-বিভক্ত আত্মা ও অনাত্মা প্রভৃতি চাহিতেছে পরস্পরকে দাবাইয়া, পরস্পরকে অস্বীকার করিয়া, অথচ সুকৌশলে চোরের মত একে অপরকে দিয়া নিজ অভিসন্ধি পূরণ করাইয়া লইতে। তাহাদের এই প্রয়াস 'মনের'ই বৃত্তি, মনের সাধ্য নাই যে সে যুগপৎ-জ্ঞানের উৎপাদন করে। 'যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনসঃ লিঙ্গম্'—যুগপৎ-জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়াই মনের লিঙ্গ। মনের ভাষা 'নির্মধ্যম নীতির (Law of Excluded Middle) ভাষা, 'Either-or' -এর ভাষা। হয় আত্মা নয় অনাত্মা, হয় চৈতন্য নয় অচৈতন্য হয় আদর্শ নয় বাস্তব—ইহা মনেরই সিদ্ধান্ত। 'মন' আত্মা-অনাত্মার যৌগপদ্য বিধানে অক্ষম। অথচ সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিয়াছে যে কোনও একটীকে লইয়াই জীবন চলে না। একান্ত আদর্শবাদ জীবনকে বাস্তব জীবন হইতে দূরে সরাইয়াই রাখে, জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর কোনও সুস্থ সমাধানই সে দিতে পারে না। আদর্শ চায় বাস্তবকে সংকোচ করিতে কিম্বা নিরোধ করিতে। বাস্তবকে বাস্তব রাখিয়া, বাস্তবকে পরম অর্থে গড়িয়া তুলিয়া কোনও আদর্শই এযাবৎ এই বিশ্বের বুকে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু বাস্তবের দাবী এমন করিয়াই আদর্শকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে যে, আদর্শেরও আজ ক্ষমতা নাই যে, সে বাস্তবকে একান্তভাবে অস্বীকার করে। একান্ত আদর্শ চলে নাই, চলিবেনা, একান্ত বাস্তবও চলিবেনা, চলিতে পারে না। একান্ত বস্তুবাদীরা বলেন, বাস্তবই আদর্শের জনক; বাস্তবকে বদলাইয়া দিলেই আদর্শ বদলাইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে আদর্শবাদ বলিতেছে যে, আদর্শই সত্য; বাস্তব যদি আদর্শের অনুসরণ না করে, বাস্তবকে বাদ দিয়াই চলিতে হইবে, আদর্শকে পরমার্থ সত্য ধরিয়া লইয়া বাস্তবকে ব্যবহারিক মূল্যই শুধু দিতে হইবে। ইহারা দুই-ই একদেশদর্শী। মনের স্তর এইভাবে আত্মা-অনাত্মার, চৈতন্য-অচৈতন্যের সংঘর্ষে মূঢ়, মুমূর্ষু। আজ তাই জড়ের ক্ষেত্রে, অজড়ের ক্ষেত্রে মরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মনের স্তরের সামনের দিক আজ রুদ্ধ; মনের সামনে শুধুই অন্ধকার, শুধুই প্রলয়। মনের স্তরে এমন একটী প্রলয় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহার ভিতর দিয়া পথ খুঁজিয়া বাহির করা মন-বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। এই প্রলয়-পয়োধিজলে নিমগ্ন মনঃকল্পিত বিশ্বের সামনে শ্রীনিত্যগোপাল 'ধৃতবান্ অসি বেদং বিহিতবহিত্রচরিত্রম্ অখেদম্'। শ্রীনিত্য-গোপাল প্রলয়-পয়োধিজলে নিমগ্ন বিশ্বের সামনে ঐ মনের স্তরের ঊর্ধ্বের প্রাণময় এক জীবন দর্শন ও জীবন চরিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আজ তাহার আলোচনা ও আস্বাদন করিবার শুভ অবসর আসিয়াছে। সামনের একটি বৎসর উজ্জ্বল-ভারত এই সেবাব্রত লইয়া চলিবে। শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে প্রতি মাসে একটু আলোচনা উজ্জ্বলভারতে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব। ইহাই হইবে তাঁহার শতবার্ষিকী স্মৃতি-পূজার প্রস্তুতি বা অধিবাস।

আজ মনের ক্ষেত্র ও মনের ভাষা বর্তমান যুগের সমস্যা সমাধানে অচল হইয়া পড়িয়াছে, পচিয়া গিয়াছে। বীজ পচিলেই অঙ্কুরোদ্গম হয়; মনের ক্ষেত্র ও মনের ভাষাও আজ পচিয়া প্রাণের ক্ষেত্র ও প্রাণের ভাষায় গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে। সর্বেন্দ্রিয়সহ মন কেমন করিয়া প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিয়া তাহারই মধ্যে স্ব স্ব যোগ্যতা অর্পণে কৃতার্থ হইয়াছিল, প্রাণ বনিয়া গিয়াছিল তাহার খোঁজ উপনিষৎ বার বার দিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল এই প্রাণতত্ত্বেরই মূর্ত বিগ্রহ।

আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয়েরই এক একটি বিশেষ সম্পদ আছে। বাক্-ইন্দ্রিয় বসিষ্ঠগুণসম্পন্ন; তাই যিনি বাক্-ইন্দ্রিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহার উত্তমা গতি লাভ হয়। বাগ্মী পুরুষগণ নিজেরাও বাস করেন এবং ধনদ্বারা অন্যকে পরাভূত করিয়া থাকেন; এই কারণে বাক্ই বসিষ্ট। চক্ষুর গুণ প্রতিষ্ঠা; যিনি দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রবণেন্দ্রিয়ই সম্পৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ; কেননা শ্রবণের সাহায্যেই সম্পৎ লাভ হইয়া থাকে। মন আয়তনের দ্যোতক; যিনি মনের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তিনি জীবনে আয়তনকে পাইয়াছেন। একদা এই সকল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে প্রাণের বিরোধ উপস্থিত হইল। প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়। অবশেষে স্থির হইল, যে দেহযন্ত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে এই দেহ অতিশয় পাপিষ্ঠের ন্যায় হয়, সে-ই শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ।

অতঃপর একে একে প্রথমে বাক্য, তারপরে চক্ষু, তারপরে শ্রবণেন্দ্রিয়, তারপর মন দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাক্য বাহির হওয়ার এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার অভাবে সমগ্র দেহের কিছু হয় নাই—বাক্যহীন হইয়া মানুষটি কিছু অসুবিধা ভোগ করিয়াছে মাত্র। সে লজ্জা পাইয়া দেহে পুনঃ প্রবেশ করিল। চক্ষুও চলিয়া গিয়া বৎসরান্তে ফিরিয়া আসিয়া ঐ একই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল এবং বুঝিল, চোখে না দেখায় প্রতিষ্ঠা লাভে বিঘ্ন হইলেও লোকটি পাপিষ্ঠের ন্যায় প্রতীয়মান হয় নাই। শ্রবণেন্দ্রিয় ও মনও একবার চলিয়া যাওয়ার পর ফিরিয়া আসিয়া ঐ রূপ অভিজ্ঞতাই লাভ করিল। তখন আসিল প্রাণের নিষ্ক্রমণের পালা। কিন্তু প্রাণ যখনই বহির্গত হইতে উদ্যত হইল, তখনই সর্বেন্দ্রিয় সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; কেননা প্রাণের যাওয়ার প্রচেষ্টামাত্রতেই সর্বেন্দ্রিয়ের অস্তিত্বে টান পড়িয়াছে। তখন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই বুঝিতে পারিল যে, সে না থাকিলেও প্রাণ ছিল বলিয়াই সমগ্র দেহ অস্তিত্ব-বান ছিল। চক্ষু কর্ণ মন—ইহারা তো মানুষের পক্ষে খানিকটা পোষাকী বস্তু। কিন্তু প্রাণেই মানুষের অস্তিত্ব—এই অস্তিত্ববোধক প্রাণ যখন জীবনের সামনে থাকে, তখনই জীবন হয় সহজ। কিন্তু মানুষ যখন যাহার উপর তাহার অস্তিত্ব, সেই ভিত্তিকে ভুলিয়া যায়, তখনই তাহার আসে চরম বিকৃতি। আজিকার বিশ্ব জীবনের ভিত্তিস্বরূপ এই প্রাণকে ভুলিয়া গিয়াই না এতদূর অধঃপতিত ও বিকৃত

হইয়াছে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সমগ্র প্রাণদৃষ্টি হারাইয়া মনে করিয়া ছিল, 'আমিই বড়'। কিন্তু এই সকল প্রতিটী ইন্দ্রিয়ের ব্যক্তিগত যোগ্যতা যতই থাকুক না কেন, ইহারা কেহই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ নহে, ইহারা কেহই ব্রহ্ম নহে, কেহই সমগ্র নহে।

আধুনিক কালে ইহারই পুনরভিনয় চলিতেছে। বাক্‌সর্বস্ব মানুষ মনে করে যে, বাক্য দ্বারাই, প্রোপাগাণ্ডা-দ্বারাই সে বিশ্ব জয় করিয়া লইবে। প্রতি জাতি কথার মারপ্যাঁচে সত্য কথাকেই গোপন করিয়া, পদদলিত করিয়া চলিয়াছে। এইভাবে বাক্‌ইন্দ্রিয় সমগ্রের সেবা না করিয়া সমগ্রকে বিকৃতই করিতেছে। সর্বোপরি আজিকার সভ্যতার অন্তর্নিহিত সত্তা যদিও ব্যাকুলভাবে সমগ্রকেই চায়, প্রাণেরই খোঁজে যদিও সে এদিকে ওদিকে ঢু দিয়া ফিরিতেছে, তথাপি তাহার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ চলিতেছে মনের সাহায্যে। মন বলিতেছে, 'আমিই শ্রেষ্ঠ, আমারই কূটনীতিতে বিশ্বযন্ত্র ঘুরিতেছে।' সমগ্রদৃষ্টিহীন মন জীবন যন্ত্র পরিচালিত করিলে যাহা হইতে পারে, আজিও তাহাই হইতেছে। মন এক ব্লককে ত্যাগ করিয়া অপর ব্লকের সংগে একাত্ম হইয়া বিভেদের ফাটলই বাড়াইয়া চলিয়াছে। আজিকার সংসার বিভেদের সংসার। মনের ব্যর্থতা তাই দিকে দিকে। মনের সামর্থ্য আর কতটুকু? সে তো আর জীবন হইতে বড় নয়; সমগ্র জীবনকে সে ধরিয়া রাখিবে কোন্ যোগ্যতায়? অথচ তাহারই প্রচেষ্টা চলিতেছে—মন দিয়াই সমগ্র জীবনকে, ব্রহ্মবস্তুকে ধরিবার বিশ্বসমস্যা সমাধান করিবার প্রচেষ্টা। বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন তাহাদের নিজেদের ক্ষমতা নিজেরাই জানে না।

কিন্তু প্রাণ যখনই শক্তি লইয়া কাড়াকাড়ির ফলে বাহির হইতে উদ্যত, তখনই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের চমক ভাঙ্গে; 'অহম্ প্রথমঃ' কিংবা আমিই শ্রেষ্ঠ—এ কথা মনে করিবার ভুল তখনই তাহাদের কাটে। তখন তাহারা প্রাণের নিকট সমাগত হইয়া বলিবার সুযোগ পায়, বাধ্য হয়, 'তুমিই আমাদের প্রভু, তুমিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—তুমি উৎক্রমণ করিও না'। তখনই বাক্‌ইন্দ্রিয় বলে, 'ওগো প্রাণ, আমার যাহা বিশেষত্ব বলিয়া মনে করিতেছি, সেটি তুমিই—আমি যে বসিষ্ঠত্বগুণে বিশেষিত, সে গুণ তোমারই নিকট হইতে পাওয়া—বস্তুতঃ তুমিই সেই বসিষ্ঠত্বগুণ।' এইভাবে চক্ষু, কর্ণ ও মন তখন তাহাদের নিজেদের গুণ যে প্রাণেরই গুণ, প্রাণেরই নিকট হইতে উহা যে পাওয়া—এ কথা বুঝিতে পারিয়া নিজেদের সম্পদ প্রাণকেই দান করে। চক্ষুর প্রতিষ্ঠাগুণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সম্পদগুণ এবং মনের আয়তনগুণ সবই প্রাণেরই গুণ। সেইজন্য শ্রুতি বলিলেন, পণ্ডিতগণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের নিজস্ব নামে অভিহিত করেন না, সকলকে 'প্রাণ' বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। কেননা প্রাণই হইতেছে সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়স্বরূপ।

এই যে প্রাণ, এই প্রাণই হইতেছে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। বায়োলজিক্যালি যেমন সে জ্যেষ্ঠ, সাইকোলজিক্যালিও তেমনি সে শ্রেষ্ঠ। এই উভয়ধর্মী যে মুখ্য প্রাণ, মহাপ্রাণ—বর্তমান বিশ্ব সেই প্রাণকেই অন্তরে অন্তরে চাহিতেছে। প্রাণ যে

বায়োলজিক্যালি জ্যেষ্ঠ, তাহা আমরা সহজেই বুঝি। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণে বাক্-চক্ষু-কর্ণ-মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রকাশিত হইবার বহু পূর্বেই সেখানে প্রাণের সঞ্চার হইয়া থাকে। আর সাইকোলজিক্যালিও প্রাণই শ্রেষ্ঠ। এই সাইকোলজিক্যাল প্রাণের অধীশ্বর হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ পরাণবঁধু, প্রাণবল্লভ। আর সেইজন্যেই

কৃষ্ণের যতেক খেলা
সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাঁহারই স্বরূপ।

একমাত্র নরবপুর মধ্যেই সমন্বিত রহিয়াছে মনের পরস্পরবিরুদ্ধ জটিল-কুটিল তত্ত্বসমূহ।

যাহা হউক, ঐভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার অন্ন কি হইবে'? অপর প্রাণগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ বলিল—'কুক্কুর ও শকুনি হইতে আরম্ভ করিয়া জগতে যাহা কিছু ভক্ষ্য বস্তু 'অন্ন' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমস্তই তোমার অন্ন হইবে।'

উপনিষৎ এই প্রাণের স্তুতি করিয়া বলিতেছেন, 'জবালানন্দন জাবাল সত্যকাম এই প্রাণদর্শন-বিদ্যা বৈয়াঘ্রপদ্য গোশ্রুতিকে উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—কেহ যদি শুষ্ক বৃক্ষের নিকটও এই প্রাণদর্শন বলে, তাহা হইলে এই শুষ্ক বৃক্ষেও শাখা জন্মিতে পারে এবং পত্রসমূহও প্রাদুর্ভূত হইতে পারে।'—শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে, মরা ভ্রমর গুঞ্জরিবে।'

ছান্দোগ্যোপনিষদের নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলিতে প্রাণের এই তত্ত্বই প্রকাশিত রহিয়াছে ঃ

'যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ। যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ বসিষ্ঠো হ স্বানাং ভবতি বাক্ বাব বসিষ্ঠঃ। যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকে অমুষ্মিংশ্চ, চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা॥ যো হ বৈ সম্পদং বেদ সংহাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দৈবাশ্চ মানুষাশ্চ শ্রোত্রং বাব সম্পৎ॥ যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং হ স্বানাং ভবতি মনো হ বা আয়তনম্॥ অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যূদিরেঽহং শ্রেয়ান্ অস্মি শ্রেয়ান্ অস্মি ইতি॥ তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরম্ এত্য উচুঃ ভগবান্ কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি। তান্ হোবাচ—যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত; স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি॥ সা হ বাগুচ্চক্রাম, সা সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্য ইতি উবাচ—কথমশকত ঋতে মৎ জীবিতুমিতি। যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ এবমিতি প্রবিবেশ হ মনঃ॥ অথ হ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সুহয়ঃ পড়্বীশ-শঙ্কূন্ সংখিদেৎ এবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদৎ তম্ হ অভিসমেত্য উচুঃ ভগবান্ এধি ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মা উৎক্রমীঃ ইতি॥ অথ হি এনং বাক্ উবাচ—যদ্ অহং বসিষ্ঠঃ অস্মি, ত্বং তদ্বসিষ্ঠঃ অসি ইতি। অথ হি এনং চক্ষুরুবাচ—যদ্ অহং প্রতিষ্ঠা অস্মি, ত্বং তৎ প্রতিষ্ঠা অসি ইতি॥ অথ হি এনং শ্রোত্রম্ উবাচ—

যদ্ অহং সম্পদ্ অস্মি, ত্বং তৎ সম্পদ্ অসি ইতি। অথ হি এনং মন উবাচ—যদ্ অহম্ আয়তনম্ অস্মি, ত্বং তদ্ আয়তনম্ অসি ইতি॥ ন বৈ বাচঃ ন চক্ষুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসি ইতি আচক্ষতে, প্রাণঃ হি এব এতানি সর্বাণি ভবতি॥

স হি উবাচ কিং মে অন্নং ভবিষ্যতি ইতি যৎ কিঞ্চিৎ ইদম্ আ শ্বভ্য আ শকুনিভ্য ইতি হ উচুঃ। তৎ বৈ এতৎ অনস্য অন্নম্ অনো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষম্, ন হ বা এবং বিদি কিঞ্চন ন অনন্নং ভবতি ইতি।

তদ্ হৈ তৎ সত্যকামঃ জাবালঃ গোশ্রুতয়ে বৈয়াঘ্রপদ্যায় উক্ত্বা উবাচ—যদ্যপি এতৎশুষ্কায় স্থাণবে ব্রুয়াৎ জায়েরন্ এতস্মিন্ শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি ইতি॥

'...প্রাণ বাগাদি ইন্দ্রিয় হইতে সর্বাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ; প্রাণ সকলের চেয়ে গুণেও শ্রেষ্ঠ। কেননা প্রাণ সকলকে লইয়াই সংসারী, তাহার 'নিজ' বলিতে বুঝায় 'সব'। প্রাণ সর্বাশ্রয়, আচার্য শংকরের ভাষায় 'সর্বম্ভরি।' প্রাণের সকলই অন্ন; সর্ব রূপ, সর্ব রস, সর্ব গন্ধ, সর্ব কাম, সর্ব সম্প্রদায়, সর্ব মতবাদ সকলই প্রাণের অন্ন। কিছুই তাহার কাছে 'অনন্ন' নাই। প্রাণ সুগন্ধ-দুর্গন্ধ বাছে না, সকল গন্ধের ভিতরেই সে পুরুষোত্তম-গন্ধ খোঁজে, প্রাণ সুরূপ-কুরূপ বাছে না, সকল রূপেই গূঢ় পুরুষোত্তমরূপকেই সে দেখিতে চায়। সব ইন্দ্রিয়েরই বাছাবাছি আছে, 'এটা নয় ওটা' আছে, তাই তো তাহারা সংসারী। প্রাণ ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয় এই-জন্যই 'পাপবিদ্ধ' হইয়াছিল। সব হজম করিতে পারাই প্রাণের যোগ্যতা; বাছাবাছি করাই পাপ। প্রাণই সন্ন্যাসী। প্রাণ নির্বিশেষ বলিয়াই নির্বিশেষ পুরুষোত্তম তাঁহার বল্লভ; পুরুষোত্তম তাই তো প্রাণবল্লভ। প্রাণ সর্বসমন্বয়, সর্বান্ন। প্রাণের অগ্নিমান্দ্য নাই—তাহার অগ্নি নিত্য-দীপ্ত। সব কিছু হজম করিতে পারার গুণেই সে সব বিশেষ হইতে শ্রেষ্ঠ। পূর্বে উল্লিখিত উপনিষদের প্রাণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের [illegible] এই রহস্য স্পষ্টতঃই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সমগ্র ছান্দোগ্যে প্রাণ উপাসনার ধারাই নানা রসে নানা রকমে চলিয়া আসিতেছে। বৃহদারণ্যকেও ইহার মহিমা নানা ছন্দে কীর্তিত হইয়াছে।

শ্রীনিত্যগোপাল এই প্রাণদর্শন ও প্রাণঘন জীবন লইয়া বিশ্বের বুকে এক দার্শনিক ও জীবনগত বিপ্লব আনয়ন করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। এই প্রাণদর্শনের অন্তর্গত রহিয়াছে মনের দর্শন, চক্ষুর দর্শন, সর্বেন্দ্রিয়ের দর্শন। এই প্রাণদর্শন হইয়া পড়িত মিস্টিকদেরই দর্শন, যদি না ইহার মধ্যে মন, চক্ষু, শ্রবণ ও বাক্যের দর্শন অন্তর্নিহিত থাকিত। এতদিন ভারতবর্ষ এই সংসারের ওপারে ব্রহ্মকে খুঁজিয়াছে; তাই মনস্তত্ত্বের ভিতরকার জটিলতা লইয়া বিব্রত হইবার প্রয়োজনবোধ তাহার হয় নাই। ব্রহ্ম যখন অপ্রাকৃত, তখন নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃতির ওপারে, প্রাকৃত মনবুদ্ধির ওপারে, দেহেন্দ্রিয়াদির ওপারে। সে ব্রহ্মোপাসনার পথে ইহাদিগকে চাপা দিতেই চাহিয়াছে, এড়াইতেই চাহিয়াছে। কিন্তু চাপা দিলেই যে ইহারা চাপা পড়ে নাই, এড়াইতে চাহিলেই যে এড়ানো সম্ভব হয় নাই, বরং

চাপা দিয়া চলিবার ফাঁক দিয়া ইহারা যে প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়াছে, শত্রু ভাবাপন্ন হইয়াছে, আদর্শকে পদদলিত করিয়া নিজেদের জয় জয়কার ঘোষণা করিতেছে, সারা দুনিয়াময় দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম করিয়াছে, তাহা বর্তমান যুগের বর্তমান চিত্রের দিকে তাকাইলে স্পষ্টতঃই প্রতিভাত হইবে। শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছেন দুনিয়াকে এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য। আজ কারণার্ণ-বেরও ওপারের ব্রহ্ম, দ্বীপান্তরিত ব্রহ্ম মন-বুদ্ধি অহঙ্কার-চিত্ত-ইন্দ্রিয়াদির মধ্য দিয়া নিংড়াইয়া প্রকৃতিনন্দন রূপে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছেন। আজ ধরার ধূলি ব্রহ্মকে পুরুষোত্তমরূপে গড়িয়া তুলিবে, মানুষ তাহার সকল দেহ প্রাণমন-বুদ্ধিদ্বারা তাঁহার আরাত্রিক করিবে, তাঁহাকে সর্বেন্দ্রিয়ে ধারণা করিবে 'সুভৃতং গর্ভিণীব'। ব্রহ্ম হইবেন উপনিষদের ভাষায় জীবের সর্বেন্দ্রিয়ের নিংড়ান-ধন, আঙ্গিরস—'যৎ অঙ্গানাং রসঃ'। মিস্টিসিজমকে আজ মনস্তত্ত্বের ভাষায় ব্যাখ্যার সুযোগ আসিয়াছে। আজ অধরকে সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা ধরিবার দুঃসাহস লইয়া জীব-জগত দাঁড়াইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল তাহারই পথপ্রদর্শক, অগ্রগামী অগ্নিদেবতা। 'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্'—হে অগ্নিদেবতা, ব্রহ্মকে সকল অঙ্গ নিংড়াইয়া সৃষ্টি করার সুপথে আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া চল।

প্রাণই intuition. এই intuition সর্বেন্দ্রিয়ানুগ হইয়া সর্বেন্দ্রিয়াতীত। ইহা একান্ত সর্বেন্দ্রিয়াতীত হইলে ইহার সঙ্গে প্রাকৃত মানুষের কোন যোগই সম্ভব হইত না। কেননা যুক্ততা তো সম্ভব সর্বেন্দ্রিয়দ্বারাই। সর্বেন্দ্রিয়াতীতের সর্বে-ন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগ অসম্ভব । Intuition -কে মানুষের প্রত্যক্ষ [illegible] ধরিবার ছুঁইবার দিন আজ আসিয়াছে।

'When we talk of intuitional truths, we are not getting into any void beyond experience. It is the highest kind of experience when the intellectual conscience of the philosopher and the soaring imagination of the poet are combined. Intuitional experience is within the reach of all provided they themselves strain of it. These intuitional truths are not to be put down for chimeras simply because it is said that intellect is not adequate to grasp them. The whole, the Absolute, which is the highest concrete, is so rich that its wealth of content refuses to be forced into the fixed forms of intellect. The life of spirt is so overflowing that it brusts all barriers. It is vastly richrer than human thought can compass. It breaks through every conceptual form and makes all intellectual determination impossible. While intellect has access to it, it can never exhaust its fullness. —Radhakrishnan—The Reign of Religion in contemporary Philosophy. —p. 440. যে intuition ছিল এতদিন মিস্টিকদের, তাহা

আজ যুগ বিবর্তনের ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতার আওতায় আসিয়া পড়িয়াছে—'the highest kind of experience when the intellectual conscience of the philosopher and the soaring imagination of the poet are combined.' Intuition আজ তর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছে, মনস্তত্ত্বের ভাষায় ইহার ব্যাখ্যান সম্ভব হইয়াছে। যাহা ছিল এতদিন অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ, যাহার সহিত তর্কের যোজনা না করাই ছিল ব্যবস্থা—ন তাং তর্কেন যোজয়েৎ—আজ তাহাতে শ্রীনিত্যগোপালের কৃপায় তর্কের যোজনা করা সম্ভব হইয়াছে, অচিন্ত্যনীয় হইলেও তাহাকে আজ মানবীয় চিন্তার ভিতর আনয়ন করা সম্ভবপর হইয়াছে।

শ্রীনিত্যগোপাল এই প্রাণদর্শন 'শুষ্কায় স্থাণবে' শুষ্ক স্থাণুতুল্য বর্তমান বিশ্বের ব্যষ্টি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাণে কাণে শুনাইয়া তাহাদের জীবনে প্রাণ সঞ্চার করিবার জন্য, ফলে ফুলে পলাশে সুশোভিত করিবার জন্য প্রোপাগাণ্ডা-জর্জরিত বিশ্বের বুকে লুকাইয়া আসিয়াছিলেন, আবার বিশ্ব হইতে লুকাইয়াই চলিয়া গিয়াছেন। প্রাণের স্বভাবই লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে গোপন করিয়া রাখা। শ্রীনিত্যগোপাল কোনও এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, 'ওরে বিলে (নরেনের ডাক নাম), আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাঁথা মুড়ি দিয়েই যাব।' তিনি চলিয়া যাইবার পর আজ তাঁহার এই কাঁথা-মুড়ি দেওয়ার প্রকৃতির অর্থাৎ যোগমায়া-প্রকৃতির উদ্ঘাটন করিবার অবসর আসিয়াছে।

এই প্রাণদর্শনকে [illegible] জটিলকুটিল মনস্তত্ত্বের পরতে পরতে অনুপ্রবেশ করাইবার জন্যই মূল সূত্রস্বরূপে তিনি দিয়া গিয়াছেন ঃ 'সমন্বয়। নিত্যানিত্যসমন্বয় বা আত্মানাত্মসমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার-নিরাকার সাকার সমন্বয়। জড়াজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। সর্ব সমন্বয়।'—বিবিধতত্ত্ব। ইহারই বিবৃতি দিতে যাইয়া অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, 'সমুদ্রে জলও আছে, এবং বাড়বানলও আছে। অথচ উভয়ে পরস্পরবিপরীত পদার্থ। ঐ প্রকারে একাধারে 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অবস্থিতি অসম্ভব হয় না। ঐ প্রকারে এক ব্রহ্মের আকার নিরাকার হওয়াও অসম্ভব হয় না। ঐ প্রকারে একই ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণ, ব্যক্তাব্যক্ত হওয়াও অসম্ভব নহে।'

পরস্পর-বিপরীত সগুণ-নির্গুণ, আকার-নিরাকারের 'একাধারে' থাকিবার বিবরণ দিয়া উহাদের 'এক সঙ্গে' (যুগপৎ) থাকিবার অনুকূল দৃষ্টান্ত দিয়া লিখিতেছেন, 'সময়ে সময়ে বৃষ্টি এবং রৌদ্র যেমন একসঙ্গে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞান এবং ভক্তিও একসঙ্গে প্রকাশিত থাকিতে পারে। ঐ প্রকারে সাকার-নিরাকারও একসঙ্গে প্রকাশিত থাকিতে পারে। ঐ প্রকারে দ্বৈতাদ্বৈত একসঙ্গে প্রকাশিত থাকিতে পারে।'—নিত্যধর্ম পত্রিকা—২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ৬৭-৬৮পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে 'একসঙ্গে' ('together') বাক্যাংশটুকু বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁহার শ্রীহস্তলিখিত গ্রন্থ সিদ্ধান্তদর্শনের উপসংহারে

লিখিতেছেন: 'এই সিদ্ধান্তদর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্তদর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এবং এক ও বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়, প্রতিবাদ ও অপ্রতিবাদকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়।' সমন্বয়ের এত বড় ব্যাপকতম ও গভীরতম চিত্র কি কেহ এ যাবৎ আঁকিতে পারিয়াছেন? সমন্বয় শব্দদ্বারা পাছে জীবন আবার static হইয়া যায়, সামনের দিক closed হইয়া যায়, তাই অসমন্বয়কেও শ্রীনিত্যগোপাল 'ব্রহ্ম' বলিয়াছেন। সমন্বয় সিদ্ধান্ত স্থাপনে এই হিসাবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী; 'ন তৎ সমঃ চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।' আমরা বর্তমান বিশ্বের ধূলিলুণ্ঠিত অসহায় মানবকুল সর্বসমন্বয়মূর্তি ইত্থম্ভূতগুণ শ্রীনিত্যগোপালকে সকল দেহপ্রাণমন দিয়া বরণ করিতেছি। বন্দেমাতরম্।

'মিথ্যা যাহা তাহা নাই। তোমার মতে মায়া মিথ্যা, সুতরাং তাহাও নাই। সুতরাং তাহা কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

যদি বল মায়া আছে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই সত্য। মায়া সত্য স্বীকৃত হইলে মায়ার প্রত্যেক কার্যও সত্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে মায়ার প্রত্যেক কার্যের প্রত্যেক ফলও স্বীকার করিতে হয়।'

—শ্রীনিত্যগোপাল

রাধা

গোপেশ্বর সাহা

কুসুমিত বৃন্দারণ্যে পুষ্পিত যৌবনা
বিলোল কটাক্ষময়ী মদির নয়না
সুন্দরী রাধিকা,
শুধু আখ্যায়িকা?
বিদ্যুৎবরণা ধনি অনন্ত যৌবনা
অনন্ত লাবণ্যময়ী অপূর্ব দর্শনা,
কবির কল্পনা শুধু মৌন আখ্যায়িকা
কিশোরী রাধিকা।
ওকি শুধু বৈষ্ণবের চিত্র আধ্যাত্মিকা?
বৃন্দাবন তরুচ্ছায়ে নির্জন কুটীরে
মুগ্ধা বধূ নতনেত্রে বাঁধিছে কবরী,
ফুল হারে সাজাইছে কৃষ্ণ কেশদাম,
সুবর্ণ দর্পণ করে হেরি বারংবার
পরিছে সিন্দুর-বিন্দু সীমন্তে আপন,
এ কি সবই কল্পনার অলীক স্বপন!
নিত্য সন্ধ্যাবেলা,
জলফেলি জল আনা কালিন্দীর কূলে,
নিত্য নীপমূলে,
আড় চোখে চেয়ে দেখা, তমাল ছায়ায়
চোখে চোখে কত কথা লুকোচুরি খেলা!
মধ্যাহ্নের নদীতটে ছিঁড়ি কণ্ঠহার
সযতনে পরাইয়া দেওয়া বারংবার।
চলিতে সম্মুখ পানে ক্ষণেকের তরে
ঘুরায়ে বংকিম গ্রীবা পশ্চাতের পানে
ক্ষণেকের দেখা লাগি উৎসুক পরাণ
একি শুধু বৈষ্ণবের আধ্যাত্মিক গান!

হে ঐতিহাসিক,
মিলাইছ বসি বসি বছর তারিখ,

গণিতেছ বারংবার তিথি-বর্ষ-মাস,
অলীক সকলি কিছু,—অলীক অলীক
মাস-বর্ষ-দিন-ক্ষণ কিছু নাহি ঠিক।
হে প্রত্নতাত্ত্বিক,
ভাগবতে রাধা নাই, বলিয়াছ ঠিক,
বহু গবেষণা করি বহু পুঁথি ঘাঁটি
করেছ নির্ণয় বটে সত্য যেই খাঁটি!
ভাগবতে রাধা নাই ; জীবনের সাথে
বাঁধা পড়ে গেছে রাধা চিরদিন তরে
তোমার আমার আর নিখিল জীবনে
অনন্ত জীবনে সে যে যৌবনে যৌবনে।
অনন্ত যৌবনা রাধা দুর্বার চঞ্চলা,
আজো হেরি লোকালয়ে স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ে।
দাঁড়ায়ে কুটীরদ্বারে আঁখি নির্ণিমেষে
চাহি শূন্য পথ পানে প্রান্তরের শেষে।
মধ্যাহ্নের পল্লী পথে জনশূন্য বাটে,
আজিও চলিছে সে যে উদ্ভিন্ন যৌবনা
যৌবন গরবে ধনী ঠমকি ঠমকি
নবীন বিদ্যুল্লতা বংকিম গমনে।
মধ্যাহ্নের গ্রাম পথে সিক্ত নীলাম্বরী
নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলে পরাণ সহিত,
নিঙাড়ি যৌবন সুধা নিখিলের প্রাণে
বিতরি নবীন ছন্দ জীবনের গানে।
আজো রাধা চলে সে যে যৌবন চঞ্চলা
নিত্য নব অনুরাগে নীলিম অঞ্চলা।
চলে চলে চলে সে যে গুপ্ত মনোসুখে
ফুটায়ে রক্তিম পদ্ম ধরণীর বুকে।
—ফুটায়ে রক্তিম পদ্ম শত মর্ম মাঝে
আজো রাধা চলে সে যে অপরূব সাজে।
অলক্তের দাগ,
আজিও ধরণী বক্ষে সৃজে অনুরাগ।

যে দিন ছিলো না মাস বছর লগন
সেই দিন হতে রাধা চঞ্চল চরণ

চলিছে ছুটিয়া নিত্য বাধা-বন্ধহীন,
নীরব স্রষ্টার বুকে বাজাইয়া বীণ
অনাগত সৃষ্টি মাঝে বিদ্যুল্লতিকা
অনন্ত যৌবনা সে যে দীপ্ত কিশোরিকা।
আজো রাধা চলিতেছে জীবনের পথে
শত মর্মলোক মাঝে যৌবনে রভসে
চলিছে বিদ্যুৎগতি সে চির চঞ্চলা
চঞ্চল চরণ ছন্দে চঞ্চল অঞ্চলা,
উড়ায়ে অঞ্চলখানি শত মর্মাকাশে
মুগ্ধ করি নিখিলেরে মন্দ মৃদু হাসে।
বিজয়িনী চলে নিত্য হাসিয়া হাসিয়া
দুর্বার যৌবনাবেগে উচ্ছ্বাসে নাচিয়া।
ঘন বরষার রাত্রে নিঃসঙ্গ শয়নে
আজিও কাঁদিছে রাধা বিনিদ্র নয়নে।
বাহিরে বিশাল বিশ্বে চলে মাতামাতি
উন্মাদ-পবন যেন বাদলের সাথী;
তুফান চলিছে আজি ভুবনের দ্বারে,—
তুফান চলিছে আজি হৃদি পারাবারে;
একেলা কাঁদিছে রাধা মর্মে আপনার,
শূন্য এ ভবন তার করে হাহাকার,
গৃহ আজ গৃহ নয় এযে কারাগার,
গান আজ গান নয় শুধু হাহাকার।
রুদ্ধ গেহে বন্ধ প্রাণ গুমরিয়া মরে,
উতলা পবন আজি কেঁদে কেঁদে ঘোরে।
বন্ধনীতিবিদ্,
নাসিকা কুঞ্চিত করি, চোখে নাহি নিদ্
কি ভাবিছ বসি বসি শুধু ব্যভিচার?
নদী যবে ভাঙে কূল কে ঠেকায় তার
যৌবন তরংগ বেগ দুর্দম দুর্বার?
একূল ও কূল তার হয় একাকার।
যৌবন তরংগ ভংগে নেচে নেচে যায়
ভাঙি সর্ব বাধা ভয় দুর্বার প্রবাহে,
আপন প্রাণের বেগে প্রাণের সন্ধানে,
কানে তার পশে আসি অনন্তের গান;

অক্ষম ক্লীবের বাহু সে কি কভু মানে
অলংঘ্য সৃষ্টির বেগ যদি তারে টানে!
সমাজ সংসার সব পিছে পড়ি রয়
অনন্তের বংশীরব পশে তার কানে
জীবন সাধন ধন ডাকে বংশী তানে।

উচ্ছল যৌবনে যার জাগিছে পরাণ
অন্তরে উদ্বেগ মধু করে আনচান্
পরিপূর্ণ রসভারে বিকাশের লাগি
অসীম আগ্রহে আর অস্থির আবেগে।
একূল ওকূল তার হল একাকার
ঘরকে বাহির করে বাহিরেরে ঘর;
মনই যার হল বন, বন হল মন
মনে বনে একাকার সদা সব ক্ষণ,
পূর্ণ করি সর্ব শূন্য নিত্য প্রাণ রসে
জীবন-মরণ যার একাধারে পশে
দ্বন্দ্বাতীত ছন্দোময় মোহানার কূলে
তাহারে বাঁধিবে কেবা ক্লীববন্দীশালা?
অক্ষম ভীরুর বাহু?　পালা ওরে পালা।

'পরম প্রেমযোগে যে পুরুষ প্রকৃতি ভাবাপন্ন হন, তিনি রাধা-ভাবাপন্ন হন স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য পরম প্রেমযোগে যে পুরুষ প্রকৃতি স্বভাব-সম্পন্ন হন, তিনি রাধার স্বভাবসম্পন্ন হন স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু রাধাই পরাপ্রকৃতি এবং পরাশক্তি।'

শ্রীনিত্যগোপাল

প্রাচীন ইরাকের পুরাণকাহিনী

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রকৃতি ও মনুষ্য সমাজের মধ্যে যে শৃংখলা (ওয়ার্লড্ অর্ডার) বিরাজ করছে, সেই শৃংখলার উৎপত্তি প্রণালী ও ধারা সম্বন্ধেও কতগুলি কাহিনী আছে। সুমেরীয়দের বিশ্বরাষ্ট্ররূপের কল্পনা বিষয়ে পূর্বে অনেক কথা বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়ম ও সমাজ শৃংখলা সেই সার্বজনীন রাষ্ট্রেরই বিধান। বিশ্বরাষ্ট্রের সেই বিধানকে প্রবর্তন ও সংরক্ষণের ভার জল-দেবতা এনকির ওপর। এই ভার দিয়েছেন তাকে দেবাদিদেব আনু ও দেব-সেনাপতি এনলিল। কৃষির জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থাসমূহ পরিদর্শন করেন এনকি, ধরণীকে শস্যশ্যামলা করে তোলেন তিনি। নদী জলে ভরে ওঠে, মাছ ছুটোছুটি করে বেড়ায় তার মধ্যে, এ-ব্যবস্থা তাঁরই। কৃষি-কার্য, ইষ্টক ও গৃহাদি নির্মাণ প্রভৃতি তত্ত্বাবধান করে তাঁরই পরি-দর্শকেরা। দেবতার সুব্যবস্থায় পৃথিবী সত্যই উপভোগ্য হয়েছে, কিন্তু এ সত্ত্বেও মানুষের জীবন মংগলময় হয় নি। জন্ম থেকে ব্যাধিগ্রস্ত এমন মানুষ আছে—আর আছে ক্লীব নপুংসক বন্ধ্যা নারী, জরা। দেবতার প্রশাসনের এই সব ত্রুটি বিচ্যুতির অনুব্যাখ্যান প্রয়োজন। এ-বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা পাওয়া গেছে মৃৎলিপি লেখনে, কিন্তু চাকতিটি পাওয়া গেছে ভগ্নাবস্থায়, তাই সম্পূর্ণরূপে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। স্থূলভাবে যে ধারণা করা যায় এই ভগ্ন চাকতিটির লিখন থেকে, তাই এখানে বলা হল :

এনকি-নিনমা আখ্যায়িকা : প্রথমেই বলা হয়েছে সেকালে জীবিকা-নির্বাহের জন্য দেবতাদেরও পরিশ্রম করতে হত। কাস্তে দিয়ে শস্য কাটতেন তাঁরা, কুড়ুল দিয়ে কাটতেন গাছ। খাল কাটতেন—খাদ্যের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হত তাঁদের। কিন্তু কায়িক পরিশ্রম তাঁরা ঘৃণা করতেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শৃংখলা-রক্ষার ভার যে দেবতার ওপর, সেই জলদেবতা এনকি তখন অনন্ত শয্যায় ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁর কাছে এলেন দেবতারা, এবং তাঁদের সংগে তাঁদের মাতা নামমু (Nammu) যিনি পাতালের দেবী। তারপর কিরূপে পাতালের উপরিভাগে একটি কর্দমের স্তর প্রস্তুত করে' তার ওপর পৃথ্বী-দেবী নিনমা'কে (Ninmah) প্রতিষ্ঠিত করা হল তার বর্ণনা আছে। কিন্তু এখানেই ভাঙা চাকতিটির বিবরণীতে একটি বৃহৎ ছেদ ঘটেছে। মানব জাতির সৃষ্টির কথা লেখা ছিল চাকতির যে স্থানটিতে, সেই জায়গাটি গেছে ভেঙে, তাই এখানে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয় আমরা কিছু জানতে পারি নি। তারপর গল্পের যে বোধগম্য অংশ তা এইরূপঃ জল-দেবতা এনকি

[illegible] নিনমা ও তার মাতাকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করেছেন। শ্রেষ্ঠ দেবতারাও নিমন্ত্রিত অতিথি। সুদক্ষ কর্মী এনকির প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ, কিন্তু এই প্রমোদোৎসবের মধ্যেও সুরু হয়ে গেল বাগ্‌বিতণ্ডা। এনকি ও নিনমা উভয়েই অতিরিক্ত মদ্যপান করেছিলেন। মত্তাবস্থায় পৃথ্বীদেবী নিন্‌মা জল-দেবতাকে খোঁচা দিয়ে পরুষকণ্ঠেই বললেন, "আসলে মানুষের শরীরের আবার ভাল মন্দ কি? খুশী মত আমি তার শরীরকে ভালও করতে পারি মন্দও করতে পারি।" প্রত্যুত্তরে এনকি বললেন, "ভাল বা মন্দ মানুষের দশা যেমন ইচ্ছা তৈরি করতে পার তুমি, এ-কথা যদি সত্য হয়—তাহলে আমিও তোমার তৈরি ভাল দশাকে করতে পারি মন্দ, আর মন্দ দশাকে করতে পারি ভাল, তা-ও তেমনি সত্য।"

তখন আরম্ভ হল উভয়ের উভয়কে পরীক্ষা। পৃথ্বী দেবী খানিকটা কর্দম তুলে নিয়ে ছয়টি বিকলাঙ্গ পুরুষ নারী নির্মাণ করলেন—তারা হল কেউ জন্ম থেকে মূত্রাশয়ের ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ, কেউবা বন্ধ্যা স্ত্রীলোক আর কেউবা নপুংশক। সঙ্গে সঙ্গেই এনকি এদের প্রত্যেকেরই সমাজ-জীবনে এক একটি স্থান নির্ণয় করে দিয়ে তাদের মন্দের প্রতিকার করলেন। নপুংশক হল রাজার খোজা-ভৃত্য এবং বন্ধ্যা স্ত্রীকে করা হল অন্তঃপুরে রাজ্ঞীর পরিচারিকা। এমনি করে বিকলাঙ্গ নরনারীর গতি করে দিলেন এনকি। তারপর প্রস্তাব করলেন, "এবার আমি সৃষ্টি করবো মানুষের দশা। পার যদি কর দেখি তার প্রতিবিধান।" তারপর তিনি মানুষের নানা দশার সৃষ্টি করলেন—কিন্তু ঠিক এইখানেই চাকতি আবার ভেঙে যাওয়ায় দশাগুলির বিবরণ ধ্বংস পেয়েছে। সুধু পাওয়া যায় একটি অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির বিবরণ। তার জীবন নিঃশেষিত হয়ে আসছে, চোখে দেখতে পায় না সে। তার হাত কাঁপে, যকৃত ও হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা। এমনি একটি জীব সৃষ্টি করে নিনমাকে বললেন এনকি, "তোমার সৃষ্ট ব্যক্তিদের জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা করেছি আমি, এখন তুমি আমার সৃষ্ট মানুষের বাঁচবার উপায় করে দাও।" নিনমা পড়লো ফাঁপড়ে। প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারে না এই জীবটি। এক টুকরো রুটি দিলে সেটি যে তুলে নিয়ে যাবে, এমন শক্তিও নেই তার। এমন লোককে বাঁচাবে কেমন করে নিনমা? চটে মটে বললে সে, এটা মানুষই নয়। এনকি করে তাকে ঠাট্টা। ভগ্ন মৃৎখণ্ডের লিপি-লেখন থেকে এটা বেশ বোঝা যায় যে, বার্দ্ধক্যজনিত আধি ব্যাধি এনকি সৃষ্টি করেছিলেন নিনমাকে জব্দ করবার জন্য। দেবতার পক্ষে যা ছিল খেলা মাত্র মানুষের পক্ষে তাই হয়েছে মৃত্যু। নিনমা পারে নি জগৎ শৃঙ্খলার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমাজ জীবনে আধি ব্যাধির একটি স্থান করে দিতে। ক্ষোভে রোষে নিনমা তখন এনকিকে এই বলে অভিশাপ দিলে যে, এখন থেকে জল-দেবতা স্বর্গেও থাকবেন না, পৃথিবীতেও থাকবেন না—তাঁর বাসভূমি হবে পাতাল পুরীর অন্ধ গহ্বরে। কাহিনীটি পরিসমাপ্তি হল, টিলমান উপাখ্যানে যেমন দেব সমাজের উপরোধে উভয়ের মধ্যে আপোষ হয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবে।

এনলিল-নিনলিল উপাখ্যান ঃ কাহিকাটিতে চন্দ্র ও তার তিন ভ্রাতার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। চন্দ্রের ভাইরা সব পাতাল-পুরীর বাসিন্দা। এমন উজ্জ্বল রজত শুভ্র চন্দ্র-দেবতা, তার ভ্রাতৃগণ পাতাল-পুরীর অধিবাসী হল কিরূপে? আখ্যায়িকায় নগরের প্রাচীন নাম আর নদী নালার বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নায়ক-নায়িকার রঙ্গভূমি সুমের-দেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর-রাজ্য নিপ্পার (Nippur)। সেখানে একটি দেব-সমাজ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর নাটকের মূল ভূমিকায় যারা অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরাও দেবতা। নায়ক প্রবল শক্তিমান ঝঞ্ঝার দেবতা, যার নাম এনলিল। নায়িকা দেব-কুমারী নিনলিল। কুমারীর মাতা দেবী নিনসে-বারগুনু।

মাতৃদেবী কুমারী কন্যাকে নদীর জলে অবগাহন করতে বার বার বারণ করেছিলেন,—

"ওগো, স্বচ্ছ নদী-নীরে করিস নি স্নান,
পার বেয়ে নালার তটে উঠিস নি, নিনলিল।
দীপ্ত দুটি আঁখির ঠারে চাইবে তোর পানে প্রভু এনলিল,
দীপ্ত চোখ মেলে রবে গিরিশন্ত পিতা,
চুপি চুপি দেখবে তোকে রাখাল-দেবতা,
বুকে তুলে লবে তোরে, মুখে দেবে চুমু।"

মার মানা শুনলে না তরুণী, আর কোন্ তরুণীই বা তা শোনে? সে গেল নদীর ঘাটে। মা যা বলেছিলেন হলও ঠিক তাই। এনলিল দেখলেন নিনলিলকে, নানা ছলে তার মন ভুলোতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই রাজি হল না সে। তখন তাকে জোর করেই গ্রহণ করলেন এনলিল। ফলে নিনলিল হল অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভে ছিল তখন চন্দ্র-দেবতা 'সীন' (Sin)।

এনলিলের এই অনাচার যখন দেব-সমাজ জানতে পারলে, তখন পঞ্চাশ জন দেবতা নিয়ে একটি সভা বসলো, আর সেই সভায় হল এনলিলের বিচার। বলাৎ-কারের অপরাধে এনলিলের শাস্তি হল, নির্বাসন।

পাতাল পুরীতে (Hasles) নির্বাসন। এনলিল চললেন সেখানে দেব-সভার আদেশ পালন করতে, আর তাঁর পিছে-পিছে চললো নিনলিল। এনলিল চান না, দীর্ঘ পথ সে তাঁর অনুসরণ করে। তাঁর ভয় হল, মেয়েটাকে অসহায় অবস্থায় একাকিনী পেয়ে তিনি নিয়ে যেমন অত্যাচার করেছেন তার ওপর, তেমনি জুলুম আর কেউ করতে পারে। পথে একটি নগরদ্বারে এসে প্রথমেই চোখে পড়লো জনৈক দ্বার রক্ষক। তখনই মাথায় একটা বুদ্ধি খেললো এনলিলের।

"ডেকে বলে দ্বার-রক্ষকেরে এনলিল;
হে দ্বারের মানুষ, ওহে খিলের মানুষ,
ওগো তালার মানুষ, পবিত্র আগল-ধারী মানুষ,

তোমার রাণী নিনলিল আসছেন।
সে যদি জিজ্ঞেস করে আমার কথা
কোথায় আমি, সে-কথা ব'লো না তারে।
...　　...　　...　　...
কী মধুর, রূপসী কুমারী,
সাবধান! আলিঙ্গন ক'র না তারে, চুম্বন কর না।
কত মধু কত রূপ নিনলিলের,
এনলিল দেখেছে তারে দীপ্ত আঁখি দিয়ে।"

তারপর দ্বার-রক্ষকের পরিচ্ছদ পরে তার স্থান গ্রহণ করলে এনলিল। নিনলিল সেখানে এল, চিনতে পারলে না এনলিলকে। মনে করলে, সে দ্বার-রক্ষক। তখন সেই ছদ্মবেশী দ্বার-রক্ষক বললে, এনলিল তার প্রভু, তিনি তাকে আদেশ দিয়েছেন নিনলিলকে গ্রহণ করতে। নিনলিলও বললে, তার গর্ভে আছেন চন্দ্র-দেবতা সীন। তাই শুনে এনলিল বিব্রত হয়ে পড়েছেন এমনি ভান করলেন। বললেন, প্রভুর ঔরসে যার জন্ম সেই সোণার চাঁদকে পাতালের অন্ধকূপে নিয়ে যাবে কেমন করে? সে তখন প্রস্তাব করলে, নিজে সে উৎপাদন করবে একটি পুত্র-সন্তান যে প্রভু-পুত্র চন্দ্রমার স্থান অধিকার করে পাতালপুরীতে যাবে।

"প্রভুর সোণার চাঁদ ছেলে যাক স্বর্গে
আমার ছেলে যাক পাতালপুরীতে।
প্রভুর ছেলের বদলে আমার ছেলেটি যাক পাতালে।"

আলিঙ্গন করলেন তিনি নিনলিলকে, গর্ভের সঞ্চার হল। চন্দ্র-দেবতার একটি ভাই জন্মালো। আবার চললেন এনলিল, নিনলিলও পিছু নিল। আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হল। এবার এনলিল ধরলেন খেয়াঘাটের পাটনীর বেশ। নিনলিলের গর্ভে তৃতীয় সন্তান জন্মালো। তারপর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ও চতুর্থ সন্তানের জন্ম। কবিতাটি হঠাৎ এইখানে এনলিলের একটি স্তব গানের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়েছে। "জয় জয় প্রভু এনলিল, জয় জয় মাতা নিনলিল।"

আখ্যায়িকাটি সুরুচির পরিচয় দেয় না সত্য, কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে সভ্যতার সেই ঊষাক্ষণে সকল সমাজেই নারীর মর্যাদাকে মূল্য দেওয়া হত খুবই অল্প। কুমারীর ধর্ষণ তার নিজের লাঞ্ছনা নয়, লাঞ্ছনা তার অভিভাবকের। বিবাহিতা নারীর নির্যাতন তার স্বামীর প্রতি অপরাধ। আর সে অপরাধ সামাজিক, নারীত্বের অপমান গণনার মধ্যেই আসে না। এই সময়ের বহু শতাব্দী পর ভারতের সুসভ্য বৈদিক যুগেও নারী-ধর্ষণ দেখতে পাই আমরা। মহাভারতের আদি পর্বে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। একজন ব্রাহ্মণ উদ্দালক-পত্নীকে তার স্বামীর ও পুত্রের সামনেই জোর করে' ('বলাৎ ইব') অন্যত্র নিয়ে গেল। পুত্র শ্বেতকেতু রেগে-মেগে উঠলেন। কিন্তু উদ্দালক বললেন, "তাত! রাগ কর না, ধৈর্য ধর। এবং ধর্ম্ম

সন তনঃ (আদিপর্ব ১।১২২।১৪)।" তিনি আরও বললেন, "পৃথিবীতে সর্ব-বর্ণের অঙ্গনাগণ অনাবৃতা। মনুষ্যেরা স্ব স্ব বর্ণের নারীর সঙ্গে গো-বৎ আচরণ করে।" উদ্দীপক বৃহদারণ্যক উপনিষদের একজন ঋষি, যাজ্ঞবল্ক্যের সমসময়িক। যাজ্ঞবল্ক্য যে-সমাজের মানুষ, সেখানেই যখন এরূপ অবস্থা তখন তার পূর্ব যুগের সমাজের উপরোক্ত আখ্যায়িকাটিতে ব্যভিচার দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করা চলে কি? এই উপাখ্যানের সার্থকতা হল নীতির বিচার নয়, নিনলিলের তিনটি দেব-শিশুর জন্ম দান। সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেই উপাখ্যানটিকে বুঝতে হবে, তার ব্যাখ্যা করতে হবে। জ্যোতির্ময় চন্দ্র-দেবতার তিন ভাই হলো কেন, আর পাতালপুরীর শক্তি-নিচয় রূপেই বা তাদের আবির্ভাব হল কেন? এই সব প্রশ্নের যে-জবাব ফুটে উঠেছে মানস-লোকে, সেই মনস্তত্ত্বের বিষয়গুলিকে ভাষায় রূপ দেওয়া হয়েছে কাহিনীটিতে। এনলিল বাত্যা-দেবতা, বিশৃঙ্খল উন্মাদশক্তি, ঊর্ধ্বতন জগতেই বিরাজ করেন তিনি। এই উদ্দামবন্ত দেবতা মানে না কোন সমাজ ব্যবস্থা, তার অস্থির প্রকৃতিই হলো তার দেব-সমাজ থেকে নির্বাসনের কারণ। ঊর্ধ্বলোকে তিনি জন্ম দিয়েছিলেন উজ্জ্বল চন্দ্রদেবতাকে, আর সেই শক্তিমান প্রভু পাতালে অন্ধ-গহ্বরে ঢুকে নারকীয় শক্তিপুঞ্জ সৃষ্টি করলেন। এনলিলের শিশুসন্তান স্বর্গীয় ও নারকীয়—এমন বিপরীত-ধর্মী হল কেমন করে? না, এনলিলের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সেই বিরুদ্ধ-ধর্ম, আলোর মাঝে আঁধার। মিথটির পিছনে রয়েছে বিশ্বের রাষ্ট্ররূপ কল্পনা। এনলিল, নিনলিল, সীন সকলেই প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের বিভিন্নরূপ।

সারা বিশ্বকে রাষ্ট্ররূপে কল্পনা করে দেবতাদের রাজ্যের শাসক সম্প্রদায় বলে মনে করা হত। বিশ্ব-রাষ্ট্রের পটভূমিকায় এই-যে পুণ্য-কথাগুলি রচিত হয়েছিল, তাই থেকেই আমাদের সুমেরীয় ধর্মের মর্ম গ্রহণ করতে হবে। দর্শন-তত্ত্বের আবির্ভাব হয় নি তখনো, সুমেরীয়দের ধর্ম দর্শন চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কোন্ যুক্তি সিদ্ধ আর কোন্ যুক্তিটিই বা অসিদ্ধ, এ-রকম তর্ক বিচার তখনো মানুষের মনে জাগেনি। সম্ভব-অসম্ভব বিচার শূন্য যুক্তি-তর্ক বর্জিত আদিম মনোবৃত্তি, যা দেখতে পাই আমরা আদিম জাতির সমাজে, সেই মনোবৃত্তিকে পরিত্যাগ করতে পারে নি তখনো সুমেরীয়রা। মানুষ জীব-জন্তু যেমন জীবন্ত, বিশ্ব-প্রকৃতির অন্যান্য বস্তু—যেমন উদ্ভিদ, পাথর, নক্ষত্র প্রভৃতি—তারাও তেমনি প্রাণবন্ত। এই আদিম বিশ্বাস, যাকে বলে animism বা animatism—এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পেয়েছি আমরা 'লবণ-স্তুতি'র মধ্যে। অর্থাৎ যখন লবণকে ব্যক্তি-রূপে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,—"হে লবণ, তোমার জন্ম শুদ্ধ স্থানে। এনলিলের বিধানে তুমি হয়েছ দেবগণের খাদ্য" ইত্যাদি। এখানকার ধর্মে ছিল বহু দেবতা, সবই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি—সর্বশক্তির মূলাধার কোন আদি-কারণের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। একেশ্বরবাদ কল্পনায় আসে নি তখনো।

মনের গহনে

সুবোধ সেনগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৫)

রেস্তোরা কারে ছোট একটি টেবিলে দুইদিকে বসে আছে রিণি ও অপরেশ। অদূরে অনুরূপ আর একটি টেবিলে বীরেন ও গীতা। ভাগ্যে চারজনের মত টেবিলগুলি সবই ভর্তি ছিল, তাই এমনি স্থানেই তাদের বেছে নিতে হয়েছিল। তাছাড়া বীরেন ও গীতা, তারাও চাইছিল অপরেশ ও রিণি আলাদা হয়ে বসুক। নিজেদের দিক থেকে প্রয়োজন ছিল কিনা জানা যায়নি, তবে তারা অপরের প্রয়োজনে উদারতা ও মহত্ত্ব দেখাতেই চাইছিল সবচেয়ে বেশী। রিণির প্রতি অপরেশের পক্ষপাতিত্বের কথা যে তারা একেবারে জানত না তা নয়।

রিণির খাবার খাওয়া শেষ হয়েছে। অপরেশকে এক পেয়ালা চা ঢেলে দিয়ে রিণি নিজের জন্য এক কাপ চা ঢেলে নিল, তারপর নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। এতক্ষণ তারা একটি কথাও বলেনি। অন্যান্য টেবিলে কাঁটাচামচের ঠক্ ঠক্, কথাবার্তা সজোরে চলছিল, অদূরে বীরেন ও গীতা তখন প্রায় উচ্চৈঃস্বরে ভারতীয় কৃষ্টি ও দর্শন সম্বন্ধে তুমুল তর্ক বাধিয়ে দিয়েছে।

অপরেশ আর চুপ করে থাকতে পারছিল না। সে রিণিকে জিজ্ঞেস করল, "শরীর কি তোমার খুবই খারাপ বোধ হচ্ছে রিণি?"

রিণি চোখ তুলে তাকাল, ধীরকণ্ঠে বলল, "না।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"বল।"

"বিনয়বাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন, এ কথা ত কই তুমি আমাকে আগে বলোনি।"

"আমি জানতাম না, তাই বলিনি।"

"বিশ্বাস করতে পারি কি সহজভাবে?"

"সে তোমার ইচ্ছে, কিন্তু আমি সত্যিই জানতুম না বিনয়দা আসবেন।"

"কি কথা হোল জানতে পারি কি?"

রিণি উত্তর করলে না। একদিন আগে যদি অপরেশ এ প্রশ্ন করত তাহলে হয়ত অতি সহজভাবে উত্তর দিতে পারত, কিন্তু আজকে পারলে না, এখন আর পূর্বের মত সহজ সরল মানসিক সম্পর্ক বিদ্যমান নেই। সে চুপ করে গেল। তারপর অনেকক্ষণ উভয়ে চুপচাপ। এদিকে গাড়ীর মধ্যে যাত্রীদলের কোলাহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। চা খাওয়া শেষ হয়েছে সকলেরই, রাত্রির জড়তা যা কিছু ছিল

সব গেছে কেটে, উৎসাহে তর্কের মাত্রা বেড়ে গেছে। এদিকে অপরেশ ও রিণি শুধু নির্বাক।

অপরেশ আবার কথা আরম্ভ করলে। "তোমার এরূপ নির্বাক অবস্থা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, রিণি। এখানের কথা বলছি না, আমাদের দলের লোকদের কথাই বলছি। তারা বুঝে উঠতে পারছে না তোমার মত মেয়ে চুপ করে আছে কি করে?"

"মানুষের কি চুপ করে থাকার অধিকারও নেই?"

"তা থাকবে না কেন রিণি? তবে যার যেটা স্বভাব নয়, সেটা তাকে করতে দেখলে সবাই একটু অবাক হয়ে যায় কিনা তাই বলছিলাম।"

"আমার মনটা ভাল নেই অপরেশ, আমি অনুরোধ করছি আমাকে আর বিরক্ত করোনা।"

অপরেশ রিণির কাছ থেকে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করেনি। সে বুঝতে পারল রিণির ব্যথা কোথায়। ঈর্ষায় সে জ্বলে উঠল। কিন্তু নিজের রাগ প্রকাশ করা তার স্বভাব নয়। সে বলল "তোমাকে বিরক্ত করতে সত্যিই আমি চাইছি না রিণি। তোমার হয়ত শরীর মন ভাল নেই এ অবস্থায় তোমাকে যদি একটু আনন্দ দিতে পারতাম, সেই আশায়ই কথা আরম্ভ করেছিলাম, তা তোমার যদি আপত্তি থাকে তবে চুপ করেই থাকি।"

অপরেশের কথায় রিণির মনটা নরম হয়ে এল। সে লজ্জিতকণ্ঠে বলল, "না, না তুমি কিছু মনে করো না অপরেশ, আমার মনটা ভাল নেই বলেই চুপ করে ছিলাম।

সাহস পেয়ে অপরেশ বলল, "মন খারাপের কারণ ত জানতে পারলাম না রিণি। কিছুদিন যাবৎ তুমি আমার কাছে সব কথা খুলে বলছিলে। বিনয়বাবুর প্রতি তোমার ছেলেমানুষি মনোভাবের কথাও গোপন করনি। কিন্তু আজকে এরকম ব্যবহার কেন?"

"ছেলেমানুষি মনোভাব? কার প্রতি বলেছি?"

"কেন বিনয়বাবুর প্রতি?"

"সত্যি বলেছি?"

"হ্যাঁ, বলেছ।"

"যদি বলে থাকি তবে ঠিক কথা বলিনি।"

"এ কথার অর্থ?"

"অর্থ তেমন কিছু নয়, তবে একথা বলে তাঁকে অশ্রদ্ধা করেছি অপরেশ।"

"কেন?"

"আমি তাঁকে পরিহাস করেছি বলে। আমি জীবনের প্রতি মুহূর্তকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি। যদি তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভালবাসায় গিয়ে মিশে থাকে, তাহলে সেই মুহূর্তকে আমি হারিয়ে ফেলে কি করে তাঁকে পরিহাস করলাম, তাই

আমি ভাবছি অপরেশ।"

"তাহলে তুমি আজও তাঁকে ভালবাস রিণি?"

"সে কথাত আমি বলিনি। আমি বলছি সেই মুহূর্তের কথা, যে মুহূর্তের কথা উত্থাপন করে আমি তাঁকে অশ্রদ্ধা জানিয়েছি।"

"আমি তোমার সব কথা বুঝি না রিণি। আমি শুধু এইটুকু বুঝি যে তুমি অতীতের সেই মুহূর্তকে আজও ছাপিয়ে উঠতে পারনি। তোমার মনোভাব আজও তেমনি রয়েছে।"

"কে বলেছে একথা?"

"তুমি বলছ।"

"ভুল করছ অপরেশ আমি সে কথা বলিনি। যদি ছাপিয়ে নাই উঠতে পারতুম, তবে আজ এমনিভাবে চলে এলাম কি ক'রে। তা নয়, আমি ভাবছি আমি ভুল করলাম কেন?"

"কিসের ভুল?"

"না কিছু নয় অপরেশ, কিছুই না। তুমি বুঝতে পারবে না আমি আজ কি ভাবছি। আজকের জন্য তুমি চুপ ক'রে যাও, তারপরে তুমি যা ইচ্ছে তাই জিজ্ঞেস করো। আমি উত্তর দেব।"

অপরেশের ঈর্ষানল ততক্ষণে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। বহুদিনের চাপা মনের বেদনা আজ তাকে দুঃসহ ব্যথা দিচ্ছে। সে চুপ করে যেতে পারল না। সে রুদ্ধ কণ্ঠে বল্লে, "বিনয়বাবু যে তোমার সবটা জুড়ে রয়েছেন সেকথা আমি বুঝতে পারছি রিণি। কিন্তু কেন? কেন তুমি তাকে ভালবাসবে? আমি তার চেয়ে নিকৃষ্ট কিসে বুঝিয়ে দাও। ধনে, মানে, বিদ্যায়, রূপে, গুণে আমি ত তার চেয়ে নিকৃষ্ট নই? তবে কেন তুমি তাকে ভালবাসবে?"

রিণি হেসে বল্লে, "এবার তাহলে তুমি সত্যিই চটে গেছ। কে বলেছে তুমি তাঁর চেয়ে নিকৃষ্ট? সত্যিই তুমি তার চেয়ে কোন অংশেই কম নও, কোন ভাবেই নিকৃষ্ট নও, তুমি তাঁর চেয়ে অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠ।"

"তবে?"

"কিসের তবে?"

"কিসের তবে বুঝতে পারছ না?"

"না। কিন্তু, অপরেশ, আবার তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি চুপ ক'রে যাও, আমার একান্ত অনুরোধ জেনো। তুমি উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক প্রশ্ন এনে ফেলেছ। আজ তোমারও মন ভাল নেই অপরেশ, শুধু আজকের জন্য তুমি শান্ত হয়ে থাক। অনর্থক বাজে কথার জাল সৃষ্টি ক'রে আর যাত্রাপথটিকে অসুন্দর ক'রে তুলোনা।"

অপরেশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। সে কঠিনস্বরে জবাব দিলে, "এ তোমার

কথার ফাঁকে আসল প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয় রিণি।"

"তাই কি?"

"হ্যাঁ তাই। তুমি বহুদিন যাবৎ আমাকে এড়িয়ে এসেছ, আর আজও এড়াতে চাইছ। এর কারণ কি? যা বলবার স্পষ্ট করে বল্লেই সব চুকে যায়। হেয়ালীর প্রয়োজন কিছু আছে কি?"

"হেয়ালি মানে?"

"হেয়ালি ছাড়া আর কি, কোন রকমেই তোমার নিজেকে তুমি প্রকাশ করছ না, একবার এইদিকে, আর একবার অন্যদিকে, এরূপ ভাব নিয়ে জীবনে চললে কি জীবনের গতি বন্ধ হয়েই যায় না?"

"তা যায় সেটা আমি অস্বীকার করছি না অপরেশ, কিন্তু আমি যে ওভাবেই চলছি তার প্রমাণ কি তুমি কিছু পেয়েছ?"

"নিশ্চয়ই পেয়েছি। তুমি কি মনে কর তোমার অনিশ্চিত ভাবধারার কথা আমি একেবারেই বুঝতে পারি না? এতই কি আমি বোকা?"

"না, নিশ্চয়ই তুমি বোকা নও অপরেশ, এ অপবাদ শত্রুও তোমাকে দিতে পারবে না। কিন্তু তুমিই কি আমাকে একদিন বলনি যে তুমি আমার জন্য সারা-জীবন অপেক্ষা করবে, আমাকে জীবনসঙ্গিনী পেতে তুমি যে কোন প্রকার ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত? আমার অপরাধ কোথায় আমি জানি, নিজেকে মনের কষ্ঠি-পাথরে যাচাই না করে দেখে, তোমাদের দুজনের সাথেই সমভাবে মিশেছি এবং তোমাদের দুজনের মত অত তাড়াতাড়ি মন স্থির করে নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করে বসিনি। এ আমার অপরাধ হয়েছে অবশ্য তোমাদের দিক থেকে। কিন্তু সমস্যা যেখানে আমার জীবন মরণের সেখানে ভালভাবে চিন্তা করে দেখব সে অধিকারও কি আমার থাকবে না?"

"তা কেন থাকবে না, সে অধিকার ত রয়েছেই আর তাছাড়া যে প্রতিশ্রুতির কথা তুমি উল্লেখ করছ, সে প্রতিশ্রুতি আমি আজও পালন করতে প্রস্তুত। তোমাকে জীবনসঙ্গিনী পাবার আশায় আমি যে কোন ধৈর্য পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারি।"

"এই কি তার রূপ অপরেশ, ভেবে দেখ, যে অভিযোগ আমার উপর তুমি এনেছ, সেই অভিযোগ কি তোমার ধৈর্যের পরিচায়ক?"

"কেন নয় বল? অতীতের কথা ভেবে দেখ, আমি তোমার জন্য কি না করেছি, একবার ভেবে দেখ আমি আমার সকল বান্ধবীকে পরিত্যাগ করেছি শুধু তোমার জন্য, আর তোমারই জন্য আমি জীবনের সব কিছুকে পরিত্যাগ করতে পারি।"

"তোমার অভিযোগ এবং ওটা যে অভিযোগ নয় তা প্রমাণ করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা আমাকে বিস্ময়াভিভূত করেছে অপরেশ। সে কথা যাক্, তুমি এখন কি বলতে চাও তা আমায় স্পষ্ট করে বল।

"স্পষ্ট করে কি আর বলব। স্পষ্ট করে এই শুধু বলতে পারি যে তোমায় আমি ভালবাসি।"

"সে কথা ত অনেকদিন শুনেছি এবং আমারও যে সে কথার উত্তরে জবাব দেবার সময় হয়নি, তাও তোমাকে আমি বলেছি, তবে এ অধীরতা কেন?"

অপরেশ চুপ করে রইল। জবাব দেবার তার কিছু নেই। রিণি জানলার মধ্য দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। কতক্ষণ তারা এমনভাবে ছিল তা তারা জানে না। দুজনেই তখন বাস্তব জগতের বাইরে। উভয়ের জীবনে মহাসমস্যা। এবং সে সমস্যা জীবনমরণ নিয়ে। রিণি ভাবছে অপরেশের ব্যবহারের কথা, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল মনীষের সাবধান বাণী। সত্যিই ত অপরেশ শুধু তারই শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে নিজের জীবনকে পরিচালনা করছে, নিজের স্বকীয় শক্তি তার নেই বল্লেই চলে। কিন্তু একথাও স্বীকার না করে পারলে না যে অপরেশের পক্ষেও বাস্তবের ক্ষেত্রে পাওয়া না পাওয়ার সীমারেখা টেনে চলা অসম্ভব। তার আজকের উম্মার কারণ সে নিজেও বটে, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তবে পথ কোথায়? রিণি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। তীব্র বেদনার চিহ্ন তার মুখে চোখে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। রিণি তাহলে কি করবে। অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে, অশ্রু আপ্লুত মৌন আবেগে তার মন চীৎকার করে যেন বলে ওঠে 'হে ঠাকুর পথ দেখিয়ে দাও।'

অপরেশেরও চিন্তার সীমা পরিসীমা নেই। সে ভাবছে রিণির কথা, রিণি সত্যি তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারেনি, এ ক্ষোভ তার জীবন গেলেও যাবে না। কেন, সে কি এতই অনভিপ্রেত। বিদ্যায়, মানে, সম্ভ্রমে সে বিনয়ের প্রায় সমকক্ষ, কিন্তু একদিক থেকে সে বিনয়কে ছাড়িয়ে গেছে। তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থের কাছে বিনয় দাঁড়াতে পারে না। তাছাড়া মেয়েরা চায় অর্থ, সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠা। এ তিনটি তার প্রচুরভাবেই আছে, তবু রিণি তাকে চাইবে না এ কেমন করে হয়? সবচেয়ে বৈসাদৃশ্য ঠেকে বিনয়ের সঙ্গে রিণির বয়সের পার্থক্য। অপরেশ যুবক, বিনয় প্রৌঢ়। সে কি করে রিণির কাম্য হতে পারে অপরেশ বুঝে উঠতে পারে না। অপরেশ স্থির করে, আজ তাকে একটা হেস্ত-নেস্ত করতেই হবে, এমনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য রিণির ইচ্ছা অনিচ্ছাকে তোষামদ করে চলা তার পক্ষে অসম্ভব।

গাড়ী মোগলসরাই ছেড়ে গেছে। বীরেন ও গীতা একবার অপরেশ-রিণির সমাহিতভাবের দিকে লক্ষ্য করে তাদের অজানিতেই নেমে নিজ কামরায় চলে গিয়েছিল। বানারস ক্যাণ্টনমেণ্ট এল, চলেও গেল। উভয়ে নির্বাক, যেন পাষাণ দিয়ে গড়া। মাঝে মাঝে রিণির চাপা উদ্গত দীর্ঘ নিঃশ্বাস অপরেশের কাণে এসে বাজছিল। রেস্তোরার বয় ৩।৪ বার এসে মধ্যাহ্নের আহারের কথা জিজ্ঞেস করে গেছে। উভয়ের আত্মসমাহিত ভাব দেখে সে আর কথা জিজ্ঞেস কর্তে সাহস করেনি।

বেলা বেড়েই চলেছে। প্রতাপগড় আসতেই কতকগুলো লোক এসে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল, বীরেন গীতাও এল। মধ্যাহ্ন আহারের সময় হয়েছে। সবাই খেয়ে নিল, সামান্য কথা বিনিময় করে অপরেশ রিণিও খাওয়া সমাপ্ত করলে। আবার তাদের মধ্যে পূর্বের তুষ্ণীভাব। বিস্মিত যাত্রীরা তাদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে রায়বেরিলি আসতেই নেমে গেল। শুধু গেল না বীরেন ও গীতা, তারা অদূরে বসে রইল।

লক্ষ্ণৌ পার হয়ে গেল, হরদৈ গেল। এবার অপরেশের মুখে কথা ফুটল। সে জিজ্ঞেস করল, "এমনিভাবে চুপ করে আছ যে রিণি?"

"তাছাড়া উপায়ই বা কি আছে অপরেশ। কথা যখন কথার ফাঁকে বন্ধ হয়ে যায়, তখন তাকে আর চলতে না দেওয়াই ভাল।"

"তাহলে এম্নি করেই আমাদের সময় কাটবে?"

"উপায় নেই অপরেশ, সময় কাটাতে হলে এম্নিভাবেই কাটাতে হবে।"

কয়েক ঘণ্টার চিন্তায় রিণির মন যতটা সাম্য অবস্থায় ফিরে আসছিল, ততটা বিক্ষিপ্ত হয়েছিল অপরেশের মন। রিণির কথায় সে আরও হল ক্রুদ্ধ। কোন রকমে রাগ চেপে অপরেশ বল্ল, "আচ্ছা, বিনয়ের আর সমস্ত কথাই না হয় বাদ দিলুম কিন্তু বয়সের পার্থক্যের কথা কি তুমি ভেবে দেখবে না।"

"আমার যুক্তিই কি তুমি আমাকে দেখাতে চাও অপরেশ?"

"তোমার যুক্তি কি রকম?"

"একদিন আমি কথাচ্ছলে ঠাট্টা করে যে পার্থক্যের কথার অবতারণা করেছিলুম, তাই নিয়েই কি তুমি এখন আঘাত করতে চাও?"

"যদি বলি তাই।"

"তাহলে জবাব আমি দেব না।"

"কেন?"

"তাদ্বারা ক্ষতিবৃদ্ধি যদি কারও হয় তা হবে আমারই, তোমার নয়। অতএব সে প্রসঙ্গ থাক। তোমার নিজের কথা যদি বলবার থাকে তবে বলতে পার।"

"আমার নিজের কথা কি তোমার প্রসঙ্গের বাইরে?"

"না, তা হয়ত নয়, কিন্তু তবুও আর আমার দিক থেকে কোন কথা আজ আমি বলব না।"

"অর্থাৎ, তুমি আজ তোমার ভুলত্রুটিগুলো আর স্বীকার করবে না।"

রিণি চুপ করে রইল। প্রশ্ন সে এড়িয়ে গেল। অপরেশের রাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। সে রাগতকণ্ঠে বলল, "কাল রাত্রিতে তুমি মনীষের সাথে এত কি কথা বলছিলে?"

রিণি নির্নিমেষদৃষ্টিতে অপরেশের দিকে তাকাল, তারপর কিছুপরে শান্ত সমাহিতভাবে বলল, "সে কথা আমার, আমার একান্ত নিজস্ব।"

"সারারাত ধরে একজন অপরিচিত অনাত্মীয় লোকের সাথে কথা বলবে, আর যে তোমার এতদিনের বন্ধু তাকে তুমি সেকথা বলতে পারবে না?"

"বন্ধু তুমি নিশ্চয়ই অপরেশ, সে বিষয়ে আমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করছি না, কিন্তু যে কথা আমার একান্তভাবে নিজস্ব সে কথা আমার বন্ধু কেন, ভবিষ্যৎ জীবনের আমরণ সংগীকেও বলতে পারব না।"

"অর্থাৎ তুমি আমাকে সবরকমে এড়িয়ে চলতে চাচ্ছ।"

"চাচ্ছি কিনা এখনও জানি না, কিন্তু এরকম মনোবৃত্তির পরিচয় দিলে এড়িয়ে যেতে বাধ্য হব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাক্ অনেক কথা বলেছি। গাড়ী সাজাহানবাদ এসে গেল, চল নিজ কামরায় ফিরে যাই, সবাই ব্যস্ত হয়ে আছেন। তুমি আমার জন্য ভেবো না, আজ অন্ততঃপক্ষে এই দৃষ্টি আমি লাভ করেছি, যে দৃষ্টি নিয়ে আমি আমার পথ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করতে পারব। তুমি ক্রুদ্ধ হয়ো না অপরেশ, সময় আমাদের ফুরিয়ে যায়নি, আমাকে চিন্তা করতে দাও। আমি আজও কারো নই, আমার মন আজও কারো হয়নি; আজ, কাল, পরশু, একমাস, দু-মাস, একবছর, দুবছর পরে নিশ্চয়ই আমার মনকে আমি যাচাই করে দেখতে পারব, তখনো যদি তোমার ধৈর্যের সীমা না পেরোয়, আমার কাছ থেকে আমার মনের সত্যি পরিচয় তুমি নিশ্চয়ই পাবে অপরেশ। আজ এখন চল, সন্ধ্যা নেমে এসেছে, কামরায় ফিরে যাওয়া আমাদের একান্তই প্রয়োজন।"

ক্রমশঃ

'আইডিয়া যত বড়ই হোক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।...শুদ্ধমাত্র ভাব যত বড়োই হোক, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষ বস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।'

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র সঙ্গীতের নৈরাশ্যের সুর

জয়দেব রায়

রবীন্দ্রনাথের গানের মূলসুরটি কারুণ্যের, ঔদাস্যের। বাংলা দেশের প্রাণের সুরটিও যে তাই। কর্ম হইতে ছুটি, বন্ধন হইতে মুক্তি, জীবনের দেশের প্রাণের সুরটিও যে তাই। কর্ম হইতে ছুটি, বন্ধন হইতে মুক্তি, জীবনের সহস্র প্রয়োজনের তাগিদের মধ্যে অনাসক্তি সংসার বৈরাগ্যের বিচিত্র অনুভূতি বাংলার সংগীত চিরকাল প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। চর্যাপদ হইতে রামপ্রসাদ পর্যন্ত সমস্ত বাঙালী কবির গানই যেন কর্মের চাঞ্চল্যময় জীবন স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন। আধুনিক যুগ যাহাকে Escapism বলিয়া থাকে বাংলার সুরের তাই বৈশিষ্ট্য। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে জনসাধারণ যে বৈরাগ্যের দীক্ষা পাইয়াছিল, বাংলার কীর্তন বাউলে তাহার গভীর রেখা পাত হইয়াছে।

বাংলা দেশের জল বায়ু, প্রচুর বারিপাত, উর্বরা ভূমি এবং নদী প্লাবিত সমতল মাটি সমস্ত মিলিয়া বাঙালীকে করিয়াছে কর্মবিমুখ, বৈরাগী। এই অনাশক্তি বাঙালীর সাহিত্য এবং সংগীতের ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও এই সংসারে অনাসক্তি কেবল রামপ্রসাদী গানেই নয়, বৈষ্ণব গানেও প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে সংসারত্যাগী বৈষ্ণব কবিরা কি করিয়া নরনারীর প্রেমের অমন মাধুর্য ভরা গান রচনা করিলেন! তাঁহাদের কাছেই আমরা আশা করিয়াছিলাম বৈরাগ্যের সুর শুনিবার, কিন্তু তাঁহারা শুনাইলেন 'বিরহ মিলনের অভিসারের গান'। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে শুনিলেই ধরা যাইবে—নরনারীর এই মিলন গাথায় তাঁহারা সেই কারুণ্যের সুরই শুনাইয়া গেলেন। যে দুঃখানুভূতিতে দুহু ক্রোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া সেই সুরই তাঁহারা শুনাইয়াছেন একটু ভিন্নভাবে।

নরনারীর দেহের মিলনতো বাহ্যিক মাত্র, তাহাদের মনের মিলন যে সম্ভব নয়! কখনও কোন একটি মন অন্য মনকে সম্পূর্ণে নিজেকে বিলোপ করিয়া ধরা তো দেয় না? নিঃশেষ করিয়া কেহ আত্মবিলোপ করিবে না! এই যে দুইটি হৃদয়ের সংযোগে নব বিচ্ছেদের জন্ম তাহার তো সমাপ্তি নাই! বৈষ্ণব কবিতার আপাতঃ দৃষ্টির মিলন গানের অন্তরালে সেই বিরহের রোদন বাজিতে থাকে।

বাংলার লোক সংগীতের মধ্যেও সেই বৈরাগ্যের সুর। বাউলরা তাহাদের মনের মানুষের সন্ধান করে। এই মনের মানুষ মনের মাধুরী দিয়া গড়া, তাহাকে বাহিরে কোথায় পাওয়া যাইবে? তাই তাহার গানেও এই হতাশার সুর।

আমাদের সমাজে নরনারীর আলাপ পরিচয়ে অনেক বাধা, সমাজপতিরা অহরহ কঠিন পাহারা দিতেছেন। যাহাকে ভালো লাগিবে তাহার সঙ্গ পাওয়া যায় না। এই

প্রিয়-বিরহ বৃন্দাবন গীতি হইতে সুরু করিয়া যুগে যুগে নব নব রসের যোগান দিয়া আসিতেছে। কেবল লৌকিক বিচ্ছেদই নয়, কবি মানসী প্রেয়সীর বিরহেও অস্থির হইয়া পড়েন; মানসীকে তো মানবীর মধ্যে পাওয়া যায় না, সেখানেই সুরু হয় কবি-চিত্তের অভিসার, সুরের সন্ধান যাত্রা।

"আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?"

অল্প বয়সে যখন প্রেম সম্বন্ধে কবির কোন ধারণাই ছিল না তখন হইতেই অজানা বিরহ ব্যথায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"কো তুহুঁ কো তুহুঁ সব জন পুছয়ি,
অনু দিন সঘন নয়ন জল মুছয়ি
যাচে ভানু সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণ পর গোয়।"

তাহার পর তাঁহার জীবনে নারী আসিলেন কল্যাণী রূপে, কিন্তু তিনি যে কল্পনাময়ীর ছবি আঁকিয়াছিলেন এতো সে নয়! এখন যে—

"চারি দিক হতে বাঁশী শোনা যায়,
সুখে আছে যারা তারা গান গায়;
আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে, বিকচ ফুলে"

মৃত্যুর সংগে মুখোমুখী হইলেন জীবনে বার বার, প্রিয় বিচ্ছেদের বেদনা সহিলেন, বার বার নানাভাবে আসিল দুঃখ।

"কেন এই আনা গোনা,	কেন মিছে দেখা শোনা
দুদিনের তরে,
কেন বুক ভরা আশা,	কেন এত ভালোবাসা
অন্তরে অন্তরে।"

নিজের খ্যাতি, নিজের কবি-খ্যাতির আদর যতখানি আশা করিয়াছিলেন, দেশবাসীর কাছে তাহা পাইলেন না। তাঁহার মনে এ দুঃখ চিরদিনই ছিল। তাই যখন যে পৌরহিত্যেই ডাক পড়িয়াছে অভিমান ভরিয়া তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন—

"আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।"

বিশ্বকবির সিংহাসন পাইলেন, দেশ-বিদেশ জয়ধ্বনিতে ভরিয়া গেল, খ্যাতির প্রাঙ্গণতলে আসিয়া কবি দাঁড়াইলেন। তখন আবার কিসের দুঃখ? তখন দুঃখ দেশবাসীর জন্য—'ওরা তো খ্যাতি পাইল না, ওরা তো আমার পাশে দাঁড়াইবার অধিকার পাইল না।' তাই—

"বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বর তলে, ধূসর প্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে।"

তারপর জীবনকে সম্পূর্ণ উপভোগ করার পর সুখে শান্তিতে জীবন

কাটাইয়া গুরুদেবের আসনে দেশবাসীর প্রণাম পাইলেন, তখন তাঁহার দুঃখ হইল আরো গভীরতর। চারপাশে আনন্দ উৎসবের জোয়ার আসিয়াছে এযুগের তরুণ-তরুণী দল প্রমোদ উৎসবে মাতিয়াছে। তাঁহার তো যোগ দিবার উপায় নাই।

এখন এস অন্য সুরে অন্য গানের পালা,
এখন গাঁথো অন্য ফুলে অন্য ছাঁদের মালা।

তিনি কেবল তাহাদের লীলার দর্শক মাত্র, তাঁহাকে উৎসবে কেহ তো আমন্ত্রণ করিবে না। তাঁহার যে দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।

তবু সেদিন কে তাহাদের মনের কথা লয়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি,
আমি যদি ভবের কূলে বসে পরকালের ভালো মন্দ গণি।।

রাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জ মিলনে সখীদের কাজ ছিল তাঁহাদের মিলনকে রমণীয় করিয়া তোলা। সখীরা কেহ মালা গাঁথিয়া, কেহ চন্দন ঘসিয়া, কেহ কুংকুম দিয়া রাধারাণীকে সাজাইতেন, কেহ বা চামর ব্যজন করিয়া তৃপ্তি পাইতেন। রাধার সম্ভোগের মধ্যে নিজেদেরও মনে মনে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহারা ধন্য হইতেন। এই সখী ভাবের ভাবুক সমস্ত বৈষ্ণব কবি। পরিণত জীবনে কবির মনেও সেই শ্রেণীর ভাবের উদয় হইয়াছিল। নূতন যুগের তরুণ-তরুণী দলের মিলনের দিনের তিনি হইলেন গান গাহিবার সাথী—

"আমি যে গান গেয়েছিলেম শুকনো পাতার ঝরার বেলায়।
এই কথাটি মনে রেখো—তোমাদের এই হাসি খেলায়॥"

কবির দুঃখানুভূতি আরো গভীর। তিনি কেবলমাত্র মানসী প্রিয়ার বিরহেই ব্যাকুল হন নাই, মানসলোকের সন্ধানে হতাশও হইয়াছেন। এই পরিচিত পৃথিবীর জনতার মধ্যে কবি নিজেকে মিশাইতে পারেন নাই, অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, ভাবলোকের সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। খ্যাতি যতই পাইয়াছেন, খ্যাতির মূল্য যে কতো অসার তাহাও বুঝিয়াছেন।

কবির মন সতত সঞ্চরণশীল, এখনই যাহার জন্যে উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন, অল্পক্ষণ পরেই আর তাহার চাহিদা স্বীকার করেন নাই। আবার নবীনের ডাক পড়িয়াছে।

শেষের কবিতার লাবণ্য অমিতের সম্বন্ধে ঠিক্ তাই বলিয়াছিল—"ওর মনের গড়নটাই কবির, আজ ওর যা ভালো লাগ্‌ছে কাল না লাগ্‌তেও পারে।"

এই যে বিদায়ীর ব্যথা তাহা যে মর্মান্তিক। উৎসব রাত্রি শেষে মৃৎ পাত্রের মতন রজনীর সুধাভাণ্ডকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। তাহার অপেক্ষা—

তার চেয়ে যবে ক্ষণকাল অবকাশ হবে
বসন্তে আমার পুষ্পবনে

চলিতে চলিতে অন্য মনে অজানা গোপন গন্ধে
পুলকে চমকি দাঁড়াবে ঠমকি।

যাহাকে পাইবার জন্য এত প্রতীক্ষা, এতো উৎকণ্ঠা, সে আসিয়া গেলেই তো তাহারও শেষ; তাহার মূল্য যে প্রতীক্ষায়—

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ
খেলে যায় রৌদ্রছায়া বর্ষা, আসে বসন্ত॥

'পথের-আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয় ক্ষয়' করিয়া যাত্রাপথের লক্ষ্য স্থলে হাজির হইবার জন্য আর সকলের তাড়া থাকিতে পারে, কবির মোটেই নাই। কবি এই যাত্রাপথকে দীর্ঘ করিয়া যাত্রা অবসানের প্রতীক্ষার আনন্দ উপভোগ করিতে চান।

দুঃখানুভূতি আবার এই যাত্রাপথের পাথেয়। নিজের মনের মধ্যে দুঃখের দীপ জ্বালিয়া তাহার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। দুঃখকে লালন করাই কবির বিলাস! শেষে—

দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো
তোমার পায়ে এসে ঠেকল শেষে সকল সুরের সুর হলো॥

বন্ধুর রথ হৃদয়দ্বারে তখনই আসিবে যখন চোখের জলে প্লাবনে অভিমানের দুঃখ বহিয়া যাইবে—

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।।

অশ্রুজলেই সুন্দর বিধুর হইয়া উঠে ভাবলোকের বিরহ, যে দুঃখ দিয়াছে দুঃখ সহিবার ক্ষমতাও দিয়াছে,

যা হবার তা হবে।
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে।
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে পথ যে কোথায় সেই তা জানে
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায়, সেই তো ঘরে লবে॥

শ্রীমতী রাধিকাও তাঁহার আক্ষেপের মধ্যে এ আশ্বাসই পাইতেন যে তাঁহাকে দুঃখ দিতেছে সেই আবার সুখেরও সন্ধান দেবে। রাধা এই সান্ত্বনার বলেই শ্রীকৃষ্ণের উপর অভিমান করিতে পারিয়াছিলেন।

অনায়াসলব্ধ জীবন-প্রবাহের মধ্যে সে নির্ভরতা নাই। জীবন যখন শুকায়ে যায় তখনই করুণাধারায় তিনি আসিবেন। তিনি যে আসিবেন, তাহা সুনিশ্চিত. মানবযাত্রীও তাঁহার সন্ধানেই ঘর ছাড়িয়াছে অবিরাম—

তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে চলেছে মানবযাত্রী
যুগ হতে যুগান্তর পানে ঝড়ঝন্ঝা বজ্রাঘাতে,
জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর প্রদীপখানি॥

ভক্ত যেমন ভগবানকে চায়, ভগবানও তেমনি ভক্তের প্রতীক্ষা করেন, সুখের অজস্রতার মধ্যে দুঃখের নিরানন্দকে আশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতে দেবেন কেন? তাঁহার মধ্যে যে বাৎসল্য রসের পূর্ণ পাত্রটি রহিয়াছে। তিনি কি কবিকে হেলা করিতে পারেন—

রইবো তোমার ফসল ক্ষেতের পাশে
জেগে রবো গভীর উপবাসে।।

দুঃখ না আসিলে সুখকে চেনা যায় না। 'মায়ার খেলা' পালা গানে সেই বিরহ-বিচ্ছেদই তাহাদের মিলনকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল—

তোমার কাছে শান্তি চা'ব না।
থাকনা আমার দুঃখ ভাবনা।।

অশান্তির এই দোলার পরে বোসো বোসো লীলার ভরে।

অশান্তির অন্তরে যে শান্তি বিরাজমান, বজ্রে যে বাঁশীর সুর বাজে তাহার মধ্যেই রহিয়াছে পরিপূর্ণ সার্থকতা।

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো॥

কবি ওয়াডস্‌ওয়ার্থ yarrow নদীকে দেখিবার আগে যত সুন্দর মনে করিয়াছিলেন, কল্পনার তুলি দিয়া তাহার যে ছবি আঁকিয়াছিলেন, নদীকে দেখিয়া তাঁহার সে অনুভূতি ভাঙিয়া গেল। বাস্তব যত সুন্দরই হোক কখনও কল্পনার সৃষ্টির তুল্য হইতে পারে না।

এই স্বপ্নভঙ্গের সুরই বাংগলী কবির প্রধান সম্বল। লৌকিক জীবনে এ দুঃখ গভীর না হইলেও কবি জীবনে এতবড়ো নিরাশা আর নাই। সুন্দরের অন্তরালে বীভৎস যখন জাগিয়া উঠে, কুরূপ যখন দেখা দেয় তখন তো আরো গভীর দুঃখ!

রাজা নাটকে সুদর্শনা রাজাকে চোখে দেখিবার আগে মনে মনে যে ছবি আঁকিয়াছিলেন, বাস্তবের সঙ্গে তাহা মিলিল না।

সুদর্শনার দুঃখের আর শেষ রহিল না। সুদর্শনার এ দুঃখ প্রকৃতপক্ষে কবি মনেরই দুঃখ; কবি যে কল্পনা করেন বাস্তবে তাহা যখন রূপলাভ করে না, তখন অবসাদে তাঁহার মন ভরিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে বারবার এ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার গানে সেজন্য এ দুঃখানুভূতি এমন গভীরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

সুরের বেদনার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, জীবনের তুচ্ছ দুঃখানুভূতির অপেক্ষা এ বেদনা অনেক গভীর, অনেক মর্মস্পর্শী। এ বেদনা সুরই সৃষ্টি করে, সুরেই ইহার শেষ। ইহা রসের বেদনা। আমাদের অবচেতন মনে বহু আক্ষেপ, প্রেমের বহু অলক্ষ্য অনুরাগ, ব্যর্থতার বহু দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, সুরই

তাহাদের জাগাইয়া তোলে—

ওগো দুঃখ জাগানিয়া তোমায় গান শোনাব

অমায় পরশ করে প্রাণ সুধায় ভরে, তুমি যাও যে সরে

বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো।।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত গানের মধ্যে এই বেদনার রস প্রবাহিত। অজস্র আনন্দের মধ্যেও যে দুঃখ, সেই অলৌকিক রসের দুঃখ। তাহার রসে সঞ্জাত কবির গান।

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা।

পিয়ো হে পিয়ো।

মাঝে মাঝে দুঃখকে নিবিড় করিয়া অনুভবের জন্য কবি ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার মনে হইয়াছে অশান্তির আঘাতেই তাঁহার প্রাণের বীণা ঝংকারিয়া উঠিবে—

শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে

অশান্তি যে আঘাত করে তাইতো বীণা বাজে।।

কবি যাহার স্পর্শ পাইবার জন্য ব্যাকুল, একমাত্র সুরের পথ দিয়াই তাহার কাছে যাওয়া যায়—

সুরে সুরে খুঁজি তারে অন্ধকারে

যে আঁখিজল তোমার পায়ে নাবে

থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে।।

আঘাতকে ভয় থাইলে চলে? আরো আঘাত সহিবার জন্য কবি বারবার আগাইয়া গিয়াছেন—

আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো

আরো কঠিন সুরে জীবন তারে ঝংকারো॥

কোথাও বলিয়াছেন—

আরো, আরো, প্রভু, আরো, আরো।

এমনি করে আমায় মারো॥

এ সমস্তই তাঁহার সেই স্থির বিশ্বাসের ফল। তিনি জানিয়েছেন দুঃখের বেশে আসাটা তাঁহার ছল, তাঁহার প্রেমের গূঢ়তা পরীক্ষা মাত্র।

লোকের কথার বোঝা বহিয়া, মান-অপমানের লাভ-ক্ষতির হিসাব কষিয়া সারা দিনের গভীর ক্লান্তি লইয়া সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিলে, সেখানে—

আঁখিজল মুছাইলে জননী—

অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো,

ধন্য ধন্য তব করুণা।।

সেখানে তাঁহার মাতৃমমতার পূর্ণ ছবিটি

দেখেছি আজি তব প্রেম-মুখখানি

পেয়েছি চরণচ্ছায়া,
চাহি না আর কিছু—পূরেছে কামনা
ঘুচেছে হৃদয় বেদনা॥

এই তো গেল ভাগবতী অনুভূতিতে বেদনা, কবির কাছে মানবীয় দুঃখেরও শেষ নাই। কবির মনে বেদনার ঢেউ তুলিয়া যে চলিয়া যায়। তাহাকে সুর শোনানো হয় না—

আমায় পরশ করে প্রাণ সুধায় ভরে
তুমি যাও যে স'রে।

এই 'দুখ জাগানিয়া' তাঁহার গানের রসেরও জাগরণ করে, এ তাঁহারই মানসী সুরলক্ষ্মী। তাঁহারই মুখের চকিত সুখের হাসি দেখিবার জন্য কবি সারাদিন গান গাহিয়া বেড়ান। তাঁহার বাঁশী ডাক দেয়, কিন্তু তাঁহাকে দেখা যায় না, কবির বাঁশীও তাই তাঁহাকে খুঁজিয়া ফেরে। এমনি করিয়া 'কাঁদন হাসির আলো ছায়ায় সারা অলস বেলা' কাটিয়া যায়। শুধু ব্যথাই পাওয়া যায়, যে ব্যথা দেয় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না, কেন যে এ বেদনা তাহাও অজানাই রহিয়া যায়—

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম।
কে যে আমায় কাঁদায় আমি কি জানি তার নাম॥

সমস্ত হৃদয় এমনি করিয়া বেদনায় ভরিয়া যায়। ভরা হৃদয় পাত্র বহন করিয়া ফিরিতে হয়। মনে হয়—

দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার।।

এই ভাবেই প্রেমের লীলা খেলা শেষ হয়। যাবার বেলা করুণ মিনতি জানাইয়া কবি বিদায় গ্রহণ করেন—'তবু মনে রেখো'। বৈষ্ণব কবিরা জানিতেন বিরহেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। ঋতুতে ঋতুতে রাধার নব নব বিরহ রোদন তাঁহারা কাব্যে রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও তেমনি বিরহী মনের ভাবকুলতা ছয়-ঋতুর গানের নানা রঙে প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতার মধ্যে কৈশোরের স্মৃতিকে মনে করিয়াছেন—

মধ্য দিনের বিজন বাতায়ণে
ক্লান্তিভরা কোন্ বেদনার মায়া
স্বপ্নাভাসে ভাসে মনে মনে।।

বর্ষা তো বিরহের ঋতু, বাদল দিনের পুবহাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে, যূথী বনের গন্ধে, কেয়া বনের পরাগ ঝরানো ধূলায়, অশ্রুভরা বেদনায় বিরহকাতর হৃদয় জাগিয়া উঠে—

আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে
তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণ গগণ তলে।।

শরতের বেদনা—আনন্দময় বেদনা—

কী যে গান গাহিতে চাই বাণী মোর খুঁজে না পাই॥

শরৎ শেষে প্রভাত বেলায় তাঁহার বাঁশী কাহাকে দিয়া যাইবেন সে ভাবনায় কবি উদ্‌বিগ্ন হইয়া পড়িলেন।

হেমন্তে শুধু প্রতীক্ষার বেদনা, শীতে রিক্ততার দীর্ঘশ্বাস, বসন্তে আবার কোন্ বেদনা? বসন্তে মালঞ্চ ভরা ফোটা ফুলের সঙ্গে শুকনো পাতা, ঝরা ফুলের খেলা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছে। ফাগুনের সুরু হইতেই পুরাতনের যে যাওয়ার ডাক পড়ে তাহার মধ্যে অনেক গভীরতর বেদনা লুকাইয়া আছে।

তারপর শেষ বসন্তের দিনে নব পথিকের হাতে গানখানি দিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিবেন—

দিয়ে গেনু বসন্তের এই গান খানি।
তবু তো ফাল্গুন রাতে এ গানের বেদনাতে
আঁখি তব ছল ছল এই বহু মানি।।

সেই আশ্বাস লইয়া তিনি তরী ভাসান। নব নব বসন্ত দিনে নব নব বনবীথিতে এমনি নব নব তরুণ তরুণী দল এইরকম বকুল চাঁপায় ভরা দখিন হাওয়ায় পাগল করা কোকিলের ডাকে মাতিবে, নূতন কবি আবার তাঁহার বাঁশীতে সুর দেবেন। সেই সুরের সঙ্গে তাঁহারও গান যে জড়াইয়া থাকিবে—

আজি হতে শতবর্ষ পরে
আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণ তরে।।

'পূর্ণতার বিপরীত শূণ্যতা, কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার, বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ।'

—রবীন্দ্রনাথ

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

(পূর্বানুবৃত্তি)

অসংযতাত্মনা যোগে দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৬।৩৬

(পক্ষান্তরে) অসংযতাত্মনা [পুরুষোত্তমলীলারসে ডুবিয়া গিয়া সামান্য বিশেষের মধ্যে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতে পারার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ যে সংশয় সেই সংশয় বশতঃ অসংযত (উচ্ছৃঙ্খল) দেহ-ইন্দ্রিয়াদি (আত্মা) যাহার, সেই অসংযতাত্মা; তাহা দ্বারা] যোগঃ [যোগ] দুষ্প্রাপঃ [দুঃখে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দুর্লভ] ইতি [ইহাই] মে মতিঃ; তু (কিন্তু) বশ্যাত্মনা [অভ্যাস-বৈরাগ্যদ্বারা বশ্যতা প্রাপ্ত আত্মা যাহার, সেই বিশেষাত্মা দ্বারা] (কিরূপ বশ্যাত্মা?) যততা [পুনঃ পুনঃ প্রযত্নকারী] শক্যঃ অবাপ্তুম্ [যোগলাভ করিতে] উপায়তঃ [যথোক্ত উপায় দ্বারা]।

অসংযতাত্মার পক্ষে যোগ দুর্লভ, ইহাই আমার মত; বিধেয়াত্মা ও যত্নপরায়ণ যিনি তিনি যথোক্ত উপায় দ্বারা যোগ লাভ করিতে সক্ষম হন্। ৬।৩৬

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৬।৩৭

(এই প্রকারে পুরুষোত্তম-স্তরের সঙ্গে যোগাভ্যাস-অঙ্গীকরণের ফলে এই ইহ-লোক ও পরলোকের সঙ্গে যোগীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়; তখন এই স্তরের সাধন সকল কর্ম্মই তো পরুষোত্তমে অর্পিত হয়। অথচ মোক্ষ সাধন এবং যোগসিদ্ধির ফলস্বরূপ যে সম্যগ্ দর্শন, তাহাও পাওয়া হইল না, এইরূপ ভাবিয়া যে যোগীর মন যোগমার্গ হইতে অন্তকালে চালিত হয়, সে তো একেবারেই নাশ প্রাপ্ত হইল, এই প্রকার শঙ্কা করিয়া) অর্জ্জুন উবাচ [অর্জ্জুন বলিলেন] অযতিঃ [যোগমার্গে প্রযত্নহীন] (অথচ) শ্রদ্ধয়া [আস্তিক্য বুদ্ধিরূপ শ্রদ্ধা দ্বারা] উপেতঃ [যুক্ত] যোগাৎ [যোগমার্গ হইতে] (অন্তকালে) চলিতমানসঃ [ভ্রষ্টস্মৃতি; চলিত হইয়াছে মানস (মন) যাহার, সে] অপ্রাপ্য [প্রাপ্ত না হইয়া] যোগসংসিদ্ধিং [সম্যগ্ দর্শন রূপ যোগ ফল] কাং গতি [কাদৃশগতি] হে কৃষ্ণ, গচ্ছতি [লাভ করিয়া থাকে; শুধু শ্রদ্ধা থাকিলেই হয় না, চাই সেই শ্রদ্ধাকে কার্য্যাত্মক রূপে ফুটাইয়া তুলিবার কৌশল অবলম্বন। কৌশল না জানা থাকিলে শ্রদ্ধা মিথ্যাজ্ঞান প্রসূত গুণের ক্ষেত্রের স্পর্শে মলিনতা প্রাপ্ত হয়। যত্নশীল শ্রদ্ধাবানের যোগই নির্গুণ যোগ। যত্নহীনের শ্রদ্ধা হয় সাত্ত্বিক, নয় রাজস, নয় তো তামস; নির্গুণ নিশ্চয়ই নয়। ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ শ্রদ্ধার কথা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।]

অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ, যাহার যোগমার্গে শ্রদ্ধা আছে, অথচ যত্নপরায়ণ নহে, সে যদি যোগমার্গ হইতে বিচলিতমনা হয়, তাহা হইলে যোগসংসিদ্ধি না পাইয়া কীদৃশ গতি সে প্রাপ্ত হয়? ৬।৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৬।৩৮

কচ্চিৎ [একেবারেই কি?] ন উভয়বিভ্রষ্টঃ [দ্বন্দ্বপাপবিদ্ধ রাগদ্বেষযুক্ত পুরুষ তন্ত্র স্তরও ছাড়িল, অথচ পুরুষোত্তম স্তরও পাইল না—এইরূপে উভয় হইতে, ইহ ও অমুত্র স্তরের মধ্যে নানা দর্শন, অসহ দর্শন প্রাপ্ত হওয়ার ফলে, বিভ্রষ্ট পুরুষ] ছিন্নাভ্রম্ ইব্ [বিছিন্ন মেঘখণ্ডের মত] ন নশ্যতি ['ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ' হইয়া নষ্ট হয় না?] অপ্রতিষ্ঠঃ [এই স্তরে এবং ঐ স্তরে কোথায়ও দাঁড়াইতে না পাইয়া] হে মহাবাহো, বিমূঢ়ঃ। [ইহ-অমুত্রের দ্বন্দ্বমোহে আচ্ছন্ন] ব্রহ্মণঃ পথি [ব্রহ্ম-পুরুষোত্তমের পথে, ব্রজের পথে]।

এই স্তর এবং ঐ স্তর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের মত প্রতিষ্ঠাহীন, পুরুষোত্তম-পথে বিমূঢ় পুরুষ কি একেবারে বিনষ্ট হয় না? ৬।৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৬।৩৯

এতৎ [ইহাই] মে সংশয়ং, হে কৃষ্ণ ছেত্তুম্ [অপনয়ন করিতে] অর্হসি [যোগ্য হও] অশেষতঃ [শেষ না রাখিয়া, সমূলে] ত্বদন্যঃ [তোমা ছাড়া অন্য কেহ] সংশয়স্য অস্য [এই সংশয়ের] ছেত্তা [নিরাকরণকারী] ন হি উপপদ্যতে [নিশ্চয়ই উপযুক্ত নয়]।

হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় তুমিই সমূলে উচ্ছেদ করিতে সক্ষম; তোমা ছাড়া অন্য এই সংশয়ের নিরাকরণ করিতে উপযুক্ত নহে।

শ্রীভগবান্ উবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৬।৪০

(এই শ্লোককে ধরিয়া সাড়ে চারিটী শ্লোকে শ্রীভগবান ইহার উত্তর দিতেছেন) হে পার্থ, ন এব ইহ [রাগদ্বেষযুক্ত, দ্বন্দ্বপাপবিদ্ধ এই স্তরে] ন অমুত্র [কিম্বা ঐ পুরুষোত্তম স্তরেও] বিনাশঃ তস্য [তাঁহার, পুরুষোত্তম-পথযাত্রীর বিনাশ] ন বিদ্যতে [নাই;]; (বিনাশ নাই কেন?) হি [যেহেতু] কল্যাণকৃৎ [পরম কল্যাণময় পুরুষোত্তম-পথচারী] কশ্চিৎ [কোনও ব্যক্তিই] দুর্গতিং [কুৎসিৎ গতি] হে তাত [আত্মাকে পুত্র-রূপে যে পরিণত করে, তিনিই তাত (পিতা); পিতাই পুত্র হন; পুত্রও তাই 'তাত' পদবাচ্য হয়, শিষ্যকেও তাত বলা হয়। পুরুষোত্তম অর্জ্জুনের 'সখা' হইয়াও তাহাকে 'তাত' সম্বোধনের দ্বারা ইহাই ঈঙ্গিত করিলেন যে, এই বিশ্বকে আত্মকৃতি-পরিণামের ভিতর গড়িয়া তুলিবার যে ভার পুরুষোত্তম লইয়াছেন, তাহাই অর্জ্জুনের নিকট অর্পিত হইয়াছে, যেমন পিতার দায়িত্ব পুত্রে সমর্পিত হয়]। (শ্রীভগবান পূর্ব্বেও

বলিয়াছেন—'নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'॥ পুরুষোত্তমে প্রতি পদক্ষেপও স্বসম্পূর্ণ।]

শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ, রাগদ্বেষের স্তরে বা পুরুষোত্তম স্তরে তাহার বিনাশ নাই; কারণ হে তাত, পুরুষোত্তমের কল্যাণ পথে বিচরণকারী কোনও জন দুর্গতি প্রাপ্ত হন্ না।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৬।৪১

(তাহা হইলে কোথায় তাহার গতি হয়, তাহাই বলিতেছেন) (পুরুষোত্তম-পথের পথিক অনন্ত পথ-চলার মাঝখানেই যদি পথের অন্ত করিয়া ফেলেন, তখন সেই যোগভ্রষ্ট) প্রাপ্য [প্রাপ্ত হইয়া] পুণ্যকৃতাং [অশ্বমেধাদি পুণ্যানুষ্ঠাতাদের] লোকান্ [লোক সমূহ; পুরুষোত্তম-পথে স্বল্প চলিবার সার্থকতা ও অনন্ত পথ-চলার সম্বন্ধে ব্যর্থতার সংমিশ্র ফলস্বরূপ লোক সমূহ] (এবং সেখানে) উষিত্বা [বাস করিয়া, সুখ ভোগ করিয়া] শাশ্বতীঃ সমাঃ [বহুতর বৎসর] (সেখানের ভোগ ক্ষয়ে) শুচীনাং [সদাচার সম্পন্নদের] শ্রীমতাং [বিভূতি-মানদের] গেহে যোগভ্রষ্টঃ [যোগ হইতে ভ্রষ্ট] অভিজায়তে [জন্ম লাভ করেন]। (পুরুষোত্তম-পথ চলিতে চলিতে পথের মাঝে যাহারা পথ-চলার শেষ করিল, ভ্রষ্ট হইল, তাঁহারাও দীর্ঘকাল পুণ্যময় আদর্শলোকে বাস করিয়া এই লোককে পুণ্যলোকে গড়িয়া তুলিবার জন্য শুচি ও শ্রীমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুণ্যলোকই পুরুষোত্তম লোক হইত, যদি পুরুষোত্তম-পথের মাঝখানেই পথ-চলা শেষ করিয়া অনন্ত পথ-চলিবার মত বুকের পাটা যোগীর থাকিত, নিত্য যোগী হইত; সমস্ত যোগের সার্থকতা ও তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে এই গড়িয়া তোলার মাঝে]।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকৃৎগণের লোকে দীর্ঘকাল বাস করিয়া শুচি ও শ্রীমান ব্যক্তিগণের গৃহে জন্মলাভ করেন। ৬।৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৬।৪২

অথবা যোগিনাম্ এব [ধনীগণের কুলব্যতিরেকে দরিদ্র যোগিগণেরই] কুলে [বংশে] ভবতি [জন্মগ্রহণ করেন] ধীমতাম্ [বুদ্ধিমান], এতৎ হি [দরিদ্র যোগিগণের গৃহে এই জন্ম নিশ্চয়ই] দুর্লভতরং [ধনবানগণের কুলে জন্ম অপেক্ষা দুর্লভতর] লোকে [মনুষ্য লোকে] জন্ম যৎ ঈদৃশং [যথোক্ত বিশেষণযুক্ত দরিদ্র যোগিগণের কুলে এইরূপ যে জন্ম]।

অথবা ধীমান্ যোগিদিগের কুলে জন্মলাভ করে; মনুষ্যলোকে এই প্রকার যোগিগণের কুলে জন্মলাভ ধনবানদের গৃহে জন্মলাভ অপেক্ষাও দুর্লভতর। ৬।৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৬।৪৩

(যেহেতু) তত্র [শুচি শ্রীমানদের কুলে অথবা যোগিগণের কুলে] তং [সেই] বুদ্ধি-সংযোগং [পূর্ব জন্মের বিচ্ছিন্ন বুদ্ধির সঙ্গে সংযোগ] লভতে [লাভ করে] পৌর্ব্ব-দৈহিকং [পূর্বদেহে ভব, পুরুষোত্তম-পথযাত্রার মাঝখানে বুদ্ধির যে স্তরে সে পথ-চলার শেষ করিল, বুদ্ধির সংযোগ হারাইয়াছিল, একা অখণ্ড বুদ্ধির মাঝে বিচ্ছেদ আসিয়াছিল, পূর্বদেহের সেই বিচ্ছিন্ন স্ববুদ্ধিকে পুনরায় লাভ করে] যততে চ [এবং প্রযত্ন করেন, যে প্রযত্নের অভাবে তাহার সব পণ্ড হইয়া গিয়াছিল, সেখান হইতেই সে আবার রওয়ানা হইল] ভূয়ঃ [পুনরায়] সংসিদ্ধৌ [অনন্ত পথ-চলা রূপ, সিদ্ধি-অসিদ্ধির সমন্বয় রূপ সম্যক্ সিদ্ধির জন্য] হে কুরু নন্দন।

সেই জন্মে পূর্বজন্মের বিচ্ছিন্ন বুদ্ধির সংযোগ প্রাপ্ত হন্ এবং সেখান হইতে পুনরায় যোগসংসিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্ন করেন। ৬।৪৩

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥ ৬।৪৪

(কি করিয়া পূর্ব দেহের বুদ্ধিসংযোগ সম্ভব হইল, তাহাই বলিতেছেন) হি [যেহেতু] পূর্ব্বাভ্যাসেন [পূর্বজন্মকৃত যে পুরুষোত্তম-পথ-চলার অভ্যাস, সেই পূর্ব্বাভ্যাস] তেন এব [বলবান তাহা দ্বারাই] হ্রিয়তে [বিচ্ছিন্ন পথ হইতে একরূপ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যেন আবার পূর্বের সেই সমগ্র পথের বুকে আকর্ষণ করিয়া ফিরাইয়া আনা হয়] অবশঃ অপি [অবশ হইয়া, পুরুষোত্তম-গৃহীত হইয়া, পুরুষোত্তম পথের টানে বশীভূত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও] (দীর্ঘকাল অব্যক্তভাবে থাকিলেও যোগজ সংস্কারের একান্ত বিনাশ হয় না; উহা কোনও না কোন পথে ফুটিয়া উঠিবেই। জীবের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম পৌর্ব্বদৈহিক সংস্কার তো আসিয়াছে সহজ পুরুষোত্তম হইতে; কেননা পুরুষোত্তম দেহই তাহার পূর্ব স্বরূপভূত দেহ। যাহার পথ-চলা যতখানি পুরুষোত্তমের পথ-চলার অনুবর্তী, তাঁহার সংস্কার তত দৃঢ়, তত বলবান, তত খানিই উহাকে ডিঙ্গাইয়া চলিবার সামর্থ্য রাগদ্বেষ-যুক্ত স্তরের থাকিবে না] জিজ্ঞাসুঃ অপি যোগস্য [যোগের জিজ্ঞাসুও; যোগের স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা করিয়া যোগমার্গে প্রবৃত্ত একান্ত কর্মযোগী অথচ যোগভ্রষ্ট পুরুষও] শব্দব্রহ্ম [পুরুষতন্ত্রে অনুষ্ঠিত বেদোক্ত কর্মের ফল] অতিবর্ত্ততে [অতিক্রম করিতে পারেন; যে ব্যক্তি যোগের স্বরূপ বুঝিয়া তাহার অনুষ্ঠান অভ্যাস করেন, তাঁহার আর কথা কি?]

তিনি অবশ হইয়া পূ[illegible] দ্বারা যোগমার্গে প্রবর্ত্তিত হন। যে ব্যক্তি যোগের জিজ্ঞাসা অথচ যোগভ্রষ্ট, তিনিও সমগ্র পুরুষোত্তমের অনুষ্ঠিত বৈদিক কর্ম্মফল অতিক্রম করেন। ৬।৪৪

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৬।৪৫

(যোগিত্ব কেন শ্রেয়, তাহাই বলিতেছেন) প্রযত্নাৎ [কৌশল অবলম্বন করার প্রকৃষ্ট যত্ন হেতু] যতমানঃ [অতিশয় যত্নবান] যোগী [বিদ্বান যোগী] সংশুদ্ধকিল্বিষঃ [সংশুদ্ধ-

পাপ] অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ [অনেক জন্মে অল্প অল্প সংস্কার সমূহ সঞ্চয় করিয়া সেই অনেক জন্ম সঞ্চিত সংস্কার সমূহের সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ হইয়া] ততঃ [তাহার পর সম্যগ্ দর্শন লাভ করিয়া] যাতি পরাং [প্রকৃষ্ট] গতিঃ [গতি]।

প্রযত্নপূর্ব্বক যত্ন করিতে করিতে ক্ষীণ পাপযোগী অনেক জন্মের পর সম্যক্ সিদ্ধ হইয়া তৎপরে পরাগতি প্রাপ্ত হন। ৬।৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৬।৪৬

(যোগের মহিমা ও ফল যখন এইরূপ) তস্মাৎ [সেই হেতু] তপস্বিভ্যঃ [একান্ত তপস্বীদের তপস্যার স্বয়ং মূল্য দিয়াও তপস্বী হিসাবেই তপস্বিগণ হইতে] অধিকঃ ['সমগ্র' বলিয়া অধিক; ব্যাপকতর সমগ্র পুরুষোত্তম-যোগে তপস্যাও পূর্ণ। কিন্তু একান্ত তপস্যার মধ্যে সমগ্র পুরুষোত্তম-যোগ অংশেই মাত্র পূর্ণ। তপস্যার বাহিরের অন্যান্য অংশেও তিনি পূর্ণ, তাই তপস্বী হইতেও অধিক] যোগী [পূর্ণ পুরুষোত্তম যোগী] জ্ঞানিভ্যঃ অপি [একান্ত জ্ঞান-পন্থিদেরও জ্ঞানী হিসাবেই] মতঃ [স্বীকৃত] অধিকঃ [পুরুষোত্তম-যোগী একান্ত জ্ঞানযোগকেও স্বয়ং পূর্ণ করার যুগপৎ সমকালেই তপস্যা ও কর্ম্মযোগকে স্বয়ম্পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন; অতএব তিনি জ্ঞানযোগকে অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ করিয়াও জ্ঞানযোগের অধিক]। কর্ম্মিভ্যঃ চ [এবং কর্ম্মিগণ হইতে ও কর্ম্মী হিসাবেই] অধিকঃ [অধিক; তপস্বী কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগী পরস্পরস্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়; কিন্তু যিনি নিজ জীবনে সবকেই পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়া আস্বাদন করিতেছেন, তিনি কাহারও একচেটিয়া নন্; তিনি প্রত্যেকের মাঝে পরিপূর্ণ থাকিয়াও প্রত্যেকেরই অধিক। কেহই কাহারও কাছে ধরা পড়িলেন না, সকলকেই সমভাবে জীবনে হজম করিতেছেন, তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকেরই অধিক। 'They complete, by excluding each other.—De Broglie. পূর্ণযোগের এক একটী দৃষ্টি কোণ হইতেছে তপস্যা, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। পূর্ণযোগ সর্ব্বযোগসমন্বয়] তস্মাৎ [যে হেতু ইহারা প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া সেই সেই ক্ষেত্রের যোগ্য হইয়াছেন, যোগী হইয়াছেন, সেই হেতু] যোগী [সর্ব্ব যোগ সমন্বয়-যোগে যোগী, সর্বক্ষেত্রের যোগ্যতাসম্পন্ন যোগী] ভব [হও] হে অর্জ্জুন।

যোগী তপস্বিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মত, জ্ঞানিগণ হইতেও অধিক, কর্ম্মিগণ হইতেও অধিক; অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। ৬।৪৬

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬।৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যান যোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

(বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের যোগ্যতাসম্পন্ন সর্ব্ববিধ যোগিগণের মধ্যে সর্ব্ববিশেষের সমন্বয় মূর্ত্তি, পুরুষোত্তম-'আমি'র ভক্ত-যোগী যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই বলিতেছেন) যোগিনাম্ অপি সর্ব্বেষাং [আত্মা ও সর্বভূতের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের যোগ্যতা সম্পন্ন সর্ববিধ যমনিয়মাদি পরায়ণ যোগিগণের মধ্যে] মদ্‌গতেন [আমি-পুরুষোত্তমে গত, আসক্ত হইয়াছে যে অন্তরাত্মা অন্তঃকরণ, তাহা দ্বারা] শ্রদ্ধাবান্ [শ্রদ্ধাবান্ হইয়া] ভজতে [পুরুষোত্তম-আমি বনিয়া গিয়া সেবা করে—'দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ] যঃ [যে যোগী] মাং [আমাকে] সঃ [সেই যোগী] মে [আমার] যুক্ততমঃ [বহুর মধ্যে সর্ব্ব প্রকৃষ্ট]; 'সর্ব্বপ্রকর্ষে তমপ্'—যুক্ত শব্দের উত্তর তমপ্ প্রত্যয় দ্বারা 'যুক্ততম' পদ নিষ্পন্ন। ব্রহ্ম-যোগী 'যুক্ত', পরমাত্ম-যোগী 'যুক্ততর', ভগবান্-পুরুষোত্তম যোগীই যুক্ততম যোগী।

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বংমদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তঃ লভতেঽঞ্জসা।
সর্ব্বাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি॥

মতঃ [অভিপ্রেতঃ]।

সকল যোগিগণের মধ্যে যে যোগী শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদ্‌গত অন্তঃকরণ দ্বারা আমিময় হইয়া আমার ভজনা করেন, তিনিই আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম যোগী। ৬।৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

রমণীর রূপ

আনন্দকুমার সমাজদার

স্রষ্টার সৃষ্টির সেরা রমণীর রূপ
নরের নয়নে ভাসে তাঁরই সুষমা—
মনে ভাসে নানা রূপে।
রাজা রাজ্য রাজধানী কত...
ভস্মীভূত করিয়াছে রূপ-বহ্নিশিখা
যুগে যুগে।
পুরাণ-ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তার
চিরকাল।
সুন্দ উপসুন্দ অভেদ আত্মা সহোদর
নাশ হ'ল তারা
পরস্পরে করিল সংগ্রাম
নারী লাগি'।
সবংশে পুড়িলো রাঘবারি সে আগুনে।
ট্রয় ক্ষয় হেলেন লাগিয়া।
দুর্ব্বার খিলজি ধ্বসিলো এ রূপের বহ্নিতে।
ধ্বংস হ'ল চিতোর ব্যর্থ কামে
লভিতে পদ্মিনী।

অন্যদিকে ঊর্মিলা-বল্লভ
উপেক্ষিলা রক্ষসুন্দরী সূর্পনখারে।
ধনঞ্জয় উপেক্ষিলো স্বর-মন-লোভা ঊর্ব্বশীরে
মধুর মাতৃ সম্বোধনে।
যবে পরাজিত নৃপতির লুণ্ঠিতা কামিনী
প্রেরিতা শিবাজী সকাশে—
ভোগ্য উপহার বলি';
হেরি' নারী, ত্যজি সিংহাসন
রূপ মুগ্ধ শিবাজী কহিল বিনয়ে
হইতে মা, তুমি যদি জননী আমার
হইতাম ওই রূপ আমিও সুন্দর।

শৃঙ্খলা

রেণু মিত্র

শৃংখলা কাকে বলে আমরা তা জানি নে বললে বিশেষ ভুল বলা হবে না। কিংবা জানতে পারি তবে আমাদের কথাবার্তায় আচার আচরণে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রিতে ঘুমুতে যাওয়া অবধি যত কথা বলি বা যতগুলি ব্যবহার আমাদের চালাতে হয়, তারমধ্যে এতই শৃংখলার অভাব থাকে যে দেখবার চোখ থাকলে আমরা গভীর পীড়া বোধ করতাম। আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে এমন অনেক ঘটনা বের করা যায়, যা উচ্ছৃংখলই, অথচ যা আজ আর আমাদের চোখে পীড়াদায়ক হয় না।

খুব ভোরে শয্যাত্যাগ স্বাস্থ্যবিধি সম্মত একথার বিরুদ্ধে বলার মত সত্যিকারের বোধহয় কিছুই নেই এবং এক সময়ে হিন্দুর ঘরে ঘরে এ সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল বলাও যায়—কিন্তু আজ তা সাধারণভাবে উলটো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজী প্রবাদবাক্যও আছে, Early to bed and early to rise, Makes a man healthy, wealthy and wise. কিন্তু আমাদের এ অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতি পরিবারে সকালে কোন সম্মিলিত প্রার্থনা বলে কিছু নেই—তাই যে যখন খুশী উঠছি, সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত গরমের দিনেও অনেককে বিছানায় পাওয়া যাবে। তবে সকলে একসংগে বসে চা খাবার রেওয়াজ কোন কোন পরিবারে হলেও সেটা ঠিক সময় রেখে সকলে একসংগে করা তেমন করেই বা হল কই? 'চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো, শীগ্গির এসো'—এ আহ্বান যে জানাতে হয় কত, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন কিংবা দ্বিতীয়বার চা করার প্রয়োজন হয় না এমন পরিবারও বোধহয় কম।

সময়মত স্নান সেরে রেখে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা একটা স্বাস্থ্যসম্মত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকলের দুপুরের খাওয়া শেষ করা—এ যে কয়টি বাঙ্গালীর ঘরে হয়—তা হাতে গুণে তোলা যায়। কাজের জন্য যারা বাইরে চলে যাচ্ছে তারা তো আগেই খেয়ে নিচ্ছে কিন্তু যারা বাড়ীতে থাকছে, তারা কি করে একটা যুক্তিসম্মত সময়ের মধ্যে সকলের খাওয়া শেষ করতে পারে—এ খবর বাঙ্গালীর পরিবারে জানা নেই। আর ইস্কুল কলেজ অফিস ছুটির দিনে তো কথাই নেই। 'এই রে, রান্না হয়ে গেছে, বেলা হল, স্নান করে নে। এই রে, দেরী করিস নে, ঠাকুর চাকর রাগ করে।'—এ বোধহয় সব পরিবারেই বলতে হয়। কাজের দিনে ৯টা থেকে ১০টায় যাদের খেয়ে যেত হল, তারা ছুটির দিন সেটা পুষিয়ে নিতে গিয়ে মনে করে যে স্নান খাওয়ার সময়টায় অসময় ঘটানোই সব চেয়ে আনন্দজনক। বাড়ীর ছেলেদের তবু বা একটা

নাগাদ পাওয়া গেলেও কর্তারা দুটো নিশ্চয়ই বাজাবেন।

হিন্দুর সংসার গোছানো সংসার নয়। ছেলেমেয়েরা—বিশেষ করে ছেলেরাই—জামাটা ছাড়বার সময় ছুঁড়ে এক টান মেরে কোন্‌খানে ফেলে রাখলো—তাকে কুড়িয়ে এনে ধোয়ার জন্য আর এক লোককে দরকার—খেলে এসে জুতোটা সেখানে খুশী ঢুকিয়ে রাখলো—একখানে জুতো, একখানে বই, একখানে তার খেলার জিনিষ, একখানে জামা কাপড়—সব মিলিয়ে একটা এলোমেলোর ব্যাপার। বেশ গোছানো, সুষ্ঠু, নয়নতৃপ্তিকর—এ অবস্থাটা আমাদের ঘরবাড়ী, আমাদের কথাবার্তা, আমাদের আচার ব্যবহারেও নেই, আমাদের ছেলেপিলেদের চালচলনে কথায়বার্তায়ও নেই।

আজকাল অনেক বাড়ীতে ড্রইংরুম থাকে কিংবা বাড়ীর ঘরগুলো মোটামুটি গোছান থাকে এমন কিছু বাড়ীও পাওয়া যায়। কিন্তু জামাকাপড় জুতো যদিও গোছান পাওয়া যায় কিন্তু কথায়বার্তায় চাল-চলনে আবার সে শালীনতা দেখা যায় না কিংবা সত্যিকারের একটা প্রাণখোলা প্রীতির স্পর্শও পাওয়া যায় না। বেশ নম্র, সশ্রদ্ধ, অথচ প্রাণের আবেগে চঞ্চল এমন ছেলেপিলে আজকাল দেখা যায় কোথায়? বড়দের মধ্যে কেমন একটা দূরত্ব রক্ষা করে কেমন একটা দেখানো ভদ্রতা যা প্রাণকে স্পর্শ করে না। আর ছোটরা দুর্বিনীত, শ্রদ্ধাহীন, চালিয়াত কিংবা ফ্যাসানেবল। মনে হয় যেন ওসবের মধ্যে ঠিক শৃঙ্খলা বা রুচি বোধ নেই, আছে বাইরে থেকে শেখা একটা বাহ্যিক ভদ্র আবরণ। যে শৃঙ্খলা বা সুষ্ঠু জীবনবোধ ভেতর থেকে গড়ে ওঠে, যে শুচিতা আন্তরিক অবস্থার বাহ্যিক প্রকাশ, তেমন শৃঙ্খলা আর তেমন শুচিশুভ্র পরিচ্ছন্ন দেহ মনের অবস্থা কোথাও আজকাল দেখা যায় না।

হিন্দুধর্ম ও সমাজের যে অবস্থাতে একদিন ব্রাহ্মধর্ম আত্মপ্রকাশ করেছিল, ব্রাহ্মধর্মের সেই প্রথম দিনগুলিতে এমন কয়েকজন মানুষ ও এমন কয়েকটি পরিবার ছিল, যাদের জীবন ভেতর থেকে গড়ে উঠে বাইরে একটা শুচিশুভ্র প্রাণ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁদের ঘরে বা বাড়ীত ঢুকলে যেমন ঘরগুলোতে গোছানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা আবহাওয়া পাওয়া যেত, তেমনি তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে পাওয়া যেত একটা সত্যিকারের হৃদ্যতা, একটা প্রাণস্পর্শ। খুব দরিদ্র ব্রাহ্ম পরিবারেও এই বিশ পঁচিশ বছর আগেও দেখা গেছে কেমন নিষ্ঠা, কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও গোছান চালচলন। হিন্দু পরিবারে দুই চারটে জায়গা ছাড়া সাধারণতঃ এ ভাবটা নেই এ কথা বলা চলে।

আমাদের হিন্দু পরিবারে বিবাহাদি কোন অনুষ্ঠান হলে তাতে হৈচৈ, গোলমাল, হাকাহাকি, গলাভাঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে আছে। অথচ একটি ব্রাহ্ম পরিবারে—দরিদ্র পরিবারেই দেখেছি বিবাহ সভায় যে ঘরে উপাসনা হচ্ছে তার পাশের ঘরেই খাওয়া চলছে অথচ এতটুকু হৈচৈ বা হাকডাক নেই।

একটি বিবাহাদি অনুষ্ঠানে হিন্দু পরিবারে কত ভাগ অপচয় হয়—শক্তির শুধু নয়—জিনিষপত্রেরও, তার হিসাব আমরা রাখিনা। কেন না আমাদের চোখকে

তা আর পীড়া দেয় না। কিন্তু সব সমাজের ব্যবস্থা এ রকম নয়।

এছাড়া কতকগুলি চাল চলন আছে যেগুলিও অসুন্দর। যেমন 'তিরিশ জন না খেয়ে ক্লাবে এসেছে, পঁচিশ জন জুতোর ফিতে বাঁধতে ভুলে গেছে, জুতোগুলো নোংরা, বার জনের হাতে বড় বড় নখ রয়েছে, সাত জনের জামাকাপড় নোংরা, দুজন দাঁত না মেজেই ক্লাবে এসেছে, একজন উল্টো দিকে পুলওভারটা চাপিয়ে ক্লাবে ছুটে এসেছে। ......থুথু দিয়ে পাতা ওল্টানো, সিগারেটটা খেয়ে ছুঁড়ে দেওয়া, লেবু খেয়ে খোসাটা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ফেলা, আরো কত।'

আরও—'ইস্কুলে ছেলেদের বই আর খাতাগুলো যদি একটু মন দিয়ে দেখা যায়, তবে কি বিচিত্র বস্তু যে দর্শন করবার সৌভাগ্য হবে, তার আর অন্ত নেই। কারুর বা বাইরের দু চারটে পাতা অদৃশ্য হয়ে গেছে পোড়োর পড়ার দাপটে, কারুর পা বাঁধান বইয়ের শক্ত বাঁধনটুকু আছে—চিহ্নটুকু পড়ে আছে, বাকীটুকু নেই। কারুরবা বইর উপর চায়ের খোলের রাংতা দিয়ে মোড়া, কারুর দুটো আছে আর বাকী দুটো মলাট নেই, কারুর বা খবরের কাগজের মলাটের ওপর নানান বিচিত্রের চিত্র—দু একটা শ্লীল বা অশ্লীল মন্তব্য, আরো কত কী। খাতার দফা আরও শোচনীয়, রাফ খাতায় তো মলাট নেই, পাতাও নেই গোড়ার দিকে দু' চারটে। অংকের খাতার পিছনে বাংলা মানে, বাংলার খাতার মাঝখানে ইংরাজী সারাংশ ইত্যাদি।'

আরও—'অনেক ঘরে খাবার টেবিলে চায়ের কাপ প্লেট সকাল থেকে পড়ে আছে তা আছেই। কারুর ঘরে বা খাবার পর থালাবাটী বা চায়ের কাপ টেবিলের তলায় রয়েছে তো রয়েছে, কয়েক ঘণ্টা নয়, কয়েকদিন বাদে হয়তো নজর পড়ে যখন, তখন চাকর বাকর নয় ছেলেমেয়ের ওপর বকুনির পালা চলে খানিকক্ষণ।' 'এমনিভাবে প্রতিদিনের সকাল থেকে রাত্রিতে শোয়া পর্যন্ত যা কিছু করি, তা এমনি আগোছালো এলোমেলো ও অসম্পূর্ণাঙ্গ যে আমাদের গেরস্ত জীবন যাত্রা আজ সম্পূর্ণ শ্রীহীন ও শুচিহারা কদর্য পর্যায়ে নেমে এসেছে। এ কথা প্রত্যেকেই আপন আপন ঘরের ছবি বা আশপাশের দু'এক বাড়ীর কথা ভাবলেই বুঝতে পারবেন।'

আমাদের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিয়ে নিতে আমরা ফাল্গুণ সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসুনীতিকুমার পাঠকের লিখিত 'অভ্যাস গঠনে মা-বোনের প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি উপরে গ্রহণ করলাম। যেগুলি আমরা এ পর্যন্ত উল্লেখ করেছি সেগুলি অত্যন্ত সাধারণ কথা অথচ এরই মধ্যে রয়েছে একটা জাতির আভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্যের চিহ্ন। এই সমস্ত শৃঙ্খলার ওপর একটা জাতির অগ্রগতি নির্ভর করে। এমনি আরো কয়েকটি সাধারণ শৃঙ্খলার অভাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে কথা রক্ষা করা। আজকের দিনে আমরা যে কোন বয়স বা যে কোন পদমর্যাদা বা কান অবস্থারই লোক হই না কেন, অনেকেই কথার ঠিক রাখি না। অথচ বাক্য রক্ষার মত প্রয়োজনীয় ও সুন্দর অবস্থা বোধ হয় খুব কমই আছে। বুড়োই হোক, গুড়োই হোক কিম্বা

একেবারে পথের ভিখারী হোক কিংবা সম্পত্তিপন্নই হোক কেউ-ই ছোটর কাছেই কথা দিয়ে থাকি কিংবা গুরুজনের কাছেই কথা দিয়ে থাকি সেটাকে যথাযথ পালন করবার বিন্দুমাত্র দায় আছে বলে আমরা ভুলে গেছি।

আজকালকার দিনে আরও যে জিনিষটা খুব পীড়াদায়ক হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই সব বুঝি। রাজনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি থেকে আমরা সবাই-ই না বুঝি এহেন বিষয় পৃথিবীতে নেই এবং আমি যা বুঝেছি ঠিকই বুঝেছি, অন্যের বুঝের জন্য এতটুকু ফাঁক নিজের কাছে রেখে দিতে চাই না। রাজনীতির চালে জওহরলাল চরম মূর্খ, অমুকে অমুক আর অমুকে অমুক এই রকম মন্তব্য আর শ্রদ্ধাহীন প্রতিবাদ আমরা নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে করে যাচ্ছি। এমন কি বার চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলেদেরও এমন শ্রদ্ধাহীন মন্তব্য করতে শুনেছি। এই শ্রদ্ধাহীনতা আমাদের সমস্ত মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে—পরিবারে, বিদ্যালয়ে, সভাগৃহে বা অন্য কোথাও সুমিষ্ট নম্রতা আমাদের চরিত্র থেকে একেবারে লোপ করিয়ে দিলে। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন একটা জাত বেঁচেই বা থাকবে কি করে, কালের ঢেউ কেটে আগিয়েই বা যাবে কি করে?

কেন এমন হল? চারদিকের এমন এলোমেলো কেন আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টিজীবনকে ছেয়ে ফেললে? এর থেকে রেহাই পাওয়ার পথ কী?

কেন এমন হল এর প্রধান ও প্রথম উত্তর হল আজকের আমরা দুটো সভ্যতার সংমিশ্রণজাত দ্বন্দ্বের ফল। আমরা ভারতবর্ষের স্বভাবগত আধ্যাত্মিকতার কুলেও নেই অথচ তাকে একেবারে ছাড়তেও পারিনি, আবার পাশ্চাত্য থেকে নবাগত জড়-বাদেরও কুলে উঠতে পারিনি। আমরা আমাদের প্রাচীনকে খুইয়েছি অথচ তার আবেশ কাটাতে পারিনি। এদিকে আজ বস্তুজগতের চাপ আমাদের ওপর এমন করে পড়ছে যে আমরা নিকৃষ্ট ধরণের জড়বাদী হয়ে উঠেছি। নিকৃষ্ট ধরণের এই জন্য যে জড়বাদের গুণটুকু পাইনি অথচ দোষটুকু ষোল আনার উপরে আঠারো আনা পেয়ে গেছি। প্রাচীনকাল থেকে আমরা অনেক কিছুই মেনে আসছিলাম ধর্মের ভয়ে। এটা করতে হবে, নইলে অধর্ম হবে, ওটা করা ছাড়া উপায়ই নেই, ধর্মে পতিত হওয়া চলবে না—এমনি করে শয্যাত্যাগ থেকে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত সমস্ত কাজকর্ম ব্যবহারকে একটা ধর্মের মোড়ক দিয়ে মুড়ে রাখা হয়ে ছিল—জীবনে আমাদের সমস্ত শৃঙ্খলা বা শুচিতাবোধ ঐ ধর্মকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হতো।

কিন্তু ঐ মোড়ক আজ ছিঁড়ে গেছে। বস্তু জগতের সংস্পর্শে এসে এত-দিনকার আমাদের ঐ ধর্মকে আর ধরে রাখা গেল না। তাই ঐ মনোবৃত্তি থেকে সৃষ্ট যেসব নিয়মনিষ্ঠা ছিল তা ভেঙ্গে গেল। আর আজকের আমরা বস্তু জগতের সংস্পর্শে এসে আগের থেকে অনেকখানি জটিলতর কর্মজগতে প্রবেশ করে কর্মী হয়েছি। আগেকার মত জীবনযাত্রা তো আর আজ নেই। কত বদলে গেছে। আজ বেঁচে থাকতে হলে এই বদলকে মেনে নিতেই হবে। তাই, অর্থাৎ কর্মী হতে

গিয়েই আজ আর আগেকার অনেক কিছুই মানা সম্ভব হয় না। আজ তো অনেকের পক্ষেই আর ঘরেরটা বসে খেয়ে জীবন যায় না। তাই আগেকার আচার অনুষ্ঠানের অনেক কিছুই ছেলেমেয়ে উভয়ের পক্ষেই রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

তাই আগেরটা তো গেল যে কারণেই হোক না কেন, কিন্তু নূতন করে জীবন-শৃঙ্খলা বোধ সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে যদি না এসে যায়, তবে মানুষের জীবনের সৌন্দর্যই বা বজায় রইল কি করে? আজ যা হয়েছি তাতে যে আমরা অসুন্দর হয়ে গেছি। আমরা কালাতীতের ধ্যানে ছিলাম তাই কালকে সম্মান দিতে শিখি নি—তাই সময়মত কাজ করা বা সময় রক্ষা করাকে আমরা যেন বাহুল্যই মনে করেছি। আমরা বাক্যাতীতের ধ্যানে ছিলাম, তাই কথা রক্ষা করার শিক্ষায় মনোযোগ দিতে পারিনি। আজ জড়বাদকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু কালকে মেনে নিতে পারছি না। পাশ্চাত্য জড়বাদী, সত্যিকারের জড়বাদীই সে—তাই কালকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে সে জানে।

কিন্তু কালকে স্বীকার করে তাকে দৈনন্দিন জীবনে সম্মান দেওয়া, কথা রক্ষা করা, নিজের বোঝাকেই চূড়ান্ত মনে না করে বাইরের বিশ্বটার প্রতি সশ্রদ্ধ ও বিনীত হওয়া, জীবনের ছোটখাট চালচলন ব্যবহারগুলিকে গুছিয়ে সুশৃঙ্খলার মধ্যে আনা—এ যে আজ বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের ধারণা ছিল যারা ছোটখাট বিষয়ে মনোযোগী হয়, তারা বিষয়ী হয়, সংসারী হয়—তারা বৈরাগ্যবান হতে পারে না; বড় জায়গায়, বড় চিন্তার মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারে না। যারা দেশের কাজ দশের কাজ করে, যারা সন্ন্যাসী হয় তাদের নিজের জামাটা কাপড়টা বিছানাটা সম্বন্ধে খেয়াল থাকবে না, তাদের ঘর হবে নিতান্ত অগোছানো—ছোটখাট জিনিষের প্রতি তাদের দৃষ্টি না থাকাটাই পরম যোগ্যতার অবস্থা বলে প্রশংসিত হতে থাকে। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে খানিকটা বিরুদ্ধতা সাধারণতঃ থাকলেও আজকের দিনে সভ্যতা যে জায়গায় এসে দাঁড়াতে চাইছে সেখানে আমাদের প্রত্যেককেই এই দুটো বিষয়েই সমর্থ হতে হব। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ঘটনাকেও শৃঙ্খলা, সুষ্ঠুতা ও শুচিতার সংগে করতে হবে আবার নিজেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রেও বিচরণ করাবার মত মনের বিস্তার রেখে দিতে হবে।

ভগবান শ্রীনিত্যগোপালের জীবনে আমরা এ দুটোর সমন্বয় দেখেছি। মুহুর্মুহু তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁর দেহে জ্বলন্ত অংগার অনেকক্ষণ ধরে রেখে দিলেও তাঁর দেহজ্ঞান ফিরে আসে না—অথচ তাঁর ছোটখাট কাজগুলি কেমন রুচিসম্মত, নিষ্ঠাপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন। যে কোন সময়ে তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকলে মনে হতো যে এইমাত্র কেউ গুছিয়ে রেখে গেলো। বইগুলি পরিচ্ছন্নভাবে সাজান, একটা এদিকে সরে আছে, আর একটা ওদিকে সরে আছে—এমন নয় এতটুকু, পেনসিল কলম বা ঘরের প্রতিটি জিনিষই এমনি পরিচ্ছন্নভাবে গোছানো। ছোট পেনসিলটা যেটা আমরা ফেলে

দেই—তিনি সেটাতে কাগজ জড়িয়ে অনেকদিন ব্যবহার করছেন। ডাকে যে সব বই ইত্যাদি আসতো তা যে সুতোটা দিয়ে বাঁধা থাকতো—বইটি খুলে নিয়ে সেই সুতোটা তিনি যত্নের সঙ্গে রেখে দিতেন—আর একদিন আর একটা প্রয়োজনে সেটা লাগতো। ঘরের মধ্যেই তিনি বসে থাকতেন, দিনের মধ্যে কচিৎ কখনো বাইরে যেতেন—কিন্তু কোথায় কি হচ্ছে, না হচ্ছে তা তার দৃষ্টির মধ্যে থাকত। বাগানের ঘাস শুকিয়ে রেখে বর্ষার সময় জ্বালানি করে ব্যবহার করবার ব্যবস্থার কথা বাতলেও তিনি দিয়েছেন। অথচ এই মানুষেরই জীবনে এমন সময় গেছে যখন দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধ্যানে, সমাধিতে, লেখাপড়ায় কেটে গেছে—পরণের কাপড় কুলির গায়ের কাপড়ের থেকেও ময়লা তেলতেলে হয়ে গেছে তথাপি তা ছাড়বার হুঁস নেই বা প্রয়োজন বোধ নেই। তাঁর জীবনে এমনি পরস্পর বিরুদ্ধের সমন্বয় এমন কতই বের করা যাবে।

তাই বলি আমরা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের জীবনের দৃষ্টান্ত দেখে এটুকু অন্ততঃ স্বীকার করতে পাব যে দুটো একই সঙ্গে সম্ভব; আর একই সঙ্গে যে প্রয়োজনীয় তা তো বুঝতেই পারছি। একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান অন্যদিকে বাস্তব জীবনে সুষ্ঠু, রুচিসম্মত, সুশৃঙ্খল দৈনন্দিন ব্যবহার—আমরা যেন এই দিকেই দৃষ্টি রেখে নিজেদেরকে এবং ছেলেপিলেদেরকে চালনা করি। এই সামর্থ্য আমাদের হোক, ভগবান শ্রীনিত্যগোপালের জন্মতিথিতে তাঁর কাছে সেই প্রার্থনা জানাই।

পুস্তক পরিচয়

গোধুলি সূর্য্য—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী। শ্রীকালীপদ বিশ্বাস, ৮নং কালী ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা ৬, হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান অশোক লাইব্রেরী, ১৫।৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯। মূল্য আট আনা মাত্র।

বইটি একটি নাটিকা।

যাহারা বিরাট প্রাণের অধিকারী হইয়া আসেন, তাঁহাদের জীবনকে নানা রকম করিয়া দেখিবার, আস্বাদন করিবার এই যে প্রয়াস –ইহা জাতির স্বাস্থ্য দ্যোতনা করে। গান্ধীজী আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন একটি বিরাট প্রাণ লইয়া। তাঁহাকে কেহ আমরা বুঝি, বেশির ভাগই বুঝি না, কেহ তাঁহার সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকি, কেহ গাল দেই, কেহ বিমুগ্ধ বিস্ময়ে

পূজা করি, কেহ অশ্রদ্ধায় মুখ ফিরাইয়া লই। তবু তাঁহাকে বাদ দিতে কেহ পারিব না—এমনই ভাবে জাতীয় জীবনের সঙ্গে তিনি জড়াইয়া আছেন। তাই তাঁহার জীবন লইয়া যেটুকু যত রকম আলোচনাই হোক না কেন, সব আলোচনাকেই আমরা অভিনন্দন জানাই। বইটি পড়িয়া ইহাই আমাদের প্রথম মনে হইল।

রাজনৈতিক মতামত যাহাই হউক না কেন, বইটিতে গান্ধীজীর তত্ত্বটি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

'আমি স্বাধীনতা চাই মানুষের চাই হৃদয়ের,
কর্ম্মের আর চিন্তার। চাই বিদ্বেষ থেকে,
হিংসার থেকে, বিভেদ কিংবা শ্রেণীবোধ থেকে
মুক্তি। জীবন যেখানে মহৎ রাষ্ট্রের চেয়ে,
ব্যক্তি যেখানে সার্থক গণ-জীবনে এসে।'

ভারতবর্ষকে যিনি আত্মসচেতন করিয়া তুলিবার অভিযান করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে দেশবিভাগ মানিয়া লওয়া চলে না।

'............ধর্ম্মমত
যত হয় হোক, জাতি শুধু একক রাষ্ট্রের।
মানুষের সত্য ধর্ম আঘাত করে না কোন দিন
চিন্তার স্বাতন্ত্র্য কারো। মানুষের মুক্তির সংগ্রামে
আমার শেষের ধর্ম্ম হোক তার মরণের ব্রত।'

তাঁহার ধর্ম্ম পথের—শাসনের কাজে তাঁহার সময় কোথায় ?

'মানুষের চির হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে
আমি যে ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিব পথ ছেড়ে পথে পথে।'

আমরা যাহারা সকল ঘটনার সাক্ষী তাঁহারা আজ এ নাটিকাটি পড়িয়া যতটুকু বেদনা ও বিস্ময় বোধ করিব, তাহা অপেক্ষা গভীরতর বেদনা ও বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবী কালের পাঠক ইহার মধ্যে অতীত কালকে খুঁজিয়া পাইবে। নাটিকাটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেও চিত্রগুলি যেমন স্পষ্ট হইয়াছে তেমনই উহারা ভবিষ্যতের আশার বাণীও উদ্বোধিত করিয়া তোলে। আর লেখকের ভাষা তো তাঁহার অন্যান্য রচনার মতো এখানেও মিষ্টি হইয়াছে এবং তাহা মানুষের কল্পনাপ্রবণ চিত্তকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। বইটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

সাময়িকী

শ্রীনিত্যগোপাল ও সম্প্রত্তি : 'সম্প্রত্তি'-শব্দের অর্থ 'সম্প্রদান'—পুত্রতে পিতার কর্তব্য-সম্পাদনের ভার। বৃহদারণ্যকে এই 'সম্প্রত্তি'র বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে যে, লোক যখন আপনাকে আসন্নমৃত্যু বুঝিতে পারে, তখন পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলেন—তুমি ব্রহ্ম (বেদ), তুমি যজ্ঞ এবং তুমি লোক। তখন পুত্র প্রতি বচনে বলেন—হাঁ, আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ এবং আমিই লোক। ইহার অর্থ এই যে, পিতার যাহা কিছু অধীত বা অনধীত—অধ্যয়ন করিতে বাকী আছে, পুত্রই সেই সকলের ব্রহ্ম অর্থাৎ পুত্রই তৎস্বরূপ। পিতার কর্তব্য 'অধ্যয়ন' পুত্র পূর্ণ করিবে। যে সকল যজ্ঞ পিতার কর্তব্য ছিল, পুত্র সে সকলের যজ্ঞস্বরূপ অর্থাৎ পিতার কর্তব্য যজ্ঞ সে সম্পাদন করিবে। আর যে-কোন লোক (ভোগস্থান) জয় করা, আয়ত্ত করা পিতার ইচ্ছার মধ্যে ছিল, উচিত ছিল, সম্ভবও ছিল, পুত্রই সেই সকলের লোক-স্বরূপ, অর্থাৎ পুত্র সে সকল জয় করিবে। পিতা ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিলে পর পুত্র তাঁহার এই কর্তব্যভার বহনপূর্বক পিতাকে রক্ষা করিবে—এই জন্যই পণ্ডিতগণ অনুশিষ্ট পুত্রকে লোক অর্থাৎ পিতার শুভলোক লাভের অনুকূল বলিয়া থাকেন এবং এই কারণেই পিতা পুত্রকে ঐরূপ উপদেশ প্রদান করেন। এবম্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন পিতা যে সময়ে ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তখন তিনি বাক্, প্রাণ ও মনের সহিতই পুত্রে প্রবেশ করেন। পিতার কোনও কর্তব্য কর্ম যদি ঘটনাক্রমে করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুত্র নিজে অনুষ্ঠানপূর্বক সেই কর্ম পূরণ করিয়া সেই কর্তব্য-বন্ধন হইতে বিমোচিত করে। এইরূপ পিতার কর্তব্য পূরণ করে বলিয়াই সন্তানের 'পুত্র' নাম প্রসিদ্ধ। সেই পিতা মৃত হইয়াও এবম্বিধ উপদেশ-প্রাপ্ত পুত্ররূপে ইহলোকে বর্তমান থাকেন।

পিতা-পুত্রের মধ্যেই যে শুধু 'সম্প্রত্তি'র ব্যবস্থা ছিল তাহা নয়, গুরু-শিষ্যের মধ্যেও সেই একই সম্প্রত্তির ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল, আজিও আছে। আচার্য শংকরের অবতরণের প্রয়োজনকে তাঁহার শিষ্যগণই বিশ্বের বুকে রূপ দিয়া গিয়াছেন। সব মহাপুরুষদের 'সম্প্রত্তি' লইয়াই ভক্তগণ তাঁহাদের জীবন চালাইয়া গিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের তিরোভাবের পর শিষ্যগণই গুরুদেবের ব্রহ্ম (বেদ) যজ্ঞ ও লোক। শ্রীগুরুদেব তাঁহার প্রকটকালীন যে-সব কার্যভার নিয়া আসিয়াছিলেন, যে-কার্যকে তিনি যথেষ্টরূপে রূপ দিয়া যাইতে পারেন নাই, শিষ্যগণের দায়িত্ব রহিয়াছে তাঁহার সেই আরব্ধ অথচ অসমাপ্ত কার্যকে সমাপ্তির দিকে আগাইয়া নিয়া চলা। যিনি পিতার জীবন-সাধনাকে সম্যক্‌রূপে 'তনোতি' বিস্তার করেন, তিনিই তো পিতার সত্য সন্তান, সার্থক সন্তান। বিশ্বগুরু শ্রীনিত্যগোপাল যে প্রাণদর্শন ও প্রাণঘন জীবন 'দায়'রূপে বিশ্বের সামনে, বিশেষতঃ তাঁহার আশ্রিত ভক্ত ও

শিষ্যদের সামনে রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আশ্রিত-ভক্ত-শিষ্যদের সাধনা হইবে তাহাকেই অধিকতর কুশলতার সহিত জমাইয়া তোলা। শ্রীনিত্যগোপালের 'আরম্ভে'ই হইবে তাঁহাদের আরম্ভ; তাঁহারা হইবেন 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী', যেমন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের 'আরম্ভে'ই অর্জুনের যুদ্ধারম্ভ সার্থক হইয়াছিল। শ্রীনিত্য-গোপাল হুগলী নিত্য-মঠে থাকাকালীন কোনও এক সময়ে ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—'আমি জানি তোমরা আমারই বিকাশ'। সত্যই ভক্ত-শিষ্যগণ তো স্বরূপতঃ ও রূপতঃ তাঁহারই বিকাশ স্থানীয়। বিশ্ব তাঁহাদের জীবনেই শ্রীনিত্য-গোপালকে দেখিবে, চিনিবে ও আস্বাদন করিবে। শ্রীগুরুর সম্পত্তি পাইতে হইলেও শ্রীগুরুর মতই তাঁহার দায়িত্বভার মাথায় বহন করিতে হইবে। শ্রীগুরুর বিকাশ-স্বরূপ ভক্ত-শিষ্যগণ তো এক হিসাবে আগের দিকে, ভবিষ্যতের দিকে শ্রীগুরুদেবের চেয়েও অনেকখানি অগ্রসর। যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তিনি বীজরূপে, তাহাকে মহীরুহ রূপে গড়িয়া তোলাতেই হইবে শিষ্যদের সার্থকতা।

শ্রীনিত্যগোপাল এই 'সম্প্রত্তি'র ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহার পার্থিব সম্পত্তির উইল দ্বারা বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি শেষ উপদেশে বলেন যে, 'তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিপদে পড়িলে অন্য সকলে তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবেন। যদ্যপি কাহারও কোন কষ্ট হয় তবে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন, পৃথিবীর যাবতীয় লোককে ভ্রাতৃ-ভাবে দেখিবেন ও পরস্পর সাহায্য করিবেন, অনাথ আতুর দেখিলে সাহায্য করিবেন, পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না, সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমানভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস করিবেন'।

উপরি-উল্লিখিত শ্রীনিত্যগোপালের শেষ উপদেশবাণীর মধ্যে কোথায়ও প্রজ্ঞা-বাদের গন্ধও নাই, আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মজ্ঞানের, সমাধির, মহানির্বাণের জন্য উদ্বুদ্ধ করিবার উপযোগী কোনও ঝাঁঝালো উপদেশের স্থান নাই। আছে সহজ নীতিবাক্য, আছে সংঘ-গঠনের মূল রহস্যের ইঙ্গিত, আছে বিশ্বনাগরিক হওয়ার জন্য আহ্বান। ব্রহ্মজ্ঞান বিশ্বের বুকে জমিয়া উঠিলেই যে শ্রীনিত্যগোপালদেবের মতানুসারে তাহা হয় নীতিজ্ঞান, লয়-সমাধির চরম পরিণতিই যে সংঘ-গঠন, বিশ্ব-সংঘ রচনার বুকেই যে ব্রহ্মজ্ঞানের, ভগবত্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, আদর্শের অবতরণের ফলেই বাস্তব যে সত্যিকার বাস্তব, শ্রীনিত্যগোপালদেবের উপদেশের মধ্যে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিশ্বজনীন সম্পর্ক স্থাপনই যে ব্রহ্মজ্ঞানের পরম আস্বাদন, বিশ্বের প্রতি সম্প্রদায়কে সমানভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস করার মধ্যেই যে বিশ্বশান্তি নিহিত রহিয়াছে, শ্রীনিত্যগোপাল নিজ জীবনে ও দর্শনে তাহাই প্রকট করিয়াছেন। বড় বড় পণ্ডিতদের বড় বড় কথা" এই উপদেশ নামায় তিনি আমাদের শুনাইয়া যান নাই, শুনাইয়া গিয়াছেন ছোট ছোট কথা, যে সব ছোট ছোট কথার ভিতর জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান। তিনি লিখিয়া গিয়াছেনঃ 'অল্প অগ্নিও

পূর্ণ, অধিক অল্পিও পূর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ।' ছোট-বড়র ভেদদর্শনহীন প্রাণদর্শন প্রচার করিয়াই তিনি বিশ্বগুরু। আজ বাসন্তী অষ্টমীতে তাঁহার এই আবির্ভাবের সামনে আমরা আমাদের সকল তৃষ্ণার্ত দেহপ্রাণমন নোয়াইয়া দিতেছি। তাঁহার আবির্ভাব বিশ্বজীবনে জয়যুক্ত হউক।

পাকিস্থান কোন্ পথে?: ৫ই মার্চ লাহোরের পি. টি. আই-এর সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য রাত্রি হইতে লাহোরের অবস্থা উদ্বেগজনক। অদ্য প্রাতে আহম্মদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীদের উপর পুলিসের গুলী বর্ষণে তিনজন মারা গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মেয়ো হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, গত ২ দিনে পুলিশের গুলীবর্ষণে নিহত দশজনের মৃত দেহ হাসপাতালে পড়িয়া আছে। পুলিশের গুলীবর্ষণ ও লাঠি-চালনার ফলে আরও ৭০ জনকে এ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। বেলা সাড়ে তিনটা হইতে ৬ই সকাল ছয়টা পর্যন্ত লাহোরে কার্ফু জারী করা হইয়াছে। ৪ঠা মার্চের করাচীর সংবাদে প্রকাশ, 'আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শণের পর হইতে এ পর্যন্ত করাচীতে এই সম্পর্কে এক হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৬ই মার্চ তারিখে করাচীর সংবাদে প্রকাশ যে, ৬ই লাহোরে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। দশম ডিভিসনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল মহম্মদ আজমখান প্রধান শাসককার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, টেলিগ্রাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্থার কর্মচারীরা অদ্য বয়কট করার জন্য আফিস ত্যাগ করিলে সৈন্যেরা ঐ সকল কার্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করে। ৭ই হইতে লাহোরের সহিত ভারতের সকল অংশের টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইবার ফলে লাহোরের অবস্থা কিছুটা শান্ত হইলেও ৮ই মার্চ আবার হাঙ্গামা দেখা দিয়াছে। পুলিশ ও সেনাদলকে হাঙ্গামাকারীদের উপরে গুলী চালাইতে হয়। ৮ই মার্চ অমৃত সহরের অবস্থার অবনতি হইয়াছে। পাক্ রেডিওর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, হাঙ্গামা হওয়ার ফলে রাওয়ালপিণ্ডি সহর ও ক্যান্টনমেণ্টে সন্ধ্যা ছয়টা হইতে সকাল ছয়টা পর্যন্ত কার্ফু জারী হইয়াছে। প্রধান সামরিক শাসনকর্তা এক সম্মেলনে বলেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব, সহরে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটী করা হইবে না। দুষ্কৃতকারীদের প্রতি কোনরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করা হইবে না; তিনি তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করেন।

যাহারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে, তাহারাও মুসলমান এবং যাহাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইতেছে, তাহারাও মুসলমান এবং উভয়েরই সরকার মুসলমান-সম্প্রদায় দ্বারা গঠিত। আজ মুসলমানের বিরুদ্ধেই মুসলমান বিক্ষোভ করিতেছে, এবং মুসলমান সকারই মুসলমানদের গুলী বিদ্ধ করিয়াছে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মসলমানদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আমরা দেখিয়াছি। সে সংগ্রাম ছিল এক সম্প্রদায়ের মানষের সঙ্গে আর সম্প্রদায়ের মানুষের। কিন্তু এইবারকার

সংগ্রাম একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমানদের সংগে ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমানদের। আজ মুসলমানদের কাছেই মুসলমানদের ধন-প্রাণ মর্যাদা বিপন্ন। কেন এই রকম হইল? এই রাষ্ট্র কেমন করিয়া ইহার মীমাংসা করিবে? লাহোরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য কোনও চেষ্টার ত্রুটী করা হইবে না; শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা হইবেও। কিন্তু একই মুসলমান-সমাজের দুই অংশের মধ্যে বিরোধ যে ইহা দ্বারা আরও পাকা হইয়া থাকিবে, তাহার কি উপায় হইবে? বর্তমান বিশ্বে মুসলমান-সমাজে পরস্পরের গোঁড়ামি রক্ষার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন আত্মঘাতী সংগ্রাম চলিতে পারে, ইহা কল্পনাতীত।

যেদিন হিন্দু-মুসলমান বিভেদকে আশ্রয় করিয়া, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে লাগাইয়া, ইসলামের জয় জয়কার দিয়া ইসলাম রাষ্ট্র স্থাপন করা হইল, সংখ্যালঘু হিন্দুগণকে রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য মুসলিম লীগ উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, সেই দিনই যে ভেদ বুদ্ধির ভূত ইহাদের ঘাড়ে চাপিয়াছিল, সেই ভেদবুদ্ধিই আজ নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। এমনই হয়। পাকিস্থান যদি সত্য সত্যই আত্মরক্ষা করিতে চায়, সর্ব প্রথমে তাহার কর্তব্য হইবে এমন রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা, যাহা হইবে মানুষের রাষ্ট্র—মুসলমানেরও নয়, হিন্দুরও নয়, খৃষ্টানেরও নয়। সমগ্র মানুষের রাষ্ট্রে কাহারও কোনও বৈশিষ্ট্যের নামে গোঁড়ামি থাকিতে পারে না; সেখানে স্থাপিত হইবে সকলের সকল বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়। হিন্দুর যাহা সত্যিকার বৈশিষ্ট্য, হিন্দু তাহা সর্বক্ষেত্রে—অর্থনীতিতে রাজনীতিতে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, মুসলমানও তাহার বৈশিষ্ট্য কাহারও উপর জোর করিয়া চাপাইবে না, তবেই না হইবে তাহা 'মানুষে'র রাষ্ট্র'? হিন্দু-মুসলমান যতদিন একই 'মানুষে'র মধ্যে সমভাবে না সম্মানিত হইতেছে, ততদিন গোড়া মুসলমান ও আহম্মদীয়া মুসলমানদের মধ্যে প্রভেদ কিছুতেই দূর করা সম্ভব হইবে না, হিন্দুদের সংগে তো নয়ই। গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে লাভ হইবে না।—মনস্তত্ত্বের এই কথাটী এই দুর্যোগের মধ্যে পাকিস্থান সরকারকে অনুধাবন করিতে বলি। তাহা হইলেই তাহাদের রাষ্ট্র নিরাপদ হইতে। সামরিক আইন জারী করিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার কোনও অর্থই হয় না। প্রকৃত শান্তি রক্ষা হইবে সর্বপ্রথমে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দ্বারাই। ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই।

মার্শাল ষ্ট্যালিন : ৫ই মার্চ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯—৫০-এ (মস্কো সময়, ভারতীয় সময় ১—৪৪ মিঃ) মার্শাল ষ্ট্যালিনের জীবনাবসান হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পরলোক গমনে বিশ্ব একজন নব-প্রবর্তিত সভ্যতার ধারক ও বাহক মহান্ মানুষ হারাইল। তিনি ছিলেন Materialist conception of History -র ধারক, বাহক ও সংস্থাপক। বিশ্বের বুকে এই একান্ত জড়বাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলিয়াই ইহা এমনভাবে

বিশ্বমানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, বিশ্বমানবকে একান্ত অজড়বাদের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রকট হইয়াছে। এতদিন Idealist conception of History নির্বিবাদে চলিয়া আসিতেছিল; তাহার পাশাপাশি মার্কস-এঙ্গেল্স্ স্থাপন করিলেন Materialist conception of History এবং মহান্ নেতা লেনিন-ষ্ট্যালিন তাহারই ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিলেন। কিন্তু Materialist conception of History Idealist conception of History-র মতই একদেশদর্শী। কোনও একটিকেই একান্ত করিয়া লইলে যে শ্রেণীসংঘর্ষ যেমন তেমনই রহিয়া যায়, তাহা বুঝিবার দিন আজ আসিয়াছে। আজ রাশিয়ার এক-নায়ক রাষ্ট্র মহাবিপদের সম্মুখীন। কেন না, বিশ্বের বুকে আজ প্রবর্তিত হইতেছে ইতিহাসের ধারা বহিয়া ইতিহাসের Idealist ও Materialist এর সমন্বয়। এই সমন্বয় প্রচারিত হইলে রাশিয়ার মতবাদও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে। আজ রাশিয়ারও বুঝিবার দিন আসিয়াছে যে, একান্ত অজড়বাদ যেমন চলে নাই, একান্ত জড়বাদও তেমনি চলিবে না। একটি নূতন ধারার প্রবর্তক, মানব-দরদী মহামতি ষ্ট্যালিনের পরলোক গমনের ভিতর দিয়া রাশিয়ার জনসাধারণ, কম্যুনিষ্ট পার্টির পরিচালকবৃন্দ ভবিষ্যতের বুক চিরিয়া তাহাদের অবদান বুকে লইয়া জড়-অজড় সমন্বয়ের পথ পরিষ্কার করুন। ইহা হইলেই মহামতি ষ্ট্যালিনের আত্মা পরিতৃপ্ত হইবেন। তাঁহার অগ্রগতি এই পথেই সম্ভব। তাঁহার সত্যিকার স্থিতি সম্ভব হইবে জড়-অজড় সমন্বয়ের বুকেই। তাঁহার আত্মা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। শ্রেণীসংঘর্ষের প্রতিষ্ঠাতা শ্রেণী-সমন্বয়ের মধ্যেই নবরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবেন, আমরা বিশ্ববাসী এই মহাপ্রয়াণের দিনে তাঁহার সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠাকেই আবাহন করিতেছি। বন্দেমাতরম্

লোকসেবক প্রেস—৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

৬ষ্ঠ বর্ষ — ৪র্থ সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৬০

ভগবান বুদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম্ম

'অনেক জীব নাস্তিক হয়। তাহারা অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী হয়। সেইজন্য জীবের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারে নিজে নাস্তিক হইয়া, নাস্তিকতার মধ্য দিয়া সর্বজীবে দয়া করিবার পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি নাস্তিকতার মধ্যে অবস্থান করিয়াও কি প্রকারে পরম বৈরাগী হইতে হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নাস্তিক হইয়াও কি প্রকারে সর্বগুণমণ্ডিত হইতে হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নাস্তিকদের প্রতি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া নাস্তিকতার মধ্য দিয়া কি প্রকারে নির্বাণ প্রাপ্তির উপায় হইতে পারে তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।'—শ্রীনিত্যগোপাল—নিত্যধর্মপত্রিকা, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; পৃঃ ৬৯।

বেদ, ঈশ্বর ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে pre-existing knowledge or eve cherished prejudice লইয়া বিশ্বের মানুষ যখন একদিকে নিজ জীবন ও বিশ্ব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবিধি গড়িয়া তুলিয়াছিল, যখন সেই বিধির অনুসরণ করিয়া মানুষ বেদ, ঈশ্বর, অদৃষ্টের ক্রীড়নকরূপে পরিণত হইয়াছিল, যখন মানুষ 'আত্মানং বিজানথ' এই উপনিষৎ-মন্ত্রের ও 'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ' গীতোক্ত এই বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য অবধারণ করিতে অক্ষম হইল, মানুষ যখন নিজের মূল্য সম্বন্ধে অচেতন হইল, প্রতিটি মানুষেরও যে শক্তি আছে বেদ ঈশ্বর অদৃষ্টকে গড়িয়া তুলিবার, ইহা ভাবিবার সাহসও যখন বেদ ঈশ্বর অদৃষ্টের চাপে অন্তর্হিত হইল, যখন মানুষ নিজকে অস্বীকার করিয়া, বিশ্বকে অস্বীকার করিয়া গতিধর্মকে বিসর্জন করিল, একান্ত স্থিতির সঙ্গে জীবনকে বাঁধিবার জন্য সাধন করিল, তখন অপরদিকে বেদবিরোধী, ঈশ্বরবিরোধী বিশ্বময় এক আলোড়ন তুলিবার উপযোগী সব-কিছু লইয়া একদল মানুষ নাস্তিক-আখ্যা পাইয়া, বিপুল-গতিবেগ লইয়া সমাজের বুকে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভগবান তাহাদের এই নাস্তিকতাকে দিব্যরূপে ফুটাইয়া তুলিবার মহা ব্রত লইয়াই বুদ্ধরূপে প্রকট হইলেন, নাস্তিকরূপে বেদ ঈশ্বর অদৃষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন রহিয়া মানুষের উপর, মানুষের শক্তির উপর, গতিধর্মের উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিবার মন্ত্র

দিয়া গেলেন। ঈশ্বরশাসিত সমাজে সর্বপ্রথমে মানুষের পূজা তিনিই প্রবর্তন করিয়াছেন; তিনিই Father of dynamism. তিনিই বেদ নামক পুস্তকখানির স্থলে জীবনবেদের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। তিনিই নিষ্ঠুর অদৃষ্টকে গড়িয়া তুলিবার দুর্জয় সাহস লইয়া কর্মমার্গের প্রতিষ্ঠা দিলেন, ঈশ্বর-নিরপেক্ষ মানুষের মূল্য নির্ধারণ করিলেন, পুস্তক-বেদ লইয়া অনন্ত শাখাযুক্ত বৈদিক মতবাদের কাড়াকাড়ির মধ্য হইতে ধীমানকে উদ্ধার করিয়া জীবনের শাস্ত্র গড়িয়া তুলিলেন, অখণ্ড বেদ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দিলেন, জ্ঞান-নিরপেক্ষ কর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া গেলেন। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার উপযোগী গৌরব এই ধরাকে তিনি প্রদান করিলেন।

বেদ, ঈশ্বর ও অদৃষ্ট লইয়া যে-পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি সেই পৌত্তলিকতার মহানির্বাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহারা নাস্তিক বলিয়া বুদ্ধদেবকে বর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই অখণ্ড বেদকে টুকরা টুকরা করিয়া, তাহাকে বহু শাখায় বিভক্ত করিয়া এবং প্রত্যেক শাখাকেই অখণ্ড বেদ বলিয়া ও অপর শাখাকে খণ্ডন করিয়া প্রকারান্তরে বেদেরই 'অপ্রামাণ্য' প্রচার করিলেন, বেদের বেদত্বই অস্বীকার করিলেন। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! তাঁহারা নিজেরা আস্তিক বলিয়া পরিচয় দিলেও নিজেদের অজ্ঞাতসারে নাস্তিকের ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন। বেদের বুক নিংড়াইয়া উত্তরমীমাংসা ও পূর্বমীমাংসার উদ্ভব হইয়াছিল। কি অধিকার আছে বেদবাদী উত্তরমীমাংসকদের পূর্বমীমাংসকদিগকে খণ্ডন করিবার? জৈমিনির রক্তে যেদিন উত্তরমীমাংসার তর্পণ করা হইল, সেদিন যে বেদকে হত্যা করাই হইল, তাহা কি হত্যা করিবার আনন্দে বিভোর উত্তরমীমাংসকদের কাছে ধরা পড়িয়াছিল? যখন বৈদান্তিক শংকর-রামানুজ পরস্পরকে খণ্ডন করিতেছেন, যখন শংকর রামানুজ একজোট হইয়া বৈদিক গৌতম-কপিল-কণাদের শাস্ত্রকে খণ্ডিত করিতেছেন, তখন এই খণ্ডনের ফাঁক দিয়া বেদই যে আর্তনাদ করিতেছিলেন, সে আর্তনাদ কি ইহাদের কর্ণে পৌঁছাইয়াছিল? এই আকুল আর্তনাদ ভগবানের সিংহাসনকে টলাইয়া দিয়াছিল; তাই ভগবান আসিলেন 'সদয় হৃদয়' লইয়া, জীবনের মধ্যে সকল দ্বন্দ্বের মহানির্বাণ আনয়ন করিবার বীর্য লইয়া। তিনি যে সাধারণ 'পশুঘাত' দূর করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন, তাহা নয়; তিনি আসিয়াছিলেন বিশ্বের সর্বসম্প্রদায়ের, সর্ব মতবাদের ভিতর চলিতেছিল যে পারস্পরিক নির্মম 'আঘাত', সেই আঘাতকে হৃদয়ের ধর্মে গলাইয়া দিয়া বিশ্বসঙ্ঘ রচনা করিতে, হন্ ধাতুর হিংসাত্মক অর্থ মুছিয়া ফেলিয়া সেখানে গত্যর্থক সংঘসাধনার প্রবর্তন করিতে, হিংসাজর্জরিত বিশ্বে এক-দর্শন, এক-জাতি গঠনোপযোগী বীর্য আধান করিতে। ভগবান বুদ্ধের কৃপায় বেদ আজ জীবনের মধ্যে স্থান পাইয়াছে; বেদ আজ জীবনবেদ। বেদ শুধু আজ অপৌরুষেয়ই নয়; অপৌরুষের বেদ আজ পুরুষের নিজ জীবনের রসম্বারা গড়িয়া উঠিয়া অনন্ত বেদে রূপ লাভ

করিয়াছে। আজ জীবনের স্পর্শে পৌরুষেয় সকল শাস্ত্রেরও বেদরূপে পরিগণিত হইবার শুভ অবসর আসিয়াছে।

ভগবান বুদ্ধ যে 'ক্ষণে'র মহিমা প্রচার করিয়াছেন, সেই ক্ষণই আজ বেদের প্রতিটি শাখাকে, প্রতিটি বেদের প্রতিটি দার্শনিক মতবাদকে, পরম ঈশ্বরের দেশ-কাল-পাত্র উপযোগী প্রতিটি প্রকাশকে জীবনের এক একটি ক্ষণরূপে, উৎসবরূপে উদ্ভাসিত করিয়া জীবনের মধ্যে সর্বক্ষণের সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। তিনি একত্ববোধের উপর জোর দেন নাই, বরং তাহাকে 'অবিদ্যাই' বলিয়াছেন। কেননা একত্ববাদীরা একত্ববাদের ভিতর যেভাবে অনৈক্য স্থাপন করিয়াছেন, প্রত্যেকের নিজস্ব বিশেষ মতবাদের মধ্যে অন্যান্য বিশেষগুলিকে যেমনভাবে ডুবাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাহার ফলে একের স্থলে অনেকেরই স্থাপনা হইয়াছে, অনৈক্যেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। করুণাবিগ্রহ, পরম সাম্যবাদী বুদ্ধদেব তাই অনেক ক্ষণের, অনেক একের শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন এই অনৈক্যকে শুষিয়া লইবার জন্য। আজ শ্রীনিত্যগোপাল সর্ব মতবাদের, সর্ব সম্প্রদায়ের, সর্ব দর্শনশাস্ত্রের যে মহারাসলীলারস বিশ্ববাসীকে পান করইবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, সার্ধ দুই হাজার বৎসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধদেব তাহারই ভিত্তি এই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের দ্বারা পত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রতিটি মতবাদ সমগ্র মানব জীবনের এক একটি ক্ষণ, প্রতিটি সম্প্রদায় মানবসমাজের এক একটি ক্ষণ, প্রতিটি জাতি বিশ্বমানবজাতির এক একটি ক্ষণ। আজ এই ক্ষণসমূহের স্বয়ংমূল্য প্রতিষ্ঠিত হইবে. স্বয়ংমূল্যবান প্রতিটি মতবাদ, প্রতিটি সম্প্রদায়, প্রতিটি দর্শন ও প্রতিটি জাতির সমন্বয়ে এক বিশ্ব গড়িয়া উঠিবে। ভগবান বুদ্ধদেবে যাহা ছিল পরিকল্পনা, ভগবান শ্রীনিত্যগোপালে তাহাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবে। তাহারই সূচনা আজ দিকে দিকে। **বন্দেমাতরম্।**

'আকাশস্য স্থিতির্যাবদ্ যাবচ্চ জগতঃ স্থিতিঃ।
তাবন্মৎ স্থিতির্ভূয়াৎ জগৎ দুঃখানি নিঘ্নতঃ॥'

—যতদিন এই আকাশ থাকিবে, এবং যতদিন এই জগৎ থাকিবে, ততদিন জগতের সমস্ত দুঃখ অপনয়ন করিতে আমি যেন থাকিতে পারি।

'যৎকিঞ্চিৎ জগতো দুঃখং তৎসর্বং ময়ি পচ্যতাম্।
বোধিসত্ত্ব শুভৈঃ সর্বৈর্জগৎ সুখিতমস্তু চ॥

—জগতের যা কিছু দুঃখ তাহা আমার উপরে ফলুক, আর বোধিসত্ত্বগণের যাহা শুভ তাহা দ্বারা এই জগৎ সুখী হউক।

—ইহাই বোধিসত্ত্বগণের জীবনের আদর্শ।

অমিতাভ

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

কোন্ দিব্য প্রেরণার নবীন উষায়
চন্দ্রিকার শান্ত বক্ষে লভিয়া জনম
করুণার নেত্র তুলি উজ্জ্বল প্রভায়
ধরিত্রীর পানে তুমি চাহিলে প্রথম ?
শঙ্খশ্বেত ঐরাবতে স্বপন মন্থিয়া
নির্ঘোষিয়া আবির্ভাব নৈশ-অন্তরালে
পারিজাত সৌন্দর্যের সুষমা ভরিয়া
অবতীর্ণ হলে তুমি মেদিনীর ভালে।
হে প্রবুদ্ধ অমিতাভ! আত্মার বান্ধব!
বিশ্বজয়ী মিত্রতার প্রমূর্ত প্রতীক!
প্রাণময় সম্রাটেরে করি পরাভব
মানসের রাজ্যে হ'লে প্রথম ঋত্বিক!
নির্বাণেরে উপেক্ষিয়া বৈশাখী জ্যোৎস্নায়
মন্দার করুণামৃত দিলে বসুধায় ॥

ধনিয় গোপ ও ভগবান্ বুদ্ধ

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

ধনিয় (ধনিক) গোপ একটি সাধারণ গোয়ালা; সে চায় খড়ে-ছাওয়া ছোট্ট একটি কুটির, তাহার ভিতরে একটি কর্মকুশলা অচঞ্চলা মনোজ্ঞা স্ত্রী, কয়েকটি স্বাস্থ্যবান্ এবং চরিত্রবান্ পুত্র, কয়েকটি গাভী, কয়েকটি বৃষ, সমান শ্রেণীর সহানুভূতিশীল প্রতিবেশী এবং এই নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশের মধ্যে একটি সুখের সংসার —শান্তির জীবন। এই ধনিয় গোপ—তাহার ছোটখাট আশা-আকাঙ্ক্ষা—ইহারই পাশে দাঁড় করান হইয়াছে ভগবান্ বুদ্ধের লোকোত্তর চরিত্র পালি সুত্তনিপাতের একটি সুত্তে। একটি অপূর্ব দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া উভয় চরিত্রই হইয়া উঠিয়াছে মনোরম, একজনে ছোটখাট একটি শান্তির নীড়ে তাহার গোয়ালাজনোচিত ছোটখাট গার্হস্থ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া, অপর তাঁহার মহান্ বৈরাগ্য, ধ্যান-সাধনা লইয়া। নিম্নে আমরা সমস্ত চিত্রটিই তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি। প্রথমে ধনিয় গোপ বলিতেছে,—

পক্কোদনো দুদ্ধখীরো হমস্মি
অনুতীরে মহিয়া সমানবাসো।
ছন্না কুটি আহিতো গিনি—
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব॥

আকাশ জুড়িয়া মেঘ করিয়াছে, আকাশের দেবতা যেন ঘনবর্ষণোন্মুখ; ধনিয় গোপের মনে কোনও ভয় নাই, সে বলিতেছে,—"হে আকাশের দেবতা (দেয়া), তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তুমি প্রচুরভাবে বর্ষণ করিতে পার; কারণ, আমার খাবার রান্না হইয়া গিয়াছে, গোরুর দুধ দোহান হইয়া গিয়াছে; মহীনদীর তীরে আমি নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করি। আমার কুটির ভালভাবে ছাওয়া আছে, ঘরে আগুন স্থাপিত করা আছে।" একটি গোয়ালা গৃহীর পক্ষে আর কি চাই, এই আয়োজনই যথেষ্ট। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম ভগবান বুদ্ধের উদাত্ত কণ্ঠ; তিনিও বলিতেছেন, তাঁহারও নাই কোনও ভয়; আকাশের দেবতার ইচ্ছা হইলে সে প্রচুরভাবে বর্ষণ করিতে পারে।—

অক্কোধনো বিগতখিলো হমস্মি
অনুতীরে মহিয়া একরত্তিবাসো।
বিবটা কুটি নিব্বুতো গিনি—
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব॥

ধনিয় বলিয়াছে, সে 'পক্কোদন' (পক্ক হইয়াছে ওদন যাহার), তাহার পরিবর্তে বুদ্ধদেব বলিতেছেন, তিনি 'অক্কোধন' (অক্রোধন); ধনিয় হইতেছে 'দুদ্ধখীরো'

(দোহা হইয়াছে দুধ যাহার), বুদ্ধদেব বলিতেছেন, তিনি 'বিগতখিল' (বিগত হইয়াছে সর্বপ্রকার খিল বা বন্ধন যাহার); ধনিয় মহীনদীর তীরে বহুদিন ধরিয়া নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করিতেছে, বুদ্ধদেব মহীনদীর তীরে শুধু একরাত্রি বাস করেন (কোথাও তিনি স্থায়ী হইয়া বাস করিতে চান না); ধনিয় গোপের 'ছন্না কুটি' (ভাল করিয়া ছাওয়া কুটির), বুদ্ধদেবের 'বিবটা কুটি' (বিবৃত কুটির, অর্থাৎ উন্মুক্ত আকাশতল হইল তাঁহার কুটির), ধনিয়ের 'আহিতো গিনি' (গৃহে স্থাপিত অগ্নি) আর বুদ্ধদেবের 'নিব্বুতো গিনি' (নিভিয়া গিয়াছে মনের সকল অগ্নি)—এই জন্যই তাঁহার নাই বর্ষাবাদল ঝড়-ঝঞ্ঝায় কোনও শঙ্কা।

ধনিয় গোপের কণ্ঠ আবার শুনিতে পাই—

অন্ধকমকসা ন বিজ্জরে
কচ্ছে রূঢ়তিণে চরন্তি গাবো।
বুট্ঠিং পি সহেয়ুমাগতম্
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব॥

এখানে ডাঁশ-মশা প্রভৃতির যন্ত্রণা নাই; আর ঘাসভরা জলাভূমিতে আমার গোরুগুলি চরিয়া বেড়ায়; বৃষ্টি আসিলেও সহ্য করিতে পারিব,—তুমি ইচ্ছা করিলে প্রচুর বর্ষণ করিতে পার।

সঙ্গে সঙ্গেই জাগিয়া উঠিল বুদ্ধদেবের কণ্ঠ—

বদ্ধা হি ভিসি সুসংখতা
তিন্নো পারগতো বিনেয্য ওঘং।
অত্থো ভিসিয়া ন বিজ্জতি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব॥

আমার ভেলা অতি শক্তভাবে গড়া এবং বাঁধাই আছে; সমস্ত ঢেউ বশীভূত করিয়া আমি উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছি ওপারে; এখন আর ভেলার নাই আমার কোনও প্রয়োজন; সুতরাং নির্ভয় নিঃশঙ্ক আমি,—হে আকাশের দেবতা, তোমার ইচ্ছা হয়ত তুমি প্রচুর বর্ষণ কর।

ধনিয় বলিল,—

গোপী মম অস্সবা অলোলা
দীঘরত্তং সংবাসিয়া মনাপা।
তস্সা ন সুণামি কিঞ্চি পাপং
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব॥

"আমার গোপী (স্ত্রী) সুচরিতা, অচঞ্চলা; বহুদিন ধরিয়া সেই মনোজ্ঞার সহিত করিতেছি একত্রে বাস; তাহার সম্বন্ধে শুনি নাই কখনও কোনও পাপের কথা।"—আর কি চাই, ইহাই তাহার গোয়ালা জীবনের কতবড় গর্ব এবং শান্তি!

বুদ্ধদেব বলিলেন,—

চিত্তং মম অস্সবং বিমুত্তং
দীঘরত্তং পরিভাবিতং সুদন্তং।
পাপং পন মে ন বিজ্জতি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব॥

"চিত্ত আমার অস্রব (সর্ববিধ স্খলনরহিত) এবং বিমুক্ত; বহুদিনের (ধ্যান-ধারণা দ্বারা) সে পরিভাবিত এবং সম্পূর্ণরূপে বশীভূত; পাপ কিছু নাই আমার ভিতরে।"—ইহাই আবার হইল বুদ্ধের জীবনের শান্তি এবং গর্ব।

ধনিয় বলিল,—

অত্তবেতনভতো হহমস্মি
পুত্তা চ মে সমানিয়া অরোগা।
তেসং ন সুণামি কিঞ্চি পাপং
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব॥

"আমি হইলাম 'আত্মবেতনভৃত', (অর্থাৎ নিজের পরিশ্রমে অর্জিত আয়ের উপরেই নির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী নই); আমার প্রিয় পুত্রগণও হইল রোগহীন; তাহাদেরও শুনি নাই আমি কোনও পাপ।"

বুদ্ধদেব জবাব দিলেন,—

নাহং ভতকোহস্মি কস্সচি
নিব্বিট্ঠেন চরামি সব্বলোকে।
অথো ভতয়া ন বিজ্জতি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব॥

"আমি নই কাহারও ভৃত্য, নিজের অর্জিত ধনের দ্বারাই ঘুরিয়া বেড়াই সকল লোকে; প্রয়োজন নাই আমার কোনও উপজীব্যের (ভাতার);" সুতরাং মুক্ত আমি নিঃশঙ্ক!

ধনিয় বলিল,—

অত্থি বসা অত্থি ধেনুপা
গোধরনিয়ো পবেনীয়ো পি অত্থি।
উষভো পি গবম্পতি চ অত্থি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব॥

এইবারে ধনিয় গোপ তাহার গোধনের গর্ব করিতে লাগিল; বিভিন্ন রকমের বংশপরম্পরাগত রহিয়াছে তাহার কত গাভী এবং কত বৃষ! শুনিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন, —তাঁহার নাই কোনও গাভী—কোনও বৃষ—তাহাতেই তিনি আনন্দিত।—

নত্থি বসা নত্থি ধেনুপা
গোধরনিয়ো পবেনীয়ো পি নত্থি।

উঁষভো'পি গবম্পাতি'পি নত্থি
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব॥

ধনিয় গোপ আবার বলিল,—

খিলা নিখাতা অসম্পবেধী
দামা মুঞ্জময়া নবা সুসণ্ঠানা।
নহি সক্খিন্তি ধেনুপা'পি ছেত্তুং
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব॥

"গোরুর গোঁজ ভাল করিয়া মাটিতে পোতা আছে, একটুও নড়ে না, মুঞ্জা-ঘাসের তৈয়ারী নূতন দাড়ি দ্বারা সব ভাল করিয়া বাঁধা আছে; বাছুরগুলিও তাহা ছিঁড়িতে পারিবে না।"—অতএব গার্হস্থ্য গোপজীবনে ধনিয় নিশ্চিন্ত।

বুদ্ধদেব বন্ধনের কথা শুনিয়া আরও দৃপ্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—

উসভোরিব ছেত্বা বন্ধনানি
নাগো পূতিলতং ব দালয়িত্বা
নাহং পুন উপেস্‌সং গব্‌ভসেয্যং
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব॥

"বৃষের মত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সকল বন্ধন, (মত্ত) হাতী যেমন দলিত করে পূতিলতা (তেমন করিয়া সকল বন্ধন দুই পায়ে দলন করিয়া)—গর্ভশয্যায় আর করিব না প্রবেশ; (নিঃশঙ্ক নির্ভয় আমি); হে দেব, ইচ্ছা করিলে কর প্রচুর বর্ষণ।"

এমন সময় নিম্নদেশ এবং স্থলদেশ জলে ভরিয়া দিয়া তখনই মহামেঘ ঘনবর্ষণ আরম্ভ করিল; আকাশের সেই বর্ষণধ্বনি শুনিয়া ধনিয় গোপ ভগবান্ বুদ্ধের চরণে নতি জানাইল। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সে বলিল,—

লাভা বত নো অনপ্‌পকা
যে ময়ং ভগবন্তং অদ্দসাম।
সরণং তং উপেম চক্‌খুম
সত্থা ন হোহি তুবং মহামুনি॥

"লাভ আজ আমাদের অল্প হয় নাই যে আমরা ভগবানকে দেখিলাম; হে চক্ষুষ্মন্! তোমারই শরণ গ্রহণ করিলাম, হে মহামুনি, তুমি আমাদের শাস্তা হও।" ধনিয় আরও বলিল,—

গোপী চ অহঞ্চ অস্‌সবা
ব্রহ্মচরিয়ং সুগতে চরামসে।
জাতিমরণস্‌স পারগা
দুক্‌খস্‌সন্তকরা ভবামসে॥

"হে সুগত! গোপী (আমার স্ত্রী) এবং আমি অস্খলিতভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করিব, এবং আমরা জন্মমরণের ওপারে যাইব, দুঃখের শেষ করিব।"

সয়তান মার যেন পাশেই বসিয়াছিল, গোপ-দম্পতি এবং ভগবান্ বুদ্ধ উভয়পক্ষকে শুনাইয়া শুনাইয়াই সে বলিয়া উঠিল,—

নন্দাতি পুত্তেহি পুত্তিমা
গোমিকো গোহি তথেব নন্দাতি।
উপধি হি নরস্স নন্দনা
ন হি সো নন্দাতি যো নিরূপধী॥

"যাহার পুত্র আছে, সে পুত্রগণ হইতেই আনন্দ পায়; যাহার গোরু আছে সে সেই গোরু দ্বারাই পায় আনন্দ; কিছু থাকাই হইল মানুষের আনন্দ,—সে কখনও পায় না আনন্দ যাহার নাই কিছু।"

ভগবান্ বুদ্ধ তাহার উত্তরে বলিলেন,—

সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা
গোমিকো গোহি তথেব সোচতি।
উপধি হি নরস্স সোচনা
ন হি সো সোচতি যো নিরূপধী॥

"যাহার পুত্র আছে সেই পুত্রের জন্যই সে পায় শোক, যাহার গোরু আছে সেই গোরু হইতেই সে পায় শোক; কিছু থাক্‌ই হইল মানুষের শোক, সে কখনও শোক করে না যাহার নাই কিছু।"

ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং।
অত্তনো ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ॥
—পর কি বলেছে কঠিন বচন পর কি করে বা না করে।
তাহে কাজ নাই তুমি আপনার কৃত বা অকৃত দেখরে॥
—রবীন্দ্রনাথ কৃত ধম্মপদের অনুবাদ

পঁচিশের দুরন্ত স্বপন

নচিকেতা

যৌবন সোণালী স্বপ্নে মনে হয় আমি যেন প্রথম মানুষ,
স্বর্গের আনন্দ ছবি এইমাত্র দেখিনু চাক্ষুষ।
মোর চোখে এখনো যে পারিজাত মন্দারের মায়া
কুলুকুলু মন্দাকিনী মোর বক্ষে ফেলিতেছে ছায়া,—
সে ছায়ার মধু কলধ্বনি
আমার হৃৎপিণ্ডরক্তে উঠিতেছে ধ্বনি।--
ওরা বলে এ কল্পনা পঁচিশের আগে
সকলেরই একদিন সোণাস্বপ্নে যৌব-বক্ষে থাকে,—
তারপরে কখন যে চুপি চুপি শূন্য করি সব
উড়ে যায় নিঃশেষিয়া নিশ্চিত নীরব।
সবার হলেও তাহা আমি জানি আমার হবেনা
আমার পঁচিশ কভু বন্ধ্যা হয়ে রিক্ত সে রবে না।
সেখানে বুনেছি আমি যে সৃষ্টির বীজ
সে বীজ মেলিবে পাখা--সে মাটিতে নাই কোন খিঁচ।
আমার হৃৎপিণ্ডরক্তে সে মাটি যে আশ্চর্য উর্বর,
অফুরাণ প্রাণাঙ্কুর শ্যাম স্বপ্নে জাগে মোর তপ্ত বক্ষপর।
আমার তো কিছু নাই বিত্ত বা বীরত্ব নাই মোর,
কর্মের তপস্যা দানে করিব যে দুঃখ রাত্রি ভোর—
স্বার্থের শিবিরে আমি হানা দেব—হয়ে রূঢ় দুরন্ত সৈনিক
সংগ্রামে নিঃশঙ্ক চিত্তে হব যে দুর্ভীক—
সে আমার কাজ নয়—জেনেছি তা প্রথম প্রভাতে।
একটি উর্বর জমি আছে মোর হাতে,
আর আছে মননের অঙ্কুরিত বীজ পাকা পাকা,
আমার যৌবন চোখ চিরকাল রবে তাহা শ্যামাঞ্জনে আঁকা।
আমার চেতনা সাথে সমপ্রাণ মানুষের বেদনা-স্বাক্ষর
আমার অঙ্কুর-বীজে যৌব স্বপ্ন রহিবে অমর।
কণ্ঠে মোর আছে গান আর আছে ভরা প্রাণে ফসলের আশা
আমার সৃষ্টির ভূমে উর্ধ্বশির প্রতিশোধ ভাষা—
মনন সৈনিক ওরা কালো কালো কালির অক্ষরে
সহস্র মনের দ্বারে পৌঁছে দেবে সূর্য স্বপ্ন হৃদয় পঞ্জরে।

ওরা আগে মুক্ত হাতে দানবের বক্ষে বক্ষে দাগিবে কামান—
বুভুক্ষু বঞ্চিত হাতে দিবে আনি মানুষের লুণ্ঠিত ফরমান।
আগামীর ইতিবৃত্তে হবে যারা নির্ভীক সেনানী
তাঁদের আহত কণ্ঠে শোনাইবে উজ্জীবনী বাণী।
দম্ভের দুর্গের দ্বারে স্তূপীকৃত ঐশ্বর্য ভাণ্ডার
মুক্ত ভিন্ন করি দিয়া মিটাইবে যুগান্তের অশ্রু হাহাকার।
আপাততঃ দুই হাতে বুনে যাই ছোট মোর ক্ষেতে
পঁচিশের স্বপ্ন দিয়ে মৃত্যুপথে চলে যেতে যেতে:
আগামীর অফুরাণ প্রাণের ফসল
আমার যৌবন-অর্ঘে সহস্র যৌবন হবে
প্রাণ রক্তে অপূর্ব উজ্জ্বল।
কলমের কোদাল চালিয়ে
বারে বারে এ মাটিরে
স্বর্ণদীপে রাখিব জ্বালিয়ে
—তাই মোর এ পঁচিশ ব্যর্থ যে হবে না
ব্যথা-কৃষ্ণ এ মাটিতে জাগিবেই স্বপ্ন নিয়ে
বিপ্লবের শত সূর্যসেনা।
পঁচিশের সোণা স্বপ্নে মননের সোণা ধান বুনি—
ক্ষুধার পরম অন্নে চিনে নেবে কে দুশমন খুনী।
সৃষ্টির ফসল মোর সুধা সোম হয়ে
নব জাতকেরে নেবে যুগান্তের কুরুক্ষেত্রে বয়ে।
বক্ষে বক্ষে তুলিবে সে দিগ্বিজয়ী রক্তাক্ত নিশান
পঁচিশের বোনা ধানে আমি শুধু বিলাইব মুঠা মুঠা প্রাণ।
আমার পঁচিশে-স্বপ্ন যাবে না সে উড়ে
নিত্য নব প্রাণরূপে উঠিবে সে কৃষ্ণ মাটি ফুঁড়ে।
পঁচিশের সোণা-ভরা মননের মাঠে
আমার কলমকাস্তে রাশি রাশি সোণা ধান কাটে :
সে ধানেতে একমাত্র আছে অধিকার
যুগান্তের কুরুক্ষেত্রে শিবিরে শিবিরে যত নির্ভীক সোনার।

রবীন্দ্রকাব্যে সৃষ্টির স্বরূপ

অমিতা মিত্র

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবি। বিশ্বকে তিনি ভালবেসেছেন। তাঁর এই ভালবাসা ব্যক্ত হয়েছে কাব্যে তথা সাহিত্যে, ছন্দে, শিল্পে, সংগীতে,—জীবনের বিচিত্র প্রকাশে। নিজের প্রেমের আলোকে তিনি দেখেছেন নিখিলের 'ধুলায় ধুলোয়' প্রেম আছে, ছোট কণারও দরদ আছে। তাই জগতের কিছুই তুচ্ছ নয়, সবই মহনীয়।

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।

কবি এই উপলব্ধ সত্য লাভ করেছেন যে, এই পৃথিবীকে যে এত ভালবাসি তার কারণ এর সংগে সম্বন্ধ আমার শুধু আজকের নয়, জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে এই সম্বন্ধ নিত্য নূতন হ'য়ে নব নব চেতনার আলোকে এসে দেখা দিচ্ছে। এই পৃথিবী অনেকদিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালবাসার লোকের মত কবির কাছে চিরনূতন রূপে দেখা দিয়েছে। তাই কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে দিয়ে বসুন্ধরার জন্মের ইতিহাস এবং তার সংগে আমাদের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তা বলতে চেষ্টা করেছেন। কেমন করে এই বিশ্বজগৎ গড়ে উঠল এবং কে তার নিয়ামক এ সম্বন্ধে কবির কৌতূহলের সীমা ছিল না, এবং এই গভীর সৃষ্টি রহস্য সন্ধানে কবিচিত্ত সর্বদাই উন্মুখ হ'য়ে থাকতো, এবং এই সন্ধান-তৎপরতা তাঁর কাব্যে কতভাবে ব্যক্ত হয়েছে তার প্রচুর নিদর্শন আমরা দেখতে পাই তাঁর সমগ্র সাহিত্যে। কৈশোরের 'প্রভাত সংগীত' থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যুগে 'বলাকা' এমন কি তার পরেও অনেক কাব্যে সৃষ্টির প্রাণধর্মের কথা বলেছেন। সৃষ্টির প্রাণধর্মের রূপ সর্বত্রই একভাবে প্রকাশ পায়নি সত্য কিন্তু সর্বত্রই এর রূপ কোন না কোনভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সৃষ্টির প্রাণধর্মে এই লীলা-চাঞ্চল্যকে তিনি কখনও দেখেছেন বিস্ময়-ভাববিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে, কখনও দেখেছেন সুমহান আদর্শের ঊর্ধ্বমুখীন কল্পনায়। তাই প্রথম থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত বলেছেন—

'অবজ্ঞা করিনি তোমার মাটির দান
আমি যে মাটির কাছে ঋণী জানায়েছি বারম্বার।'

জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, মননেরও প্রায় তাই, কিন্তু অনুভূতির ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। যাকে জ্ঞানে যুক্তিতে তর্কে পাওয়া যায় না, যে বস্তু ধ্যানেরও অতীত তাকে পাওয়া যায় অনুভূতির সীমাহীন রাজ্যে। অনুভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ প্রেম। এমন কোন বস্তু নেই যা প্রেমের সীমায় এসে মিলিত না হয়। এই অনুভূতি কবিকে কাব্য রচনায়, শিল্পীকে রূপ রচনায়, সাহিত্যিককে সাহিত্য রচনায় প্রেরণা

জাগিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রেরণার মূলেও রয়েছে এই অনুভূতির প্রেরণা, প্রকাশের প্রেরণা, কোনরকম তথ্য তত্ত্ব বা জ্ঞানের প্রেরণা নয়।

কবি তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে এক জায়গায় বলেছেন,—"আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিষ বুঝি নাই কিন্তু তাহা অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে।' কে অন্তরের অন্তঃস্থলে বসে 'নাড়া' দিয়েছে তা আমরা জানি না, কিন্তু তিনি যিনিই হোন তিনিই যে কবির জীবনের একমাত্র নিয়ামক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কবি রাখেননি। 'জীবন-স্মৃতি'র পাতায় দেখা যায় যে, একদিন তিনি কলকাতায় সদর স্ট্রীটের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, হটাৎ তাঁর মনে এক অপূর্ব চিন্তাপ্রবাহ সারা অন্তরকে আলোড়িত করে তুলেছিল। তিনি মুহূর্তে অনুভব করলেন,—"একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।...শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। ...বিশ্বজগতের অতল স্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরণা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইলাম।" আমরাও দেখি, সেই সকাল বেলায় এক জ্যোতির্ময় মুহূর্তে তিনি যে প্রত্যয়টি আবিষ্কার করেছিলেন, পরবর্তী জীবনে এই একান্ত সত্য বোধটি জীবনের বিচিত্র অনুভূতিতে কত সত্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই সত্যবোধ দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত নয়, অধ্যাত্মবোধের ফলস্বরূপও নয়, একটি সহজ স্বাভাবিক অনুভূতির ফলেই এই সত্য তিনি লাভ করেছিলেন। কবি নিজেই বলেছেন, এ "তত্ত্বও নয়, বিজ্ঞানও নয়, কোনপ্রকার কাজের জিনিষও নয়, তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মত অন্তরের চেহারা মাত্র। তাহার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা আর কোন বুদ্ধিসাধ্য জিনিষ মিলাইয়া দিতে পার তো দাও, কিন্তু সেটা গৌন।" কারণ, "অন্তরের অন্তঃস্থলে যে কাজ চলে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে তার সকল খবর আসিয়া পৌঁছায় না।" তাই অমরা দেখি তাঁর রচিত বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে বহু সুমহান সত্যের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট রয়েছে কিন্তু তা যত না জ্ঞানমার্গীয় তার থেকে অনেক বেশী হৃদয়মার্গীয়।

চিন্তাশীল অনুভূতিপ্রবণ মানুষের মনেই প্রশ্ন জাগে। তত্ত্বান্বেষী মন নানাভাবে সব কিছুই জানতে চায়, বুঝতে চায়; প্রকাশ করতে চায়। তাই তার অনন্ত প্রশ্ন অনন্ত সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে। মানুষ যুগের পর যুগ সৃষ্টি রহস্য বা বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে চিন্তা, গবেষণা ও কল্পনা করে পরবর্তী যুগের জন্য চিন্তাধারা সঞ্চারিত করে গিয়েছে। সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতির মধ্যে নানারকম আখ্যান, উপাখ্যান, উপকথা, রূপকথা, বিজ্ঞানসম্মত কথা প্রচলিত আছে।

রবীন্দ্রনাথ 'প্রভাত সঙ্গীতে' 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতাটির মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির আদি অন্ত যা বলেছেন তার সঙ্গে পুরাণের কল্পনা ও বিজ্ঞান চিন্তার বেশ সুন্দর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে লিখেছেন—"আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলাম। তখন পৃথিবীতে জীব জন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলেম —নব শিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছিলেম। এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তনরস পান করেছিলেম। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি পড়লেই মনে হয় যে, কবি পৃথিবীর জন্মরহস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা' কবিতাটি বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কল্পনার রঙিন তুলিতে অপূর্ব কাব্য-রূপ লাভ করেছে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটিতে কবি নিজের উপলব্ধির কথা বলেছেন,—

"আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব, ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার— বোবার ইঙ্গিত-ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়িতে যে রক্ত বহে, সে-ও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে—
যখন বিলীনভাবে ছিনু ঐ বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে,—লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে, সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবী প'রে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মত
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।"

'বসুন্ধরা' কবিতাটির মধ্যেও অনুরূপ ভাবের দ্যোতনা দেখা যায়। 'বসুন্ধরা' কবিতায় মাটির সঙ্গে ও জীব জগতের সঙ্গে বিচিত্র ভঙ্গিতে কবির এক হ'য়ে মিশে যাবার আকাঙ্ক্ষার মূলে যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পূর্বজন্ম স্মৃতি নিহিত আছে,

এখানেও সেই স্মৃতি কবিকে ব্যাকুল করে তুলেছে—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগযুগান্তর ধরি', আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধরেণু, তাই আজি
কোন দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর;
......জাগে মহা ব্যাকুলতা
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বত্যাগী হ'য়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান রবে—শতবার করে'
সমস্ত ভুবন, সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হ'তে, মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দ খেলার
পরিচিত রব।

কবির কাছে এই অদৃষ্ট সৃষ্টি ধারা, যার বেগ অবোধ্য, তা নিছক তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক কথা নয়, বা বিশেষ কোন মতবাদও নয়। তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন যে, চির প্রবহমান প্রাণধারা নিত্য নব নব রূপে এই সৃষ্টিতে প্রাণ সঞ্চার করে চলেছে। প্রাণের অসীম জগতেও চলেছে এই অবোধ্য প্রাণপ্রবাহের ধারা। নিখিল বিশ্বের এই অদৃশ্য বিরাট প্রাণ প্রবাহকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ক'রে আনন্দের অভিব্যক্তি হ'লো—

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রি দিন ধায়

সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে।

* *

করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।"

কবি সর্বদাই বলেছেন এ কোন তত্ত্বকথা নয়, এ আমার আনন্দরূপ। তাই কবি নিখিল বিশ্বের সঙ্গে নিজের প্রাণের গভীর বন্ধন অনুভব করেছেন।

———— ক্রমশঃ

'আমি সমস্ত দ্যুলোক ভূলোক ভ্রমণ করে এসে দাঁড়ালুম প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

সেই প্রথমজাত অমৃত আজও জরাজীর্ণ হয় নি, জলে স্থলে আকাশে তার ঐশ্বর্য তো বিচিত্ররূপে প্রকাশমান। আদিকালের সেই প্রথমজাত অমৃতই তো মানুষের আত্মার 'অপূর্বেণেষিতা বাচস্' অপূর্বের দ্বারা প্রেরিত বাণী, তার প্রকাশ তো আজও নব নব আনন্দরূপে উদ্ভাবিত হয়ে মানুষকে সর্বোচ্চ গৌরবে মহীয়ান করেছে। এই আবিকে এই সুন্দরকে এই আনন্দকে ঈর্ষা করে আমরা যদি তার প্রতি বিমুখ হই, তবে আমাদের জীবন মূঢ় অদৃষ্টের পায়ের তলায় শিকলে বাঁধা হয়ে কাটবে শুধু মাত্র খেয়ে পরে'। আমরা যে সৃষ্টিকর্তার সরিক, আমাদের আত্মা যে প্রকাশ স্বরূপ এই কথাই আজ নব বর্ষে আমরা যেন স্বীকার করতে পারি।'

—রবীন্দ্রনাথ, ১লা বৈশাখ, ১৩৪২

নারীর মর্য্যাদা

প্রতিভা রায়

সতীর অপমানে স্বর্ণলঙ্কা আজ বিষাদ সাগরে মগ্ন। যাহার অহঙ্কারদৃপ্ত প্রতাপে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কম্পিত, সে আজ নররূপী নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের শরাসনে ভূপাতিত। রাবণ চাহিয়াছিলেন শ্রীরামের লক্ষ্মী সীতা দেবীকে জোর করিয়া তাঁহার ভোগে লাগাইতে; তাই তো তিনি সীতাকে তো পাইলেন না উপরন্তু এক লক্ষ পুত্র এবং সোয়া লক্ষ নাতি সহ নিজেও নিহত হইলেন। বংশের প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিবার মত কেহই রহিল না। ইহাই হইল অহঙ্কারের পরিণতি। এই অহঙ্কার-দৃপ্ত রাবণের স্পর্শে শ্রীরামের লক্ষ্মী সীতা অলক্ষ্মীরূপিণী হইয়া রাবণের স্বর্ণ লঙ্কা ধ্বংস করিয়া, লঙ্কাকে বিষাদ সাগরে ডুবাইয়া দিয়া আজ শ্রীরামের সীতা শ্রীরামের সকাশে চলিয়াছেন। সঙ্গে বিভীষণ হনুমান আদি রামভক্তগণ।

আজ সমুদ্রের এক পার বিষাদ সাগরে মগ্ন, অপর পার আনন্দ কোলাহলে মুখরিত। বানরগণের আনন্দের আর সীমা নাই, এতদিনের এত দুঃখ কষ্টের অবসান হইল। রাবণ বধ করিয়া রামের সীতাকে উদ্ধার করিয়া শ্রীরাম সকাশে আনিতে পারিয়াছে তাই আজ এই আনন্দ।

কিন্তু এ কি, শ্রীরামের মুখে তো হাসি নাই, তিনি বিভীষণকে ডাকিয়া বলিলেন, সীতাকে কেন আনিয়াছ? সখা, আমি সীতাকে উদ্ধার করিয়াছি, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারিব না। সীতা যেখানে থাকিতে ইচ্ছা করেন সেখানে চলিয়া যাইতে পারেন। স্তম্ভিত সীতা, স্তম্ভিত বানর বাহিনী, স্তম্ভিত বিভীষণ লক্ষ্মণ! এ কি কথা, যাহার জন্য শ্রীরাম কাঁদিয়া আকুল, যাহার জন্য সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা স্থাপন, যাহার জন্য দুর্লঙ্ঘ্য সাগর বন্ধন, যাহার জন্য রাবণ বধ, আজ তাহাকেই পাইয়া এ কি নির্মম ব্যবহার! মুহূর্তে সকল আনন্দ-কোলাহল থামিয়া গেল, ধরিত্রী ডুবিয়া গেল বিষাদ সাগরে। ব্যাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় শ্রীরামের চরণতলে নিপতিতা হইলেন সীতাদেবী।

পরম কারুণিক সীতাপতি রাম, কঠোর নির্দেশ করিলেন সীতা দেবীর প্রতি। তিনি বলিলেন, শোন জনক দুহিতা! তুমি রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়া রাক্ষস ভবনে দিনযাপন করিয়াছ, তোমাকে লইয়া আমি অযোধ্যায় যাইয়া অযোধ্যার রাজ সিংহাসন কলঙ্কিত করিতে পারি না। তুমি নিষ্কলঙ্ক, অগ্নিপরীক্ষাদ্বারা যদি ইহা প্রমাণিত করিতে পার তবেই আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি। তাহাই স্থির হইল, সমুদ্রতীরে সীতার সতীত্ব পরীক্ষার জন্য অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইল, রামানুগতা সীতা দেবী শ্রীরামের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া সতীত্বের পরীক্ষা দিতে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন। অগ্নি হইতে স্বয়ং অগ্নিদেবতা সীতাকে কোলে করিয়া

শ্রীরাম সমীপে আসিলেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ, পিতৃপুরুষগণ সকলে শ্রীরাম সকাশে আসিয়া সীতা যে নিষ্পাপ নির্মল, ইহা বলিয়া রামসীতাকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। সীতার গলায় বিভীষণপ্রদত্ত কুসুম মালা অম্লান, সীতা যেমন ছিলেন সেইভাবেই, রামের চরণে প্রণতা হইলেন। বানর বাহিনী জয় সীতারাম ধ্বনিতে মেদিনী কম্পিত করিয়া দিল, স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হইতে লাগিল, শ্রীরাম সাদরে সীতাকে বামপার্শ্বে বসাইলেন।

আজ অযোধ্যা নগর আনন্দ সাগরে মগ্ন, ১৪ বৎসর বনবাসের পর পিতৃসত্য পালন করিয়া রামসীতা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভরতের রক্ষিত অযোধ্যার শূন্য সিংহাসনে রামসীতা উপবেশন করিয়াছেন, তাই অযোধ্যাবাসীর আনন্দের সীমা নাই।

কিন্তু দুঃখের ইতিহাস রচনা করিবার জন্য, নির্যাতিতা প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য যিনি ধরার বুক চিরিয়া জনকের লাঙ্গলে উদ্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার জীবনে এ সুখ সহিবে কেন? শ্রীরামচন্দ্র প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কলহরত এক প্রজার মুখে শুনিতে পাইলেন—স্বামী স্ত্রীকে শাসন করিয়া বলিতেছে, তুমি চলিয়া যাও, আমি রামচন্দ্র নই যে, দীর্ঘদিন যে-সীতা রাবণের বাড়ী থাকিয়া আসিল তাহাকে লইয়া সংসার করিব। প্রজার মুখে এই কথা শুনিয়া শ্রীরাম মর্মাহত হইয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। নগররক্ষক দুর্মুখকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার রাজ্যে প্রজারা কি অবস্থায় আছে বর্ণনা কর। দুর্মুখ বলিলেন—মহারাজ আপনার রাজ্যে প্রজারা সর্বপ্রকারে সুখে বাস করিতেছে। কিন্তু সীতাদেবী রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়া রাক্ষসের গৃহে দীর্ঘদিন বাস করার পর আপনি সেই স্ত্রীকে লইয়া সংসার করিতেছেন, কেবলমাত্র আপনার এই অপবাদ সকলের মুখে শুনিতে পাই। শ্রীরামচন্দ্র দুর্মুখকে বিদায় দিয়া বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে লক্ষ্মণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা বলিয়া সীতাকে বনবাসে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ এই কঠিন আদেশ পাইয়া কাতর হইয়া শ্রীরামকে অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—না ভাই, তাহা হয় না, আমি রাজা, আমার কর্তব্য প্রজাগণ যাহাতে কোনপ্রকার উদ্বেগ বা কষ্টে না থাকে তাহাই দেখা। ইহার জন্য যদি সীতার উপর অত্যাচার বা অবিচার হয় তাহা করিতে আমি বাধ্য, কেননা, আমি রাজধর্ম হইতে চ্যুত হইতে পারিব না। সীতা তপোবন দর্শনের ইচ্ছা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে সেই কথা বলিয়া লইয়া গিয়া কোনও ঋষির আশ্রমে রাখিয়া আইস।

রামানুগত লক্ষ্মণ নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আদেশ পালনে প্রস্তুত হইয়া সীতার নিকট গমন করিলেন এবং সীতার নিকট শ্রীরামের আদেশ নিবেদন করিয়া বলিলেন,—দেবী! তপোবন দর্শনে যাইবার জন্য এই মুহূর্তেই প্রস্তুত হইয়া লউন। কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় সীতার বুক কাঁদিয়া উঠিল। সীতা বলিলেন,—মহারাজ কেন

আসিলেন না লক্ষ্মণ! আমি তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া কেমন করিয়া তপোবন দেখিতে যাইব? লক্ষ্মণ বলিলেন,—মহারাজ রাজকার্যে ব্যস্ত, তিনি এখন আসিতে পারিবেন না, আপনি চলুন। সীতা শাশুড়ীগণকে প্রণাম করিয়া শ্রীরামের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। কিন্তু সীতার বনগমনের আনন্দ আর রহিল না, রামের অদর্শনে প্রাণ তাঁহার কাঁদিতে লাগিল। রথ বনের ভিতর এক ঋষির আশ্রমের নিকট থামিলে সীতা সহ লক্ষ্মণ অবতরণ করিলেন। লক্ষ্মণ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীরামের সেই নিষ্ঠুর আদেশ সীতার নিকট নিবেদন করিলেন. সীতা বজ্রাহত বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে সুস্থ করিয়া, অনেক সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া নিকটেই বাল্মীকি মুনির আশ্রম, সেখানে যাইবার কথা বলিয়া লক্ষ্মণ বিদায় চাহিলেন। সীতা বলিলেন, লক্ষ্মণ, মহারাজকে আমার প্রণাম দিও আর জিজ্ঞাসা করিও সীতা অপরাধিণী; কিন্তু আমার গর্ভে তাঁহার যে শিশু সন্তান রহিয়াছে তাহার কি অপরাধ? লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে রথারোহনে অযোধ্যায় গমন করিলেন।

অযোধ্যার রাজসভা, মুনি ঋষি রাজন্যবর্গ বেষ্টিত শ্রীরামচন্দ্র। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার শিষ্যদ্বয় কুশ-লব নামে দুই কিশোর বালক সহ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাম জন্মের বহু পূর্বে রামের যে ইতিহাস বাল্মীকি মুনি রচনা করিয়াছিলেন, বীণাযন্ত্রে মধুর কণ্ঠে ঐ দুই কিশোর বালক রামচন্দ্রের সমক্ষে তাহা গান করিয়া শুনাইতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র মুগ্ধ এবং বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কে এই শিশু দুইটি? ইহাদের দেখিয়া প্রাণ কেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল? সভাস্থ সকলে দেখিতে লাগিলেন। রামের সদৃশ এই শিশু দুইটি কে? বাল্মীকির নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি উহারা যে শ্রীরামেরই সন্তান তাহা বলিলেন। তখন রামচন্দ্র সীতাকে আনিবার জন্য লক্ষ্মণকে পাঠাইলেন। লক্ষ্মণের সহিত সীতাদেবী অযোধ্যার রাজসভায় উপনীত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, সীতা! তুমি একবার সেই সমুদ্রতীরে অগ্নিপরীক্ষা দিয়া নিজের নির্মলত্ব প্রমাণ করিয়াছিলে. কিন্তু অযোধ্যাবাসী তো তাহা দেখে নাই. তাই তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না। আজ অযোধ্যার রাজসভায় সকলের সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা দিয়া তোমার পবিত্রতা প্রমাণ কর। সীতা বলিলেন—না, মহারাজ, বার বার নিজেকে এত অপমানিত করিতে পারিব না। রঘুমণি, দুঃখিনী সীতা তোমার চরণে চিরবিদায় লইল। এই বলিয়া সীতা ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে জর্জরিত হইয়া পৃথিবীকে আহ্বান করিলেন—মা, আর দুঃখ অপমান সহ্য হয় না। তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ি। মুহূর্ত মধ্যে পৃথিবী দ্বিধা হইল—সীতা তাহার ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কুশ-লব মা, মা, বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এই তো সীতার দুঃখময় জীবন কাহিনী। আমাদের দেশে মেয়েদের সীতা

নাম রাখিতে খুব ভয় পায়, কেননা, সীতার দুঃখময় জীবন যদি তাহার হয় এই ভাবিয়া। কিন্তু সীতার মত সতী হওয়ার কথা সবাই বলেন। প্রচলিত সতীত্বের মাপকাঠিতে যদি যাচাই করা যায়, তবে কি সীতার সতীত্ব তাহাদের মাপকাঠিতে খুব বেশী স্থান পায়? সীতা তো শেষ পর্যন্ত শ্রীরামের অত্যাচার মানিয়া লইতে পারেন নাই, অপমানে জর্জ্জরিত সীতা তাই অভিমানে পাতালে প্রবেশ করিলেন। উহা তো স্বামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই প্রমাণ করে। সীতা অপমানিত নারী প্রকৃতির প্রতীক। রাম হেন স্বামীর কাছেও অপমানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সীতা এই কথাই বিশ্বপ্রকৃতির সামনে আঁকিয়া দেখাইলেন যে পুরুষ-কৌলীন্যে প্রতিষ্ঠিত সমাজের বুকে নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য বা মর্য্যাদা নাই। পুরুষেরই শুধু মর্য্যাদা আছে, অথচ শ্রীরামচন্দ্র মর্য্যাদা পুরুষোত্তম। তিনি রাজধর্ম্মের দোহাই দিয়া প্রজার সুখের জন্য, আপন মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহার রাজ্যের একজন নারী প্রজার উপর এতখানি অবিচার করিলেন, ইহার কি কোন জবাব আছে? যিনি করুণাময়, শবরীর বেদনায় যিনি বেদনাতুর, গুহক চণ্ডালের যিনি প্রাণবন্ধু, তিনিই কিনা আপন মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সীতা হেন অনুগত স্ত্রীকে সতীত্বের পরীক্ষা দিবার জন্য বার বার অগ্নি-পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন? যে সীতাকে লঙ্কায় অগ্নি পরীক্ষা করিয়া দেবতাগণ ও পিতৃগণের সাক্ষীতে গ্রহণ করিলেন, সন্তানের জননীত্ব প্রদান করিলেন, সেই সীতকে পুনরায় বনবাসে পাঠাইলেন? তাঁহার একটা জবাবও শুনিলেন না? সীতা তাঁহার স্ত্রী, সীতা তাঁহার নারী-প্রজা, তাঁহার কি শ্রীরামের নিকট কোন সুবিচার পাওয়ার অধিকার ছিল না? শ্রীরাম স্বয়ং ভগবান, কে ইহার জবাব দিবে? কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি এ অত্যাচার মানিয়া লন নাই। নারীর যে পুরুষ-নিরপেক্ষ একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, ইহার ঘোষণা করিতেই অপমানিতা সীতা পাতাল প্রবেশ করিলেন, পরবর্ত্তী যুগে শ্রীরাধারূপে, স্বাধীন-ভর্ত্তৃকারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। যেখানে রামের স্ত্রী সীতার এই লাঞ্ছনা, সেখানে সে সমাজে যে নারীর এতটুকুও মর্য্যাদা ছিল না ইহা কি বুঝিতে কোন অসুবিধা আছে। কুরুসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক পাশায় পণ রাখা ইহাও তো পুরুষকৌলীন্যেরই প্রমাণ করিয়াছে। বিশ্বের পরা প্রকৃতি তাই ক্রমশঃ নারী সমাজকে নিজের মর্য্যাদা লাভের জন্য, নিজের স্বাধীন সত্তাকে বিশ্ব দরবারে স্বীকৃত করাইয়া লইবার জন্যই শেষ নারী চরিত্রের আদর্শ লইয়া রাধারূপে আসিয়াছিলেন। কিন্তু নারী জাতি কি আজও এ সম্বন্ধে সচেতন হইলেন?

সীতা যেমন শেষ পর্য্যন্ত শ্রীরামের আদেশ মানিতে পারেন নাই, অপমানে পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন, মেয়েরাও আজ পুরুষকৌলীন্যের চাপে নিপীড়িত হইয়া সমাজের বাঁধন ছিঁড়িয়া আত্ম-স্বাতন্ত্র্য লাভের আশায় ঘর ছাড়িয়া ছন্নছাড়া হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহাদের জীবনের আদর্শ স্থাপন করিতে যে নারী স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যের পথ তাহাদের সামনে আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার

আদর্শকে অনুসরণ করিতে পারিতেছে না। তাই হয় ঘরে অযোগ্যতার ভরপুরে ক্লীব স্বামীদের হাতে লাঞ্ছিত হইতেছে, নতুবা রাস্তায় বাহির হইয়া কাপুরুষের হাতে পড়িয়া অপমানিত হইতেছে। ইহার সমাধান কোথায়? নারী সমাজকে আজ নিজের মাঝে নিজের স্থিতি খুজিতে হইবে, আত্মসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সকল খেয়াল, সকল বিলাসিতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিজেদের আদর্শকে শক্ত করিয়া ধরিতে হইবে; যোগ্য ব্যতীত, উত্তম পুরুষ ব্যতীত যেখানে সেখানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজকে আর অপমান করিব না এই মন্ত্রে নারী সমাজ আজ দীক্ষিত হউক, পুরুষোত্তমের খোঁজে যোগিনী সাজুক, পরা প্রকৃতি রাধারাণীই তাহাদের এ পথের গুরু। লাঞ্ছিতা অপমানিতা নারীসমাজ আজিকার এই দুর্দিনে দুর্গম পথের যাত্রী বিপ্লবময়ী রাধারাণীর ধ্যানে বিভোর হউক, প্রণত হউক। তাঁহার নির্দেশিত পথে আজ তাহাদের এই উন্মাদিনী গতিকে প্রবাহিত করুক, পথ পাইবে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা, কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ'। এই প্রবন্ধের আলোচনায় শ্রীরামচন্দ্রের যে অপূর্ণতার দিক আলোচনা করিয়াছি তাহা শ্রীরামচন্দ্রকে ছোট করিবার জন্য নহে। তিনি ভগবান। অপূর্ণতা যে পূর্ণতারই প্রকাশ ইহাই আমরা বুঝিয়াছি। অপূর্ণ বিশ্বসভ্যতাকে পূর্ণতার পথে গড়িয়া তুলিবার ইঙ্গিত সীতারাম রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্ব তাঁহাদের চরণ রেণু মাথায় লইয়া সভ্যতার পথে আগাইয়া চলিয়াছে। আজ আমাদের সকল সত্তা দিয়া পরম কারুণিক সেই শ্রীরামচন্দ্র ও পরাপ্রকৃতি সীতা দেবীর শ্রীচরণে প্রণতি জানাইতেছি, বিশ্বজীবনে তাঁহারা জয়যুক্ত হউন।

মনের গহনে

সুবোধ সেনগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৬)

রাত্রির খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, মোরাদাবাদ আসতে আর বাকী নেই। কামরা একেবারে খালি হয়ে গেছে, তারা ৭ জন ছাড়া আর মাত্র ১ জন পাঞ্জাবী আছেন, তিনি মোরাদাবাদ নেমে যাবেন। কে কোথায় শোবেন তা স্থির হয়ে গেছে। বীণাদি একটু মোটাসোটা, বেঞ্চির প্রস্থ তাঁর কাছে নিরাপদ নয়, তাই তিনি শোবেন নীচে; মাঝের বেঞ্চিতে রাজেনবাবু, ওপাশের বেঞ্চিতে গীতা, এদিকে তার পুরান জায়গায় রিণি, দুই বাঙ্কে বীরেন ও অপরেশ, মনীষ তার ১২নং সীটে।

রাজেনবাবু মনীষকে ডেকে বল্লেন, "তাহলে তুমি লকসরেই নেবে যাচ্ছ? কালকেই মুসৌরী যাবে?

"হ্যাঁ।"

"আমরা কিন্তু খুব আশা করেছিলাম, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে" রাজেনবাবু বল্লেন।

গীতা বলে উঠল, "আপনি কথা দিয়ে কথা ঘোরালেন একথা যেন মনে থাকে মনীষদা।"

মনীষ বলল, "আমি নিশ্চয়ই কাশ্মীরে যাব গীতা, তবে যাওয়ার পথে নয়। তোমরা এখনও অনেকদিন সেখানে থাকবে, আমি ফেরবার পথে তোমাদের ওখানে সাত দিন থেকে তবে কলকাতায় ফিরে যাব।"

"যে আনন্দ একসাথে যাওয়ার সময়ে হোত, সে আনন্দ হতে আমরা বঞ্চিত হলাম" গীতা বল্লে।

"সাত দিনের একসাথে বেড়ানর আনন্দের সঙ্গে শুধু একসাথে যাওয়া এবং দুদিন থাকার আনন্দ তুলাদণ্ডে মেপে দেখো বোন, যেটা তোমার কাছে লাভজনক বলে মনে হয় তাই আমি করব, এই তোমাকে শেষ কথা দিচ্ছি।" সকলে হেসে উঠল।

গভীর রাত্রে মনীষ নেমে যাবে তাই সকলের কাছ থেকে সে বিদায় নিয়ে রাখল। গাড়ী মোরাদাবাদ ছেড়ে গেছে, যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় শয়ন করে আছে। পরের ষ্টেশন লকসর জংসন, কিন্তু পথ মোরাদাবাদ থেকে কম নয়। সময়ও লাগবে দুঘন্টা। রাত্রি একটা নাগাদ পৌঁছাবে। মনীষ জানালার কাঁচে মাথা দিয়ে চুপ করে বসেছিল আর গত ২৮ ঘণ্টার সমস্ত ঘটনাগুলিকে সে মনে মনে হিসাব করে দেখছিল। অপরেশ আর রিণি রেস্তোরা কারে দশ ঘণ্টা ছিল। এই দশ

ঘণ্টার মধ্যে তারা নিজেদের মধ্যে সমস্ত আলোচনা শেষ করেছে, এ বিষয়ে নিশ্চিত। যাক্, সে আলোচনা যদি উভয়পক্ষের মঙ্গলজনক হয়ে পরিসমাপ্ত হয়ে থাকে তবে উত্তম, কিন্তু যদি তা না হয়ে থাকে তবেই ত মুস্কিল। রিণির মন যথেষ্ট আবেগ-প্রবণ, এরূপ আবেগপ্রবণ মন নিয়ে কোন কিছু সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা বিপজ্জনকও বটে। কিন্তু মনীষ কি করবে? সে ত সকলের মনের খবর জানে না, আর তার চিন্তাধারার সঙ্গে সকলের যে খাপ খাবে তারই বা নিশ্চয়তা কি। আর তাছাড়া সেই বা এদের মধ্যে কে? বিনয়ের করুণ মর্মবেদনা মনীষকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটার হয়ত সেখানেই শেষ হয়ে যেত, যদি না রিণি মাঝরাতে তাকে ঘুম থেকে তুলে সমস্ত কথাগুলো তাকে জানিয়ে দিত। সংসারে সর্বত্র এরূপ অবস্থা, কোথাও কেউ জোর করে মনকে স্থিত করেছে, কোথাও বা তা হচ্ছে না, ফলে সমস্ত জীবন তাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পূর্বাহ্নে যদি কারও সাবধানতা অবলম্বন করবার মত অবস্থা এসে পড়ে, তার সুযোগও সে লাভ করতে পারে না, সামাজিক কারণে, বাইরের অবস্থার চাপে। কিন্তু এরা ত সমাজের দিক থেকে কোন চাপ অনুভব করছে না, এরা অনুভব করছে মনের বিভিন্নমুখী ভাবধারাজনিত অস্বস্তি। একটি স্তরে গিয়ে সমস্ত কিছুর সামঞ্জস্য তারা করতে পারত, তা তারা করেনি বলেই আজ এ বিপর্যয়।

অপরেশ ও রিণি রেস্তোরা কার থেকে প্রায় দশঘণ্টা পরে যখন ফিরে এসেছিল তখন মনীষ উভয়ের মুখের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেছিল। উভয়ের মুখে রয়েছে কালঘন মেঘের ছায়া, সে ছায়া কোনকালে অপসারিত হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই গাম্ভীর্যের অন্তরালেও যে সুখময় পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে তাও অসম্ভব নয়। কোনকালে face হয়ত index ছিল, মুখ দেখে বুদ্ধিমান লোক কিছুটা আন্দাজ করতে পারতেন, কিন্তু যুগের পরিবর্তন হয়েছে, জীবন হয়েছে অনেক বেশী জটিল। এই জটিলতার মাঝে সূক্ষ্মদৃষ্টির অধিকারীই পথ হারিয়ে ফেলে, মনীষ ত কোন্ ছার।

অপরেশের পক্ষ নিয়েও মনীষ চিন্তা করেছে এবং তার পক্ষসমর্থনও যে সে করে নাই এমন নয়; কারণ অপরেশ সত্যিকার যুগধর্ম পালনে হয়ত সমর্থ হতে পারে। মানুষের মনোভাব বয়সকে আশ্রয় করে চলে এটাই স্বাভাবিক, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যেখানে তার ব্যতিক্রম দেখা যায় সেখানে ধরে নিতে হয়, অবস্থা স্বাভাবিক নয় এবং তার মনোবৃত্তি নিচয়ের সংগ্রামশক্তি অসাধারণ। সেরকম লোক আছে কটা? অতএব অপরেশের সঙ্গে যদি রিণির মিলন হয় তবেই হবে সবচেয়ে শোভন। তাছাড়া শুধু ভাবরাজ্যে বিচরণ করলেও সব সময়ে চলে না। 'ভালবাসা' কথাটিকে নিয়ে স্বপ্নরাজ্য গড়ে তোলা যায়, কিন্তু বাস্তবে তার মূল্য কতটুকু? অভাবের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভালবাসার যে দুঃখের রূপ মনীষ প্রত্যক্ষ করেছে সেকথা সে ভাবতেও পারে না। তবে বাস্তব জীবনে ভালবাসার মূল্য কতটুকু? ভালবাসা

হয় সমানে সমানে, বিয়ের ক্ষেত্রেও তাই সকলে সমান ঘর খুঁজে থাকে। মানুষের দেহমনের সমস্ত অণুপরমাণুগুলো যেভাবে প্রথম জীবনে ছন্দোবদ্ধ হয়, সে অবস্থাকে যখন পরবর্তী জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করা হয়, তখনই হয় যত বিরোধের সৃষ্টি। তাই গুরুজনেরা মেয়েদের শিখিয়ে থাকেন যে-কোন অবস্থায় গিয়ে জীবনকে খাপ খাইয়ে নিতে। কিন্তু পুরুষেরা ত সে শিক্ষা লাভ করে না, তাদের স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার দাম্ভিকতায় সব দিকে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়ে যায়। সবক্ষেত্রেই যে এরূপ হয় তা নয়, কিন্তু কখনও কখনও এরূপ যে না হয় তাও ত নয়। মনীষ ভাবতে ভাবতে আসে আবার রিণির কাছে।

রিণি অপরেশকে ভালবাসতে সুরু করেছে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই; আজ রিণি সেকথা স্বীকার করুক আর নাই করুক। ভাললাগা যে ঠিক কখন ভাল-বাসাতে মিশে গিয়েছিল সে তা বুঝতে পারেনি। এই বুঝতে না পারার ফলেই রিণির মনে বিপর্যয়ের সৃষ্টির পথ খুলে গিয়েছিল, সে ভালবেসে বসল বিনয়কে। অথচ সে মনে মনে এবং মুখে ত বটেই সকল ভালবাসাকেই অস্বীকার করে এসেছে। এ কেন? সে কোথাও কিছু বুঝতে পারেনি এই কি তার সম্বন্ধে বিশ্বাস করা যায়? বুঝতে সে পেরেছে কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে সে আসতে পারেনি, এটাই হয়েছে তার সবচেয়ে বড় ত্রুটি। এই ত্রুটির মূলে রিণির দায়িত্বই বা কতটুকু আর যদি তার দায়িত্বহীনতা কিছু থেকেই থাকে তবে তাকে পরিপুষ্ট করেছে কে? নিশ্চয়ই অপরেশ। অপরেশ রিণিকে ভালবাসে কিন্তু রিণিকে যথাসর্বস্ব দেওয়ার ভানই সে করেছে, নিজেকে দিতে পারেনি সুষ্ঠুভাবে তাই ত তারই ফাঁকে বিনয় প্রবেশ করতে পেরেছে। বিনয় অপরেশের কথা কিছু জানে না, জানলে সে কি করত তা বলা যায় না, কিন্তু অপরেশ বিনয়ের ব্যাপার জেনেও নিজের দিক থেকে কেন সাবধান হয়নি? প্রকৃত ভালবাসা যেখানে রয়েছে, সেখানে এক হয় সে এগিয়ে যাবে আর না হয় অবস্থা বিবেচনা করে একেবারে পিছিয়ে আসবে তার প্রেমের খাতিরেই। কোনরূপ নীচতা তাতে প্রবেশ করবে না এই কথাটুকুই শুধু মনীষ বুঝতে পারে।

মনীষের চিন্তা যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই সে অতল সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। আজ সে এদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিছুদিন পর তাদের সঙ্গে যখন পুনরায় দেখা হবে তখন সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ত হয়ে যাবে, ক্রমবর্ধমান জটিলতা রিণির জীবনকে হয়ত আর বিভ্রান্ত করে দেবে না। মনীষ অনাগত আশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেই এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

মনীষ জানালা খুলে দিলে, বাইরের মুক্ত বাতাস এক ঝলক এসে তার মুখে চোখে ঝাপ্টা মেরে চলে গেল। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর গাঢ় অন্ধকার যেন সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করতে বসেছে, আর তারই বুকে সজোরে আঘাত হানতে হানতে দৈত্যের মত ট্রেণ ছুটে চলেছে যেন অনির্দিষ্টের পানে। আঁধারের এমনি বুকের আঘাত যেন

মনীষের বুকে এসে আবার আঘাত করতে থাকে। যে স্বস্তির নিঃশ্বাস সে ফেলেছিল তা যেন বুকে আবার ভার হয়ে ফিরে আসে। অস্বস্তিতে তার দেহমন ভরে যায়। সে অন্ধকার কামরায় একবার রিণির দিকে তাকাল। রিণি শুয়ে নেই, উঠে বসেছে। মনীষ চমকে ওঠে।

নিঃশব্দে রিণি এগিয়ে আসে। ফিস্ ফিস্ করে রিণি ডাকে "মনীষদা"।

"বল" ক্ষীণকণ্ঠে মনীষ জবাব দেয়।

"আপনি এক্ষুণি নেবে যাবেন?"

"হ্যাঁ বোন।"

"আপনি আমাদের কথাই ভাবছিলেন ত মনীষদা, না?"

"হ্যাঁ।"

"কি ভাবছিলেন?"

"ভাবছিলাম কি স্পষ্ট করে বলব?"

"হ্যাঁ বলুন।"

"দুঃখ পাবে না ত?"

"না, পাবনা। যে দুঃখ পাচ্ছি তার চেয়ে অন্ততঃপক্ষে মর্মান্তিক হবে না, আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন।"

"আমি ভাবছিলাম তোমার ত্রুটীর কথা। তুমি যদি প্রথম সমস্যার উদ্ভব থেকে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে তাহলে আজ আর এই পরিস্থিতির সম্মুখীন তোমার হতে হোত না। আজ তুমি দোটানায় পড়ে গেছ। বিনয়ের বিরুদ্ধে বয়সের পার্থক্যের অভিযোগ তোমার কাছে অর্থহীন অথচ অপরেশও তোমার কাছে কম প্রিয় নয়।"

"আপনি সত্যি বিশ্লেষণই করেছেন দাদা! আপনি আমাকে পথ দেখিয়ে দিন আমি কি করব।"

"আমি পথ দেখাব কি করে? আজকে আবেগবশে যে পথের সন্ধান আমার কাছে চাইছ, সে পথের সন্ধান যদি আমি দেইই তা কি মনঃপুত হবে?"

"হ্যাঁ হবে, আপনি বলে দিন আমার পথ।"

"না বোন, তা আমি পারব না। আজকের রাত্রির অন্ধকার কেটে গেলে যখন কালকের উজ্জ্বল সূর্যের আলোক দেখা দেবে, তখন তুমি আমারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে সে কথা ভেবে লজ্জিত হবে।"

"না, হব না, আপনি আমায় পথ দেখিয়ে দিন। আমি আর এ বিভিন্নমুখী চিন্তার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারছি না।"

"সে কি করে হবে বোন, তা হয় না। তোমার মনের প্রতি কোণে আমার পক্ষে প্রবেশ অসম্ভব, অতএব আমার নির্দেশদান সেক্ষেত্রে ভুলের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে রিণি। তুমি সময় নিয়ে নিজে চিন্তা করে সিদ্ধান্তে এসো, এই তোমাকে

আমি আমার শেষ কথা বলতে পারি।"

রিণি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বেশ দাদা তাই হবে।"

ট্রেণের গতি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসছে দেখে মনীষ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। অদূরে ষ্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। লকসর জংসন আসতে আর ২।১ মিনিট বাকী।

মনীষ রিণিকে বলল, "আবার দেখা হবে বোন, আমি মনে প্রাণে আশীর্বাদ করছি তুমি সুখী হবে, যে তোমার সত্যকার আপন, সে তার নিজের চরিত্রগুণেই যেন তোমার কাছে এসে নিজেকে সমর্পণ করে এই প্রার্থনাই আজ আমি ভগবানের কাছে করি।"

রিণি কোন কথা বলল না, সে নত হয়ে মনীষকে প্রণাম করল।

গাড়ী ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। কুলি ডেকে জিনিষগুলো নামিয়ে মনীষ রিণির দিকে ফিরে তাকাল, স্মিতহাস্যে রিণিকে ডেকে বললে "রিণি, আবার তোমার সাথে দেখা হবে বোন, আজ এখন আসি।"

রিণি হাসল, কথা বললো না, শুধু মনীষের নামবার প্রয়োজনে জ্বালান বাতিগুলোকে নিবিয়ে দিল।

মনীষ চলে এল। প্ল্যাটফরমের অপরদিকে দেরাদুনের গাড়ী। মনীষ একটা মধ্যম শ্রেণীর কামরায় গিয়ে উঠল। গাড়ী ছাড়তে তখনও ২ ঘণ্টা বাকী। সে বিছানা করে ফেলল, তারপর বিছানার উপরে বসে বসে সে পাঞ্জাব মেলের দিকে রইল তাকিয়ে। এই পাঞ্জাব মেলে করে সে প্রায় ৩০ ঘণ্টার পথ পার হয়ে এসেছে। এই গাড়ীটায় বহু ঘটনা ঘটে গেছে, কারও মানসিক অবস্থার ক্রমপরিবর্তনও সংঘটিত হয়েছে এই গাড়ীতেই। মনীষ ভাবতে থাকে রিণির কথা, অপরেশের কথা। হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল, গার্ড সাহেব সবুজ বাতি দেখালেন, পাঞ্জাব মেলের ইঞ্জিন গুরুগম্ভীর আওয়াজ করে ছেড়ে দিলে—নিয়ে গেল সাথে করে রিণিকে, আর সুপ্তির কোলে নিমগ্ন আর পাঁচজন বন্ধুকে। মনীষের অন্তরস্থল হতে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। সে চোখ বুজে ফেলল।

হঠাৎ মনীষ চমকে গেল, এ কার কণ্ঠস্বর! মনীষ আবার কাণ পেতে শোনে "মনীষদা।"

"এ যে রিণির কণ্ঠস্বর!"

দ্রুতবেগে কামরা থেকে বেরিয়ে এসে মনীষ রিণির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মনীষ কাছে আসতেই রিণি প্রায় ঢলে পড়ে যাচ্ছিল, মনীষ তাকে ধরে ফেললে।

রিণি মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলে। সে বললে, "দাদা চল, তুমি কোন্ গাড়ীতে উঠেছ সেখানে আমি একটু বসব, তারপর আমার কথাগুলো শেষ করে চলে যাব।"

রিণির হাতের সুটকেসটি মনীষ হাতে নিল, তারপর সে নিজের কামরায়

এসে উঠল। মনীষ কোন কথাই বলতে পারছিল না। সে চুপ করে শুধু রিণির দিকে তাকিয়ে ছিল।

রিণি বলল, "আমি চলে আসাতে আপনি খুব অবাক হয়ে গেছেন দাদা, তাই না?"

অতি কষ্টে মনীষ জবাব দেয় "হ্যাঁ।"

"আপনার নির্দেশ অনুসারেই কাজ করেছি দাদা। আপনি সমস্ত ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। আজ থেকে নিজের জন্য স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে চিন্তা করব এই পণ আমি গ্রহণ করেছি।"

"তুমি এখন কোথায় যাবে স্থির করেছ?"

"যাব দিল্লীতে। এক্ষুণি দিল্লীর গাড়ী আসবে দেরাদুন থেকে, সেই গাড়ীতেই আমি চলে যাব। দিল্লীতে আমার মাসীবাড়ী আছে সেখানেই আমি এখন থাকব।"

"কতদিন থাকবে?"

"যতদিন আমি নিজেকে বুঝতে না পারি।"

"কতদিন সময় লাগবে বলে মনে হয়?"

"তা আমি বলব কি করে?" ম্লান হাসি হেসে রিণি জবাব দেয়। "এ জীবনে আমাকে আমি বুঝে উঠতে নাও ত পারি।"

"এ সব কথা কি বলছ রিণি?"

"সত্যিই বলছি দাদা। বিনয়দা ও অপরেশ উভয়ে আমার জীবনে এসেছে। আমার ত্রুটীর জন্য শুধু আমার সর্বনাশই আমি করতে যাইনি, তার সাথে আরও দুজনের দুঃখের কারণও আমি হয়েছি। আমাকে তারজন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

"কি করে?"

"আত্মশুদ্ধি করে।"

"কি ভাবে করবে?"

"তা ক্রমপ্রকাশ্য মনীষদা। আমি সম্প্রতি দুজনের কাছ থেকেই দূরে থাকব, তারপর যা হয় দেখা যাবে।"

"যদি দেখার তোমার সুযোগ না হয়? যদি যাকে ভালবাস বলে তুমি নিশ্চিত জানলে সে অপরের হয়ে যায়?"

"তা হোন, কিন্তু আত্মোপলব্ধি ব্যতীত কাউকে গ্রহণ আমি করতে পারব না।"

"কিন্তু ভেবে দেখ, আমার নির্দেশ ত তুমি চেয়েছিলে; আমার নির্দেশ কিছু থাকলে তাকে কি গ্রহণ করতে পারতে?"

"সে শিক্ষা ত আপনার কাছেই পেয়েছি দাদা, আপনি নির্দেশ দিতে পারেন না। পথের সন্ধান না দিতে পারলেও পথ খুঁজে পাবার নির্দেশ আপনি দিয়েছেন। এবার আমি পথ খুঁজে পাবই। আপনার আশীর্বাদ বিফলে যাবে না দাদা।"

"তুমি কি তিক্ততা থেকে তাদের ছেড়ে যাচ্ছ?"

"মোটেই না, তাদের ত্রুটী আজ আমার গোচরের মধ্যেই নয়। আজ আমার ত্রুটীগুলোই আমার কাছে এত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে যে, আজ তাদের মহৎ গুণ-গুলোই আমার চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। আজ আমি যাই দাদা, যেদিন পথ খুঁজে পাব সেদিন আপনাকেই আমি সবচেয়ে কাছে চাইব প্রথমে।"

"কেন বোন?"

"আমার আত্মশুদ্ধির খবর আপনিই জানবেন প্রথমে, কারণ আপনিই আমার গুরু, তারপর আপনি আমাকে পৌঁছে দেবেন তার কাছে, যাকে আজ থেকে আরও বেদনা দিতে থাকব আমি প্রচুরভাবে। আপনি না হলে কে আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে দাদা, কে আমার স্বার্থকে সংরক্ষণ করবে?"

"আমি কথা দিচ্ছি বোন যখনই আমাকে ডাকবে, আমি তোমার কাছে তক্ষুনি উপস্থিত হব।"

"কথা দিন আপনি কাউকে আমার ঠিকানা জানাবেন না।"

"দিচ্ছি কথা।"

একটুকরো কাগজে রিণি তার ঠিকানা লিখে দিলে। মনীষ তা একবার দেখে পকেটে পুরে রাখল।

দিল্লীগামী দেরাদুনের গাড়ী এসে গেল, মনীষ রিণির সুটকেস হাতে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে এল, তারপর রিণিকে টিকিট করে উঠিয়ে দিল মেয়েদের মধ্যম-শ্রেণীর কামরায়।

রিণি গাড়ীতে বসে বলল, "দাদা, আমার উপর দিয়ে আজ ৩০ ঘণ্টা যে ঝড় বয়ে গেল, সেই ঝড়ের বেগকে আপনিই শান্ত করে দিয়েছেন। আজ আমি সর্বান্তঃ-করণে আপনার কাছে প্রণতি জানাচ্ছি। ভুলবেন না, বোনের দায় রইল আপনার। আমার যাত্রাপথে আপনি রইলেন আমার সহায়, সেই সাহসে বুক বেঁধেই আমি জীবনে অগ্রসর হতে যাচ্ছি।"

"ভুলব না বোন আমি ভুলব না। তোমাকে আমি আমার আপনার বোনের পর্যায়ে স্থান দিলাম।" মনীষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

"কাশ্মীর হয়ে ফেরবার পথে দিল্লীতে দেখা করে যাবেন?"

"হ্যাঁ বোন যাব।"

গাড়ী ছেড়ে দিল। আধ আলো, আধ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ট্রেণ প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে গেল। যতক্ষণ গাড়ীর শেষ লাল বাতিগুলোকে দেখা যায় ততক্ষণ মনীষ গাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইল।

আলো অদৃশ্য হতে মনীষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে নিজের গাড়ীর দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

শ্রীনিত্যগোপাল জন্ম শতবার্ষিকী

স্মৃতিপূজার প্রস্তুতি

পুরুষোত্তমানন্দ

(২)

প্রাণের পথ

অনন্ত ছিদ্রযুক্ত এই বিশ্ব; ছিদ্রদাতা আকাশের কোলেই ইহার উদ্ভব। এই ছিদ্রপথেই প্রাণের আনাগোনা। মনবুদ্ধি চাহিয়াছিল এই ছিদ্রপথকে মুছিয়া ফেলিতে, বিশ্বকে নিচ্ছিদ্র করিতে, নিরেট বস্তুতে (block universe) পরিণত করিতে। কিন্তু বিশ্ব নিচ্ছিদ্র হইল না। ছিদ্র বন্ধ করিতে গিয়া ছিদ্র কেবল বাড়িয়াই চলিল। আজ বিশ্বের সব-কিছু সম্পদ এই ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যাইতেছে। বিশ্ব আজ তাই সর্বহারা। ছিদ্রকুম্ভ-স্বরূপ এই বিশ্ব ভরিয়া কে জল আনিবে পরাশক্তি (Higher nature) প্রাণবল্লভা শ্রীশ্রীরাধা ছাড়া বিশ্বের অদম্য পিপাসা মিটাইবার জন্য? সতীর ধ্বজা উড়াইয়া, সততার দম্ভ লইয়া যে-সব বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ সাধু সমাজসংস্কারক বিশ্বের জ্বালা জুড়াইবার প্রচেষ্টায় ছিদ্রকুম্ভে জল ভরিতে প্রাণপণ করিলেন, প্রাণহীনতার দরুণ সকলের সব প্রচেষ্টা যে ব্যর্থই হইল; ছিদ্র-কুম্ভে এক ফোঁটা জলও যে রহিল না, সব জলই যে ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িয়া গেল! ছিদ্র বন্ধ করিবার সাধ্য 'বুদ্ধি'র (calculating intelligence) নাই।

বুদ্ধিমানেরা অনেক-কিছু ফন্দি আঁটিয়া যুগে যুগে চাহিয়াছে ছিদ্রপথ বন্ধ করিতে বিধির আশ্রয়ে; কিন্তু বিধি যে-বরই তাহাদের দিয়া থাকুক না কেন, ছিদ্র-পথে মরণের আসা কিছুতেই আটকায় নাই। হিরণ্যকশিপু একদিন তপস্যা করিয়া-ছিলেন অমর হইবার লালসায়। বুদ্ধির উপাসক হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছে অর্থাৎ বুদ্ধির দেবতার কাছে, বিধির কাছে বর মাগিলেন—'আমি দিনে মরিব না, রাত্রিতে মরিব না।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'তথাস্তু'। আবার হিরণ্যকশিপু চাহিলেন, 'আমি দেব-মানব-পশু কাহারও হাতেই মরিব না'। ব্রহ্মা বলিলেন, 'তথাস্তু'। হিরণ্যকশিপু ভাবিলেন তবে তো আমি কার্যতঃ অমরই হইলাম। কিন্তু বুদ্ধির ঐ চাওয়ার মধ্যে যে ফাঁক ছিল, ফাঁকি ছিল, ছিদ্র ছিল, তাহা কি বুদ্ধিমান হিরণ্যকশিপু টের পাইলেন? মরণ আসিয়াছে দিন-রাত্রির ছিদ্রপথে, গোধূলিতে; তাঁহার মরণ আসিয়াছে দেব-মানব-পশুর ফাঁক দিয়া, নরসিংহ রূপের মধ্য দিয়া। বুদ্ধিমানেরা কখনও মধ্যম পথের খোঁজ রাখে না; তাহাদের দৃষ্টি রহিয়াছে ছিদ্রপথের ডাইনে ও বায়ে। তাহাদের দৃষ্টি কখনও সমগ্র নয়। সে জানে—হয় দিন আছে, নয় রাত্রি আছে, হয় দেবতা আছে, নয় মানুষ আছে, নয় পশু আছে। কিন্তু দিনরাত্রির সন্ধি বলিয়া

বিশেষ যে একটি ক্ষণ আছে, দেব-মানুষ-পশু সমন্বিত কোনও প্রাণবান সত্তা যে বিশ্বে থাকিতে পারে ও নিশ্চয়ই আছে তাহা একদেশদর্শী বুদ্ধির অগম্য। হিরণ্যকশিপু মারা গেলেন প্রাণবল্লভ নৃসিংহদেবের কাছে, যিনি একাধারে নৃ এবং সিংহ rationality ও animality, যাহার জীবনে চৈতন্যের দাবী অচৈতন্যের দাবী সমন্বিত, যিনি সর্বপ্রথমে এই বিশ্বে ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদের জীবন-মাধ্যমে বিশ্বনাগরিকত্বের প্রবর্তন করিলেন, যাহারই উপাসনায় সিদ্ধভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—'নৈতান্ কৃপণান্ বিহায় বিমুমুক্ষে'—আমি দুনিয়ার এই সব কৃপণদের পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি চাহি না। সচ্চিদানন্দঘন নৃসিংহদেবের জীবনেই ধরাভিমুখী-অবতরণকারী প্রাণতত্ত্বের সর্ব প্রথম প্রকাশ; দ্বিতীয় প্রকাশ তাহার শ্রীরামচন্দ্রে, তৃতীয় প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে। প্রাণের এই ত্রিবিধ প্রকাশের নামজপই তারক-ব্রহ্ম নামজপ ঃ

—'হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।'

এই তারকব্রহ্ম নামের মধ্যে হরি, রাম ও কৃষ্ণ শব্দত্রয় রহিয়াছে। হরি হইতেছে নৃ-হরি শব্দের সংক্ষেপ। পচা গলা বিশ্বের ওপারে, কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠে যে প্রাণতত্ত্ব ছিল একান্ত গোপনে, গুপ্ত সেই প্রাণতত্ত্ব কোন্ ছন্দে স্পন্দিত হইতে হইতে জমিতে জমিতে শ্রীনরহরিরূপে, শ্রীরামরূপে, শ্রীকৃষ্ণরূপে ধরার ধূলিকে চুম্বন করিয়াছিল, প্রাণ-উপাসনার সেই খবর পৌঁছিয়াই ভাগবত শাস্ত্র ধন্য, ভাগবতধর্ম মহিমামণ্ডিত।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রাণই 'মধ্যম প্রাণ' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মধ্যমপ্রাণ সম্বন্ধে উক্ত উপনিষৎ বলিতেছেনঃ 'ইদমেব নাপ্নোৎ যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ তানি জ্ঞাতুং দধ্রিরে। অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সঞ্চরন্ চ অসঞ্চরন্ চ ন ব্যথতে ন রিষ্যতি, হন্ত অস্য এব সর্বে রূপম্ অসামেতি তে এতস্য এব সর্বে রূপম্ অভবন্ তস্মাৎ এতে এতেন আখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি'—'মৃত্যু কেবল ইহাকেই আয়ত্ত করিতে পারে নাই, যাহার নাম মধ্যম প্রাণ। সেই ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে জানিবার জন্য ব্রত ধারণ করিল। তাহারা বুঝিল যে, ইনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—যিনি সঞ্চরণ করিয়া এবং সঞ্চরণ না করিয়া ব্যথা পান না, বিনাশপ্রাপ্ত হন না।' কিন্তু বাক্ যখন ব্রত ধারণ করিয়াছিল যে, 'বদিষ্যাম্যেবাহম্'—আমি বলিয়াই চলিব, কিছুতেই ক্ষান্ত হইব না, চক্ষু ব্রতধারণ করিয়াছিল যে, 'দ্রক্ষ্যাম্যহম্'—আমি দেখিতেই থাকিব; কিছুতেই থামিব না; শ্রোত্র যখন ব্রত ধারণ করিল যে, 'শ্রোষ্যাম্যহম্'—আমি শুনিয়াই চলিব, তখন 'মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বা'—মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল ও অবরুদ্ধ করিল। মধ্যম প্রাণ যুগপৎ সঞ্চরণ ও অসঞ্চরণ করিতে পারেন বলিয়াই অনন্ত শ্রমের মধ্যেও তাঁহার বিশ্রামের ভঙ্গ হয় না। কিন্তু প্রাণস্পর্শহীন বাক্ 'শ্রাম্যতি', চক্ষু 'শ্রাম্যতি', শ্রোত্র 'শ্রাম্যতি'—শ্রান্ত হয় এবং শ্রম মৃত্যুরূপে তাহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। দুনিরাময় আজ এই শ্রমের ছবি ফুটিয়া

উঠিয়াছে। কোথায় বিশ্রাম, কোথায় বিশ্রাম! সব আজ শ্রান্ত।

এই বিশ্বে মধ্যম প্রাণের খবর জানা ছিল না বলিয়াই এ-দেশে ও-দেশে নির্মধ্যম নীতি সকল বাক্যে, সকল দেখায়, সকল শোনায় সকল মননে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল। তাহার ফল ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও দর্শনে সর্ব বিধ্বংসীই হইয়াছিল। হয় সৎ না হয় অসৎ, হয় ব্রহ্ম না হয় মায়া, হয় সগুণ না হয় নির্গুণ, হয় এক না হয় বহু, হয় জ্ঞান না হয় কর্ম, হয় ভোগ না হয় ত্যাগ, হয় সংসার না হয় সন্ন্যাস, হয় বন্ধন না হয় মুক্তি, হয় রাজনীতি নয় আধ্যাত্মিকতা—ইহাই মধ্যম প্রাণস্পর্শহীন নির্মধ্যম নীতি অনুসরণের ফল। সৎ ও অসৎ-এর মধ্যে বা middle-এ যে-মধ্যম প্রাণ আত্মগোপন করিয়াই ছিল, বুদ্ধির লজিক তাহাকেই 'exclude' করিয়াছে, বাদ দিয়াছে। যে মধ্যম প্রাণ দুইকে দুই রাখিয়া, দুইকে দ্রব অবস্থায় (flux) রাখিয়া সমগ্র এক-এ গড়িয়া তুলিতে পারিত, সেই মধ্যম প্রাণকে হটাইয়া দিবার ফলেই সৎ ও অসৎ তাহাদের নমনধর্মশীল স্বভাব, দ্রবধর্ম পরিত্যাগ করিল, নিরেট হইয়া পড়িল। তখন আর কিছুতেই তাহাদিগকে 'এক সঙ্গে' করা গেল না, দুই একান্ত দুই-ই রহিয়া গেল, একান্ত দুই কিছুতেই গলিয়া গিয়া সমগ্র 'একে' গড়িয়া উঠিল না।

সমাজ-সংগঠনে এই নির্মধ্যম নীতির ফল কি মারাত্মক হইয়াছে, তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। সমগ্র সমাজের অঙ্গস্বরূপ ধনিক ও শ্রমিকের মাঝখানে ছিল 'প্রাণ'। কিন্তু বুদ্ধি মাঝখান হইতে যেদিন প্রাণকে উৎখাত করিল, সেই দিন হইতেই ধনিক একান্ত ধনিক ও শ্রমিক একান্ত শ্রমিক হইল, ধনিকের ধন শ্রমিকের হইল না, শ্রমিকের শ্রমও ধনিক নিল না, ধনিক শ্রমিককে শোষণ করিয়াই চলিল, শ্রমিকও তাহার প্রতিক্রিয়ায় ধনিককে শোষণ করিবার জন্য, পদতলে নিষ্পেষিত করিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। প্রাণ যদি মধ্যমে থাকিত, প্রাণের উষ্ণ স্পর্শ দুইয়েরই কাঠিন্য গলাইয়া দিতে পারিত, দুইকে প্রাণবান দুই করিয়া একই সমাজে গড়িয়া তুলিতে পারিত। কিন্তু যতদিন বিশ্বে নির্মধ্যম নীতির লজিক প্রচলিত থাকিবে, ধনিক-শ্রমিকের শ্রেণীসংঘর্ষ, সৎ-অসতের, ব্রহ্ম-মায়ার, সগুণ-নির্গুণের শ্রেণীসংঘর্ষ কিছুতেই শান্ত হইবে না। সংঘর্ষ-শ্রান্ত পরস্পরবিরুদ্ধ সব-কিছু আজ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পরস্পরকে প্রাণের মধ্যে পাইয়া এক অদ্বৈত হইবার জন্য তাই লালায়িত হইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রাণশক্তিই জটিলা-কুটিলা বুদ্ধি দ্বারা পরিবেষ্টিতা মূর্তিমতী আরাধনা শ্রীরাধা। একদিন সতীত্বের পরীক্ষায় এই বুদ্ধি সতীশিরোমণি প্রাণময়ী শ্রীরাধার কাছে পরাজিত হইয়াছিলেন। জটিলা-বুদ্ধির বিচারে বিপ্লবময়ী প্রাণশক্তিই ছিল অসতী। অসতী এই শ্রীরাধার অসতী-কলঙ্ক অপনোদন করিয়াই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে জয়যুক্ত। বৃন্দাবনে প্রাণেরই জয়, বুদ্ধির নয়। বৃন্দাবনে প্রাণের মধ্যে বাক্-চক্ষু-শ্রোত্র ও মনের মহানির্বাণ লাভ হইয়াছে, সেখানে বাক্ও প্রাণ, চক্ষুও

প্রাণ, মনও প্রাণ। ব্রজধামই প্রাণের দেশ। ব্রজধামই বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র। এই প্রাণকেন্দ্রের মাঝেই বিশ্বের যাহা কিছু স্পন্দন সার্থক।

এই প্রাণের পথ ধরিয়া চলিতে চলিতেই শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন:

এ কূলে ও কূলে দুকূলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥

এ কূলে ও কূলে অর্থাৎ আত্মার কূলে অনাত্মার কূলে, চৈতন্যের কূলে অচৈতন্যের কূলে, আপনা বলিবার প্রাণের ঠাকুরাণী রাধারাণীর কেহ ছিল না। তাই দুই কূলের মধ্যস্থানে রহিয়াছে যে মধ্যম প্রাণ, সেই মধ্যম প্রাণের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ নেওয়া ছাড়া তাঁহার কি আর গতি থাকিতে পারে? আজ সারা বিশ্বকে ঐ প্রাণের শরণ লইতেই হইবে, যদি তাহাকে এই দো-টানার মধ্যে বাঁচিতে হয়, চিদানন্দের ঘনরূপ আস্বাদন করিতে হয়। প্রাণের পথই শ্রীরাধারাণীর পথ, শ্রীরাধারাণীর পথই প্রাণের পথ।

এই মধ্যম প্রাণের মহিমা কীর্তন করিতে যাইয়া জেম্‌স্‌ জিন্‌স্‌ তাঁহার "**ফিজিক্‌স্‌ এ্যান্ড ফিলোসফি**" গ্রন্থে লিখিতেছেন:

'A second difference of idiom, . . . arises out of the philosophical practice of depicting the world entirely in black and white, and so ignoring all the halftones, gradualness and vagueness which figure so prominently in our experience of the actual world. The obvious example of this is provided by the law of excluded middle, which has dominated formal logic, with devastating results, from the time of Aristotle on. The law asserts that everything must be either A or not-A, whatever A may be. The Scientist, on the other hand, knowing that everything will generally possess some A-ness and some not-A-ness, is very little concerned as to whether an object is classed as A or not-A; what he wants to know is how much A-ness it possesses.'

—"ভাষাগত দ্বিতীয় একটি পার্থক্যের উৎপত্তি হয়, এই বিশ্বকে একান্ত শাদা-কালোতে চিত্রিত করিবার দার্শনিক প্রক্রিয়া হইতে এবং মধ্যস্থানে স্থিত হাফ্‌-টোন, ক্রমিকতা (gradualness) ও অস্পষ্টতাকে (vaguaness) অস্বীকার করা হইতে; অথচ এইগুলিই বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার উপর প্রাধান্য সহকারে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। ইহার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হইতেছে 'নির্মধ্যম নীতি' যাহা এ্যারিস্টটেলের সময় হইতে সর্ব-বিধ্বংসী ফল উৎপাদন করিয়া

ফরমাল লজিক-এর উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে। এই নির্মধ্যম নীতি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করে যে, প্রত্যেক বস্তুই হইবে 'হয় A নয় not-A', A বলিতে যাহাই ধরা যাউক না কেন। পক্ষান্তরে, প্রত্যেক বস্তুতে সাধারণতঃ আছে কিছুটা A ness এবং কিছুটা not-A-ness—এই রহস্য বৈজ্ঞানিক জানেন বলিয়া কোন্ বস্তু A-শ্রেণীভুক্ত কিম্বা not-A শ্রেণীভুক্ত, সে সম্বন্ধে তিনি অল্পই উদ্বিগ্ন। বৈজ্ঞানিক শুধুই জানিতে চান কতখানি A-ness (how much A-ness) ইহার মধ্যে আছে।"

আলো-আঁধারের ঐকান্তিক রূপ ছাড়া দার্শনিকগণ অন্য কোনও রকমেই জগৎকে দেখিতে অভ্যস্ত নন বলিয়া উহাদের মধ্যস্থ half-tone, gradualness vagueness -এর রহস্য দার্শনিকগণ অবধারণ করিতে পারেন নাই, আলো-আঁধারের সমন্বয় বিধান করিতে পারেন নাই। একান্ত আলো বা একান্ত আঁধার বলিয়া কিছুই নাই। আছে শুধু উহাদের মধ্যে 'মাত্রা'র (degree, how much-ness) স্পর্শ, মাত্রাস্পর্শ। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই মাত্রাস্পর্শেরই পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত, এবং পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল এই মাত্রাস্পর্শের ভিত্তিতেই বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের দর্শন প্রচার করিয়া গিয়াছেন। একান্ত সৎ বা একান্ত অসৎ নাই; জানিতে হইবে প্রতি স্তরে 'কতখানি' সৎ ও 'কতখানি' অসৎ-এর স্পর্শ রহিয়াছে। একান্ত ব্রহ্ম বা একান্ত মায়া বলিয়া কিছুই নাই; বুঝিতে হইবে বিশ্বের প্রতিটি কণার মধ্যে আছে কতখানি ব্রহ্মত্ব এবং কতখানি মায়াত্ব ব্যক্তভাবে বা অব্যক্তভাবে। একান্ত অদ্বৈত বা একান্ত দ্বৈত বলিয়া কোনও বাদই নাই; অদ্বৈতবাদে কতখানি দ্বৈতবাদ অব্যক্তভাবে আছে এবং দ্বৈতবাদে কতখানি অদ্বৈতবাদ অব্যক্তভাবে আছে, তাহাই শুধু খুঁজিতে হইবে। একান্ত নর বলিয়া মানুষ নাই, একান্ত নারী বলিয়াও কোন মানুষ নাই। আছে প্রতি নর ও নারীর মধ্যে নরমাত্রা ও নারীমাত্রার স্পর্শ। এই নরমাত্রা ও নারীমাত্রার সুসামঞ্জস্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল ব্রজধামে রাসলীলা—'রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ আত্মা-রামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।' একান্ত ধনিক বলিয়া কিছুই নাই, একান্ত শ্রমিক বলিয়াও কিছু নাই; আছে প্রতি মানুষে ধনিকত্ব ও শ্রমিকত্বের মাত্রাস্পর্শ। একান্ত কর্ম, একান্ত জ্ঞান, একান্ত ভক্তি বলিয়াও উদ্ভট কিছুই নাই। তাই শিখিতে হইবে কোন্ মাত্রায় কর্ম করিলে জ্ঞান ও ভক্তিমাত্রার সঙ্গে তাহার সমন্বয় হয়, কোন্ মাত্রায় জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম ও ভক্তির মিলন হইলে জীবন সহজ, সরল সমগ্র হয়। একান্ত নর বা একান্ত পশু বলিয়াও কিছু নাই। প্রতি মানুষে রহিয়াছে নর ও পশু মিলিয়া মিশিয়া। নরসিংহমূর্তির মধ্যে প্রহ্লাদ আস্বাদন করিয়াছিলেন নরমাত্রা ও পশু-মাত্রার সমন্বয়; এবং এই সমন্বয়-সাধনার ভিতর দিয়াই বিশ্বে প্রবাহিত হইয়াছে বিশ্বরূপের সাধনা।

এই মধ্যম প্রাণের স্তরে দাঁড়াইয়াই শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্ম ও মায়া দুইয়েরই

নিত্যত্ব প্রমাণ করিবার জন্য লিখিতেছেনঃ 'যে অহঙ্কারের প্রভাবে আত্মার ও আত্মজ্ঞানের পর্যন্ত অস্তিত্ববোধ হয়, তাহাকে তুমি অসত্য বলিতে পার না। তাহাকে তোমার নিত্য-সত্যই বলা উচিত। তাহা নিত্য-সত্য বলিলে তাহা যে-মায়ার অংশ, সেই মায়াকেই নিত্য-সত্য বলিতে হয়।' —সিদ্ধান্তদর্শন, দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

'যাহার কারণ নাই, তাহা নিত্য। যাহার কারণ নাই, তাহার উৎপত্তিও নাই। উৎপত্তি যাহার হয় নাই, তাহার বিনাশও নাই। পরমহংস শংকরাচার্যের আত্মানাত্মবিবেকানুসারে অবিদ্যারও উৎপত্তির কারণ নাই। সে মতে অবিদ্যার উৎপত্তির কারণ নাই বলিয়া অবিদ্যাও অজ, সে মতে অবিদ্যা অজ বলিয়া অবিদ্যা অমরও বটে, সে মতে অবিদ্যা অজ-অমর বলিয়াই অবিদ্যাও নিত্য। সুতরাং সেই মতানুসারে অবিদ্যা ও ব্রহ্ম অভেদ বলিতে হয়। কারণ সে মতে ব্রহ্মও অজ, অমর ও নিত্য। সে মতে ব্রহ্মকে অনাদি ও অবিদ্যাকেও অনাদ্যা বলা হইয়াছে। যাঁহার আদি কেহ নাই, তিনিই অনাদি। যাঁহার আদি কেহ নাই, তাঁহার উৎপত্তিও হয় নাই। উৎপত্তি যাঁহার নাই, তাঁহার মৃত্যুও নাই। শংকরাচার্যের মতে পুংলিংগে ব্রহ্ম যেমন অনাদি, তদ্রূপ তাঁহারই মতে স্ত্রীলিংগে অবিদ্যাও অনাদ্যা। অবিদ্যা অনাদ্যা, সুতরাং অবিদ্যারও কেহ আদি নাই। অবিদ্যার আদি নাই বলিয়া অবিদ্যারও ঐ ব্রহ্মের ন্যায় জন্মমৃত্যুও নাই। সেইজন্য ব্রহ্মের ন্যায় অবিদ্যাও নিত্য।' —সিদ্ধান্ত দর্শন, তৃতীয় সিদ্ধান্ত। আদি-অনাদি, জড়-অজড়, মৃত্যু অমরের দ্বন্দ্বমোহ হইতে মুক্ত থাকিয়া শ্রীনিত্যগোপাল উহাদের middle exclude তো করেনই নাই, বরং তাহারই উপরে স্থিত থাকিয়া দুইকেই সমন্বয় বিধান করিলেন, দুইয়েরই নিত্যত্ব বিধান করিলেন। ইহা দর্শনশাস্ত্রের এক যুগান্তরকারী বিপ্লব। অন্যত্র তিনি লিখিতেছেনঃ 'সৎ ব্রহ্ম হইতে অসৎ-মায়ার উৎপত্তি অসম্ভব হইলে মায়ার উৎপত্তির আর অন্য কারণও নাই। অথচ মায়ার বিদ্যমানতা এবং নানা কার্য প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। সুতরাং মায়ার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। মায়ার নিত্যত্ব স্বীকৃত হইলে মায়াকে অসত্য বলিতে পার না। কারণ নিত্য যাহা তাহা অসত্য নহে, তাহা সত্য। সুতরাং তাহা অনিত্য নয়; সত্যকে অনিত্য বেদান্ত প্রভৃতি অদ্বৈত মত . প্রতিপাদক কোন গ্রন্থেই বলা হয় নাই।'—নিত্যধর্ম পত্রিকা, ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা; পৃ- ২৪৯

মায়া-প্রকৃতি ছিলেন এতদিনকার দর্শনশাস্ত্রে অনাদি কিন্তু বিনাশশীলা। শ্রীশ্রীনিত্যদেবের মতে তাহা যেমন অনাদি, তেমনি বিনাশহীনাও। ব্রহ্মের মত মায়াও অনাদি অনন্ত স্বীকৃত হইলে দর্শনশাস্ত্রের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইবে। এবং তাহারই ভিত্তিতে প্রবর্তিত হইবে সব সাধনারও নূতন orientation, যাহার ফলে এই অবিদ্যাপ্রসূত জগৎও ব্রহ্মেরই মত নিত্য সত্তারূপে গড়িয়া উঠিবে। এই দর্শনের খোঁজ দিতেছে বর্তমান যুগের পদার্থবিদ্যা কোয়াণ্টাম্ থিয়োরী আবিষ্কার করিয়া, দিক্-কাল-সন্ততির (space-time-continuum) প্রবর্তন করিয়া, অনিশ্চয়বাদের (Law of Indeterminism) সাহায্যে বিশ্বকে নমনধর্মশীল

প্রতিপন্ন করিয়া। মধ্যম প্রাণের এই ভিত্তি ভূমিতে দাঁড়াইয়াই জেম্‌স্ জিন্‌স্ লিখিলেন :

'The old physics showed us a universe which looked more like a prison than a dwelling place. The new physics shows us a universe which looks as though it might conceivably form a suitable dwelling place for free men, and not a mere shelter for brutes—a home in which it may at least be possible for us to mould events to our desires and live life of endeavour and achievement.'—Physics and Philosophy.

'সংসার-কারাগার'-বাদ আজ বিশ্বের বুক হইতে অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। এতদিনের তৃষিত এই সংসার-মরু আজ শ্রীনিত্যগোপালপ্রসাদে এবং বর্তমান যুগের পদার্থবিদ্যা ও দর্শনের অবতরণে শস্যসম্পদশালী কৃষিক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিবে। এতদিনের পতিত মানব-জমিন—যাহা ত্যাগ করিয়া সাধকদল ইহার ওপারে গোলোক-বৈকুণ্ঠ খুঁজিয়াছিলেন, তাহাতেই নিত্যগোপাল-প্রবর্তিত সমগ্র যোগসাধনার ফলে আবাদিত হইয়া সে না ফলিবে, সোনার বৃন্দাবন গড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু মধ্যম প্রাণের খোঁজ পাওয়া এতদিন সম্ভব হয় নাই; কেননা, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে কোনও জীবন্ত সম্বন্ধ-সূত্র এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। বিজ্ঞান-দর্শনের অন্যোন্যমিলনের মধ্যেই প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হয়। কিন্তু বর্তমান যুগ বিজ্ঞান-দর্শনের এই যোগসূত্র ধরিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছে।

'The philosophy of any period is always largely interwoven with science of that period, so that any fundamental change in science must produce reaction in philosophy. This is especially so in the present case, where changes in Physics itself are of a distinctly philosophical hue; a direct questioning of nature by experiment has shown the philosophical background hitherto assumed by physics to have been faulty. The necessary emendations have naturally effected the scientific basis of philosophy and through it, our approach to the philosophical problems of everyday life. Are we, for instance, automata or are we free agente capable of influencing the course of events by our volitions? Is the world material or mental in its ultimate nature? Or is it both? If, so, is matter or mind the more fundamental—is mind a creation of matter or matter a creation of mind? Is the world we perceive in space and time the world of ultimate reality, or is it only a curtain veiling a deeper reality beyond?'—Physics and Philosophy—by James Jeans, Page 2.

—যে কোন যুগের দর্শনশাস্ত্র সর্বদাই সেই যুগের বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অনুস্যূত থাকে; সুতরাং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের মৌলিক পরিবর্তন দর্শনে তাহার প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিতে বাধ্য। বর্তমান যুগে ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, যখন পদার্থবিদ্যার মধ্যের পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে দার্শনিক রঙে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। Experiment দ্বারা প্রকৃতি সম্বন্ধে আজিকার সাক্ষাৎ প্রশ্ন সেই পটভূমিকাকেই প্রমাদযুক্ত করিয়া দিয়াছে যাহা এতদিনের পদার্থবিদ্যা

দর্শনের জন্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বাভাবিকভাবেই দর্শন-শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, এবং ইহার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাসমূহকে দেখিবার দৃষ্টিকোণকেও। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—আমরা কি কলের পুতুল না তেমন স্বাধীন সত্তাবান্ মানুষ, যাহারা নিজ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ঘটনার গতিকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে? এই বিশ্ব কি স্বরূপতঃ জড়ীয় না মনঃপ্রসূত? কিম্বা দুই-ই? যদি দুই-ই হয়; তবে জড়সত্তা কিম্বা চিত্তসত্তাই মৌলিক? তবে কি মন জড়েরই সৃষ্টি কিম্বা জড় মনেরই সৃষ্টি? যে বিশ্ব আমরা দেশে কালে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা কি এইরূপেই মূলতঃ বাস্তব, কিম্বা এই বিশ্ব কি এই বিশ্বের অতীত অপর কোন বস্তুতন্ত্র বিশ্বের আবরণ মাত্র?

উপরের প্রশ্নগুলি শুনিলে উহাদিগকে দার্শনিকদের প্রশ্ন বলিয়াই মনে হইবে। অথচ তাহারা আজ উত্থাপিত হইয়াছে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে। দর্শন ও বিজ্ঞান অদূর ভবিষ্যতে একই জীবনের দুইটি আস্বাদনরূপে গড়িয়া উঠিতে চলিয়াছে।

Louis De Broglie তাঁহার Matter and Light গ্রন্থে লিখিতেছেন: 'And it is equally fair to observe in passing that no less a physicist than Niels Bohr thinks that the 'uncertainties' and 'complementary aspects' of Quantum Physics are sure to find a place sooner or later in biological theory. For according to Genetics, all the essential factors of life and heredity are contained in elements so minute as to be more or less comparable with atoms; it is possible even that they are contained in fractions of these elements: so that Bohr's suggestion becomes all the less surprising, since if he is right, the mysterious interconnections of Life and Matter would take place in so extremely restricted a sphere that Quantum concepts would necessarily be operating.'—Matter and Light—Preface—Page 10.

—'ইহা প্রসঙ্গক্রমে তুল্যভাবেই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে নিয়েল্স্ বোরের মত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পদার্থবিৎ মনে করেন যে, কোয়াণ্টাম্ পদার্থবিদ্যার 'অনিশ্চয়তা' ও 'পরস্পর পরিপূরক দিক্গুলি' দেরীতেই হউক আর শীঘ্রই হউক—জীববিদ্যার মধ্যে নিশ্চয়ই স্থান লাভ করিবে। কেননা সুপ্রজননবিদ্যা অনুযায়ী জীবন ও বংশ-গতির সারভূত সর্ববিধ factor গুলি এমন সব মৌলিক সূক্ষ্ম পদার্থসমূহের মধ্যে এমনভাবে নিহিত রহিয়াছে যে, ইহাদিগকে পরমাণুর সঙ্গে অল্পাধিক পরিমাণে তুলনা করা যাইতে পারে। এমন কি ইহাও সম্ভব যে, ঐ জীবন ও বংশগতি এইসব মৌলিক পদার্থের ভগ্নাংশের মধ্যেও নিহিত থাকিতে পারে। কাজেই বোরের ইঙ্গিত আদৌ আশ্চর্যজনক না হইতে পারে; যেহেতু, যদি তাঁহার উক্তি সঠিক হয়, তবে জীবন ও জড়বস্তুর অনির্বচনীয় পারস্পরিক যোগ সংঘটিত হইবে এমনই এক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, যেখানে কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যা অবশ্যই কার্যকরী হইবে।'

কোয়াণ্টাম থিওরীর মধ্যে পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা এক অদ্বৈত ভাবাপন্ন হইতে চলিয়াছে। এইখানে দাঁড়াইয়াই কি শ্রীনিত্যগোপাল 'আকার-সাকার-নিরাকার

সমন্বয়' তত্ত্বের বার্তা বিশ্বদরবারে পৌঁছাইয়াছেন : 'কৃষ্ণ নিত্যাকার। সেইজন্য কৃষ্ণ সদাকার। কৃষ্ণ নিত্য সাকার। সেইজন্য কৃষ্ণ সৎ-সাকার। কৃষ্ণ নিত্য নিরাকার, সেইজন্য কৃষ্ণ সন্নিকার।' ভক্তিযোগ দর্শন—পৃঃ ৮১। শ্রীকৃষ্ণজীবনে জীবন ও জড় অনির্বচনীয় পারস্পরিক যোগে যুক্ত বলিয়া তাঁহাতে আকার-নিরাকার-সাকার সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে। যিনি আকার, যিনি নিরাকার, তিনিই পারস্পরিক যোগে জীবন্ত শ্রীকৃষ্ণ। 'দেহদেহিবিভেদোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ। আকারকে আমরা জড়ীয় বলিয়াই জানি। সেই জড়ীয় আকার বিজ্ঞানের কোন্ ধারা বহিয়া অজড় চৈতন্যের সঙ্গে জীবনের মধ্যে যুক্ত হইল? কোয়ান্টাম্ থিওরী ইহার একটি দিগ্‌দর্শন দিয়াছে। ইহার মতে জড় ও জীবনের এই যোগ সম্ভব 'in a extremely restricted sphere' —খুবই এক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকেই কি এ দেশের ভক্ত মিষ্টিক দার্শনিকগণ যোগমায়া ক্ষেত্র বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন? এই ক্ষেত্রের পরাশক্তি যোগমায়া উপাশ্রয়েই কি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য-নির্বিকার রূপগুণকর্ম লইয়া, নিত্য-নির্বিকার মন-বুদ্ধি লইয়া নিত্য বৃন্দাবনে লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন? এ কোন্ দেশ, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-পরমাত্মাই শুধু নিত্য নির্বিকার নন, যেখানে আত্মারই মত শ্রীকৃষ্ণের মন-বুদ্ধি-রূপ-গুণ-কর্মও নিত্য নির্বিকার; উহারা যেখানে শুধু ব্যবহারিকভাবেই নিত্য নয়, পারমার্থিক-ভাবেই নিত্য? শ্রীকৃষ্ণরূপের উপাসনা কদাচ প্রতীকোপাসনা নয়, উহা আত্মপূজাই। আকার-নিরাকারের এই রহস্যপূর্ণ সমন্বয় যোগমায়ার দেশেই সম্ভব, অবধূতের দেশেই সম্ভব। বর্তমান যুগের মানুষের সৌভাগ্য এই যে, এই রহস্যপূর্ণ জড়-অজড় সংযোগ আজ আর একান্ত মনবুদ্ধির অগোচরই নয়; ইহার আভাস পদার্থবিদ্যা ও [illegible] পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর বুদ্ধির সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা প্রকৃতির বাহিরে নয়; ইহা জীবভূতা এই প্রকৃতিরই এক 'সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে' অনাদি অনন্তে অনুষ্ঠিত ও উপলব্ধ হইতেছে। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে উপলব্ধ এই দেহ-আত্মা সমন্বয়, রূপ-আত্মা সমন্বয়, গুণ-আত্মা সমন্বয়, কর্ম-আত্মা সমন্বয়, মন-আত্মা সমন্বয় ও বুদ্ধি-আত্মার সমন্বয়কে এই বিরাট বিশ্বের বুকে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন এবং ইহাদিগকে উপলব্ধির বিষয়ীভূত করিবার পন্থারও নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রই অবধূতের দেশ। এখানে আকার নিরাকার ও সাকারের সংস্কার, সগুণ-নির্গুণের সংস্কার, এক-বহুর সংস্কার ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। এই ক্ষেত্রে শুধু বিরাজ করে সর্বসংস্কার বর্জিত—বন্ধন-মুক্তিরও সংস্কার বর্জিত—নিত্য নিরঞ্জন কেবল চিৎ-কণ, চিদানন্দ-কণ মুক্তের সংঘ। এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রই আজ বিরাট বিশ্বে প্রসারিত হইতে চাহিতেছে। সর্বগুহ্যতম এই মতবাদ যত আস্বাদিত হইবে, ততই অপরা প্রকৃতির যান্ত্রিক দেহ বদলাইবে, যান্ত্রিক রূপ বদলাইবে, যান্ত্রিক গুণ বদলাইবে, যান্ত্রিক কর্ম বদলাইবে, যান্ত্রিক মন-বুদ্ধি বদলাইবে। অপরা প্রকৃতির বুকে শ্রীনিত্যগোপালের অবতরণ আজ জয়যুক্ত হউক। বন্দেমাতরম্

দীপালী

নিশিকান্ত

আজি গোধূলিতে

এক সাথে হয় জ্বালা

আকাশে মাটিতে

প্রদীপ-প্রসূণ মালা।

মর্ত্য-লোক আর অমর-লোকের মাঝে

মিলন-লীলার

আলোকের দ্বার

দিকে দিকে খুলিয়াছে;

আজি সন্ধ্যায়

নিশি-গন্ধায়

পারিজাত-জ্যোতি ঢালা।

অসীমা-তামসী

মহাশক্তির কোলে

আঁধারে বিকশি'

অসংখ্য শিখা দোলে।—

সেই মহানিশাময়ী মহাকালী আসি'

আজি এ নিশীথে

এই দীপালীতে

উঠিয়াছে উদ্ভাসি';

ধরে গ্রহতারা

সৃজনের ধারা

ধরণীর দিগ্বালা।।

নির্বিশেষ

রেণু মিত্র

নির্বিশেষ হওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে ভারী একটা আকুতি আছে। এই আকুতিটি খানিকটা স্বতঃসিদ্ধ; কেননা মানুষের মধ্যের নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার একটা খোঁচা তাকে দিনরাত উত্যক্ত করে। বোধহয় পৃথিবীর যাবতীয় মহৎ সৃষ্টি এই প্রেরণা থেকে জাত। এই স্বতঃসিদ্ধ খোঁচাটুকুর বাকিটুকু আসে মানুষের মধ্যে প্রয়োজন বোধের তাগিদে। মানুষ দেখে বিশেষকে নিয়ে ভারী হাঙ্গামা। প্রতিটি বিশেষের নাম আলাদা, রূপ আলাদা, প্রকৃতি আলাদা। এই রকম বহু বিভিন্ন নাম, রূপ প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার চালান ভারী মুস্কিল। মানুষ ভাবে এতে সোয়াস্তি থাকে না—এত বহু নিয়ে, এত বিভিন্ন নিয়ে ঘর করা চলে না। বিপদাপন্ন বোধ করে মানুষ হাঙ্গামা পোয়াতে হয় যা নিয়ে, তাকে বাদ দিলে। রাম, শ্যাম যদু মধু গীতা সীতা মিতা নীতা বাদ দিয়ে সে বললে মানুষকে চাই। ইংরেজ জার্মাণ ফরাসী, রাশিয়ান ভারতবাসী জাপানী চীনা বাদ দিয়ে সে বললে মানুষকে চাই। শিশু কিশোর যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ বাদ দিয়ে সে বললে আর কাউকে দরকার নেই কেবল মানুষকে চাই। মানুষকে চাই মানে কোন বিশেষ মানুষকে নয়, মানুষত্বকে চাই। এতে তো কোন হাঙ্গামা নেই—রূপ নিয়ে, গুণ নিয়ে প্রকৃতি নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ করবার কোন সম্ভাবনা নেই। কত সুবিধে হয়ে গেল! মানুষ মনে করল খুটিনাটি ছোটখাট বস্তুপুঞ্জ বাদ দিয়ে পথটাকে বেশ সরল করা গেল। বেশ একটা বড় চিন্তাজগতে এসে পড়া গেল—বেশ বিস্তৃত, সেখানে কেবল মানুষ!

কিন্তু এই রকম মানুষত্বের ধ্যান করতে গিয়ে মানুষ একটা বিপদ করে বসল। কেবলই সে বড়কে চাইতে শিখেছে, ছোটকে ভুলতে চেয়েছে। বড়ত্বকে, ব্রহ্মকে চাওয়া ভাল কিন্তু ছোটকে ভুলতে শিখতে গিয়ে মানুষ কি ভাল করেছে? জীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখ, সংসারের ছোট ছোট মানুষগুলি—তারা জীবনকে যে মধুর করে রেখেছে—দুঃখ তো মধুরই করে তোলে জীবনকে—তাদের ভুলতে গিয়ে কি মানুষ খুব লাভবান হয়েছে? জীবনকে তারা তো কেবল মধুময়ই করেনি, জীবনকে তারা যে পিলসুজের মত ধরে রেখেছে। অথচ তাদেরকেই আমরা ভুলতে চাই।

এই ভুলবার সাধনায় আমরা ছোটকে ভুলেছি বটে কিন্তু ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাইনি। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছেন—যুদ্ধ করবেন বলেই এসেছিলেন। কিন্তু দুই সেনাদলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের আত্মীয়স্বজনকে দেখে অর্জুনের যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তি চলে গেল। তিনি দেখলেন ভীষ্ম দ্রোণ এই সব গুরুজন আর বহুবিধ আত্মীয়স্বজনকে বধ করে রাজ্যভোগ অপেক্ষা ভিক্ষান্নে জীবনও শ্রেয়ঃ।

স্বজন বধ করে শ্রেয়ঃ কোথায়? রাজ্যভোগসুখ যাদের জন্য মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে, সেই সবাইকে তো যুদ্ধে হত্যা করতে হবে? অর্জুন বললেন এমন রাজ্য আমি চাই না। আচার্য, পিতৃগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, শ্বশুরেরা, পৌত্রেরা, শ্যালাসমূহ ও সম্বন্ধীগণ—এরা সকলেই ধনপ্রাণের মায়া কাটিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। এদের সকলের কথা অর্জুনের মনে পড়ল—এদের সকলকে হত্যা করেই তো রাজ্যসুখ ভোগ করতে হবে! অর্জুনের মন কেঁদে উঠল, তাঁর শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ দেখা দিল, হাত দিয়ে গাণ্ডীব ধরবার সামর্থ্য রইল না।

অর্জুনের যে শুধু এদেরই কথা মনে পড়েছে তার পেছনে রয়েছে সেই বড় নিয়ে মাথা ঘামানর স্বভাব আর ছোটকে ভুলবার প্রচেষ্টা। রাজা মহারাজাদের কথা অর্জুনের মনে পড়েছে, কিন্তু মনে পড়ল না লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর কথা, মনে পড়ল না পদাঘাতহত বিদুরের কথা। ছোটর জন্য ভাবনা গেছে, কিন্তু বড়র ভাবনায় অর্জুন রাজ্যত্যাগ করতে পারেন। মনে পড়ল না নিজের স্ত্রীর লাঞ্ছনা যা ঘটেছিল ঐ রাজা-মহারাজা সমর্থিত দুর্যোধনের হাতে, মনে পড়ল না প্রাণবান বিদুরের অপমান ঐ দুর্যোধনেরই কাছে। এরা যে ছোট,—দ্রৌপদী নারী—বিদুর দরিদ্র! অর্জুন যখন ভিক্ষান্নে জীবনধারণ শ্রেয়ঃ মনে করে রাজ্য ফেলে দিয়ে যেতে চান ঐ দুর্যোধনেরই কাছে, তখন এ কথা তাঁর একবারও মনে হল না যে, ক্ষত্রিয় আমি, অত্যাচারের প্রতিবিধান না করে অত্যাচারীরই হাতে ফেলে রেখে চলে যাব অত্যাচারিতকে? যে রাজ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের চোখের সামনে রাজবাড়ীর নারীরই অপমান সম্ভব হয়, সে রাজ্যে একটি নারীও যে সম্মানের সঙ্গে জীবন যাপন করে না, এ কথা বুঝতে অসুবিধে নেই। নারীর অপমানে যে রাজ্যে গর্জন করে না আচার্য, গর্জন করে না পিতামহ, গর্জন করে না ব্রাহ্মণ, গর্জন করে না ক্ষত্রিয়, গর্জন করে না কেউ—সে রাজ্যের নারীর সম্মান তো এতটুকুও ছিল না। আর এ হেন রাজ্যে যে বিদুরের মত ভাল মানুষের সম্মান থাকবে না, তাতে আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু অর্জুনের এ সব কিছুই মনে পড়ল না। ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন শ্রেয়োবোধের অভ্যস্ত রক্ত অর্জুনের মধ্যেও ;তাই আত্মীয়স্বজন বধ করতে গিয়ে তাঁর দয়ার্দ্রচিত্ত কেঁপে উঠল। সিদ্ধান্ত করলেন, বধ করব না। অর্জুনের চিত্তে দয়া ছিল এ খুব ভাল কথা—শত্রুর জন্যও তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল, যা একরত্তি পাওয়া যাবে না দুর্যোধনের মধ্যে। কিন্তু প্রাণ তো অর্জুনের দ্রৌপদীর জন্য কাঁদল না, কাঁদল না তো বিদুরের জন্য? কেন? কাঁদল না এইজন্যই যে, অর্জুনের রক্তে রয়েছে the nature of 'abstracting of universals from the limitless multiplicity of appearances.'—যারই পরিণতি হচ্ছে ভিক্ষান্নে জীবনযাপনাকাঙ্ক্ষা, বৈরাগ্য—যে বৈরাগ্য অত্যাচারীর হাতে দুর্বলকে ফেলে রেখে যেতে বাধা দেয় না, যে বৈরাগ্যবোধ মনে করিয়ে দেয় না অর্জুনকে যে—এই সব আচার্য পিতামহ পুত্রপৌত্রাদিকে বধ করা বেদনাদায়ক

সন্দেহ নেই—কিন্তু তার থেকেও অধিক বেদনাদায়ক নারীকে আর দরিদ্রকে অত্যাচারী রাজার হাতে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া। ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে যে বৈরাগ্য, অর্জুন সেই বৈরাগ্যের খবর জানেন। কিন্তু বৈরাগ্যের মধ্যেও যে আগুন আছে যা অত্যাচারকে সহ্য করে না, তাকে পুড়িয়ে দিতে পারে—সে বৈরাগ্যের কথা অর্জুন জানবেন কেমন করে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই বৈরাগ্য শেখাতে এসেছিলেন। মনে দ্বন্দ্ব যখনই এল, অনেককে বধ করতে হবে বলে করুণা যখনই অর্জুনকে আবিষ্ট করল, তখন সেই বেদনা বুকে নিয়েও যে অত্যাচারীকে বধ করে দ্রৌপদীকে ও বিদুরকে সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করা শ্রেয়ঃ—এ ভাবনা অর্জুনের হলনা। অর্জুনের মনে যে দ্বন্দ্ব উঠেছে, বধ করতে হবে বলে ব্যথা জেগেছে, সেটা ভাল। দুর্যোধনাদির তো এজন্য কোন ব্যথাই নেই। আজকের দিনেও পাশ্চাত্য জাতিরা যখন একে অপরকে বধ করার মারণ যজ্ঞে নেচে ওঠে, তখন অপরের জন্য তাদের মধ্যে এতটুকু করুণা থাকে না, নিজে অত্যাচারী না হয়ে কোন অত্যাচারীকে বধ করে অত্যাচারিতকে মুক্ত করার সুদুর্লভ আদর্শ নিয়েই কেউ আজ যুদ্ধে অগ্রসর হয় না। প্রত্যেকেই নিজের জাতির অথবা গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনেই রণউন্মাদ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করেছিলেন তখন তার পেছনে মনের যে স্তরের খবর ছিল—আমরা আজও তার সন্ধান পাইনি, আয়ত্ত করতে পারিনি। যাকে বধ করছি তার জন্য ব্যথা থাকবে না, এ হতে পারে না; ক্রোধ বা বিদ্বেষের বশীভূত হয়েও তাকে আঘাত করব না। তার জন্য থাকবে বুকভরা ব্যথা, তথাপি তাকে বধও করতে হবে। বধ করতে হবে নিজের ব্যক্তিগত বা জাতিগত আক্রোশে নয়, বধ করতে হবে সে বিশ্বের কল্যাণ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছে বলে। কিন্তু এমন ব্যবস্থার কথা অর্জুনের জানা নেই। অপর পক্ষের জন্য যখনই বেদনার সঞ্চার হল, তখনি তাঁর মনে এদের বধ না করবার প্রেরণা জাগল। এই বধ না করার মনোবৃত্তিতে রয়েছে পালিয়ে গিয়ে, ঘটনাপুঞ্জ থেকে সরে এসে আরামে থাকার অন্তঃস্যূত একটা আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্যেই দ্রৌপদীর কথা মনে পড়ল না, পড়ল না মনে বিদুরের কথাও। এইটেই নির্বিশেষ বুদ্ধির কথা। বিশেষ বিশেষ মানুষের দুঃখকে, ছোটর লাঞ্ছনাকে দূর না করে মানুষের জন্য যে আকুলতা তাইই নির্বিশেষ আকুতি।

ভারতবর্ষের জ্ঞানসাধনা এবং বিশ্বের অপরাপর স্থানের জ্ঞানসাধনার ধারাকে বিশ্লেষণ করলে এবং আমাদের নিজেদেরও মন ও স্বভাবকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিশেষকে বাদ দিয়ে, বাস্তবের বহুত্বের চাপ থেকে সরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে মানুষের ভারী ভাল লাগে। বহির্জগতের বহুত্ব আমাকে চাপ দেয় কেন, কখন? তখনই ঐ বহুত্ব আমার ওপর চেপে বসে, যখন ঐবহুকে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারি না। বাস্তব দাবী করছে আমার প্রাণকে ব্যাপক করা দরকার—বহু মানুষের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার—কিন্তু আমার স্বভাব তা হতে চায় না, নিজেকে ব্যাপক করতে হলে নিজেকে যে বদলাতে হয়, তাতে সে ইচ্ছুক নয়। তখনই বাইরেটা আমার ওপর চাপ দেয় আর তখনই আমার প্রবৃত্তি হয় বাইরের এই চাপ থেকে

দূরে সরে যেতে। সাধকের পক্ষেও ঠিক এই-ই হয়—তাই ভারতবর্ষের সাধক কেবলই অন্তর্মুখী গতিতে বাইরে থেকে সরে এসেছে ভিতরে, আরও ভিতরে। তাই সে বিশেষত্বহীন নির্বিশেষের উপাসক। অর্জুনকেও এই ভাবনায় পেয়েছে। তিনি নিজের স্বধর্ম বিসর্জন দিয়ে দ্রৌপদী বিদুরের কথা মনেও না করে সিদ্ধান্ত করে বসলেন—ভিক্ষান্নে জীবনও শ্রেয়ঃ, যুদ্ধ অপরাধ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এমন ভাবনায় চলবে না। বিশেষকে বাদ দিয়ে যে নির্বিশেষ, তেমন নির্বিশেষ শূন্যতা, তাতে জীবনের মূল্য রক্ষিত হয় না। বিশেষকে বাদ দিয়ে নির্বিশেষকে চাইলে তাও অপর একটি বিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। সর্ব বিশেষের সমন্বয়ে যে নির্বিশেষ তাই-ই সত্যিকারের নির্বিশেষ। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, '...ব্রহ্ম, যিনি নির্বিশেষ, তিনি বিশেষের মধ্যেই ব্যক্ত। যিনি নিরাকার, তাঁর আকারের অন্ত নেই—হ্রস্ব দীর্ঘ স্থূল সূক্ষ্মের অনন্ত প্রবাহই তাঁর। যিনি অনন্ত বিশেষ তিনিই নির্বিশেষ, যিনি অনন্ত রূপ, তিনিই অরূপ। অন্যান্য দেশে ঈশ্বরকে ন্যূনাধিক পরিমাণে কোনো একটি মাত্র বিশেষের মধ্যে বাঁধতে চেষ্টা করেছে—ভারতবর্ষেও ঈশ্বরকে বিশেষের মধ্যে দেখবার চেষ্টা আছে বটে কিন্তু সেই বিশেষকেই ভারতবর্ষ একমাত্র ও চূড়ান্ত বলে গণ্য করে না। ঈশ্বর যে সেই বিশেষকেও অনন্তগুণে অতিক্রম করে আছেন এ কথা ভারতবর্ষের কোন ভক্ত কোনদিন অস্বীকার করেন না।' 'ধর্মের স্থূল ও সূক্ষ্ম, অন্তর ও বাহির, শরীর ও আত্মা এই দুটো অংগকেই ভারতবর্ষ পূর্ণভাবে স্বীকার করতে চায় বলেই যারা সূক্ষ্মকে গ্রহণ করতে পারে না তারা স্থূলটাকেই নেয় এবং অজ্ঞানের দ্বারা সেই স্থূলের মধ্যে নানা অদ্ভূত বিকার ঘটাতে থাকে। কিন্তু যিনি রূপেও সত্য অরূপেও সত্য, স্থূলেও সত্য সূক্ষ্মেও সত্য, ধ্যানেও সত্য প্রত্যক্ষেও সত্য, তাঁকে ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে দেহে মনে কর্মে উপলব্ধি করবার যে আশ্চর্য, বিচিত্র ও প্রকাণ্ড চেষ্টা করেছে তাকে আমরা মূঢ়ের মত অশ্রদ্ধা করে য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর নাস্তিকতায়-আস্তিকতায় মিশ্রিত একটা সংকীর্ণ নীরস অংগহীন ধর্মকেই একমাত্র ধর্ম বলে গ্রহণ করব—এ হতেই পারে না।'

এইভাবে সর্ব বিশেষকে সত্য সার্থক করে তাদেরকেও যিনি পেরিয়ে যাচ্ছেন, তিনিই সত্যিকারের নির্বিশেষ। আজকের দিনে আমরা এই নির্বিশেষকেই চাই—তাহলে বাস্তবকে অস্বীকার করে, ভুলে গিয়ে ভিক্ষান্নের জীবন শ্রেয়ঃ মনে করব না—তাহলে দ্রৌপদী ও বিদুরকে ভুলে যাবার প্রয়োজন হবে না অথচ বাস্তবকে একটি সীমাবদ্ধ ও ব্যক্তিগত মূল্যে দেখবারও অবকাশ থাকবে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্বানুবৃত্তি)

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ৭।১

('যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।'—এই বাক্যের মধ্যে প্রশ্নবীজ নিজেই স্থাপন করিয়া 'আমি ঈদৃশ তত্ত্ব এবং এইরূপে মদ্গতচেতা হইতে হয়'—ইত্যাদি উত্তর বলিবার উদ্দেশ্যেই) শ্রীভগবান্ উবাচ [শ্রীভগবান বলিলেন] ময্যাসক্তমনাঃ [বক্ষ্যমান বিশেষণযুক্ত পুরুষোত্তম-আমিতে আসক্ত, আট্‌কাইয়া গিয়াছে মন যাহার, তিনিই ময্যাসক্তমনা; পুরুষোত্তমে আসক্ত হইলেই যে-সঙ্গ হইতে কাম জন্মে, সেই সঙ্গের দোষ কাটে। সাধনারম্ভের পূর্বে চাই পুরুষোত্তম কিম্বা পুরুষোত্তমভাব-ভাবিত শ্রীগুরুদেব-জীবনে আসক্ত হওয়া] হে পার্থ, যোগং যুঞ্জন্ [মন সমাধান করিয়া] মদাশ্রয়ঃ [সর্বাশ্রয়মূর্তি পুরুষোত্তম-আমিই আশ্রয় যাহার, তিনিই মদাশ্রয়। যে কোনও ব্যক্তি খণ্ড ধর্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষ-রূপ পুরুষার্থ কামনা করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি সেই খণ্ড প্রয়োজনের সাধন স্বরূপ কর্ম, তপস্যা, দান বা একান্ত জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি কোনও খণ্ড আশ্রয়কেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অখণ্ড ধর্ম, অখণ্ড অর্থ, অখণ্ড কাম, অখণ্ড মোক্ষকামী পুরুষ অন্য খণ্ড সব সিদ্ধি ও উপায় পরিত্যাগ করিয়া 'সমগ্র' আমাকেই আশ্রয় বুদ্ধিতে অবলম্বন করেন এবং আমাতেই আসক্তচিত্ত হন] হে পার্থ [অর্জুন, তুমি এবম্ভূত হইয়া] অসংশয়ং ['সামান্য-বিশেষে একতা রীতি' প্রাপ্ত হইয়া নিঃসংশয়ে] সমগ্রং [আত্মা-সর্বভূত সমন্বিত সমগ্র, Integral] মাং [স্বরূপ-বিশ্বরূপ সমন্বয়মূর্তি পুরুষোত্তম-আমিকে] যথা [যে প্রকারে] জ্ঞাস্যসি ['শ্রীভগবান এইরূপই'—এইরূপ জানিবে] তৎ [তাহা] শৃণু [শোন]।

শ্রীভগবান বলিলেন—হে পার্থ, আমাতে হৃদয় আসক্ত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া যোগ সাধন করিতে করিতে যে প্রকারে সমগ্র আমাকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। ৭।১

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ৭।২

জ্ঞানং [আত্মবিষয়ক জ্ঞান, কৈবল্য জ্ঞান, শ্রীভগবানের বিস্তারের জ্ঞান] তে [তোমাকে] অহম্ সবিজ্ঞানম্ [বিজ্ঞানের সহিত; বিচিত্রের ক্ষেত্রে অনাত্ম-সর্বভূত

বিষয়ক জ্ঞানই কলা-বিজ্ঞান, অনুভবঘন লীলা-বিজ্ঞান, শ্রীভগবানের জীবনের গভীরতার জ্ঞান] ইদম্ [এই] বক্ষ্যামি [বলিতেছি] অশেষতঃ [শেষ না রাখিয়া, কৃৎস্নভাবে]। (ঐ জ্ঞানের স্তুতি করিতেছেন) যৎ [জ্ঞান-বিজ্ঞান সমন্বিত যে পুরুষোত্তম জ্ঞান] জ্ঞাত্বা [আস্বাদন করিয়া] ন ইহ [এই দুনিয়ায়] ভূয়ঃ [পুনরায়] অন্যৎ [অন্য পুরুষার্থ সাধন] জ্ঞাতব্যম্ [জ্ঞাতব্যরূপে] ন অবশিষ্যতে [অবশিষ্ট থাকিবে না; আত্মানাত্ম সমন্বয়, নিত্যানিত্য সমন্বয়, জড়-অজড়-সমন্বয়, সর্ব সমন্বয় মূর্তি আমায় জানার ভিতর সব জানার, সব বিচিত্র জানার সাধই মিটিবে]।

আমি তোমাকে অনাত্মাবিষয়ক লীলাবিজ্ঞান সহ কৈবল্যজ্ঞান কৃৎস্নভাবেই বলিব, যাহা জানিয়া এই সংসারে জ্ঞাতব্যরূপে অন্য পুরুষার্থসাধন অবশেষ থাকিবে না। ৭।২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৭।৩

(মদ্ভক্তি বিনা আমার জ্ঞান দুর্লভ, ইহাই বলা হইতেছে) (অসংখ্য জীবের মধ্যে মনুষ্য ব্যতিরিক্ত কাহারও শ্রেয়ে প্রবৃত্তি নাই) মনুষ্যাণাং [মানুষগণের] সহস্রেষু [সহস্রের মধ্যে] কশ্চিৎ [কোনও কোনও জ্ঞানী বা যোগী] যততি [যত্ন করেন] সিদ্ধয়ে [ব্রহ্মসিদ্ধি বা পরমাত্ম সিদ্ধিরই জন্য]; যততাম্ অপি [যত্নকারীদের সহস্রের মধ্যে কেহবা ব্রহ্ম সিদ্ধি ও পরমাত্ম সিদ্ধি লাভ করেন] সিদ্ধানাং [সেই সব ব্রহ্মসিদ্ধ ও পরমাত্মসিদ্ধগণের মধ্যে] কশ্চিৎ [কোনও পুরুষ] বেত্তি [জানেন] তত্ত্বতঃ [আমি যাহা ঠিক সেই রূপে। ইহা মহাসিদ্ধাবস্থা; শ্রীনিত্য-গোপাল লিখিয়াছেন 'মহাসিদ্ধাবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এক বলিয়া মনে হয়।' 'ভগবান নানারূপী। তাঁহার সাকারত্বে নানাত্ব, নিরাকারত্বে একত্ব। সিদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরীয় বহু সাকার এক বোধ ও দর্শন হয়। এই প্রকার বোধ ও দর্শনকে সাকারে অদ্বৈতজ্ঞান বলা হয়। মহাসিদ্ধাবস্থায় সাকার নিরাকার অভেদ বোধ হয়। এই প্রকার জ্ঞান অতি দুর্ল্লভ।—সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার, পৃঃ ৮৮। প্রকৃতির সহিত বিযুক্ত প্রকৃতিস্পর্শ রহিত যিনি, তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব; ঘড়িকে খুলিয়া ফেলিয়া ঘড়ির যে তত্ত্ব, প্রকৃতির সব জোড়া (যোগ joint) বিচারের পথে ভাঙ্গিয়া দিলে প্রকৃতির যাহা অবশেষ জ্ঞান, তাহাই গুহ্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মতত্ত্ব। কিন্তু যতক্ষণ না ঘড়ির অঙ্গ-গুলি পুনরায় জোড়া দেওয়া হয়, ততক্ষণ যেমন বাস্তবের দেশে ঘড়ি হয় না, ঘড়ির বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণই হয় না, তেমনি যতক্ষণ না ব্রহ্ম প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হইতেছেন, ততক্ষণ তিনি একান্ত ভাবুকতা; উহার কোনও বাস্তব নিদর্শনই নাই। এই নিদর্শন লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মকে প্রকৃতির দ্রষ্টা হইয়া প্রমাণ দিতে হইবে যে প্রকৃতিদর্শনেও তিনি কূটস্থ, নির্ব্বিকার। প্রকৃতি-দ্রষ্টা এই নির্ব্বিকার ব্রহ্মই গুহ্যতর পরমাত্মতত্ত্ব। কিন্তু এখানেও নির্বিকার ব্রহ্মের নির্বিকারত্বের চরম পরীক্ষা হয় না, যতক্ষণ না দ্রষ্টা-পরমাত্মা আবার প্রকৃতির ভোক্তারূপে প্রকৃতির সকল অঙ্গে

রমণ করিয়াও মদনমোহন থাকিতেছেন। পরমাত্মার প্রকৃতি-ভোক্তা রূপই গুহ্যতম শ্রীভগবান। এই ভোক্তা-শ্রীভগবান আবার যখন ভোগ্যা-প্রকৃতির ভিতর হজম হইয়া গিয়া, প্রকৃতিময় হইয়া, প্রকৃতির সব বন্ধন স্বীকার করিয়াও মুক্ত, নির্ব্বিকার নন্দন রূপে প্রকটিত, তখন তিনিই সর্ব্বগুহ্যতম পুরুষোত্তম। গীতা 'গুহ্য', 'গুহ্যতর', গুহ্যতম—এই তিনটি শব্দ প্রয়োগের দ্বারা একই ব্রহ্মতত্ত্বের ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান-পুরুষোত্তম এই চারিটী স্তর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন]।

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন; তাদৃশ প্রযত্নশীল সিদ্ধগণের মধ্যে কেহ বা আমাকে তত্ত্বতঃ জানেন। ৭।৩

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৭।৪

(স্বতত্ত্বে দাঁড়ানো পুরুষোত্তমের বংশীগানের মূর্চ্ছনার তরঙ্গ হিল্লোলে যোগমায়া প্রকৃতি কেমন করিয়া দৃশ্য-দ্রষ্টারূপে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞরূপে, জড়-চৈতন্যরূপে, অনাত্মা-আত্মারূপে আপনাকে উদ্ভাবিত করিয়া পরে পুরুষোত্তমের নিরবদ্য দিব্যজ্ঞান সংযোগে যুক্ত হইয়া, অন্যোন্য মৈথুনে রত থাকিয়া রূপে রূপে জমিয়া মূর্ত্ত হইয়াছিল, শ্রীরাধারাণীর মত ত্রিভঙ্গ হইয়া 'বংশী শিক্ষা'র জন্য অর্থাৎ এই প্রকৃতিরহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার জন্যই অর্জুনকে মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত প্রকৃতিকে নিজ দিব্য জীবনে হজম করিয়া, অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ মহাপুরুষরূপে, পুরুষ প্রধানরূপে শ্রীভগবান বলিতেছেন) ভূমিঃ আপঃ বায়ুঃ খং [static পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত] মনঃ [static মন এবং পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়] বুদ্ধিঃ এব চ [এবং static বুদ্ধিই] অহঙ্কারঃ [static অহঙ্কার] ইতি [এতদিনকার দর্শন-শাস্ত্র-অনুমোদিত এইরূপ] ইয়ং [এই] মে [পুরুষোত্তম-'আমি'রই] ভিন্নাঃ [স্বয়ং মূল্য সম্পন্ন তাই ভিন্ন, অথচ শ্রীভগবানের যোগসূত্রে এক; অভিন্ন] প্রকৃতিঃ [যোগ-মায়ার অংশ অপরা পরকীয়া প্রকৃতি] অষ্টধা [আট প্রকারের; অহঙ্কারের পর আর মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্তের কথা শ্রীভগবান উল্লেখ করেন নাই; কেননা ঐ দুইটি স্তর নিজ শরীরে মাখিয়াই তো তিনি অবতীর্ণ। বিশেষতঃ ঐ দুইটি জীবের ব্যষ্টি সাধনার ক্ষেত্রের একান্ত নাগালের বাহিরে; তাই করুণাময় ভগবান জীবের ঐ দুই স্তরের সাধনা জীবের পক্ষ হইয়া নিজের জীবনেই করিয়া লইয়া, অহঙ্কারের স্তরে পুরুষোত্তম-অহং-রূপে স্থিত হইয়া 'বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তা আমি' মনে করিয়া দাঁড়ানো জীবের সামনে প্রকট হইলেন। মনে রাখিতে হইবে, এই দৃশ্যা অপরা প্রকৃতিকে ভগবতী প্রকৃতি দৃক্ পরাপ্রকৃতির সঙ্গে যোগ করিয়াছেন পুরুষোত্তম জীবনে। পুরুষোত্তম জীবনেরই দুইটী আস্বাদন—পরা ও অপরা প্রকৃতি। পরা-অপরা প্রকৃতির সমন্বয়ে যিনি মূলা পুরুষোত্তম-প্রকৃতি, তিনিই পরা ও অপরার সমন্বয় রূপিণী, পরমেশ্বরী পরমাপ্রকৃতি—'পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী'-শ্রীশ্রীচণ্ডী। যোগমায়াসমাবৃত পুরুষোত্তম পরা প্রকৃতি সহায়ে অপরা প্রকৃতিকে পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার

জন্য অনাদি অনন্তে ছুটিয়া চলিয়াছেন। গীতার সাধনা এই সৃষ্টির সাধনা। পুরুষোত্তম আমি হইতে বিচ্ছিন্ন 'আমি'র স্তরে দৃশ্য একান্ত static দৃশ্য, জড়; এবং দ্রষ্টা একান্ত static দ্রষ্টা, চেতন। সাংখ্য অন্ধ-পঙ্গু ন্যায়ের অবতারণা করিয়া ইহাদের গোজামিল দিয়াছে। বিবর্ত্তবাদ যে-সংযোগের যুক্তিযুক্ত হৃদ্য ব্যাখ্যা দিতে না পারিয়া অনির্ব্বচনীয়তাবাদের দুয়ারে যুক্তিকে বলিদান করিয়া জড়া-প্রকৃতির খুনে অজড় আত্মার তর্পণ করিয়া ব্রহ্মকে একান্ত নিরাকার-নির্গুণ ইত্যাদি বচনের আমলে অনিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছে, দৃক্-দৃশ্যের মিলনের ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত রূপে দিতে পারে নাই, পুরুষোত্তম 'মে প্রকৃতি' বলিয়া সেই আত্মা-অনাত্মার নিরবদ্য, যুক্তিশাস্ত্র-সম্মত উপাধিবিধুর স্বাভাবিক সম্বন্ধময় flexible সংযোগই নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন। পুরুষোত্তম-'অহম্' সূত্রে দিব্যভাবে, দিব্যজ্ঞান রূপে জড়-অজড় গ্রথিত; এখানে জড় জীব ও অজড় ঈশ্বরও প্রভেদ-অভেদভাবে এক, অখণ্ড। পুরুষোত্তম-চুম্বিত ও আলিঙ্গিত মহত্তত্ত্বের বুকে দৃক্-দৃশ্য পরস্পরের দিব্যভাবে উপরক্ত হইয়া স্বার্থ-পরার্থ সমন্বিত সর্ব্বার্থ সাধন করিতেছে। জড়েরই মন্থন-উদ্ভূত যে অজড় চৈতন্য অথচ তাহা জড়াতীত, চৈতন্যেরই ঘনীভূত আস্বাদন যে জড়, এবং পুরুষোত্তমের অস্মিতে থাকার ফলস্বরূপ জড় চৈতন্য যে পরস্পরের পরকীয়, স্বাধীন সত্তাযুক্ত—ইহা পুরুষোত্তম জীবনের নিগূঢ় আস্বাদন। স্বাধীন স্বাধীনার, কেবল ও কেবলার নিরবদ্য সংযোগই পরকীয়)।

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই অষ্টভাবে আমার প্রকৃতি ভিন্ন। ৭।৪

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৭।৫

অপরা [পরা প্রকৃতি হইতে অন্য, পরকীয় অর্থাৎ স্বয়ং মূল্যবতী] ইয়ং [পূর্ব্বোক্ত এই অষ্টধা দৃশ্যা, জড়া প্রকৃতি]; ইতঃ [এই অপরা হইতে] তু [পক্ষান্তরে] অন্যাং [পরকীয়া] প্রকৃতিং [ক্ষেত্রজ্ঞ ও দৃক্‌শক্তি, যোগমায়ার অংশ পরকীয়া প্রকৃতি] বিদ্ধি [জানিয়া রাখ] মে [আমার] পরাম্ [পরা, স্বাধীন সত্তাযুক্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ রূপা, দৃক্-স্বরূপা] (সেই পরা প্রকৃতিটী কি রূপ?) জীবভূতাং [জীবস্বরূপা, জীবনস্বরূপা; এইখানে জৈববিদ্যা (biology) দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।] হে মহাবাহো, যয়া [যে পরা প্রকৃতিদ্বারা] ইদং জগৎ [এই জগৎ] ধার্য্যতে [ধারণ করিয়া রক্ষা করা হইতেছে]।

হে মহাবাহো, এই পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি অপরা; ইহা হইতে পরকীয় আমার যে প্রকৃতি আছে, তাহা জীবভূত পরাপ্রকৃতি, যাহার দ্বারা এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। ৭।৫

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথাঃ॥ ৭।৬

(প্রকৃতির ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভায়িত রূপের বর্ণনা করিয়া দিব্য প্রকৃতির অন্যোন্য-মৈথুনের ভিতর দিয়া পুরুষোত্তম-অহম্‌ই যে সব কিছু করিতেছেন ইহাই বলিতেছেন) এতদ্‌যোনীনি [এই আত্মা-অনাত্মা স্বরূপ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ, দৃশ্য-দৃক্‌ স্বরূপ উভয় প্রকৃতিদ্বয় হইতেছে যোনি, কারণভূত যাহাদের, তাহারাই এতদ্‌যোনি, এমন] ভূতানি সর্ব্বাণি [স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বভূত] ইতি [এইরূপে] অবধারয় [অবধারণ কর]; (এই যোনিদ্বয়ের সমন্বিত মহত্তত্ত্বে, চিত্তরূপ যোনিতে আমিই পুরুষোত্তম বীর্য্য আধান করি—যোনির্মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্‌গর্ভম্‌দধাম্যহম্‌'। পুরুষোত্তম চুম্বিত আলিঙ্গত, পুরুষোত্তমময়ী জড়া প্রকৃতি যোগায় দেহাদি, এবং জীবভূতা পরাপ্রকৃতি সেই জড়া প্রকৃতির প্রতি খণ্ড-পরিণামকে স্বয়ং পূর্ণ করিয়া, প্রতি স্বয়ংম্পূর্ণ খণ্ড পরিণামগুলিকে পরস্পরের সংগে অন্যোন্যবন্ধবাহু করিয়া, অন্যোন্যসক্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং গর্ভাধানকারী পুরুষোত্তম-অহম্‌ সন্ধিতে সন্ধিতে দাঁড়াইয়া সবগুলি পরিণামকে কণ্ঠে কণ্ঠে গ্রহণ করিয়া এক অখণ্ড রাসচক্র গড়িয়া তুলিতেছেন, ইহাই বলিতেছেন) অহম্‌ [পুরুষোত্তম আমি] কৃৎস্নস্য [প্রতি কৃৎস্ন খণ্ডগুলির সমন্বয়ে কৃৎস্ন] জগতঃ [জগতের] প্রভবঃ [যাহা হইতে প্রকৃষ্টরূপে, ভাগবতরূপে কিছু হয়, তিনিই প্রভব, পরমকারণ] তথা [সেইরূপ] প্রলয়ঃ [প্রকর্ষত্ব রক্ষা করিয়া ও নিজের বিচিত্র স্বয়ংমূল্য মুছিয়া না ফেলিয়াই লীন হয় যাহার মধ্যে, তিনিই প্রলয়]।

স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূত এই দ্বিবিধ (পরা ও অপরা) প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ইহা অবধারণ কর। আমিই কৃৎস্ন জগতের পরমকারণ এবং সংহারমূর্ত্তি। ৭।৬

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥ ৭।৭

(যেহেতু যোগমায়া সমাবৃত আমি পরকীয়া অনাত্ম-প্রকৃতির প্রতি পরিণামকে স্বয়ং মর্য্যাদা দিয়া, স্বয়ম্পূর্ণ করিয়া অথচ প্রত্যেকের অতীত থাকিয়া, এবং প্রতি স্বয়ম্পূর্ণ পরিণামগুলির সন্ধিতে সন্ধিতে থাকিয়া সংঘবন্ধ এক, অখণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছি, সকলকে ব্যাপিয়া এবং সকলের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া অতীত-অনুগরূপ উপাধি-বিধুর সহজ সম্বন্ধময় এক রাসলীলা চক্রে সচ্চিদানন্দ লীলা রস আস্বাদন করিতেছি, অতএব) মত্তঃ [আমা হইতে] পরতরং [অধিকতর ব্যাপ্য এবং অধিকতর ব্যাপক, অতীত-তর এবং অনুগ-তর] ন অন্যৎ কিঞ্চিৎ [অন্য কিছুই নাই] হে ধনঞ্জয়, ময়ি [পুরুষোত্তম 'আমি'তে] সর্ব্বং ইদম্‌ [এই সব] প্রোতং [ব্যাপ্য এবং ব্যাপকভাবে টানা পড়েনের রূপে গ্রথিত] সূত্রে [সূত্রে] মণিগণাঃ ইব [মালা মধ্যস্থ মণিগণের মত; সূত্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন মণিগণকে জড়াইয়া এক, অখণ্ড মালায় গড়িয়া উঠিয়াছে। সূত্র ও মণিগণ যেমন অন্যোন্য ব্যাপ্য ব্যাপক, উপাধিবিধুর সহজ সম্বন্ধযুক্ত, এই সর্ব্ব ও পুরুষোত্তম অহম্‌ও এইরূপে যুক্ত]।

হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে পরতর আর কিছুই নাই; সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত, তেমনি আমাতে এই সর্ব্ব গ্রথিত রহিয়াছে। ৭।৭

ক্রমশঃ—

ঘাসের কথা*

চিত্তরঞ্জন রায়

ঘাসকে আমরা কত তুচ্ছ জিনিষ বলে মনে করি। তুলে ফেলে দিই—জঙ্গল মনে করে পায়ে মাড়িয়ে চলে যাই। আবার কোন সময়ে যত্ন করে ঘাস বুনে বাড়ীর চারিদিকে সবুজের আচ্ছাদন তৈরী করি। ঘাসকে আমরা যতই তুচ্ছ ভাবিনা কেন—ঘাস কিন্তু তুচ্ছ করবার মত জিনিষ নয়।

ঘাসে পৃথিবীর পাঁচভাগের একভাগ ছেয়ে আছে। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৬,০০০ রকমের ঘাস আছে। কাহার সংগে কাহারও এতটুকু সাদৃশ্য নেই! ঘাসের আকৃতি অত্যন্ত সাধারণ। একটি ডাঁটা এবং তার প্রত্যেক গাঁটে একটি করে পাতা। এই হল ঘাসের মূল আকার। ঘাসের ফুলও হয়। তবে সেই ফুলে নেই সৌরভ, নেই বর্ণসমারোহ। তার কারণ আছে। ঘাসের ফুলের রেণু বাতাসে ভর করে এক ফুল থেকে আর এক ফুলে নীত হয়। সুতরাং কীট পতংগকে আকর্ষণ করবার যে প্রয়োজন তা বাতাস সমাধা করে থাকে। এই কারণে কীট পতংগ আকর্ষণের জন্য সুগন্ধ এবং বর্ণের ঔজ্জ্বল্য তার দরকার নেই।

ঘাসকে আমরা খুব তুচ্ছ ভাবি; কিন্তু তার জীবনী শক্তি একটি মহীরুহকেও হার মানায়। মরুভূমিতে, নীরস পাষাণগাত্রে, এমনকি পৃথিবীর হিমাঞ্চলেও ঘাস আপন মহিমায় বিরাজিত। বাঁচবার জন্যে সে যে কোনও অবস্থার সংগে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিতে পারে। ঘাস দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। বৃদ্ধির সংগে সংগে ভূখণ্ডের উপর প্রসারণ শক্তিও তার কম নয়! এক একটি ঘাসের ফুলে প্রায় পাঁচকোটি রেণু-কণা বর্তমান; আর এই রেণু পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় চার হাজার ফুট উঁচুতেও উড়ে বেড়াতে দেখা গেছে। ঘাসের রেণু বহুদূর পর্যন্ত বাতাসে ভর করে ভেসে যায়।

ঘাসের বীজ মানুষের কাপড় জামার সংগে অথবা জন্তু জানোয়ারের গায়ের লোমে আটকে এক দেশ থেকে আর এক দেশে নীত হয়। এই ভাবে পৃথিবীর এক প্রান্তের ঘাস অন্য প্রান্তে গিয়ে জন্ম নিয়েছে। যখন ক্রীতদাসের ব্যবসায় প্রচলিত ছিল তখন আফ্রিকার বারমুদা নামক ঘাস আমেরিকায় নীত হয়; কারণ ক্রীতদাসেরা বারমুদা ঘাসের বিছানায় শয়ন করতো। আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় আসবার সময় তাদের ঘাসের বিছানাও সংগে থাকতো।

ঘাসের উপকারিতার কথা অনেকেই জানেন। ঘাসের দ্বারা মাটির মধ্যেকার পুষ্টিকর বস্তু শোষিত হয়ে বীজের মধ্যে সঞ্চিত হয় এবং প্রাণীর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গম, যব, ধান ইত্যাদি ঘাসের বীজের ধারাবাহিক বিবর্তনের ফলেই জন্ম

---

*পঞ্চমবর্ষ, ডিসেম্বর ১৯৫২-র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' হইতে লওয়া হইয়াছে।

নিয়েছে। অবশ্য এই বিবর্তন কিছুটা প্রাকৃতিক এবং কিছুটা মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফল। এদের পিতৃকুল, আদিম কালের বন্য ঘাস আজ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই রকম এক জাতীয় বন্য ঘাসই স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে আজ বাঁশের রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রশ্ন হলো বাঁশও তাহলে ঘাস? হ্যাঁ ঘাসই। বাঁশের আকৃতি, বৃদ্ধি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা বাঁশকে ঘাস জাতীয় বস্তু বলে স্বীকার করেছেন। ঘাসের আবাদ থেকে একালের পৃথিবীর মানুষ জীবন ধারণ করছে। অনেকে রেগে গিয়ে বলেন—আমাকে বোকা পেয়েছ? আমি কি ঘাস খাই? কিন্তু বিজ্ঞানীর বিচারে তিনি ঘাসই খান, তবে বোকা তিনি নন। ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা ঘাসের আবাদ থেকে তৈরী করেছে গম এবং ভারতীয় এবং চীনারা তৈরী করেছে ধান আর আমেরিকাবাসীরা অন্যান্য নানাবিধ শস্য।

গম পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের দ্বারা প্রায় ৬০০০ বছর ধরে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জেমস্ টাউন এবং প্লীমথের অধিবাসীরাই সর্বপ্রথম গম আমেরিকাতে আমদানী করে। চালও সেইরকম চার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অর্ধেক অধিবাসীর দ্বারা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৬৯৪ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকায় দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে ধান চাষ করা হয়।

আর সর্বপ্রথম তৈরী করে ভারতবাসীরা একরকম বনজ স্যাকারিণ ঘাস থেকে; ১৭৪১ সালে সেণ্টডোমিঙ্গো থেকে সর্বপ্রথম আমেরিকাতে নিয়ে যাওয়া হয়। খাদ্য হিসাবে ঘাস শক্তি আহরণ করে সূর্যকিরণ থেকে; আর তা আমাদের জন্য সঞ্চয় করে তার বীজে আমরা যা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি।

আমরা ঘাস থেকে পাই শক্তি, এই শক্তি সে আহরণ করে সূর্যকিরণ থেকে। গৃহপালিত পশু এই ঘাস খায় আর তাদের দেওয়া দুধ থেকে আমরা পাই ঘি, মাখন ইত্যাদি। সুতারং দেখতে গেলে দুধ মাখন ঘি খেয়ে আমরা যে শক্তি অর্জন করি তা প্রকারান্তরে আসে ঘাস থেকে।

পরিমাণ করে দেখা গেছে—এক পাউন্ড সাধারণ ঘাস যে পরিমাণ তাপ (ক্যালোরি) দিতে পারে, তদ্দ্বারা একজন মানুষ দেড় মাইল চলতে পারে, দু মিনিট ধরে সিঁড়িতে উঠানামা এবং আধ ঘণ্টা ধরে কাঠচেলা, আর তিন ঘণ্টা ধরে হোটেলের বাসন ধোয়ার কাজ করতে পারে। শস্য জাতীয় খাদ্য ঠিক এর চারগুণ শক্তি দিতে পারে।

ঘাসের উপকারিতা অনেক। ঘাস জমির ক্ষয় নিবারণ করে। বাঁধের উপর ঘাস জন্মালে বাঁধ শক্ত এবং মজবুত হয়। পৃথিবীতে মানুষ নানা উপাদান দিয়ে বাঁধ তৈরী করেছে। কিন্তু সাধারণ মাটির বাঁধের উপর ঘাসের আচ্ছাদন দিয়ে যে বাঁধ তৈরী হয়েছে তার মত মজবুত নয়।

শুনলে আশ্চর্য হবে যে, পৃথিবীর প্রথম ইলেকট্রিক আলো তৈরী হয়েছিল ঘাস থেকে! এডিসন তার প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর ফিলামেণ্ট তৈরী করে ছিলেন

অঙ্গারীকৃত বাঁশের আঁশ দিয়ে এবং এই বাঁশের ফিলামেণ্ট ব্যবহৃত হতো ১৯১০ সাল পর্যন্ত। একালে ঘাস থেকে সাবান তেল সুগন্ধি দ্রব্যাদি তৈরী হচ্ছে। ঘাস থেকে ভারত এবং চীন তৈরী করে মাদুর, উত্তর আফ্রিকা কাগজ, মেক্সিকো তৈরী করে সুন্দর ঝাঁটা ও আমেরিকা তৈরী করে দড়ি; আর পৃথিবীর সর্বত্র ঘাস দিয়ে ছাওয়া হয় ঘরের ছাদ। ঘাসের সব চেয়ে বড় এবং মজবুত জাত হল বাঁশ। বাঁশ থেকে পর্দা, ঝুড়ি, সুইচ, জলের পাইপ ইত্যাদি নানা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরী হচ্ছে।

এছাড়া ইদানিং বাঁশ থেকে সেলুলোজ রেয়ন তৈরী হচ্ছে। ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে সর্বপ্রথম বাঁশ থেকে রেয়ন তৈরী করা হয়। ভারত, ফ্রান্স এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি স্থানে কাগজ শিল্পে বাঁশ ব্যবহার করা হয়।

পাথরের উপরকার দাগ দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন পৃথিবীতে ঘাস প্রায় দু কোটি বছর ধরে বর্তমান। এমন এক সময় ছিল যখন পৃথিবীর সম্পূর্ণ ভূভাগ ঘাসে আচ্ছাদিত ছিল।

তুচ্ছ ঘাসের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে বিজ্ঞানীরা তার পরিমাপ করেছেন। তাঁরা বলেছেন ৭০০ একর জমিতে বর্তমান ঘাস সারা দিনে সূর্য কিরণ থেকে যে শক্তি আহরণ করে, তার পরিমাণ একটি অ্যাটম বোমা অথবা ২০,০০০ টন টি, এন, টি বারুদের বিস্ফোরিত শক্তির সমান।

ঘাস সত্যই তুচ্ছ নয়। মানুষ ঘাস ছাড়া বাঁচতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বলেন— এমন দিন হয়তো আসতে পারে, যেদিন মানুষ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু ঘাস সমভাবেই পৃথিবীতে বিরাজ করবে।

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের রেখার কাব্য—শ্রীশ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, এম,এ। এসিয়া প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স সিণ্ডিকেটের পক্ষে ১৯, নূর মহম্মদ লেন, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীতপোধন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

বইটি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

একটী রাসভারী নামের বই যখন একেবারে ক্ষুদ্রতম অবয়বে হাতে এসে পৌঁছল, তখন প্রথমে একটু অবাক হয়ে গেলাম। আর রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে সত্যিই তো না-বোঝার বিস্ময় ছিল! পড়ে বুঝলাম ভূমিকাতে শ্রীযুত কালিদাস নাগ মহাশয় যা বলেছেন, তাই-ই ঠিক। বড় জিনিষ নিয়ে, যতো যেরকম আলোচনাই হোক না কেন, তার মূল্য আছে, তাকে সাদরে আহ্বান করি। ছোট হোক বড় হোক আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সত্যকার দৃষ্টিটির খবর যদি দিতে পারে, তবে সমস্ত আলোচনারই উপযুক্ততা আছে। রবীন্দ্রচিত্রকলা সত্যিই আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য। অথচ বুঝতে চাওয়ার একটা বাসনা আছে। তাই শ্রীহরিবাবুর আলোচনাটি যত ছোটই হোক তার মধ্যে রবীন্দ্রকলাকে বুঝতে পারার ইঙ্গিতটুকু পেয়ে আমরা খুশী হয়েছি। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণার সাথে রবীন্দ্রচিত্রকলা মেলে না। তাই শ্রদ্ধাহীন আমরা অনেকেই নিতান্ত মূর্খ বলেই বিরূপ মন্তব্য করে বসে থাকি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ব্যক্তিত্বের হাত দিয়ে যা বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই কোথাও তার কোন মূল্য রয়েছে, আজ না বুঝলেও হয়তো এক সময়ে বুঝতে পারি—এ শ্রদ্ধা বা ধৈর্যটুকু আমাদের ছিল না। কিন্তু সে শ্রদ্ধা আনতেই হবে। শ্রীহরিবাবুর বই পড়ে আরো একটি বইর কথা মনে পড়ল—শ্রীনন্দলাল বসুর ভূমিকা সম্বলিত শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত রবীন্দ্রচিত্রকলা। তাই রবীন্দ্রচিত্রকলা তথা সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে আজকে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে, এবং সে আলোচনা ঠিক পথেই পরিচালিত হচ্ছে, শ্রীহরি-বাবুর অতি ক্ষুদ্র বইটি পড়ে সেই কথাটি বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হলাম।

জীবনটাকে মানুষ কতরকম করেই না আস্বাদন করল! কেউ আকার বাদ দিয়ে নিরাকারের শূন্যতার ধ্যানে বিভোর, আর রবীন্দ্রনাথ বলছেন,...'স্পষ্ট বুঝতে পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা। আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ। ...' রূপের মাহাত্ম্য কীর্তন করে রবীন্দ্রনাথের ভাববিলাসী মন আজ আকারের সাধনায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছে। এই আকারের সাধক রবি-মানসের যে দিকটিকে শ্রীহরিবাবু অল্পের মধ্যে ইঙ্গিত করেছেন, তার জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এবং বিস্তৃত আলোচনা তাঁর কাছে অপেক্ষা করে আমরা বসে থাকলাম।

নিশীথ রাতের [illegible] পথে—শ্রীমতী সুষমা মিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

বইটি শ্রীরাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেবের করকমলে উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

সাধারণতঃ ভ্রমণ কাহিনী মাত্রই পড়তে ভাল লাগে। মানুষ বাস করে সীমার মধ্যে কিন্তু তার বুকের মধ্যেও অসীমের ডাক, আর বাইরের বিশ্বটাও অসীম। তাই বইখানি যখন হাতে নিলাম তখন এর বাইরের সুষ্ঠু অবয়ব দেখে বুঝলাম সেদিক থেকে বলবার কিছু নেই—বহিরঙ্গ যতটা সুন্দর হতে পারে মোটামুটি তা হয়েছে। আর্ট পেপার হওয়াতে ভেতরের ছবিগুলিও বেশ ভালই হয়েছে। ভেতরে পড়তে আরম্ভ করেও ভালই লাগল। তখন প্রীতি লাভ করলাম। এটা সত্য কথা যে, যে-একটা নূতন ও আমাদের থেকে খানিক ভিন্নতর দেশের সম্বন্ধে লেখিকা বলতে আরম্ভ করেছেন, তার সম্বন্ধে এত স্বল্প সংবাদে পাঠকের পরিতৃপ্তি হয় না। তবু যে দেশে ছয়মাস দিন রাত্রি সূর্যের আলো থাকে, আর রাত্রিকালে দিনের আলোর মধ্যেই আবার রাত বারোটায় সূর্যোদয় হয়, সে দেশের কথা পড়তে খুব ভাল লাগছিল বলেই মন বিস্তৃত খবরের প্রয়োজন বোধ করছিল।

বহিঃ প্রকৃতি আমাদের কেন এত ভাল লাগে? বহু বহু বৎসর আগে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে এমন ব্যবধানে তো আমরা ছিলাম না—ওর সঙ্গে ছিল আমাদের গায়ে গায়ে লাগান আত্মীয়তা। সেই আদিম গায়ের গন্ধ আজও বোধ করি যখনই তার সম্পর্কে আসি। তাই তাকে এত ভাল লাগে। সেই ভাল লাগার আস্বাদন পাই আলোচ্য বইটি পড়ে। আর সবাইও পাবেন এটা বুঝতে পারছি। তাই এর বহুল প্রচার কামনা করি।

সাময়িকী

ভূদান যজ্ঞ : ২৭শে মার্চ দিল্লীতে একটী ভূদান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভূদান আন্দোলনকে সর্বজনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে সংসদের বিভিন্ন দলের সদস্যদের লইয়া গঠিত এই সম্মেলনে আচার্য্য বিনোবাভাবের ভূদান আন্দোলনকে সমর্থন করিয়া জনসাধারণকে বিশেষভাবে সংসদ সদস্যগণকে অনুরোধ করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হয় :

'সংসদের উভয় সভার সদস্যদের এই সম্মেলন আচার্য্য ভাবের ভূদান আন্দোলনের প্রগাঢ় প্রশংসা করিতেছে। ভারতের সমাজ ও অর্থনৈতিক জগতে এই আন্দোলন নবযুগের সূচনা করিতেছে। আচার্য্য ভাবে যাহাতে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে তাঁহার লক্ষ্য ২৫ লক্ষ একর জমি সংগ্রহ করিতে পারেন, এজন্য সম্মেলন ঐকান্তিকভাবে এই আশা পোষণ করে যে, জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে সংসদের ও বিভিন্ন আইন সভার সদস্যগণ এই মহান আন্দোলনে কার্যকরীভাবে সাহায্য ও সহায়তা করিবেন।'

এই সম্মেলনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলিয়াছেন, 'দেশে ভূমির প্রশ্নই যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রধান, তাহা সুস্পষ্ট। কংগ্রেস ও অন্যান্য দল প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণও এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন; কিন্তু জনগণের জীবনে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা তাঁহাদের চিন্তার বাহিরে। এইরূপ একটী বিষয়ই হইল আচার্য্য ভাবের আন্দোলন। এই আন্দোলন হৃদয় মন প্রভাবান্বিত করে; কেবল তাহাই নহে, তাঁহার আন্দোলন জনগণের জীবনের অন্যান্য দিকের উপরও প্রভাব বিস্তার করিবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্তৃক ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন প্রশংসিত হইয়াছে। দেশের সমস্যা সমাধান সম্পর্কে এই আন্দোলন যে এক অহিংসা পন্থার সন্ধান দিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু স্বীকার বা প্রশংসা করিলেই যে সকলের দায়িত্বের অবসান হইয়াছে, তাহা মনে করা উচিত নয়। জনগণ যদি মনে করে যে, এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার দায়িত্ব শুধু আচার্য্য ভাবেরই, তাহা হইলে তাহারা ভুল করিবে। এই আন্দোলনের প্রবর্তক অপেক্ষা যে জনগণের দায়িত্ব কোন অংশে ন্যূনতর, তাহা মনে করা ঠিক নহে।'

শ্রীনেহরু আরও বলেন, 'এই আন্দোলন অত্যন্ত উচ্চ আদর্শের পরিবেশের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইয়াছে; তাহা ছাড়া এই আন্দোলন এক বিশেষ বৈপ্লবিক পরিবেশেরও সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা সংঘর্ষ বা হিংসার বিপ্লব নহে; ইহা অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজের রূপ পরিবর্তন করিতে সাহায্য করিতেছে। যে অভিনব পন্থায় এই আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে, তাহা অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণের

ধারণার অতীত। এই আন্দোলনের আবেদন জনগণের হৃদয় মনে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ...ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য কোন কোন দেশে রক্তপাত ঘটিয়াছে। কিন্তু রক্তপাত ব্যতিরেকে শান্তিপূর্ণ অহিংস ও সহযোগিতামূলক উপায়ে যে ভূমি সমস্যার সমাধান করা যায়, তাহা ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন প্রদর্শন করিয়াছে।...ইহা সুস্পষ্ট যে, ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য আইনের প্রয়োজন রহিয়াছে। আচার্য্য ভাবের আন্দোলন যতই সাফল্যমণ্ডিত হউক না কেন, তাহা আইনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগণের দায়িত্ব রহিয়া গিয়াছে। যদি কেহ মনে করেন যে, আচার্য্য ভাবের আন্দোলনের ফলে সরকারের দায়িত্ব হ্রাস পাইয়াছে. তিনি ভুল করিবেন। ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন ভূমি সমস্যা সমাধানের পথে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে. এবং এই সমস্যাকে উপলব্ধি করিতে সহায়তা করে। এই আন্দোলন এমন একটী পরিবেশ সৃষ্টি করে, যাহা ভূমিসমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও দ্বেষ হ্রাস করে।...এই আন্দোলন কোন দলীয় আন্দোলন মনে করা উচিত হইবে না। কংগ্রেস এই আন্দোলনকে গ্রহণ ও সমর্থন করিয়াছে। অন্যান্য দলও এই আন্দোলনকে সমর্থন করিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কংগ্রেস সেবকগণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর কাজ করিয়াছে। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এই আন্দোলনের কার্যে তাঁহার সময় নিয়োগ করিয়াছেন।'

ভারত রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ঐ সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন. 'অনেকে বলিতেছেন যে, জমিদারদিগকে উচ্ছেদ করিতে হইবে এবং কৃষকগণের পক্ষে তাহাদের জমি দখল করা উচিত। ভূমিসমস্যা সমাধানের ইহা একটী উপায় বটে। কিন্তু ভারতের চিরাচরিত রীতি, ভারতের সংবিধান ও গান্ধীজীর আদর্শ উহার বিরোধী। ভূমিসমস্যা সমাধান সম্পর্কে ভারত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছে। আচার্য্য ভাবে যে প্রেমের পদ্ধতি প্রচার করিতেছেন. তাহা গাণতান্ত্রিক পদ্ধতি অপেক্ষাও মহত্তর।'

এই সম্মেলনে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, শ্রীনেহরু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। কনষ্টিটিউসন হলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ সদস্যগণ, সমাজকর্মিগণ ও বহু গঠনকর্মী সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের আহ্বায়কগণ সকল রাজনৈতিক দলের সদস্যাদিগকেই এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্মেলনে প্রধানতঃ কংগ্রেস, প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সদস্যগণ ও কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্য যোগদান করিয়াছিলেন।

ভূদান যজ্ঞ সম্মেলনে যোগদানকারী দলসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে, যাহারা শ্রেণীসংঘর্ষে বিশ্বাসী, তাহারাই এই সম্মেলনে যোগদান করে নাই. করিতে পারে না। এই আন্দোলন যে তাহাদের মাথায় বজ্রপাত তুল্য। এই আন্দোলন সফল হইলে শ্রেণীসংঘর্ষ নীতিই যে অকেজো হইবে, বিশ্ব রাজনীতির মূল ধারাই অহিংসার পথে প্রবাহিত হইবে এবং মহাত্মাজীর ভারতবর্ষ বিশ্ব সভ্যতার মোড়

ফিরাইয়া দিবার পথে সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে। বর্তমান বিশ্বের বর্তমান পদার্থ-বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র দুই-ই এক 'অবিভাষ্য সমগ্রের' (indivisible whole) মহিমা কীর্তনে বিভোর। জেমস জিনস লিখিয়াছেন, 'The division between subject and object is no longer definite or precise; complete precision can only be regained by uniting subject and object in a single whole.' সমগ্র সমাজের দুই দিক্ হইতেছে ভূমিমালিক ও কৃষক। দুই-ই এমনভাবে essentially related যে, কোনও একটীকেই একান্ত ধরিলেই সমাজ হিংসার পথে চূর্ণবিচূর্ণ হইবে, শ্রেণীহীন সমাজ গড়িবার উপযোগী ক্ষেত্রই থাকিবে না। রাশিয়ার যাহা দিবার ছিল তাহা তাহার দেওয়া হইয়া গিয়াছে। ('Zar' -এর অত্যাচারের পট-ভূমিকায় তাহার বিরুদ্ধে শ্রেণীসংঘর্ষের প্রবর্তনেরও প্রয়োজন একদিন ছিল। আজ বিশ্বে এমন কেহ নাই যে, ধনতান্ত্রিকতাকে স্বীকার করে, বা স্বীকার করিতে সাহস পায়। কিন্তু স্বীকার না করুক বা স্বীকার করিতে সাহসই না পাউক, ধনতান্ত্রিকতাকে বর্জন করিবার কোনও ভদ্রজনোচিত অহিংসা পন্থা তো তাহাদের কেহ দিতে পারে নাই। ধনতান্ত্রিকতা যেমন কেহ চায় না, তেমনি রক্তপাতের পথে ধনতান্ত্রিকতা বিলোপও কেহ আজ চায় না। কেননা, রাশিয়া এবং এই সেদিনকার চীন রক্তপাতের বীভৎস সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। আচার্য্য বিনোভাবের ভূদান আন্দোলন এই দিক চাহিয়াই কৃষকদের মধ্যে জমিদারদের অবতরণের পথ খুলিয়া দিতেছে। ধনতান্ত্রিকতার মোহ কাটিয়াছে বটে, কিন্তু ধনতান্ত্রিকতার 'প্রারব্ধ' কাটিতে বেশ সময় লাগিবে। 'প্রেম' যদি এই পরিবেশে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইত, ভারতের সংবিধানও এই দুরূহ কার্যকে সহজসাধ্য করিতে পারিত না। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন তাই ঠিকই বলিয়াছেন যে, 'ভূমিসমস্যা সমাধান সম্পর্কে ভারত গাণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছে। আচার্য্য ভাবে যে 'প্রেমের পদ্ধতি প্রচার করিতেছেন, তাহা গাণতান্ত্রিক পদ্ধতি হইতেও মহত্তর'। প্রেম গণতন্ত্র হইতে ব্যাপকতর ও গভীরতর; কেননা, গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা গণের তন্ত্রের উপর বেশী মূল্য দেয়। পক্ষান্তরে, প্রেম স্বাতন্ত্র্য ও গানতান্ত্রিকতার সমন্বয় বিধানে সক্ষম। প্রেমে মানুষ স্বতন্ত্র থাকিয়াও গণতন্ত্র থাকিতে পারে, গণতন্ত্র থাকিয়াও স্বাতন্ত্র্য আস্বাদন করে।

এই শ্রেণীসংঘর্ষহীন প্রেমের পথেই সত্য বাস্তব শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব যাহা ছিল মহাত্মাজীর আদর্শ। মহাত্মাজীর এই পরিকল্পনা রাশিয়ার শ্রেণী-সংঘর্ষেরও পরের কথা। ভারতবর্ষ তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভূমিসমস্যার সমাধান ক্ষেত্রে ইহা কার্যকারীভাবে পরীক্ষিত হইলে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইহা ছড়াইয়া পড়িবে। ইহাই ভারতবর্ষের সুর; এবং ইহার মধ্যেই ভারতের অন্তরাত্মা নিজকে ফিরিয়া পাইবে। ভারতবর্ষ চোখের সামনে দেখিয়াছে, কেমন করিয়া রাজার কুমার বুদ্ধদেব সকল রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া একদিন সর্বহারাদের মাঝে

তাহাদের বেদনা বুকে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহা ২,০০০ বৎসর পূর্বের ঘটনাই নয়; ইহা যে নিত্য বর্তমান (eternal present)। ভারতবর্ষের কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞের এই বাণীই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিম্নলিখিত ভাষায় উচ্চারিত হইয়াছিলঃ

—সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥

—সৃষ্টির প্রাক্কালে যজ্ঞের সহ সব প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি বলিয়াছিলেন—'এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞই তোমাদের ইষ্টকাম দোহন করিবে।

গীতার চিরপরিচিত এই সুর আবার বিশ্ববাসীর কানে বাজিয়া উঠিল আচার্য্য বিনোবাভাবের আন্দোলনের ভিতর দিয়া। ইহা নিশ্চয়ই কানের ভিতর দিয়া ভারত-বাসীর মর্মে প্রবেশ করিবে, 'ভারতীয় হওয়ার' তাগিদে ও অনুপ্রেরণায় এদেশের ধনী-দরিদ্র, ভূম্যাধিকারী, কৃষক, সরকারী-বেসরকারী সব দলই নিশ্চয়ই ইহাকে সকল প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে, ভারতবর্ষ আবার জগদ্গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রেণীসংঘর্ষের বিভীষিকা হইতে বিশ্ব মুক্ত হইবে। পুরুষোত্তম ভারত বিশ্বকে এই দীক্ষা দিবার জন্যই আজ সগৌরবে দাঁড়াইয়াছে। বন্দেমাতরম্

লোকসেবক-প্রেস—৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞপ্তি

উজ্জ্বলভারত নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র। নরনারায়ণ আশ্রমেস্থিত উজ্জ্বলভারত কার্যালয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাণী 'ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং' কি করিয়া বেদান্তের সহিত সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, তাহারই ভিত্তিতে প্রতি রবিবার বিকাল ৪॥ টায় উজ্জ্বলভারত সম্পাদক কর্তৃক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ হইয়া থাকে।

উজ্জ্বলভারত কার্যালয়
৮৯ রসা রোড সাউথ (একতলা)
কলিকাতা-৩৩

শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব

(শ্রীনিত্যগোপাল)

বিরচিত

১। সিদ্ধান্তদর্শন ২৲
২। ভক্তিযোগদর্শন ৸০
৩। সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার ১॥০
৪। জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন
(বাঁধা) ৩৲
(অবাঁধা) ২॥০
৫। নিত্যগীতি (১ম ভাগ) ১৲
৬। নিত্যগীতি (২য় ভাগ) ও
গীতাবলী ২৲
৭। আশ্রমচতুষ্টয় ১॥০
৮। নিত্যউপাসনাবিধি ।৵০
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও
সাধকসুহৃদ্ ১।০
১০। পূজা ॥৵০
১১। প্রভাবতী (দৃশ্যকাব্য) ১৲
১২। যোগদর্শন ॥৵০
১৩। দিব্যদর্শন ॥৵০
১৪। যবন বৈরাগী ও অপরাধ-
ভঞ্জন (দৃশ্যকাব্য) ॥০
১৫। [illegible]কুসুমমালা ১৲
১৬। বিবিধতত্ত্ব ২৲
১৭। স্তবরত্নাকর ও
কুসুমাঞ্জলী ১৵০
১৮। পদ্যাবলী ২৲
১৯। প্রার্থনাগীতা
১ম ভাগ ॥৵০
২০। ঐ (২য় ও ৩য় ভাগ) ৸০
২১। অধ্যাত্মতত্ত্ববোধ ॥০
২২। সাধনা ও মুক্তি ।৵০
২৩। সিদ্ধান্তসার ।০
২৪। সাধক সহচর ॥০
২৫। পাতঞ্জলদর্শন ও
মণিরত্নমালা ॥০

প্রাপ্তিস্থান :

মহানির্ব্বাণ মঠ

১১৩, রাসবিহারী এভেনিউ

কলিকাতা ২৯

উজ্জ্বলভারত

৬ষ্ঠ বর্ষ | ৫ম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'

রেণু মিত্র

'গোরা আসিয়াই একেবারে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া পরেশকে প্রণাম করিল এবং তাঁহার পায়ের ধুলো লইল। পরেশ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, এস, এস, বাবা, বসো।

গোরা বলিয়া উঠিল, পরেশবাবু, আমার কোন বন্ধন নেই।

পরেশবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, কিসের বন্ধন?

গোরা কহিল, আমি হিন্দু নই।

পরেশবাবু কহিলেন, হিন্দু নও!

গোরা কহিল, না, আমি হিন্দু নই। আজ খবর পেয়েছি আমি মিউটিনির সময়কার কুড়ানো ছেলে—আমার বাপ আইরিশম্যান। ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বার আজ আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে—সমস্ত দেশের মধ্যে কোনো পংক্তিতে কোনো জায়গায় আমার আহারের আসন নেই।

পরেশ ও সুচরিতা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন—পরেশ তাহাকে কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

গোরা কহিল, আমি আজ মুক্ত পরেশবাবু। আমি যে পতিত হব, ব্রাত্য হব সে-ভয় আর আমার নেই—আমাকে আর পদে পদে মাটির দিকে চেয়ে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হবে না।

সুচরিতা গোরার প্রদীপ্ত মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গোরা কহিল, পরেশবাবু, এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি—একটা-না-একটা জায়গায় বেধেছে—সেই সব বাধার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার মিল করবার জন্য সমস্ত জীবন দিনরাত কেবলই চেষ্টা করে এসেছি—এই শ্রদ্ধার ভিত্তিকেই খুব পাকা করে তোলবার চেষ্টায় আমি আর কোনো কাজই করতে পারিনি—এই আমার একটিমাত্র সাধনা ছিল। সেইজন্যই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রতি সত্যদৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে গিয়ে আমি বার বার ভয়ে ফিরে এসেছি—আমি একটি নিষ্কণ্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্যে এতদিন আমার চারদিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি। আজ এক মুহূর্তেই আমার সেই ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেছে। আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখদুঃখ জ্ঞান-অজ্ঞান একেবারেই আমার

বুকের কাছে এসে পৌঁছেছে—আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি—সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে—সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়—সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্র।

...গোরা কহিল, আমার কথা কি আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন? আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দুমুসলমানখৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন। দেখুন, আমি বাংলার অনেক জেলায় ভ্রমণ করেছি, খুব নীচ পল্লীতেও আতিথ্য নিয়েছি—আমি কেবল শহরের সভায় বক্তৃতা করেছি তা মনে করবেন না কিন্তু কোনোমতেই সকল লোকের পাশে গিয়ে বসতে পারিনি—এতদিন আমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদৃশ্য ব্যবধান নিয়ে ঘুরেছি, কিছুতেই সেটাকে পেরতে পারিনি। সেজন্য আমার মনের ভিতরে খুব একটা শূন্যতা ছিল। এই শূন্যতাকে নানা উপায়ে কেবলই অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছি—এই শূন্যতার উপরে নানাপ্রকার কারুকার্য দিয়ে তাকেই আরও বিশেষরূপ সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করেছি। কেননা ভারতবর্ষকে আমি যে প্রাণের সঙ্গে ভালোবাসি—আমি তাকে যে অংশটিতে দেখতে পেতুম সে-অংশের কোথাও যে আমি কিছুমাত্র অভিযোগের অবকাশ একেবারে সহ্য করতে পারতুম না। আজ সেই সমস্ত কারুকার্য বানাবার বৃথা চেষ্টা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি পরেশবাবু।

...তিনি (ভগবান) যে এমন করে আমার অশুচিতাকে একেবারে সমূলে ঘুচিয়ে দেবেন তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার ভয় রইল না।'

পরেশবাবুকে এর পরে গোরা বললে, 'আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না। যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।'

—সমাজ জীবনের যে নিগূঢ়তম প্রয়োজনে সেদিন রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মা ভারতবর্ষের এই দেবতাকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন, সে দেবতা কোথায়? রবীন্দ্রনাথ কি তাঁকে খুঁজে পেয়ে সমাজ জীবনে তাঁকে পাওয়ার পথের নিশানা দিয়ে গিয়েছিলেন? তাঁকে যে আমরা আজও চাইছি।

হিন্দু গোরা যে ভারতবর্ষকে চেয়েছিল তার সে 'নিষ্কণ্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ' বাস্তবে কোথায়? গোরা নিজেও তার ভাবের ভারতবর্ষের সঙ্গে বাস্তবের ভারতবর্ষকে মেলাতে পারেনি। তার ভাবের ভারতবর্ষকে রক্ষা করবার চেষ্টায়, বাস্তবের সঙ্গে ভাবের মিল বজায় রেখে তার শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টায় সে প্রাণপণ করেছে। কিন্তু বাস্তব ভারতবর্ষের

মন্দিরের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়, চণ্ডালের ঘরেও জাত যায় না, গোরার চাওয়ার ভারতবর্ষের জাত এত শক্ত নয়, সে ভারতবর্ষের চিত্ত এমন উদার নয় যেখানে ব্রাত্য হবার, পতিত হবার কোন ভয় নেই। গোরার সেই ভাবের ভারতবর্ষে প্রতি মুহূর্তেই ভয়,—এই বুঝি পতিত হলাম, এই বুঝি ব্রাত্য হলাম, পদে পদে মাটির দিকে চেয়ে এখানে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হয়।

গোরার অন্তর এই ভারতবর্ষকেই লক্ষ্য করেনি—তার অন্তরের অন্তরে ভারতবর্ষের সেই বিরাট রূপেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু বাইরের থেকে যাকে সে আশ্রয় করেছিল তার রূপ বীভৎস বলা যেতে পারে,—সে শুধু বিভেদের উৎস। সেখানে দাঁড়িয়ে গোরাকে বলতে হয় তার মাকে, '...তোমার ওই খৃষ্টান দাসী লছমিয়াটাকে না বিদায় করে দিলে তোমার ঘরে খাওয়া চলবে না।' আচারবিচারহীন তার মা আনন্দময়ীর ঘরে গোরা নিজেও খেত না, বন্ধু বিনয়ের খাওয়াকেও জোর করেই ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে। খৃষ্টান দাসী লছমিয়াকে বিদায় দেবার কথায় আনন্দময়ী বললেন, 'ওরে গোরা; অমন কথা তুই মুখে আনিস নে। চিরদিন ওর হাতে তুই খেয়েছিস—ও তোকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে।...ছোটো-বেলায় তোর যখন বসন্ত হয়েছিল লছমিয়া যে করে তোকে বাঁচিয়েছে সে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।'

গোরা উত্তরে বলে, 'ওকে পেনশন দাও, জমি কিনে দাও, ঘর করে দাও, যা খুশি করো, কিন্তু ওকে রাখা চলবে না মা।

আনন্দময়ী, গোরা তুই মনে করিস টাকা দিলেই সব ঋণ শোধ হয়ে যায়। ও জমিও চায় না, বাড়িও চায় না, তোকে না দেখতে পেলে ও মরে যাবে।

গোরা, তবে তোমার খুশী ওকে রাখো। কিন্তু বিনু তোমার ঘরে খেতে পাবেনা। যা নিয়ম তা মানতেই হবে, কিছুতেই তার অন্যথা হতে পারে না।'

কিন্তু কেন, লছমিয়া তোমাকে সন্তানের মত স্নেহ করে, তার মাতৃহৃদয় তোমার দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়—সে চরিত্রহীন খারাপ লোক নয়, শুধু ভিন্ন জাত বলেই তার হাতে তুমি খেতে পাবে না—এ ব্যবস্থা কেন? এ তো মানুষের সমাজের ব্যবস্থা নয়। অথচ এই হিন্দুত্বকে রক্ষা করতে গোরা প্রাণপণ করেছে।

বন্ধু বিনয় এটাকে বাড়াবাড়ি হচ্ছে বলাতে গোরা বললে, 'একচুল বাড়াবাড়ি নয়। যেখানে যার সীমা আমি সেইটে ঠিক রক্ষে করে চলতে চাই। কোনো ছুতোয় সূচ্যগ্রভূমি ছাড়তে আরম্ভ করলে শেষকালে কিছুই বাকি থাকে না।'

কিন্তু গোরা জানে না যে, জোর করে বেঁধে রেখে শেষ রক্ষা করা যায় না। সমাজকে রক্ষা করবার পথ তাকে বেঁধে রাখা নয়।

এই জাত বিচারে মনুষ্যত্ব যে খর্ব হয় তা গোরার প্রাণেও একদিন ধরা পড়েছিল। সুচরিতার অস্তিত্ব যখন গোরার প্রাণে প্রথম স্পন্দন জাগিয়ে তুললো, তখন নিজেকে গোরা দূরে সরিয়ে নিলে—কেননা ওটাকে সে তখন পাপ বলে মনে করত।

সে যাই হোক, ভ্রমণে বেরিয়ে এক গ্রামে এক নাপিতের ওখানে গিয়ে সমাজের ওপর নীলকুঠির সাহেবের অত্যাচার স্বদেশের মানুষের হাত দিয়ে কি নিদারুণ হয়ে পড়ছে, তার কাহিনী শুনে মানুষ গোরার প্রাণ স্তব্ধ হয়ে গেল। এর পরেই নিজেদের খাওয়ার প্রশ্ন যখন উঠল তখন দেখা গেল, জাত বিচারে ঐ দরদী নাপিতের ঘরে গোরার অন্নগ্রহণ চলে না, তাদের দুর্বৃত্ত অন্যায়কারী মাধব চটুজ্জের অন্ন খেয়ে জাত বাঁচাতে হবে, তখন সে চিন্তা 'তাহার অসহ্য বোধ হইল। তাহার মুখ-চোখ লাল ও মাথা গরম হইয়া মনের মধ্যে বিষম একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিষ করিয়া ভুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কি ভয়ংকর অধর্ম করিতেছি। উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে-লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে! যাই হউক, এই আচার-বিচারের ভালোমন্দের কথা পরে ভাবিব কিন্তু এখন তো পারিলাম না।'

এই যে খাওয়াদাওয়ার শুচিতা রক্ষা করবার ব্যবস্থা—এতে কি আমাদের জীবনকে উদার করেছে না সঙ্কুচিত করতে করতে কোণঠেঁসা করে দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে?

গোরা ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিল। এইটেই গোরার জীবনের সৌন্দর্য, এই-খানেই ব্যক্তিগত জীবনের সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে তার জীবনে বিশ্বজনীনতার অবকাশ প্রবেশ করে তাকে মহত্তর করেছিল। কিন্তু সেই ভারতবর্ষের যে রূপকে সে যে-ভাবে আকড়ে ধরছিল, সেইখানে ছিল তার ভুল। সে বললে, 'যে-দেশে জন্মিয়াছি সে-দেশের আচার, বিশ্বাস, শাস্ত্র ও সমাজের জন্য পরের ও নিজের কাছে কিছুমাত্র সংকুচিত হইয়া থাকিব না। দেশের যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব।' বিলেতের আদর্শের সঙ্গে খুটে খুটে মেলালে আমাদের দেশের আদর্শ যদি না মেলে, তাতে লজ্জা না পাওয়া ভাল। কিন্তু দেশের যা কিছু বলতে কি বোঝায়? গোরার সেই যা-কিছুর মধ্যে আনন্দময়ীর স্থান হয় নি, কেননা আনন্দময়ীর ঘরে সে খেতে পারে না—লছমিয়াকে বাদ দিতে হয়, তার ভারতবর্ষে পরেশবাবু, সুচরিতার স্থান হয় নি, এবং শেষে অকৃত্রিম বন্ধু বিনয়ও বাদ পড়ে গেল। এমনি করে সবাই যদি বাদই গেল, তবে সে ভারতবর্ষ কাদের নিয়ে? আমরা সভ্য কি অসভ্য তা নিয়ে জবাবদিহি করতে যেমন ভাল লাগে না, তেমনি খানিকটা করতেও হয় বৈকি। বিশ্বের মধ্যে যখন বাস করি তখন আমি কি, আমি কেমন করে চলি, বিশ্বের অপর একজনের সঙ্গে আমার ব্যবহার কি রকম, এ নিয়ে খানিকটা কৈফিয়ৎ অপরের কাছে আমার আছে বৈকি। আমি আমার দেশের লোকের হাতে জল খাব না—আর বলব এ-ই আমার দেশীয় ব্যবস্থা-এর ওপরে তোমার কোন বক্তব্য নেই—এ কথা আর আজ মেনে

দেওয়া চলবে না।

গোরা অত্যন্ত হিন্দু হয়ে উঠছে দেখে তার পিতা কৃষ্ণদয়ালের ভারী দুশ্চিন্তা হয়েছে। খৃষ্টান রক্ত যার ধমনীতে, সে হিন্দু হবে কি করে—এই দুর্ভাবনায় কৃষ্ণদয়াল বলছেন, 'হিন্দু বললেই হিন্দু হওয়া যায় না। মুসলমান হওয়া সোজা, খৃষ্টান যে-সে হতে পারে—কিন্তু হিন্দু বাপরে! ও বড়ো শক্ত কথা।'

হিন্দু হওয়া শক্ত কথা—এটা যাদের কাছে আজও গর্বের কথা তাদের বলবার বা বোঝাবার সামর্থ্য কারো নেই। সুচরিতা বলেছিল পরেশবাবুকে, 'বাবা, আমি যে আমার দেশ থেকে জাত থেকে বিচ্ছিন্ন একজন ক্ষুদ্র মানুষ এমন কথা আমি কেন বলব? আমি কেন বলতে পারব না আমি হিন্দু?

পরেশ হাসিয়া কহিলেন, অর্থাৎ মা, তুমি আমাকেই জিজ্ঞেস করছ আমি কেন নিজেকে হিন্দু বলি নে? ভেবে দেখতে গেলে তার যে খুব গুরুতর কোনো কারণ আছে, তা নয়। একটা কারণ হচ্ছে, হিন্দুরা আমাকে হিন্দু বলে স্বীকার করে না, আর একটা কারণ, যাদের সঙ্গে আমার ধর্মমতে মেলে তারা নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয় না।' সুচরিতা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। পরেশ কহিলেন, 'আমি তো তোমাকে বলেইছি এগুলি গুরুতর কারণ নয়, এগুলি বাহ্য কারণ মাত্র। এ বাধাগুলোকে না মানলেও চলে। কিন্তু ভিতরের একটা গভীর কারণ আছে। হিন্দু সমাজে প্রবেশের কোনো পথ নেই। অন্ততঃ সদর রাস্তা নেই, খিড়কির দরজা থাকতেও পারে। এ সমাজ সমস্ত মানুষের সমাজ নয়—দৈববশে যারা হিন্দু হয়ে জন্মাবে—এ সমাজ কেবলমাত্র তাদের।

সুচরিতা কহিল, সব সমাজই তো তাই।

পরেশ কহিলেন, না কোনো বড়ো সমাজই তা নয়। মুসলমান সমাজের সিংহদ্বার সমস্ত মানুষের জন্য উদ্ঘাটিত—খৃষ্টান সমাজও সকলকেই আহ্বান করছে। যে-সকল সমাজ খৃষ্টান সমাজের অঙ্গ তাদের মধ্যেও সেই বিধি। যদি আমি ইংরেজ হতে চাই তবে সে একেবারে অসম্ভব নয়—ইংলণ্ডে বাস করে আমি নিয়ম পালন করে চললে ইংরেজসমাজভুক্ত হতে পারি—এমন কি সেজন্যে, আমার খৃষ্টান হবারও দরকার নেই। অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে জানত, বেরতে জানতো না—হিন্দু ঠিক তার উলটো। তার সমাজে প্রবেশ করবার পথ একেবারে বন্ধ, বেরোবার পথ শত সহস্র।

সুচরিতা কহিল, তবু তো, বাবা, এতদিনেও হিন্দুর ক্ষয় হয় নি—সে তো টিঁকে আছে।

পরেশ কহিলেন, সমাজের ক্ষয় বুঝতে সময় লাগে। ইতিপূর্বে হিন্দুসমাজের খিড়কির দরজা খোলা ছিল। তখন এদেশের অনার্য জাতি হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে একটা গৌরব বোধ করত। এদিকে মুসলমানের আমলে দেশের প্রায় সর্বত্রই হিন্দু রাজা ও জমিদারের প্রভাব যথেষ্ট ছিল; এইজন্যে সমাজ থেকে কারও

সহজে বেরিয়ে যাবার বিরুদ্ধে শাসন ও বাধার সীমা ছিল না। এখন ইংরেজ অধিকারে সকলকেই আইনের দ্বারা রক্ষা করছে, সে রকম কৃত্রিম উপায়ে সমাজের দ্বার আগলে থাকবার জো এখন আর তেমন নেই—সেইজন্য কিছুকাল থেকে কেবলই দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে—এ-রকমভাবে চললে ক্রমে এদেশ মুসলমানপ্রধান হয়ে উঠবে—তখন একে হিন্দুস্থান বলাই অন্যায় হবে।'

রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ-বাণী চল্লিশ বৎসর পরে যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল, তার আলোচনা স্থগিত রেখে গোরাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই হিন্দুর ভারতবর্ষকে সে কি করে পারে? যে ভারতবর্ষ তার ধ্যানের বস্তু সে কি এই ভারতবর্ষ? কখনোই নয়। কিন্তু সেই ধ্যানের বস্তুকে পেতে গোরা যে পথকে অবলম্বন করেছিল, সেই পথেই ছিল ভুল। হিন্দুর রক্ষা পাওয়ার পথের আভাস দিচ্ছেন পরেশবাবু,—'...রক্ষা পাবার জন্য একটা জাগতিক নিয়ম আছে—সেই স্বভাবের নিয়মকে যে পরিত্যাগ করে, সকলেই তাকে স্বভাবতঃই পরিত্যাগ করে। হিন্দুসমাজ মানুষকে অপমান করে' বর্জন করে; এইজন্যে এখনকার দিনে আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠছে। কেননা, এখন তো আর সে আড়ালে বসে থাকতে পারবে না—এখন পৃথিবীর চারদিকের রাস্তা খুলে গেছে, চারদিক থেকে মানুষ তার উপরে এসে পড়ছে—এখন শাস্ত্র সংহিতা দিয়ে বাঁধ বেঁধে প্রাচীর তুলে সে আপনাকে সকলের সংস্রব থেকে কোনমতে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হিন্দু সমাজ এখনো যদি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার শক্তি না জাগায়, ক্ষয় রোগকেই প্রশ্রয় দেয়, তাহলে বাহিরের মানুষের এই অবাধ সংস্রব তার পক্ষে একটা সাংঘাতিক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।'

এই যে-নিদারুণ সত্য কথাটি পাকিস্থানকে জন্ম দিয়েছে—তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবহিত হতে পেরেছিলেন; গোরা উপন্যাসের জন্ম সেই অবহিতির। সমস্ত উপন্যাসটির মধ্যে এই কথাটিই প্রমাণিত হয়েছে যে, যে-ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে সুদীর্ঘ কালের বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা মিলিত হয়েছে, সেই ভারতবর্ষকেও সমগ্রভাবে পাওয়ার পথ প্রচলিত হিন্দুত্ব এমন নিদারুণভাবে রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে কোন নূতন, স্বাধীন ও ব্যাপক চিন্তাসম্পন্ন মানুষের স্থান নেই। গোরা ভারতবর্ষকে চেয়েছিল। প্রথমে যখন সে হিন্দুত্বের যে সকল সংস্কার ব্যাপকতাকে রোধ করে দাঁড়ায় সেগুলিকে মানতে পারতো না, তখনও সে ভারতবর্ষকেই চেয়েছিল। আবার যখন উলটে গিয়ে ঠিক করল যা কিছু নিজের তাকেই আকড়ে ধরে তাকে রক্ষা করব, তখনও সে ভারতবর্ষকেই চেয়েছিল। প্রচলিত হিন্দুত্ব-বোধের সঙ্গে নিজেকে সে এমন করে একীভূত করে ফেলেছিল যে, তার নির্দিষ্ট পথে চলে সে যে তার স্বপ্নের ভারতবর্ষকে পেতে পারে না—এ বোধও তার লোপ পেয়ে গিয়েছিল। অথচ প্রতি পদে বাধা সে পাচ্ছিল।

একটা প্রকাণ্ড অসঙ্গতি সুদীর্ঘ কাল থেকে আমাদের সমাজে ও দর্শনে চলে

আসছে। একদিকে ব্যাপকতর জীবনবোধকে প্রচলিত হিন্দুত্ব-বোধ বাধা দিচ্ছে, যারই জন্য পরেশবাবুকে বলতে হল, হিন্দু সমাজ মানুষকে অপমান করে' বর্জন করে, এইজন্যে এখনকার দিনে আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠছে। যারই জন্যে হিন্দু গোরা খৃস্টানী দাসী লছমিয়ার হাতে জল খেতে পারে না, ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করতে গেলে বিনয়কে সমাজচ্যুত হতে হয়। মানুষের পরিচয় মানুষ হিসেবে না থেকে জাতের বিচারেই তার পরিচয় হয়েছে, তাইতে হৃদয়বান দরদী নাপিতের ঘরে খেলে গোরার জাত যায় অথচ অত্যাচারী দুর্দান্ত মাধব চাটুজ্জের বাড়ী খেয়ে তাকে জাত রক্ষা করতে হয়। আর সর্বশেষে যারই জন্যে হিন্দুর রক্ত গোরার দেহে নেই বলে দীর্ঘ কাল হিন্দুত্বের সাধনা করে এসেও গোরা হিন্দু হতে পারল না!

এই হচ্ছে প্রচলিত হিন্দুত্ব, প্রচলিত হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থা। এই যেমন একদিক আর একদিকে ভাবনার ক্ষেত্রে, দর্শনের ক্ষেত্রে তার চিন্তার ব্যাপকতা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যে কোন সভ্যতার থেকে মহত্তর। এরই জন্যে গোরার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছিলেন, 'অন্যান্য দেশে ঈশ্বরকে ন্যূনাধিক পরিমাণে কোনো একটি মাত্র বিশেষের মধ্যে বাঁধতে চেষ্টা করেছে—ভারতবর্ষেও ঈশ্বরকে বিশেষের মধ্যে দেখবার চেষ্টা আছে বটে কিন্তু সেই বিশেষকেই ভারতবর্ষ একমাত্র ও চূড়ান্ত বলে গণ্য করে না। ঈশ্বর যে সেই বিশেষকেও অনন্তগুণে অতিক্রম করে আছেন এ কথা ভারতবর্ষের কোন ভক্ত কোনদিন অস্বীকার করেন না।...ধর্মের স্থূল ও সূক্ষ্ম, অন্তর ও বাহির, শরীর ও আত্মা এই দুটো অংগকেই ভারতবর্ষ পূর্ণভাবে স্বীকার করতে চায়......। কিন্তু যিনি রূপেও সত্য অরূপেও সত্য, স্থূলেও সত্য, সূক্ষ্মেও সত্য, ধ্যানেও সত্য প্রত্যক্ষেও সত্য, তাঁকে ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে দেহে মনে কর্মে উপলব্ধি করবার যে আশ্চর্য, বিচিত্র ও প্রকাণ্ড চেষ্টা করেছে তাকে আমরা মূঢ়ের মত অশ্রদ্ধা করে য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর নাস্তিকতায়-আস্তিকতায় মিশ্রিত একটা সংকীর্ণ নীরস অংগহীন ধর্মকেই একমাত্র ধর্ম বলে গ্রহণ করব—এ হ'তেই পারে না।'

—এই যে অসংগতি দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে—সমাজ জীবনে ক্ষুদ্রতা আর ভাবনার জগতে বিরাটত্বের কল্পনা—এ অসংগতি আজও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হতে পারে নি—তাহলে যে-চিন্তাধারা সমাজ ব্যবস্থাকে এমন কুণো করে ফেলেছে, নিজের বুকের থেকে মানুষকে বের করে দিয়েছে, দিচ্ছে, তাকে পরিবর্তন করে নেবার জন্য সমাজপতিদের মধ্যে আন্দোলন দেখা দিত। সেদিক থেকে আজ পর্যন্ত কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ এ প্রশ্ন করে তাকে ব্যাপক আন্দোলনে পরিণত করতে পারছে না যে, কেন আমার ঘরের থেকে লোক বেরিয়ে যাবে, কেন যে বেরিয়ে গেছে তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারব না, কেন বেরোবার পথই শুধু খোলা, ঢোকবার পথ একেবারে চিরঅর্গলবন্ধ? ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর সমাজের ক্ষেত্রের

এই অসাম্যই রবীন্দ্রনাথকে 'গোরা'র মধ্য দিয়ে সমস্ত সমস্যাটাকে খুলে দেখাতে প্রণোদিত করেছিল। সর্ব সংস্কারবর্জিত একটি স্বাধীন মুক্ত জীবনপ্রবাহ যে ভারতীয় সমস্ত অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসের অন্তরালে ঢাকা পড়ে আছে, সেই মুক্ত জীবনধারাটিকে খুঁজে বের করবার প্রেরণা নিয়েই গোরার কাহিনী রচিত। 'গোরা' প্রশ্ন করল, হিন্দুত্বের এমন কোনো একটি সর্বভারতীয় মূর্তি কল্পনা করা যায় কিনা যেখানে খৃস্টিনী লছমিয়ার স্থান আছে, স্বীকৃতি আছে, আপন জন বলে আদর আছে, যেখানে খৃস্টান গোরাকে লালনপালন করেছে বলে আনন্দময়ীকে হিন্দুত্বের বাইরে যেতে হয় না, তার ঘরে ছেলেদের খাওয়া বন্ধ হয় না, যেখানে ব্রাহ্মপরিবারে কিংবা যে-কোন ধর্মাবলম্বীর পরিবারের—যারা ভদ্র রুচি ও কৃষ্টি সমন্বিত—মেয়েকে বিয়ে করতে গেলে হিন্দুত্ব হতে চ্যুত হতে হয় না, মুসলমানের ছেলেকে সন্তানবৎ পালন করে বলে যেখানে নাপিতের জাত যায় না, খৃস্টান রক্ত হলেও এতদিনের আচরণ ও প্রীতি নিয়েও গোরার হিন্দু হওয়ায় বাধা হয় না? অর্থাৎ এমন কোন সর্বভারতীয় ব্যাপক হিন্দুত্ব কি নেই, এমন কোন শুচিতা কি নেই—যেখানে চণ্ডালের ঘরেও আর অপবিত্রতার ভয় থাকে না, পদে পদে যেখানে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হয় না? ভারতের অন্তরাত্মা সেই হিন্দুত্বকে খুঁজে বের করতে চায়। রবীন্দ্রনাথের গোরা এই প্রশ্নকে তুলে দিয়ে গেছে। —চলবে।

"নিবেদিতা বলিতেছেন, 'হিন্দুধর্ম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মই পরিবর্তনমুখে এতটা আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। বিভিন্ন যুগে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম অথবা সংস্কৃতি হিন্দুধর্মের সম্মুখে আসিয়াছে, হিন্দুধর্ম সেগুলিকে অংগীভূত করিয়া নিজের শক্তির পরিচয় দিয়াছে।'—ইহা একটি অভিনব ব্যাখ্যা সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষতঃ পূর্ববংগে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুধর্ম এবং ক্রমবর্ধমান মুসলমান ধর্ম এ ব্যাখ্যার সমর্থনে সাক্ষ্য দেয় না।

নিবেদিতা বলিতেছেন, 'আত্মরক্ষাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ নয়। অপরকেও আমরা এখন convert করিব।' আক্রমণশীল হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে গিয়া ভগিনী নিবেদিতা একটু বেশী দূরে গিয়া পড়িয়াছেন। আমরা হিন্দু, অন্য ধর্মাবলম্বীকে convert করিয়া আনিয়া হিন্দুসমাজে স্থান দিতে আমরা পারি না। আমরা অন্য ধর্ম দ্বারা converted হইতে পারি এবং হইয়াও আসিয়াছি। ভারতবর্ষের মুসলমান যুগের ইতিহাস তাহার প্রমাণ। ভগিনী নিবেদিতাও হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকেও হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া লইতে পারি নাই। হিন্দুধর্ম জাতিগত (ethinc) ধর্ম। যে জন্মে হিন্দু নয়, তাহাকে এই ধর্মে আনিয়া সমাজভুক্ত করা যায় না। ইহা ethnic ধর্মের বিশেষত্ব। পরন্তু মতের (creed) ধর্মে পৃথিবীর যে-কোনো ধর্মের মানুষকে ঐ ধর্মের সমাজভুক্ত করা যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান বা মুসলমান হইতে পারে; কিন্তু মুসলমান খৃস্টান বা বৌদ্ধ হিন্দু হইতে পারে না।"

—শ্রীগিরিজাশংকর রায়চৌধুরী লিখিত বৈশাখ, ১৩৬০ সালের 'জয়শ্রীতে' প্রকাশিত 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

আজকের ছেলেরা

শান্তশীল দাশ

আজকের দিনের ছেলেদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠছেঃ 'তারা বকে গেছে', 'বয়ে গেছে', 'একেবারে গোল্লায় গেছে', ইত্যাদি। অভিযোগ মিথ্যে নয়, পথে ঘাটে তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিদিন। তাদের মধ্যে নেই কিশোর জনোচিত সারল্য, ছাত্র জনোচিত শ্রদ্ধা। সকলের মধ্যেই যে নেই, তা' নয়; তবে বেশীর ভাগ কিশোরদের মধ্যেই কিশোর জনোচিত সৌন্দর্যের অভাব।

ছাত্র জীবনে, কিশোর জীবনে এই যে উচ্ছৃংখলতা, অশোভন ব্যবহার, একি একদিনেই গড়ে উঠেছে? যদি না হয়, তবে কেন এ অবস্থা হ'ল? কেবলমাত্র তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থেমে গেলেই তো চলবে না; প্রতিকারের চেষ্টাও তো করতে হবে। আজকের যারা কিশোর, কাল হবে তারা যুবক; তাদের ওপর পড়বে নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার। কিন্তু সে ভার বহনের যোগ্যতা যদি তারা অর্জন না করে, তাহ'লে অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত কাজ সুশৃংখলার সংগে সম্পন্ন হবে না। দেশের অগ্রগতির পথও রুদ্ধ হবে।

প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থার সংগে আজকের শিক্ষাব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নেই। তখন ছাত্রেরা গুরুগৃহে গিয়ে দীর্ঘকাল আদর্শ গুরুর সংস্পর্শে এসে শিক্ষা লাভ করতো। শিক্ষা শেষে সহজ সরল জীবন যাপনের উপযোগী জ্ঞান ও সেবা নিয়ে ফিরে এসে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করতো। আজ আমরা সে-জীবনের কথা ভাবতে পারি না। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে জীবন ধারার বহু পরিবর্তন ঘটেছে। জীবনের জটিলতা অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। সুতরাং সে জীবনে ফিরে যাওয়া আজ অসম্ভব।

আজকের সমাজ, আজকের রাষ্ট্র, আজকের শিক্ষাব্যবস্থা, সবই ভিন্ন রকমের। এরই মাঝে আমাদের চলা, এরই মাঝে আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি। এই পরিবেশের মধ্যে বাস করে আমাদের ছেলেরা কেন উচ্ছৃংখল হয়ে উঠছে, এ কথা সত্যই ভাববার বিষয়।

মানুষের শিক্ষা সুরু হয় প্রথমে গৃহে, তারপর বিদ্যালয়ে, পরে বৃহত্তর শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিবেশে। আজকের দিনে ছেলেরা গৃহশিক্ষা কতটুকু পাচ্ছে, তা' আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা জীবন গঠনের উপযোগী কিছু পায় না। অধিকাংশ অভিভাবক তাঁর পুত্র-কন্যাদের প্রতি উদাসীন। উদাসীনতা যে একেবারে স্বেচ্ছাকৃত তা' ঠিক বলা যায় না। কারণ অর্থনৈতিক কারণে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা এত বেশী বিধ্বস্ত

যে পুত্রকন্যাদের প্রতি মনোযোগ দেবার সময় সত্যই খুব বেশী মেলে না। যে-টুকু মেলে সে-টুকুও কাজে লাগে না। ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে, আর সামর্থ্য থাকলে একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেই দায়িত্ব শেষ করেন অধিকাংশ অভিভাবক। অর্থের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না অনেকেই। কেউ কেউ বা তাদের পুত্রকন্যাদের মংগলের প্রতি এত বেশী মনোযোগী যে তারা ভয়ে অভিভাবকদের কাছে সত্য কথা বলতে সুযোগ ও সাহস পায় না, দিনের পর দিন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অকারণ শাসনের হাত থেকে রেহাই পেতে গিয়ে অন্যায়ের ভিত্তির ওপর জীবনের কাঠামো গড়ে তুলছে। আজকের দিনের গৃহশিক্ষার এই দুর্দশা।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার কথা বলতে গেলে অনেক অপ্রিয় কথা বলতে হয়। জীবনযুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করে এবং পদে পদে পরাজিত হয়ে অধিকাংশ শিক্ষক আদর্শচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছেন, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। শিক্ষক জীবনের দীনতার দিকে তাকিয়ে, তাঁদের জীবনধারার অস্বচ্ছলতা ছাত্রদের মনে শ্রদ্ধা জাগায় না। জীবনধারা ও শিক্ষার অসমতা ছাত্রদের জীবনে রেখাপাত করে না। বেত্রের আস্ফালনেও শিক্ষা দেওয়া যায় না। তরুণ মন স্নেহ ভালবাসার কাঙাল। স্নেহ-ভালবাসার মাধ্যমে আদর্শ জীবনধারার সংস্পর্শে সত্যকার শিক্ষা তরুণ জীবনে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত তারা ঘরে এবং বাইরে। ঘরের শিক্ষা ও পরিবেশ তাদের কচি মনকে গড়ে তোলার সহায়তা করে না, এবং বাহিরের নীরস ও আন্তরিকতাশূন্য পরিবেশও তাদের চরিত্র গঠনে অনুকূল নয়। অশ্রদ্ধা ও অনাদরের মধ্যে যে-জীবন গড়ে ওঠে, তা' সুন্দর হতে পারে না। আজকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগে কোন আদর্শের সম্পর্ক নেই, আছে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি কর্তৃপক্ষের আর তথাকথিত রাজনীতি। এখানে মন গড়ে ওঠে না। ক্রমাগত অভাবের সংগে যুদ্ধ করতে করতে শিক্ষক জীবন থেকে সুকুমার বৃত্তিগুলির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নীরস পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যাবার সময় এবং মনোবৃত্তি দুই তাদের নেই। ক্লান্ত ও পরাজিত হয়ে অনেক সুশিক্ষক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরে গেছেন অত্যন্ত দুঃখে, অত্যন্ত অনিচ্ছার সংগে। তাঁদের স্থান পূরণ করতে যাঁরা আসছেন এবং এসেছেন তাঁদের অনেকের মধ্যেই নেই সত্যকার শিক্ষকজনোচিত মনোবৃত্তি, যা কিশোর জীবনকে এগিয়ে দিতে পারবে সুন্দরের পথে, সমৃদ্ধির পথে।

পাঠ্যপুস্তকের তালিকা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। সেগুলো পাঠ করে, মুখস্ত করে পাশ করা যায়, কিন্তু সত্যিকার মনুষ্য চরিত্র গঠন হয় না। চরিত্র গঠনের মালমসলা নেই সে শিক্ষায়। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠছেন, তাঁরা কতটুকু মনুষ্যত্ব অর্জন করছেন, সে বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এবং অত্যন্ত দুঃখের সংগেই স্বীকার করতে হচ্ছে যে তথাকথিত শিক্ষিত জীবনের মধ্যেই বাসা বেঁধেছে অন্যায়, অসত্য আর অনাচার সব চেয়ে বেশী

পরিমাণে। অর্থনৈতিক অভাব যেখানে প্রবল সেখানে অনেক সময় অভাবের হাত থেকে বাঁচার জন্যে অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হচ্ছে, এ সত্যকে স্বীকার করেও বলতে হচ্ছে জীবনের বিকৃতির কারণ একমাত্র আর্থিক অনটন নয়, কারণ প্রাচুর্যের মধ্যেও রয়েছে অন্যায় লিপ্সা।

ব্যষ্টি জীবন যেখানে বিকৃত, সেই ব্যষ্টির সমন্বয়ে গঠিত যে সমাজ ও রাষ্ট্র, তা' সুন্দর হবে কেমন করে? চতুর্দিকের বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে যে-জীবন গড়ে উঠছে, সে-জীবনও তাই সুন্দর হয়ে উঠছে না। সৎ-অসৎ যে-কোন উপায়ে কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে পারলেই আজকের মানুষ সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে,—অথচ তাদের জীবনধারা সহজও নয় সুন্দরও নয়। আদর্শভ্রষ্ট এই অশোভন ও অনাচারী জীবনের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে যে দু'একটি মানুষ বাঁচার চেষ্টা করছে, তাদের জীবনাদর্শকে দূর থেকে বাহবা দিচ্ছে সমাজ, রাষ্ট্র, কিন্তু তাঁদের বাঁচার ব্যবস্থা করছে না; তাঁদের জীবনধারাকে গ্রহণ করার মতো আগ্রহও কারও নেই। অন্যায় করে, অশুচি জীবন যাপন করে যে-সমাজে, যে-রাষ্ট্রে মাথা তুলে দাঁড়ান যায়, আর সত্য-ন্যায়কে গ্রহণ করে যেখানে তিলে তিলে প্রাণ দিতে হয়, সেখানে ভাবীকাল যদি বিপথগামী হয়, তবে দায়ী করবো কাকে? শুধু অভিযোগ করে, আর দোষারোপ করে দূরে চলে গেলে চলবে কেন?

আজকের কিশোর দল যদি প্রশ্ন করে—তোমরা আমাদের কী দিয়েছ? কোন্ আদর্শ আমাদের সামনে রেখেছ? তোমাদের জীবনধারার মধ্যে সত্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কতটুকু?—জবাব দেবে কে!

তবু এই বিকৃত আদর্শহীন পরিবেশের মধ্যে এখনও মিলছে তেমন দু'চারটি ছেলে, যারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। অসত্য, অন্যায় জীবনধারা যেখানে বয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে, সেখানে তারা আত্মস্থ হয়ে এগিয়ে চলেছে আপনার পথে সবার অলক্ষ্যে। সত্যকে আজও তারা ভালবাসে; মানুষের দুঃখে আজও তারা ছুটে যায় অপ্রচুর সামর্থ্য নিয়ে। অশোভন জীবনের প্রাচুর্যময় প্রলোভনকে এরা পরিহার করে চলেছে আপন প্রাণৈশ্বর্যে বিভোর হয়ে। সংখ্যায় এরা নগণ্য, তবু এরা আছে, ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এরা এগিয়ে চলেছে স্থির দৃষ্টিতে, দৃপ্ত পদবিক্ষেপে। ভাবীকাল অপেক্ষা করে আছে এদের জন্যে। এরা গড়ে তুলবে নতুন দেশ, নতুন জীবন। বর্তমানের সমস্ত মলিনতাকে দূর করে শুচি শুভ্র জীবনের আদর্শে ভাস্বর হয়ে সবার অলক্ষ্যে কঠোর জীবন যজ্ঞে এরা ব্রতী। এদের সাধনা সার্থক হোক।

ইশারা

সন্তোষকুমার অধিকারী

রাতের আকাশে কাস্তেচাঁদের মুদ্রিত হ'লো আঁখি,
অন্ধকারের বক্ষে নীরব স্বপ্ন সে গেলো আঁকি';
আকাশ নীরব, স্তব্ধ মাটির অরণ্যঘন বুক,—
হে পৃথিবী, তব আঁখিরহস্য বুঝিবারে দেবেনাকি?

আমি অনুদিন সাঁঝে ও ঊষায় দুর্যোগে মধুরাতে,
শুধু চেয়ে থাকি, খুঁজে খুঁজে চলি,—জীবনের সুর কই?
যে সুরে শাখার পত্র আড়ালে জাগে কুসুমের কলি,
যে সুরে কুঁড়ির হৃদয়পাপড়ি মেলেছে কমলপাখা,
হৃদয়মধুতে জাগে বীজ নবসম্ভাবনার আশা,
পথে পথে দূর আকাশইশারা—নবপৃথিবীর ছবি,
জীবনের পথে স্বপ্নরঙীন যে ধরার ছায়ালোকে
তুমি বেঁচে থাকো ধ্বংস জটিল মহাভাঙনের স্রোতে।

হে পৃথিবী আজ আকাশে তোমার চাঁদের ছলনা কেন,
কাস্তেচাঁদের আলো ঘেরি শুধু কুয়াশাবিহ্বলতা,
আঁধার ত' নেই, নেই যে সুদূর যাত্রার ধ্বনিটুকু
নেই সে উদয়সূর্য বিভোর দিগঙ্গনের ডাক।

এই চলা আর থেমে থাকা আর নিশীথস্বপ্ন দেখা,
এই গতিহীন তন্ময়তায় শান্ত সন্ধ্যালোকে
হতগোধূলির দিগন্তছায়ে আঁখি মুদ্রিত রাখা,
সীমাহীন ক্ষণচঞ্চল তব গতির ছন্দহারা
নিশ্চিত চিরনির্ভাবনায় নিরালার নীড় গড়া;
হায়, তার চেয়ে চাঁদহীন নভে নামুক অন্ধকার,
ছিঁড়ে যাক আলো—আসুক ইশারা দুর্যোগভরা নভে
পথ চিনে নিই স্তম্ভিত মেঘে বিদ্যুৎ কশাঘাতে।

হে পৃথিবী তব কাস্তেচাঁদের মধুর স্বপ্নমোহে
অরণ্যঘন মাটির শ্যামলে বিহ্বল ছায়ালোকে

ভুলে যাই চিরজীবনের চির চঞ্চলতার ছোঁওয়া,
ধূসর আকাশ ঢেকে যায় ঘন কুয়াশার ছলনাতে;—
হায় তার চেয়ে আকাশ চিরিয়া বিপ্লব-সমারোহে
আসুক ইশারা, চাঁদহীন নভে নামুক অন্ধকার,
চির উন্দাম সীমাহারা তব মহাতাণ্ডবনের ডাক,
সেই ভালো, যেন পথ চিনে নিই বিদ্যুৎ কশাঘাতে।

রবীন্দ্রকাব্যে সৃষ্টির স্বরূপ

(পূর্বানুবৃত্তি)

অমিতা মিত্র

অনেকে বলে থাকেন বার্গস' ও বার্ণাডশর গতিবাদের বা বিবর্তনবাদের প্রভাব কবির কাব্যের ওপর অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে। এর উত্তরে কবি খুব সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বললেন—"য়ুরোপে একদল আছেন যাঁরা ভারতীয় যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে য়ুরোপের কাছে ঋণী প্রমাণ করতে চান। নইলে এ দেশে তাঁদের প্রভুতার পক্ষে কিছু অসুবিধা হয়। আবার সেই সুরে সুর মিলিয়ে আমাদের দেশেও বহুলোক এখানকার সব দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে আগা গোড়া পাশ্চাত্যের কাছে ঋণী বলতে চান। আমার চিন্তার মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকবে না এমন কথা কেমন ক'রে বলবো? সর্বযুগের সর্বদেশের তপস্যাকে আমি শ্রদ্ধা করে তাদের আশীর্বাদ জীবনে গ্রহণ করেছি। প্রাণের উপরে প্রাণের প্রভাব পড়বেই, নইলে সে প্রাণ নয়, নির্জীব, সে পাথর। কিন্তু দেখতে হবে, যে কথাটা বলচি তার কোন মূল কি ভারতের পূর্বে কোথাও ছিল না? য়ুরোপীয়েরা ভারতের ভক্তিবাদকে একেবারে খৃষ্ট ধর্মের কাছে ঋণী সাব্যস্ত করতে চান। যেহেতু খৃষ্ট ধর্মকে ভারত এক সময়ে ভদ্রতা করে আশ্রয় দিয়েছিল, তাই তাঁদের এই দাবী। হয়তো কিছু প্রভাব ঘটেও থাকবে, কিন্তু ভারতে কি তার পূর্বে কোথাও ভক্তি ছিল না? আর্য-দ্রাবিড় কারও মধ্যেই কি ভক্তি কখনও ছিল না? এখানে তাঁরা শুধু কে আগে কে পিছে এই হিসাব করেই কে ধনী কে ঋণী এই সত্য নির্ণয় করতে চান। কিন্তু খৃষ্টের বহু আগে বুদ্ধ। অথচ খৃষ্টধর্মের উপরে বুদ্ধের কোনো প্রভাবই কি তাঁরা মানতে রাজি?

ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হলে যখন পাশ্চাত্য একদল ধর্ম ব্যবসায়ী বলতে প্রবৃত্ত হলেন, এইসব কথা খৃষ্ট ধর্মেরই প্রভাবে লেখা, তখন আমাদের দেশেরই বহুলোক সেই কথা আরও জোরে প্রতিধ্বনিত করতে প্রবৃত্ত হলেন। ঘরের লোককে

পর করতে আমাদের মতো আর কেউ নেই। তার বহু দুর্গতি চিরদিন আমরা ভুগেছি। আজও আমরা সেই দুর্গতি ভুগছি, তবু তো চৈতন্য হয় না। যাক, তখন আমাকে বাধ্য হয়ে কবীরের অনুবাদ করে দেখাতে হলো, এই জাতীয় চিন্তা ভারতে ইংরাজ আমলেই আসেনি। এই সব চিন্তা আরও পূর্বে এই দেশে ছিল। কবীরের মধ্যেও ছিল। কবীরেরও পূর্বে ছিল। কতকাল হতে এই সব ভাব চলে আসছে তা বলা শক্ত। হয়তো বেদ উপনিষদেরও পূর্ব হতে চলে আসছে এই সব চিন্তার ধারা। এইগুলো আমাদের খুঁজে দেখা দরকার।

আমাদের দেশের মতেও পুরুষ বা আত্মা ক্রমাগতই চলছে। হংসের মতোই সে লোক হতে লোকান্তরে যাত্রা করে চলেচে। তার মন্ত্র 'চরৈবেতি' অর্থাৎ এগিয়ে চলো। আমাদের দেশে লোকে মনীষী সাধক ও গুরুদের কাছে চেয়েছেন, 'গতি দাও, মুক্তি দাও।' মধ্যযুগের সাধকেরা সবাই গতিরই জয়গান করেছেন। বৌদ্ধদর্শনে বস্তুমাত্রই গতিতে আপন আপন রূপ নিচ্ছে ও তার পরক্ষণেই সেই রূপটি হারিয়ে আবার নব নব রূপ নিয়ে চলেচে। সব নাম ও রূপই নৃত্যের ও গতির ক্ষণিক লীলা মাত্র। কোন স্থির সত্তা নেই। জীবেরও গতির বিশ্রাম নেই, প্রকৃতিরও নেই। প্রাণলীলায় বিশ্বচক্র পরিধির মত ক্রমাগত ঘুরচে। বিশ্রাম আছে তার কেন্দ্রে। সেই বিশ্বকেন্দ্রই পরমাত্মা। তাই পরম সত্যকে চলচে ও চলচে না, দুই-ই বলা চলে। অদৃশ্য বলে যা মনে হচ্ছে যে অচল, তাও চিন্তার ও মনের চেয়ে বেশি বেগে ধাবমান।

এই সব তত্ত্ববাদ তো এই দেশে ছিল। অন্ততঃ আমার প্রাণের মধ্যে যে ছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। আমার ছেলেবেলার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হতে আমার কবিতায় গানে নাটকে সর্বত্র এই গতি-ব্যাকুলতা। তবু য়ুরোপের মনীষীদের গতির কথা পড়ে আমি মনে যে প্রভূত সায় ও আনন্দ পেয়েচি তাতে সন্দেহ নেই। আর যদি প্রাণের সহজ ধর্মে তার কিছু প্রভাবও আমার চিন্তার মধ্যে এসে থাকে তাতেই বা কি? মোট কথা, গতিই আমার ও ভারতীয় চিন্তাধারার এক প্রধান কথা।" রবীন্দ্র-জীবনবেদ ও ভারতীয় চিন্তাধারার এর থেকে স্পষ্ট বাখ্যা আর কি হতে পারে?

তত্ত্বের দিক দিয়ে ঐ মনীষীদ্বয়ের মতবাদের যথেষ্ট মূল্য আছে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সাহিত্যে এর প্রকাশ রসোপলব্ধির সহায়ক নয়। বিশুদ্ধ চেতনার সত্তা আছে কিন্তু প্রাণ নেই, কারণ তা অনুভূতির রসে প্রাণবান নয়। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে বিবর্তনবাদ আছে, অধ্যাত্মবাদ আছে, কিন্তু তা শুধু চেতন লোকেই সীমাবদ্ধ নয়, যুগ যুগান্তরব্যাপী পরিবর্তনের মধ্যে তিনি দেখেছেন অবিনশ্বর আত্মাকে। যে আমি শুধু বর্তমানেই নিবদ্ধ নয়, যার আরম্ভ অনাদি কালে, সেই বৃহত্তর আমি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কাব্যে। কবি জন্মান্তরবাদে অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রাণীজগতের মধ্যে এই সৃষ্টিধারার মধ্যে স্রষ্টার নিত্য লীলাবিলাস চলছে। তাঁর লীলার জন্যই এই সৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যে এত যে বৈচিত্র্য তা শুধু তাঁরই আনন্দের অভিব্যক্তি। তাই

সৃষ্টি ও স্রষ্টা, জড় ও চিন্ময়, শান্ত ও অনন্ত, খণ্ড ও অখণ্ড সব কিছু মিলেমিশে এক হ'য়ে রয়েছে—তাই পরস্পরের বিচ্ছিন্ন হওয়া শক্ত।

সর্বানুভূতি রবীন্দ্র কাব্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বিশ্বের ছোট বড়, সামান্য অসামান্য সমস্ত কিছুর মধ্যে কবি এক অপূর্ব প্রাণ স্পন্দনের শক্তি অনুভব করেছেন। তুচ্ছতম ধূলিকণাকেও তিনি অসীম সৃষ্টি রহস্যের অন্তরঙ্গ বলে জেনেছেন, খণ্ড জীবনের মধ্যে চিরন্তন জীবনের স্পন্দন তিনি অনুভব করেছেন। তাই ছোট বড় সকলের মধ্যেই তিনি চিত্ত স্থাপন করতে পেরেছিলেন। এই বিশ্ব সমষ্টি বোধ রবীন্দ্রকাব্যে অপরূপ অনির্বচনীয়তা দান করেছে। কবি বিচিত্র বিশ্বের বিচিত্র রাগিনীর মধ্যে পরম ঐক্য এবং এই অনন্ত বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে মানুষের অখণ্ড যোগ বিস্মিত পুলকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি অন্তরে অন্তরে এটা নিশ্চয় করে বুঝেছিলেন যে, যে সৃজনলীলা মানুষের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে চলছে, তার সঙ্গে বিশ্বের একটা অখণ্ড যোগ আছে, ঐক্য আছে, তা না হ'লে এত বড় বিরাট বিশ্বকে অত্যন্ত অপরিচিত অদ্ভুত বলে বোধ হতো। এই মূক মাটির বন্ধন পরিপূর্ণ প্রাণের স্বীকার লাভ করেছে যার জীবনে তাকেই বলা সাজে 'স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে'।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে একান্তভাবে ভালবেসে ছিলেন তাই তাকে নিয়ে তাঁর গানের ফসল ফলে ফুলে ভরে উঠেছিল। এই বিশ্বসঙ্গীত তিনি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত গাইতে ক্লান্তি বোধ করেননি। এ কথা তিনি বিচিত্র রূপে বলেছেন—

'আকাশ-ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে।
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি চোখ মেলেছি
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

বিশ্ব-প্রকৃতির ছন্দ দোলায় কবির প্রাণে অপূর্ব স্পন্দন জাগে, সেই স্পন্দনে কবির কণ্ঠে গান বিচিত্র রাগিনী লাভ করে।

কবি কতবার বলেছেন যে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে এক অবিচ্ছিন্ন চিরপুরাতন একাত্মতা কবিকে একান্তভাবে আকর্ষণ করেছে। কবি বলেছেন—"কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ

করিয়া দিয়াছি, তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দ-গানে বহিয়া গেছে। তখনি একথা বলিতে পারিয়াছি—

হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল—
কিছুতেই নেই ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্ত বিহীন আপনা।

তখনি একথা বলিয়াছি—

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চল তলে। ওগো মা মৃন্ময়ি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো।"

এই জল স্থল, আকাশ বাতাস, তরু-লতা, চন্দ্র-সূর্য বিশ্বের সমস্ত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ কবির চিত্ত বীণায় সংগীত মূর্ছনা তুলেছে। কবি স্থির প্রত্যয় লাভ করেছিলেন যে এই চেতনা প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক জড় ও চিন্ময় জগতে স্পন্দিত হচ্ছে, তাই তার মধ্য থেকে যে ঐক্যতান উত্থিত হয় তা হৃদয়কে স্পর্শ না করে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সংগে আমাদের একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করে। এই তৃণ গুল্ম লতা, জল ধারা, এই ছায়া লোকের আবর্তন, জ্যোতিষ্ক দলের প্রবাহ, পৃথিবীর অখন্ড প্রাণী পর্যায় এই সমস্তের সংগেই আমাদের নাড়ী চলাচলের যোগ রয়েছে।" কবি অহল্যার মত তাঁর নাড়ীতে যুগ-যুগান্তের বিশ্বের বিরাট স্পন্দন অনুভব করেছেন। এই স্পন্দনের কথা লিখেছেন—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে সেই প্রাণ চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোম কূপে

* * *

করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অংগে আমারে করেছে মহীয়ান্

সেই যুগ-যুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।

কবি বহুবার দেখিয়েছেন বিশ্বের সঙ্গে এই আন্তর যোগই মানবজন্মের শ্রেষ্ঠ রহস্য। কবি বসুন্ধরাকে মা বলে সম্বোধন করেছেন। তাতে বোঝা যায় যে, মানুষ ধরিত্রীর জীবনের অংশ মাত্র, গর্ভস্থ শিশু যেমন মায়ের সঙ্গে বিলীন হয়ে মাতৃরস পান করে, তেমনি মানুষ জন্মের পূর্বেও ধরিত্রীর রসে সঞ্জীবিত। তারপর কালের চক্রে ঘূর্ণায়মান মানুষ যায় আবার আসে, কিন্তু সম্বন্ধ থাকে অচ্ছেদ্য। তাই 'মাটির টান' এত তীব্র। মানুষের কাছে সৃষ্টি তাই বিস্ময়ের বস্তু—

আবার জাগিনু আমি
রাত্রি হ'লো ক্ষয়
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব
এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।

সৃষ্টির মধ্যে কবি যে শুধু স্নেহ ভালবাসা, আনন্দ সৌন্দর্য দেখিয়েছেন তাই নয়, এর মধ্যে যে কি নিদারুণ বেদনা আছে তাও কবির অত্যন্ত স্পর্শকাতর চিত্তকে ব্যাকুল করে তুলেছে। বিশ্বসৃষ্টির মাঝে তিনি নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য দেখেছেন। তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে ধ্বংস অন্য পদক্ষেপের আঘাতে সৃষ্টি।

তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
সুখে দুঃখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে।

সৃষ্টের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে কান পেতে ও চোখ দিয়ে তিনি যেন শুনেছেন ও প্রত্যক্ষ করেছেন—

শুনিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন, দেখিলাম শূন্য মাঝে
আঁধারের আলোক-ব্যগ্রতা। কত শত মন্বন্তরে
কত জ্যোতির্লোক গূঢ় বহ্নিময়, বেদনার ভরে
অস্ফুটের আচ্ছাদন দীর্ণ করি তীক্ষ্ম রশ্মিঘাতে
কালের বক্ষের মাঝে পেল স্থান প্রোজ্জ্বল প্রভাতে
প্রকাশ উৎসব দিনে। যুগ সন্ধ্যা কবে এল তার
ডুবে গেল অলক্ষ্য অতলে। রূপনিঃস্ব হাহাকার
অদৃশ্য বুভুক্ষু ভিক্ষু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে

ধূলায় ধূলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।

তবুও সুখ দুঃখ তরঙ্গ—

এ দুয়ের মাঝে কোনোখানে আছে কোন মিল
নহিলে নিখিল
এত বড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না
সব তার আলো
কীটে কাটা পুষ্পসম এতদিনে হ'য়ে যেতো কালো।

যিনি চিরদিনই মিলনের কথা বলে এসেছেন, যাঁর অন্তরে আশার অনির্বাণ দীপশিখা জ্বলতো তিনি আবার বললেন—

সুখ দুঃখ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।

স্বর্গ ও মর্ত্যের বিরোধ-বিচ্ছেদ যেখানে অবলুপ্ত, উপলব্ধির সেই গভীর লগ্নের বাণীই রবীন্দ্রকাব্যের শেষ বাণী। প্রেম ও শান্তির বাণী যাঁর জীবনের একমাত্র মূল মন্ত্র ছিল জীবনের গোধূলি লগনে তিনি মুক্ত কণ্ঠে বললেন—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে।
হে ছলনাময়ী।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এখানে একটি কথা বলে উপসংহার টেনে দিতে চাই যে, কবির সৃষ্টিপ্রবাহ এক সত্যের কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হয়েছে। সে সত্য এই যে, বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে যিনি রয়েছেন বিশ্বসৃষ্টির মধ্যেও তিনি। তিনি প্রাণরূপী নারায়ণ। রূপ হ'তে রূপে, প্রাণ হ'তে প্রাণে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আপন মাধুরী আপনিই অনুভব করেন।

জীবন হ'তে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস সরোবরে—
সূর্য তারা ভিড় ক'রে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়
কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।

এই সত্যের মুখোমুখী হ'য়ে কবি উপলব্ধি করলেন ইনি প্রাণ, ইনি প্রলয়, ইনি চঞ্চল, ইনি স্থির, ইনি খণ্ড, ইনি অখণ্ড, ইনি সীমা, ইনি অসীম, ইনি সান্ত, ইনি

অনন্ত। এ'র থেকেই সৃষ্টি, এ'তেই বিলীন।

কত চতুরাণন মরি মরি যাওঅত
ন তুয়া আদি অবসানা
তোহি জনম পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।

উপনিষদের মানসপুত্র রবীন্দ্রনাথ। উপনিষদের তত্ত্বানুসারে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের আধার স্বরূপ সমগ্র বিশ্ব প্রাণরূপী ব্রহ্মের বিভিন্ন বিকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। সৃষ্টিও ব্রহ্মের ইচ্ছায় "সোঽকাময়ত একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েম।" তিনি তপস্যার দ্বারা তপ্ত হ'য়ে সমস্ত সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর। "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—সৃষ্টিতে যা কিছু প্রকাশিত, তাই আনন্দের অমৃত রূপ। এই অনুভূতিই কবির সমস্ত কাব্যসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, এখানেই তাঁর কাব্যের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। এই অদ্বৈত তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল জন্মশতবার্ষিকী

স্মৃতিপূজার প্রস্তুতি

পুরুষোত্তমানন্দ

(৩)

প্রাণের পথ

প্রাণের পথই 'সমগ্র দৃষ্টির' (synoptic vision) পথ, সমন্বয়ের পথ; অর্থাৎ স্বতন্ত্র দ্রষ্টা (subject) ও স্বতন্ত্র দৃশ্য (object) প্রভৃতি পরস্পর-বিরুদ্ধদের অন্যোন্য-অপেক্ষার পথ ও একান্ত অনপেক্ষতার পথ। এই পথের দৃষ্টি রহিয়াছে পরস্পরবিরুদ্ধদের মধ্যস্থিত সম্বন্ধের (relation) দিকে। এই সম্বন্ধই ব্রজের 'পরকীয়' সম্বন্ধ, যাহার মধ্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্য অনন্ত ব্যবধানে থাকিয়াও সমগ্রের ভিতর অব্যবহিত, অন্যোন্যমৈথুনরত (inter-penetrated). ইহার দৃষ্টি একান্ত দ্রষ্টার দিকেও নয়; একান্ত দৃশ্যের দিকেও নয়; একান্ত দর্শনের দিকেও নয়। এই সম্বন্ধের মাঝে দৃশ্য দ্রষ্টার 'স্বকীয়' নয়; দৃশ্যকে নিজের মানদণ্ডে দেখিবার কোনও অবসর এখানে দ্রষ্টার নাই। এখানে দৃশ্যের মানদণ্ডেই দৃশ্যকে দেখিবার, বুঝিবার ও আস্বাদন করিবার কৌশল নিহিত রহিয়াছে। এই পরকীয় সম্বন্ধের মাঝেই রহিয়াছে সম্বন্ধ ও নিঃসম্বন্ধেরও সমন্বয়।

দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই স্তরে দুইকেই ডিঙ্গাইয়া (transcend করিয়া) দুইকে পাইবার জন্য ব্যাকুল। দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই পরকীয় রসের ভিতর দুইকে exclude করিয়াই দুইকে পরিপূর্ণ করে—'complete by excluding each other'. একান্ত দ্রষ্টা, একান্ত ভোক্তা এই স্তরে অপূর্ণ, একান্ত দৃশ্যও অপূর্ণ। এই পরকীয় সম্বন্ধের ছাঁচেই বিশ্ব সুগ্রথিত। ইহাই রবীন্দ্রনাথের 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি'। বন্ধনহীন গ্রন্থিই পরকীয় সম্বন্ধ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদার পরকীয় পুত্র, নন্দ-যশোদাও শ্রীকৃষ্ণের পরকীয় পিতামাতা, ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয় সখা; শ্রীবৃন্দাবনই যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয় দেশ। ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণের স্ব-দেশও নয়, বি-দেশও নয়, পরকীয় দেশ। এখানে দেশ ও কাল দুই-ই পরকীয় রসে পরস্পরের কাছে ধরা পড়িয়াছে, একাত্ম হইয়া গিয়াছে। ইহাই কি আইনস্টিনের দিক-কাল-সন্ততি। এই পরকীয় দেশে সকল সম্বন্ধই—পিতাপুত্র সম্বন্ধ, নরনারী সম্বন্ধ, দ্রষ্টা-দৃশ্য সম্বন্ধ, জড়াজড় সম্বন্ধ, চেতন-অচেতন সম্বন্ধ সবই পরকীয়। পরস্পরবিরুদ্ধদের মধ্যে রহিয়াছে একটা অনন্ত ব্যবধান; এবং এই অনন্ত ব্যবধানই আজ আইনস্টিনের মতে সর্বাপেক্ষা 'সরল রেখা'। ইউক্লিডের 'সরল রেখা' এই দেশে অচল। এই দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইতেছেন 'যোগমায়া', যিনি যান্ত্রিক মায়ার প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে ব্রহ্মের যোগ বিধান করিয়া বিশ্বকে ব্রজধামে গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্রহ্মেরই পরকীয়া অনির্বচনীয়া শক্তিরূপে ব্রজধামে পূজিতা। ইহারই স্তব করিয়া নন্দব্রজকুমারিকাগণ বলিয়াছিলেনঃ

> কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিনি অধিশ্বরি।
> নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥
>
> —ভাগবত, ১০।২২।৪

যোগমায়াই একাধারে পরস্পরবিরুদ্ধ মহামায়া ও মহাযোগিনী। এই যোগমায়া সমাবৃত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন। এই 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলারস আস্বাদন করিয়াছিলেন। এই বিশ্ব যে 'finished product' নয়, ইহার বুকে যে অনন্ত ভাগবত সম্ভাবনা ঘুমাইয়া রহিয়াছে, সেই 'অনন্ত হওয়া'র মাঝে বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া ব্রজধামে গড়িবার পথই না পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন? সেই কৌশলকে ধরার বুকে ছড়াইয়া দিবার গুরু দায়িত্ব লইয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তিনি আবার আসিয়াছিলেন।

> প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন।
> রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
> রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
> এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম॥
> ঐশ্বর্যভাবেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
> ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥

আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥

*　　*　　*

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

*　　*　　*

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপিগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥

*　　*　　*

ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম॥

*　　*　　*

পরকীয় ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

রাগমার্গের আস্বাদনক্ষেত্র ব্রজধাম; পরকীয় ভাবেই এই রাগমার্গের প্রকাশ। ব্রজধামে সব সম্বন্ধই পরকীয়। এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্বন্ধ পরকীয়; আবার এই সৃষ্টির মধ্যের পারস্পরিক সকল সম্বন্ধই পরকীয়। পরকীয় সম্বন্ধই রাগের সম্বন্ধ; ইহার মধ্যে কোনও অভিসন্ধি নাই—ধর্মাভিসন্ধি, অর্থাভিসন্ধি, কামাভিসন্ধি নাই। স্রষ্টা-সৃষ্টির মধ্যে তাই এখানে মোক্ষাভিসন্ধিমূলকও কোন সম্বন্ধ নাই। মায়ার ক্ষেত্রের সব সম্বন্ধই অভিসন্ধিমূলক; কিন্তু যোগমায়া ক্ষেত্রের সম্বন্ধ শুধুই অনুরাগমূলক, অহৈতুক, অব্যবহিত। স্রষ্টা-সৃষ্টের সম্বন্ধ রাগাত্মক রূপে আস্বাদিত হইলে উহা বিশ্বের সর্ব সম্বন্ধের মধ্যে সহজেই সংক্রামিত হইবে। বাধ্যবাধকতার স্পর্শও ব্রজে নাই। প্রভু-দাস, পিতা-পুত্র, নর-নারী পরস্পরকে ব্রজের মানুষ ভালবাসিবে কোনও অভিসন্ধি না লইয়া, কোন-কিছু বাধ্যবাধকতার চাপে সঙ্কুচিত না হইয়া। স্বাধীনে স্বাধীনে প্রেমই পরকীয় প্রেম। এখানে স্বামীস্ত্রী যখন পরস্পরকে সর্ববিধ বিধিসম্মত বাধ্যবাধকতার হাত হইতে মুক্তিদান করিয়া কেবল ভালবাসার জন্যই ভালবাসিবে, তখন সেই ভালবাসাই হইবে পরকীয়। পরকীয়ত্ব রহিয়াছে বিশ্বের প্রতিটি অণুর মধ্যে, প্রতিটি সম্বন্ধের মধ্যে। জড়-অজড় সম্বন্ধও এই হিসাবে পরকীয়, সৎ-অসৎ সম্বন্ধও পরকীয়, ব্রহ্মমায়া সম্বন্ধও পরকীয়। বিশ্বময় 'সম্বন্ধে'র এই পরকীয়ত্ব প্রচার করিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর ধন্য,

অদ্বিতীয়। তবে তিনি যে-কালে আসিয়াছিলেন, বিধিমার্গের যে জঞ্জালের মাঝে, যে ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই জঞ্জাল, সেই ঝঞ্ঝাট হইতে রাগমার্গকে তিনি তখন মুক্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাই বিধিমার্গের ভিত্তিতেই রাগমার্গকে স্থাপন করিয়া গেলেন। শত শত খুঁটিনাটি বিধিব্যবস্থার চাপে আবার তাঁহার প্রবর্তিত সেই রাগমার্গই লুপ্তপ্রায় হইল। তাই প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই বলিয়াছিলেন— 'কুত্রাপি তে পদবী নেক্ষতে।' বৈধ চাপ-জর্জরিত রাগমার্গকে, ধরার বুকে সাংসারিক সকল সম্বন্ধের ভিতর ছড়াইয়া পড়িতে না পারিয়া আবার mysticism-এর অন্তর্গত হইয়া-পড়া এই রাগমার্গকে ধরার বুকে সকল সম্বন্ধের ভিতর ছড়াইয়া দিবার উপযোগী এক দার্শনিক বিপ্লব লইয়া গৌরসুন্দরের দ্বিতীয় কলেবর নিত্যগোপাল অবতীর্ণ হইলেন। বর্তমান যুগের পদার্থবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র তাঁহার এই অবতরণের অনুকূল।

রাগমার্গ (প্রাণের পথ) যোগমায়ারই দিব্য রূপ, একটি সচ্চিদানন্দময় আস্বাদন। 'পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা। আনন্দে তাই এক হল তার পৌঁছানো আর চলা।' পথ গন্তব্যস্থল একই process-এর বিভিন্ন আস্বাদন। যিনি ছিলেন পথের শেষে গন্তব্যস্থল, তিনিই আজ পথের মাঝে জীবের সঙ্গীরূপে প্রকট হইয়াছেন। যিনি ছিলেন 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' গম্যস্থল তিনিই আজ এই পথের মাঝে জীবনে 'মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।' যিনি ছিলেন অধর, গোলোক বৈকুণ্ঠের ঠাকুর, তিনিই যোগমায়া শক্তিসহায়ে সান্ত-অনন্ত, সাকার-নিরাকার-আকার, সগুণ নির্গুণের ভেদ গলাইয়া আমার পরিচ্ছিন্ন গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া ধরা দিলেন, অতিগ থাকিয়াও অনুগ হইলেন। এই ভাবে জীবের 'প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গের কান্না'র একটি দিব্য অর্থ ফুটিয়া উঠিল। এই স্তরে পুরুষ বিশ্বরূপ, স্ত্রী হয় বিশ্বরূপ, পিতামাতা হয় বিশ্বরূপ, পুত্র হয় বিশ্বরূপ, পতি হয় বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ পতিই উপ-পতি পদবাচ্য; কেননা কোন পতির উপর তাহার স্ত্রীরই যে একান্ত দাবী, স্ত্রীর প্রতিই যে স্বামীর একান্ত বাধ্যবাধকতা আছে, তাহা নয়। বিশ্ববাসীর দাবী প্রতি জীবের উপরে আছে বলিয়া কেহই কাহারও একান্ত-কিছু নয়, একচেটিয়া-কিছু নয়। বিশ্বের প্রতিটী অণুই একাধারে স্বরূপ-বিশ্বরূপ। এখানে ভোক্তাও বিশ্বরূপ, ভোগ্যবস্তুও বিশ্বরূপ। এখানে জীব-ঈশ্বর, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী যোগমায়াশক্তির উষ্ণ উত্তাপে ডিমের খোসা হইতে ছানার ফুটিয়া বাহির হইবার মত সকল আবরণ, সকল উপাধির খোসা ভাঙ্গিয়া সহজের দেশে সহজ মানুষের রূপ-রসে ফুটিয়া উঠিবে। এই 'নব বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে একত্র হইয়া রয়।' ঈশ্বর-মানুষের একত্র হইয়া থাকার দেশই বৃন্দাবন। তাই গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতেও ইহার উৎকর্ষ। গোলোক-বৈকুণ্ঠে এই পরকীয় রসের আস্বাদন নাই। 'বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার

প্রচার', তাহাই শ্রীকৃষ্ণ 'ভুবি বৃন্দাবনে' আস্বাদন করিলেন।

বৈকুণ্ঠে সহজ মানুষ কোথায় মিলিবে? বৈকুণ্ঠ তো অমৃতের দেশ। সেখানে বিষ কোথায়? নীলকণ্ঠ কোথায়? বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠা নাই, বিরহ নাই। কিন্তু বৈকুণ্ঠেরও জমাটবাঁধা রূপ এই বিশ্ব মিলন-বিরহ, বিষামৃত মিলিয়া এক দিব্য প্রেমরূপে উদ্ভাসিত। সহজ-মানুষ ব্রজে সকল কুণ্ঠ'কে, সকল কুণ্ঠাতীতকে পরিপাক করিয়া প্রেমরসে বিভোর।

'এই প্রেম আস্বাদন　　তপ্ত ইক্ষু চর্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেম যার মনে　　তাঁর বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥'—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

এই বিশ্ব finished product নয়। Finished product হইলেই বৈকুণ্ঠধাম হয় ইহার ও-পারে; কিন্তু যোগমায়া প্রভাবে এই বিশ্ব যখন পুরুষোত্তম-ছাঁচে re arranged হয়, তখন বিশ্ব-সংগঠনোপযোগী এক নূতন জ্যামিতিরও আবির্ভাব হয়, তখন এই বিশ্বই হয় বৈকুণ্ঠধাম, গোলোকধাম। 'ভুবি-বৃন্দাবন' প্রতিষ্ঠাই ছিল শ্রীগৌরসুন্দরের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই নিত্যগোপাল প্রাণদর্শন ও প্রাণপথ নিয়া আবির্ভূত। ধরার মাটিতেই আজ বৈকুণ্ঠ-গোলোকের গড়াগড়ি যাইতে হইবে।

মহোপনিষদ এই সম্বন্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে শুনাইতেছেন ঃ

'সম্বন্ধে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যানাং মধ্যে দৃষ্টির্হি যদ্বপুঃ।
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাবিবর্জ্জিতং তদিদং পদম্॥'

—'দ্রষ্টা ও দৃশ্যসমূহের 'মধ্যস্থিত সম্বন্ধে দৃষ্টি'-রূপ দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্যবর্জিত যে-'বপু', তাহাই জীবজগতের পদ বা গম্যস্থল'। দ্রষ্টা-দৃশ্যের এই সম্বন্ধ 'স্বকীয়' হইলে তাহার মধ্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে যে ফাঁক রহিয়া যায়, তাহা ভরিবার জন্য প্রকৃতির অতীত (supernatural or spiritual) কোনও একটি সত্তাকে স্বীকার করিতেই হয়, এবং মানুষ পরিণত হয় infra-human পশুর স্তরে, যেখানে জীবনের সব ঘটনার 'কারণ' নির্ণয় করিতে হইলে পূর্বকালে অনুভূত কোনও ঘটনার সঙ্গেই সেই 'কারণ'কে এক করিয়া লইতে হয়। কিন্তু দ্রষ্টা-দৃশ্যের সম্বন্ধ যদি 'পরকীয়' হয়, তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য পরস্পরের স্বয়ংমূল্য স্বীকার করিয়া এক ধারায় আগাইয়া যাইতে পারে; যাহার ভিতর 'দৃষ্টি' দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্যাবিবর্জিত থাকিয়াই দ্রষ্টা-দর্শন দৃশ্য সমন্বিত। পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রফেসার ওয়ালেস (Wallace) লিখিয়াছেন ঃ

'All development is by breaks and yet makes for continuity.' 'Continuity may be inconsistent with breaks, if we define a 'break' as a chasm or an alien influx into nature.—The Idea of God

মায়া-প্রকৃতির ক্ষেত্রেই break (ছেদ) ও continiuty (সন্ততি) সর্বদাই অসমঞ্জস (inconsistent) ; সেখানে বিভেদ বিভেদই, অভেদ অভেদই। এবং অভেদ ও প্রভেদের মধ্যে রহিয়াছে একটি অনির্বচনীয় শক্তি (alien influx into nature), যে কিছুতেই প্রভেদ ও অভেদের মধ্যে একটি জীবনধারা আবিষ্কার করিতে অক্ষম। মায়াপ্রকৃতি ও যোগমায়াপ্রকৃতি সম্বন্ধে 'Idea of God' গ্রন্থের লেখক লিখিতেছেন ঃ

'The lower Naturalism is that which seeks to merge man in the infra-human nature from which he draws his origin—which consistently identifies the cause of any fact with its temporal anticedents, and ultimately equates the outcome of a process with its starting-point. A higher Naturalism will not hesitate to recognise the emergence of real differences where it sees them, without feeling that it is thereby establishing an absolute chasm between one stage of nature's processes and another. What we have to deal with is the continuous manifestation of a single Power, whose full nature cannot be identified with the initial stage of the evolutionary process, but can only be learned from the course of the process as a whole, and most fully from its final stages.'—Ibid—Pages 209-10.

মায়াবাদীর প্রকৃতি হইতেছে Lower Nature. যোগমায়াবাদীর প্রকৃতি হইতেছে Higher Nature. মায়াবাদী বর্তমানের ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য উজান স্রোতে অনন্ত অতীতে initial ব্রহ্মকে আশ্রয় করেন। যোগমায়াবাদী সেই স্থলে প্রতিটি ঘটনাকে 'process as a whole' -এর ভিতর ফেলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চান; কিংবা অনন্ত গতিসম্পন্ন, সামনের দিকে ধাবমান পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করিয়া ব্যাখ্যা দিতে চান। যোগমায়াবাদীর কাছে যিনি 'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ', তিনিই 'অগ্রে আসীৎ' সৎ থাকিয়া 'দূরং ব্রজতি'। 'Reality lies ahead' —'আসীনঃ দূরং ব্রজতি' 'শয়ানঃ যাতি সর্ব্বতঃ'। মায়াবাদীর ব্রহ্ম হইতেছেন গ, সা, গু (G. C. M.) ; যোগ-মায়াবাদীর ব্রহ্ম হইতেছেন ল, সা, গু (L. C. M.) বা পুরুষোত্তম। গ, সা, গু-র একত্ব ও ল, সা, গু-র একত্ব বিভিন্ন স্তরের। গ, সা, গু-র একত্ব ছেদহীন, পক্ষান্তরে ল, সা, গুর একত্ব ছেদের সঙ্গে জীবনযোগে যুক্ত।

কিন্তু ভারতবর্ষের পাতঞ্জল দর্শন দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগকে 'হেয়হেতু'ই বলিয়াছেন—'দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগঃ হেয়হেতুঃ।' বেদান্তদর্শনের মায়াবাদী ভাষ্য দৃশ্যা পরার্থা প্রকৃতির পারমার্থিক নিত্যত্ব অস্বীকার এবং তাহার শুধু ব্যবহারিক সত্তামাত্র অঙ্গীকার করিয়াছে; ব্রহ্মের সঙ্গে প্রকৃতির যোগকে এক 'অনির্বচনীয়' শক্তিরই প্রভাব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। ইহাদের মতে ব্রহ্মই শুধু অনাদি অনন্ত, প্রকৃতি অনাদি কিন্তু বিনাশশীলা। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে এই অনির্বচনীয়া প্রকৃতির বিনাশ সংসাধিত হয়। কিন্তু এই 'অনির্বচনীয়তা' যে প্রকৃতির মধ্যে এ 'alien influx'

মাত্র, ইহা যে কেমন করিয়া কোথা হইতে প্রকৃতির মধ্যে আসিয়া পড়িল, কেমন করিয়া এই alien বস্তুটি যে ব্রহ্মের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ বিধান করিয়াছে তাহার কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যান ইহা দিতে পারে নাই। শ্রীনিত্যগোপাল সৎ ব্রহ্মের সঙ্গে প্রকৃতির যোগকে অনির্বচনীয় করিয়া রাখেন নাই; পরন্তু উহাকে ব্রহ্মেরই অনাদ্যা অনন্ত সহজ শক্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 'সত্তা নিত্যা। সত্তা জাত নহে। সেইজন্য সত্তার জাতি নাই। সত্তাই আত্মা। আত্মারই অপর আখ্যা পরমাত্মা। সত্তা অশক্তি নহে। সত্তাও একপ্রকার শক্তি। সত্তা অনাদ্য শক্তি। সত্তা নিত্যা শক্তি। প্রসিদ্ধ পাতঞ্জলদর্শন মতে সেই সত্তাই দৃক্‌শক্তি। ভগবান শঙ্করাচার্য সেই দৃক্‌শক্তিকেই 'দৃগেবাত্মা' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সত্তাই আত্মা। সেইজন্য আত্মা অশক্তি নহে। আত্মাও শক্তি। তবে তিনি পরাশক্তি।'—নিত্যধর্ম পত্রিকা—২য়—বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

'The Self or Subject is not to be conceived as an entity over and above the content or as a point of bare existence to which the content is, as it were, attached . . The unity of the subject we may agree, simply expresses this peculiar organisation or systematisation of the content. But it is not simply the unity which a systematic whole of content, in Prof. Bosanquet's phrase, has 'come alive'; it has become a unity for itself, a subject. This is, in very general terms, what we mean by a finite centre, a soul or, in its highest form, a self.—Idea of God, p. 285. 'Externality, *i.e.*, the general system of nature, cannot be really separated from the foci in which it finds expression, to make this separation, as we argued in the first course, is to hypostatise an abstruction.'—Ibid. সত্তা (existence) যে নিছক সত্তা (bare existence) নয় এবং প্রকৃতিও যে তাহার কাছে বিজাতীয় (alien) নয়, দৃক আত্মা ও প্রকৃতিকে যে কোনও দিন কোনও অবস্থাতেই একান্ত পৃথক করা সহজ নয়, সম্ভবও নয়, শ্রীনিত্যগোপাল ইহা বিশ্বের সামনে এক নূতন কল্পনা (hypothesis) স্থাপন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : 'ব্রহ্ম যেমন আদি, অনাদি ও অনন্ত, তদ্রূপ তাঁহার শক্তিও আদ্যা অনাদ্যা ও অন্তহীনা।'—নিত্যধর্মপত্রিকা—২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। একান্ত অদ্বৈতবাদী প্রকৃতিকে অনাদি কিন্তু অন্তশীলা বলিয়া মানিয়া লওয়ার ফলে যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রকৃতির ব্যবহারিক সত্তা মানিবেন এবং এই বাধ্যবাধকতার ফলে প্রকৃতির ক্ষেত্রকে সংকুচিত করিতে করিতে একান্তভাবে নিরোধের সাধনার নির্দেশ দিতেও বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু যদি কল্পনা করিয়া লওয়া যায় যে, প্রকৃতিও ব্রহ্মেরই মত অনাদ্যা ও অন্তহীনা, তবে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের মোড় ফিরিয়া যাইবে। তখন সাধনাবস্থাই বল আর সিদ্ধাবস্থাই বল, কোনও অবস্থাতেই প্রকৃতির 'অন্ত' সম্ভব নয়। মানুষ ঘটনার ব্যাখ্যানের জন্য যে-কোনও কল্পনা মানিয়া লইতে পারে। যে কল্পনা-

দ্বারা অধিকতম ঘটনার ব্যাখ্যান সম্ভবপর, তাহাকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। 'সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে'—এই কল্পনার চেয়ে 'পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে' ইহা ধরিয়া লইলে অধিকসংখ্যক ঘটনার ব্যাখ্যা মিলে বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ 'পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে'—এই কল্পনাকেই যুক্তিযুক্ত ধরিয়া লইয়াছেন। আমাদের চক্ষুর দেখাকে একান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে 'সূর্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে' দেখিব; কিন্তু তাহা দ্বারা অপরাপর ঘটনার কোনও ব্যাখ্যানই মিলে না। সূর্য ও পৃথিবী সম্বন্ধে যত রকমের ঘটনা ঘটিতেছে, সে-গুলির সবই আজ বিচার করিবার সুযোগ মিলিয়াছে।

এইভাবে আত্মা ও অনাত্মা প্রকৃতির সম্বন্ধও বিচার করিতে হইবে। অনাত্মাকে আত্মজ্ঞানের উদয়ে বিনাশশীল বলিয়া ধরিয়া লইলে জীবের জৈব আবেগের (urge) কোনও ব্যাখ্যাই মিলে না; তখন উহা অবশ্যই নিরোধযোগ্য। কিন্তু প্রকৃতি যদি 'অনন্তা' হন, তবে প্রকৃতি প্রকৃতি থাকিয়াও, প্রকৃতির প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি থাকিয়াও কেমন করিয়া পুরুষোত্তমের মধ্যে পুরুষোত্তমের সঙ্গে নিবৃত্তির সঙ্গে একাত্ম হইতে পারে, তাহার কৌশল শিক্ষা করা সম্ভব হয়। ইহাই বৈষ্ণব সাধকদের 'সিনান করিবি কেশ না ভিজাবি'। মানুষের সঙ্গে অহংকার হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার দেহ পর্যন্তের সম্বন্ধও পরকীয়। এই পরকীয় সম্বন্ধের মধ্যেই কৈবল্য ও লীলা এক অদ্বৈত। শ্রীনিত্যগোপাল প্রকৃতির অনন্তত্ব স্বীকার করিয়া এই লীলা-কৈবল্যের সমন্বয়ের পথই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আত্মা-অনাত্মা কেহই কাহারও 'কিছু-না', অথচ একে অন্যের সবটুকু। অনন্ত অভাবের সঙ্গে অনন্ত ভাবের সমন্বয়ের, অনন্ত না-এর সঙ্গে অনন্ত হাঁ-এর সমন্বয়ের উপরেই পুরুষোত্তম বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে। এই বিশ্বে কেহই কাহারও নয়: তাই মায়াবাদও আংশিক-ভাবে সত্য। আবার এই বিশ্বে প্রত্যেকেই অপরের সবটুকু; তাই বিষয়াসক্তিও এক হিসাবে সত্য। হারাইয়া-পাওয়া এবং পাইয়া-হারানোর মধ্য দিয়াই যোগমায়ার পথ বহিয়া চলিয়াছে।

পরমার্থদৃষ্টিতে প্রকৃতি পুরুষেরই সার, সত্ত্ব (content),—'আকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যতে।' আকাশ স্ত্রী দ্বারা পূর্ণ হন। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন ঃ "আত্মাকে পূর্ণ বলা হইয়াছে। সেইজন্য তিনি কোনো বিষয়ে অপূর্ণ নন। সেইজন্য তাঁহাকে অসগুণ-অসক্রিয় বলিলে তিনিও 'অপূর্ণ' স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাকে 'পূর্ণ' বলা হইয়াছে বলিয়া তিনি সগুণ-সক্রিয়ও বটেন। যাহাতে 'সমস্ত' আছে, তিনিই পূর্ণ; আত্মাতে 'সমস্ত' আছে সেইজন্য আত্মাও 'পূর্ণ'। আত্মা ব্যতীত 'সমস্ত' বলিয়া, 'আত্মা' ও 'সমস্ত' অভেদ বলা যায় না। কারণ আত্মা ও 'সমস্ত' অভেদ হইলে, আত্মা 'পূর্ণ' শব্দদ্বারা বিশেষিত হইতেন না। 'পূর্ণ' শব্দ অদ্বৈতবাচক নহে। আত্মাকে পূর্ণ বলিলে আত্মা ব্যতীত অপর কিছু নাই বুঝিবার কোন কারণ নাই; যেমন পূর্ণকুম্ভ বলিলে কেবলমাত্র কুম্ভ বুঝিবার কোন কারণ নাই,—পূর্ণকুম্ভ

বলিলে সেই কুম্ভ কোন বস্তুদ্বারা পূরিত বুঝিতে হয়; তদ্রূপ 'পূর্ণাত্মা' বলিলে আত্মা কোন বস্তু বা বহু বস্তুদ্বারা পূরিত বুঝিতে হয়। ” শ্রীনিত্যগোপালকৃত সিদ্ধান্তদর্শন, পৃঃ ২৩১-৩২। এই 'কোন বস্তু বা বহু বস্তুই' প্রকৃতি। এই বহুদ্বারাই পূর্ণ ব্রহ্ম পূরিত। প্রকৃতিকে 'অনন্ত' স্বীকার করিয়া লইলে বহু-প্রসবিনী প্রকৃতিই হন পুরুষের সার (content), যাহার দ্বারা পুরুষ পূর্ণ হন।

কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে-অন্তরে।
পূর্ণানন্দ-পূর্ণরসরূপ কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমারে আনন্দ দিতে ঐছে কোন্ জন॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আস্বাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥

*　　*　　*

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥

*　　*　　*

এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীকৃষ্ণ একান্ত পূর্ণ নন, তিনি নিত্য অপূর্ণও বটেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ একই স্বরূপ; শক্তি-শক্তিমান একই স্বরূপ। তাই এখানে পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকেও রাধিকার প্রেম উন্মত্ত করিয়া তোলে।

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রকৃতি অনন্ত বলিয়াই পুরুষ কৃষ্ণের পক্ষে 'উন্মত্ততা', 'বিহ্বলতা' প্রভৃতি 'মহা-গুণায়ন্তে'। প্রকৃতির পরারূপের ক্ষেত্রে, যোগমায়ার দেশেই এই পরস্পর বিরুদ্ধের সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে।

আমি যৈছে পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়।
রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময়॥—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই পরম সমন্বয়ের বারতা বর্তমান যুগের পদার্থবিদ্যাও পৌঁছাইয়াছে।

বর্তমান যুগের পদার্থবিদ্যা দ্রষ্টা-দৃশ্যের, সত্তা-শক্তির, আত্মা-অনাত্মার অবিভাজ্যতার বারতা সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিতেছে :—

'It used to be supposed that in making an observation on nature, as also in the more general activities of our everyday life, the universe could be supposed divided into two detached and distinct parts, a perceiving subject and a perceived object. Psychology provided an obvious exception, because the perceiver and the perceived might be the same; subject and object might be identical or might at least overlap. But in the exact sciences, and above all in physics, subject and object were supposed to be entirely distinct, so that a description of any selected part of the universe could be prepared which would be entirely independent of the observer as well as of the special circumstances surrounding him.

The theory of relativity (1905) first showed that this cannot be entirely so; the picture which each observer makes of the world is in some degree subjective. Even if the different observers all make their pictures at the same instant of time and from the same point of space, these pictures will be different unless the observers are all moving together at the same speed; then, and then only, they will be identical. Otherwise, the picture depends both on what an observer sees, and on how fast he is moving when he sees it.

The theory of Quantum carries us further along the same road. For every observation involves the passage of a complete quantum from the observed object to the observing subject, and a complete quantum constitutes a not negligible coupling between the observer and the observed. We can no longer make a sharp division between the two; to try to do so would involve making an arbitrary decision as to the exact point at which the division should be made. Complete objectivity can only be regained by treating observer and observed as parts of a single system; these must now be supposed to constitute an indivisible whole, which we must now identify with nature, the object of our studies. It now appears that this does not consist of something we perceive, but of our perceptions; it is not the object or subject-object relation, but the relation itself.'—Physics and Philosophy—by James Jeans, p. 143.

উপরোক্ত 'relation itself' পরকীয় রস, যেখানে সম্বন্ধের জন্যই সম্বন্ধের মূল্য ও প্রতিষ্ঠা। সম্বন্ধ যখন সম্বন্ধ হিসাবেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কাহার সঙ্গে কাহার সম্বন্ধ, কেন তাহাদের এই সম্বন্ধ—এ সব প্রশ্ন সম্বন্ধকে ছাপাইয়া উঠে না। তখন এই সম্বন্ধ বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে, এবং বিশ্ব একই আত্ম-সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়। এই সম্বন্ধের 'প্রয়োজন' হইতেছে 'প্রেম।' এই প্রেমই আত্মপ্রেম, পরমাত্মপ্রেম, ভগবৎপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, সমগ্র প্রেম। সমগ্র প্রেমে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ একটি অবিভাজ্য সমগ্র ('indivisible whole'). পরিপূর্ণ বস্তুতন্ত্রতা (complete objectivity) এই অবিভাজ্য সমগ্রকে আশ্রয়

করিয়াই মাত্র উপলব্ধ হইতে পারে। বস্তু তখনই হয় বাস্তব বস্তু, যখন তাহার বুকে ভোক্তা ও ভোগ্য গলিয়া গিয়া একাত্মভূমি হয়। 'রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ'।

স্বাত্মরতঃ, আত্মারাম ও অখণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গে রমণ করিলেন। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণজীবনে আত্মরতির সঙ্গে, অখণ্ডিত থাকার সঙ্গে যুক্তির দিক হইতে রমণের কোনই বাধার সৃষ্টি হয় নাই। জীবন একটি অনন্ত হওয়ার ধারা ('process of becoming'). এই process of becoming একটি স্বয়ংমূল্যবান তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ এবং অপর স্বয়ং মূল্যবান তত্ত্ব শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণের মত শ্রীরাধাও আদ্যা, অনাদ্যা ও অনন্তা। দুই-ই অভেদ প্রভেদভাবে নিত্য সত্য।

বিশ্বের সকল সম্বন্ধই পরকীয়, ইহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সৎ ও অসৎ এর সম্বন্ধও পরকীয়। সৎ-অসৎ-এর সম্পর্ক পরকীয় বলিয়াই দুইকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি পরস্পরনিরপেক্ষ মতবাদ গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। সৎ-অসৎ-কে আশ্রয় করিয়া যুযুৎসু দুইটি মতবাদ সৃষ্ট হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে পরস্পরাপেক্ষতাও রহিয়াছে। যাহারা একান্তভাবে বিসদৃশ (dis-similar) তাহারা পরস্পরস্পর্ধীও হইতে পারে না। পারস্পরিক স্পর্ধার ভিতর দিয়া স্ফুরিত হয় একটি পারস্পরিক যোগ। পরস্পর পরস্পরকে স্বীকার বা অস্বীকার যাহাই করি না কেন, ইহারা যে একই অবিভাজ্য সমগ্রেরই দুইটি দিক (aspects) তাহাতে সন্দেহ নাই। সৎ-অসৎ-এর পরকীয় সম্বন্ধ আমরা গীতোক্ত—

'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ নাভাব বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তঃ অনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥—এই শ্লোকের মধ্যে আস্বাদন করিব।

আচার্য শঙ্করের দৃষ্টিকোণে আত্মা 'সৎ', তাহাই বৌদ্ধের দৃষ্টিকোণে. চার্বাকের দৃষ্টিকোণে 'অসৎ'। আচার্য শঙ্করের দৃষ্টিকোণে একত্ব, স্থিরত্ব প্রভৃতি 'সৎ' বৌদ্ধের দৃষ্টিকোণে উহারাই 'অসৎ'। বৌদ্ধদর্শনে 'একত্বাদিভ্রান্তিঃ অবিদ্যা।' পক্ষান্তরে বৌদ্ধের দৃষ্টিকোণে যাহা 'সৎ', ক্ষণবিজ্ঞান, আচার্য শঙ্করের দৃষ্টিকোণে তাহাই 'অসৎ' মায়া। আচার্য শঙ্কর ভাবুকের দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; বৌদ্ধদর্শন, চার্বাকদর্শন রসিকের দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্বের ব্যাখ্যা করিয়াছে। শঙ্কর দিয়াছেন ভাবের মূল্য, কালাতীতের মূল্য; বুদ্ধ দিয়াছেন রসের মূল্য, ক্ষণের মূল্য। শ্রীকৃষ্ণ একাধারে শঙ্করদর্শন, চার্বাকদর্শন ও বৌদ্ধদর্শনের মূর্তিমান দৃষ্টান্ত। তিনি সর্ব দর্শনেরই 'অন্ত' দেখিয়াছেন; তাই তিনিই দৃষ্টান্ত, তিনিই সর্বদর্শনসংগ্রহ।

পুরুষোত্তম শ্রীচরণতল হইতেই প্রাণের পথের উদ্ভব। শ্রীনিত্যগোপাল এই প্রাণপথকেই বিশ্বময় প্রসারিত করিবার প্রয়োজন লইয়া অবতীর্ণ। আজ বিশ্বকে

ভাব ও রসের সমন্বয়ঘন প্রাণের দৃষ্টিকোণে দেখিবার দিন আসিয়াছে। প্রাণ সর্বাত্ম, সর্বমতবাদসমন্বয়ঘন। 'সর্ববাদাবিষয়প্রতিরূপশীল' নর-নারায়ণ জয়যুক্ত হউন। বন্দেমাতরম্

টেলিগ্রাম

(Boleslav Prus রচিত পোলিস্ গল্পের ছায়াবলম্বনে)

ফুল্লরা রায়

রাষ্ট্রপতি কন্যা একটা অনাথ আশ্রম দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে একটা ব্যাপার দেখে ভারি বিচলিত হন। কয়েকটি ছেলে মিলে একটা বই নিয়ে টানাটানি করে ছিড়ছিলো। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"এই তোমরা কি করছো? বই তো আর সন্দেশ নয় অমন করে ছিনিয়ে নিচ্ছ কেন?" হ্যাংলা মত একটা ছেলে বলল—"ও আমার কাছ থেকে 'হ-য-ব-র-ল'টা কেড়ে নিল কেন?"

ওদিক থেকে আর একদল চেঁচিয়ে উঠল—"না দিদিমণি, আমি আগে পেয়েছিলাম।" আরো দুইজন সে দাবী উত্থাপন করে বসল।

অনাথ আশ্রম পরিচালিকারা লজ্জায় আধোবদন হয়ে জানালো মাননীয়া অতিথি যেন কিছু মনে না করেন—ছোট ছেলেরা এরকম করেই থাকে, আর অনাথ আশ্রম লাইব্রেরিতে এত বইয়ের অভাব যে বই নিয়ে মারপিট একরকম দৈনন্দিন ব্যাপার মাত্র। রাষ্ট্রপতি কন্যার মনে এ ব্যাপারটা বেশ লেগেছিল। একটা সামান্য বই নিয়ে এরকম কাড়াকাড়ি তাঁর মনে ব্যথা দিয়েছিল। অবশ্য তিনি অল্পক্ষণ পরেই ব্যাপারটা হয়ত ভুলেই গিয়েছিলেন—কিন্তু কয়েকদিন পরে জনসেবক সংঘের ঘরোয়া বৈঠকে হঠাৎ তাঁর এ ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। তিনি সাড়ম্বরে এ ঘটনা বর্ণনা করে জানালেন অবিলম্বে তাদেরকে সাহায্য করা উচিত। জনসেবক সংঘের সদস্য সদস্যাদের ব্যাপারটা বেশ ভালোই লাগল। অনেকেই দুঃখে বিচলিত হলেন, সম্পাদক মহাশয় তো প্রায় কেঁদেই ফেললেন। তিনি ধরা গলায় বললেন—"অবিলম্বে অনাথ আশ্রমকে কিছু টাকা দেওয়া উচিত ছিল—কিন্তু এখানে গার্ডেন পার্টিতেই সব খরচ হয়ে গেছে।" তা ছাড়া তিনি নিজেই কিছু বই দিতে পারতেন, তাঁর বাড়ীতে গ্রন্থকারদের কাছ থেকে উপহার পাওয়া এক আলমারী বইও ছিল। কিন্তু এখন সেগুলো কে কবে পড়তে ধার নিয়েছে, সেগুলো সংগ্রহ করে ওঠাও তাঁর পক্ষে বোধহয় এখন সম্ভব নয়। তবে কালই তাঁর অধ্যাপক বসুর বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন আছে, তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে নিশ্চয় সাহায্য পাওয়া যাবে। পরদিন সম্পাদক মহাশয়

অধ্যাপক বসুর কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বললেন--"আর যাই হোক্‌—রাষ্ট্রপতি কন্যা নিজ মুখে যখন চেয়েছেন—তাঁর জন্যে একটা কিছু করার বিশেষ দরকার।"

অধ্যাপক বসুর সারাজীবন জনসেবায় কেটেছে। তিনি অনাথ ছেলেদের দুঃখে বিগলিত হয়ে পড়লেন। তা ছাড়া তাঁর ইদানীং কটা ব্যাপারে নাম খারাপ হয়ে গেছে। এরকম একটা কিছু করলে হয়ত তাঁর সুনাম ফিরেও আসতে পারে। তিনি বিশেষ উৎসাহ নিয়ে বললেন—"খুব খাঁটি কথা। আমার যদি বই থাকতো আমিও দিয়ে দিতাম, কিন্তু আমার বই সব তো দামী দামী। সেগুলো তো দেয়া যায় না।...আচ্ছা, কালই আমি সমাচার পত্রিকায় এ নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে দিচ্ছি... তারপর দেখবেন।"

অধ্যাপক মশাই পরদিন সমাচার পত্রিকার অফিসে একটা আবেদন লিখে নিয়ে হানা দিলেন। সমাচার পত্রিকার তখন একটা এ ধরণের খবরের বেশ দরকার ছিল। প্রতিযোগী কাগজগুলোর ওপর এ ধরণের খবর প্রকাশ করে টেক্কা দেওয়া চলতে পারে। কাগজ বিক্রী বড্ড কমে যাচ্ছে। অধ্যাপক বসুর আবেদন তারা লুফে নিল। সংগে সংগে সম্পাদক নিজে হেড লাইন লিখে দিলেন।

—বইয়ের কাঙাল শিশুগণ
জনসাধারণ তাদের বই দিয়ে বাঁচান।

তারপর সবাই ঘটনাটা ভুলে গেলেন। কয়েকদিন পরে এক রবিবার আমি গিয়েছিলাম গল্প করার জন্যে সমাচার সম্পাদকের ঘরে। তাঁর ঘরে ঢুকবার দরজায় দেখলাম দাঁড়িয়ে থাকতে নোংরা কাপড় জামা পড়া অতি বুড়ো গরীব একজন লোককে। দেখে মনে হল মজুর শ্রেণীর লোক। তার সংগে একটা রোগা ফ্যাকাসে ছেঁড়া জামা পড়া কালো ছোট মেয়ে, দুজনের হাতেই একগাদা করে বই।

"কি চাই তোমাদের?"

প্রশ্নের উত্তরে বুড়ো লোকটা বেশ ঘাবড়িয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলল "হেঁ হেঁ, আমরা কটা বই এনেছি। ওই যে ছেলেমেয়েদের বই চেয়ে ছেপেছেন!"

ছোট মেয়েটা বইয়ের ভারে নুয়ে পড়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি বইগুলো তার হাত থেকে তুলে নিলাম—রামায়ণ, মহাভারত, কথামালা প্রভৃতি অল্পদামের কয়েকটা বই।

সম্পাদক প্রশ্ন করলেন—"তোমার নাম কি?"

বুড়ো বেশ বিব্রত বোধ করে বলল—"হেঁ হেঁ, আমাদের আবার নাম কি!"

আমি বললাম—"তোমাদের নাম যে কাগজে ছাপা হবে! নামটা দরকার যে।"

বুড়ো বলল—"নাম দরকার নেই বাবু। আমি ওই মোড়ের দোকানে বিড়ি বাঁধি, আর আমার মেয়ে ইস্কুলের ঝিয়ের কাজ করে। গরীব ছেলেরা বই পড়তে পারছে না তাই শুনে আমরা খরচ বাঁচিয়ে টাকা জমিয়ে এ কটা বই কিনে দিয়ে

গেলাম।”

এই বলে তারা চলে গেল।

কেমন যেন ভাল লাগছিল ভাবতে ঠিক যেন একটা টেলিগ্রামে উত্তর প্রত্যুত্তর হয়ে গেল। অনাথ আশ্রমের অনাথ ছেলেমেয়েরা ডাক দিল—তার দেশবাসী বিড়ী-ওলা আর তার মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাঠাল। আর আমরা টেলিগ্রামের পোস্টের মতো সে ডাক বহন করলাম।

‘যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই; যে জয় করে, ভোগ করা তাহাকেই সাজে। যে লোক জীবনের সঙ্গে সুখকে, বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না, তাহাকে উচ্ছিষ্টমাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর মৃত্যুর আহ্বানমাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না, তাহাদের [illegible] দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তক্‌মা চাপরাসের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বলিষ্ঠ [illegible] কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে। যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব।’

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্বানুবৃত্তি)

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।

প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৭।৮

(কোন্ কোন্ ধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট তোমাতে এই সর্ব্ব প্রোত—এই প্রকার প্রশ্নের সম্ভাবনা জানিয়াই বলিতেছেন) রসঃ অহম্ [আমি সর্ব্বরসসমন্বিত দিব্য রস] অপ্সু [জলসমূহে; রসভূত 'আমি'তে জলের প্রতিকণা ও সর্ব্বকণা ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে অন্তর-বাহিরে প্রোত] হে কৌন্তেয়, [যেরূপ রসে সর্ব্বজল ওতপ্রোত, সেইরূপ] প্রভা অস্মি [আমি প্রভাও] শশিসূর্য্যয়োঃ [চন্দ্র ও সূর্যে], প্রণবঃ [ওংকার] সর্ব্ববেদেষু [সর্ব্ববেদে; প্রণবভূত 'আমি'তে সর্ব্ববেদ ব্যাপ্য ব্যাপকরূপে অন্তর-বাহিরে প্রোত], শব্দঃ খে [আকাশে আমি শব্দ; সারভূত শব্দ 'আমি' দ্বারা] (সেইরূপ) পৌরুষং [পুরুষের স্বভাব, যাহার দ্বারা 'এই ব্যক্তি পুরুষ'-এইরূপ বুদ্ধি নিজের কাছে ও অপরের কাছে উৎপাদিত হয়। পুরুষোত্তমত্বই পুরুষের সত্য বাস্তব পৌরব] নৃষু [মনুষ্য মধ্যে; এই পুরুষোত্তমত্বেই পুরুষসমূহ অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে গ্রথিত রহিয়াছে]।

হে কৌন্তেয়, আমি জলে রস রূপে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে অন্তরে বাহিরে প্রোত; চন্দ্র সূর্যে আমি প্রভা, সর্ব্ববেদে আমি প্রণব, আকাশে শব্দ, নরসমূহে আমি পৌরুষ। ৭।৮

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।

জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৭।৯

পুন্যঃ [সুরভি-সুগন্ধির দ্বন্দ্বমোহমুক্ত সর্ব্বগন্ধময় দিব্য সহজ] গন্ধঃ [সহজ পুরুষোত্তম গন্ধ] পৃথিব্যাম্ চ [এবং পৃথিবীতে; যে দিব্য গন্ধের মাঝে পৃথিবীর সব কিছু অন্তরে বাহিরে প্রথিত; পৃথিবীতে বা জলে, গন্ধে বা রসে যে দ্বন্দ্বমোহ ফুটিয়া উঠে, তাহা বিচ্ছিন্ন অহং-এর স্তরে দাঁড়াইয়া ভাগবতী প্রকৃতি না দেখারই মিথ্যাজ্ঞানময় ফলমাত্র], তেজঃ চ অস্মি [আমি সর্ব্বতেজ সমন্বিত দিব্য তেজ হই] বিভা বশৌ [অগ্নিতে], জীবনং [যাহাদ্বারা জীবসমূহ জীবন্ত থাকে, সেই জীবন-রূপ আমি] সর্ব্বভূতেষু [সর্ব্বভূতে], তপঃ চ অস্মি [এবং তপ রূপে আছি] তপস্বিষু [তপস্বিসমূহে; এই তপস্যার মধ্যেই তপস্বিগণ প্রোত]।

পৃথিবীতে আমি পুণ্য গন্ধ; অগ্নিতে আমি তেজ, সর্ব্বভূতে জীবন, তপস্বিগণে তপস্যা। ৭।৯

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধিবুর্দ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ৭।১০

(আরও) বীজং [দৃশ্য দৃক্ সমন্বয় রূপ প্ররোহকারণ বলিয়া] মাং [পুরুষোত্তম আমিকে] সর্ব্বভূতানাং [সর্ব্বভূতের] বিদ্ধি সনাতনম্ [সনাতন অথচ নিত্য নবীন বলিয়া জান; একান্ত দৃশ্যও নয়, একান্ত দৃক্ও বীজ নয়। সর্ব্বভূত একান্ত পরিণামের বা একান্ত বিবর্ত্তের ফল নয়। 'যস্তাত্ত্বিকোঽন্যথাভাবঃ পরিণাম উদীরিতঃ। অতাত্ত্বিকোঽন্যথাভাসো বিবর্ত্তঃ স উদীরিতঃ'—কোন মূল বস্তু হইতে যখন তাত্ত্বিক অন্যথা ভাব হয়, যেমন দুগ্ধ দুগ্ধরূপ তত্ত্বকে পরিত্যাগ করিয়াই দধি হয়, তখন তাহা পরিণাম। কিন্তু তত্ত্ব পরিত্যাগ না করিয়া যে অন্যথাভাব, তাহাই বিবর্ত্ত; যেমন বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ব্রহ্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জগৎরূপে ভাসমান হইলে তাহা হয় বিবর্ত্ত। পুরুষোত্তম পরিণাম বিবর্ত্তের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব দর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতের দৃষ্টান্ত কীটপেশস্কৃত; 'কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং যেন প্রবেশিতঃ। যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্'—পেশস্কৃত দ্বারা কুড়ীতে প্রবেশিত কীট যেমন পেশস্কৃতের ধ্যান করিতে করিতে নিজের দেহ পরিত্যাগ না করিয়াই পেশস্কৃতের সাত্মতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই পুরুষোত্তম-প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্য এই সর্ব্ব জগৎও পুরুষোত্তমকে ধ্যান করিতে করিতে নিজের পূর্ব্ব পুরুষোত্তম-রূপত্ব পরিত্যাগ না করিয়াই 'অন্যথা'-ভাব প্রাপ্ত হয়] বুদ্ধিঃ [ব্যবসায়াত্মিকা, সর্ব্ব বুদ্ধিসমন্বয়রূপিণী ভবানী-বুদ্ধি] বুদ্ধিমতাং [বুদ্ধিমানদিগের] অস্মি [আমি], তেজঃ [প্রাগল্ভ্য] তেজস্বিনাম্ [তেজস্বিগণের]।

হে পার্থ, আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও, বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি ও তেজস্বিগণের তেজ আমি।৭।১০

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ৭।১১

(যে যে যোগ্যতা থাকিলে বিশ্ব পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে পারে, সেই সেই যোগ্যতা রূপেই প্রতি বস্তুতে তিনি রহিয়াছেন ইহাই অর্জ্জুনকে বলিতেছেন) বলং [সর্ব্বস্তরে বিশ্বসম্পদ বিলাইয়া দিবার উপযোগী প্রাণ রূপ বল; বিশ্বসম্পদ কাড়িয়া নিজের ভোগে লাগাইবার বল তিনি নন্] অস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতং [আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছারূপ কাম ও আত্মপ্রীতি লাভ করিবার জন্য বিশ্বসম্পদের প্রতি যে অন্যায় রাগ বা আসক্তি; তাহা দ্বারা বর্জ্জিত 'বল'ই আমি; যে বলদ্বারা বিশ্ব পুরুষোত্তমরাগে বলীয়ান হয়, সেই বলই তিনি] ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ [আত্মধর্ম্ম ও অনাত্মধর্ম্ম সমন্বিত, প্রাণধর্ম্ম ও প্রজ্ঞাধর্ম্ম সমন্বিত পুরুষোত্তম ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ, সামঞ্জস্য যুক্ত] ভূতেষু [ভূতসমূহে] কামঃ অস্মি [আমিই মদনমোহন, মূর্ত্তিমান কাম) হে ভরতর্ষভ।

আমি বলবানগণের কামরাগবর্জ্জিত বল, হে ভরতর্ষভ, আমিই ভূতসমূহে ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম। ৭।১১

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ৭।১২

(এক্ষণে গুণের বুকে পুরুষোত্তম-সৃষ্টির রহস্যকথা শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে শুনাইতেছেন) (আরও) যে চ [অন্যান্য] এব সাত্ত্বিকাঃ [সত্ত্বগুণ হইতে জাত] ভাবাঃ [ভাবসমূহ যথা শমদমাদি, পদার্থসমূহ, জন্তুসমূহ] রাজসাঃ [রজোগুণোৎপন্ন দ্বেষদর্পাদি রাজস ভাবসমূহ, পদার্থসমূহ, জন্তুসমূহ] তামসাঃ চ [এবং তমোগুণোৎপন্ন শোকমোহাদি, পদার্থসমূহ, জন্তুসমূহ] মত্তঃ এব [আত্মা-অনাত্মা সমন্বিত আমার জীবনেরই বিভিন্ন আস্বাদন বুকে লইয়া আমা হইতেই] ইতি [এইরূপে] তান্ [ভিন্ন ভিন্ন সেই সমস্তকে] বিদ্ধি [জানিয়া রাখ; এইভাবে জানিলে আমি ইহাদের মধ্যে এবং ইহারা আমার মধ্যে থাকিবে] তু [কিন্তু পুরুষোত্তম-আমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই বিভিন্ন ভাবসম্পদকে আমি সূত্রে গ্রথিত না করিলে এবং নিজের ভোগে ব্যবহার করিবার ছলে ইহাদিগের উপর ধর্ষণ চালাইলে যে ঐশ্বর্য্যের ক্ষেত্র সৃষ্টি হইবে, সেখানে তোমার কি দশা হইবে, তাহা বলিতেছি] অহম্ তেষু [আমি তাহাদিগের মধ্যে নাই; আমি তাহাদের দ্বারা ব্যাপ্য হইয়া থাকি না, অধর হইয়াই থাকি অথচ] তে [তাহারা থাকিবে] ময়ি [আমার মধ্যে; আমি থাকিব ব্যাপক, তাহারা থাকিবে ব্যাপ্য। 'আমাকে বড় মানে আপনাকে হীন। সেই প্রেমে বশ আমি না হই অধীন'॥ শ্রীভগবান পরেই বলিবেন—'যে ভজন্তি তু মাম্ ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'। ভক্তির সাধনায় ভক্ত শ্রীভগবান দুই-ই দুয়ের ব্যাপ্য-ব্যাপক, উপাধিবিধুর সহজ সম্বন্ধে যুক্ত]।

যে সকল ভাব সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস সে সকল আমা হইতেই জাত জানিও; কিন্তু ঐশ্বর্য্যদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্নদর্শনে দেখিলে আমাতে তাহারা আছে, তাহাদিগেতে আমি নাই। ৭।১২

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ৭।১৩

(পুরুষোত্তম হইতে 'অন্য' বুদ্ধিতে তাঁহার প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতি জাত ভাবসমূহকে আত্মপ্রীতির জন্য ব্যবহার করিতে গেলে যে অনর্থের সৃষ্টি হইবে তাহাই অর্জ্জুনকে বলিতেছেন) ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ [পরস্পরস্পর্দ্ধী, পরস্পরকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে যে তিন গুণ, সেই তিন গুণ প্রচুর আছে যাহাদের মধ্যে এমন] এভিঃ ভাবৈঃ [এই ভাবসমূহ দ্বারা] সর্ব্বম্ ইদং জগৎ [পুরুষোত্তমতত্ত্ব হইতে চ্যুত, রাগদ্বেষের স্তরে স্থিত এই সারা দুনিয়া] মোহিতং [সংঘর্ষময়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে মূঢ় হইয়া] ন অভি জানাতি [স্বরূপে অনাদিকাল হইতে জানা, স্বতঃসিদ্ধভাবে জানা আমাকে দ্বন্দ্বময়ী প্রকৃতির বুকে পুনরায় 'জানা'-রূপ অভিজ্ঞান লাভ করে না; গীতায় 'অভিজানাতি' পদটী বহুবার আসিয়াছে, "পূর্ব্বজ্ঞাতস্য জ্ঞানমভিজ্ঞা"—যেমন কণ্বের আশ্রমে সকল দুনিয়ার আড়ালে পরস্পরের বুকে বুক মিলাইয়া দুই চারিজন সখীর মধ্যে 'জানা' দুষ্মন্তকে শকুন্তলা পুনরায় জানিয়াছেন

দুনিয়ার বুকে প্রকাশ্য দিবালোকে সর্ব্বভূতের কোলে। এই দ্বিতীয় বার 'জানার' শাস্ত্রই শ্রীগীতা। প্রথম 'জানা' তো স্বরূপগত জানা; তাহা জীবের স্বতঃসিদ্ধই রহিয়াছে] মাম্ [আমাকে], এভ্যঃ [ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে যুক্ত ইহাদের প্রত্যেকটীকে স্বয়ম্পূর্ণ করিয়াও প্রতিটী হইতে এবং সবগুলি হইতে] পরং [অনুগ থাকিয়াও অতীত পরকীয় রূপে প্রতিষ্ঠিত পর পুরুষ আমাকে] অব্যয়ম্ [অনন্ত ব্যয়ের মধ্যে, পরিণামের মধ্যে থাকিয়াও অব্যয়, অতত্ত্বাভাব, অচ্যুত]।

এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবদ্বারা মোহিত এই সকল জগৎ এই ভাবত্রয় হইতে পর, অব্যয় আমার অভিজ্ঞান লাভ করেন না। ৭।১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭।১৪

(পুরুষোত্তমস্তর-চ্যুত পুরুষের কাছে মায়া কি জটিল কুটিল রূপে ফুটিয়া উঠে, তাহা বলিয়া উদ্ধারের পথ দেখাইতেছেন)। (পুরুষোত্তম-চ্যুত পুরুষের কাছে) দৈবী [পুরুষোত্তম-জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়ী ও পুরুষোত্তম-ক্রীড়ায় ক্রীড়াশীলা, গুণকৌলীন্যবর্জ্জিতা 'স্বগুণৈর্নিগূঢ়া'] হি [নিশ্চয়ে] এষঃ [এই পরমা] গুণময়ী [গুণসমূহের উপাধিবিধুর সহজ সম্বন্ধ যুক্ত পুরুষোত্তম-গুণময়ী] মম [পুরুষোত্তম-'আমি'র] মায়া [প্রকৃতি Higher Nature] দুরত্যয়া [দুঃখে অত্যয় অর্থাৎ অতিক্রমণ যাহার; অর্থাৎ যাহাকে অতিক্রম করা অসম্ভব। পুরুষোত্তম দৈবী গুণময়ী মায়া-প্রকৃতিতে 'সত্ত্বগুণই কুলীন এবং তাহার তুলনায় রজোগুণ অকুলীন এবং তমোগুণ নিতান্ত অস্পৃশ্য' এইরূপ দ্বন্দ্বসংঘর্ষের হেতু কোনওরূপ গুণ-কৌলীন্যের স্থান নাই]. (কিন্তু) মাম্ এব [আমার স্তরে দাঁড়াইয়া, আমি-ময় হইয়া আমাকেই] যে [যাহারা] প্রপদ্যন্তে [প্রপন্ন হন] মায়াং এতাং [এই মায়া] তরন্তি তে [উত্তীর্ণ হয়; পুরুষোত্তমের সঙ্গে ত্রিভঙ্গ হইয়া ত্রিভঙ্গের দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া দেখিলেই সব কিছু আত্মা বিষয়ক রহস্য ফুটিয়া উঠে; তথ্য না জানার আঁধার হইতে পুরুষ উত্তীর্ণ হয়]।

সেই আমার দৈবী গুণময়ী মায়া নিশ্চয়ই দুরত্যয়া; আমাতেই যাহারা প্রপন্ন, তাঁহারা এই মায়া উত্তীর্ণ হন। ৭।১৪

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ৭।১৫

(তোমাতে প্রপন্ন পুরুষগণ যদি মায়া উত্তীর্ণ হন, তবে কেন সকলেই তোমাকে প্রপন্ন হয় না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) (এইবার কর্ম্মের ক্ষেত্রে পুরুষোত্তম-কৃষ্টির প্রসঙ্গ তুলিতেছেন) ন মাং দুষ্কৃতিনঃ [দুষ্কৃতকারিগণ; আমার স্তরের বাহিরে সুকৃত-দুষ্কৃত সবই দুষ্কৃত-পদ বাচ্য]। (যেহেতু) মূঢ়াঃ [সুকৃত-দুষ্কৃতের দ্বন্দ্বমোহে মোহাচ্ছন্ন] প্রপদ্যন্তে [প্রপন্ন হয় না] নরাধমাঃ [নরের অধম যাহারা]; (তাহারা মায়য়া [পরস্পরসংঘর্ষ-মূলক মিথ্যাজ্ঞানময়ী দম্ভদ্বারা—'মায়া দম্ভে কৃপায়াং স্যাৎ']

অপহৃতজ্ঞানাঃ [অপহৃত হইয়াছে উপাধিবিধুর সহজ লীলা সম্বন্ধাত্মক দিব্যজ্ঞান যাহাদের] আসুরং ভাবম্ [একান্ত প্রজ্ঞাবাদ ও একান্ত প্রাণবাদ রূপ বিবিধ জ্ঞানযুক্ত আসুর ভাব; 'পরমাত্মভাবমপেক্ষ্য দেবাদয়েঽপি অসুরাঃ'—শাঙ্কর ভাষ্য] আশ্রিতাঃ [আশ্রিত হয়]

মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান আসুর ভাবাশ্রিত দুষ্কৃতি মূঢ় নরাধমগণ আমার প্রপন্ন হয় না। ৭।১৫

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ৭।১৬

(যাহারা নরোত্তম, সুকৃতি, তাঁহারা কি করেন, তাহাই বলিতেছেন) চতুর্ব্বিধাঃ [চারি প্রকার] ভজন্তে [সেবা করেন] মাং [আমাকে] জনাঃ [জনসমূহ] সুকৃতিনঃ [সুকৃত পুরুষোত্তমের প্রেরণা-প্রাপ্ত সুকৃতিগণ; 'তদাত্মানং স্বয়ম কুরুত তৎ সুকৃতম্ উচ্যতে' —ব্রহ্ম স্বয়ম্ নিজে নিজকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বলিয়া তাঁহাকে 'সুকৃত' বলা হয়। নিজকে দিয়া নিজের মধ্যে নিজকে আহুতি দিয়া গড়িয়া তোলাই 'সুকৃতি'; সুকৃতই 'রসো বৈ সঃ'] হে অর্জ্জুন; (এই সুকৃতের স্তরে চারি প্রকার পুরুষের কথা বলিতেছেন) আর্ত্তঃ [অসহায়; যেমন কুরু সভায় লাঞ্ছিত দ্রৌপদী, ইন্দ্র ভয়ে ভীত ব্রজবাসীগণ, কুম্ভীর গজেন্দ্র প্রভৃতি] জিজ্ঞাসুঃ [তত্ত্বজিজ্ঞাসু; যেমন মুচুকুন্দ, জনক প্রভৃতি] অর্থার্থী [যে কোনও প্রকারের অর্থলিপ্সু; যেমন রাজ্যাভিলাষী ধ্রুব] জ্ঞানী চ [এবং জ্ঞানী; সুকৃত পুরুষোত্তমের খোঁচা যাহাদের বুকে জাগ্রত, সেই খোঁচা বুকে লইয়াই যাহাদের যাত্রা হইয়াছে, তাঁহারা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, বা জ্ঞানী, যাহাই হউন না কেন, কৃষ্ণকেই ভজনা করেন। 'কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে সেও পায় কৃষ্ণ রসে'। সব-কিছু সাধনার আরম্ভ যদি হয় পুরুষোত্তমের প্রেরণা, তবেই বটে সেখানে সত্য বাস্তব সিদ্ধি লাভ] (সকলের সঙ্গেই রহিয়াছে পুরুষোত্তমের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ) হে ভরতর্ষভ।

চতুর্ব্বিধ সুকৃতী যথা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু অর্থার্থী ও জ্ঞানী আমার ভজনা করেন। ৭।১৬

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ৭।১৭

তেষাং [সেই চারি প্রকারের মধ্যে] জ্ঞানী [তত্ত্ববিৎ] নিত্যযুক্তঃ [তত্ত্বজ্ঞান হেতু নিত্য-যুক্ত]একভক্তিঃ [অন্য কোনও ভজনীয়ের অদর্শন হেতু একমাত্র পুরুষোত্তমেই ভক্তি যাহার, তিনিই একভক্তি] বিশিষ্যতে [বিশেষত্ব প্রাপ্ত হন; কেননা একমাত্র পুরুষোত্তমই সর্ব্ব ভজনীয়ের সমন্বয় বলিয়া ভগ অর্থাৎ ভজনীয়গুণসম্পন্ন 'ভগবান', এবং তাঁহার ভজনেই অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স রূপ সর্ব্বফল-সমন্বয় অনায়াসে অযাচিত ভাবেই লাভ হয়] (এইরূপ ফল ভগবান ভক্তকে দেন কোন্ কৌশলে?) হি [যেহেতু] অহম্ প্রিয়ঃ [পুরুষোত্তম আমি তাঁহাদের প্রিয়, প্রিয়তম; সেইজন্যই সকলে আমার 'আমি'র ভাষায়

নিজেদের পরিচয় প্রদান করে। জ্ঞানীর যে 'আমি', তাহা পুরুষোত্তম-অহম্ই] জ্ঞানিনঃ [জ্ঞানীর] অত্যর্থং [অতীব], সঃ চ [এবং সে] মম প্রিয়ঃ [আমার প্রিয়; যাহা আমার, তাহাই ভক্তের; যাহা ভক্তের তাহাই আমার। আমি ও ভক্ত একতনু, এক-প্রজ্ঞা, একমন, একবিজ্ঞান, একানন্দ; তাই তো তাঁহাকে অদেয় আমার কিছু নাই]।

তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানী, নিত্যযুক্ত, একভক্তিই বিশিষ্টত্ব লাভ করেন; যেহেতু জ্ঞানীর প্রিয় আমি এবং আমার প্রিয় সে।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ৭।১৮

(তবে কি আর্ত্ত প্রভৃতি অন্যান্য ভক্ত তোমার প্রিয় নন? এই আশংকার উত্তরে বলিতেছেন) উদারাঃ [দাতা; যেহেতু আত্মদানই ইহাদের একমাত্র সম্বল] সর্ব্বে এব এতে [ইহারা সকলেই] জ্ঞানী তু [জ্ঞানী যদি তাহারা; শরণাগতির ভিতর যাহাদের পরিণামে পুরুষোত্তমে অনন্য বুদ্ধির স্ফুরণ হইয়াছে, তাঁহারা আর্ত্ত-জিজ্ঞাসু-অর্থার্থী জ্ঞানী যাহাই হউন না কেন, সকলেই জ্ঞানীপদ বাচ্য; শরণাগতিই সত্য বাস্তব জ্ঞান] আত্মা এব [আমি নিজেই] মে মতম্ [ইহাই আমার অভিমত]; হি [যেহেতু] আস্থিতঃ [শক্ত হইয়া নিজের স্থানে স্থিত হইয়াছে] সঃ [সেই জ্ঞানী] যুক্তাত্মা ['আমিই অনন্য-পুরুষোত্তম আমি'—এই প্রকারে সমাহিত হইয়াছে চিত্ত অহংকার বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়-দেহ যাহার] মাম্ এব [ব্রহ্ম পুরুষোত্তম আমাকেই] অনুত্তমাং [যাহা হইতে উত্তম আর নাই, এমন অনুত্তমা] গতিং [পদ;তাঁহারা গন্তব্যকে পাইবার জন্য কোমর কসিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে]।

ইহারা সকলেই উদার, দাতা; কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মা ইহাই আমার নিশ্চয়। যেহেতু সমাহিতাত্মা জ্ঞানী আমাকেই অনুত্তমাগতি বলিয়া শক্ত করিয়া আশ্রয় করিয়াছেন। ৭।১৮

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ৭।১৯

(জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন) বহূনাং জন্মনাং [বহু জন্মের; মধুকরদের মাধুকরী দ্বারা মধুসংগ্রহের মত পুরুষোত্তম জ্ঞানের অনুকূল সংস্কার ও অভিজ্ঞতা লাভের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য লইয়া জন্ম হইতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হওয়ার] অন্তে [শেষে মধুবিদ্যা রসের আস্বাদন-চতুর] জ্ঞানবান্ [জ্ঞানবান] মাং [সর্ব্ব বিশ্বের অঙ্গ-নিংড়ানো রসফল আমি-পুরুষোত্তমদেবের] প্রপদ্যতে [প্রপন্ন হন] (কিরূপ জ্ঞানলাভ করেন?) বাসুদেব [দৃক্‌দৃশ্যোপরক্ত সর্ব্বার্থ চিত্তের, বিশুদ্ধ সত্ত্বের দেবতা বাসুদেব: 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।' বিশুদ্ধ সত্ত্বই বসুদেব; সেই সর্ব্বসংঘর্ষ বর্জ্জিত, অন্যোন্যমৈথুনরত দৃশ্য-দৃক দ্বারা উপরক্ত, সর্বার্থ-বিশুদ্ধ চিত্তে অনাবৃত না থাকিয়া প্রকাশিত হন বলিয়াই তিনি বাসুদেব; 'বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বসত্যস্মিন্নিতি বা বসু, দিব্যতি দ্যোততে ইতি দেবঃ।

বসুভিপূর্ণৈর্যদীব্যতি প্রকাশতে ইতি বা বসুদেবশব্দ-বাচ্যং বিশুদ্ধং সত্ত্বম্' বাহিরের জগতে বসুদেবের গৃহে যেমন তুমি প্রকাশিত, জীবনের ভিতরে যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব রূপ কোল, সেখানেও জীবনমন্থনধন রূপে তুমি তেমনই প্রকাশিত] সর্ব্বম্ ইতি ['বাসুদেবই সব', সর্ব্বার্থ চিত্তের, সর্ব্ববিশ্বের বুক নিংড়াইয়া প্রকাশিত ব্রহ্ম বস্তুই বাসুদেব। বাসুদেবকে পাইতে হইলে প্রকৃতির সকল স্তরে মাধুকরী করিতেই হইবে। জন্ম-জন্মান্তর ভ্রমণ ভ্রমবশতঃ নয়; ইহার মূলে রহিয়াছে কৃষ্ণান্বেষণেরই প্রেরণা] সঃ [সেই প্রকার] মহাত্মা [যাহার সমানও কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই; তাই তো] সুদুর্ল্লভঃ [সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যেও সুদুর্ল্লভ]।

বহু জন্ম ধরিয়া কৃষ্ণান্বেষণের পরে 'সবই বাসুদেব'—এই প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়া জ্ঞানবান আমাকে প্রাপ্ত হন; এই প্রকার মহাত্মা সুদুর্ল্লভ। ৭।১৯

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্য দেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ৭।২০

('ন মাং দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়া প্রপদ্যন্তে'—দুষ্কৃতিগণ আমার প্রপন্ন হয় না; তবে তাহাদের কি গতি হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন) (আমার স্তরের বাহিরে কামী-কাম-কাম্যের মধ্যে শক্ত 'অন্য'-বুদ্ধির ব্যবধান রাখিয়া কামীগণ যে যে কাম কামনা করে) কামৈঃ তৈঃ তৈঃ [সেই সেই কামসমূহ দ্বারা] হৃতজ্ঞানাঃ [হৃত হইয়াছে, চুরি হইয়া গিয়াছে জ্ঞান অর্থাৎ কামী-কাম-কাম্যের মাঝের পরকীয় সম্বন্ধাত্ম জ্ঞান যাহাদের, তাহারা] প্রপদ্যন্তে [প্রপন্ন হয়] (সর্ব্ব দেবময় আমাকে ছাড়িয়া) অন্যদেবতাঃ [অন্য বুদ্ধিতে খণ্ড খণ্ড দেবতার] তং তং নিয়মং [যে যে দেবতার আরাধনায় যে যে কর্ত্তৃ-তন্ত্র নিয়ম রহিয়াছে, সেই সেই নিয়ম] আস্থায় [অবলম্বন করিয়া] (কেন তাহারা খণ্ড দেবারাধনার নিয়ম অবলম্বন করে?) প্রকৃত্যা স্বয়া [পুরুষোত্তমপ্রকৃতির আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জন্মান্তরার্জ্জিত সংস্কারবিশেষযুক্তা, খণ্ডিতা যান্ত্রিক প্রকৃতি দ্বারা নিয়তাঃ [বিধির শক্ত নিগড়ে নিয়মিত]।

সেই সেই কামনা দ্বারা হৃতজ্ঞান পুরুষগণ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক স্বকীয় যান্ত্রিক প্রকৃতির তাড়নায় আমা হইতে অন্য খণ্ড খণ্ড দেবতার প্রপন্ন হয়।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ৭।২১

(যাহারা সর্বদেহময় তোমাকে ছাড়িয়া অন্য খণ্ড দেবতার শরণ লয়, তাহাদের কি সেই আরাধনা একেবারেই ব্যর্থ? তাহারা কি একেবারেই ভাসিয়া যাইবে? —এইরূপ শঙ্কার উত্তর দিতেছেন) যঃ যঃ ভক্তঃ [যে যে কামী ভক্ত] যাং যাং [যে যে] তনুং [আমার সচ্চিদানন্দ তনুরই প্রকাশ-বিশেষ এই সব খণ্ড বিচ্ছিন্ন তনু] শ্রদ্ধয়া [শ্রদ্ধা পূর্বক] অর্চিতুম্ [অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে] তস্য তস্য [সেই সেই মূর্তি বিষয়িণী শ্রদ্ধাই] বিদধামি [বিধান করি, স্থিরত্ব সম্পাদন করি, যাহার ফলে সে তাহার স্বস্থান হইতে স্বধর্ম বজায় রাখিয়া ধীরে ধীরে এবং অনায়াসে আমার সহজ আকর্ষণে

পড়িতে পারে। আমি কাহারও বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া কাহারও স্বভাবসিদ্ধ সাধনা ও ইষ্টবিষয়িণী শ্রদ্ধার উপর চাপ দেই না; বরং তাহাকে বাড়াইয়াই তুলি, সেখান হইতে ছুটাইয়া আনিয়া আমার দিকে টানাটানি করি না। কেননা যে আরাধনা সে করিতেছে, সে তো প্রকারান্তরে আমারই আরাধনা; সেই দেবতার আরাধনা বন্ধ করিলে আমিও একটি 'অন্য' খন্ড দেবতায় পরিণত হইব]।

যে যে কামী ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে যে তনু অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই শ্রদ্ধাকে অচলা করিয়া থাকি। ৭।২১

(ক্রমশঃ)

'কোথা হতে এলাম আমি'...

শৈলেন্দ্রকুমার গুপ্ত রায়

কোথা হতে এলাম আমি
যাব কোন্ সে দেশ?
কত যুগের যাওয়া-আসায়
যাত্রা পথের শেষ?
জীবন ভরে যাদের যত
দিয়েছিলাম ফাঁকি,
কোন দেনাই মিটল না মোর
রইল সবই বাকি;
তাইতো বিফল মোর সাধনা
ধূলায় মলিন বেশ।

আলোক হতে আঁধার যেন
অনেক ভালোবাসি,
সর্বহারা দীনের বোঝা
বইতে যেন আসি।
মন যেন মোর ধায় না কভু
তৃষা মরুর পানে,
দিশাহারা হয় না যেন
দুখের উজান টানে;
পারের বাঁশী তবেই গাইবে
চিরমুক্তির রেশ।

শিশু শিক্ষার ইতিহাস

(৪)

সুবোধকুমার সেনগুপ্ত

শিশুশিক্ষার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রথমেই কমেনিয়াস তারপর রুশো এবং তারপর পেস্তালজির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। রুশো সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাঁর শিশু সম্বন্ধীয় নিজস্ব অভিজ্ঞতা খুবই কম ছিল। শিশুদের শিক্ষা কিভাবে, এবং কোন্ পরিবেশে হওয়া উচিত তাই তিনি তাঁর 'এমিলি' নামক পুস্তকে লিপিবন্ধ করেছেন। ছোট ছোট শিশুদের (৬ বৎসর পর্যন্ত) ভার কমেনিয়াস মাতার উপর ন্যস্ত করে দিয়েছিলেন, অবশ্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে গিয়েই তিনি ঐ বয়সের শিশুদের সুষ্ঠু শিক্ষার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে মায়েদের উপরে ঐ ভার ন্যস্ত করেছিলেন। পেস্তালজিও ছোট শিশুদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত সে বিষয়ে প্রত্যেক মাতাকে লক্ষ্য করে উপদেশ তাঁর শিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকে লিপিবন্ধ করেছেন। ছোট শিশুদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষাবিদদের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল, কিন্তু শিক্ষার কাঠামো কিরকম হবে, তার রূপদান করা কারও পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। ছোট শিশুদের জন্যও নিয়মিত শিক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু কিভাবে তা দেওয়ার বন্দোবস্ত হবে, তাই ছিল তৎকালীন সমস্যা। সমস্যা কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সমস্যারও সমাধান কিছুটা হ'ল, এবং তারও কিছুটা সমাধান করলেন ফেডারিক ফ্রয়েবেল।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতি সম্বন্ধীয় সমস্ত নীতি লিপিবন্ধ হয়েছে 'The Education of Man'-এ। কিন্তু ফ্রয়েবেল সত্যকার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাঁর Kindergarten—এর জন্য। Kindergarten এবং The Education of Man-এর মধ্যে নীতিগত বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান বলে Herbartian Psychology as Applied to man নামক পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে একত্ব যে কোথায়, কতদূরে এবং কোন প্লেন-এ গিয়ে হয়েছে—তা পরে আলোচনা করা যাবে। বর্তমানে কি অবস্থার মধ্য দিয়ে ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতিকে রূপদান করেছেন, সেই আলোচনার মধ্যেই আমাদের বক্তব্য নিবন্ধ রাখব।

শৈশবে ফ্রয়েবেল অত্যন্ত নিরীহ ধরণের বালক ছিলেন, একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি সর্বদাই একলা থাকতে ভালবাসতেন, খেলাধূলায় তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করতেন না, ভাল যে লাগত তাও নয়। প্রকৃতির সঙ্গে তার সংযোগ ছিল খুব, তিনি ধর্মপ্রাণও ছিলেন। মোট কথা শৈশবে তিনি মোটেই কর্মপ্রবণ ছিলেন না, স্বপ্নময় রাজ্যেই বিচরণ করতে ভালবাসতেন, কিন্তু এই অলস বালকই একদিন উত্তর কালে যে কর্মপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই বিস্ময়কর।

অর্থাভাবের জন্য তাঁর পিতা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দিতে পারেননি, ফলে ফ্রয়েবেল বনবিভাগের এক কর্মচারীর অধীনে শিক্ষানবিশী করেন, কিন্তু সেখানে আসল শিক্ষার কাজে কোনওরূপ মনোনিবেশ না করে তিনি বন-জঙ্গলে প্রকৃতির সঙ্গে আরও নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করলেন। বলা বাহুল্য তিনি পূর্বে যতটা একাকী থাকতে ভালবাসতেন শিক্ষানবিশীতে আসার ফলে তিনি আরও সমাজের গণ্ডীর বাইরে চলে গেলেন। বৃক্ষলতা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী ইত্যাদি তিনি পর্যবেক্ষণ করে একটি অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান পেলেন। তিনি দেখলেন কোন বস্তুই তার নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিচ্ছিন্ন নয়, সকলের সঙ্গেই সকলের যোগাযোগ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্য বর্তমান। তিনি গণিতশাস্ত্রও কিছু আলোচনা করেন এবং গণিতের মূলতত্ত্বের সঙ্গে এই ঐক্যের একটা সামঞ্জস্য বিদ্যমান এই ধারণাটিও তিনি মনে মনে পোষণ করেন।

ঠিক এই সময়ে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এক সুযোগ উপস্থিত হয় এবং গণিত ও বিজ্ঞানের দিকে তাঁর পড়াশুনাকে তিনি কেন্দ্রীভূত করেন। তাঁর অধ্যাপক ছিল প্রফেসার ব্যাস (Batsch)। এই অধ্যাপক 'German Huxly' নামে পরিচিত ছিলেন। ফ্রয়েবেল এই অধ্যাপকের কাছেই জানতে পারেন যে, মেরুদণ্ডী প্রাণী যথাঃ মানুষ, মাছ, পাখী এবং অন্যান্য স্তনপায়ী জন্তুর মধ্যে একটা ঐক্য রয়েছে। ঐক্য সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলের নিজস্ব ধারণা অধ্যাপকের সাহায্যে যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করে। অংশগুলি পৃথক পৃথক হয়েও যে উহা সম্পূর্ণ এবং পরিচ্ছিন্ন নয় সে ধারণা ধীরে ধীরে তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইতিমধ্যে তিনি একটি পেস্তালজির শিক্ষানীতির আদর্শে পরিচালিত স্কুলে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁর অধিকাংশ সময় গভীর অধ্যয়নে কাটে। অধ্যক্ষ উইস (Weiss) -এর কাছে স্ফটিকবিদ্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করেন এবং একটি মিউজিয়মের কিউরেটার নিযুক্ত হন। সমস্ত স্ফটিকগুলির মধ্যে সৌসামঞ্জস্য বর্তমান দেখে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মাল যে, সৃষ্টির নীতির মধ্যে একটি সার্বজনীন পরিকল্পনা নিহিত রয়েছে।

এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই তিনি শিশুর পক্ষে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি শিশুকে জীবনের করণীয় কাজগুলিকে অনুসরণ করতেই হয়—তাহ'লে তাকে ক্রমবৃদ্ধির নীতিগুলিকে মেনে চলতেই হবে এবং সেই ছন্দও তাকে আয়ত্ত করতে হবে, তবেই জীবনের বৈপরিত্যগুলির সুসমঞ্জস বিধান সম্ভব হবে। মানুষের এই ক্রমবৃদ্ধির নীতিগুলি ফ্রয়েবেল আবিষ্কার করেন এবং নীতিগুলি সম্বন্ধে ছন্দজ্ঞান লাভই হচ্ছে শিক্ষা—এই হচ্ছে তাঁর মত। ফ্রয়েবেলের মতে জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কর্মে। পরস্পর বিপরীতমুখী কর্মের সামঞ্জস্য বিধানই হচ্ছে শিক্ষার গোড়ার কথা। কতকগুলি কর্ম আছে যেগুলি সমষ্টির প্রয়োজনে উত্থাপিত হয়, আর

তাছাড়াও আছে কতকগুলি কার্য যেগুলির সৃষ্টি হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির এই দ্বন্দ্বকে যদি সমন্বয় সাধন করা যায় তাহ'লেই সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়ে যাবে। ফ্রয়েবেলের মতে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা সম্ভব, কারণ সমস্ত কিছু সৃষ্ট জিনিষের মূলে হচ্ছে আধ্যাত্মিকতাবোধ এবং যা হচ্ছে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মূলাধার। যদি মূলাধার এক হয়, তবে তার চেয়ে যা কিছু উদ্ভূত তাদের মধ্যে সমগোত্রীয়তা থাকবেই এবং সেই সূত্রেই সহজ সমাধানও সম্ভব।

শিশুদের নিয়ে কাজ করবার সুযোগ ফ্রয়েবেলের শীঘ্রই ঘটল। গ্রুণার নামে একজন কৃতী শিক্ষকের নির্দেশে তিনি কয়েকটি ছেলে নিয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন এবং পেস্তালজির পরিচালিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বলা বাহুল্য প্রথম দর্শনেই তিনি পেস্তালজির শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রমের মধ্যে কতকগুলি বৈষম্য দেখতে পান। তাহ'লেও তিনি শিক্ষকতা কার্য সেই সূত্র ধরেই চালিয়ে যান এবং অচিরে শিক্ষক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এ সময়ে তিনি তিনটি ধনী শিশুর শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি একবার শিশুদের নিয়েই পেস্তালজির বিদ্যালয়ে গিয়ে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন এবং স্বয়ং পেস্তালজির সংগে তাঁর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন। এই স্থানে অবস্থানকালেই শৈশব অবস্থার ক্রমবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদান সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় ধারণা জন্মে এবং এই ধারণা পরবর্তী যুগেও তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। পেস্তালজির বিদ্যালয়ে ন্যাগেলি ও পিফারের সংগীত শিক্ষা দেখেই তাঁর মনে হয় যে, সংগীত, অংগ-সঞ্চালন এবং মৌখিক প্রকাশ হচ্ছে আত্ম-প্রকাশের গোড়ার কথা। তাঁর প্রবর্তিত 'কিণ্ডার গার্টেনে' যে ওদের স্থান কত বড় করে রাখা হয়েছিল তা বর্তমানে সকলেই দেখতে পাচ্ছেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে ফ্রয়েবেল বার্লিনে এসে একটি পেস্তালজি-স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এই স্কুলের সংগে জড়িত ছিলেন আর একজন শিক্ষাবিদ—নাম ফাদার জান্। তিনি ফ্রয়েবেলের কাজ দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং (Langethal) ল্যাংগেথাল নামক এক শিক্ষকের সংগে পরিচয় করিয়ে দেন। ল্যাংগেথালের মারফৎ ফ্রয়েবেলের পরিচয় হয় (Middendorf) মিডেনডর্ফ-এর। এই তিনজনের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের ফলে নূতন শিক্ষার ধারা বিশেষভাবে দানা বেঁধে উঠে। কি করে দানা বাঁধল সেই কথাই এখন বলা হচ্ছে।

ফ্রয়েবেলের ভাই ক্রিস্টক মারা যাওয়ায় তাঁর তিন ছেলে ফ্রয়েবেলের আশ্রয়ে এল, তাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এমন সময় আরও এল দু'ভাইপো, উদ্দেশ্য শিক্ষালাভ। এই পাঁচটি শিশু এবং ল্যাংগেথালের ছোট ভাই, এই ছয় জনকে নিয়ে ফ্রয়েবেল তাঁর প্রথম বিদ্যালয়ের কাজ সুরু করেন। এই স্কুল অবশ্য অচিরে 'কিলহু' বলে এক জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়। ফ্রয়েবেল স্কুল সম্বন্ধে বলেছেন, "আমার পরিকল্পনা হচ্ছে খুবই সাধারণ; আমি চাচ্ছি একটি বিদ্যালয়,

যেখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে একটা সহজ পরিবারগত সম্বন্ধ বর্তমান আর আমি চাই প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে শান্তিপূর্ণ জীবন।" সে যাহোক, আসল কথা হচ্ছে ফ্রয়েবেলের বিদ্যালয়ে শিশুরা সহযোগিতামূলক কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একটা শিক্ষামূলক যোগাযোগ স্থাপন করবে। ফ্রয়েবেলের মতে এ-পদ্ধতি অনুসরণে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা মোটেই নাই, কারণ বহির্প্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির মধ্যে একটা সংগতি রয়েছে। ফ্রয়েবেল ছিলেন নিগূঢ় দ্রষ্টা এবং সমস্ত জিনিষের মধ্যে ভগবানকে তিনি দেখতে পেতেন এবং সমস্ত জিনিষ দেখতেন ভগবানের মধ্যে। ফ্রয়েবেলের মতে প্রকৃত শিক্ষা হবে জীবন ধারণ ও কর্মের মধ্য দিয়ে। সামাজিক জীবনধারণ করাও ছিল শিশুদের শিক্ষার একটি অংগ। ছুটির দিন, উৎসবের দিনগুলি এবং ছাত্রদের ও শিক্ষকদের জন্মদিনও শিক্ষার উদ্দেশ্যেই উদ্‌যাপিত হত। ছেলেদের সমাজ জীবন পরিচালনার ভার ছিল ছাত্রদের উপরেই। পাঠসূচী ছিল বিশেষভাবে নমনীয়। শিক্ষক প্রয়োজনবোধে তার রদবদল করতে পারতেন। আর তাঁর শিক্ষাসূচী রচিতও হয়েছিল দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে। যারা শিক্ষা শেষে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবেশ করবে, তাদের জন্য একরকম শিক্ষাসূচী, আর ভিন্ন রকমের শিক্ষাসূচী রচিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদের জন্য।

'কিলহুর' স্কুলের শিক্ষাদান সুষ্ঠুভাবেই চলতে লাগল। সরকারী পরিদর্শক বিদ্যালয়ের কাজ দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। চারিদিকে তাঁর কাজের নূতনত্বের কথা ছড়িয়ে পড়ল। দেড়শত বৎসর পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার ভাবধারা প্রবেশীকরণ সত্যিই নবচেতনার সূচনা করেছিল। ফ্রয়েবেল নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও স্বীয় দর্শনকে অবলম্বন করে The Education of Man নামে এক পুস্তক রচনা করেন। ল্যাঙ্গেথাল ও মিডেনড্রফের সাহায্যে বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে থাকে, কিন্তু পেস্তালজিও যেমন অধীনস্থ শিক্ষকদের নিকট হতেই কাজে বাধা পেয়েছিলেন, ফ্রয়েবেলও ঠিক সেই অসুবিধা ভোগ করলেন। তখন ইউরোপে নেপোলিয়নের যুদ্ধ চলছে বলে দেশের আর্থিক অবস্থা ছিল সংকটপূর্ণ, তাই ধনী-গরীব নির্বিশেষে সমস্ত গৃহ হতে আগত শিশুদের জন্য খাদ্য ব্যবস্থা সকলের মনঃপূত না হওয়ায় ফ্রয়েবেলের বিদ্যালয় তীক্ষ্ম সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়াল, আর ইন্ধন যোগাল তাঁরই শিক্ষক। ফলে বিদ্যালয় প্রায় ধ্বংসের মুখে গিয়ে পড়ল, কিন্তু এ বিপদ থেকে রক্ষাও করলেন তাঁরই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নাম ব্যারপ।

এই সময়ে ফ্রয়েবেল শিক্ষা ব্যাপারে এক নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার একাংশের মধ্যেই কিণ্ডার গার্টেনের সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল। এই পরিকল্পনাটি ছিল বহু বিষয়কে অবলম্বন করে, অর্থাৎ এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে একটি শিল্প-কলা বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মায়েদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় এবং আর একটি ৩ থেকে ৬

বৎসরের অনাথ শিশুদের জন্য বিদ্যালয় খোলা হবে। এই পরিকল্পনা হেলবা পরিকল্পনা বলে বিখ্যাত এবং এর সাথে যুক্ত ছিলেন মিনিংগেনের ডিউক। পরিকল্পনাটি বিবেচনাধীন থাকা কালীনই ফ্রয়েবেল তাঁর প্রিয় সহকর্মী ব্যারপের কাছে এক চিঠিতে জানান যে তিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠান খুলতে চান, যাকে তিনি বিদ্যালয় নামে অভিহিত করবেন না, কারণ বিদ্যালয় বললে সেখানে পড়া ও লেখার প্রশ্ন এসে যায়। তিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠান খুলতে চান, যেখানে শিশুরা শিক্ষকের সহযোগিতায় ও যত্নে আপনা আপনি বৃদ্ধি পায়। মিনিংগেনের ডিউক একদিন কথাচ্ছলে নিজের ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলকে জিজ্ঞেস করেন। ডিউকের ছেলে কি জাতীয় শিক্ষা পাবে তাই বলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু ফ্রয়েবেল সে ধার দিয়েও গেলেন না। তিনি বললেন, শিশুর শিক্ষা, শিশু হিসাবে তার ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য করে অন্য সকল শিশুদের সংগেই ব্যবস্থা হবে। তাঁর এভাবে বলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে, শিশু অবস্থায় অধুনা তিন থেকে ছয় বৎসরের মধ্যে যখন লেখাপড়ার চেয়ে খেলার মধ্য দিয়ে দেহ ও মনের নানারূপ বিকাশ প্রয়োজন তখন সেইভাবেই শিশুকে পরিচালনা করা প্রয়োজন হবে, বয়সের অনুপযুক্ত কার্যভার তার উপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। হেলবা পরিকল্পনায় মায়েদের জন্য শিক্ষার প্রস্তাব অভিনব সন্দেহ নাই। এই শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল কি করে মায়েরা শিশুর সহজ বৃদ্ধির সহায়তা করবেন সে সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা। এরূপ শিক্ষা যদি মায়েরা পান তা হ'লে তাঁরা তাঁদের শিশুপুত্রদের হয়ত এমনিভাবেই তৈরী করতে পারবেন, যাতে করে শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার জন্য উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ মায়েরা যদি স্কুলের কাজে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন এবং নিজেদের শিশুদের উপযুক্তভাবে তৈরী করেন তাহ'লে শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে সহজভাবে গড়ে উঠতে পারবে। হেলবা পরিকল্পনার আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, সেটা হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে চারু ও কারুশিল্পের ব্যবস্থা। বৃত্তি হিসেবে এবং অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা হিসেবে এগুলোকে পরিকল্পনায় স্থান দেওয়া হয়নি; ফ্রয়েবেলের উদ্দেশ্য ছিল চারু ও কারুশিল্পের মাধ্যমে ছাত্রদের দেহ ও মন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কুশলী করা, যাতে তারা সমাজের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠে। চারু ও কারুশিল্প ছাড়াও ফ্রয়েবেল চেয়েছিলেন ছাত্রদের কর্মমাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া। 'কিণ্ডারগার্টেন' শব্দটি আবিষ্কারের পূর্বে ফ্রয়েবেল তাঁর পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের জন্য নাম দিয়েছিলেন 'School based on the active instincts of children.' হেলবা পরিকল্পনায় শিশু একটি সহজ মানুষে গড়ে উঠবে এরূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিকল্পনাটি কার্যকরী হয় না, তার কারণ মিনিংগেনের ডিউক, যাঁর উৎসাহে এবং অর্থসাহায্যে হেলবা পরিকল্পনা রূপ নেবে কথা ছিল, তিনিই ফ্রয়েবেলের বিরুদ্ধচারীদের প্ররোচনায় ফ্রয়েবেলকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। [ক্রমশঃ

চীনদেশ ও চীনদেশবাসী

(পূর্বানুবৃত্তি)

লিন্-ইউ-তান্ অনুবাদক—**মনোরঞ্জন গুপ্ত**

(৫) শান্তিপ্রিয়তা

এ পর্যন্ত আমরা চীনা স্বভাবের তিনটি নিকৃষ্ট গুণের আলোচনা করেছি। এই তিনটি গুণই তাদের সকলে মিলে একযোগে কাজ করার পরিপন্থী। তবে এই গুলি জীবনের যে ভুয়োদর্শন থেকে উদ্ভূত, তা যেমন নিপুণতাজ্ঞাপক তেমনি পরিপক্কতাসূচক—এর ভিতরে এমন একটা ভাব আছে, যাকে বলা যায় উদার উদাসীনতা। জীবন সম্বন্ধে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর যে যথেষ্ট কার্যকারিতা আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সব গুণ কোনো বয়োবৃদ্ধ মানব-গোষ্ঠিতেই সম্ভব যাদের কোনো একটা অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, পৃথিবীতে সকলের উপরে টেক্কা মারার কোনো তাগিদ যাদের মনে নেই, যারা দুটো চোখে জীবনের অনেক কিছু দেখেছে এবং জীবনে যা-কিছু পেয়েছে তার মূল্য যা-ই হোক না তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে প্রস্তুত অথচ যারা অদৃষ্টে যা-ই থাক না কেন সুখে-শান্তিতে ও সুরুচিসম্মতভাবে জীবনযাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

চীনারা আগুনে-পোড়া পোক্ত জাত। তারা কোনো অসংগত নিরর্থক প্রলাপের ধার ধারে না। তারা খৃষ্টানদের মত মরবার জন্যই বেঁচে থাকে না,—যদিও খৃষ্টানদের সেটা বাইরের ভাণ মাত্র। অপর দিকে এই পৃথিবীতে তারা একটা মনঃকল্পিত অলীক স্বর্গরাজ্যেরও প্রয়াসী নয়, যেমন প্রত্যাশা করে থাকেন পাশ্চাত্যের বহু মহাপুরুষ। তারা জানে যে জীবনে যথেষ্ট দুঃখ, কষ্ট ও শোকের কারণ বিদ্যমান। তাই তারা এমনভাবে ব্যবস্থা করতে চায় যাতে তারা শান্তভাবে কাজ-কর্ম করে', যা সইতে হবে, তাকে মহানুভবতার সংগে সহ্য করে যথাসম্ভব সুখে নিরুদ্বেগে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। পাশ্চাত্যেরা যে গুণগুলিকে মহৎগুণ হিসেবে যথেষ্ট মর্যাদা দেয়—যেমন ভদ্রতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সংস্কার সাধনে আগ্রহ, লোক হিতৈষণা, বিপদসংকুল কর্ম-প্রচেষ্টায় উদ্যমশীলতা, বীরোচিত সাহস ইত্যাদি, চীনাদের সে সব গুণের একান্ত অভাব। মণ্ট্ ব্লাংক নামক পর্বতের মত পর্বতারোহণ কিংবা উত্তর মেরু আবিষ্কার-অভিযানে তাদের কোনো উৎসাহ নেই। কিন্তু জীবনের কোনো সাধারণ বৈষয়িক ব্যাপারে তাদের আগ্রহের অন্ত নেই। আর তাদের আছে একটা অপরাজেয় সহিষ্ণুতা, একটা অক্লান্ত অধ্যবসায়, কর্তব্যবোধ, চৌচাপটে সাধারণ বুদ্ধি, প্রফুল্লতা, রসিকতা, উদারতা, শান্তিপ্রিয়তা এবং প্রতিকূল অবস্থাতেও মনের আনন্দ রক্ষা করতে পারার মত একটা অতুলনীয় প্রতিভা, যার ফলে বিশেষত্বহীন অতি সাধারণ জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেও তাদের পক্ষে এই

পার্থিব জীবনের সুখ-সম্ভোগ সম্ভবপর। এইগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে শান্তিপ্রিয়তা ও উদারতা, যা পরিপক্ক সংস্কৃতির নিদর্শন বলে গণ্য এবং যার অভাব বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতায় একান্ত পরিস্ফুট।

বর্তমান ইউরোপের যে দৃশ্য চোখের উপরে দেখতে পাই, তাতে অনেক সময়ে মনে হয় যে তার তো তীক্ষ্ম প্রতিভা বা ক্ষুরধার বুদ্ধির অভাব নেই—চতুরতা এবং কর্মতৎপরতাও অফুরন্ত, তবু যে নানা দুর্ভোগের হাত থেকে সে রেহাই পাচ্ছে না, তার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু এই যে তার এমন একটা সুবুদ্ধির অভাব, যাকে বলা যায় পরিপক্কতাজনিত কোমল শান্ত-বুদ্ধি। আমার ধারণা যে, ইউরোপীয় সভ্যতার বয়স আরো কিছুটা বাড়লে পরে, ইউরোপ হয়তো তার প্রতিভার খানিকটা তীব্রতা ও তীক্ষ্মতা কমিয়ে দিয়ে তার বর্তমানে উষ্ণ-মস্তিষ্ক যুবত্বের আনাড়িত্ব কাটিয়ে উঠবে। আর এক শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে পৃথিবীটা এমন সংঘবদ্ধ এবং এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এতটা দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠবে যে, ইউ-রোপীয়ানরা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হওয়ার ভয়েই উদারতার শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে একযোগে চলবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হবে। তাদের বুদ্ধির ধারটা হয়তো একটু কমবে, কিন্তু বুদ্ধিটা পাকা হবে এবং প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের এরূপ পরিবর্তন যখন আসবে, তখন তা আপন প্রাণ বাঁচাবার সহজাত সংস্কার থেকেই আসবে, কোন অপূর্ব মতবাদের চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য থেকে নয়। তখন হয়তো পাশ্চাত্য বিশ্বাস করতে শিখবে যে আত্ম-স্বার্থ প্রতিষ্ঠাই বড় কথা নয়, তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে উদারতা ও সহিষ্ণুতা। কেননা পৃথিবীর যাবতীয় জাতিবৃন্দ যখন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠবে, তখন বাঁচতে হলে প্রত্যেককেই উদারতা অবলম্বন করতে হবে। তখন হয়তো তাদের দ্রুত উন্নতির ঝোঁকটা কিছু পরিমাণে কমবে এবং জীবন সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাটা বাড়বে। এবং তখন হয়তো হাংকুকুমান্ গিরি-সঙ্কটের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাণী তারা অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে শুনতে রাজী হবে।

চীনবাসীদের ধারণা অনুসারে শান্তিপ্রিয়তা একটা মহৎ গুণ নয়—শুধু একটা সাধারণ সদ্‌গুণের মধ্যে গণ্য। কেননা সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞান যার আছে, তার মধ্যেই এই গুণ বর্তমান থাকা স্বাভাবিক। যদি এই পার্থিব জীবনের পরে আর কোনো অপার্থিব জীবন না থাকে, তবে এই দু'দিনের জীবনে অশান্তি ডেকে আনার কোনো অর্থ হয় না। তাই সুখ যদি আমাদের কাম্য হয় তবে সকলের সঙ্গে শান্তিতে নির্বিবাদে বসবাসের চেষ্টা করাই প্রয়োজন—এই দিক থেকে দেখলে, পাশ্চাত্যের নিজেকে জাহির করার যাবতীয় প্রচেষ্টা ও অসংখ্য ব্যাপারে চিত্তের অস্থিরতা প্রকাশ, সবই যুবোচিত আনাড়িত্বের পরিচায়ক। প্রাচ্য দর্শনে প্রাজ্ঞ

চীনারা সহজ জ্ঞানেই বোঝে যে পাশ্চাত্যের এই আনাড়িত্ব বয়স বাড়লেই ক্রমে লোপ পাবে। অদ্ভুত মনে হলেও এ-কথা সত্য যে, বিচক্ষণ মতবাদ সম্বলিত "তাও" দর্শনে পরমতসহিষ্ণুতা বা উদারতা কথাটা বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। আমার মতে এই সহিষ্ণুতা বা উদারতাই হচ্ছে চীনা সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা বড় বিশেষত্ব এবং এইটেই আধুনিক কালের সংস্কৃতিরও সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব হয়ে উঠবে, যখন এই সংস্কৃতি বয়সের পরিপক্কতা লাভ করবে। এই উদারতার শিক্ষা লাভ করতে হলে তাও-বাদ-সম্মত খানিকটা বিষাদ-মিশ্রিত বৈরাগ্যের ভাব মনে থাকা চাই। যারা সত্যি সত্যি বৈরাগ্যবান, তারা অতিশয় দয়ালু হয়ে থাকে। কেননা তারা দেখে যে, জীবন অন্তঃসারশূন্য এবং এই উপলব্ধি থেকে তাদের মন স্বতঃই বিশ্বের প্রতি একটা দয়া ও সহানুভূতির ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

শান্তিপ্রিয়তা একটা উঁচু দরের মানবীয় বুদ্ধিমত্তার বিষয়ও বটে। মানুষ যদি যা আছে তার চেয়ে আর একটু বেশী বৈরাগ্যবান হওয়ার শিক্ষা লাভ করে, তবে কোনো কিছুর জন্যেই মারামারি করার প্রবৃত্তি তার খুব কম হবে। এই জন্যেই বোধ হয়, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই কিছুটা ভীরু-স্বভাব বলে প্রতীতি জন্মে। পৃথিবীর মধ্যে চীনারাই নিকৃষ্ট যোদ্ধা, কেননা জাত হিসেবে তারা বেশী বুদ্ধিমান। আর আছে তার সঙ্গে তাও-মতাবলম্বীদের অবিশ্বাস-বাদ এবং কনফিউসীয় মতাবলম্বীদের জীবনের আদর্শ হিসেবে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ—উভয় মতবাদই নির্ঝঞ্ঝাট মনোবৃত্তির সৃষ্টি করে থাকে। চীনারা যুদ্ধ করে না, যেহেতু তারা জাত হিসেবে অতিশয় আত্মস্বার্থ-সন্ধানী এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী হিসেবি। একটি সাধারণ চীনা শিশুও জানে, যা ইউরোপের পক্ককেশ অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদও জানে না, যে ব্যক্তি-বিশেষই হোক, কিংবা একটা জাতিই হোক, যুদ্ধ করতে গেলেই আহত হয়ে বিকলাঙ্গ অবস্থায় বাঁচতে হয়, বা নিহত হতে হয়। চীনাদের মধ্যে দুই দলে ঝগড়া বাঁধলে, উভয় পক্ষকেই বুঝিয়ে কোনো একটা মীমাংসায় রাজী করান খুব সহজ। তাদের অতি হিসেবি দর্শন শিক্ষা দেয় যে ঝগড়া বাঁধাবে বুঝে-শুনে ধীরে-সুস্থে—ঝগড়া মেটাতে হবে চোখের নিমেষে। তাদের যে পাকা ধূর্ত-বুদ্ধি-সূচক জীবন-দর্শন একদিকে যেমন বিপদের দিনে তাদের ধৈর্য ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বনের শিক্ষা দেয়; অপর দিকে আবার জয় ও সাফল্যের দিনে ক্ষণিকের অহংকারে স্ফীত হওয়া এবং জমকালোভাবে নিজেকে জাহির করার অসমীচীনতা সম্বন্ধে তাদের সতর্ক করে দেয়। ধৈর্য ও সংযম সম্বন্ধে চীনা উপদেশ হচ্ছে—"যখন সৌভাগ্য আসে তখন রয়ে সয়ে ভোগ করতে হয়—সুযোগ পেলে সুযোগটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে নেই"। আত্ম-প্রতিষ্ঠার অত্যধিক প্রচেষ্টা ও সুবিধাজনক অবস্থার পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করাটাকে চীনারা বলে "অতিরিক্ত ধার দেখানো" এবং সেটা তাদের মতে ইতরামীর নিদর্শন ও অধঃপতনের পূর্বলক্ষণ। ইংরেজরা মনে করে ন্যায়

ও নীতির মর্যাদা রক্ষার্থে পরাজিত-প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে নেই। চীনারা এই ভাবটাকে প্রকাশ করতে বলে "কাউকেই শানের পরে আছাড় দিও না"—সংস্কৃতির প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে বলে একই ভাব প্রকাশের রকমটা পৃথক পৃথক হয়ে পড়ে।

চীনবাসীদের মতে ভ্যারসেই সন্ধি শুধু যে অন্যায় ও অসঙ্গত তা নয়—এই সন্ধি যারা জোর করে জার্মাণীর ঘাড়ে চাপিয়েছে তাদের ইতর মনোবৃত্তি বা সংস্কৃতির অভাব সূচনা করে। ফরাসীরা যখন যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল তখন যদি তাও-মতাবলম্বী মনোভাবের ছিটে-ফোঁটাও তাদের মনে স্থান পেতো, তবে তারা কখনই ভ্যারসেই সন্ধি জার্মাণীর উপরে চাপাতো না এবং যদি না চাপাতো, তবে আজও তাদের মস্তক অধিকতর আরামে বালিশের পরে বিশ্রাম নিতে পারতো। কিন্তু ফ্রান্স তখনো যুবা বয়সের আনাড়িত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং জার্মাণীও সুযোগ পেলে ঠিক তাই করতো। ফ্রান্স ও জার্মাণী পরস্পর পরস্পরকে চিরতরে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে যে অতিমাত্র মূঢ়তা ও বালকোচিত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছে, সে উপলব্ধি তাদের কারো নেই। ক্লেমাঁশো লায়োৎসে -এর গ্রন্থ পড়েনি। হিটলারও তাই। কাজেই মরুক তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ করে—এদিকে তাও-বাদী তাদের দূর থেকে দেখেছে এবং মৃদু মৃদু হাসছে।

চৈনিক শান্তিপ্রিয়তা প্রধানতঃ তাদের স্বভাবেরই বিশেষত্ব। তা ছাড়া এ গুণ পরিপক্ক বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচায়কও বটে। পাশ্চাত্য দেশের ছেলে-পিলেরা রাস্তায় যতটা মারামারি করে, চীনের ছেলে-পিলেরা ততটা করে না। জাত হিসেবে যতটা যুদ্ধ-বিগ্রহ আমাদের করা উচিত, তা আমরা করিনে, যদিও দেশে গৃহ-বিবাদ ও আত্মকলহের শেষ নেই। আমাদের দেশে যেমন, সেরূপ কুশাসন যদি আমেরিকায় চলতো, তবে গত বিশ বছরে তিন বার নয়—অন্ততঃ তিরিশ বার সে দেশে রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত হতো। আয়ারল্যাণ্ডে এখন শান্তি বিরাজিত, যেহেতু তারা লড়াইটা যা করেছে, ভীষণভাবেই করেছে। আমাদের লড়াইয়ের শেষ নেই—চলছেই যেহেতু আমাদের লড়াই কখনই তেমন জোর লড়াই হয় না।

চীনের যে ঘরোয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ তাকে প্রকৃত যুদ্ধই বলা চলে না। হালে অবস্থাটা একটু বদলেছে বটে, কিন্তু এতদিন এই ঘরোয়া বিবাদ-বিসম্বাদে। যুদ্ধ মোটেই গৌরবের বিষয় বলে গণ্য হতো না। আইনের দ্বারা বাধ্য করিয়ে সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত করার প্রথা চীনদেশে কোনোদিন প্রচলিত হয়নি। সাধারণ সৈন্যেরা, যারা সত্যি সত্যি যুদ্ধ করে, তারা সবাই নেহাৎ দরিদ্র শ্রেণীর লোক। তাদের জীবিকা-নির্বাহের অন্য কোনো উপায় নেই বলেই তারা সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হয়। বেশ ভালভাবে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে এরূপ সৈন্যদের কখনই তেমন কোনো আগ্রহ বা রুচি থাকে না। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষেরা নিজেরা তো যুদ্ধ করে না—তাই যুদ্ধ সম্বন্ধে তারাই বেশী উৎসাহশীল হয়ে থাকে। যে-কোনো বড় রকমের যুদ্ধ-অভিযানে রুপোর গুলী-গোলাই যুদ্ধ-জয়ের কারণ হয়ে থাকে, যদিও তার পরেই

হয়তো এক পক্ষ বিজয়ী বীরের মত কামানের গর্জনে বিজয়-বার্তা ঘোষণা করতে করতে সদলবলে শোভাযাত্রা করে রাজধানীতে এসে উপস্থিত হবে। এম্নি কামান-গর্জনই হচ্ছে চীনবাসীদের যুদ্ধের ঢক্কা-নিনাদ। এরূপ শব্দাড়ম্বরই হচ্ছে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রকৃত স্বরূপ। তাদের ব্যক্তিগত কলহ ও গৃহ-বিবাদ কেবল মাত্র হৈ-চৈ, চেঁচামেচি ও বিচিত্র শব্দাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। চীনদেশে কেউ যুদ্ধ দেখতে পায় না—সবাই যুদ্ধের কথা শোনে মাত্র। আমি এরূপ দুটো যুদ্ধের কথা শুনেছি—একটা পিকিং ও অপরটা আময় শহরে। শুনতে বেশ ভালই। সাধারণতঃ প্রবলতর সৈনাদল ভয় দেখিয়েই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সৈন্যদলকে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করে এবং পাশ্চাত্য দেশে যা দীর্ঘ যুদ্ধাভিযানের ব্যাপার হয়ে ওঠে, চীনদেশে তা মাসেকের মধ্যেই চুকে-বুকে যায়। চৈনিক ন্যায়-বিচারের ধারণা অনুযায়ী পরাজিত সেনাধিনায়ককে পাথেয় হিসেবে লক্ষাধিক মুদ্রা দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বিদেশে শিল্প ব্যবসায়ের অনুসন্ধানে থাকেন এবং সংগে সংগে এ কথাটা তাঁর সব সময়েই মনে থাকে যে আগামী যুদ্ধে বিজেতার পক্ষ সমর্থনের জন্য তার ডাক পড়তে পারে। পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরার মাঝে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে যে বিজেতা ও বিজিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দুই বন্ধুর মত একই সংগে এক গাড়ীতে বসে চলেছে। এইটেই হচ্ছে চৈনিক সংস্কৃতির মাধুর্য ও মাহাত্ম্য। কিন্তু দেশের সাধারণ লোকদের এ সব ব্যাপারের সংগে কোনো যোগ নেই। তারা যুদ্ধ-বিগ্রহকে ঘৃণা করে এবং চিরকালই তা করবে। চীনদেশে ভাল লোকেরা কখনো লড়াই করে না। ভাল লোহা দিয়ে পেরেক তৈয়ারী হয় না। তেমনি ভাল লোককে কেউ সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত করে না।

[ক্রমশঃ

আমার আশা

সত্যনারায়ণ দাস

পরমাণুর নর্তন
বুভুক্ষের করুণ ক্রন্দন,—
আর সামাজিক নির্মম খোঁচায়
হে কবি!
হারিয়ে ফেলছ তুমি আশা?
নিষ্পেষিত তোমার চিন্তাধারা,
কাঠিন্যের তীব্র ঘায়ে
হারিয়ে ফেলছ সত্তার উৎস।
সোণালী স্বপনেরা নিয়েছে বিদায় তোমা হ'তে
উৎকট বিপদেরা হয়েছে উদ্ভব—
কম্পমান স্বর্ণ সিংহাসন
তোমার পূজ্য দেবীর।
চেতনারা করে তোমায় তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ
বহু জনের পাণ্ডুর প্রতিকৃতি নেয় তার সুযোগ,
তোমার কবিতার কেটে গেছে তান
ছেড়ে তোমার বীণার তার—'ঝানাক্-ঝান্'!
হে কবি!
হারিয়ে ফেলেছ তুমি আশা?

আশা হারাইনি মোটেই, আমি,—
প্রাচীন চিররোগীর মত আমি বেহায়া আশাবাদী,
হৃদয়ের পাঁজরে জ্বালাই আশার আগুন
গানের রাগিণী মোর তাই আশায় ভরপুর,—
মৃত্যুর বুকের 'পর প্রতিষ্ঠিত
মোর আশাবাদ, নোতুন সৃষ্টি।
শোন কবি!
মোর আশার ঝংকার,—
গত ঐ পুরাতন বৎসরের অন্ধকার গহ্বর কুয়াশা থেকে
জন্ম নিয়েছে আজ নব সূর্য পূবের সীমায়,

আর
লক্ষ প্রাণের নব উদ্দীপনার দৃপ্ত অংকুর।
আগামী শুভ্র দিনের প্রখর তাপে
দুঃসহ এ দুর্দিন মেঘ ছিড়ে হবে খান-খান
নিঃশেষ হবে এ কংকাল সভ্যতার আস্ফালন;
মোহন সৃষ্টির উন্মাদনায়,—
মাঠগুলি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে সবুজ হাসিতে,
কারখানার বুকে নেবে অসমে আলোর জোয়ার।
আশা হারাইনি মোটেই, আমি,—

দিনে দিনে এগিয়ে চলবো, আমি,—
আগলি' বহু রুদ্ধ দুয়ার
অবসান হবে তাতে পুঞ্জীভূত যত সামাজিক গ্লানি;
পাথেয় মোর এ নব দিনের নব শপথের অনুরাগ
আর
আমার আশার সঞ্জীবনী সুধা,
অমর আমার আশাবাদ।
হে কবি!
হারিয়ে ফেলছ তুমি আশা?

———

সাময়িকী

পরীক্ষায় ছাত্রদের অকৃতকার্যতা: 'সত্যযুগ' পত্রিকার বাণিজ্যবিভাগের উদ্যোগে "ছাত্রদের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা'র কারণ সম্বন্ধে এক তদন্ত পরিচালিত ও তথ্য সংগৃহীত হয়। উক্ত তথ্যসমূহ গত ৯ই বৈশাখ বুধবার অপরাহ্নে ইউনিভার্সিটি হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রকাশ করা হয়। কলিকাতার ৬টি কলেজ, ২টি মেয়ে কলেজ, ও মফঃস্বলের ২টি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা সম্বন্ধে ১৫৮টি পরিবারের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া উক্ত তথ্য সংগৃহীত হয়। উক্ত তদন্তে দেখা যায়, কলিকাতার কলেজগুলির শতকরা ৪০·৬ জন ছাত্রছাত্রীর জন্মস্থান পূর্ববঙ্গে, শতকরা ৫০·৭ জনের জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গে ও শতকরা ৮·৭ জন অবাঙ্গালী। যে ১৫৮টি পরিবারের মধ্যে অনুসন্ধান করা হইয়াছে, সেইসব পরিবারের আয়ের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ খাদ্যের জন্য, ১৫ ভাগ শিক্ষার জন্য ও ৩০ ভাগ অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য ব্যয়িত হয়। অনুসন্ধানে আরও প্রকাশ পাইয়াছে যে, পরিবারের আয় যত কম হয়, শিক্ষার ব্যয়ের হার তত বেশী হয় এবং আয় বেশী হইলে শিক্ষার ব্যয়ের হার কম হয়। অর্ধাশন ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের জন্য পশ্চিম-বঙ্গের তরুণতরুণীরা শিক্ষাজীবনেই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই ক্ষয় হইতে দেশকে বাঁচাইতে হইলে শিক্ষার ব্যয় কমাইতে হইবে, কলেজে বিনা খরচায় জলযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। হোটেল ও মেসগুলিতে সরকারী অর্থ-সাহায্য করিতে হইবে এবং পাঠ্যপুস্তকের উচ্চমূল্য হ্রাস করিতে হইবে। বর্তমান শিক্ষাসংকটের জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক ক্রমাবনতিই একমাত্র কারণ। তদন্তের উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় হাজার হাজার মধ্যবিত্ত পরিবারে বেদনার আর্তনাদই উঠে। পৃথিবীর কোন সভ্য দেশেই পরীক্ষার নামে এইরূপ শক্তির অপচয় হয় না। এই পরিস্থিতির অবসান করা প্রয়োজন। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, শতকরা ৭৮ জন কলেজের ছাত্র ও মফঃস্বলের শতকরা ৭০ জন ছাত্রের জন্য পড়িবার ঘর নাই। কলেজের ছাত্রছাত্রীর শতকরা ৫৬ জনের কোন টিফিন জোটে না। অর্থাভাবে শতকরা ৫০ জন ছাত্রছাত্রীই অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে বাস করিতে বাধ্য হয়।

সাধারণতঃ ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যাপারে তিনটি পক্ষের কথাই মনে হয়—যাহারা পরীক্ষা দেয়, যাহারা পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করে এবং যাহারা পরীক্ষা লয়—অর্থাৎ ছাত্র, অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আরও একটি পক্ষকেও ইহার সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইতে হইবে। সেই পক্ষটি হইল 'আবেষ্টন'। এই চারিপক্ষের সামগ্রিক দৃষ্টি লইয়া ব্যর্থতার কারণ খুঁজিতে হইবে। ছাত্রগণও যেমন ইহার জন্য একান্তভাবে দায়ী নয়, একান্তভাবে অধ্যাপক, বিশ্ব-

বিদ্যালয় বা আবেষ্টনও দায়ী নয়। অথচ প্রত্যেকেই দায়ী। ছাত্র অধ্যাপকের কথা মনে হইলে বরিশালের অশ্বিনীকুমার-প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কথাই মনে পড়ে। সেখানে ছাত্র-শিক্ষক মিলিয়া একটি 'সমগ্র' বস্তু ছিল। ছাত্রদের দৈনন্দিন প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের সংগে শিক্ষকগণ পরিচিত ও যুক্ত থাকিতেন। একদিনের কথা মনে পড়ে। কোনও বাসায় একদিন সন্ধ্যার পর খুব বৃষ্টির মধ্যে দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া ছাত্রগণ মনের আনন্দে তাস খেলিতেছিল। হঠাৎ দুয়ারে ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। ভিতর হইতে শব্দ হইল, 'কে, কে?' বাহিরের ভদ্রলোক বলিলেন, 'দুয়ার খোল'। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুয়ার খোলা হইলে দেখা গেল, সামনে দাঁড়াইয়া ব্রজমোহন কলেজের তাৎকালিক অধ্যক্ষ পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। আজ কি ইহা কল্পনাও করা যায়? বৃষ্টির মধ্যে অধ্যক্ষ মহাশয় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ছেলেরা কি করিতেছে দেখিবার জন্য। ছাত্র-অধ্যাপকের সম্পর্ক এমন মধুর হইলেই শিক্ষার ভিত্তি পত্তন হয়, শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বাড়ে। কিন্তু বর্তমানে যে সবই ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। চাল-ডাল-তেল-নুনের ব্যবসায়ের মত শিক্ষাদানও একটি ব্যবসায়। যাহারা পড়ে, তাহারা ভাবে 'টাকা দিয়া পড়ি', যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা ভাবেন 'টাকা পাইয়া পড়াই'। ব্যর্থতার মূল রহিয়াছে শিক্ষা সম্বন্ধে এই শ্রদ্ধাহীনতার মধ্যে; 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'—ইহা আজ প্রবাদবাক্যে পরিণত। কিন্তু এই শ্রদ্ধাহীনতার মূল খুঁজিলে আবার পাওয়া যাইবে, বিশ্বের সমস্ত ঘটনাকে একান্ত অর্থনীতিদ্বারা ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা। রাশিয়ার জড়বাদ একটা শ্রদ্ধাহীনতার আবহাওয়া এদেশে সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের ধারণা —ভক্তিশ্রদ্ধা প্রীতি প্রভৃতির মূলেও রহিয়াছে অর্থনৈতিক সম্বন্ধের মধ্যে। Materialistic conception of History ভারতবর্ষে কম অনর্থ সৃষ্টি করে নাই। অথচ ইহাকে একান্তভাবে অস্বীকার করিবার যো-ও নাই। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনেকটা দায়ী, তাহা সত্য হইলেও তাহাই যে একমাত্র সত্য নয়, তাহাও আজ ভাবিবার দিন আসিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অর্থনীতি চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। লক্ষ লক্ষ ছেলে মহাদারিদ্র্যের মধ্যে ইহার নিকট হইতে উহার নিকট হইতে বই ধার করিয়াও সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

শিক্ষা ও শিক্ষকদের উপর শ্রদ্ধাহীনতা কতদূর চরমে উঠিয়াছে, তাহার বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে গত ২৮শে বৈশাখ সোমবারের আনন্দবাজারের 'যৎকিঞ্চিৎ' হইতে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। 'পরীক্ষার হলে গার্ড হওয়া যে কিরূপ বিপজ্জনক ব্যাপার, সম্প্রতি মধ্য কলিকাতায় বি-কম পরীক্ষার কেন্দ্রের জনৈক গার্ডকে তাহা মর্মে মর্মে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'অতিরিক্ত' কঠোরতা প্রদর্শনের অভিযোগে দেড়শত পরীক্ষার্থী দলবদ্ধভাবে এই গার্ডকে আক্রমণ করে, কিছু কিল-চড়-গুঁতা খাইয়া ভদ্রলোক প্রাণরক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত দৌড়াইয়া গিয়া অধ্যক্ষের ঘরে আশ্রয়

গ্রহণ করেন এবং ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেন। ক্রুদ্ধ ছাত্রদল ইটপাটকেল ছুঁড়িয়া ঘরের দরজা জানালার উপর দিয়াই আক্রোশ কতকটা মিটাইয়া লয়। ইতোমধ্যে ফোন পাইয়া লালবাজার হইতে পুলিশ আসিয়া পড়ে এবং গার্ড মহাশয়কে তাহারাই বালীতে তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয়। আমরা যতদূর জানি, পরীক্ষার হলে পাহারা দিবার জন্যই গার্ড রাখা হয়, যাহাতে পরীক্ষার্থিগণ অসদুপায় অবলম্বন করিতে না পারে। পাহারা দেওয়াটা কি পরিমাণের হইলে সহনযোগ্য ও নরম বলিয়া ছাত্রদের নিকট বিবেচিত হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। আর যে গার্ড পাহারা দিবে না, কোন কড়া নজর রাখিবে না, তেমন গার্ডের ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি বিশ্ববিদ্যালয় দিতে পারিবেন কি না, তাঁহারাই বলিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত দেখিতেছি যে, পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের উপরই গার্ড দিবার ভার ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকিবে না। ভবে মনে হয়, ছাত্রদেরও বোধহয় ইহাই দাবী।' বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে বিনা গার্ডেই পরীক্ষা লওয়া হইত। কিন্তু সেখানে নকল করিবার দুর্বুদ্ধি কেনও ছাত্রের হইত না। ছাত্রগণ পরস্পরের গার্ড থাকিত। আজ কি ইহা ভাবা যায়?

উৎকট জড়বাদের আবির্ভাবের ফলে বস্তুর ব্যবহারিক সত্তার মূল্যকে এমনভাবেই বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে যে, বস্তুর পরমার্থিক মূল্য অস্বীকৃত হইয়া পড়িতেছে। ছেলেবেলায় পড়িয়াছি,—'সদা সত্য কথা বলিবে'। আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে —এই সত্য কি একান্ত (absolute), না আপেক্ষিক (relative)? এ দেশ একান্ত সত্যের সেই পারমার্থিক রূপের উপরেই জোর দিয়াছে, যাহা হাজার বৎসর পূর্বেও সত্য, হাজার বছর পরেও সত্য। পারমার্থিক সত্যের কোনও পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আজ আসিয়াছে সত্যের ব্যবহারিক রূপের মূল্য দিবার যুগ— 'truth for us.' Truth-in-self আজ ভাসিয়া যাইতেছে। সমস্ত শিক্ষার গোড়াই আজ বদলাইয়া যাইতেছে। পারমার্থিক সত্যকে অস্বীকার করার ফলে 'সুবিধাবাদে'র আমদানী হইয়াছে। 'সুবিধা' হইলে সত্য বলিব, 'সুবিধা' না হইলে বলিব না, মিথ্যাই বলিব, নকলও করিব। দুইকেই তুল্যভাবে মূল্য দিয়া দুইকে সমন্বয় করিবার প্রয়োজনীয়তা আজ আসিয়াছে। কেননা কোনও এক পক্ষকেই অস্বীকার করিবার সম্ভাবনা আর নাই। 'সত্যই' জাতির মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ড আজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ব্রজমোহন কলেজের আদর্শ ছিল—'সত্য প্রেম পবিত্রতা'। সত্যচ্যুত, শ্রদ্ধাহীন একটা জাতি আজ সকল পরীক্ষায়ই ব্যর্থ হইতেছে; কলেজের পরীক্ষায় এত ফেল হওয়া তাহারই একটি বাহিরের নিদর্শনমাত্র।

যতদিন এই আবহাওয়া বিশুদ্ধ না হইতেছে, ততদিন ছাত্র-পরীক্ষক-অভিভাবক-বিশ্ববিদ্যালয়ও কিছু করিতে পারিবে না। তবে কি চুপ করিয়া এই আবেষ্টনকে যেমন তেমনি চলিতে দিতে হইবে? নিশ্চয়ই নয়। এই আবেষ্টনকেও সৃষ্টি করিবার দুঃসাহস লইয়া একদল ছাত্র, অভিভাবক ও অধ্যাপককে অগ্রসর হইতে

হইবে। নূতন একটা দর্শন বিশ্বের বুকে আসিয়াছে, যে দর্শনের মধ্যে পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও এদেশের অজড়বাদের সমন্বয় সম্ভবপর। আজ সারা বিশ্ব বিশেষভাবে ভারতবর্ষ এই দুই মতবাদের সংঘাতের ভিতর পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। ভারতে ইহার প্রতিক্রিয়া সব চাইতে বেশী। কেননা, সে দীর্ঘদিন পরাধীন ছিল।

ভারতের বর্তমান আবহাওয়ায় কিছুতেই স্কুল কলেজের শিক্ষাকে বিশুদ্ধ রাখা সম্ভব হইবে না, যতদিন না একদল ছাত্র, অভিভাক, অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয় নূতন করিয়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পরস্পরবিরোধী ধারাদ্বয়ের সমন্বয় দর্শনকে চিন্তাক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছে। আজিকার আবেষ্টনে 'শিক্ষা' গৌণ হইয়া পড়িয়াছে; উৎকট জড়বাদ চায় সর্বাগ্রে সর্বত্র ছাত্রদের ভিতর তাহার মতবাদ প্রচার করিতে। তাই যখন তখন যে-সে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্র ধরিয়া ছাত্রেরা স্কুল ত্যাগ করে, শিক্ষকগণও ধর্মঘট করেন। স্কুলে কলেজে চলিতেছে এখন 'রাজনীতি'। কিসের পড়াশুনা? দেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছিল, তখন আমরা বলিয়াছি, 'Education can wait, but Swaraj cannot'. 'Materialistic conception of history-র উপর গড়িয়া ওঠা রাজনৈতিক দল বলিতেছে, 'আগে দেশে জড়বাদের প্রতিষ্ঠা চাই, পরে স্কুল-কলেজের ব্যবস্থা হইবে'। ছাত্রগণ আজ লেখাপড়া ছাড়িয়া রাজনীতির জন্য ব্যস্ত। অথচ পাশ না হইলে চাকুরী মিলিবে না। তাই ফাঁকির আশ্রয় লইয়া পাশ করার দিকে এত ঝোঁক।

এই অবস্থায় শিক্ষক-অধ্যাপক-বিশ্ববিদ্যালয়কে, বিশেষ করিয়া অভিভাবক-গণকে সতর্কতার সহিত ইহার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। প্রথমে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে কোথায় ও কিরূপে জড়বাদ ও অজড়বাদের সমন্বয় হইবে, সত্য-প্রেম-পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা হইবে। এই সমন্বয়ের আবহাওয়া প্রচারিত না হইলে ছাত্রদের কিছুতেই ঘরে ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর হইবে না।

'বন্দে মাতরম্'

লোকসেবক-প্রেস—৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বল ভারত

ষষ্ঠ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৬০

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'

রেণু মিত্র

সমস্ত 'গোরা' বইটার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যতগুলি সমস্যাসঙ্কুল ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তাদের সবাইরই ভিতরকার প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিকারের হিন্দুত্ব কি বস্তু? হিন্দুত্বের যে ক্ষুদ্রতার দিকটি সমাজ ব্যবস্থায় বা আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে প্রচলিত হয়ে আছে, তাকে সরিয়ে দিয়ে হিন্দুত্বের বিরাটত্বের দিকটিকে সমাজজীবনে কি প্রচলন করা যায় না? অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে হিন্দুত্বের যে ব্যবহারিক দিক, তা' নেতিমূলক, তা' অন্যকে বর্জন করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে। রবীন্দ্রনাথ গোরার মধ্যে যে কয়টি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তাতে দেখেছি হিন্দুত্ব রক্ষা করতে গেলে খ্রীষ্টানত্ব ব্রাহ্মত্ব অর্থাৎ হিন্দুত্ব বলতে যে কতকগুলি নির্দিষ্ট আচার ব্যবহার বা ধারণা ঠিক করে নেওয়া গেছে, সে গুলির সঙ্গে যা মিলবে না, তাকেই বহুদূরে সরিয়ে রেখে নিজেকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু এ হিন্দুত্ব যে বর্তমান যুগের সামগ্রিক জীবনবোধের সঙ্গে মেলে না, এমনকি ভারতের ঔপনিষদিক বা গীতোক্ত ভাবধারার সঙ্গেও যে এর মিল নেই, একথা সমাজের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কই? রবীন্দ্রনাথের যৌবন কালে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রথম অনুপ্রবেশ সময়ে যে সংঘাত ফেনিয়ে উঠেছিল, নানাভাবে তার মোড় ফিরে যায়— বিশেষ করে রাজনৈতিক আন্দোলন এসে সামাজিক সমস্যাটাকে চাপা দিয়েছে। সামাজিক সমস্যাগুলির যে সমাধান হয়ে গেছে, তা নয়; সেগুলি নেপথ্যে সরে গেছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ গোরাকে হিন্দু করতে পারলেন না,

সেদিন বাস্তবে তাঁর চোখের সামনেও তো এই দৃষ্টান্তই ছিল। ভগিনী নিবেদিতা হিন্দুত্বকে কেমন করে আপন করে নিয়েছিলেন, সে খবর কে না জানে? Aggressive Hinduism প্রচার করবার চেষ্টাও তিনি করেছেন, সমস্ত জীবনটা তাঁর যাঁরা হিন্দু তাঁদেরই কথা অনুসরণ করে তাঁদেরই জন্য ব্যয়িত হয়েছে, তথাপি নিবেদিতা নিজে হিন্দু হতে পারেন নি। হিন্দুত্বের এই যে ক্ষুদ্রতা, এ নিয়ে আজ পাকিস্তান সৃষ্টি—কিন্তু এই পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারটার সমস্ত রাজনৈতিক রং-এর পেছনে যে সামাজিক বিভেদনীতি বা বর্জননীতিই দায়ী এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ও ব্যাপক সচেতনতা কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করে গোড়া হিন্দুত্বের পক্ষের যুক্তিগুলি অতি সরস ভাষায় গোরার মুখে তুলে ধরেছেন। সেগুলি শুনতে ভাল—কিন্তু গোড়াতে বিভেদটাকেই আমার বেঁচে থাকবার পক্ষে সত্য বলে মেনে নিলে গোরার যুক্তিগুলি অকাট্য বটে। কিন্তু এই ভেদ-নীতিটাকেই গোড়া থেকে আমরা অস্বীকার করতে চাইছি। বর্জন নয়, সমস্ত বৈচিত্র্যকেই তার সত্যিকারের মূল্যে স্বীকার করে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে কি নেওয়া যায় না, মিশিয়ে নিয়ে কি নিজের আত্মধর্ম বজায় রাখা যায় না? গোড়া হিন্দুত্বে নারীত্বের স্থান ও মান সম্বন্ধে গোরার যুক্তিগুলি সত্যিই কি ছেঁদো যুক্তি নয়? গোরা যখন স্বদেশকে ভালবাসে, যখন সে বিনয়কে বলে, 'তোমার কথা শুনে আমি একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, তোমার জীবনে তুমি আজ একটা প্রবল সত্যের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ—তার সঙ্গে ফাঁকি চলে না। সত্যকে উপলব্ধি করলেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। আমি যে-ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছি সেই ক্ষেত্রের সত্যকেও অমনি করেই একদিন আমি উপলব্ধি করব এই আমার আকাঙ্ক্ষা। তুমি এতদিন বই-পড়া প্রেমের পরিচয়েই পরিতৃপ্ত ছিলে—আমিও বই-পড়া স্বদেশপ্রেমকেই জানি—প্রেম আজ তোমার কাছে যখনি প্রত্যক্ষ হল তখনি বুঝতে পেরেছ বইয়ের জিনিষের চেয়ে এ কত সত্য—এ তোমার সমস্ত জগৎ চরাচর অধিকার করে বসেছে, কোথাও তুমি এর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছ না—স্বদেশ প্রেম যেদিন আমার সম্মুখে এমনি সর্বাঙ্গীণ ভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে সেদিন আমারও আর রক্ষা নেই—সেদিন সে আমার ধনপ্রাণ, আমার অস্থি মজ্জা-রক্ত, আমার আকাশ-আলোক, আমার সমস্তই আকর্ষণ করে নিতে পারবে, স্বদেশের সেই সত্যমূর্তি যে কী আশ্চর্য অপরূপ, কী সুনিশ্চিত সুগোচর,

তার আনন্দ বেদনা যে কী প্রচণ্ড প্রবল, যা বন্যার স্রোতের মতো জীবন মৃত্যুকে লঙ্ঘন করে যায়, তা আজ তোমার কথা শুনে মনে মনে অল্প অল্প অনুভব করতে পারছি—তোমার জীবনের এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে আজ আঘাত করেছে—তুমি যা পেয়েছ তা আমি কোনো দিন বুঝতে পারব কিনা জানি না কিন্তু আমি যা পেতে চাই তার আস্বাদ যেন তোমার ভিতর দিয়েই আমি অনুভব করছি'—এ সব যখন গোরা বলে বিনয়কে, তখন এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরে বিশেষ আনন্দ হয় যে, গোরার জীবনে সুদূরের ডাক আছে, বিরাটত্বের আহ্বান আছে, ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডী পেরিয়ে তার জীবনে অনন্তের মৃদু স্পর্শের ঢেউ এসে আঘাত করেছে। কিন্তু এই অনন্তের ধারণাকে প্রচলিত গোঁড়া হিন্দুত্বের মাপকাঠিতে মাপতে গিয়ে সে যে তাকে কত ক্ষুদ্র করে ফেলেছে, সে কথাটা তখনই বুঝতে পারি যখন নারী সম্বন্ধে বা নারীত্ব সম্বন্ধে তার ধারণা জানতে পাই। সে ভারতবর্ষকে চায়, ভারত-বর্ষকে চায় তার সমস্ত মানুষের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তার এই স্বদেশপ্রেমের মধ্যে নারীর স্থান নেই। এক অর্ধেককে বাদ দিয়ে আর এক অর্ধেককেই সে সমগ্র করে ধরেছে। বিনয় বলছে গোরাকে, 'দেখো, গোরা, একটা কথা তোমাকে আমি বলতে চাই। আমার মনে হয় আমাদের স্বদেশপ্রেমের মধ্যে একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে। আমরা ভারতবর্ষকে আধখানা করে দেখি। .... আমরা ভারতবর্ষকে কেবল পুরুষের দেশ বলেই দেখি; মেয়েদের একেবারেই দেখি না। গোরা জবাব দিলে, 'তুমি ইংরেজদের মতো মেয়েদের বুঝি ঘরে বাইরে, জলে স্থলে, শূন্যে, আহারে আমোদে কর্মে সর্বত্রই দেখতে চাও—তাতে ফল হবে এই যে, পুরুষের চেয়ে মেয়েকেই বেশি করে দেখতে থাকবে—তাতেও দৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট হবে।' গোরা যে স্বদেশ-প্রেমের মধ্যে মেয়েদের অংশকে তার চিন্তার মধ্যে যথাপরিমাণে আনে না, দেশকে যে সে নারীহীন করে জানে, একথা গোরা মেনে নিতে পারে না। মূর্খের মত জবাব দেয়—যেমন অনেকেই দিয়ে থাকে—, 'আমি যখন আমার মাকে দেখেছি, মাকে জেনেছি তখন আমার দেশের সমস্ত স্ত্রীলোককে সেই এক জায়গায় দেখেছি এবং জেনেছি।'

সত্যিই গোরা মূর্খের মত এ কথা বলেছে। মাতৃত্বই কি সংসারে একমাত্র সত্য কথা? আর মাতৃত্বই যদি সত্য তবে যে-স্ত্রীত্বকে প্রথমে অঙ্গীকার করে এই মাতৃত্বলাভ ঘটে, তা কি করে অসত্য হবে? অথচ ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন

ধরে ভারতীয় নারীর পক্ষে মাতৃত্বেরই একমাত্র মহিমা কীর্তন করে এসেছে আর সবগুলিকে অস্বীকার করে। সে কিছুতেই স্বীকার করবে না যে নারী যেমন মা, তেমনি সেইসঙ্গে সে স্ত্রীও বটে, অন্য অনেক কিছুও বটে। জীবনে সবগুলিরই মূল্য সমান। জীবনে একটা ঘটনা যদি সত্য তবে অপর ঘটনাও অবশ্যই সত্য—সবই ঘটনা—একটাকে সত্য বললে, অপরটাকেও সত্য বলতে হয়। গোরা বুঝতে পারে না যে, জীবন থেকে স্ত্রীত্বকে বাদ দিয়ে সে জীবনের সমগ্রতা লাভ করতে পারবে না। হিন্দুত্বকে ভালবাসতে গিয়ে সে যতখানি স্বাভাবিক মানুষ ছিল, তার চেয়ে বেশি একটা মতবাদের প্রতীক হয়ে পড়েছিল। এর যেমন একটা উপকারিতা ও সৌন্দর্য আছে, তেমনি বিপদও আছে। গোরার ঐ হিন্দুত্ব যদি একই সঙ্গে ব্যাপক ও গভীর হয়ে সামগ্রিক হতো, তা'হলে বিপদ কিছু ঘটতো না। কিন্তু সে যে একদেশদর্শী হিন্দুত্বকে আকড়ে ধরেছিল, তাতে শুধু গোড়ামিপূর্ণ একটা মতবাদ ছিল, মানুষ ও মানুষের বিভিন্ন দিক বাদ পড়ে গিয়েছিল একেবারে। 'জীবনে গোরার একটিমাত্র বন্ধু আছে তাহাকেই ত্যাগ করিয়া গোরা তাহার ধর্মকে সত্য করিয়া তুলিবে।' যে মাকে সে এত ভালবাসে, এত ভক্তিশ্রদ্ধা করে, নিজের ধর্মকে রক্ষা করতে সে তাঁর ঘরেও খাওয়া ছেড়েছিল। তার কাছে হয় এটা, নয় ওটা। অথচ জীবনের কোন উপলব্ধি, কোন চিত্তবৃত্তিই যে অসত্য নয়, স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে নারীকে ভালবাসা যে বিরুদ্ধ নয়, মিথ্যা নয়, কেবল যে তার একটা ছন্দ জানাই শুধু প্রয়োজন, ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার পরিপোষক বলে মনে করা হয় যে ব্যক্তিগত প্রেমকে, তা যে বিশ্বজনীন স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে বিশ্বজনীনও হতে পারে—এ কথা গোরার মাথায় ঢোকে না—ঢোকে না বহু মানুষেরই মাথায়। হয় এটা নয় ওটার অবস্থাকে গোরা আবার খুব সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে উপস্থিত করে। বিনয়ের কাছে মানুষের থেকে মত বড় ছিল না—তাই মানুষ তার মধ্যে প্রবেশ করতো অতি সহজেই। প্রথম প্রেমের স্পর্শে তার সমস্ত সত্তা যখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তখন সত্যকে সে সহজেই মেনে নিয়েছে। সুচরিতার অস্তিত্বও গোরাকে একটা ধাক্কা দিয়ে গেছে। তাইতে তার একমুখীন গোড়ামি একটু নরম হয়ে এসেছে। তবু হয় এটা নয় ওটাই গোরার পক্ষে সত্য কথা। বলছে বিনয়কে, 'বিনয়, এ সব কথা আমি যে ঠিক বুঝি তা বলতে পারিনা। দু'দিন আগে তুমিও বুঝতে না। জীবন ব্যাপারের মধ্যে আবেগ এবং আবেশ আমার কাছে যে আজ

পর্যন্ত অত্যন্ত ছোটো ঠেকেছে সে কথাও অস্বীকার করতে পারি নে। তাই বলে এটা যে বাস্তবিকই ছোটো তা হয়তো নয়—এর শক্তি এর গভীরতা আমি প্রত্যক্ষ করি নি বলেই এটা আমার কাছে বস্তুহীন মায়ার মতো ঠেকেছে—কিন্তু তোমার এত বড়ো উপলব্ধিকে আজ আমি মিথ্যা বলব কী করে? আসল কথা হচ্ছে এই, যে লোক যে ক্ষেত্রে আছে সে ক্ষেত্রের বাইরের সত্য যদি তার কাছে ছোটো হয়ে না থাকে, তবে সে ব্যক্তি কাজ করতেই পারে না। এই জন্যেই ঈশ্বর দূরের জিনিষকে মানুষের দৃষ্টির কাছে খাটো করে দিয়েছেন—সব সত্যকেই সমান প্রত্যক্ষ করিয়ে তাকে মহা বিপদে ফেলেন নি। আমাদের একটা দিক বেছে নিতেই হবে, সব এক সঙ্গে আঁকড়ে ধরবার লোভ ছাড়তেই হবে, নইলে সত্যকেই পাব না। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে সত্যের যে-মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করছ—আমি সেখানে সে-মূর্তিকে অভিবাদন করতে যেতে পারব না—তা'হলে আমার জীবনের সত্যকে হারাতে হবে। হয় এদিক নয় ওদিক।'

গোরার এই কথাগুলির মধ্যে একটি ভিত্তিগত ভুল রয়ে গেছে। এটা সত্যি কথা যে, দেশ ও কালের ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ—একই সঙ্গে একই সময়ে বহু সত্যকে সে কর্মে রূপ দিতে পারে না। কিন্তু তাইতেই প্রমাণিত হয় না যে, অতএব হয় এটা নয় ওটাই মানুষের জীবনে একমাত্র সত্য কথা। আসলে ব্যক্তিগতভাবে কেউ জ্ঞানপ্রবণ, কেউ কর্মপ্রবণ, কেউ ভক্তিপ্রবণ; কিন্তু তাই বলে একের পক্ষে যেটা প্রধান বা যেটার প্রবণতা বেশী, তার পক্ষে আরগুলি হবে মিথ্যে—এ হতেই পারে না। প্রকাশের ক্ষেত্রে যে কোন একটা সত্য কোন একজনের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও আইডিয়ার ক্ষেত্রে গোড়াতে সামগ্রিকতাকে স্বীকার করতেই হবে। মানুষের জীবনের প্রতিটি বৃত্তি, প্রতিটি ভাব সমান মূল্য দাবী করবার অধিকার রাখে—এবং একটি অপরটিকে ডিঙিয়ে না গিয়ে প্রত্যেকটিকে কি করে একটা সামঞ্জস্যের মধ্যে সংগ্রথিত করা যায়—সেই প্রচেষ্টাটাই জীবন। গোরার মধ্যের স্বদেশপ্রেমের বিশ্বজনীনতা প্রাণে সাড়া দিয়ে যায়—ওটা গোরার কাছে তার রক্ত-মাংসের মত সহজ, সত্য; তাই সে বড়, বহুর প্রাণের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ থাকায় তাই সে সুন্দর। কিন্তু সে যখন তার ঐ স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম মেশাতে পারে না, বলে নারীকে তার প্রয়োজন নেই, ওটাকে সে ছোট মনে করে—তখন বুঝি জীবনের বৃহত্তর মুক্তির সন্ধান গোরা আজও

পায় নি ; আর সেই মুক্তিকেই খুঁজে পেতে তার জয়যাত্রা। একদিন যখন ক্ষুদ্র হিন্দুত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে গোরা বেঁচে গিয়েছিল, সেদিন স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেমকেও সে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিল।

সমস্ত 'গোরা' বইটার মধ্যে যে সকল সমস্যা রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত করেছিলেন, তার একটারও যে আজ পর্যন্ত প্রচলিত হিন্দুত্বের মানদণ্ডদ্বারা সমাধান লাভ হয়নি, আমরা সে কথা আগেই বলেছি। আর্য সমাজের জন্ম একদিন হিন্দুত্বের এই ক্ষুদ্রতা থেকে মানুষ-হিন্দুকে রক্ষা করতে সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজের জন্মও সেইখান দিয়েই। এর পরে পাশ্চাত্য মতবাদ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দেশের অর্থনীতি, রাজনৈতিক প্রেরণার জাগরণ এবং সমস্ত সমস্যাকে অর্থনীতিদ্বারা ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা সব মিলিয়ে দেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বা হয়েছে যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত যে-সমস্ত সমস্যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সমস্তর মধ্য দিয়ে আসল সমস্যাটা কি বা সমস্ত সমস্যার মূল কোথায় তা খুঁজে দেখবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত আমরা হারিয়ে ফেলেছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, হিন্দু সমাজ যদি নিজের বুকের থেকে কেবল বের করেই দেয়, গ্রহণ করতে যদি না পারে, তবে যে ভাবে মুসলমান বেড়ে উঠছে তাতে এদেশ ক্রমে এমন মুসলমান-প্রধান হয়ে উঠবে যে, একে হিন্দুস্থান বলাই অন্যায় হবে। রবীন্দ্র নাথের অন্তরাত্মার সে আশঙ্কা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে—পাকিস্তান হয়েছে। কিন্তু এ কথা কি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে পারছি যে, তথাকথিত হিন্দু সমাজের ক্ষুদ্রতাই, সামাজিক বৈষম্যই পাকিস্তান সৃষ্টির মূল কারণ? সমাজের মধ্যে, মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে চলেছে যে, একদিক থেকে মনে হচ্ছে যে সমাজের খুব প্রগতি হয়েছে—মানুষ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আবার সেই সময়েই দেখবার চোখ থাকলে দেখা যায় যে, মানুষ এত বেশী প্রগতি বিরোধী যে নূতনকে, নূতন চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছে বলে যতই মনে হোক না কেন, অন্তরের অন্তরে সত্যিকারের মানুষটি অত্যন্ত পীড়াদায়কভাবে সনাতনী—ক্ষুদ্রতা তার শিরায় শিরায়। অস্পৃশ্যতা যে হিন্দু-সমাজের রোগ—সেই সমাজে আজও অন্তঃস্যূত হয়ে আছে সে। ভগবান বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস পর্যন্ত অস্পৃশ্যতা বর্জনের যে প্রয়াস করে এসেছেন, আজও কি সে অস্পৃশ্যতা সামাজিকভাবে দূরীভূত হয়েছে গ্রামের অলি গলি থেকে? হয় নি। অথচ হয় নি যে সামাজিকভাবে, সে কথাটাও আমরা বুঝতে ভুল করছি। আমরা মনে

করছি যা করবার ছিল, তা করা হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতিই যে আজ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে দিয়েছে, আজ যে যে যা খুসি করতে পারছে সেটা প্রগতির জন্য নয়—রাষ্ট্র ও সমাজের বিশৃঙ্খলার জন্য, সে কথাই বা বোঝে কয়জন? ক্ষুদ্র হিন্দুত্বের কুসংস্কারগুলি যে আমাদের মনের, ব্যবহারের ও দৈনন্দিন জীবনের অলিতে গলিতে রয়ে গেছে, বাইরের যা খুসি করা যে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করছে না, বড় করছে না—এর খবর কে রাখে?

তাই রবীন্দ্রনাথের গোরার আলোচনার প্রয়োজন খুব বেশি করেই আজও আছে। আজকের দিনের মানুষগুলি কেমন যেন হয়ে গেছে, কোন কিছু সম্বন্ধেই কোন আন্দোলন চালাবার মত তেজবীর্য-বিবেচনা নেই। একটা বড় হিন্দুত্ববোধের সামাজিক প্রয়োজন খুব বেশি—যে-হিন্দুত্ব সব ঘটনাকে হজম করে আত্মসাৎ করেও তার আত্মধর্ম বজায় রাখতে পারে, যে-হিন্দুত্বে হিন্দুকে মুসলমান হতে হয় না, গারো প্রভৃতি জাতিকে খৃষ্টান হতে হয় না, হিন্দুনারীকে সমাজের বাইরে ঠেলে দেবার মত অবস্থার সৃষ্টি করে তোলে না, একবার বাইরে গেলেও ঘরে ফিরে আসবার মতো দুয়ার যে-হিন্দুত্বে খোলা থাকে, জন্মের দ্বারা যে হিন্দু নয় এমন অ-হিন্দুকেও হিন্দু করে নিজের মধ্যে গ্রহণ করবার উদারতা ও ব্যাপকতা যে-হিন্দুত্বের আছে—এমনি একটা সর্বভারতীয় হিন্দুত্বকে হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থা ও হিন্দুর দর্শনের মধ্য দিয়ে আজ স্পষ্টতর করে তুলবার বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। গোরার ভাষায়, 'আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।' আমাদের কথা হচ্ছে হিন্দুর দেবতাই কেন না ভারতবর্ষের দেবতা হতে পারবেন? অবশ্যই তিনি হতে পারেন—তা না হলে ভারতবর্ষই লোপ পেয়ে যাবে, হিন্দুত্ব তো যাবেই।

'গোরা'র মধ্যে আর যে প্রশ্নটা বড় হয়ে রয়েছে সেটাও ঐ হিন্দুত্ব বোধেরই অন্তর্গত বলা যায়। সেটা হচ্ছে—বিশ্বজনীন জীবনবোধের সঙ্গে—যেমন স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে—ব্যক্তিগত জীবনকে যোগ করে দেওয়া যায় কেমন করে? যতক্ষণ গোরা হিন্দু ছিল—খাঁটি হিন্দু হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল, ততক্ষণ সুচরিতাকে সে সহজে গ্রহণ করতে পারে নি। মানুষ গোরা মানুষ সুচরিতাকে গ্রহণ করবে—এমন করে সে ভাবতে জানত না।

তার অন্তরের অন্তরাত্মা অবশ্য বলেছে সুচরিতার যা মানুষী-সত্তা, তা শুধু তার সাথেই যুক্ত হতে পারে—হরিমোহিনীর দেবরের সাথে সুচরিতার মিলন যে কোনোমতেই চলতে পারে না, গোরার অন্তরাত্মা একথা জানত—কিন্তু গোরার হিন্দুত্ব ঐ দেবরের কাছেই সুচরিতাকে বলি দিতে বাধ্য হয়েছিল। অবিবাহিতা নারীর সাথে বিশ্বজীবনের—যেমন সমাজসেবা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্রের বাইরে কোন বিশেষ প্রয়োজন নেই—এ তো জানা কথা। কিন্তু নারীর বিচরণ ক্ষেত্র শুধু অন্দরমহল, আর পুরুষের বহির্বিশ্ব—এমন সুস্পষ্ট ব্যবধান রক্ষা করাও আজ আর কারোরই মানুষী সত্তার সঙ্গে সায় দেয় না। প্রত্যেকেই প্রত্যেক স্থানে অবাধ বিচরণে অধিকারী—অথচ কেউ নিজের সীমা বা মর্যাদা লঙ্ঘন করবে না। পথেঘাটে চলতে, সমাজসেবা বা স্বদেশপ্রেমের ক্ষেত্রে নারীর সঙ্গে দেখাও হবে, ব্যবহারও চালাতে হবে একথা গোরাকে বুঝতে হবে; আবার এ-ও বুঝতে হবে যে খাঁটি ব্রাহ্মণ হতে গেলেই নারীকে এমন কি বিশেষ নারী সুচরিতাকেও বাদ দেবার প্রয়োজন নেই যদি এবং যখন সুচরিতার মধ্যে একটা বিশ্বজনীন দিক রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে মানুষের ভয় এইজন্যে যে, তাতে আসক্ত হয়ে পড়ার, আটকে পড়ার, অতি মূল্য দেবার মত প্রবণতা সহজে এসে যায়। কিন্তু ভয় আছে বলেই বা যাকে ঠিক আমার পছন্দ অপছন্দের সাথে মেলাতে পারছি না বলেই তার থেকে দূরে থাকাটা তো মুক্তি নয়, আটকে না পড়েও যে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের যোগ রেখে জীবন চালান যায়, সেইটে প্রমাণ করাই মুক্তি। গোরার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ সেই মুক্তির জয়যাত্রায় বের হয়েছে। প্রত্যেকটি সত্য অথচ কোনটাকে কোনটা ডিঙিয়ে যাবে না, সামঞ্জস্য নষ্ট করবে না—গোড়াতে এই বোধ রেখে দিয়ে পথচলার যে প্রচেষ্টা সেইটেই আমাদের জীবন, সেইটেই আমাদের করণীয়। আদর্শকে, সামঞ্জস্যের আদর্শকেও, কেউ কোনদিন পুরোপুরি আয়ত্ত করে ফেলবে এ হয় না, সেই মুখো হয়ে মানুষ সৎ প্রচেষ্টা করে যাবে—সেইটেতেই ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক কল্যাণ। গোরা একটা ব্যাপকতর হিন্দুত্ববোধকে আহ্বান জানিয়ে এই কল্যাণ প্রচেষ্টার পথে মানুষকে ডাক দিয়ে গেল।

চলবে—

———

শিশু-শিক্ষার ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুবোধকুমার সেনগুপ্ত

হেল্‌বা পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হবার পর ফ্রয়েবেল সুইজারল্যাণ্ডে চলে গেলেন। কিছুদিন ওয়ারটেনসি (Wartensee) এবং কিছুদিন উইলিস (Willisau) তে শিক্ষকতা করার পর তিনি বার্গডর্ফের শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ের অধিকর্তা নিযুক্ত হন। ৬০ জন শিক্ষকের শিক্ষাকেন্দ্রকে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে দাঁড় করালেন। সাথে একটি পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ও ছিল। সেই বিদ্যালয়ে পাঠদান করেই ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষানীতিগুলির পরীক্ষা করতে থাকেন। তিনিই সর্বপ্রথমে তিন বৎসর বয়স্ক শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দান করেন, অর্থাৎ তিন বৎসর বয়স্ক শিশুদেরও শিক্ষার ধারা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে তিনি গবেষণা করেন। ঐরূপ অল্পবয়স্ক শিশুদের উপযোগী, গান, ছড়া, খেলা, কাজ ইত্যাদি অর্থাৎ যেগুলো শিশুরা অনায়াসে ও আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করতে পারবে, এরূপ সকল কিছু সংগ্রহ ও রচনা করা তাঁর গবেষণার কার্য হয়ে দাঁড়ায়। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল এমন সকল বস্তু বা খেলার সামগ্রী স্থির করা, যাদের সাহায্যে শিশুদের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়। হেল্‌বা পরিকল্পনায় তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে সমগ্র মানবসমাজের শিক্ষার একটি ভিত্তি রচনা করতে চেয়েছিলেন, সেই পরিকল্পনা এখন তিনি আংশিকভাবে কাজে লাগাতে অগ্রসর হলেন। মানুষ যাতে একটি পবিত্র জীবন যাপনে উপযোগী হয়, তারজন্য মানবসমাজের একটি সুসম্বদ্ধ বৃদ্ধি প্রয়োজন, এবং সেই সুসম্বদ্ধ বৃদ্ধি সম্ভব হবে, যদি সকল স্তরের মানুষ একই শিক্ষা-আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, অতএব তিনি হেল্‌বা পরিকল্পনার মতই সবচেয়ে ছোট শিশু থেকে আরম্ভ করে বয়স্কদের পর্যন্ত একটা শিক্ষার ধারা নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেন। ফ্রয়েবেল প্রথম জীবন থেকেই মানবজাতির শিক্ষক হিসেবে নিজেকে মনে মনে গণ্য করেন; অবশ্য এধারণার বশবর্তী যে তিনি ছিলেন তার প্রমান হচ্ছে তাঁর পুস্তক 'The Education of Man.' সুসম্বদ্ধ শিক্ষা তাঁর মতে আরম্ভ হবে

শিশু অবস্থা থেকেই। খেলাতেই শিশু তার আত্মপ্রকাশ করে সবচেয়ে বেশী এবং তাঁর অভিমত অনুযায়ী খেলাই হচ্ছে শিশুদের শিক্ষার মাধ্যম।

এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েবেলের শিক্ষার মূল নীতি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। পেস্তালজির Anschauung সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই শব্দটিকে যেমন অনুবাদ করা যায়নি, তেমনিই ফ্রয়েবেলের Darstellung শব্দটিও অনুবাদ করা সম্ভব নয়। অনুবাদ না করতে পারলেও এর মর্মার্থ হচ্ছে শিশুর সর্বপ্রকার আত্মপ্রকাশ। শিশুর মনে যাকিছু প্রকাশ হবার জন্য উদ্বেলিত, তারই সমস্ত প্রকাশ হচ্ছে Darstellung. মানুষ তার ধ্যান, ধারণা ইচ্ছা, অনিচ্ছা, বিশ্বাস, প্রক্ষোভ, উদ্দেশ্য সবকিছু প্রকাশ করে পরিকল্পনায়, আবিষ্কারে, অভিনয়ে, কথনে, রচনায়, নানারূপ সৃজনাত্মক কর্মে ইত্যাদিতে। যে যে আত্মপ্রকাশের কথা বলা হল, তার সব কিছুতে প্রয়োজন সহযোগিতা, দলগত কর্ম এবং কর্মে অনুমোদন। অর্থাৎ শিশুকে তার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে চলতে হলে তাকে অন্তর ও বাহিরের সবকিছুকে প্রকাশ করতে শিখতে হবে। শিশু এইভাবে সৃজনাত্মক কর্মের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা পাবে, এই হচ্ছে ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির সবচেয়ে বড় কথা।

ফ্রয়েবেল ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বার্গডর্ফ ছেড়ে চলে যান। অবশ্য স্কুলের ভার দিয়ে যান Langethal এর উপর। তিনি জার্মানীর Oberlin ও তাঁর শিষ্যবর্গ পরিচালিত শিশু-বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন। এই সম্পর্কে তৎকালীন Infant schoolsগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা পূর্বেই বলেছি, শিশুদের শিক্ষার কথা কমোনিয়াস, রুশো, পেস্তালজি চিন্তা করেছেন, কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারা দানা বাঁধতে পারেনি, তার প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁরা সকলেই মায়ের উপর শিক্ষার ভার ন্যস্ত করেছিলেন, কিন্তু দীন, অর্ধশিক্ষিত এবং নানা কার্যে ব্যাপৃত মায়ের উপর শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা, আর শিক্ষাদানের দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া একই পর্যায়ভুক্ত হয়। অর্থাৎ কমোনিয়াস, রুশো, পেস্তালজির শিশু-শিক্ষা-নির্দেশ জীবনের স্তরে কোনওরূপ কার্যকরী হয় না। এই সময় Jean Frederic Oberlin শিশুসমাজের প্রয়োজনকে যথার্থ উপলব্ধি করে একটি শিশু-বিদ্যালয় খুললেন। ছোট শিশুরা সেখানে খেলত, গান করত, বেড়াতে যেত, পরিবেশের সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করত, ছবি আঁকত ইত্যাদি আর

অপেক্ষাকৃত বড় শিশুরা ঐ সকল কাজের সঙ্গে সঙ্গে সেলাই করত, কাপড় বুনত ইত্যাদি। Oberlinএর শিশু বিদ্যালয় দেখে আরও কয়েকজন যথা, Princess Pauline, Prof Wadzech, Pastor Theodor ইত্যাদি শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভব করে স্কুল খুলতে থাকেন। ইংলণ্ডে Robert Owen শিশু বিদ্যালয় খুলেছিলেন। কিন্তু যতই শিশু বিদ্যালয় খোলা হোক না কেন, বিদ্যালয়গুলি শেষ পর্যন্ত প্রাচীন-পন্থী বিদ্যালয়ে পরিণত হতে লাগল, অর্থাৎ লেখা-পড়ার দিকেই বিদ্যালয়গুলিতে ঝোক্ দেওয়া আরম্ভ হল।

ফ্রয়েবেলও জার্মানীতে Oberlin প্রবর্তিত বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে স্কুলগুলি অনেক ক্ষেত্রেই লেখাপড়ার শিক্ষা-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বা অপেক্ষাকৃত ছোট শিশুদের জন্য হয়েছে গৃহের পরিবর্ত্ত, অর্থাৎ মায়ের অনুপস্থিতিতে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাক্ষেত্র, শিক্ষাকেন্দ্র নয়। ফ্রয়েবেল যে এ ব্যবস্থা দেখে মোটেই সন্তুষ্ট হন নি, সেকথা বলাই বাহুল্য। তিনি এমনি সব ক্রমবর্ধমান কার্য্য ও খেলার কথা চিন্তা করছিলেন, যাদের সাহায্যে শিশুর দেহ ও মন, অন্তর ও বাহির, পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও অবধান ক্ষমতা, স্বয়ংক্রিয়তা ও আত্মপ্রকাশ সুষ্ঠুভাবে বর্দ্ধিত হতে পারে। শিশুর স্বাভাবিক সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত জীবনের সমন্বিত সুপ্রকাশ যে ভাবে সম্ভব, সেই ধারা ও ক্রমের গবেষণামূলক আবিষ্কারই ফ্রয়েবেলের কাম্য। School based upon natural instincts of the children এই হবে ফ্রয়েবেলের স্কুলের নাম, একথা তিনি ভাবছিলেন, কিন্তু নামটা অর্থব্যঞ্জক করতে গিয়ে মস্ত বড় করা হচ্ছে একথাও তাঁর মনে উদয় হচ্ছিল। আরও সহজ সরল কিন্তু অধিকতর অর্থব্যঞ্জক একটি নাম হলে বেশ ভাল হয়। একদিন তিনি পর্বতগাত্রে হেটে বেড়াচ্ছিলেন আর এসব কথাই চিন্তা করছিলেন, হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "পেয়েছি পেয়েছি, আমার স্কুলের নাম হবে Kindergarten (শিশূদ্যান)"; অর্থাৎ বাগানে যেমন চারাগাছ সুদক্ষ মালির যত্নে পরিবর্ধিত হয় তেমনি শিশূদ্যানে শিশুরা দক্ষ শিক্ষকের পরিচালনায় সুন্দরভাবে বর্ধিত হবে।

ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেনের ক্রীড়া দ্রব্যের মধ্যে হচ্ছে মুখ্য দ্রব্য তিনটি। একটি Sphere (গোলা), একটি Cube (ঘনক্ষেত্র) ও একটি Cylinder (নলাকৃতি বস্তু)। এগুলিকে Gifts বলা হয়। গোলা নিয়ে

শিশুরা গড়িয়ে দিত বা ছুঁড়তো, Cube গুলি দিয়ে শিশুরা কোনকিছু তৈরী করত আর Cylinder গুলিকে যেহেতু দাঁড় করিয়ে বা গড়িয়ে দেওয়া চলতে পারে, সেইহেতু শিশুরা খেলা অনুযায়ী সেগুলোকে ব্যবহার করত। ইতিমধ্যে আরও নানা রকম খেলার বন্দোবস্ত হতে থাকে, খেলার মূল ক্রীড়নকের সঙ্গে যুক্ত হয়—আরও অনেক জিনিষ যথা, কাঠি, আংটি, ত্রিকোণাকৃতি ও চতুষ্কোণাকৃতি বস্তু ইত্যাদি। যে সমস্ত আকৃতি-বিশিষ্ট জিনিষের কথা বলা হল, এগুলো হচ্ছে প্রকৃতি ও শিল্পকলার প্রতিভূস্বরূপ এবং ফ্রয়েবেলের মতে প্রকৃতি ও শিল্পকলার মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য একত্ববোধ বর্ত্তমান এবং সকলের উপরের সত্তায় যে একত্ব সেটা হচ্ছে ভগবানের ক্ষেত্রে। পৃথিবীর নানা দ্বৈধদ্বন্দ্ব থেকে কিছু দূর অবস্থিত শিশুর মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা বোধ বর্ত্তমান, তার ফলেই সে কিছুটা সৃষ্টি করতে সক্ষম। ভগবান হচ্ছেন সকলের চেয়ে বড় স্রষ্টা, শিশু ভগবানের অংশ হিসাবে স্রষ্টা, এই ভাবেই ফ্রয়েবেল শিশুর সৃষ্টি-ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম দিকে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল তার কিছু আলোচনা চলতে পারে। সেখানে বলা হয়েছিল যে Herbartian Psychology applied to Education পুস্তকে Adams বলেছেন যে ফ্রয়েবেল প্রবর্ত্তিত Kindergarten এবং তাঁর শিক্ষানীতি-মূলক পুস্তক The Education of Man এর মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু ভাল করে চিন্তা করলে দেখতে পাওয়া যায় The Education of Man Kant এর দর্শনকে অবলম্বন করে লিখিত আর Kindergarten এর Gift গুলি যথা Sphere, Cube এবং Cylinder Hegel-এর Dialectical নীতির ধারাকে অবলম্বন করে নির্বাচিত। এদিকে Hegel এর Dialectical নীতি Kant-এর Critical Method হতে উদ্ভূত। অতএব দেখা যাচ্ছে The Education of Manএ বর্ণিত শিক্ষানীতি এবং Kindergarten এর Gift গুলির মূল সূত্র একই। The Education of Manএ ফ্রয়েবেল বলেছেন যে, প্রকৃতি এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুতে হচ্ছে ভগবানের প্রকাশ। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বই হচ্ছে ভগবানকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা। ভগবান হচ্ছেন অদ্বৈত, সম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ। ভগবান যদি তাই হন তাহলে তাঁর চেয়ে যারা উদ্ভূত বা তাঁরই যারা প্রকাশ তারাও তাঁরই মত। অতএব তাঁর সৃষ্ট যে কোন জীব হতে কিংবা প্রকৃতির যে কোন বস্তু হতে ভগবানে

পৌছান সম্ভব। মানুষের যখন অনুভূতি হয় যে তাঁর স্বীয় আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ভগবান হতে উদ্ভূত, সে ভগবান থেকে এবং প্রকৃতপক্ষে এক সময়ে ভগবানের সাথেই বিলীন হয়েছিল, তখন সে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারে যে ভগবানই হচ্ছেন পিতা এবং সে হচ্ছে ভগবানের সন্তান এবং ভগবানই পৃথিবীর সমস্ত জীব ও জড়কে নিয়ন্ত্রিত করেন। The Education of Man এ ভগবানের সম্বন্ধে মানুষের এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় Kindergarten এর তিনটি মুখ্য Gift। প্রকৃতির বহুত্ব এবং মানুষের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব গিয়ে মিলেছে ভগবানের একত্বে একথা আমরা স্বীকার করেছি। তাহলে পৃথিবীর বস্তু নিচয়ের মধ্যে শিশুর স্থান কোথায়? শিশুকে তিনটি দিক হতে বিচার করলেই তার প্রকৃত ব্যক্তিত্বকে বুঝতে পারা যাবে, শিশু হচ্ছে ভগবানের সন্তান, সে প্রকৃতির সন্তান এবং একটি মানব শিশুও বটে। তার তিনটি অস্তিত্বের সমন্বয় সাধন হয়েছে একটি স্তরে গিয়ে যেখানে স্রষ্টা ভগবানের সঙ্গে তার রয়েছে একত্ব। কিন্তু এর পরিণতি কি ভাবে হয়েছে তা একবার দেখা যেতে পারে। Hegel এর Dialectical process এর Thesis, Antithesis, ও Synthesis (প্রসঙ্গ, বিপরীত প্রসঙ্গ ও উহাদের সমবায়) এর সঙ্গে শিশুর জীবনের গতি ও শিক্ষার মূল ঐক্যকে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। ফ্রয়েবেল The Education of Man এ লিখেছেন, "Every object and form of existence is known only when it is related to its opposite and only in so far as its unity, its agreement with and resemblance to this is discovered ; and this knowledge becomes the more perfect the more complete in the contrast with its opposite and the recognition of the mediating link." The Pedagogies of the Kindergarten নামক পুস্তকে ফ্রয়েবেল লিখেছেন "Everything is and will be best recognised by means of that which is its opposite."

তাহলে শিশু যা শিখবে তার স্থায়িত্বের জন্য বৈপরীত্যের মধ্যে তার শিখতে হবে, তাহলে মূল ঐক্যকে সে বুঝতে কখনও ভুল করবেনা। তাই Kindergarten Giftsগুলির মধ্যে ফ্রয়েবেল তিনটি মুখ্য বস্তু, যথা গতি-সম্পন্ন গোলাকৃতি বস্তুর, তার বিপরীত স্থিতি-সম্পন্ন ঘনক্ষেত্র এবং দু'য়ের সমন্বিতগুণ সম্পন্ন নলাকার বস্তুর আমদানী করেছেন শিশুদের

ক্রীড়ার ক্ষেত্রে। ক্রীড়নকগুলির রূপক শিশুজীবনের বাস্তব বিশ্লেষণে সাহায্য করে, অর্থাৎ জীব ও জড়জগতের সমস্ত বৈপরীত্যগুলির সমাধান করে' ভগবানের একত্বকে উপলব্ধি করতে শিশু ধীরে ধীরে সক্ষম হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে The Education of Man এবং The Pedagogies of Kindergartenএর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে দেখা গেলেও তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য বিদ্যমান রয়েছে। উভয়ের মধ্যে দর্শনগত ঐক্য বর্তমান থাকা ছাড়াও The Education of Man ফ্রয়েবেলের ক্রীড়ার নীতি পরিপোষণ করে, আর Kindargartenএ তার প্রকৃত কার্যকরী রূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি।

ফ্রয়েবেল খেলার মধ্য দিয়ে শিশুদিগকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা Kindergartenএ করেছেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। খেলা সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলের মতামত আরও সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করবার পূর্বে তাঁর শিক্ষা-সম্বন্ধীয় নীতিকে একবার বিচার করে দেখা যেতে পারে। ফ্রয়েবেলের দর্শন-সম্বন্ধীয় ধারণার কিছুটা আলোচনা আমরা করেছি। শিশু বয়সের তাঁর ধর্মপ্রাণ মন পরবর্তী কালে Kant, Fitche, Schelling, Hegel প্রভৃতি দার্শনিক দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলেই তিনি সর্বক্ষেত্রে ভগবানের একত্বকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভগবান অদ্বৈত ও একান্ত এবং তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতি ও মানব। অতএব অদ্বৈত ভগবানের মধ্যেই বৈপরীত্য দেখা যায় এবং এই বৈপরীত্যগুলিরই আবার সামঞ্জস্য বিধান করেন অদ্বৈত ভগবান। নীতি হিসাবে যদি ধরা হয় যে সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে রয়েছেন এক এবং একান্ত ভগবান, তাহলে বিশ্বের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন ভাবও বর্তমান একথা স্বীকার করতেই হবে। যদি কোথায়ও পরিবর্তন বা উন্নতি দেখা যায়, তাহলে তাদের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ত অবিচ্ছিন্ন গতি দেখতে পাওয়া যাবে। ফ্রয়েবেল বলেন "God creates and works productively in uninterrupted continuity." ভগবান হঠাৎ কোন কিছুর প্রবর্তন করেন না বরং অতি ক্ষুদ্র মৌলিক পদার্থকেও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে তোলেন। অতএব ফ্রয়েবেল মানব জীবনকে একটি অবিচ্ছিন্ন ক্রমবর্ধমান অবস্থা বলে মনে করেন।

এই ধারণা থেকেই ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষা-নীতির বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন 'unity' (একত্ব), 'Continuity' (অবিচ্ছিন্নতা) and

'Development' (ক্রমবৃদ্ধি) এই তিনটির সঙ্গে শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা বিজড়িত। তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষাই একদিন দর্শাবে যে মানুষ ও প্রকৃতি একই নিয়মানুগ এবং মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েই ভগবান হতে উদ্ভূত এবং তাঁরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষাই জীব ও জড়জগতের 'বস্তুর' মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম। যদিও ফ্রয়েবেলের মতে মানব প্রকৃতি আধ্যাত্মিক তবুও তা একান্তভাবে অপরিবর্তনীয় নয়, তা সর্বদা ক্রমবর্ধমান, স্বয়ংক্রিয় এবং এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় গতিশীল। প্রতি মানব নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে অতীত যুগের মানবের প্রতি অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করে আসে, এই ভাবেই সে তার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে। প্রতি মানব, মানবজাতির ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে এবং ফ্রয়েবেলের মতানুসারে অন্তর্নিহিত প্রেরণা হতে এই পর্যালোচনা সম্ভব, কিন্তু বহির্জগতও যে অন্তর্জগতকে প্রভাবান্বিত করে, সেকথাও বিচারাধীন না করলে চলবে কেন? ক্রম-বৃদ্ধি বা ক্রম বিকাশ সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলের ধারণা বর্তমান যুগের ধারণা হতে বিভিন্ন; তাঁর মতে মানবের 'ক্রমবিকাশ' পূর্বাহ্ণে স্থিরীকৃত রয়েছে। তিনি তুলনা করেছেন শিশুকে চারাগাছের সঙ্গে। চারাগাছ বৃক্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে প্রথমেই সম্পূর্ণ, শিশুও তাই, শুধু কাজ হচ্ছে তাদের সযত্নে বড় করে তোলা। কিন্তু বর্তমান ধারণায় ক্রম বিকাশের পথে আকৃতিগত নানারকম পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। এদিকে ক্রমবৃদ্ধির অবিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলের মতামত সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর মতানুসারে ক্রমবিকাশের ধারা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু পরে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফ্রয়েবেলকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, কোন একটি স্তরকে ফলপ্রসূ করতে হলে পূর্বের স্তরে শিশুর বৃদ্ধি পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করেছে কিনা দেখতে হবে। একটি স্তরে ভুল থেকে গেলে পরের স্তরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে একথা বলাই বাহুল্য। ফ্রয়েবেল বলেছেন যে পিতামাতারা তাদের শিশুদের বয়সবৃদ্ধি ও স্তর অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থা করবেন। প্রতি স্তর শিশু সহজভাবে পরিক্রমণ করতে পারলেই পরের স্তর শিশুর নিকট গ্রহণ-যোগ্য হতে পারবে। পিতামাতারা ভুল করেন কোনখানে? তাঁরা হয়ত দেখেন যে শিশু বয়স অনুযায়ী একটি বিশেষ বয়স প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু শিশু পূর্বের শিক্ষণীয় স্তরগুলিকে অতিক্রম করে সেখানে এসেছে কিনা না

জেনেই পিতামাতা বয়স অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শিশুর দেহ মন ও আভ্যন্তরিক প্রকৃতি যদি উপযুক্ত হয় তবেই শিশু উপযুক্ত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। শুধু বয়সের উপযুক্ততার উপর শিশুর শিক্ষা গ্রহণ নির্ভর করবে না।

Kindergarten-এর মূলনীতি নির্ভর করছে শিশু চরিত্রের পর্যবেক্ষণের উপর। রুশো, পেস্তালজি প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণও শিশু-চরিত্র পর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, ফ্রয়েবেলও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ছাড়া মনোবিজ্ঞান বিশেষ উন্নতি লাভ করে না, ফলে Kindergarten-এর মূল বস্তুকেই বাদ দিয়ে ফ্রয়েবেলকে অগ্রসর হতে হয়। অবশ্য ফ্রয়েবেল মনোবিদ ছিলেন না, কিন্তু তবুও তাঁর নিজস্ব একটি মনোবিজ্ঞানের ধারা ছিল এবং সেই ধারণাগুলি ছিল নিম্নরূপ। (১) শিক্ষা মানব জীবনের স্বাভাবিক গতি, (২) শিশু সজীব বস্তু এবং সে সৃজনাত্মক স্বয়ং কর্মের মাধ্যমে সাধারণ নিয়মানুযায়ী বৃদ্ধি পায়, (৩) শিশু সমাজের সক্রিয় সভ্য।

ফ্রয়েবেলের প্রথম সিদ্ধান্তটিই যুগান্তকারী এবং তার জন্যই তিনি শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে অন্যতম বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন; দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিও শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার—মানুষ সৃজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি করবে। মানবজাতির ক্রমবর্ধমান গতির সঙ্গে প্রতি সজীব মানুষের যোগাযোগ রয়েছে এবং প্রত্যেকে বিশ্বসৃষ্টিতে অবদানের মধ্য দিয়ে নিজের স্বয়ং মূল্য যাচাই করে নিচ্ছে—এই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। ব্যক্তি সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলের ধারণা হচ্ছে যে মানুষ কর্মপ্রবণ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, শিশু তার অঙ্গ হয়ে সেও সৃষ্টি করবে তারই ক্ষমতা অনুযায়ী। ফ্রয়েবেল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সেই মতই পোষণ করেন। শিশু, ফ্রয়েবেলের মতে হচ্ছে কর্মী এবং শিক্ষার স্থান হচ্ছে কর্মের পরে। শিক্ষা হবে নিশ্চয়ই, তবে কর্মান্তে। রুশো পেস্তালজি ইন্দ্রিয়ানুভূতি জনিত শিক্ষা দান সম্পর্কে যে মত পোষণ করবেন, ফ্রয়েবেল তা পরিহার করেছেন, তাঁর মতে সৃজনাত্মক কাজে স্বয়ং-কর্মের মধ্য দিয়েই ইন্দ্রিয়ানুভূতি জনিত শিক্ষা হয়ে থাকে।

শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ও বিকাশের সাহায্য করতে পারে এরূপ কতকগুলি খেলা ও গান ফ্রয়েবেল সংগ্রহ ও রচনা করেন, একথা পূর্বেই

বলা হয়েছে। এই খেলাগুলি সম্পর্কে কয়েকরকম Gift এর কথাও আলোচনা করা হয়। এই Gift হচ্ছে নয় প্রকার এবং শিশুর বিকাশে সাহায্য করবে এই হিসেবে এই Gift গুলিকে সাজান হয়েছে। এই Gift গুলির একটা করে দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে। প্রতিটি Gift ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু এবং শিক্ষাপ্রদ। একটি নূতন Gift এর সঙ্গে পুরানো Gift থাকে এবং তাতে খেলা সহজ ও বুদ্ধিজনিত হয়। এই Gift গুলির সাহায্যে শিশুর নৈতিক, শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক সর্বরকম বিকাশ হয়। Gift গুলির ক্রম এবং তাদের শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য সংক্ষেপে নিয়ে দেওয়া গেল।

গিফ্ট্	বস্তু	শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য
১নং	৬টি কাঠের বল, প্রত্যেকটির রং বিভিন্ন।	যখন বলগুলিকে গড়িয়ে দেওয়া হয় তখন বলের উপাদান, রং, আকৃতি, গতি, দিক ইত্যাদি সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞান লাভ হয় এবং বল চালনার ফলে শিশুর মাংসপেশী সমূহের চেতনা ও কর্ম-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
২নং	একটি বল (sphere), ঘনাকৃতি দ্রব্য (cube) এবং একটি নলাকৃতি জিনিষ (cylinder)	গতিসম্পন্ন বল সম্বন্ধে জানা আছে, অজানা স্থিতি সম্পন্ন ঘনাকৃতি জিনিষ আনার দরুণ, শিশু দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। দুইয়ের সমন্বয় হয়েছে নলাকৃতি জিনিষে যার মধ্যে দুইয়ের গুণগুলিই বর্তমান।
৩নং	একটি বড় ঘনাকৃতি কাঠের জিনিষ আটটি কিউবে বিভক্ত।	অংশের সাথে পূর্ণের সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান। এ গুলির দ্বারা নানারকম জিনিষ যথা—বাড়ী, সিঁড়ি, দরজা ইত্যাদি তৈরী সম্ভবপর হয়।
৪নং	আটটি লম্বা তিন-পলা কাচ (Prism)	সংখ্যা গণনা, আকৃতি, একটির সঙ্গে আর একটির সম্পর্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। এগুলির সাহায্যে নানা জিনিষ তৈরী সম্ভব হয়। ব্যবহারিক জ্যামিতি সম্বন্ধে শিশুদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়।
৫নং	কিউব এবং প্রিস্‌ম একসঙ্গে	
৬নং	১নং হতে ৫নং পর্যন্ত সমস্ত Gift	
৭নং-৯নং	কাঠের টুকরা, কাঠি, আংটি, দড়ি গুটি	আয়তন, পরিধি, পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা বৃদ্ধি পায়।

এই Gift গুলি নিয়ে শিশুরা খেলবে kindergarten এ, কিন্তু ঠিক কোন্ বয়সের শিশুরা kindergarten এ আসবে, তা একবার ভেবে দেখলে হয়। শিশুদের ফ্রয়েবেল তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অবস্থা (Infancy) হচ্ছে খুব ছোট শিশুদের, জন্মের পর হতে তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত। এই সময়ে শিশুরা বাড়ীতে থাকবে, নিজ নিজ প্রয়োজনে খেলবে, সে খেলার উদ্দেশ্য থাক বা না থাক। ম্যাডাম মন্তেসরি একটি বিশেষ উদাহরণ দিয়ে শিশুর এই অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন। একটি ছোট শিশুকে নিয়ে একটি নার্স গেছে রোমের একটি বাগানে। শিশুটি তার ছোট ঠেলাগাড়ী থেকে নেমে খেলতে খেলতে কতকগুলি পাথর কুড়াতে লাগল। নার্স শিশুর উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে নিজেই কতকগুলি পাথরের টুকরো শিশুর গাড়ীতে তুলে দিল এবং মনে ভাবল শিশুর চাহিদাকে পুরণ করেছে। বলা বাহুল্য শিশুর চাহিদাকে সে পুরণ করতে পারেনি। শিশু চেয়েছিল নিজেই সে পাথরের টুকরোগুলি কুড়াবে ; ঐ হচ্ছে তার খেলা বা কাজ। ফ্রয়েবেলের মতে শিশুদের দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে ৩ বৎসর থেকে ৭ বৎসর পর্যন্ত (Childhood)। এই বয়সেই শিশু কিণ্ডারগার্টেনে থাকবে এবং নানা খেলার মারফত সে প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাবে। ৭ বৎসরের পরের অবস্থাকে ফ্রয়েবেল বলেছেন বাল্যকাল (Boyhood)। এই সময়ে বালককে শিক্ষা দেওয়া হবে। শিশুকালের 'শিক্ষা পাওয়া' ও বাল্যকালের 'শিক্ষা দেওয়া'র মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, শিশুকালে শিশু খেলার মারফত স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে শিক্ষার প্রয়োজন হবে সেই শিক্ষাই সে পাবে, আর বাল্যকালে শিশুর উপর শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হবে। kindergarten এই শেষের দিকের শিশু এবং বাল্যকালের প্রথম অবস্থার বালকদের নিয়ে ফ্রয়েবেল Connecting School খুলেছিলেন ; উদ্দেশ্য দুই অবস্থার বৈপরিত্যের মধ্যে একটু সহজ সমাধানের ব্যবস্থা করে শিশুদের বাল্যাবস্থার জন্য তৈরী করে দেবেন।

শৈশবকালে kindergarten এ থাকা কালীন শিশুদের কাজ হবে ভাষা শিক্ষা ও খেলা। শিশু যে শুধু খেলবে তাই নয়, খেলার প্রতি উপাদানের ও বস্তুর নামাকরণ তাকে করতে হবে, খেলবার সামগ্রীগুলির মধ্যে সম্বন্ধ তাকে জানতে হবে, বলতে হবে। খেলার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফ্রয়েবেল এই অবস্থায় খেলার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন "Play is the highest achievement of child

development at this stage, since it is the spontaneous expression, according to the necessity of his own nature, of the child's inner being. ......Play at this period of life is not a trivial pursuit; it is a serious occupation and has deep significance." শিশু খেলার ভিতর দিয়ে নিজের জীবনকে তৈরী করে নেয় এই হচ্ছে ফ্রয়েবেলের মত। তাঁর মতে খেলা এবং শিক্ষণীয় কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, উভয়েই এক। খেলার বিষয়ে তিনি পিতামাতার কাছে সুপারিশ করে বলেছেন যে, তারা শিশুদের শুধু খেলার সুযোগই দেবেন না প্রয়োজন মত তাদের সঙ্গে খেলবেনও "Let us live in sympathy with our "Children".

ফ্রয়েবেল যদিও খেলার নীতিকে আবিষ্কার করেন নি, কিন্তু তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে এর সুযোগ্য স্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমান নূতন শিক্ষার ধারায় এর প্রয়োজন যে কতখানি তা পরিকল্পনামূলক কাজ এবং অন্যান্য সৃজনাত্মক কাজে বিশেষভাবে উপলব্ধি হচ্ছে।

—চলবে

'কেবলমাত্র ঘর আমাদিগকে এত বাঁধনে এমন করিয়া বাঁধিয়াছে, চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইবার ম ন আমাদের এত অযাত্রা, এত অবেলা, এত হাঁচি-টিকৃটিকি, এত ‹.শ্রপাত যে, বাহির আমাদের পক্ষে অত্যন্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ঘরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।'

—রবীন্দ্রনাথ

'রুদ্র'

শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

হে রুদ্র ভৈরব!
বিশ্ব প্রকৃতি বক্ষে কিসের উৎসব,
উন্মাদের তাণ্ডব নর্ত্তন
উদ্দাম উলঙ্গ-রঙ্গে প্রলয় গর্জ্জন,
কি মহান আনন্দেতে মাতি
মরণ আসন দিলে পাতি
স্তব্ধ ভীত সন্তাপিত বসুন্ধরা পরে
বিজয়ের মদ গর্ব ভরে,
মহোল্লাসে অট্টহাস্যে গালবাদ্য করি
দৃঢ় হস্তে সমুদ্যত কম্পমান বজ্রশূল ধরি
নির্দ্দয় আবেগে তারে শূন্য হতে চাহ নিক্ষেপিতে
প্লাবিয়া ধরণীবক্ষ মানবের সুতপ্ত শোনিতে?
হে ভোলাসন্ন্যাসী!
আত্মানন্দ পানে তৃপ্ত নির্লিপ্ত উদাসী
হেমগিরি সুবর্ণ শিখরে
ছিলে যবে ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত অন্তরে
মদন বসন্ত সহচর
কৌতুকে হানিল ফুলশর
অতর্কিতে যোগনিদ্রা ভাঙ্গিবার লাগি।
বিস্ময়ে উঠিলে তুমি জাগি।
ভ্রূকুটি কুটিল ভঙ্গে তৃতীয় নয়ন
মহারোষে উদ্গারিল জ্বালাময়ী বজ্রহুতাশন
দগ্ধ করি শঙ্ক শরে সে দাহের হল না নির্বাণ
চাহ পুন সংহারিতে অন্নহীন বুভুক্ষের প্রাণ।

হে করুণাময় !
কেন এই অকরুণ লীলা অভিনয় ?
শান্তিহীন ধরণী মাঝারে
কেহ গর্ব্বে হাসে, কেহ ভাসে অশ্রু ধারে
শাস্তির অকুণ্ঠ উচ্চহাস
ক্ষুধিতের অন্ন করি গ্রাস
দাম্ভিক দুর্বৃত্ত সুখে করে অত্যাচার
দুর্ব্বলের উঠে হাহাকার
বাধাহীন পাশবিক শক্তি পরীক্ষায়
মানবের নীতি ধর্ম্ম চিরন্তরে লবে কি বিদায় ?
আর্ত্তের ক্রন্দন-ধ্বনি এখনো কি পশিল না প্রাণে ?
লীলাময়, এ লীলা সম্বর প্রভু বিশ্বের কল্যানে।

হে প্রমত্ত শিব !
সংহর প্রলয় মূর্ত্তি অশান্ত অশিব।
জগতের মঙ্গল বিধাতা
দুষ্ট বিনাশনকারী আর্ত্তজন ত্রাতা
এস নামি মূর্ত্ত অবতার
যে রূপে এসেছ বারে বার
যুগে যুগে নিবারিতে আর্ত্তের ক্রন্দন
নববেশে নর-নারায়ণ।
কর জোড়ে কম্প্র বক্ষে উর্দ্ধপানে চাহি
কাতরে ডাকিছে আর্ত্তে অশ্রুজলে নিত্য অবগাহি,
অন্নহীন বস্ত্রহীন নিপীড়িত মানব-সন্তানে
রক্ষ বরাভয়ধারী করুণার শান্ত বারি দানে !

———

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ-ব্যবস্থা

সুবোধ মুখোপাধ্যায়

সাধারণভাবে ও মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সামাজিক ব্যবস্থার গোড়ার কথা হল উভয় সমাজে মেয়েদের স্থান-বিভাগ। উভয় সমাজেই বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে মন্তব্য পাওয়া যাবে—কোথাও মেয়েরা হল আনন্দের আকর—সুখের খনি-বিশেষ: আবার কোথাও বলা হয়েছে নারী নরকের দ্বার—দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী! এর মধ্যে কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যা নিহিত আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বিভিন্ন ধর্ম্মের আবহাওয়ায় নারীর স্থানও ভিন্ন ভিন্ন রকমে রূপ বদলেছে। ব্রাহ্মণপ্রধান গোঁড়া হিন্দু ধর্ম্মে, বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীর অবাধ মেলামেশার যুগে, বৈষ্ণব ও আউল বাউল সম্প্রদায়ের আওতায় সমাজে মেয়েদের স্থান অল্পবিস্তর রূপ বদল করেছে। ঠিক একই রকম ভাবে না হলেও পাশ্চাত্য দেশেও ক্যাথলিসিজম ও প্রোটেস্‌ট্যানটিজম্ এর বিভিন্ন আবহাওয়ায় সমাজে মেয়েদের স্থানের অদল বদল হয়ে এসেছে।

রোমান্ ক্যাথলিকদের যুগে আকুমার ধর্ম্মযাজকগণ নারীকে ঈশ্বরের সন্নিকটেই স্থান দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী প্রোটেস্‌ট্যানটিজম্ এর যুগে নারীর সে সম্মান আর ছিল না। নারীকে সর্ব্বতোভাবেই নরের তাঁবেদার করে দেওয়া হল। এমনকি সেকালের যৌন জীবনেও ধর্ম্ম-যাজকগণ অবাধে নারী সঙ্গে লিপ্ত হতে লাগলেন। যদিও এই একটি প্রথাই প্রোটেসট্যানটিজম্‌কে দুর্ব্বল ও অন্তঃসারশূন্য করে ফেলতে লাগলো, তবুও ধর্ম্মের দিক দিয়ে প্রোটেসট্যানটিজমই পুর্ব্ববর্ত্তী ক্যাথোলিসিজমকে আর মাথা তুলতে দিল না। একথা অবিসম্বাদে বলা চলে যে, মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক সভ্যতার আর কখনো পুনরাগমন হবে না—সে সভ্যতা চিরতরেই বিদায় গ্রহণ করেছে। প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের বিরোধ ক্যাথলিসিজিমের যুগে যে ভাবে প্রতীয়মান হত, পরবর্ত্তী যুগে তা আর তদনুরূপ হত না। অতিপ্রাকৃতের প্রতি যদিও কিয়ৎ পরিমাণ লোকের মামুলি সহানুভূতি দেখতে পাওয়া যায়, তবুও তার কোনো শক্তিই আজকাল পরিলক্ষিত হয় না। একভাবে বলতে গেলে

প্রোটেসট্যানটিজম্ প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের সংমিশ্রণে অপারগ হয়ে যাকিছু প্রাকৃত তার অবমাননা করেছে। প্রোটেসট্যানটিজম-এর ভগবান সম্বন্ধে দীনহীন ধারণা এবং জীবনের অতি প্রয়োজনীয় যৌন ব্যাপারে অস্পষ্ট ও নৈরাশ্যকর ভাবধারা সম্মিলিত হয়ে সাধারণ মানুষকে প্রোটেসট্যান্ট খৃষ্টধর্ম্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যৌন জীবনকেও সর্ব্বতোভাবে পঙ্কিল করে তুলেছে।

এটা সর্ব্ববাদী সত্য যে প্রোটেসট্যানটিজিম্-এর যুগেই যান্ত্রিক সভ্যতা সর্ব্বরকমে মানুষের জীবনের মান উন্নত করেছে তার নানান যান্ত্রিক আবিষ্কার ও কলকব্জার ব্যবহারের ভেতর দিয়ে। অনেকের মতে যান্ত্রিক সভ্যতার জনক হ'ল প্রোটেসট্যানটিজম্। প্রোটেসট্যানটিজিম্-ই উচ্ছৃঙ্খল ও নিয়ম-বিহীন আত্ম-কৈন্দ্রিক সভ্যতার জন্মদাতা। এই আত্ম-কৈন্দ্রিক সভ্যতাই যন্ত্রকে দানবে পরিণত করেছে—এবং মানুষের জীবনকে ভয়াবহ করে তুলেছে। প্রোটেসট্যানটিজম্-এর আত্মকৈন্দ্রিকতার বিপথে যাবার (Perversion of individuality into individualism) প্রধান কারণ হল যৌন সম্পর্ক ব্যাপারে শুদ্ধ সত্য প্রেমের অভাব। প্রোটেসট্যানটিজিম-এর মতে মানুষের সঙ্গে ভগবানের ঘনিষ্ট যোগাযোগ—চিরসত্য পিতাপুত্রের সম্পর্কের নব আবিষ্কার। এই মতের উপর বিশ্বাস করে এও-ও বলা চলে যে, সত্য বিবাহ হল ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যার মিলন এবং উভয়ের উভয়কে স্বীকার করা। প্রোটেসট্যান্টিজম্ যদি সত্যি কোনো ধর্ম্ম-প্রচেষ্টা হত, তা'হলে ত নরনারীর সম্পর্ককে বহুভাবে উন্নত ও সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। এটা সম্পাদনে অপারগ হওয়ায় ও ক্যাথোলিসিজম্ এর ভগবৎ-বিশ্বাসের অবমাননা করায় অনেকের মতে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রোটেসট্যানটিজম খাঁটি ধর্ম্ম-প্রচেষ্টা নয়—এটা প্রধানতঃ আত্ম-কৈন্দ্রিকতার নূতন রূপ-পরিগ্রহ—an assertion of egotism. প্রোটেসট্যানটিজম্-এর প্রধান কীর্ত্তি হল ইউনিভারসাল চার্চ্চ-এর বদলে ন্যাশনাল স্টেট-এর প্রতিষ্ঠা। পরবর্ত্তী যুগে ন্যাশনাল স্টেট-এর যথেচ্ছাচার কিয়দংশে চাপা পড়ে মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিগত অধিকারের তাগিদে। এই ব্যক্তিগত অধিকার শেষাবধি কেবল মাত্র পুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য হয়ে উঠলো। নারী অবশেষে ক্যাথোলিক চার্চ্চ প্রদত্ত স্বীয় সম্মান-স্থান হারিয়ে ফেললো। যদিও কিছু পরে নারী পুরুষের সঙ্গে সমান রাজনৈতিক অধিকার লাভ করেছিল বটে, কিন্তু সত্য স্বাধীনতা হারিয়ে রাজনৈতিক অধিকার লাভ কিছুই

নয়। আসলে নারীর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণই হল। এতে বিবাহ পরিণত হল "যৌথ কারবারে" ও নরনারীর মিলনে যে ভগবৎ প্রেম ও আত্মশক্তির বিকাশ হয় তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হল। মোটাকথায় বলতে গেলে প্রোটেসট্যানটিজম্-এর শেষকীর্ত্তি হল—'to make of marriage the spurious union of two individualisms instead of the complete meeting & mating of two individuals. ....The frustrated woman seeks compensation in the aggrandisement of the family as a competitive unit.'

সমাজের এই শেষের অবস্থা প্রথম অবস্থার চেয়ে সর্ব্বাংশেই নিকৃষ্ট। স্বর্গীয় ও চিরন্তন নরনারীর প্রেমই হল সত্যভাবে ভগবৎ প্রেমের অভিব্যক্তি। এর ব্যতিক্রমেই প্রোটেসট্যানটিজম্ ও সেই পরিবেষ্টনের সামাজিক ব্যবস্থা ভগবৎ অনুভূতির দৈন্য দশার ও ভাগবত ভাবের শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক সরকারের সার্ব্বভৌমত্বের এটাই কারণ। 'A conception of God which has no room for the principle of woman, necessarily degenarates into the world view of scientific mechanism of the eventual, through unconsious adulation of material power. No other power is real to men who have ceased to be capable of experiencing spiritual power.'

আধুনিক সমাজের অব্যবস্থার দিনে যান্ত্রিক সভ্যতার কাছে মানবাত্মার অবমাননা চরমে পৌঁছেছে। এতে আর কোনো সংশয় নেই। নৈতিক জ্ঞান সর্ব্বনাশী যান্ত্রিক যুদ্ধের কাছে নির্ব্বাক। এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে সারা দুনিয়ার খৃষ্টীয় সমাজের সমবেত প্রার্থনা ও পৃথিবীর সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহানুভূতি সূচক মতবাদ সত্ত্বেও এ পৃথিবীতে কোনো সক্ষম আধ্যাত্মিক শক্তি বর্ত্তমান নেই। সে শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে।

এ কথা সত্য যে আমরা যদি আত্মশক্তির নব প্রেরণা ও ভগবৎ অনুভূতির অবাধ উৎসের সন্ধান স্বাভাবিক ভাগবত মানব প্রেমের ভেতর না পাই, তাহলে তা অন্য কোথাও পাব না। আমরা যদি প্রেমের নূতন উৎসের কোন সন্ধান না করি ও নরনারীর মধুর সম্পর্কের নূতন কোনো ধারার পরিচয় না পাই, তাহলে পৃথিবীতে যান্ত্রিক সভ্যতারই একমাত্র শক্তি পরিলক্ষিত হবে—অন্য কোনো শক্তিই সেখানে খাটবে না। যান্ত্রিক সভ্যতার বিরাট

শক্তি কেবলমাত্র মানব-প্রেম দিয়েই আয়ত্তে আনা যায়। কিন্তু সেই প্রেম হওয়া চাই শাশ্বত ও সত্য। পাশ্চাত্য জগতের অদ্ভুত পরিস্থিতি এই যে, সে এখনো প্রেমের ধর্মে বিশ্বাসের ভাণ করে। সে ধর্ম এখন আর নেই। মানুষ কেবলমাত্র মুখে দেখায় যে, সে ধর্মে বিশ্বাসী এবং ধর্মের ও ধর্ম-বিশ্বাসের অবাধ শক্তিকে মানে। যে ঈশ্বরকে ক্রীশ্চানরা পূজা করেন বলে বলেন—তাঁর সঙ্গে তাঁদের সত্যিকারের কোনো সম্বন্ধই নেই।

ভগবানের সঙ্গে যোগস্থাপনই আমাদের প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন—এই-ই হল সত্য ও শাশ্বত প্রেমের অভিজ্ঞতা। এ কথা সমস্ত মানুষের পক্ষেই সত্য ও সম্ভব কেবলমাত্র এক উপায়ে—নর ও নারীর উভয়ে উভয়ের মধ্যে ভগবানের রূপ পরিদৃষ্ট করা—উভয়ের আত্মার মিলনে। এইটেই হবে আমাদের নব সমাজের দৃঢ় ভিত্তি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সপ্তমোঽধ্যায়

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত স্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ৭।২২

স [অন্যদেবতার উপাসক সেই জন] তয়া [আমাদ্বারা বিহিত] শ্রদ্ধয়া [শ্রদ্ধাদ্বারা যুক্ত হইয়া] তস্যাঃ [সেই দেবতনুর] রাধনম্ [আরাধনা] ঈহতে [চেষ্টা করেন] লভতে চ [এবং লাভও করেন] ততঃ [তাহার আরাধিত দেবতনুর মারফতে] কামান্ [ঈপ্সিতসমূহ] ময়া এব [তত্তদ্দেবতান্তর্য্যামী, কর্ম্মফল বিভাগজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর আমি দ্বারা] বিহিতান্ [নির্ম্মিত] তান্ [সেই সমুদয়কে] হি [নিশ্চয়ই] (প্রতি দেবতনুও আমারই তনু ; প্রতি দেবতনু স্বয়ম্পূর্ণ, অথচ আমি প্রতি তনুর অতীত, সমগ্র, সর্ব্বদেবসমন্বয় ; আমার বাহিরে, আমাকে ডিঙ্গাইয়া কেহ নাই)।

সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই ভক্ত সেই দেবতনুরই আরাধনা করিয়া থাকে. এবং সেই দেবতার মারফত সেই সকল ফল লাভ করে ; বাস্তবিক আমাদ্বারাই ঐ সকল বিহিত। ৭।২২

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি। ৭।২৩

(যে কারণে তাহাদের আরাধনার মধ্যে ভেদদৃষ্টি, অভিমান ও অকৃৎস্নদর্শন রহিয়াছে, সেই কারণেই) তু [কিন্তু] অন্তবৎ [বিনাশী] ফলম্ [ফল] তেষাং [তাহাদের] তৎ [তাহা] ভবতি [হয়] অল্পমেধসাং [অকৃৎস্নদর্শীদের] ('যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ'—ইহাই বলিতেছেন) দেবান্ [দেবসমূহ] দেবযজঃ [দেবতা যজন করে যাহারা, তাহারা] যান্তি [প্রাপ্ত হন] মদ্‌ভক্তাঃ [আমার ভক্তগণ] যান্তি [প্রাপ্ত হন] মাম্ অপি [সমগ্র আমাকে ; এবং আমার মধ্যে অন্যদেবতাগণকে তো পানই]।

সেই অল্পদৃষ্টিসম্পন্নদিগের সেই ফলও বিনাশশীল হয়। দেবযাজীরা দেবতা পান, মদ্ভক্তগণ আমাকে পান।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ৭।২৪

(কি কারণে তাহারা আমাকে আশ্রয় করে না, তাহাই বলা হইতেছে) অব্যক্তম্ [অব্যক্ত প্রকৃতিকে হজম করিয়া, অঙ্গীভূত করিয়া, প্রতি ব্যক্তিকে স্বয়ম্পূর্ণ করিয়াও প্রতি ব্যক্তির অতীত এবং প্রতি স্বয়ম্পূর্ণ ব্যক্তিগুলিকে সংযমন করিয়া তাহার অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও তাহাদের অতীত, সর্ব্বব্যক্তিসমন্বিত অব্যক্তত্বে অচ্যুত আমাকে] ব্যক্তিম্ আপন্নং [বিশেষ ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত ; কোনও খণ্ড বিশেষ ব্যক্তির মাঝে ধরা পড়িয়াছি এইরূপ] মন্যন্তে [মনে করে] মাং [সমগ্র 'সর্ব্বসমন্বয়' আমাকে] অবুদ্ধয়ঃ [সমগ্রদর্শনবুদ্ধিহীন] পরং [অনুগ হইয়াও অতীত, পরকীয়] ভাবং [প্রতি ব্যক্তি ও অব্যক্তের মধ্যস্থ ভাব, লীলা] অজানন্তঃ [অবিবেকীগণ] মম [আমার] অব্যয়ম্ [অনন্ত ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াও তত্ত্বতঃ ব্যয়রহিত] অনুত্তমম্ [নাই উত্তম যাহা হইতে, সকলকে সমন্বয় করিয়া প্রতি ব্যক্তির উত্তম, সর্ব্বোত্তম]।

অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তির মধ্যে আপন্ন (ধরা পড়িয়াছি) বলিয়া, আমার অনুত্তম অব্যয় পর ভাব সম্বন্ধে বুদ্ধিহীনগণ মনে করে। ৭।২৪

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্। ৭।২৫

(লোকে আমাকে কেন ধরিয়াও ধরিতে পারে না, তাহাই বলিতেছেন) ন অহম্ [আশ্চর্য্যস্বভাব আমি] প্রকাশঃ [ঘন প্রকাশ সম্পন্ন নই] সর্ব্বস্য [সর্ব্বলোকের কাছে] (আমার কোনও কোনও ভক্তের কাছেই শুধু আমার প্রকাশ ঘন হইয়া থাকে) (কেন প্রকাশ নই ?) যোগমায়াসমাবৃতঃ [যিনি যোগ, তিনিই মায়া, একাধারে যোগমায়া শ্রীদুর্গাশক্তি (Organic Power). সেই যোগমায়াদ্বারা সম্যকরূপে আবৃত। অন্তর্ম্মুখিনী, আত্মাভিমুখিনী, একত্বাভিমুখিনী, বিশ্লেষণময়ী (analytic), নৈগু'ণী কেবল গতিই যোগ ; 'অন্তঃ পুরুষরূপেণ'। বহির্ম্মুখিনী, অনাত্মাভিমুখিনী, বহুত্বাভিমুখিনী, সংশ্লেষণময়ী (Synthetic), লীলাময়ী গুণময়ী গতিই মায়া, 'কালরূপেন যঃ বহিঃ'। যোগ ও মায়া একান্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে একটা জীবনহীন মড়া যন্ত্রেরই (mechanism) সৃষ্টি করে। যোগমায়াই জীবনযন্ত্রের স্রষ্টা, যাহার ভিতরে প্রতি বিশেষটী স্বার্থ (for itself) বাঁচিয়া থাকিয়াও পরার্থ (for the organism)। জীবনযন্ত্রের এইখানেই মায়াত্ব, অনির্ব্বচনীয়তা যে 'each cell must live for itself as well as for the whole of organism'. স্বার্থ-পরার্থের দ্বন্দ্বমোহের স্থান মড়া যন্ত্রে আছে, জীবনযন্ত্রে নাই। সমগ্র পুরুষোত্তমজীবনের বাহিরে অল্পবুদ্ধিদের, অবুদ্ধিদের সব-কিছু সাধনাসাধ্য এই মড়া যন্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই জীবনযন্ত্রের সাধনা ও সিদ্ধির খবর নিজের জীবন ও নিজের শাস্ত্রদ্বারা বিশ্বের সামনে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিলেন। এই জীবন সর্ব্বপ্রকাশধর্ম্মী বলিয়াই 'স সর্ব্বস্য প্রকাশঃ'। সর্ব্ব-প্রকাশের 'যোগ' রহিয়াছে বলিয়া ইহা 'যোগ' ; আবার এই যোগ আশ্চর্য্যরূপে সকলের বুদ্ধির সামনে একটা ইন্দ্রজালের মত ফুটিয়া উঠিল বলিয়া ইহা 'মায়াও'—একাধারে যোগমায়া] (অতএব) মূঢ়ঃ [যোগ ও মায়ার দ্বন্দ্বমোহে মূঢ় ; একান্ত যোগও মূঢ়তা, একান্ত মায়ার সাধনাও শ্রীভগবানের দৃষ্টিতে মূঢ়তা] ন অভিজানাতি [অভিজ্ঞান লাভ করে না, স্বতঃসিদ্ধরূপে আমাকে পাইলেও অনাত্মার বুকে সেই স্বতঃসিদ্ধ পাওয়াকেই পুনরায় সাধনা করিয়া সিদ্ধরূপে প্রাপ্ত হয় না ; ভগবান যখনই 'জানাতি' বলিতে চান, প্রায়ই 'জানাতি' না বলিয়া 'অভিজানাতি' পদের প্রয়োগ করেন] লোকঃ [লোক] মাম্ [আমাকে] অজম্ [সকল জন্মকে জন্মের মূল্যেই সার্থক করিয়া তাহাদের মধ্যে

ন-রূপে গূঢ় 'অজ'; এখানেও শ্রীভগবান 'অ' ও 'অজে'র সমন্বয়রূপিণী যোগমায়াদ্বারা আবৃত] অব্যয়ম্ [সব ব্যয় করিয়া দেওয়া-রূপ পরিণামের বুকে তত্ত্বদৃষ্টিতে কিছুই ব্যয় না করা-রূপে বিবর্ত্তিত 'অব্যয়'; এখানেও পরিণাম-বিবর্ত্তের সমন্বয়রূপিণী যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত শ্রীভগবান্]।

যোগমায়াসমাবৃত আমি সকলের সামনে প্রকাশবান নহি। মূঢ়লোক অজ, অব্যয় আমির অভিজ্ঞান লাভ করে না। ৭।২৫

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ৭।২৬

(পুরুষোত্তম নিজ পুরুষোত্তম ছাচে ঢালিয়া স্বা প্রকৃতির অপূর্ব্ব রূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, 'স্বগুণৈর্নিগূঢ়' গুণের রূপ, সুকৃতের রূপ, দেবতার রূপ সবই একে একে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এইবার যে কাল হইতে 'যতঃ ভিন্নদৃশাং ভয়ম্' সেই কালের রূপ প্রকাশ করিয়া প্রত্যেককে তাহার তাহার স্থানে ও মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া বলিতেছেন) বেদ [জানি] অহম্ [যোগমায়াসমাবৃত আমি, যে-আমির চরণতলে সর্ব্ব 'কাল' মূর্চ্ছিত, মূর্ত্ত] সমতীতানি [সমতিক্রান্ত] ভূতানি [ভূতসমূহ] বর্ত্তমানানি চ [এবং বর্ত্তমান] হে অর্জ্জুন ভবিষ্যাণি ভূতানি চ [এবং ভবিষ্যৎ ভূতসমূহ] মাং তু [আমাকে কিন্তু] ন বেদ [জানে না] কশ্চন [কেহই]। (প্রাণবল্লভ পুরুষোত্তম স্তরে কালের অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ প্রতিটী অংশ নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ থাকিয়া প্রত্যেকের মধ্যে প্রত্যেকে গলিয়া এক জীবনস্রোতে নিতুই নব নব রূপে পরিণামের পর পরিণাম গড়িয়া তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখা পুরুষের ধর্ম্ম, 'যোগ'; বর্ত্তমানদৃষ্টি মায়া-প্রকৃতির ধর্ম্ম; পুরুষোত্তম একাধারে প্রকৃতি-পুরুষ, যোগমায়া। যাহা বিজ্ঞাত, তাহা বাক্যের ক্ষেত্র—'রূপ যৎকিঞ্চ বিজ্ঞাতম্ বাচস্তদ্রূপম্'। যাহা কিছু বিজিজ্ঞাস্য তাহা মনের রূপ—'যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং মনসস্তৎ রূপম্'; যাহা কিছু অবিজ্ঞাত তাহা প্রাণের রূপ—'যৎ কিঞ্চ অবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রূপম্'। ভবিষ্যৎ অবিজ্ঞাতের রাজ্য পাড়ি দিতে প্রাণ ছাড়া দ্বিতীয় কেহ নাই। পুরুষোত্তম জীবনে অতীতই বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানই অতীত এবং ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎই অতীত-বর্ত্তমান। কালের কোনও বিশেষ প্রকাশই একান্ত নহে, তাহার মধ্যে অন্য সব বিশেষ কাল 'একভূয়ং ভূত্বা' রহিয়াছে। পুরুষোত্তম প্রতি কালে স্বয়ম্পূর্ণ থাকিয়াও

তাহার অতীত, প্রতি স্বয়ম্পূর্ণ কালসমূহের সমন্বয় করিয়াও তাহার অতীত। তাঁহাকে যে কোনও বিশেষ কালের ভাষায়ই ব্যাখ্যা করা চলে, অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি স্তরে সমভাবে আস্বাদন করা চলে। তিনি অতীতে স্বয়ম্পূর্ণ রূপে থাকিয়াও লীলারসরাজমূর্ত্তিতে অতীতের অতীত বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে, বর্ত্তমানে পূর্ণ থাকিয়াও বর্ত্তমানের অতীত অতীত ও ভবিষ্যতে, ভবিষ্যতে পূর্ণ থাকিয়াও সমভাবে ভবিষ্যতের অতীত অতীত ও বর্ত্তমানে। তাঁহার জীবনে কোনও কাল-কৌলীন্য নাই, প্রতি কালের সহিতই তাঁহার সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। পুরুষোত্তমন্তরে কলিকালও সত্যত্রেতার চেয়ে কুলীন হইতে পারে। ভাগবত বলিতেছেন—'কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ'॥ 'সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরের প্রজাগণ, হে মহারাজ, কলিতে জন্ম বাঞ্ছা করেন; কলিতে নিশ্চয়ই জনগণ নারায়ণপরায়ণ হইবেন।' Mass religion প্রচারিত হইতে পারে একমাত্র কলিযুগেই। 'ভববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে ধন গোরা জগতে ফেলিল ঢালি।' ভববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত প্রেমধন সত্যত্রেতা-দ্বাপরে প্রচারিত ছিল না। হাটে হাড়ি ভাঙ্গিবার মত শ্রীগৌরসুন্দর জগতের বুকে সেই প্রেম ছড়াইয়া দিলেন। তিনিই কালপুরুষসমন্বিত, সর্ব্বকালসমন্বয়, পুরুষোত্তম ব্রজজনমনোলোভা, রাসমণ্ডলমণ্ডন, গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ)।

হে অর্জ্জুন, আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্ব্বভূতকেই জানি; কিন্তু আমাকে কেহ জানে না। ৭।২৬

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ৭।২৭

(আমার সমগ্রদর্শনের প্রতিবন্ধকারণ বস্তুটী কি, যাহা দ্বারা প্রতিবন্ধ হইয়া প্রাণিগণ সৃষ্টিব্যাপারের মধ্যে আমাকে জানিতে পারে না? এই প্রকার আশঙ্কার উত্তর দেওয়া হইতেছে) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন [ইচ্ছা এবং দ্বেষ ইচ্ছাদ্বেষ; তাহা হইতে যাহা সমুত্থিত হয়, তাহাই ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থ] (সেই ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থ কি?) দ্বন্দ্বমোহেন [দ্বন্দ্বনিমিত্ত মোহদ্বারা, পুরুষোত্তমের প্রকৃতি এবং তাঁহার প্রকৃতির কার্য্য এই জগৎ সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান হইতে জাত ইচ্ছাদ্বেষরূপ 'দোষ' হইতে উৎপন্ন দ্বন্দ্বজনিত মোহদ্বারা। পরস্পরবিরুদ্ধ-স্বভাবযুক্ত হওয়াই দ্বন্দ্বের কর্ম্ম। আত্মা-অনাত্মা একটি দ্বন্দ্ব; জড়-অজড় দ্বন্দ্ব, নিত্য-অনিত্য দ্বন্দ্ব, নির্গুণ-সগুণ দ্বন্দ্ব, আকার-সাকার-নিরাকার দ্বন্দ্ব, সত্ত্ব-রজ-

তমো দ্বন্দ্ব, কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি দ্বন্দ্ব, লীলা-কৈবল্য দ্বন্দ্ব, গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস দ্বন্দ্ব, বন্ধন-মোক্ষ দ্বন্দ্ব, স্বার্থ-পরার্থ দ্বন্দ্ব, ইচ্ছা-দ্বেষ দ্বন্দ্ব, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম দ্বন্দ্ব, সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্ব, পাওয়া ও না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব সবই অনাত্মার বিকাশ। দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ ঝগড়া ও মৈথুন দুই-ই। যাহারা দ্বন্দ্ব শব্দকে একান্ত লড়াই বা একান্ত মৈথুনার্থে নিয়াছেন, তাহারা উভয়েই দ্বন্দ্বমোহে পড়িয়াছেন। পরস্পরবিরুদ্ধ স্বভাবযুক্ত হওয়ার মধ্যে শুধু ঝগড়াই নাই, মৈথুনও রহিয়াছে। আত্মমৈথুনের দেশে, পুরুষোত্তমের দেশে পরস্পরবিরুদ্ধ স্বভাবযুক্ত হওয়ার অর্থ প্রত্যেকের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সত্তা-অভিপ্রায়-ক্রিয়া প্রভৃতির স্বয়ঃমূল্যপ্রাপ্তি, সমকক্ষতা—যে যাহার স্বয়ংসিদ্ধ স্বধর্ম্মে, স্ববৈশিষ্ট্যে অচ্যুত থাকিয়াও অন্যোন্যসক্ত, মিথুন। কাহাকেও স্বয়ংমূল্য স্বীকার না করিয়া গৌণভাবে 'পরার্থ' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া কেহ যে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না, ইহাই দ্বন্দ্ব শব্দের 'মৈথুন' অর্থের ভিতর পরিস্ফুট হইয়াছে। মানুষ পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাববিশিষ্ট ভাবসমূহের কোনও একটী পক্ষকেই একমাত্র পক্ষ মানিয়া লইয়া অপর পক্ষের বিচার করিতে চায়, দুই পক্ষের কথা পক্ষপাতবিমুক্ত হইয়া শুনিবার মত যোগ্যতা, অবসর, ধৈর্য্য তাহার নাই, সে একপক্ষের সাক্ষ্যকেই একমাত্র সাক্ষ্য ধরিয়া লইয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে, রায় দেয়। সে তাহার মনোমত সাক্ষীর সাক্ষীকে মানিয়া লইবার জন্য পক্ষপাতশূন্য বিচারপতির দরবারে বিরুদ্ধ পক্ষকে গরহাজির রাখিবার অপকৌশলও অবলম্বন করে। বিচারের এই অপচেষ্টা আজ বিচারপতি পুরুষোত্তমের কাছে ধরা পড়িয়াছে। কোনও তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ঐ তত্ত্বসম্বন্ধে স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও উদাসীন যাহার যাহা কিছু বক্তব্য, দৃষ্টান্ত, সাধনা, সকলকেই তাহা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করিবার সুযোগ দিয়া তবে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হইবে। পুরুষোত্তমের সামনে সর্ব্বক্ষেত্র সমমর্য্যাদায়, সমকক্ষতায় প্রসারিত। তিনি সকলের সব দাবী শুনিয়া এই 'সর্গ' সম্বন্ধে বিশ্ব সম্বন্ধে 'শেষ সমাধান' দিবার জন্য এই গীতাশাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন) হে ভারত সর্ব্বভূতানি [পক্ষপাতযুক্ত সর্ব্বভূত] সম্মোহং [পরস্পরের পৃথক্ পৃথক্ মর্য্যাদা। পৃথক্ পৃথক্ মর্য্যাদা-গুলির অন্যোন্যমৈথুন সম্বন্ধে তত্ত্ব নির্ণয় না করিতে পারার মোহে] সর্গে [এই বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে] যান্তি [প্রাপ্ত হয়] হে পরন্তপ।

হে পরন্তপ ভারত, ইচ্ছাদ্বেষ হইতে সমুত্থিত দ্বন্দ্বমোহদ্বারা সর্ব্বভূত সৃষ্টি ব্যাপারে মোহপ্রাপ্ত হয়। ৭।২৭

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৭।২৮

(তাহারা কাহারা, যাহারা এই দ্বন্দ্বমোহমুক্ত হইয়া তোমাকে যথাশাস্ত্র জানিয়া আত্মভাবে ভজনা করেন—এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরেই বলিতেছেন) যেষাং [যাহাদের] তু [কিন্তু] অন্তগতং [সমাপ্তপ্রায়, শেষপ্রায় হইয়াছে] পাপং [দ্বন্দ্ব পাপ] জনানাং [জনসমূহের] (কি উপায়ে কাহাদের পাপের অন্ত হইল ?) পুণ্যকর্ম্মনাং [পুণ্য হইতেছে কর্ম্ম যাহাদের তাহাদের ; রাগদ্বেষ-স্তরের ; বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট পাপপুণ্যের অন্তর্গত 'পুণ্য' এখানে 'পুণ্য শব্দ দ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। 'কর্ম্মশুদ্ধির্মদর্পণম্'—আমাতে অর্পণ করাই কর্ম্মের শুদ্ধি; মদর্পিত কর্ম্মই পুণ্যকর্ম্ম] তে [তাহারা] দ্বন্দ্বমোহ-নির্ম্মুক্তঃ [আমি ও সর্ব্বের দ্বন্দ্বমোহ হইতে নিঃশেষে মুক্ত ; ভক্ত প্রথমে যখন শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণ করেন, তখনও সেখানে ভক্ত-ভগবানের পৃথক্ দৃষ্টি থাকে, তখন সেই কর্ম্ম সাত্ত্বিক। কিন্তু এইরূপ সাত্ত্বিক কর্ম্মার্পণের ভিতর দিয়া পৃথক্ ভাবটী যখন খসিয়া পড়িয়া যায়, তখনই বাস্তবিকপক্ষে নির্গুণ ভজনের অধিকার মিলে—'কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্ যজেৎ যষ্টব্যমিতি পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ'—কর্ম্মত্যাগ, পরপুরুষে কর্ম্মার্পণ ও যষ্টব্য বলিয়া যজনা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া ভক্ত-ভগবানে পৃথগ্ভাবযুক্ত যে পুরুষ, সে-ই সগুণাভক্তিযুক্ত সাত্ত্বিক। শ্রীভগবান্ সগুণা সাত্ত্বিকী ভক্তি হইতে নির্গুণা ভক্তির স্তরে লইয়া যাইতেছেন শ্রীভগবানকে দিয়াই] ভজন্তে [নির্গুণা ভক্তির আশ্রয়ে তুমি-আমি-বিশ্বের দ্বন্দ্বমোহ কাটাইয়া অনন্যবুদ্ধিতে ভজনা করেন] মাং [আমাকে] দৃঢ়ব্রতাঃ [পুরুষোত্তম জীবন লাভে ব্রতে যিনি দৃঢ়, তিনিই দৃঢ়ব্রত]।

যে সকল পুরুষোত্তমার্পিত পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তির পাপ বিনষ্ট হয়, তাহারা দৃঢ়ব্রত, দ্বন্দ্বমোহমুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন।৭।২৮

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ৭।২৯

(এইক্ষণ পুরুষোত্তম পুরুষোত্তমছাঁচে 'বিসর্গ', অর্থাৎ সর্ব্ববৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিষম জগৎকে গড়িয়া তুলিবার প্রসঙ্গে অষ্টমাধ্যায়ের সূত্রভূত ছয়টী দৃষ্টি-কোণের বা পাদ-এর (dimension) উত্থাপিত করিতেছেন।) জরামরণ-মোক্ষায় [জরামরণ হইতে মোক্ষের জন্য; কিন্তু দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া

জরামরণমোক্ষ চাহিলে তো মোক্ষ মিলিবে না—'যত্তপি দ্বেষাৎ প্রবর্ত্ততে দুঃখং হাস্যামি ইতি ন মুচ্যেত দ্বেষস্য বন্ধনসমাজ্ঞানাৎ'—ন্যায়বার্ত্তিক। 'মোক্ষো মেঽস্তু চিন্তা চেৎ অন্তর্জাতা উত্থিতং মনঃ। মননোত্থে মনস্যেব দৃঢ়ঃ সাংসারিকঃ বন্ধঃ'—দ্বেষবশতঃ যদি প্রবৃত্ত হও যে দুঃখ দূর করিব, মুক্ত তুমি হইবে না। কেননা দ্বেষই বন্ধন বলিয়া পরিজ্ঞাত। 'মোক্ষ আমার হউক'—এই চিন্তা যখনই মনে জাত হইল, তখনই মন উত্থিত হইল, মননের উত্থান হইলেই সাংসারিক দৃঢ় বন্ধন। জরামরণ জরামরণ হিসেবেই যে দুঃখ দেয়, তাহা নয়; জরামরণের পেছনে যখন পুরুষোত্তমজীবন সম্বন্ধে কোনও দিব্যজ্ঞান না থাকার ফলে জরামরণ সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ দ্বেষের সঞ্চার হয়, তখনই জরামরণ দুঃখদ। জরামরণকে ছাপাইয়া, পরিপাক করিয়া কেমন করিয়া জীবনস্রোত (flux) ছুটিয়াছে, তাহা জানিতে পারাই হইতেছে জরামরণ-মোক্ষের হেতু। যেমন তেমন করিয়া জরামরণ লইয়া টানাটানি করিলেই জরামরণমোক্ষ মিলিবে না, ইহাই বলিতেছেন] মাম্ [পুরুষোত্তম জীবনঘন আমাকে] আশ্রিত্য [আশ্রয় করিয়া] যতন্তি [যত্ন করেন] যে [যাহারা] তে [তাহারা] ব্রহ্ম [যাহা ব্রহ্ম] তৎ [তাহা] বিদুঃ [জানেন] কৃতস্নং [সমস্ত] অধ্যাত্মং [অধ্যাত্ম; ভগবান এই সব শব্দগুলির অর্থযোজনা নিজেই পরের অধ্যায়ে করিবেন] কর্ম্ম চ [এবং কর্ম্ম] অখিলং [সমস্ত]।

আমাকে আশ্রয় করিয়া জরামরণমোক্ষের জন্য যাহারা যত্ন করেন, তাঁহারা সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও অখিল কর্ম্ম জানেন। ৭।২৯।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৭।৩০

সাধিভূতাধিদৈবং [অধিভূত ও অধিদৈবের সহ] মাং [আমাকে] সাধিযজ্ঞং [এবং অধিযজ্ঞের সহিত] যে [যাহারা] বিদুঃ [জানেন] প্রয়াণ কালে অপি [মরণকালেও, সর্ব্বাপেক্ষা অসহায় অবস্থায়ও] চ [এবং অন্য সময়ে তো নিশ্চয়ই] মাং [আমাকে] তে [তাহারা] বিদুঃ [জানেন] যুক্তচেতসঃ [সর্ব্বাবস্থার মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাবে স্থিত অথচ অতীত সূত্রস্বরূপ আমাতে যুক্ত হইয়াছে চিত্ত যাহাদের, তাহারা]।

অধিভূত অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে যাহারা জানেন, তাঁহারা প্রয়াণকালেও সমাহিত হৃদয়ে আমার সত্যবাস্তব স্বরূপ উপলব্ধি করেন। ৭।৩০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

রাশিয়ার যুবশক্তি আজ কোন্ পথে

ধীরেন্দ্র চৌধুরী

বলশেভিক বিজয়ের অব্যবহিত পরেই রাশিয়ার যুবশক্তির বিরুদ্ধে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। এই ভাব যে আজ আর নাই একথা বলা চলে না। অবশ্য ইহার কারণও আছে যথেষ্ট।

বলশেভিক দলের হাতে ক্ষমতা আসার পরে রাশিয়ার সমাজ জীবনে স্বভাবতঃই নানা বিচ্ছৃঙ্খলা দেখা দিল। তখন 'মানব-মুক্তি' আর 'প্রগতির' অছিলায় তথাকার যুবশক্তি, কি নিত্যকার ব্যবহারে কি যৌন ব্যাপারে এমন এক উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করিল যে, তাহা দেখিয়া নেতৃবৃন্দ দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া একেবারে বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

সুনিয়ন্ত্রিত যুবশক্তিই জাতির সম্পদ—জাতির ভবিষ্যৎ। সুতরাং কাল-বিলম্ব না করিয়া একদিকে লেনিন স্বয়ং এবং অপর দিকে দেশের প্রচার বিভাগ অতি কঠোর ভাষায় এই অসংযমের বিরুদ্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। প্রাভদার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিত হইল—"অবাধ প্রেম ও যৌন-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পূর্ণ ভাবেই বুর্জ্জোয়া রীতি। সমাজতান্ত্রিক নীতি বা যে বিধি-ব্যবস্থায় সোভিয়েট নাগরিকদিগকে পরিচালিত করে তাহার সঙ্গে এই রীতির কোন সম্বন্ধ নাই—ইহাই সমাজতন্ত্রের শিক্ষা জীবনের স্বীকৃতি।"

সমালোচনার কষাঘাতে উন্মার্গগামী ঐ যুবশক্তি অচিরেই সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল এবং সমাজধ্বংসকারী পথ ত্যাগ করিয়া তাহারা ধীরে ধীরে সংযম ও নীতির পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

রাশিয়ার যুবশক্তির এই পথ-পরিবর্ত্তন তাহার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এতদ্দ্বারা রাশিয়া যে আত্মশক্তি ও নৈতিক বল লাভ করিল তাহার ফলে ঘরে ও বাহিরে এত বিপদের মধ্যেও অনতিকাল মধ্যে সে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিগুলির অন্যতমরূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছে এবং গত মহাযুদ্ধে জার্মানীর তুলনায় অল্পমাত্র যুদ্ধোপকরণ থাকা সত্ত্বেও, বলিতে গেলে একক ভাবে দুর্দ্ধর্ষ জার্মান বর্ব্বরতার মূলে কুঠারাঘাত করিতেও সমর্থ হইয়াছে।

রাশিয়ার যুবশক্তির ঐ অসংযত ভাবধারা যে কেবল তদ্দেশেই আবদ্ধ রহিল তাহা নহে। বলশেভিকবাদের সঙ্গে সঙ্গে ঐ উচ্ছৃঙ্খল ভাব-তরঙ্গ আমাদের দেশেরও এক শ্রেণীর তরলমতি যুবক যুবতীর অন্তরে স্পন্দন সৃষ্টি করিল। কিন্তু তখন মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক প্রভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহা বাহিরে তেমন ঝংকার তুলিতে পারিল না; তথাপি প্রগতি, বিপ্লব ও আধুনিকতার বাকচাতুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া ঐ দুষ্ট ভাব ক্রমে ক্রমে যুবসমাজে সংক্রামিত হইতে লাগিল।

খোদ রাশিয়ায় যুব-উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব লীলা বন্ধপ্রায় হইয়া গেলেও ভারতবর্ষে কিন্তু তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। অবশ্য এজন্য যে যুব-সমাজই একা দায়ী তাহা নহে। কোন কোন স্বার্থান্ধ অদূরদর্শী নেতা যুব-সমাজের এই অসংযত ভাবকে মূলধন করিয়া ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। আবার যাহারা রাশিয়ার ভক্ত বলিয়া পরিচিত তাঁহারাও কিন্তু রাশিয়ার আদর্শে ভুল সংশোধন করা তো দূরের কথা, রাশিয়ার যুব-শক্তির গতি-পথটি যে বহুদিন পূর্ব্বেই পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন মুখীন হইয়াছে, সেই খবরটুকুও আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুবর্ত্তীদিগকে জানিতে দেন নাই। তাই দেখিতেছি যুবক যুবতীর দল 'লাল ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ' বলিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছে অথচ তাহাদের এই বোধ নাই যে, কি গৃহে কি বাহিরে জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রে, তাহারা আজিকার রাশিয়ার যুব-শক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরিয়া চলিতেছে। অধিকন্তু তাহারা একথাও উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না যে, তাহাদের চাল-চলন ও হাব ভাবের জন্যই দেশের অধিকাংশ লোক আজও রাশিয়াকে একটা ভীতি ও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছে।

একথার সত্যতা, যাহারা মরিস্ হিন্দাস বা রাশিয়া সম্বন্ধে অন্যান্য নিরপেক্ষ লেখকদিগের সমালোচনা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বেশ বুঝিতে পারিবেন।

বলশেভিক সরকার বালক বালিকা এবং যুবক যুবতীদিগের চরিত্র গঠনের নিমিত্ত যে সব 'পাইওনিয়ার্স দল' এবং 'কম্সোমল্' দেশের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে—'আত্মনিয়ন্ত্রণ, সত্য-ভাষণ, মাতা পিতা ও অন্যান্য গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, জীবে দয়া, বন্ধুজনে অনুরক্তি, সমাজ সেবা ও ধূমপান বর্জ্জন।'

ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে—'অভিযাত্রীদল তাহাদের পরিবারের ও বিদ্যালয়ের গর্ব্বের বস্তু হইবে।'

কেন্দ্রীয় কম্‌সোমলের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা ওলগা মিশাকোভা বলিতেছেন—'আমরা চাই আমাদের যুব-সম্প্রদায় দেশপ্রেমিক হোক—অতীতে যা কিছু ভাল কাজ হয়েছে এবং সোভিয়েট তন্ত্রাধীনে যা কিছু করা হবে তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা থাক। দেশপ্রেম জীবনের ভিত্তি স্বরূপ বস্তু-সমূহের অন্যতম—অন্যতম পবিত্র সম্পদ।' এই আদর্শ কি ভারতীয় আদর্শেরই অনুরূপ নহে ?

এখন আমরা বর্ত্তমান রাশিয়ার সমাজ জীবনের 'পরিবার', নারীর আদর্শ ও সতীত্ব, অতীতের ঐতিহ্য, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তবেই বুঝিতে পারিব রাশিয়ার যুবশক্তি আজ কোন্ পথে, আর ভারতীয় যুবসমাজই বা কোন্ পথ ধরিয়া চলিয়াছে। রাশিয়ার বিচ্ছৃঙ্খলার যুগে কোন কোন বলশেভিক ক্ষুদে নেতা পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'লেনিন বা কোন বিশিষ্ট নেতা কোন দিন পারিবারিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটিও কটুবাক্য প্রয়োগ করেন নাই।' সে যাহাই হউক 'বর্ত্তমানে পরিবার ও যৌথ মালিকানা সম্পত্তি ভিন্ন সোভিয়েটবাদ অচিন্তনীয়। পরিবার সোভিয়েট তন্ত্রে গৃহীত এবং শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদায় মণ্ডিত। রাশিয়ার নরনারী বাইরের প্ররোচনামূলক পরিবেশের চাইতে ঘরের আবহাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করে।' রাশিয়ানরা যেন ঠিক 'ঘর মুখো বাংগাল।' তারা বলে—'পরিবার সমাজের স্তম্ভ ও ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির প্রাণস্বরূপ। পরিবার বর্গের চিন্তা মনে সাহস ও উদ্দীপনা এনে দেয় যার ফলে সব কিছুই জয় করা যায়, এমন কি মৃত্যুকেও। পরিবার একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান।'

রাশিয়ার ছেলে-মেয়েরা পরিবারের খুবই অনুরক্ত। স্বদেশ সেবার ন্যায় পরিবারের সেবাকেও তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে।

এই পরিবারের কেন্দ্র হইতেছেন—মা। আবার ধর্ম্মে বিশ্বাস না করিলেও রুশীয় সন্তান পিতামাতার আশীর্ব্বাদকে পবিত্র বলিয়া মনে করে। মা যদি কর্কশ স্বভাবেরও হয় তবু পুত্র তার তরুণী স্ত্রীকে বলে 'আমারই তো মা। উনি যা করেন ভালোর জন্যই করেন। তাঁর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া কঠিন, একটু ধৈর্য্য ধরে থাক।' আধুনিক রুশীয় নারীর আদর্শ মাতৃত্ব, ফুলে ফুলে মধু আহরণ-কারিনী নারীত্ব নহে।

'রুশ আদর্শবাদ অনুসারে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব যেন দেশ প্রেমের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পতিপরায়ণতা, পরিবার ও জনগণের মঙ্গল চিন্তা ইহাই আজ রুশীয় নারীর কামনার বস্তু।'

'প্রাক্ বিপ্লব যুগের নারীর সতীত্বের ধারণাই আজ যৌন নীতিকে অনুশাসিত করছে। যে মেয়ে বিবাহের পূর্ব্বেই কৌমার্য্য খুইয়ে বসে বা অসংযতভাবে চলাফেরা করে, সে ভাল ছেলেদের শ্রদ্ধা হারায়, ফলে কোন ছেলেই তাকে আর বিয়ে করতে চায় না। এই ধরণের মেয়েদের ওরা বলে অলক্ষ্মী আর তাকে সারা জীবন সমাজের ধিক্কার নিয়ে বাঁচতে হয়। এই সব মেয়ের বর জোটে বুড়ো বা একপাল ছেলেমেয়ের বাপ কোন বিপত্নীক।'

তাই 'অসংযত জীবনের পরিণাম ভেবে, কিছুটা আত্মসম্মান ও নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এবং মনের মত পুরুষকে গার্হস্থ্য জীবনে নিজের করে পাবার জন্য মেয়েরা প্রাক্ সোভিয়েট যুগের মনোভাব নিয়ে কৌমার্য্য রক্ষা করে চলে। রাশিয়ানরা অল্প বয়সেই বিয়ে করে। ছাব্বিশ বৎসরেও বিয়ে না হলে, লোকে তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। বিপ্লব বা যন্ত্রযুগ এই প্রেরণা রোধ বা ব্যাহত করতে পারে নি।'

ডিভোর্সের ব্যবস্থা ও দেশে অনেক সহজ ও সরল বটে কিন্তু বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে যদি কেহ অবাধ প্রেমের তাড়নায় ডিভোর্স করে, তবে সে সমাজের শ্রদ্ধা হারায়। যে যত বড়ই হউক না কেন, বার বার ডিভোর্স করিলে তাহাকে কেহই সম্মান করেনা। তার উপর আছে অর্থের চাপ, সুতরাং রাশিয়ায় ডিভোর্স করা সহজে ঘটে না।

এমন একদিন ছিল যখন রাশিয়া অতীতের যাহা কিছু তাহাকেই অবজ্ঞা করিতে, তাহাকেই ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করিত, কিন্তু সেই দিন আর নাই।

অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাহীন যে জাতি সে কখনও উন্নত হইতে পারে না। তাই নারীর সতীত্বের ধারণার ন্যায় 'গত কালকের (প্রাক্ বিপ্লব যুগের) রাশিয়ার অনেক কিছু ফিরে এসেছে আজকের দিনে, অনেক সামাজিক নিষ্ঠা সামাজিক রুচি।'

'রাশিয়া যে শুধু তার অতীতকে পুনরাবিষ্কার করে গৌরবমণ্ডিত করছে তা নয়, নাটকীয় ভঙ্গীতে ইচ্ছাকৃতভাবে এই-সব কাহিনী জনপ্রিয় করে

তুলছে। জাতীয় চিন্তা ও জাতীয় ভাবাবেগ বর্দ্ধনের জন্তই এই প্রচেষ্টা।'

'কেবল ভাষায় নহে, বিশেষ করে পোষাক পরিচ্ছদ আচার ব্যবহারে এবং সামাজিক আইনকানুনে খাঁটি রাশিয়ান ছাপ সর্ব্বত্রই বিগুমান।'

দেশের প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য, উপন্যাস, সমালোচনা, লোক-সংগীত ও লোক-শিল্প সম্বন্ধে জানিবার ও বুঝিবার প্রবল আগ্রহ সর্ব্বত্র, বিশেষভাবে যুব সমাজের মধ্যে। যে টলষ্টয়, পুস্কিন, টুর্গেনিভ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মনিষীগণ এই সেই দিনও বুর্জ্জোয়া বলিয়া অবজ্ঞাত হইতেন, আজ তাঁহারা রুশিয়ার সমাজে স্মরণীয় ও বরণীয়। কেবল নিজ দেশেরই নহে অন্যান্য দেশের অতীতকেও সাহিত্যের ভিতর দিয়া জানিবার আগ্রহ তাহাদের কম নয়। বায়রণ, ডিকেন্স, গ্যয়েটে, মোঁপাশা, সেক্স্পীয়র, রোঁলা প্রভৃতি মনিষীদিগের বইএর তরজমা লক্ষ লক্ষ রুশীয় যুবক-যুবতীর নিত্য পাঠ্য। আমাদের দেশের রামায়ণ মহাভারতের তরজমাও তাহারা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

মরিশ হিন্দাস বলেন—'রুশিয়ার যুবশক্তি অত্যন্ত সংস্কৃতি সম্পন্ন, ভব্য, ভদ্র ও স্বাভাবিক। এক সময়ে ধূমপানের প্রতিযোগিতা ছিল ছাত্র সমাজে বিপ্লবের প্রতীক। কিন্তু মন ও দেহের স্বাস্থ্য হানির কথা বিবেচনা করিয়া রাশিয়ার সর্ব্বত্র মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের একটা ঝোঁক দেখা দিয়াছে। 'আজ কাল কলেজের ছেলে মেয়েদের পর্য্যন্ত ধূমপান করতে বড় একটা দেখা যায় না। যুবসমাজে বিশেষ করে যুবতীদের মুখে, গন্ধ দূরের কথা, মদের কথা প্রায়ই শুনা যায় না।' অথচ রাশিয়া শীত প্রধান দেশ। তাই ভাবি, ভারতীয় যুবসমাজের মোহ ভঙ্গ করিয়া দেশ ও সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবে কে?*

---

*প্রবন্ধটীতে উল্লিখিত উক্তিগুলি মরিস হিণ্ডাসের 'মাদার ইণ্ডিয়া' হইতে লওয়া হইয়াছে।

শ্রীনিত্যগোপাল জন্ম-শতবার্ষিকী

স্মৃতিপূজার প্রস্তুতি

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

৪

প্রাণের ভাষা

প্রাণের পথই সমগ্রের পথ, বিপ্লবের পথ। মানুষ যখন এই পথ ধরিয়া চলিতে থাকে, তখন সর্ব্ব ক্ষেত্রেই এই বিপ্লব ছড়াইয়া পড়ে। বিপ্লবের সর্ব প্রথম পদবিক্ষেপ হয় ভাষার ক্ষেত্রের উপর। ভাষা মানুষের চিন্তার— কি নিজের মধ্যে কি পরস্পরের মধ্যে—আদান প্রদানের বাহন। ভাষার আশ্রয় ব্যতীত কেহ নিজের মধ্যেও কিছু ভাবিতে পারে না, অন্যের কাছে নিজ ভাব প্রকাশের কথা তো স্বতন্ত্র। অথচ এই ভাষা মানুষকে তাহার চিন্তা ক্ষেত্রে বিপন্নও করিয়াছে যথেষ্ট। বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখিতেছেন: 'Grammar and ordinary languages are bad guides to metaphysics'. ব্যাকরণ শাস্ত্র ও সাধারণ ভাষা (idols of the market place, the place where men meet and talk with one another) অধিবিদ্যার পক্ষে খুবই অবিশ্বাস্য পথপ্রদর্শক। বিজ্ঞান যখন নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নিজ ভাষার মধ্যে বিপ্লব আনিতে সক্ষম হইয়াছে, তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও রূপান্তর আনিয়াছে, দর্শনশাস্ত্র সেখানে কিছুই প্রাণের পরিচয় দিতে পারে নাই। তাহার ভাষার মধ্যে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে নাই। দর্শনশাস্ত্রের ভাষাগত অগ্রগতির এই বৈষম্যের ফলে বৈজ্ঞানিক মানুষ দার্শনিক হইল না, দার্শনিক মানুষও বৈজ্ঞানিক হইল না। দুই জনই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে অস্বীকার করিয়া, খণ্ডন করিয়া চলিয়াছে। আজ বিশ্ব ভাষাগত এই বিরোধের ফলেই দ্বিধাবিভক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। যতদিন বিজ্ঞান ও দর্শন না যুক্তিযুক্তভাবে যৌথ আলোচনায় নিযুক্ত হয় ('properly engage in joint discussion'), ততদিন অখণ্ড বিশ্ব রচনার আশা সুদূর পরাহত থাকে।

'The language of philosophy differs from that of science largely because philosophy tends to use words in subjective

and science in objective senses. The language of philosophy further differs from that of science because philosophy tends to think in terms of facts as they are revealed by our primitive senses, while science thinks of them as they are revealed by instruments precesion'—Physics and Philosophy by Jeans. P. 84. দর্শনের ভাষা অনেকাংশে বৈজ্ঞানিক ভাষা হইতে এই ভাবে পৃথক যে, দর্শন শব্দগুলিকে কর্তৃতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখে, আর বিজ্ঞান দেখে বস্তুতন্ত্র দৃষ্টিতে। আরও, দর্শনের ভাষা বিজ্ঞানের ভাষা হইতে এই জন্যও পৃথক যে, ঘটনাগুলি যে ভাবে আমাদের সাধারণ মানুষের অসংস্কৃত আদিম ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত হয়, সেগুলিকে দর্শন সেই ভাবেই চিন্তা করে; পক্ষান্তরে বিজ্ঞান ঘটনাগুলিকে সেই ভাবেই বিবেচনা করে যে ভাবে তাহারা সূক্ষ্মতর নির্ভুল যন্ত্রের ভিতর দিয়া আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।'

'As science advances, new accessions to knowledge, are contiunally being interwoven into its terminology, with the result that this continually gains in richness and precision. Here a group of new words will be necessitated by a group of new facts ; there a modification in the usage of old words is called for by new knowledge of old facts, For instance the new knowledge introduced by the theory of relativity compelled us to modify our use of the words 'motion', 'velocity', 'simultaneity'. 'interval of time,' and so on.

There is nothing to correspond to this in philosophy, which still has no precise or agreed terminology. A great number of common words as well as more technical terms are used in variety of different senses, often by the same writer'—Physics and Philosophy.

—'যতই বিজ্ঞানশাস্ত্র আগাইয়া যায়, জ্ঞানের নিত্য নূতন নূতন সমৃদ্ধি বিজ্ঞানে-ব্যবহৃত পদসমূহের সঙ্গে ক্রমাগত অনুস্যূত হইয়া যায়। ইহার ফলে পদ সমূহ সমৃদ্ধি ও অর্থগত স্পষ্টতা লাভ করে। কোথায়ও নূতন নূতন শব্দসমষ্টি নূতন নূতন তথ্যসমষ্টির প্রকাশের জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়িবে, কোথায়ও বা পুরাতন তথ্য সম্বন্ধীয় নূতন জ্ঞান পূর্ব্ব-ব্যবহৃত শব্দের অর্থের মধ্যে পরিবর্ত্তন দাবী করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আপেক্ষিকবাদদ্বারা প্রবর্ত্তিত নূতন জ্ঞান আমাদিগকে 'motion' 'velocity' 'simultaneity,'

'interval of time' ইত্যাদি সম্বন্ধীয় অর্থের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে বাধ্য করিয়াছে।'

প্রাণের পথ ধরিয়া চলিলেই শুধু 'a group of new words will be necessitated by a group of new facts' এবং 'modification in the usage of old words is called for by new knowledge of old facts' সম্ভবপর হইতে পারে। প্রাণের প্রভাবেই শুধু পদসমূহ সমৃদ্ধি ও সুস্পষ্টতা লাভ করে ('gains in richness and precision'). কিন্তু এই প্রাণধর্ম্ম বিজ্ঞানকেই সার্থক করিয়াছে. দর্শনশাস্ত্রকে ইহা স্পর্শও করিতে পারে নাই। দর্শনশাস্ত্রে একই শব্দ যুগ যুগ ধরিয়া একই অর্থ বহন করিয়া চলিয়াছে; যুগ পরিবর্ত্তনে অর্থগত কোনও পরিবর্ত্তনই শব্দের সেখানে সংসাধিত হয় নাই। অথচ মানুষ চলিয়াছে কাল পরিণামের স্রোতে গা' ভাসাইয়া। মানুষের চিন্তাশক্তি সুস্থ থাকিলে কালপরিণামের সঙ্গে সঙ্গে শব্দেরও অর্থপরিণাম সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল। শব্দের কোনও একটী মাত্র অর্থ যতদিন দর্শনশাস্ত্রে একান্ত (absolute) থাকিবে, ততদিন উহা কিছুতেই বাস্তব মানুষের বাস্তব ঘটনাবলীর মীমাংসা দিতে সক্ষম হইবে না। শ্রীনিত্যগোপাল এই দিক দিয়াও অদ্বিতীয়। তিনি দর্শনশাস্ত্রের মূল চিন্তাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি শব্দের এমনভাবেই অর্থগত পরিবর্ত্তন (modification) আনয়ন করিয়াছেন যে, তাহাতে বিশ্বাতীত ব্রহ্মসত্তা আজ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হইবার সুযোগ পাইয়াছে। আজ পদার্থবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা একই পুরুষোত্তম জীবনে দুইটী একান্ত নিরপেক্ষ ও অন্যোন্যাপেক্ষ আস্বাদন বলিয়া উপলব্ধ হইবে।

আজ বিশ্বের বুকে 'প্রাণের ভাষা' প্রবর্ত্তিত হইবার শুভ অবসর উপস্থিত। এতদিন মানুষের ভাষা ছিল প্রজ্ঞাবাদের ভাষা, যে-ভাষায় একদিন অর্জ্জুন. কুরুক্ষেত্রের বুকে সমস্ত তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া পুরুষোত্তমের তিরস্কার লাভ করিয়াছিলেন—'প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে'। এই তিরস্কারে সম্বিৎ ফিরাইয়া পাইয়াই অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা।' যাহার প্রজ্ঞা প্রাণস্পন্দনে চুম্বিত, তাহার ভাষাই স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা। স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা তিনটী স্তর অতিক্রম করিয়া চতুর্থ স্তরে জমিয়া উঠিয়াছে

'রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥'

—এই শ্লোকের মধ্যে। ইহার মধ্যে বিষয়ের বুকে যে কৌশলে বিচরণ করিলে তাহা 'প্রসাদ' রূপে পরিণত হইতে পারে, সেই কৌশলের পরিপুর্ণ ভাষাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা একান্ত বিষয়ীর ভাষাও নহে, একান্ত বিষয়গন্ধশূন্য অসংসারীরও নহে। প্রজ্ঞাবাদের দর্শনে দেবতার ভাষা মানুষ বুঝিত না, জরামরণশীল মানুষের ভাষাও অজর অমর দেবতারা বুঝিত না, বিশ্বাতীতের ভাষা বিশ্ববাসী বুঝিত না, মিষ্টিকদের ভাষা বিজ্ঞান বুঝিত না, প্রবৃত্তির ভাষা নিবৃত্তি বুঝিত না, শ্রমিকদের ভাষা ধনিক বুঝিত না। প্রজ্ঞাবাদ এবং তাহারই ফলস্বরূপ তর্কবিদ্যার 'নির্মধ্যম নীতি' ভাষার মাধ্যমে একটী সমগ্র জগতকে দুইটী কঠিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারই নাম 'ভবসমুদ্র।' এই ভবসমুদ্রের এক পার জরামরণশীল বিশ্ব, অপর পার জরামরণের অতীত গোলোকবৈকুণ্ঠ। এই সমুদ্র পারি দেওয়া ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কত ভরাডুবি যে এই সমুদ্রে হইয়াছে, কত মানুষ যে এই যোগের পথে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তলাইয়া গিয়াছে, কত সৌভরি-পরাশর যে এই সমুদ্রের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরস্পর বিরুদ্ধ ইহলোক-পরলোকের ব্যবধানকে অতিক্রম করিবার জন্য যতই সাধনা করা হইতেছে, ততই ব্যবধান যে বাড়িয়াই যাইতেছে তাহা শ্রীনিত্যগোপালের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। তিনিই এ-পার ও-পারের 'সেতু', 'বিধরণ'। তিনি লিখিয়াছেন, 'জীবের শিবের প্রতি আপনার অদ্বৈততা বোধ হইলে তাহার শিবের প্রতি যে ভক্তি হইয়া থাকে, আমাদের মতে তাহাকেই পরাভক্তি বলা যাইতে পারে।' ভবসমুদ্রের এ-পার ও-পার একই পুরুষোত্তম বিশ্বের স্বয়ংমূল্যবান দুইটী দিক—এই ভাষা বুঝিবার দিন আজ আসিয়াছে। উপনিষৎ স্পষ্টভাষায় শুনাইতেছেন—

'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
য ইহ নানেব পশ্যতি স মৃত্যোঃ মৃত্যুমাপ্নোতি।'—

'যাহা ইহ, তাহাই অমুত্র এবং যাহা অমুত্র তাহাই ইহ। যে-পুরুষ ইহ-অমুত্রের মধ্যে 'নানা'র মত দেখে, সে মরণেরও অধিক মরণ প্রাপ্ত হয়।' এই মন্ত্রের ভিতর উপনিষদের 'ভাষা' বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাহা কিছু এই দেশে এই কালে, তাহাই ঐ দেশে ঐ কালে এবং যাহা-কিছু ঐ দেশে ঐ কালে, তাহাই এই দেশে এই কালে। এ-দেশ ও-দেশ, এ-কাল ও ও-কাল যে দুইটী স্বয়ংমূল্যবান সত্তা, এবং তাহারা যে পরস্পরের মাঝে

অনুস্যূত থাকিয়াই এক পর সত্যকে প্রকট করিতেছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই একই কথাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হইয়াছে। উপনিষদের ভাষার এই বৈশিষ্ট্য আজ বুঝিতেই হইবে।

'সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর
জানয়ে সকল লোকে।
সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে
এ কথা কয়োনা কাকে॥'

'যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥'

—'যিনি আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতের অনুদর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতে আত্মার অনুদর্শন করেন, তাঁহার কাছে বিশ্বে কিছুই জুগুপ্সিত নাই, কিছুই গোপন করিবার নাই।' মন্ত্রের প্রথম চরণে 'সর্ব্বভূত' কর্ম্মকারকে এবং 'আত্মা' অধিকরণে প্রযুক্ত। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় চরণে 'সর্ব্বভূত' অধিকরণ কারকে এবং 'আত্মা' কর্মকারকে প্রযুক্ত হইয়াছে। আত্মা ও সর্বভূত যে একান্ত-বিচ্ছিন্ন পদার্থ (Clearcut category') মাত্রই নয়, আত্মা ও সর্ব্বভূত যে পরস্পরের সঙ্গে আধার-আধেয় ভাবে এবং কর্ত্তার ঈপ্সিততম বস্তুরূপে উদ্ভাসিত হইতে পারে, জীবনের মধ্যে কর্ম্মকারকও যে অধিকরণ এবং অধিকরণও কর্ম্ম হয়, ব্যাকরণের একান্ত কর্ম্ম বা একান্ত অধিকরণ যে জীবনে অচল, আত্মা বা সর্ব্বভূত কেহই যে একান্ত ভাবে কর্ত্তার ঈপ্সিততম নয়, জীবনে কোনও একটীকে একান্তভাবে ঈপ্সিততম করিলেই যে জীবনের মুখ বন্ধ ('closed') হয়, হয় বিশ্বাতীতই সত্য হয়, নয়তো বা বিশ্বই একান্ত সত্য হয়, জীবনের পক্ষে অনিবার্য্যভাবে সত্য ঐ আত্মা-সর্ব্বভূত পারস্পরিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া যে পরিণামে শ্রান্তক্লান্ত হইয়া চরম অবসন্নতার কাছেই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়, তাহাকেই স্পষ্টভাষায় বুঝাইবার জন্য উপনিষৎ শুনাইতেছেন—'মৃত্যোঃ মৃত্যুমাপ্নোতি।'

ব্যাকরণ ও দ্বন্দ্বপাপবিদ্ধ 'সাধারণ ভাষা'র ইস্পাত-কঠিন স্বভাবের দ্বারা মানুষ এমনই বিব্রত ও বিপন্ন যে, বিশ্বের সহজ সরল সমগ্র বস্তুই আজ তাহার কাছে সব চেয়ে কঠিন, সব চেয়ে বক্র, সব চেয়ে খণ্ডিত। উপনিষৎ ব্যাকরণের অনুসরণ করিয়া চলেন নাই; বরং ব্যাকরণই উপনিষদের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। উপনিষৎ ব্যাকরণদুষ্ট কত পদই না প্রয়োগ করিয়াছেন! 'হৃদয়ম্' পদের অর্থ উপনিষৎ দিয়াছেন—'হৃদি অয়ম্'; ইহা

কোন্ ব্যাকরণ? সাধারণ মানুষের বাজারের ভাষা উপনিষৎ দূরে পরিহার করিয়া চলিয়াছেন। উপনিষৎ যখন বলেন—'আসীনঃ দূরং ব্রজতি শয়ানঃ যাতি সর্ব্বতঃ', তখন সাধারণ মানুষ তাহার অভ্যস্ত ভাষায় ইহার অর্থ বোঝে না। সে বলিবে, 'কেমন করিয়া আসীন থাকিয়া দূরে গমন করে আর শুইয়া থাকিয়াই বা কি করিয়া সব দিকে যায়?' কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যাইত যে, ইহা অসম্ভব নয়। ব্রহ্মবস্তুর কথা নাই বা তুলিলাম, যখন আমরা রেলে চড়িয়া শত শত মাইল দূরে চলিয়া যাই, তখন কি আমরা রেলে বসিয়া থাকা অবস্থায়ই শত শত মাইল দূরে যাই না? আমি রেলে বসিয়া আছি, ইহাও যেমন সত্য, আবার শত শত মাইল গিয়াছি, ইহাও তো তুল্যভাবেই সত্য। তবে কেন বলিব যে 'আসীনঃ' ও 'দূরং ব্রজতি' পরস্পরবিরুদ্ধ? ইহার মধ্যে যে আপেক্ষিকবাদ নিহিত আছে, তাহা সাধারণ মানুষ ধরিতে পারে নাই বলিয়াই ইহা সাধারণ মানুষের ভাষার নাগালের বাহিরে ছিল। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে আজ ভাষারও পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞানের ভাষায় পরস্পরবিরুদ্ধদের সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে, দর্শনের ভাষায় আজও তাহা আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের মধ্যে complementarity ও antagonism এর যে সমন্বয় সংসাধিত হইয়াছে এবং সেই সমন্বয় যে দর্শনশাস্ত্রেও আসিতে চাহিতেছে, পাশ্চাত্য মনীষীদের কাছে ইহা ধরা পড়িয়াছে। 'In Physics, as in every other branch of knowledge, the problem of continuity and discontinuity has existed at all times : for in this science, as elsewhere, the human mind has always manifested two tendencies atonce antagonistic and complementary.··· The conflict between the continuous view in Physics and the opposite, has existed through many centuries with varying fortunes, each gaining an advantage over the other in turn, and neither winning a definite victory. For the philosopher there is nothing surprising in this, since the development of theory in every sphere of intellectual activity shows him that, if pushed to an extreme and opposed to each other, the concept of both the continuous and the discontinuous are unable to give a correct rendering of Reality which requires a subtle and almost indefinable fusion of the two terms of this antinomy.'—Matter and Light by Louis De Broglie. P. 21.

—পদার্থবিদ্যায় এবং জ্ঞানের অন্যান্য প্রত্যেক শাখায় সন্ততি ও অসন্ততির সমস্যা চিরদিনই আছে। কেননা অন্যান্য শাখার মত পদার্থবিদ্যায়ও মানব-মন সর্বদাই এমন দুইটী প্রবণতা (tenedency) প্রকট করিয়াছে, যাহারা যুগপৎ পরস্পরস্পর্দ্ধী (antagonistic) হইয়াও পরস্পরের পরিপূরক (complementary)। ………পদার্থবিদ্যার মধ্যে সন্ততি অসন্ততির এই দ্বন্দ্ব অনেক শতাব্দী হইতেই চলিয়া আসিয়াছে, কাহারও কখনও সুস্পষ্টভাবে জয় সংঘটিত হয় নাই। কাহারও ভাগ্যে একবার জয় মিলিয়াছে, আবার তাহার পরই অপরের ভাগ্যেও জয় মিলিয়াছে। পরস্পর এই ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াই চলিয়াছে। দার্শনিকদের পক্ষে ইহার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কেননা যতই চিন্তাজগতে প্রত্যেক থিওরির ক্রমউন্নতি চলিতেছে, ততই পরিস্ফুট হইতেছে যে, এই সন্ততি ও অসন্ততিকে যখন একান্তভাবে বিপরীত দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা পরস্পরস্পর্দ্ধী হইয়া দাঁড়ায়, তখন ঐ দুইটী প্রত্যয় কখনও বাস্তবের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যান দিতে সক্ষম হয় না, যে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যানের জন্য প্রয়োজন হয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত এই দুইটী পদের অতি সূক্ষ্ম ও প্রায় অবর্ণনীয় গলিয়া যাওয়ার (subtle and almost indefinable fusion of the two terms of the antinomy).

'Reality cannot be interpreted in terms of continuity alone ; within continuity we must distinguish certain individual entities But these individual entities do not conform to the ideas which pure discontinuity would give of them : they have extension, they are continually reacting on each other, and a still more surprising fact, it always seems to be impossible to localise them and define dynamically with perfect exactness at each instant. This conception of individual entities, rather vaguely outlined against the background of continuity, is something entirely novel for physicists, and seems to be slightly shocking to some of them. Yet surely it harmonises with the conception to which philosophical considerations might lead.'—Ibid. Page 231.

—'বাস্তব বস্তুকে কেবলমাত্র সন্ততির ভাষায় ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। সন্ততির অন্তরে আমরা নিশ্চয়ই কতকগুলি ব্যষ্টি দ্রব্যকে (entities) পৃথক্ করিয়া দেখিব। কিন্তু এই সব ব্যষ্টি দ্রব্যগুলি সেই সব আইডিয়ার সঙ্গে

খাপ খাইবে না যাহা বিশুদ্ধ অসন্ততি ধারা এই সব দ্রব্য সম্বন্ধে সৃষ্টি করিতেছে। ইহাদের বিস্তার আছে, ইহারা অনবরত পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এবং আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইহাদিগকে বিশ্বের মধ্যে কোনও স্থানগত প্রতিষ্ঠাদান এবং গতির হিসাবে প্রত্যেক মুহূর্তে নিখুঁতভাবে ইহাদের বিবরণ দেওয়াও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যে সব ব্যষ্টি দ্রব্যসমূহ একটী সন্ততি ধারার ভিত্তিভূমিতে অস্পষ্টভাবে রেখাঙ্কিত হইয়া আছে, তাহাদের ধারণা পদার্থবিৎ পণ্ডিতদের কাছে নিশ্চয়ই নিতান্ত অভিনব। ইহা তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কাছে অনেকটা ভীতিপ্রদ। তথাপি ইহা নিশ্চয়ই সেই সব ধারণার সঙ্গে সামঞ্জসীভূত হইবে, যে দিকে আজ দার্শনিক বিবেচনা সমূহ পরিচালিত করিতে পারে।'

বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষা কিরূপ স্পষ্ট ভাষায় বিশ্বের পারস্পরিক দ্বন্দ্বসমূহের সমন্বয়ের বার্তা প্রচার করিতেছে তাহা অনুধাবন করিবার বিষয় বটে। কিন্তু এতদিনের ব্যাকরণ ও সাধারণ মানুষের প্রচলিত ভাষা ইহার কিরূপ পরিপন্থী, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। "Bertrand Russel says that 'grammer and ordinary language are bad guides to metaphysics. A great book might be written showing the influence of syntax on philosophy.' In illustration he mentions Descartes who thought that there could be no motion unless something moves, nor thinking unless some one thought. No doubt most people would still hold this view ; but in fact it springs from a motion unconscious—that the categories of grammer are also the categories of reality. We can find a modern illustration of the same tendency in the physics of the eighteenth and nineteenth centuries. When it had become clear that light was of an undulatory nature, physicists agreed that if there were undulations, there must be something to undulate—one cannot have a verb without a noun. So the luminous ether became established in scientific thought as the nominative of the verb to *undulate*, and misled physics for over a century."—Physics and Philosophy. P. 86.

—"বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন যে, 'ব্যাকরণ ও সাধারণ মানুষের ভাষা অধিবিদ্যায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য পথপ্রদর্শক। দর্শনশাস্ত্রের উপর syntax-এর

(বাক্য বিন্যাসের) প্রভাব সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিত হইতে পারে।' দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি দেকার্তের উল্লেখ করেন, যিনি মনে করিতেন যে, যেখানে 'নড়িবার' কোন কর্তা নাই, সেখানে 'নড়া' (motion) অসম্ভব ; কিম্বা চিন্তা করিবার কেহ না থাকিলে চিন্তনই চলে না। একথা নিঃসন্দেহ যে, আজও কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা অচেতন মনের একটী ধারণা হইতেই উদ্ভূত। সেই ধারণাটী হইতেছে এই যে, ব্যাকরণের শ্রেণীবিন্যাসই (category) ঐ বাস্তব বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস—আমরা এইরূপ একটী প্রবণতার আধুনিকতম উদাহরণ পাইব অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা হইতে। যখন ইহা স্পষ্ট হইল যে, আলোক তরঙ্গায়িত প্রকৃতি-বিশিষ্ট, পদার্থবিৎগণ একমত হইলেন যে, নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যাহা 'তরঙ্গায়িত হয়'; কেননা বিশেষ্য ছাড়া কোন ক্রিয়া হইতেই পারে না। কাজেই জ্যোতিঃসম্পন্ন ইথার 'তরঙ্গায়িত হইবার' কর্তারূপে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইল ; এইভাবে ইহা শতাব্দী ধরিয়া পদার্থবিদ্যাকে বিপথে পরিচালিত করিয়াছিল।"

এই ব্যাকরণের অনুসরণ করিয়াই না জীবজগতের পারস্পরিক আকর্ষণ ব্যাখ্যার জন্য 'সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়' মায়াকে স্বীকার করা হইয়াছে ?

সাধারণ ভাষা কেমন করিয়া দার্শনিক বস্তুসমূহের ব্যাখ্যানে অসমর্থ, তাহা বুঝাইবার জন্য জেম্‌স্ জিন্‌স্ অন্যত্র লিখিতেছেন ; 'In discussing philosophical problems, we have to deal with subtle and delicate shades of meaning, and to travel in fields of thought which are far removed from those of our everyday life ; this would seem to demand a perfectly precise, perfectly flexible and perfectly refined instrument. Ordinary language is none of these things ; it is a rough practical tool which the common man, or the unthinking savage before him, has developed from his rough contact with the world to express the ideas which arise out of these contacts. It would simply be an amazing coincidence if such a tool should be found suited for abstract discussion which have but little to do with the world of everyday experience. We might as well

expect a surgeon to perform a surgical operation with carpenters' tools—spokeshaves, chiscles and hammars'. Ibid : P. 85.

—'দার্শনিক সমস্যাসমূহের মীমাংসা করিতে গেলে আমাদিগকে শব্দের অতি সূক্ষ্ম (subtle and delicate) অর্থ প্রকাশ লইয়া আলোচনা এবং চিন্তাধারার এমন সব ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইবে, যাহা আমাদের দৈনন্দিন জীবন হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। ইহার জন্য প্রয়োজন নিখুঁতভাবে সঠিক (precise), নিখুঁতভাবে নমনধর্ম্মশীল (flexible) ও নিখুঁতভাবে উন্নত ধরণের (refined) যন্ত্রসমূহ। সাধারণের ভাষায় এই সব যোগ্যতার একটীও নাই। এই ভাষা একান্তই 'rough practical tool', (স্থূল কারিগরী যন্ত্র), যাহা সাধারণ মানুষ বা তাহাদেরও পূর্ব্বের অসভ্য মানুষেরা তাহাদের সঙ্গে প্রকৃতির 'rough contact' (স্থূল স্পর্শ) হইতে গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহা প্রয়োজন হইয়াছিল বিশ্বের সঙ্গে স্থূল স্পর্শের ফলে উদ্ভূত আইডিয়ার অভিব্যক্তি প্রদানের জন্য। ইহা হইবে সিধাসিধি এক আশ্চর্য্যজনক মিল (coincidence), যদি এইরূপ একটী যন্ত্র উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় সেই সব বিমূর্ত্ত আলোচনার (abstract discussion) জন্য, যাহার সঙ্গে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অতি অল্প সংশ্রবই আছে, তাহা হইলে আমরা সূত্রধরের বাটুল বা হাতুরী সাহায্যে একজন সার্জ্জেন তাহার সূক্ষ্ম সর্জ্জিকেল অপারেশন করিতে পারে, এইরূপও আশা করিতে পারি।'

শ্রীনিত্যগোপাল দার্শনিক সমস্যা-সমূহের মীমাংসার পথ সুগম করিবার জন্য শব্দ-সমূহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এমন সব অর্থের বিচার করিয়াছেন, যাহা বাস্তবিকই perfectly precise, perfectly flexible and perfectly refined. বাস্তব বস্তুর যত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভবপর, তাহার প্রত্যেকটীর জন্য অর্থগত সেইরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও থাকা উচিত। কিন্তু এতদিনকার ভাষা এমনই ছিল 'rough practical tool', যাহা দ্বারা ভগবান শিবসুন্দরের সতীবিরহে বিহ্বলতা, শ্রীরামচন্দ্রের সীতাবিরহে আকুলতার কোনও ব্যাখ্যাদান সম্ভবপর হয় নাই। নির্ব্বিকারত্বের মধ্যে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অর্থের প্রকাশ রহিয়াছে, তাহা যদি আমরা ধরিতে পারিতাম, তবে সতীবিরহে বিহ্বল শিবকে পূর্ণব্রহ্ম বলিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। প্রচলিত ভাষার অনুসরণকারী

দর্শনের বিচারে 'শিব' নির্গুণ নন; তিনি নির্গুণ হইতে নিম্নস্তরে সগুণের স্তরে অবস্থিত। সগুণ যে বর্তমান যুগের 'precise', 'flexible' and 'refined' অভিধানে নির্গুণেরই দিব্য একটী আস্বাদন, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান শ্রীনিত্যগোপাল আমাদের দিয়া গিয়াছেন।

প্রথমে আমরা নঞ্ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। এত দিনকার দর্শনশাস্ত্র নঞ-এর অভাবাত্মক অর্থ নিয়া 'নিরাকার' শব্দের অর্থ করিয়াছে, 'যাহার আকার নাই', নির্গুণ অর্থ 'যাহার গুণ নাই', নির্ব্বিকার অর্থ 'যাহার বিকার নাই'। নিরাকার' শব্দের অর্থে কত সূক্ষ্ম অর্থপ্রকাশ (shades of meaning) আছে, তাহা দেখাইয়া শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন; 'নিরাকার পদের অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। নিরাকার অর্থে যাহার আকার নাই হইতে পারে। নিরাকার অর্থ যিনি আকার নহেন হইতে পারে। যিনি আকার নহেন বলিলে, যিনি সাকার এ অর্থও করা যাইতে পারে। নিরাকার অর্থে যিনি নিশ্চয় আকারও বলা যাইতে পারে। কারণ অনেক প্রসিদ্ধ ব্যাকরণানুসারে 'নিঃ' অর্থ নিশ্চয়। সুতরাং নিরাকার অর্থে নিশ্চয়াকার বুঝিতে হয়। নিরাকার শব্দে যাহার নিশ্চয় আকারও হইতে পারে। তাহা হইলে অবশ্যই নিরাকার শব্দে যিনি নিশ্চয় সাকার বুঝিতে হয়। নিশ্চয় সাকার যিনি, তাঁহার আকার অনিশ্চয়ও বলা যায় না।'—শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম-পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা; ১৩২ পৃষ্ঠা।

শ্রীনিত্যগোপালের মতে 'নিরাকার' শব্দের অর্থ—'যাহার আকার নাই,' 'যিনি আকার নন', 'যিনি সাকার,' 'যিনি নিশ্চয়াকার', 'যাহার নিশ্চয়াকার আছে,' 'যিনি নিশ্চয় সাকার'। 'নিরাকার' শব্দের অন্তর্গত নঞ্-এর এই সব 'subtle, flexible and delicate shades of meaning দিয়া তিনি দার্শনিক জগতে এক যুগান্তরকারী বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। 'নিরাকার' শব্দের এই অর্থসমূহের মধ্যে নিরাকারবাদী ও সাকারবাদীদের ঝগড়ার অবসান হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কোলাকুলির প্রতিষ্ঠাই হইয়াছে। নিরাকার শব্দের অর্থ অনুসরণ করিয়া চলিলে 'নির্ব্বিকার' শব্দের অর্থও এইরূপ দাঁড়াইবে—'যাহার বিকার নাই', 'যিনি বিকার নন', 'যিনি সবিকার', যিনি নিশ্চয়বিকার' 'যাহার নিশ্চয় বিকার আছে', 'যিনি নিশ্চয় সবিকার'। নির্ব্বিকারের এই অর্থ আস্বাদিত হইলে শিবসুন্দর বিকারবান্ থাকিয়াও

নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হন। কিন্তু নির্ব্বিকারের যদি একমাত্র অর্থ হয় 'যাহার বিকার নাই,' তাহা হইলে সতী বিরহে উন্মাদ শিবকে কেমন করিয়া নির্ব্বিকার বলিব? অথচ শিবকে বিকারবান বলিবার মত সাহসও কাহারও নাই। তাই বলা হইয়া থাকে যে, শিব আসলে নির্ব্বিকার হইয়াও বিকারবান জীবের মত বিকারের অভিনয় করেন। কিন্তু বিকারের এই অভিনয়দ্বারা বিকারবান জীবকে যখন প্রকারান্তরে উপহাসই করা হয়, তখন এই পরিহাস করিবার মত প্রচেষ্টা কি শিবসুন্দরের ওপর আমরা আরোপ করিতে পারি? তিনি যে বিশ্বনাথ, ভূতনাথ, তাঁহার পক্ষে দুর্বল জীবকে এ পরিহাস সাজে না। ব্রহ্ম বিকার নন, সবিকার নন, একান্ত নির্ব্বিকারও নন বলিয়াই সব কিছু তিনিই। বিকার যাহার জীবনে পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই সত্য বাস্তব নির্ব্বিকার। বিকার-ভীতিও বিকার। বিকার শব্দ যখন আছে, বিকার শব্দ দ্বারা যখন একটি মানসিক অবস্থাই বুঝা যায়, তখন তাহাকে দ্বেষবশতঃ ত্যাগ করিতে বা এড়াইতে চাহিলে যে তাহার একটা পৃথক্ সত্তাই স্বীকার করা হয়, পৃথক্ সত্তার স্বীকৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থায়ও যে দ্বৈতাপত্তিই হয়, বিকারকে অস্বীকার করিবার সময় অদ্বৈতবাদিগণ কি তাহা ভুলিয়া গেলেন? যাহার বিকারী হইতে ভয় নাই, বিকার যাহার বি-কার বা বিশেষ কার, বিকার যাহার জীবনকে অধিকতর লীলায়িত করিয়া তুলিতে সক্ষম, তিনিই বটে সত্য বাস্তব নির্ব্বিকার। বিকার ভয়ে ভীত পুরুষ ক্লীব, তিনি পুরুষোত্তম নন। যিনি নির্ব্বিকার থাকিয়াও বিকারী, বিকারী হইয়াও নির্বিকার, তিনিই বটে নির্ব্বিকার ব্রহ্ম পুরুষোত্তম। শিবসুন্দর এমনই নির্ব্বিকার ব্রহ্ম, কৃষ্ণ এমনই নির্ব্বিকার বাস্তব ব্রহ্ম, শ্রীরামচন্দ্র এমনই নির্ব্বিকার ব্রহ্ম। ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার কোন বিকার পরিণামের বিরোধ তো নাই-ই, পরন্তু মায়ার সে সব বিকার দ্বারা ব্রহ্মই সত্য বাস্তব ব্রহ্মরূপে পরিণত হন, বিবর্ত্তিত হন, আস্বাদিত হন। বিকার-পরিণামহীন ব্রহ্ম একান্তই ভাবুকের ব্রহ্ম; উহার সহিত প্রত্যক্ষ জীব জগতের কোন প্রত্যক্ষ যোগই থাকিতে পারে না। যে ব্রহ্মে 'জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি'—এই ছয় বিকার পরিপাক-প্রাপ্ত, তিনিই ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ পুরুষোত্তম। তিনি সব বিকার গায়ে মাখিয়াই নির্ব্বিকার।

নঞ্-এর এই অর্থ সমূহ ভারতবর্ষ একদিন জানিত। কিন্তু একান্ত

অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মধ্যে নঞ্-এর 'অভাব' অর্থই শুধু সম্মানিত হইয়াছে, আর সব অর্থ চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

তৎসাদৃশ্যং অভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

—নঞ্-এর অর্থ ছয়টী—তৎসাদৃশ্য, অভাব, তদন্যত্ব, তদল্পতা, অপ্রাশস্ত্য ও বিরোধ। 'অব্রাহ্মণ' অর্থ ব্রাহ্মণ-'সদৃশ' ক্ষত্রিয় বৈশ্য। 'অযত্ন' অর্থ যত্নাভাব। 'অঘট' অর্থ ঘট হইতে 'অন্য' পটাদি। 'আপনি তো কিছুই খান না'-র অর্থ আপনি খুব 'অল্প' খান। 'অকাল' অর্থ 'অপ্রশস্ত' কাল। 'অসুখ' অর্থ সুখের 'অভাব'। নঞ্-এর এতগুলি অর্থ থাকিতে কেন অদ্বৈতবাদিগণ উপনিষদুক্ত নঞ্-এর একমাত্র অভাব অর্থ বা বিরোধ-অর্থ নিবেন? 'নেতি-নেতি' মন্ত্রাংশের নেগেটিভ অর্থ নিবেন? নিরাকার শব্দের অর্থ আকার সদৃশ আকার যাহার, আকার হইতে অন্য, অল্পাকার বিশিষ্ট, অপ্রশস্ত আকার-বিশিষ্ট কেন করা যাইবে না? এই গুলিই ছিল নঞ্-এর পজিটিভ দিক। নঞ্-এর অন্তরে যে-সব 'Subtle and delicate shades of meaning' ছিল, শ্রীনিত্যগোপাল তাহাদিগকেই পুনরুদ্ধার করিলেন এবং তাহারই সাহায্যে ব্রহ্মকে জীবনের সকল খুঁটিনাটি ব্যাপারে, জীবনের বৃহত্তম ঘটনায় আস্বাদন করিবার, জমাইয়া তুলিবার পথ প্রশস্ত করিয়া গেলেন। ব্রহ্ম জড়ানুগ থাকিয়াই জড়াতীত, সকল হাঁ এর মধ্যে থাকিয়াও সকল 'না' —ইহাই শ্রীনিত্যগোপাল প্রবর্ত্তিত দর্শনের মূল বক্তব্য।

শ্রীনিত্যগোপাল এই ভাবে নিরাকার প্রভৃতি নঞ্যুক্ত পদ-সমূহের মধ্যে 'a modification in the usage of old words' আনয়ন করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি অদ্বৈত ভাব প্রচার কল্পে ব্যবহৃত এতদিনকার প্রচলিত 'পূর্ণ' 'এক' প্রভৃতি শব্দসমূহের মধ্যেও এই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন। তিনি 'একম্' শব্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'বহু সংখ্যার মধ্যে 'একম্' শব্দও একটী সংখ্যা। সেই জন্য 'একম্' প্রাকৃত। সেই জন্য 'একম্' অনাত্মারই এক প্রকার বিকাশ। সেই জন্য ব্রহ্ম 'একম্' নহেন। 'একম্' শব্দ আত্মা নহে বলিয়া 'একম্' শব্দকেও নিত্য বলা যায় না। সুতরাং 'একম্' শব্দের অর্থ যাহা, তাহাও ব্রহ্ম নহেন স্বীকার করিতে হয়। তুমি এক-ব্রহ্ম বলিলেই কি তিনি বাড়িবেন? কারণ সেই 'এক' তো কেবল তাঁহাকেই বলা হয় না। এক-চন্দ্র, এক-সূর্য্য একাকাশ প্রভৃতিও বলা হয়।'—সিদ্ধান্ত-দর্শন

পৃ ১৮৮। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ দিতে গিয়া তিনিই লিখিতেছেন: 'ব্রহ্ম অর্থে শক্তি ও শক্তিমান উভয়ই। কারণ ব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই। অদ্বৈত মতের গ্রন্থ সকলে ব্রহ্মশব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্রহ্ম-শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থ মতে ব্রহ্ম অর্থে যোনি ও প্রকৃতি। নানা শাস্ত্রানুসারে সেই প্রকৃতি-ব্রহ্মই শক্তি। সুতরাং সেই শক্তি-ব্রহ্ম আর শক্তিমান ব্রহ্ম অভেদ।' সিদ্ধান্ত দর্শন, ১৮৯—৯০।

'পূর্ণ' শব্দের অর্থ শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন: পূর্ণ শব্দ অদ্বৈতবাচক নহে। আত্মাকে 'পূর্ণ' বলিলে আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নাই, বুঝিবার কোন কারণ নাই। যেমন পূর্ণ কুম্ভ বলিলে সেই কুম্ভ কোন বস্তু দ্বারা পুরিত বুঝিতে হয়, তদ্রূপ 'পূর্ণাত্মা' বলিলে আত্মা কোন বস্তু বা বহু বস্তুদ্বারা পুরিত বুঝিতে হয়। আত্মাকে এক বলা হইয়াছে। অনেকে ঐ 'এক' শব্দের অর্থ অদ্বিতীয় বলিয়া থাকেন। কিন্তু অদ্বিতীয় শব্দে কেবল 'এক' এই অর্থ হয় না। অদ্বিতীয় শব্দের দ্বিতীয়াধিক অর্থ হইতে পারে; সেইজন্য অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ বহুও হইতে পারে।'—সিদ্ধান্তদর্শন, পৃঃ ২৩২

শ্রীনিত্যগোপাল অভিধানকে এক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া শব্দগুলির অর্থ-প্রকাশকে perfectly precise, flexible এবং refined করিয়া প্রতি জীবনের সকল দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে ব্রহ্ম-বস্তুকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার পথই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। 'পূর্ণ', 'এক' প্রভৃতির অর্থ যে ভাবে তিনি দিয়াছেন, তাহাতে আত্মা অনাত্মার অদ্বৈততাই স্থাপিত হইয়াছে, বিশ্বেরও সত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। অষ্টাবক্র লিখিত 'যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ'—শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন, উক্ত শ্লোকানুসারে বিশ্ব কল্পিত। কল্পিত যাহা, তাহা মিথ্যা। কিন্তু আমরা স্পষ্টই এই বিশ্বে অবস্থান করিতেছি, অতএব আমরা কি প্রকারেই বা আমাদের অবস্থিতির স্থান এই 'বিশ্ব'কে কল্পিত বা মিথ্যা বলি? আমাদের এই 'প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান বিশ্ব'কে সত্যই বলিতে হইতেছে। এই 'বিশ্ব' দর্শন, স্পর্শন এবং বোধদ্বারা অবধারিত হইতেছে।'—সিদ্ধান্তদর্শন পৃঃ ২২৯

'পূর্ণ'-শব্দের শ্রীনিত্যগোপাল প্রদত্ত অর্থ বুঝিলে আমরা বুঝিতে পারিব 'পূর্ণানন্দময় আমি চিণ্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত' এই উক্তির রহস্য কোথায়? পূর্ণকেও শ্রীরাধা উন্মত্ত করান। শ্রীরাধাছাড়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণই নন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ একীভূত হইলেই তাঁহারা হন পূর্ণাত্মা। শ্রীনিত্য-

গোপাল লিখিয়াছেন 'আত্মা অপুরুষ ও অপ্রকৃতি'; আবার অন্যত্র তিনিই লিখিয়াছেন :—'আত্মাই পুরুষ প্রকৃতি।' আজ নিত্য-ব্যাকরণ, নিত্য-অভিধান, নিত্য-ভাষা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকেই দর্শনের যোগ্য বাহন করিয়া বিশ্ব-বিশ্বাতীতের সকল সমন্বয়রস আস্বাদন করিতে হইবে।

সাধারণ ভাষা কেমন করিয়া তত্ত্ব-নির্দ্ধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়া জেম্‌স্‌ জিন্‌স্‌ লিখিতেছেন।—'The inadequacy of popular language to express the subtleties of philosophic thought is well illustrated by the famous proposition of Descartes—*cogito ergo sum*. Descartes, believing this proposition to be true beyond all shadow of doubt, proposed basing the whole of philosophy on it. A later generation of philosophers has pointed out the inadequacy cf the proposition, and their criticism is based mainly on Descartes' use of common language. For this compelled the subject of the proposition to fall into one of three clear-cut categories—cogito. cogitas, cogitat—or their plurals, if the thinking does not fit into one of these moulds, common language cannot express it.' —Physics and Philosophy. P. 85.—সাধারণ ভাষার মাধ্যমে দার্শনিক চিন্তাধারাকে প্রকাশ করিবার অনুপযুক্ততার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে দেকার্তের অতি প্রসিদ্ধ—'I think therefore I exist'—'আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি'—এই প্রতিজ্ঞার (proposition) মধ্যে। দেকার্তে এই প্রতিজ্ঞাকে সন্দেহাতীত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ইহার ওপরে সমস্ত দর্শনকে দাঁড় করাইবার প্রস্তাব করিলেন। পরবর্তী একদল দার্শনিক এই প্রতিজ্ঞার অনুপযুক্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহারা দেকার্তের সাধারণ ভাষার ব্যবহারের সমালোচনা করিয়াছেন। কেননা এই সাধারণ ভাষাই প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য পদকে I think, thou thinkest, he thinks—অর্থাৎ আমি চিন্তা করি, তুমি চিন্তা কর, সে চিন্তা করে—এইরূপ একান্ত বিচ্ছিন্ন তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে বাধ্য করিয়াছে। আমি-তুমি-তিনি একান্ত বিচ্ছিন্ন হইলে যে বাস্তব-জ্ঞানেরই স্ফুরণ হয় না এবং আমি-তুমি-তিনির এই শক্ত একান্ত বিচ্ছিন্নতা যে সাধারণ ভাষাই সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সাধারণ মানুষের বুঝিবার সাধ্য একদিন ছিল না। শ্রীনিত্যগোপাল কিরূপ ভাষায় এই আমি-তুমি-তিনির শক্তভেদ গলাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাহা ভাবিলে

বিস্ময় লাগে। তিনি লিখিতেছেন: 'আমি আত্মা। তুমিও আত্মা। তিনিও আত্মা। শ্রুতিবেদান্তানুসারে একাত্মাই বিদ্যমান আছেন। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে আমি আত্মার সহিত তুমি আত্মার এবং তিনি আত্মার কোন প্রভেদ নাই। ……আমি বা অহমুপাধিবিশিষ্ট আমি, তুমি বা ত্বমুপাধিবিশিষ্ট তোমার সহিত ভেদ আছে বোধ করিয়া থাকি।………আমার আমিত্ব, তোমার তুমিত্ব এবং তাঁহার তিনিত্ব বশতঃ একাত্মার ত্রৈবিধ্য বোধ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান হইলে ঐরূপ ত্রৈবিধ্য বোধ হয় না।………তখন আমি যাহা, তুমি তাহা এবং তিনিও তাহা বোধ হইয়া থাকে।………কেবলমাত্র জ্ঞানে আমি, তুমি, তিনির অভেদত্ব বুঝিতে হয়। ব্যবহার কালেও আমিও আমাকে আমিই বলি। কিন্তু তৎকালেও আমি আমাকে তুমি কিম্বা তিনি বলি না। অথচ আমিই আমি, তুমি এবং তিনি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকি। কোনও ব্যক্তি আমিকেই তুমি বলিয়া থাকে, আমি তাহার নিকট হইতে অনুপস্থিত রহিলে সেই ব্যক্তি আমাকেই তিনি বলিয়া থাকে। সেইজন্য আমি আমিও বটি, আমি তুমিও বটি, আমি তিনিও বটি। সেইজন্য অনেক আত্মদর্শী ব্যবহারকালেও আমি, তুমি এবং তিনির অভেদত্ব স্বীকার করেন।' —নিত্যধর্ম পত্রিকা—১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা—পৃঃ ২২৫—২৬

কি অদ্ভুত ভাষাকৌশলে পরমার্থ ক্ষেত্রের আমি তুমি তিনির অদ্বৈতানুভূতিকে শ্রীনিত্যগোপাল ব্যবহারিক ক্ষেত্রের অদ্বৈতানুভূতিতে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছেন! পারমার্থিক অদ্বৈত জ্ঞানে আমি-তুমি-তিনি না থাকিয়া অদ্বৈত; আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তিন তিন থাকিয়া, প্রভেদকে প্রভেদমূল্যে স্বীকার করিয়া তিন অদ্বৈত। ভাষার এমন নমনধর্ম্মশীলতা এমন করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল ছাড়া কে ইতঃপুর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছেন? ধন্য তাঁহার ভাষাবিজ্ঞান কৌশল।

আজ শ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীচরণতলে বসিয়া নব যুগের নব ভাষা শিখিয়া আমির দৃষ্টিকোণে বিশ্বকে এবং বিশ্বের দৃষ্টিকোণে আমিকে দেখিতে হইবে। শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন। বন্দেমাতরম্।

প্রশ্ন

অরুণ বরুণ চক্রবর্ত্তী

পৃথিবীতে ভাই এমন দিন কি আসবে—
মানুষ মানুষে সত্যিই ভালো বাসবে ?
পরাধীনতার শৃঙ্খল যত টুটবে ?
মুক্তির আলো বন্যার মত ছুটবে ?
স্বার্থের ধ্বজা আকাশে আর না উড়বে ?
সবার হাতেই কাজের চরকা ঘুরবে ?
মানবের বেশে দানবেরা সব মরবে ?
অণুর শক্তি জগতের হিত করবে ?
মানুষের হাতে মানুষ রবে না বন্দী ?
সাম্যের গানে পৃথিবী উঠিবে ছন্দি' ?
হিংসা দ্বেষের বহ্ন্যুৎসব থামবে ?
শান্তির আলো চিরতরে ভাই নামবে ?
ব্যর্থ মানের ব্যর্থতা পায়ে লুটবে ?
মনুষ্যত্ব পূর্ণ প্রভায় ফুটবে ?
স্বাধীন মুক্ত মানব আত্মা জাগবে ?
নয়নে নূতন রবির কিরণ লাগবে ?
শুধু হাসি গান জীবনের গান চলবে ?
মরণেরে সবে পায়ের তলায় দলবে ?
স্বর্গবাসীরা মর্ত্যের চাবী চাইবে ?
মানুষের সাথে মিলনের গান গাইবে ?
দুয়ের মিলনে বিশ্বজননী হাসবে ?
পৃথিবীতে ভাই এমন দিন কি আসবে ?

সাময়িকী

প্রজাতন্ত্রী পাকিস্থান : গত ৫ই জুন সন্ধ্যায় করাচীস্থ 'ইভনিংস্টার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটী সংবাদে জানা যায় যে, আগামী ১৪ই আগস্ট পাকিস্থানের ষষ্ঠ স্বাধীনতাবার্ষিক উৎসব দিবসে পাকিস্থানকে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করা হইবে। উক্ত সংবাদে আরও জানা যায় যে, কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাকিস্থানও ভারতের অনুরূপ প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হইবে। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলির রাণী এলিজাবেথের অভিষেক উপলক্ষে লণ্ডন যাত্রার প্রাক্কালেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি পাকিস্থান গণপরিষদের যে অধিবেশন আহূত হইবে, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইবে। উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, গভর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ পাকিস্থান প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হইবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাকিস্থানের যে সব কূটনৈতিক দূত বর্ত্তমানে বৃটেনের রাণীর নামে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা প্রেসিডেণ্টের কূটনৈতিক দূতহিসাবে পুনর্নিযুক্ত হইবেন।

পাকিস্থান যদি সত্যসত্যই প্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়া থাকে, তবে এইবার তাহার বাঁচিবার পথ হইল। এতদিন সে আত্মঘাতী নীতির অনুসরণ করিয়াই চলিয়া ছিল, তাই সে আজ ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র বিব্রত। তাহার অবস্থা এমনই সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই না একজন প্রধানমন্ত্রীকে নাটকীয়ভাবে অপসারিত করিয়া তাঁহার গদীতে জনাব মহম্মদ আলীকে বসাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল? তাহার ঘরে-বাইরে যত সমস্যা জমিয়া উঠিয়াছে, তাহার সে কিছুতেই সমাধান করিতে পারিবে না, যতদিন না তাহার সংবিধানে 'ইসলাম রাষ্ট্রে'র কথা তুলিয়া দিয়া হিন্দু প্রজা ও মুসলমান প্রজা, খৃষ্টান বৌদ্ধ প্রজাদিগকে সমান মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ঘরের মধ্যে অসন্তুষ্ট হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধকে একদম অগ্রাহ্য করিয়া একটী রাষ্ট্রকে গায়ের জোরে কয়দিন চালানো যায়? আজও সেখানে ৯০ লক্ষ হিন্দু আছে। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষায়, ধনে-মানে পদমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত লোকের অভাব নাই। তাঁহারা আজ রাজনীতিক্ষেত্রে কেউ নন। তাঁহারা কোনও রকমে সেখানে জীবিকাসংস্থানে ব্যাপৃত, তাঁহাদের দ্বারা

প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের কোনও ক্ষতি হইবে না। কেননা তাঁহারা রাজনীতির মধ্যে অংশ গ্রহণ করিতে গেলে বিপন্ন হইবেন। তাই তাঁহারা রাজনীতি হইতে দূরে, অতি দূরে। তাঁহারা রাষ্ট্রের কোন কল্যাণও করিতে পারিতেছেন না। অথচ তাঁহাদের শক্তিসামর্থ্যকে পাকিস্থান যদি কাজে লাগাইতে পারিত, পাকিস্থান নিরাপদ হইতে পারিত। ভারত ইউনিয়ন হইতে কোনও আক্রমণের ভয়ও পাকিস্থানের ছিল না। কিন্তু পাকিস্থান নিজের আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তির ফলেই ভারত হইতে আক্রমণের স্বপ্ন দেখে। আক্রান্ত না হইলে ভারত আক্রমণ করিবে না—ইহা বিশ্বাস করিলে তাহার কল্যাণ হইত। দেখিয়া সুখী হইলাম যে, পাকিস্থানের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাক ছাত্রসমিতি এবং কেম্ব্রিজ মজলিসের এক বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করা আত্মহত্যার সমতুল হইবে। অনেক পুর্ব্বে ইহা বুঝিলে কল্যাণ হইত। শ্রীনেহরু তো মিঃ লিয়াকত আলিকে অনাক্রম-চুক্তিতে বদ্ধ হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। মিঃ লিয়াকত আলি তখন তাহাতে সম্মত হন নাই। কিন্তু ইহাদ্বারা দিনের পর দিন তাহাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যা জটিলতর হইয়াই উঠিয়াছে।

হিন্দুমুসলমানবৌদ্ধখৃষ্টান যাবতীয় প্রজাবৃন্দ যদি পাকিস্থানে সমমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, পাকিস্থান নিশ্চয়ই টিকিবে। কেন সে কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছিল? সেদিন যদি ভারতবর্ষ যুদ্ধ বন্ধ না করিয়া আরও একটু অগ্রসর হইত, কাশ্মীর সমস্যা আজ আর থাকিত না। ভারতবর্ষের যুদ্ধে জড়াইয়া না পড়িবার মনোবৃত্তি ও তাহার রাজনৈতিক সততার সুযোগ পাইয়াই পাকিস্থান আজও কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান তাহাদের অনুকূলে করিবার জন্য ব্যস্ত। এ সুযোগ ছাড়িবার মত বুদ্ধি যতদিন না আসিবে, ততদিন কি করিয়া কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইবে? গণভোটের পথ তো এখনও উন্মুক্ত রহিয়াছে। কেন সে কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছিল, ইহার জবাব সর্ব্বপ্রথমে দিয়াই তাহার কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য বসিতে হইবে। ঘটনার মূলকে এড়াইয়া ঘটনার শাখাপ্রশাখাকে ধরিয়া মীমাংসা চাহিলে তাহা সুদূরপরাহত হয়। মূল সমস্যা হইল 'পাকিস্থান হইতে আক্রমণ'। তাহার 'আক্রমণ' সে প্রত্যাহার করুক, তাহার মীমাংসা আর সুদূরে থাকিবে না। যেখানে আক্রমণ করিবার অধিকারই তাহার ছিল না, সেই অনধিকারকে গায়ের জোরে

জিয়াইয়া রাখিয়া সেই অনধিকারকে অধিকার বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে আরও বাড়াইয়া তোলা কি সম্ভব না সঙ্গত? পাকিস্থান নষ্ট হউক, ইহা ভারতবর্ষ কায়মনোবাক্যে কখনও চায় না; কেননা সে স্বেচ্ছায় পাকিস্থান মানিয়া লইয়াছে। পাকিস্থানকে নষ্ট করিতে চাওয়া তাহার পক্ষে সত্যদ্রোহিতাই হইবে। সে সত্যের উপাসক, সত্যকে সে মর্য্যাদা দিবেই। পাকিস্থান সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকসানের ভয় নাই। শ্রীনেহেরু প্রাণপণে পাকিস্থানের সহিত সৌহার্দ্দ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, যে জন্য ভারতের কোনও কোনও রাজনৈতিক দল তাঁহার উপর নিতান্ত নারাজ। পাকিস্থানের লেশমাত্র ক্ষতি হয়, ইহা শ্রীনেহেরু চান না। এখন পাকিস্থান যদি নিজের জালে নিজে জড়াইয়া পড়িয়া অন্ধকার দেখে, তবে সে জন্য দায়ী সে নিজে, দায়ী তাহার বুদ্ধি। প্রজা প্রজা—তা হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক—এই সোজা কথাটা মানিয়া লইলে তাহার কোনও দিক হইতেই ভয়ের কারণ থাকিবে না। যেখানে ভূত নাই, সেখানেও সে অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া ভূতের ভয় পাইবে, এ বিপদ হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? জনাব মহম্মদ আলিকে এই দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া নিয়া পাকিস্থানকে নিরাপদ করিবার মত শক্তি ও বুদ্ধি ভগবান দিন।

লণ্ডনের সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ মহম্মদ আলি বলিয়াছেন, 'আমি এমন শাসনতন্ত্র রচনার পক্ষপাতী, যাহার ফলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং জাতির আত্মপ্রকাশের পথ কোন রকমেই ব্যাহত হইবে না। আমরা ধর্ম্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারি না। ইসলাম মোল্লাতন্ত্রবিরোধী। রাজনীতিকে মোল্লাগণের প্রভাবমুক্ত রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য।' তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হউক। মোল্লাতন্ত্রের স্থান অধিকার করুক প্রজাতন্ত্র। হিন্দুমুসলমান সম্মিলিত হইয়া পাকিস্থান গড়ুক। হিন্দুদের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া মুসলমানদের লইয়া পাকিস্থান রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। ইতিহাস ভূগোল ভারতবিভাগের প্রতিকূল—এই মহাসত্যকে সামনে রাখিয়া হিন্দুমুসলমানের মিলনকে পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনতর মিলনের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিলে এই প্রতিকূলতাকে দূর করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া পাকিস্থান রচনায় নিযুক্ত থাকিলে পাকিস্থান টিকিবে। মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্রে মুসলমানদের সুযোগসুবিধা থাকিবেই। অতিমাত্রায় সুযোগসুবিধা ভোগের লোভ পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানের হিন্দুদের সঙ্গে

প্রাণে প্রাণে মিলন আজ প্রয়োজন—জনাব মহম্মদ আলি যদি এই প্রয়োজনকে বাস্তব করিয়া তুলিতে পারেন, তিনি ধন্য হইবেন। পাকিস্থানের রক্ষাকর্ত্তা-রূপে বিশ্বে সম্মানিত হইবেন। হিন্দুরা উদার ব্যবহারের কাঙ্গাল নয়; তাহারা চায় রাষ্ট্রের মধ্যে সর্ব্বক্ষেত্রে সম অধিকার।

পাকিস্থানের জনসাধারণের সমর্থন যে জনাব মহম্মদ আলি পাইবেন, তাহা পাকিস্থানের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অভিমত জ্ঞাপনের জন্য ঢাকা হাইকোর্টের বার এসোসিয়েসনের সাব-কমিটির যে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতেই পরিস্ফুট হইবে। কমিটির সিদ্ধান্ত এই যে, (১) শাসনতন্ত্র রচনার আর বিলম্ব করা অসঙ্গত, (২) স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করিতে হইবে। সর্ব্বত্র যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে করিতে হইবে। (৩) তপশিলী বা অনগ্রসর সমাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট দশ বৎসরের জন্য কিছু সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকিতে পারে। এই ক্ষেত্রেও যুক্ত নির্ব্বাচন-প্রথা থাকিবে। (৪) মূলনীতিতে রাষ্ট্রের প্রধান মুসলমান হইবে বলিয়া যে প্রচার করা হইয়াছে, কমিটি তাহা গণতন্ত্রবিরোধী, অবাস্তব ও অসঙ্গত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। (৫) মোল্লা বোর্ড গঠন করা চলিবে না। (৬) শাসক-সম্প্রদায় বলিয়া কিছু থাকিবে না। (৭) রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইবে বাঙ্গলা ও উর্দ্দু। (৮) প্রাদেশিক অটোনমির দাবীও তাঁহারা করিয়াছেন।

ঢাকা বার এসোসিয়েসন যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং লণ্ডনে জনাব মহম্মদ আলি যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গণতন্ত্র-সম্মত সন্দেহ নাই। এইরূপ গণতন্ত্র রচিত হইলে পাকিস্থানের মাইনরিটির বেদনার কারণ থাকিবে না। পাকিস্থানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক—ইহা হিন্দুদেরও কাম্য। এখন তাঁহারাও পাকিস্থানকে সরল দানে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রযত্নবান হইবেন। তখনই 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' বলা সার্থক হইবে। বন্দেমাতরম্

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

(মাসিক পত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ)

উজ্জ্বলভারতের বার্ষিক মূল্য ৪৲। প্রতি সংখ্যা ।৵৹, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

মাঘ থেকে উজ্জ্বলভারতের বর্ষারম্ভ। ছ' মাসের কম গ্রাহক করা হয় না।

রচনা নকল রেখে পাঠানো বিধেয়। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার।

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের হারের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৪½"×৭"।

উজ্জ্বলভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অসম্বদ্ধ সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের মধ্যে একটি জীবনের সমগ্রতায় যুগদর্শনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—উজ্জ্বলভারত

উজ্জ্বলভারত

৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৬০

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'

রেণু মিত্র

যে-হিন্দুত্বকে গোরা জানত, বিনয় জানত, আমরা জানতাম, জীবনের মধ্যে একটা নূতন ঘটনা ঘটলেই আর তা সেটাকে ব্যাখ্যাও দিতে পারে না, খাপ খাইয়েও নেওয়াতে পারে না। পরেশবাবুদের বাড়ীর সবাইকে বিনয়ের ভাল লেগেছে—কিন্তু এ ভাল লাগা ঐ হিন্দুত্ববোধে সমর্থিত নয়। বিনয় আরও একটু এগিয়ে গেল,—ললিতাকে সে ভালবেসে ফেলল। এই যে ঘটনাটা ঘটল, আমাদের পরিচিত স্বল্পপরিধির হিন্দুত্ববোধ একে কিছুতেই স্বীকার করে নিয়ে হজম করে এগিয়ে যাবার পথের খবর বলতে পারত না। সে বলত স্পষ্ট সোজা ভাষায়—যেমন বলেছে গোরা—বাদ দাও, এ অন্যায়, এ পাপ। এ মিথ্যাচরণ এ পাপ তোমার করা উচিত নয়; এ ঘটনা থেকে সরে এস নিজের মধ্যে, সরে এস নিজ গণ্ডীর মধ্যে। এটা সমাজের প্রতি কর্তব্য, ধর্মের প্রতি কর্তব্য।

বিনয় ললিতাকে ভালবেসেছে। আনন্দময়ী পথ দিয়েছেন বিনয়কে এই বিপদের সময়। বিনয় ললিতাকে বিয়ে করতে পারে বিনয়ের মনের এই অবস্থা এনে দিয়েছেন আনন্দময়ী। ললিতাকে লাঞ্ছনা অপমান থেকে বাঁচানো বিনয়ের হাতে আছে। কিন্তু গোরা শুনে বলে, 'ললিতাকে বিবাহ করে তুমি ললিতার প্রতি কর্তব্য করতে চাও, কিন্তু সেইটেই কি তোমার চরম কর্তব্য? সমাজের প্রতি কর্তব্য নেই?'

বিনয় বুঝতে পেরেছে ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ হলেও ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের বিরোধ যখন উপস্থিত হয়, তখন 'ব্যক্তি এবং সমাজ দুইয়ের উপরেই একটি ধর্ম আছে—সেইটের উপরে দৃষ্টি রেখে চলতে হবে। যেমন ব্যক্তিকে বাঁচানোই আমার চরম কর্তব্য নয়, তেমন সমাজকে বাঁচানোও আমার চরম কর্তব্য নয়. একমাত্র ধর্মকে বাঁচানোই আমার চরম শ্রেয়।' গোরা তার হিন্দুত্ববোধের সঙ্গে তার ধর্মকে এক করে দেখে। কিন্তু বিনয়ের ভাবনা আরও অনেকটা অগ্রসর হয়ে গেছে। সমাজ ও ব্যক্তির বাইরেও যে একটি ধর্ম আছে, যা সমাজকেও মানে ব্যক্তিকেও মানে, অথচ কারোরই মাত্রাহীন দাবীকে মানে না। বিনয় এমন ব্যাপকতর ধর্মবোধের রূপ ও স্বরূপের সবটুকু খবর নিশ্চয় দিতে পারবে না কিন্তু এ কথা সে বলতে পেরেছে যে, 'ব্যক্তি ও সমাজের ভিত্তির উপরে ধর্ম নয়, ধর্মের ভিত্তির উপরেই ব্যক্তি ও সমাজ। সমাজ যেটাকে চায় সেটাকেই যদি ধর্ম বলে মানতে হয় তাহলে সমাজেরই মাথা খাওয়া হয়। সমাজ যদি আমার কোনো ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতায় বাধা দেয় তাহলে সেই অসঙ্গত বাধা লঙ্ঘন করলেই সমাজের প্রতি কর্তব্য করা হয়। ললিতাকে বিবাহ করা যদি আমার অন্যায় না হয়, এমনকি উচিত হয়, তবে সমাজ প্রতিকূল বলেই তার থেকে নিরস্ত হওয়া আমার পক্ষে অধর্ম হবে।'

গোরার মুস্কিল দুটো। এক সে তার পরিচিত হিন্দুত্ববোধের বাইরে যেতে পারে না, আর একটা হচ্ছে গোরার যে ভাবের ভারতবর্ষকে সে তার নিজের সঙ্গে একাত্ম করে ভাবে, সে ভারতবর্ষকে আঘাত করতে পারে, এমন কিছু করবার মত মানসিক বীর্য গোরার নেই। বিনয়ের সঙ্গে আলোচনায় যুক্তিতে যখন সে আর হালে পানি পেলে না তখন তার অন্তরের স্বরূপটিকে কেমন মিষ্টি করে খুলে ধরেছে। 'আমি তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে চাই নে। এর মধ্যে তর্কের কথা বেশি কিছু নেই, এর মধ্যে হৃদয় দিয়ে একটি বোঝবার কথা আছে। ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করে তুমি দেশের সর্বসাধারণের সঙ্গে নিজেকে যে পৃথক করে ফেলতে চাও সেইটেই আমার কাছে অত্যন্ত বেদনার বিষয়। এ-কাজ তুমি পার, আমি কিছুতেই পারি নে—এইখানেই তোমাতে আমাতে প্রভেদ—জ্ঞানে নয় বুদ্ধিতে নয়। আমার প্রেম যেখানে, তোমার প্রেম সেখানে নেই। তুমি যেখানে ছুরি মেরে নিজেকে মুক্ত করতে চাচ্ছ সেখানে তোমার দরদ কিছুই নেই। আমার সেখানে

নাড়ির টান। আমি আমার ভারতবর্ষকে চাই। তাকে তুমি যত দোষ দাও যত গাল দাও আমি তাকেই চাই—তার চেয়ে বড়ো করে আমি আপনাকে কিংবা অন্য কোনো মানুষকেই চাই নে। আমি লেশমাত্র এমন কোনো কাজ করতে চাই নে যাতে আমার ভারতবর্ষের সঙ্গে চুলমাত্র বিচ্ছেদ ঘটে। ......সমস্ত পৃথিবী যে-ভারতবর্ষকে ত্যাগ করেছে যাকে অপমান করেছে, আমি তারই সঙ্গে এক অপমানের আসনে স্থান নিতে চাই—আমার এই জাতভেদের ভারতবর্ষ, আমার এই কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই পৌত্তলিক ভারতবর্ষ। তুমি এর সঙ্গে যদি ভিন্ন হতে চাও তবে আমার সঙ্গেও ভিন্ন হবে।'

গোরা ঠেকেছে এইখানে। তার ভাবের ভারতবর্ষের সঙ্গে তার বাস্তবের ভারতবর্ষ মেলে না—এ কথা গোরা যে না জানত তা নয়। কিন্তু যে-কথা গোরা জানত না সেটা হচ্ছে, কেন যে বাস্তবের সঙ্গে মিলছে না সেটা সে ভেবে দেখতে পারছে না এবং তার মূল কারণ বের করে তার সাধের ভারতবর্ষকে জাতিভেদ থেকে, কুসংস্কার থেকে, অপমান থেকে, পৌত্তলিকতা থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করতে পারছে না। সে ভারতবর্ষকে ভালবাসে, তার প্রত্যেক রক্ত বিন্দু দিয়ে ভালবাসে—এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু কেন সে মনে করলে সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত অপমান নিয়ে ভালবাসাটাই ভালাবাসার শেষ কথা? যখনই যে কাউকে বা যা কিছুকে ভালবাসি, তখনই সেই মানুষ বা বস্তুকে অপমান থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সেই সঙ্গেই আমার ওপর বর্তে। আর রক্ষা করতে গিয়ে যদি আমাকে তার ওপর আঘাত হানতে হয়, তবে সে আঘাত হানবার মত বীর্য থাকাও যে ভালবাসারই অপরার্ধ, এ কথা বুঝতে পারা ও পালন করে চলা খুবই কঠিন সন্দেহ নেই। পাপীকে তার সমস্ত পাপ সত্ত্বেও যদি ভালবাসতে পারি, তবে সেটা মহৎ প্রাণের পরিচয়। কিন্তু ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে পাপীকে তার পাপ থেকে বিমুক্ত করিয়ে নেবার সাধনাও যে নেওয়া নিতান্ত দরকার, নইলে সে ভালবাসা তো তামসিক। যে-ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবী ত্যাগ করেছে, যাকে অপমান করেছে, তাকে তার সমস্ত দোষত্রুটি নিয়ে ভালবেসেও যেখানে যে জন্যে তার অপমান ঘটছে, তাকে সকল পৃথিবী পরিত্যাগ করছে—সেখানে সেই কারণ দূর করবার জন্য তাকে প্রয়োজন হলে আঘাত হানতে হবে বৈকি। এ জন্য দুঃখ বোধ করাটা ক্লীবত্বের পরিচয়। একদিন জীর্ণ

সমাজকে আঘাত হানতে অর্জুন পেরেছিলেন না। যে ভীষ্মদ্রোণাদি বা যে রাজামহারাজা সভাসদ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির চোখের উপরে রাজসভার মধ্যে রাজার বাড়ীর মেয়ের অপমান হতে পারে, সেই সমাজের বুকে অত্যাচার সমর্থক সেই ভীষ্মদ্রোণাদিকে আঘাত হানতে একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ কাজ করা অর্জুনের পক্ষে বিশেষ পীড়াদায়ক হয়েছিল। সাধারণতঃ আঘাত করার প্রবৃত্তিটা আসে বিরক্তি বা বিদ্বেষ থেকে। সেখানে অপর পক্ষের কল্যাণ হওয়ার কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু বিরক্তি বা বিদ্বেষ না রেখে ভালবেসেও যে আঘাত হানা যায় অপর পক্ষের কল্যাণের জন্য—মানুষের কালচারের মধ্যে এ অবস্থাটা আজও আসে নি। গোরার পক্ষে হয়েছে সেই অসুবিধা। এখানে তার ভারতবর্ষকে ভালবাসা আসক্তির পর্যায়ভুক্ত এবং তা নিজের অহং-এরই একটা পরিতৃপ্তি। তার মধ্যে বস্তুতন্ত্রতা কম।

যাক, ভারতবর্ষের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে বিনয় আঘাত করল। ললিতাকে ভালবাসল, তাকে বিয়ে করবেও স্থির করল। প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে যেতে হলে মানুষকে কেমন হতে হয়, বিনয়-ললিতার ঘটনাটা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সে কথাটা আমাদের সুন্দর করে জানিয়েছেন। আনন্দময়ীকে যখন রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত হিন্দুত্বের বাইরে এনে ফেলেছিলেন—তখন তিনি আনন্দময়ীকে সুন্দরতর করেছেন। সমাজের থেকে মানুষকে বড় করে আনন্দময়ী উচ্ছৃঙ্খল তো হনই নাই, বরং তাঁর প্রসারিত জীবনের মধ্যে সকলের স্থান ছিল। তিনি বলেছেন, 'যতদিন সমাজ আমার সকলের চেয়ে বড়ো ছিল, ততদিন সমাজকেই মেনে চলতুম; কিন্তু একদিন ভগবান আমার ঘরে হঠাৎ এমন করে দেখা দিলেন যে, আমাকে আর সমাজ মানতে দিলেন না। তিনি নিজে এসে আমার জাত কেড়ে নিয়েছেন তখন আমি আর কাকে ভয় করি।' আনন্দময়ীকে খ্রীষ্টানী পরিচারিকা লছমীকে বাদ দিতে হয় নি। বিনয় যখন ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েকে ভালবেসে ফেলল তখন সে জটিল অবস্থায় বিনয়কে আনন্দময়ীর পরিত্যাগ করতে তো হয়ই নি, বিনয়ের জীবনের সেই সঙ্কট মুহূর্তে তিনিই তাকে পথ দেখিয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের তথাকথিত সনাতনত্বের গৌরব আনন্দময়ীর ছিল না—কিন্তু মানুষ হিসাবে তাঁকে কি অধিকতর সম্মান করে আপনতর মনে করি না? করি—শাস্ত্রের বাধা নিষেধ দিয়ে যারা নিজেদের অবস্থাকে যান্ত্রিকতায় পরিণত করে নি,

তারাই বুঝবে কৃষ্ণদয়াল বাবুর থেকে আনন্দময়ীর প্রাণ মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকার করে কেমন গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছে। গোরাকে গ্রহণ করে' আনন্দময়ী সমাজকে আঘাত করেছিলেন—সমাজের কোনো সমর্থন তিনি পাবেন না জেনে সকলের সব অপমান অসম্মানকে প্রাণভরে গ্রহণ করে রেখেছিলেন আগেই। তাই সমাজ তাঁকে আঘাত করেও আহত করতে পারে নি। প্রাণকে অনেকখানি উদার ও বিস্তৃত করতে না পারলে প্রচলিত সমাজের বাইরে যাওয়া চলে না। আনন্দময়ী সেইখান দিয়ে জীবনের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন।

তথাপি আনন্দময়ীর সমাজকে আঘাত করা আর বিনয় ললিতার সমাজকে আঘাত করা এক কথা নয়। কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে আনন্দময়ীর সম্পর্ক যতই কম থাক, তবু কৃষ্ণদয়ালের গৃহেতে ও তাঁরই অভিভাবকত্বে তিনি ছিলেন। কিন্তু বিনয় ললিতাকে একেবারে আকাশের নীচে এসে দাঁড়াতে হবে—আর চারদিক থেকে বিভিন্ন রকমের আক্রমণের বাণ এসে পড়তে থাকবে তাদের উন্মুক্ত মস্তকে। এ ক্ষেত্রে সেইদিনকার সেই আবেষ্টনে বিনয় ললিতা কেমন করে এ ঘটনাকে হজম করে এগিয়ে যাবে? গোরার কাছে কোন পথ ছিল না, বিনয় পথের খবর জানত না, ললিতা জানত কেবল বেরিয়ে পড়তে হবে। আনন্দময়ী কি জানতেন তা বলেছি। আর পথের খবর জানতেন পরেশ বাবু। বিয়ে যখন ঠিক হয়েছে তখন তিনি বিনয়কে যা লিখলেন তার মধ্যেই আছে পথের কথা।

'আমার ভালো মন্দ লাগার কোনো কথা তুলিব না, তোমাদের সুবিধা অসুবিধার কোনো কথাও পাড়িতে চাই না। আমার মত বিশ্বাস কী, আমার সমাজ কী, সে তোমরা জান, ললিতা ছেলেবেলা হইতে কী শিক্ষা পাইয়াছে এবং কী সংস্কারের মধ্যে মানুষ হইয়াছে তাও তোমাদের অবিদিত নাই। এ সমস্তই জানিয়া শুনিয়া তোমাদের পথ তোমরা নির্বাচন করিয়া লইয়াছ। আমার আর কিছুই বলিবার নাই। মনে করিয়ো না, আমি কিছুই না ভাবিয়া অথবা ভাবিয়া না পাইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছি। আমার যতদূর শক্তি আমি চিন্তা করিয়াছি। ইহা বুঝিয়াছি তোমাদের মিলনকে বাধা দিবার কোনো ধর্মসংগত কারণ নাই, কেননা, তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে। এ-স্থলে সমাজে যদি কোনো বাধা থাকে, তবে তাহাকে স্বীকার করিতে তোমরা বাধ্য নও। আমার কেবল এইটুকু মাত্র বলিবার

আছে, সমাজকে যদি তোমরা লঙ্ঘন করিতে চাও তবে সমাজের চেয়ে তোমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে। তোমাদের প্রেম, তোমাদের সম্মিলিত জীবন কেবল যেন প্রলয়শক্তির সূচনা না করে, তাহাতে সৃষ্টি ও স্থিতির তত্ত্ব থাকে যেন। কেবল এই একটা কাজের মধ্যে হঠাৎ একটা দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করিলে চলিবে না। ইহার পরে তোমাদের জীবনের সমস্ত কাজকে বীরত্বের সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে হইবে—নহিলে তোমরা অত্যন্ত নামিয়া পড়িবে। কেননা বাহির হইতে সমাজ তোমাদিগকে সর্বসাধারণের সমান ক্ষেত্রে আর বহন করিয়া রাখিবে না—তোমরা নিজের শক্তিতে এই সাধারণের চেয়ে বড়ো যদি না হও, তবে সাধারণের চেয়ে তোমাদিগকে নামিয়া যাইতে হইবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ শুভাশুভের জন্য আমার মনে যথেষ্ট আশঙ্কা রহিল। কিন্তু এই আশঙ্কার দ্বারা তোমাদিগকে বাধা দিবার কোনো অধিকার আমার নাই—কারণ, পৃথিবীতে যাহারা সাহস করিয়া নিজের জীবনের দ্বারা নব নব সমস্যার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হয় তাহারাই সমাজকে বড়ো করিয়া তুলে। যাহারা কেবলই বিধি মানিয়া চলে তাহারা সমাজকে বহন করে মাত্র, তাহাকে অগ্রসর করে না। অতএব আমার ভীরুতা আমার দুশ্চিন্তা লইয়া তোমাদের পথ আমি রোধ করিব না। তোমরা যাহা ভাল বুঝিয়াছ, সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাহা পালন করো, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন। ঈশ্বর কোনো-এক অবস্থার মধ্যে তাঁহার সৃষ্টিকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখেন না, তাহাকে নব নব পরিণতির মধ্যে চির নবীন করিয়া জাগাইয়া তুলিতেছেন; তোমরা তাঁহার সেই উদ্বোধনের দূতরূপে নিজের জীবনকে মশালের মতো জ্বালাইয়া দুর্গম পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছ—যিনি বিশ্বের পথচালক তিনি তোমাদিগকে পথ দেখান—আমার পথেই তোমাদিগকে চিরদিন চলিতে হইবে এমন অনুশাসন আমি প্রয়োগ করিতে পারিব না। তোমাদের বয়সে আমরাও একদিন ঘাট হইতে রশি খুলিয়া ঝড়ের মুখে নৌকা ভাসাইয়াছিলাম—কাহারও নিষেধ শুনি নাই। আজও তাহার জন্য অনুতাপ করি না। যদিই অনুতাপ করিবার কারণ ঘটিত তাহাতেই বা কী? মানুষ ভুল করিবে ব্যর্থও হইবে, দুঃখও পাইবে, কিন্তু বসিয়া থাকিবে না; যাহা উচিত বলিয়া জানিবে তাহার জন্য আত্মসমর্পণ করিবে;—এমনি করিয়াই পবিত্রসলিলা সংসারনদীর' স্রোত চিরদিন প্রবহমান হইয়া বিশুদ্ধ থাকিবে। ইহাতে

মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্ত তীর ভাঙিয়া ক্ষতি করিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া চিরদিনের জন্ত স্রোত বাঁধিয়া দিলে মারীকে আহ্বান করিয়া আনা হইবে,—ইহা আমি নিশ্চয় জানি ; অতএব যে শক্তি তোমাদিগকে দুর্নিবার বেগে সুখস্বচ্ছন্দতা ও সমাজবিধির বাহিরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া তাঁহারই হস্তে তোমাদের দুইজনকে সমর্পণ করিলাম. তিনিই তোমাদের জীবনে সমস্ত নিন্দাগ্লানি ও আত্মীয়-বিচ্ছেদকে সার্থক করিয়া তুলুন। তিনিই তোমাদিগকে দুর্গম পথে আহ্বান করিয়াছেন. তিনিই তোমাদিগকে গম্যস্থানে লইয়া যাইবেন।'

—কী অপূর্ব পত্র! সমাজের প্রচলিত পথের বাইরে যাবার অধিকার আমার আছে। কিন্তু তখনই আছে যখন সমাজের থেকে আমি বড়, যখন আমার কাজ কেবল প্রলয়শক্তির সূচনা করবে না, তার মধ্যে সৃষ্টি ও স্থিতির তত্ত্বও থাকবে। এই দুটো সর্ত যদি পূর্ণ থাকে, তবে প্রচলিত যে কোন ব্যবস্থার বাইরেই মানুষ যেতে পারে। যেতে পারার সে স্বাধীনতা তার আছে বলেই যুগে যুগে সে নূতন নূতন সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে, নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে, নূতন অর্থনীতিকে রূপ দান করেছে। কিন্তু পূর্ব ব্যবস্থা থেকে অধিকতর ব্যাপক, অধিকতর বিস্তৃত অবস্থার খোঁজ যদি আমি আমার কর্ম দ্বারা এনে দিতে না পারি, তবে নূতনের গৌরব কোথায়, সে তো শুধুই ধ্বংসাত্মক। কিন্তু সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে তা হচ্ছে ব্যক্তিগত আবেগের ফলে প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরে যাওয়া। সেই বাইরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমি বা আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রতাকে, পরিচ্ছিন্নতাকে, দলাদলির বুদ্ধিকে, সাম্প্রদায়িকতাকে, অপরকে দোষারোপ করবার মনোবৃত্তি প্রভৃতি বহু নীচতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বড় হই না—বহুর সাথে নিজের প্রাণের যোগ বিধান করে বিশ্বজনীন জীবনবোধের সাধনা নেই না—কেবল প্রচলিত ব্যবস্থাকেই অস্বীকার করি আমার আবেগের তাগিদে। এতে কিছুই গড়ে ওঠে না—ব্যক্তিগত জীবনও স্থিতিলাভ করে না, সমাজ জীবনও নূতন কোন সম্পদে ভূষিত হয় না। সব সময়ই যে মানুষের ব্যক্তিগত সাধনা বলে একটা জিনিষ আছে, যার জন্ত সে সমাজকেও এগিয়ে দিতে পারে, বড় করতে পারে, গোরার মধ্য দিয়ে, বিনয় ললিতার বিবাহের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাটা বলেছেন। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল এইখানে। অপর পক্ষকে দাবিয়ে দিতে চেষ্টা করে

তুমি বড় হতে পারবে না, অপর পক্ষ থেকে তুমি বড় হয়ে ওঠ জীবনের সুষ্ঠু সংগঠন দ্বারা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়দমন করেছিলেন, তখন তাঁর শক্তিও ছিল এইখানে—আমি নিজেকে বাড়িয়ে তুলব, প্রতি-আক্রমণের দ্বারা প্রতিরোধ করব না, আমার বড় হওয়ার—দেহে প্রাণে মনে জ্ঞানে বিজ্ঞানে আনন্দে—সব জায়গায় বড় হওয়ার চাপের মধ্য দিয়ে অপর পক্ষকে বশে আনব। মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রের এই একটা সত্য কথা সব সময় প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে হবে যে, কি ব্যক্তিগত ভাবে কি সামাজিকভাবে যা কিছুকে, যে কোন মানুষ বা যে-কোন ঘটনা বা যে-কোন অবস্থাকে পার হয়ে আমি তখনই যেতে পারব সামনের দিকে, যখন সেই মানুষ, ঘটনা বা অবস্থা সম্বন্ধে আমার আসক্তি বা বিদ্বেষ কোনটাই আমাকে জড়িয়ে ফেলবে না। আসক্তি যেমন বন্ধনের কারণ, বিদ্বেষও তো তেমনিই বন্ধনের কারণ। সমাজের যে ব্যবস্থাটাকে ছেড়ে যেতে চাইছি, তার সম্বন্ধে বিদ্বেষ বিরক্তি বা হিংসা নিয়ে যতই দূরে যেতে চাইব, দুদিন পরে সেইখানে বা তারও পেছনে ফিরে আসব—দ্বিগুণ প্রতিহিংসা নিয়ে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। আজকের দিনের নারী আন্দোলনের এই ভয় রয়েছে যথেষ্ট। নারী যেখানে ছিল, তার প্রতি ঘৃণা ও হিংসা নিয়ে যতই তারা সে ব্যবস্থা ভাঙতে চাইছে, ততই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—প্রগতিভ্রান্ত সেই নারীর দলের আগের অবস্থায় ফিরে আসতে দেরী হবে না। তাই এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, যাকে চাইব তার প্রতি আসক্তি যেমন আমার সত্য দৃষ্টিকে ব্যাহত করতে পারবে না, তেমনি যাকে ছেড়ে যাব তার প্রতি হিংসা বা বিরক্তি থাকলেও তাকে ছেড়ে যেতে বা পেরিয়ে যেতে আমি পারব না। পরেশবাবুর পত্রখানির সমস্ত তাৎপর্য এইখানে। সমাজের থেকে বড় হতে আমি শুধু এমন হলেই পারব আর আমার সমস্ত কাজ প্রলয়শক্তির সূচনা তখনই করবে না, তাতে সৃষ্টি ও স্থিতির তত্ত্বও একমাত্র তখনই থাকতে পারবে যখন বস্তু সম্বন্ধে (যে-কোন অবস্থাও একটা বস্তুই বটে) আমি অমনই মুক্তির খবর জানব। আসক্তি ও বিদ্বেষই বন্ধন, বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কটা বন্ধন নহে। সমাজকে তখনই পুরাতন অবস্থা থেকে নূতন একটা ব্যাপকতর অবস্থায় আনতে পারব, পুরাতনকে ছেড়ে নূতনের মধ্যে আসায় তখনই সংগঠন—সৃষ্টি ও স্থিতি—থাকবে, যখন আমি পুরাতনকে ঘৃণা না করে এবং একটা ব্যাপকতর সমষ্টি বোধ থেকে নূতনকে গ্রহণ করতে পারব।

বিনয় ললিতাকে পরেশবাবু এইখানে আহ্বান করেছেন। এই বড়ত্বের মধ্যে আসলেই বিপ্লব সার্থক। রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার হিন্দুসমাজের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব করবার যে প্রয়োজন ছিল, সে প্রয়োজন আজও আছেই। পরেশবাবু যে বড়ত্বের ক্ষেত্রে আহ্বান করে গেছেন, আমরা সেই বড়ত্বকে আয়ত্ত করতে পারিনি বলেই প্রয়োজন আজও তেমনিই আছে।

এর পরের প্রশ্ন যেটা রয়ে গেল সেটা হচ্ছে বিনয় ললিতার স্থিতিভূমি হবে কি—ভাষান্তরে আনন্দময়ীর গোরাকে গ্রহণের মধ্যে দিয়ে এবং ললিতাকে বিনয়ের বিয়ে করার মধ্য দিয়ে যে নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, সনাতন হিন্দুত্বের সাথে তার সামঞ্জস্য হবে কি করে? আরও যে সব একই জাতীয় ঘটনা এই সঙ্গে এসে যাচ্ছে সে হচ্ছে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, হিন্দুনারীর সামান্য স্খলনেও সমাজে পুনঃপ্রবেশ, বর্তমান সময়ের ধর্ষিতা নারী ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্নের সামঞ্জস্য কোথায়? গোরার ভাষায়—যে দেবতা হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা—এই দেবতাকে তথাকথিত হিন্দুত্বের মধ্য থেকে ছেঁকে বের করা যাবে কেমন করে? কেমন করে 'একে'র দেবতা 'সর্বে'র দেবতা হবেন?

একের দেবতা সর্বের দেবতা হতে পারেন তখনই যখন সমাজ জীবন্ত থাকে—সেই জীবন্ত সমাজে কর্মীর দেবতার সাথে ভক্তের দেবতার বিরোধ নেই, ভক্তের দেবতার সাথে জ্ঞানীর দেবতার বিরোধ নেই, সংসারীর দেবতার সাথে সন্ন্যাসীর দেবতার বিরোধ নেই। অধিবিদ্যা যখন বস্তুবিজ্ঞান ও জীববিদ্যার স্বীকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়—তখই সে অধিবিদ্যা বস্তুতান্ত্রিক—সেখানেই একের দেবতার সঙ্গে সর্বের দেবতার মিল হয়। বায়োলজিকে স্বীকার করে নিলে দর্শন হয় একরকম, বায়োলজিকে অস্বীকার করলে দর্শন হয় আর একরকম। জীবিত মানুষের পক্ষে বায়োলজিকে অস্বীকার করে দর্শন স্থাপনা করা মানেই হচ্ছে পরস্পরবিরুদ্ধের মিলন ক্ষেত্রকে গোড়াতেই ধূলিসাৎ করে দেওয়া। জীবনকেই যদি অস্বীকার করি, তাহলে কোন সর্বসাধারণের মিলন ক্ষেত্র কিছুতেই রচনা করা সম্ভব নয়। জীবনের মধ্যে, জীবন্ত সমাজের মধ্যে প্রত্যেকেরই অস্তিত্ব একটু খুঁজলেই বের করা যায়। আমি একটি মানুষ হয়েও একই সঙ্গে মেয়ে, বন্ধু, স্ত্রী, মা ইত্যাদি কত কি। কেমন করে হই? কেননা আমি একটা জীবন্ত মানুষ। তেমনি সমাজ

জীবন্ত হলেই বিভিন্ন ভাবধারার বিভিন্ন ঘটনাকে হজম করেও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। মৃতের হিন্দুত্ব আজ আর দরকার নেই—একটা জীবন্ত হিন্দুত্বের ধারণা করলেই একের দেবতার সঙ্গে সর্বের দেবতার মিলন সম্ভব হতে পারে। জীবনের মধ্যে সমস্ত ঘটনাই যে সম্ভব হচ্ছে, সেটা এই-ই প্রমাণ করে যে, পক্ষ প্রতিপক্ষের ঊর্ধ্বে একটা অবস্থা আছে যেটার সন্ধান পেলেই শুধু কোন কিছু সংগঠন—যার ফল এগিয়ে যাওয়া—সম্ভব। কি ব্যক্তিগত জীবনের কি সামাজিক জীবনের, সকল ক্ষেত্রের সংগঠনেই এই ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়োজন আছে—পক্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে কোন বিপ্লবই কোনদিন সংগঠিত হয় না। পরেশবাবু তাই বললেন সমাজের থেকে তোমাদের বড় হতে হবে। মনস্তত্ত্বের শেষ বক্তব্য এই ঊর্ধ্বে ওঠার আহ্বান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা' উপন্যাসের মধ্যে হিন্দুত্বকে এই ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়োজন বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রদর্শন করিয়ে একটা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তাকে আহ্বান করে গেছেন।

ভ্রম সংশোধন

গত আষাঢ় মাসে ধীরেন্দ্র চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধটীতে যে সকল উদ্ধৃতি ছিল, তাহা মরিস হিণ্ডাসের 'মাদার রাশিয়া' হইতে উদ্ধৃত—'মাদার ইণ্ডিয়া' নহে। অনবধানতাপ্রযুক্ত ফুটনোটে মাদার ইণ্ডিয়া লেখা হইয়াছিল বলিয়া আমরা দুঃখিত। উঃ ভাঃ সঃ

অনুভব

নিশিকান্ত

ওরা বলে, "ব্যোম-পন্থী", ওরা বলে, "আকাশ-বিলাসী",
ওরা বলে, "আমি নাকি স্বপ্নভরা খেলার খেয়ালী,
আমি নাকি ফাঁকি দেই জীবনের গূঢ় গ্রন্থিরাশি
দুর্বল ভীরুর মত, আমি নাকি সাজাই দেয়ালি—

বর্তিকা-বিহীন শূন্যে—নিরুত্তাপ নিষ্প্রাণ শিখায়,
মোর দুঃখ মোর সুখ অচৈতন্য অনুভূতি হীন—
রক্তের কল্পনা শুধু দোলে মোর রক্তের লিখায়।
প্রিয়তম, কেমনে বুঝিবে ওরা মোর রাত্রি-দিন

কি নিবিড় প্রাণস্পন্দে ভরা। ওরা ধূলার অঙ্গনে
খেলিছে ধূলার খেলা, ওরা চায় সহজ সুলভ—
প্রেমেরে লভিতে চায় ক্ষণিকের বাহুর বন্ধনে।
দুর্লভের লাগি' মোর পলে পলে এই অনুভব :

মর্ত্যের মৃত্তিকা টানে—তবু চিত্ত ঊর্ধ্বলোকে চায়—
জীবন ছিঁড়িয়া পড়ে—এ বেদনা কে বুঝিবে হায়!

ধান চাষের উন্নত পদ্ধতি

পবিত্রকুমার চক্রবর্তী

দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার কোন এক অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম ধান চাষ সুরু হয়। অনেকে ভারতকেই ধানের জন্মস্থান বলে মনে করে থাকেন। ধান চাষের জন্যে নীচু জমি, এটেল মাটী ও প্রচুর বর্ষার জলের প্রয়োজন এবং বর্ষাকালের আর্দ্র উষ্ণ আবহাওয়াতে এর বৃদ্ধি খুব দ্রুতগতিতে হয়ে থাকে। এইজন্যই প্রশান্ত ও ভারতমহাসাগরের তীরবর্ত্তী অঞ্চল যেমন ভারত, পূর্ব্বপাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয়, ইন্দোচীন, চীন ও জাপানে ইহার প্রচুর চাষ হয়। আবার ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে, স্পেন ও ইতালীতে ইহার ফলস খুব বেশী। এই সব অঞ্চলে বহুদিন ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে এক একটা বিশিষ্ট ধরণের কৃষি পদ্ধতি অনুসরণের ফলে ও দেশগুলির মধ্যে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা থাকার দরুণ বিভিন্ন দেশের ধান চাষের পদ্ধতি ও ধানের জাতির মধ্যে একটা বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে দুইটী দেশের ধানের ফসলের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য দেখা যায়।

সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলা দেশে ধানের চাষ হয়ে আসছে। নদীমাতৃক বাংলার বর্ষাপ্লাবিত জনপদের নিম্নভূমির কর্দ্দমাক্ত পলিমাটী ধান চাষের খুবই উপযোগী। আবার মৌসুমী ঋতুর ধারা-বর্ষণ এই ফসলটীর বৃদ্ধির সহায়তা করে। বাংলা এতদিন সুজলা সুফলা বলে বন্দিত হয়ে এসেছে। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে কর্ত্তিত পশ্চিমবঙ্গে আজ নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। পশ্চিম-বঙ্গের অপেক্ষাকৃত পুরাতন পলিমাটীর ও লালমাটীর ক্ষয়িষ্ণু উর্ব্বরতা আজ আর তেমন করে অঞ্জলি ভরে ফসল ফলাতে পারছে না। খাদ্য ব্যাপারে আমরা ক্রমেই পরমুখাপেক্ষী হয়ে যাচ্ছি। আমাদের ফলনের হারও নিম্নাভিমুখী।

পশ্চিম বাংলার ৯৩ লক্ষ একরেরও বেশী জমিতে ধান চাষ করা হয়। দেশের আবাদযোগ্য ভূমির শতকরা প্রায় ৭১ অংশ ধানের চাষ করেও আমাদের আড়াই কোটী লোকের দুবেলা আহার্য সংস্থান হয় না। এর কারণ আমাদের জমির অতি নগন্য উৎপাদিকা শক্তি। পশ্চিম বাংলায় বিঘা প্রতি ধান উৎপাদন হয় গড়ে মাত্র সাড়ে পাঁচ মণ।

উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ বীজের জন্ত রেখে দিয়ে, ইঁদুর বাদরের নৈবেদ্য বাদ দিয়ে যা থাকে, তার জন্ত রেশনের দোকানে দোকানে হুড়াহুড়ি মনকষাকষি। অথচ জাপান প্রভৃতি দেশে ধানের ফলন বিঘা প্রতি ১৫।১৬ মণেরও বেশী। কারণ বিশ্লেষণ করলে তাদের উন্নত ধরণের পদ্ধতি আর সার প্রয়োগের ব্যাপকতা চোখে পড়ে।

আমাদের দেশে আজ তাই জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষের চেষ্টা চলছে। ওদের দেশের পদ্ধতি আমাদের দেশের স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী কিছুটা পরিবর্তিত করে যদি আমাদের কৃষক কুল অনুকরণ করে, তবে আশা করা যায় ধানের ফলন আশাতীত বৃদ্ধি পাবে। এই প্রবন্ধে প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে জাপানী প্রথার তুলনামূলক বিচারের চেষ্টা করব।

এদেশে আউশ, আমন ও বোরো এই তিন ধরণের ধান হয়ে থাকে। আউশ ধান বর্ষাকালে চাষ হয়ে থাকে এবং পশ্চিম বাংলার সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়। বোরো ধান শীতের ফসল ও মাত্র অর্ধ লক্ষ একর জমিতে এর চাষ হয়। পশ্চিম বাংলায় ৭৮ লক্ষ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে এবং এই ধান হৈমন্তীক ধান নামে পরিচিত। ধানের আবাদ দুই ভাবে হয়ে থাকে; এক (১) বপন করে, (২) রোপন করে। বোনা ধান ছিটিয়ে লাগান হয়। আর রোয়া ধানের প্রথমে চারা করে নেওয়া হয় ও পরে সেই চারা তুলে জমিতে রোপন করা হয়। বোনা ধানের চেয়ে রোয়া ধানের ফলন বেশী। আমন ও আউশ ধান প্রধানতঃ রোয়া ধান। তবে নীচু জমিতে আমন ও উঁচু জমিতে আউশ ধান বুনেও চাষ করা যায়। বোরো ধান সব সময়েই রোপন করা হয়ে থাকে। এই প্রবন্ধে রোয়া আমন ধানের চাষের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করব।

চারা তোলা :—রোপণের মাস দেড়েক আগে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে চারার জন্ত বীজতলায় ধান ফেলা হয়। বীজতলায় সাধারণতঃ প্রচুর পরিমাণে গোবর সার দেওয়া হয়ে থাকে। মাটী কাদা করে অথবা ধূলো করে দুরকমেই চারা তোলা যায়। বীজের হার কাঠা প্রতি তিন সের এবং প্রায় দেড় কাঠা দু কাঠা জমির চারাতে এক বিঘা জমি রোপণ করা হয়।

আমাদের দেশে বীজতলায় অনেক সময় খুব ঘন করে বীজ ফেলা হয়। বীজ ফেলবার আগে অনেক সময় বীজ অঙ্কুরিত করে নেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। বীজ ছড়াবার আগে বীজতলা কাদা করে তার উপরে বীজ ছড়িয়ে

দেওয়া হয় এবং এর ফলে চারার শিকড় মাটীর খুব নীচে চলে যায় না।

রোপণ:—এক মাস দেড় মাস পরে বীজতলা থেকে চারাগুলো তুলে ফেলা হয়। আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত আমাদের দেশে মুসলধারে বৃষ্টি পড়তে থাকে। এই সময় আমন ধানের কর্ষিত জমিতে জল জমে যায়। ঐ জমিতে বার দুই লাঙ্গল চালিয়ে মাটীকে কর্দ্দমাক্ত করে ফেলে মই দিলে পর ধান রোপণের উপযুক্ত হয়। তারপর ৪।৫ টা করে চারা ৯" ইঞ্চি থেকে ১ ফুট দূর দূর কাদার মধ্যে পুতে দেওয়া হয়। চারা রোপণের তিন চার দিনের মধ্যেই চারার শিকড় মাটীর মধ্যে লেগে যায়। এরপর আগাছা পরিষ্কার করা ও প্রয়োজন বোধে জল দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না, তবে আমাদের দেশে জলসেচের তেমন ব্যবস্থা না থাকায় চাষীদের আকাশের দিকে হা করে চেয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

সার—এদেশে ধানের জমিতে অল্প পরিমাণ গোবর সার ও অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পুকুরের পাঁক দেওয়া ছাড়া অন্য সার একরকম ব্যবহার হয়ই না। আজকাল কোন কোন সম্পত্তিসম্পন্ন চাষী খইল এমোনিয়াম সালফেট, হাড়ের গুড়া প্রভৃতি ব্যবহার করছে। এইবার প্রচলিত পদ্ধতির পটভূমিকায় জাপানীপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনার অবতারণা করব।

চারা—জাপানীপদ্ধতিতে ধানের চারা তোলার ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। বীজতলার জমি উত্তমরূপে চাষ করে মাটী গুড়ো করে ফেলা হয় এবং এই সময় দেড় কাঠা জমির জন্য এক গাড়ী হারে গোবর সার অথবা কম্পোষ্টসার কর্ষিত মাটির সংগে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর চার ফুট চওড়া ও তিন ইঞ্চি উঁচু কতকগুলি বীজতলা তৈরী করে সেই বীজতলার উপরের স্তরে ½ ইঞ্চি পুরু করে ছাই কম্পোষ্ট ও সুষম সার ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর কাঠা প্রতি তিন সের হারে বীজ ঐ বীজতলায় ছড়িয়ে দিতে হয়। বীজ ছড়ানোর পরে তার উপর পাতলা করে গুড়ো মাটি ছড়িয়ে হাত দিয়ে জল ছিটিয়ে দিলে কয়েকদিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হবে। বীজতলার উপরের স্তরে প্রচুর পরিমাণে সার বর্ত্তমান থাকাতে চারার শিকড়গুলি উপরের দিক্‌কার কম্পোষ্টের স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে।

বীজ ছড়াবার আগে বীজগুলি প্রথমে নূনজলে ছেড়ে দিতে হয়।

ভাসমান বীজগুলিকে ফেলে দিয়ে নিমজ্জিত বীজগুলি মেয়েনক্স দ্রবণে বিশোধিত করা হয়। তারপর শুকিয়ে বীজতলাতে ছড়াতে হয়।

বীজতলাতে আগাছা বেশী উঠলে সেগুলি পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। এই সময়ে বিঘাপ্রতি /২॥ হারে নাইট্রোজেন দেওয়ার জন্য ৩ : ১ হারে খইল ও এ্যামোনিয়াম সালফেট ছড়িয়ে দিতে হয়।

(১) বীজতলা ৩" উঁচু করে তৈরী করার ফলে জল দাঁড়াতে পারে না। বাড়তি জল নালা বেয়ে বাইরে চলে যায়।

(২) বীজতলাতে প্রচুর সার দেওয়া থাকায় এবং সেই সার উপরের স্তরে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে চারাগুলির শিকড় উপরের দিকেই ছড়িয়ে থাকে এবং এবং চারাগুলি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠে। উৎপাটনের সময় শিকড় ছিঁড়ে যায় না।

(৩) বীজ লবণ জলে ডুবিয়ে পরে বিশোধিত করে নেওয়ার ফলে পুষ্ট, নীরোগ বীজগুলিই মাত্র নির্ব্বাচিত হয়।

(৪) এই পদ্ধতিতে বিঘাপ্রতি বীজের পরিমাণ কম লাগে।

রোপণ—চারা লাগাবার আগে থেকেই জমির পরিচর্য্যা সুরু হয়। বিঘাপ্রতি ৫০ মণ কম্পোষ্ট, গোবর বা সবুজ সার দিয়ে খুব ভাল করে চাষ করে রাখতে হয়। তারপর চারা লাগাবার আগে বিঘাপ্রতি ১৬ সের হিসাবে এ্যামোনিয়াম সালফেট ও সুগার কম্পোষ্ট দিয়ে জমিটা কষাতে হয়। ভাল বৃষ্টি হওয়ার পর জমিতে জল জমে গেলে দু'বার লাঙ্গল চালালেই মাটী অনেকটা কাদার মত হয়ে যায়। এর পর মই টেনে নিয়ে ধানের চারা লাগিয়ে দিতে হয়।

পাঁচ-ছয় সপ্তাহের মধ্যে চারা তুলে এনে ১০"×১০" দূরে দূরে সারি করে লাগিয়ে দিতে হয়। তর্জ্জনীর সাহায্যে মাটিতে একটা ছোট গর্ত্ত করে তারপর মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে চারাটি ধরে সযত্নে খাড়া ভাবে চারাটিকে ঐ গর্ত্তে বসিয়ে দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মাটি চেপে দিতে হয়। রোপণের সময় দড়ি ও কাঠি ব্যবহার করে সারি করে লাগানোর কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয় না।

পরিচর্য্যা—রোপণের পর সপ্তাহ দুই কেটে গেলে জমি থেকে আগাছা নির্ম্মূল করে ফেলতে হবে। এবং আরও দিন পনেরো পরে প্রত্যেকটি গাছের গোড়ার মাটি হাত দিয়ে অল্প নেড়ে দিয়ে গাছের গোড়ায় সুষম সার দিতে হবে। এই সারে কম্পোষ্ট বা খইল, এ্যামোনিয়াম সালফেট ও

দু'পায় কম্পোষ্ট থাকবে। কোন সারিতে যদি কোন শূন্য স্থান থেকে যায় তবে এই সময় নতুন চারা লাগিয়ে সেই শূন্যতা ভরে দিতে হবে। চারার গোড়ার মাটি নেড়ে দেওয়ার সময় ছোট ছোট শিকড় ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে গাছের গোড়া থেকে বিয়ান বেরোতে আরম্ভ হবে। ফুল আসার সংগে সংগে সমস্ত পরিচর্য্যা বন্ধ করে দিতে হবে। গাছের বৃদ্ধি যদি খুব বেশী হয় এবং এই সময় পাতা বা থোড়ের ভারে যদি গাছের মাটিতে শুয়ে পড়বার লক্ষণ দেখা যায় তবে মাঠের মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে দড়ি বেঁধে দিতে হবে। পাঁচ ফুট দূরে দূরে ও মাটি থেকে দুই ফুট উঁচু করে দড়ি বেঁধে দিলে গাছগুলি দড়ির উপরই কাৎ হয়ে পড়বে। মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না।

এছাড়া কীট বা রোগশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য প্রয়োজনের খাতিরে মাঝে মাঝে গ্যামেক্সিন, ডি. ডি. টি. প্রভৃতি ছড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যে অঞ্চলে বৃষ্টি কম সেখানে কৃত্রিম জলসেচেরও প্রয়োজন হতে পারে।

(১) এই পদ্ধতিতে ধানের চারাগুলি সারিবদ্ধ ভাবে ও সমান দূরে দূরে লাগানো হয়ে থাকে। ফলে, রোপনের পরবর্ত্তী পরিচর্য্যা করতে কোন অসুবিধা হয় না।

(২) চারাগুলি খাড়াভাবে লাগানো হয়ে থাকে এবং শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

(৩) জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দেওয়া হয়ে থাকে। এই সারের অধিক অংশই জৈবজাতীয় সার।

(৪) রোপণের পরে জমির আগাছা পরিষ্কার করে, গোড়ার মাটি আল্গা করে সুষমসার ব্যবহার করা হয়। এর ফলে গাছের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে ও বিয়ানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হয়।

(৫) আড়া আড়ি ভাবে দড়ি বেঁধে দেওয়ার ফলে গাচগুলি মাটিতে শুয়ে পড়ে না এবং শীষগুলি কাদায় নষ্ট হয় না।

মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে জাপানী পদ্ধতির উৎকর্ষতার মূলে দুটি কারণ বিদ্যমান। (১) চারা তোলার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন ; (২) প্রচুর সার ব্যবহার ও রোপণ-পরবর্ত্তী পরিচর্য্যা। সার ব্যবহারে কোন রকম কার্পণ্য করা হয় না। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ঘটিত গাছের গ্রহণযোগ্য সার ব্যবহার করা হয়। প্রচুর জৈব সার ব্যবহারের ফলে

রাসায়নিক সার ব্যবহারের দোষগুলি আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। তবে, আমাদের দেশে জলের জন্য আকাশের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হয়। জমিতে প্রচুর সার ব্যবহারের পর প্রয়োজনমত জল সরবরাহ করতে না পারলে অধিক ফলনের আশা করা যায় না। আমাদের সেচপরিকল্পনাগুলি সাফল্যমণ্ডিত হলে আশা করা যায় এই পদ্ধতির উৎকর্ষতা সম্যকভাবে কার্য্যকরী হবে।

এই উন্নত ধরণের কৃষিপদ্ধতির ফলে আমাদের দেশের খাদ্যোৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়ে আমাদিগকে ভিক্ষা বৃত্তির লজ্জা থেকে রক্ষা করবে এই আশা নিয়ে আজ আমাদের গ্রামে গ্রামে গতানুগতিকপন্থী কৃষককুলের মধ্যে এই নতুন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের জন্য পূর্ণ সহযোগিতার অঙ্গীকারে কাজ করে যেতে হ'বে।

অথর্ব বেদের আশয়

যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বৈষ্ণব আচার্যগণ ভক্তিশাস্ত্রের দর্শনকার বলিয়া প্রখ্যাত। দার্শনিক যুক্তিদ্বারা তাঁহারাই ভক্তিকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। পরমেশ্বর বিষ্ণু চারিটি ব্যূহে অবস্থিত, ইহাই তাঁহাদের ধারণা; অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, বাসুদেব এবং সংকর্ষণ। ইঁহারা বিষ্ণুর কায়ব্যূহ। বিষ্ণুর অংশ নহেন—চারিজনে মিলিয়া পরমেশ্বর বিষ্ণু এমন নহে। ইঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই পরমেশ্বর বিষ্ণু পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। সত্তা একই, প্রকাশ বিভিন্ন। একই বস্তুকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখা।

দার্শনিক যুক্তির কথা দার্শনিকগণই বিচার করিবেন। পরন্তু আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুসমাজে চারিটি দেবতাই প্রধান —ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং শ্যামা।

যে অখণ্ড চিৎ-সত্তা হইতে জড়-জীবাত্মক চরাচর বিশ্ব রচিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া খ্যাত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যদ্ জ্ঞানং অদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে॥ ১-২-১১

'তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম (ব্রহ্মা), তিনিই তমঃ-শবল পরমাত্মা (শঙ্কর), তিনিই শুদ্ধ সত্ত্বময় ভগবান (বিষ্ণু)। ইহার উপরে আছেন বৈষ্ণবী শক্তি শ্যামা।

চতুর্ব্যূহ-বাদ ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত যে, যিনি একেশ্বরবাদী শিখ-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, সেই নিত্যানন্দ নানকও ইহাদের স্মরণ না করিয়া পারেন নাই।

একা মাঈ যুগতি বিয়াই
তিন চেলে পরমাণু।
একু সংসারী একু ভাণ্ডারী
একু লায়ে দীবাণু॥ —জপজী ৩০-১

শ্যামা আর তাঁহার তিন 'যমজ' সন্তান—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব।

হিন্দু সমাজের যাহা মূল আকর—সেই আঙ্গিরসবেদে চতুর্ব্যূহবাদের বীজ আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি।

ব্রহ্মবাদের প্রধান কথা এই যে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু—অপর সকলই মিথ্যা।

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥ —আচার্য শঙ্কর

নিত্য ও অনিত্যের, ব্রহ্ম ও জগতের, বিশেষতঃ ব্রহ্ম ও জীবের কি সম্বন্ধ, তাহাই বেদান্তের প্রধান আলোচনা। "কেবল ব্রহ্মই সত্য" এই ধারণাটি যাহার অধিগন্তব্য, সেই জীবের পৃথক্ সত্তা আছে কি না, এবং জীবের পৃথক সত্তা থাকিলে ব্রহ্মকে কেমন করিয়া অনন্ত বলা যায়, ইহাই বেদান্তের প্রধান সমস্যা।

দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—এই এক প্রশ্নেরই বিভিন্ন উত্তর।

জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতাও আছে আবার পরমেশ্বরও সর্বশক্তিমান—এই বিরোধের মীমাংসা সহজ নহে। কেহ বা পরমেশ্বরের শক্তিকে অস্বীকার করিয়া, কেহ বা জীবের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রাচ্য দর্শনের দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের বিতর্ককে যাহারা নিরর্থক দর্দুর-কোলাহলের পর্যায়ে ফেলেন, তাঁহারা দেখিবেন, বর্তমান শতাব্দীর পাশ্চাত্য দার্শনিকদের কাহারও কাহারও সিদ্ধান্ত আরও অদ্ভুত। তাহাদের কেহ

(Mc. Taggert) বলিয়াছেন, স্বাধীন জীবদের সংঘই ঈশ্বর, ঈশ্বরের পৃথক্ সত্তা নাই, থাকিলে জীবের স্বাধীনতার অবকাশ নাই। কেহ বা (Rashdall) বলিয়াছেন—পরমেশ্বর স্বাধীন জীবসভার সভাপতি, তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা কিছুই নাই। সভ্যগণের (জীবগণের) ক্ষমতাই তিনি পরিচালিত করেন এই মাত্র।

নানাবিধ মতবাদ হইতে এ কথা বুঝা যায় যে, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু হইলে জীবাত্মার পৃথক্ সত্তা কেমন করিয়া থাকিতে পারে, এই প্রশ্নটি এড়ান যায় না। আঙ্গিরস বেদ এই প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তাহা আমরা দেখিতে পারি। আঙ্গিরস বেদ বলিয়াছেন :—

শতং সহস্রং অযুতং ন্যর্বুদং
অসংখ্যেয়ং স্বং অস্মিন্ নিহিতং।
তদ্ অস্য ঘ্নন্তি অভিপশ্যত এব
তস্মাদ্ দেব রোচতে এষ এতত্॥ —আঙ্গিরস বেদ ১০-৮-২৪

'অসংখ্যেয় জীবাত্মা তাঁহাতে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া দীপ্তি পাইতেছে—তাহাদের মধ্য দিয়াই তিনি দীপ্যমান'।

অসংখ্য বিদ্যুৎ প্রদীপ জ্বলিতেছে—লাল, নীল, সবুজ, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, গোল, চৌকস, কত না বিচিত্র। সকলেরই পৃথক সত্তা আছে। কিন্তু একটি মাত্র বিদ্যুৎ-প্রবাহই তাহাদের প্রাণ, উহা না থাকিলে সকলেই নিভিয়া যাইবে। আবার প্রদীপ আছে বলিয়াই বিদ্যুৎপ্রবাহের সত্তা আমরা বুঝিতে পারি। প্রদীপের ভিতর দিয়াই বিদ্যুৎপ্রবাহ আত্মপ্রকাশ করে; জীবাত্মাই পরমাত্মার প্রকাশ, পরমাত্মাই জীবাত্মার প্রাণ।

ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান। প্রচলিত দার্শনিক সাহিত্যে আঙ্গিরস বেদের এই ঋক্‌টির তেমন আদর যে হয় নাই, তাহা আমাদের শোচনীয় বেদ-বিমুখতারই পরিচায়ক।

আঙ্গিরস বেদে ব্রহ্মপূজার নিদর্শন আমরা পাইলাম। এখন শঙ্করের চরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। ভক্তিযোগীরা বলেন যে, পরমেশ্বর নির্বিশেষ চৈতন্য-মাত্র নহেন।—তিনি হেয়-প্রত্যনীক এবং কল্যাণ-গুণাকর। এই বিশেষ (লক্ষণ) তাঁহাতে আছে। নতুবা ন্যায়-জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ ন্যায়-জ্ঞান-হীন ব্রহ্ম হইতে উচ্চস্তরের সত্তা হইত। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। যিনি ন্যায়ের সমর্থক, তাঁহাকে কঠোর হইতেই হয়, অন্যায়ের দণ্ড দিতেই হয়।

কঠোর যে ঈশ্বর, তিনিই পিনাকপাণি শিব। আঙ্গিরসবেদ তাঁহার নমস্কার করিয়া বলেন—

নমঃ সায়ং নমঃ প্রাতর্ নমো রাত্র্যা নমো দিবা।

ভবায় চ শর্বায় চ উভাভ্যাং অকরং নমঃ ॥ —আঙ্গিরসবেদ ১১-২-১৬

'তিনি কেবল ভব (স্রষ্টা) নহেন, তিনি শর্বও (সংহারকও) বটেন'।

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যদিও কঠোরতা পরমেশ্বরে আছে, তথাপি স্বরূপে তিনি প্রেমময়। জগতের আদি কারণ যিনি, তিনি যদি প্রেমময় না হইয়া থাকেন, তবে স্নেহ ও প্রেম মানুষ কোথা হইতে পাইল? সংহার-কর্তাতে তমসের আবেশ আমরা দেখি বটে, কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি শুদ্ধ সত্ত্বময়। হিংসা অপেক্ষা প্রেমের শক্তি বেশী, মিথ্যা অপেক্ষা সত্যের শক্তি প্রবল। মানুষ কখনও এমন হিংসুক হইতে পারে না যে কাহাকেও না কাহাকে না ভালবাসে; এমন মিথ্যাবাদী হইতে পারে না যে মনে মনে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা না রাখে। অ-বিকশিত-সত্ত্বই তমস—সত্ত্বই যথার্থ সত্তা। তাই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ষট্সন্দর্ভে বলিয়াছেন যে, যদিও ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু এই তিনজন এক পরমেশ্বরেরই বিভিন্ন প্রকাশ, তথাপি শুদ্ধ-সত্ত্বময় বলিয়া বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ দেবতা। ইহাকে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা ভাবিলে চলিবে না। বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ইহা বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, সত্ত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা।

আমরা আঙ্গিরসবেদে দেখিতে পাই, বরুণকেই শ্রেষ্ঠ দেবতা বলা হইয়াছে—

অয়ং দেবানাং অসুরো বিরাজতি।

বশা হি সত্যা বরুণস্য রাজ্ঞঃ ॥ ১-১০-১

'দেবতাদের মধ্যে "অসুর" বরুণই শ্রেষ্ঠ, তাঁহার আদেশই অমোঘ'।

এখানে ইন্দ্র অপেক্ষা বরুণের প্রাধান্যই খ্যাপিত হইল। বেদে যিনি ইন্দ্র—পুরাণে তিনিই শিব। বেদে যিনি বরুণ, পুরাণে তিনিই বিষ্ণু। বরুণের প্রাধান্য ঘোষণা করাতে বিষ্ণুর প্রাধান্যই ঘোষিত হইল।

যিনি বরুণ তিনিই বিষ্ণু, এটা অনুমানমাত্র নহে। আঙ্গিরস বেদ অকুণ্ঠিত ভাষায় এই তত্ত্ব রটনা করিয়াছেন।

বিষ্ণুং অগন্ বরুণং পূর্বহূতিঃ। —আঙ্গিরসবেদ ৭-২৫-১

'বরুণ-রূপী বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ পূজা পাইবার অধিকারী'।

বরুণই যে বিষ্ণুর পূর্বরূপ, ইহা আঙ্গিরসবেদে যেরূপ স্পষ্ট ভাষায় রটনা করা হইয়াছে বৈদিক সাহিত্যের অন্য কোথাও তাহা পাওয়া যায় না।

এ স্থলে ইহাও লক্ষণীয় যে হিন্দুশাখার "অসুর বরুণ" পার্শীশাখার "অহুর মঝদার"ই প্রতিরূপ। বাজ-জপে ব্যবহারের জন্য অহুর মঝদার যে একশতটি সংজ্ঞা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'বরুণ'-ও একটি নাম—৪৬-তম নাম। *

সে যাহাই হউক, আঙ্গিরস বেদে আমরা ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় বিষ্ণুপূজারও সমর্থন পাই এবং বিষ্ণুই যে শ্রেষ্ঠ দেবতা তাহারও উল্লেখ পাই।

বাকী রহিল শ্যামা মা—তাহা হইলেই চতুর্ব্যূহ পূরণ হয়। প্রেম কেবল হিংসাকে দূর করে না, হিংসাকে প্রেমে পরিণত করে। সাত্বিকতা মিথ্যাবাদীকে মারিয়া ফেলে না, তাহাকে সত্যবাদী বানায়। শুদ্ধসত্ত্বময় বিষ্ণুর যে-শক্তি এইরূপ তমসকে সত্ত্বে পরিবর্তিত করে, সেই বৈষ্ণবী শক্তিই যোগমায়া, পশুবলকেও যাহা কল্যাণের সেবায় প্রবর্তিত করে। সেই সিংহবাহিনীর আহ্বান আঙ্গিরসবেদে শুনিতে পাই।

সিংহে ব্যাঘ্রে উত বা পৃদাকৌ।
ত্বিষির্ অগ্নৌ ব্রাহ্মণে সূর্য্যে যা ॥ —আঙ্গিরসবেদ ৬-৩৮-১

সিংহবাহিনীর আহ্বানই আঙ্গিরস বেদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কারণ এইখানেই তন্ত্রশাস্ত্রের সূচনা। বৈদিক সাধনার দুইটি পরিণতি—পুরাণ এবং তন্ত্র। পুরাণের দোসর বলিয়াই তন্ত্রের নাম যামল (যুগল)। পুরাণ আত্ম-দানের এবং তন্ত্র (বা আগম) আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথ। এক গালে চড় দিলে আর এক গাল পাতিয়া দেওয়া পুরাণের পথ, আর আহন্তার গালে দুই চড় দেওয়া আগমের পথ। বৈষ্ণবের শাস্ত্র পুরাণ আর শাক্তের শাস্ত্র আগম। চৈতন্য এবং নানকে পুরাণের, এবং গুরু গোবিন্দে শাক্তের আদর্শ রূপায়িত। আঙ্গিরস বেদই আগম শাস্ত্রের আদি উৎস। যাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠার মূল তত্ত্ব জানে না, ব্যক্তিগত জীবনে আত্মত্যাগ কিন্তু জাতীয় জীবনে আত্ম-প্রসারের অপরিহার্যতা যাহারা উপলব্ধি করে নাই, তাহারাই আঙ্গিরস বেদকে মারণ-উচ্চাটন-বশীকরণের আকর বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে।

ঈশ্বর লাভের দুইটি পথ, একটি দেবযান আর একটি পিতৃযান। একটি পথ সাকারোপাসনাকে ভালবাসে, অপরটি নিরাকারোপাসনাকে পছন্দ করে।

---

* অথকেলেসরিয়া—যজনে বা নীরঙ্গ- পৃ—২৪।

একটি পথ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিতে চায়, অপরটি সমষ্টিগত সাম্যের উপর অধিক জোর দেয়। তন্মধ্যে দেবযানই আঙ্গিরস বেদের নির্বাচিত পথ।

মানুষ তাহার অন্তর্জীবনের কতটুকু অংশকে নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে, তাহা বলা সুকঠিন। কেহ হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই হিন্দুধর্মকে ভালবাসে, অপর কেহ মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই মুসলমানধর্মকে ভালবাসে। হিন্দুতন্ত্র ও ইসলামতন্ত্রের তুলনামূলক মূল্য বিচার করিয়া কয়জন লোক হিন্দুধর্ম বা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে? মানুষ ইহা ভুলিয়া যায়—পরিবেশের প্রভাব দেখিয়াও দেখে না। কিন্তু "একই ব্যক্তি বিভিন্ন পরিবেশের ভিতর জন্মগ্রহণ করিলে তন্ত্রান্তরকে নিজের ইষ্টমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিত"। শতকরা নিরানব্বই জন মানুষের পক্ষেই একথা খাটে। অতএব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দীক্ষা পরিবেশন দ্বারা মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য ধর্মচক্র গঠনের প্রয়োজন আছে।

আত্মরক্ষার জন্য সংঘবন্ধন অপরিহার্য। সংঘবদ্ধ দশজন মানুষ এক এক করিয়া একশত জনকে অবলীলাক্রমে সংহার করিতে পারে। ইহাই মুসলমান কর্তৃক হিন্দু-সমাজ ধ্বংসের ইতিহাস। আর কোন সদ্‌গুণের অভাবই হিন্দুতে নাই—কেবল সংঘনিষ্ঠার অভাবই তাহার লাঞ্ছনা ও দুর্দশার হেতু।

অথচ তাহারই গুরুগ্রন্থ অথর্ব-বেদ

'সভা চ মা সমিতিশ্‌ চাবতাম্‌' (৭-১২-১)

বলিয়া ধর্ম চক্রের আবশ্যকতা যেরূপ তারস্বরে রটনা করিয়াছেন, অন্য কোনও প্রেরিত পুস্তকে তাহা পাওয়া যায় না।

অথর্ব-বেদের প্রেরণাতেই গণধর গোবিন্দসিংহ দর্শ ও পৌর্ণমাসীতে দেবযান সভার ব্যবস্থা করিয়া বেদান্ত-তন্ত্রকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। স্থায়ী "সভা" গঠনের এবং পাক্ষিক "সমিতি"-র অধিবেশনের নির্দেশ আমরা অথর্ববেদ হইতেই পাইতে পারি।

পরন্তু চক্র অঙ্কিত করিতে হইলে একটি কেন্দ্র চাই। একটি গুরুগ্রন্থ না থাকিলে ধর্মচক্র গঠন করা যায় না। তাই বেদ বলিয়াছেন—

সমানঃ মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী। —ঋগ্বেদ, ১০-১৯১-৩

'তোমরা একই সমিতিতে মিলিত হইয়া একই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাসনা করিও'।

গুরুগ্রন্থের নাম অথর্ববেদ দিয়াছেন 'উচ্ছিষ্ট'—উত্তম শাস্ত্র (উৎ—শাস্+ক্ত)। আর "উচ্ছিষ্টে"র মাহমা কীর্তন করিয়া ধর্মচক্রের অপরিহার্যতাই সূচিত করিয়াছেন (১১-৭-১—১১-৭-২৬)।

কিন্তু দেবযানই হউক আর পিতৃযানই হউক, ইহারা হইল পথ মাত্র—লক্ষ্য নহে, উপায় মাত্র—উপেয় নহে। লক্ষ্য হইল মনুষ্যত্ব-লাভ, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। এই সার্বভৌম মনুষ্যত্ব কোন বিশিষ্ট দেশের কিংবা কোন বিশিষ্ট জাতির প্রতি পক্ষপাত দ্বারা মলিন নহে। ইহা নির্মল নির্মুক্ত বিশ্বজনীন প্রেম—মানুষ বলিয়াই মানুষকে ভালবাসা।

মাতা বসুন্ধরা দেবী, পিতা মম মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ মানবাঃ সর্বে, স্বদেশঃ ভুবনত্রয়ম্॥

এই সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী, এই "বৈশ্বানর-নিষ্ঠা" ছিল বলিয়াই আর্যের জাতীয়তা কখনও বিশ্বমানবতার পরিপন্থী হয় নাই। হিন্দু হিন্দু হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, পার্শী পার্শীরূপেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। হিন্দু পার্শীকে দ্বেষ করিতে শিখে নাই, পার্শীও হিন্দুকে দ্বেষ করিতে শিখে নাই। এক মনুষ্যেরই বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া তাহারা পরস্পরকে প্রেম করিতে শিখিয়াছে।

জাতীয়তা এবং বিশ্বমানবতার দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল বিশ্বামিত্রের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা জাতীয়তাকে বিশ্বমানবতার পরিপন্থী মনে না করিয়া, উহাকে বিশ্ব-মানবতা লাভের সহায়করূপে পরিবর্তিত করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই আর্যজাতি জগতের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিল। জাতীয়তা বনাম বিশ্বমানবতা রূপ সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই, উভয়েরই দাবী মিটাইতে পারে এরূপ কোনও দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়াই ইউরোপ একটি সনাতন কুরুক্ষেত্র, আর বিদ্বেষের বহ্নি রাবণের চিতার ন্যায় মুসলমানের বক্ষে নিরন্তর দহমান।

সত্য বটে রামচন্দ্র হিন্দু-জাতীয়তার এবং জরথুস্ত্র পার্শী জাতীয়তার দীক্ষাগুরু। কিন্তু জাতীয়তাবাদ অতিক্রম করিয়া অতি-জাতীয়তা (আন্তর্জাতিকতা) স্থাপন করিয়াছিলেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, এবং ইহাই স্মরণ করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন,

কিরাত-হূনান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কসাঃ।
আভীর-কঙ্কাঃ-যবনাঃ-খসাদয়ঃ॥ ২-৪-১৮

কাহারও পক্ষেই গীতোক্ত ধর্ম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবসমাজে প্রবেশ করিতে বাধা নাই। পরন্তু বিশ্বামিত্রের দৃষ্টিভঙ্গী আঙ্গিরসবেদেও যে অনুপলব্ধ নহে, তাহা আমরা অথর্ববেদের পঞ্চদশম অধ্যায় পাঠেই বুঝিতে পারি।

মাতা ভূমিঃ পুত্রো অ্হং পৃথিব্যাঃ। অথর্ববেদ (১২-১-১৭)

আমি পৃথিবীর সন্তান, সমগ্র পৃথিবীই আমার মাতৃভূমি।

হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যিনি পার্শীতন্ত্র দ্বারা নিতান্ত প্রভাবিত হইয়াছিলেন, সেই মহাকবি ইক্‌বাল ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

আরব ও চীন হামারা, হিন্দুস্তান হামারা।
ইসলাম হৈ হম বতন সারী দুনিয়া হামারা। —বাঙ্ এ-ডেরা

'আরব ও চীন আমার, হিন্দুস্থান তো আমার বটেই, ইসলাম (পার্শীতন্ত্র ?) আমাকে সার্বদেশিক করিয়াছে, সমগ্র বিশ্বই আমার'।

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর॥

—রবীন্দ্রনাথ।

'নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করলে নিজেকে প্রকাশ করাই যায় না। বীজ আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই মাটির ভিতরে আড়াল খোঁজে, ফল আপনাকে পরিণত করবার জন্যই বাহিরের দিকে একটা খোসার পর্দা টেনে নেয়।'

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।

অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥৮।১

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥৮।২

('তে ব্রহ্ম: তদ্বিদুঃ'—ইত্যাদি দ্বারা ভগবান অর্জ্জুনের কাছে প্রশ্নবীজ উপদেশ দিয়াছেন ; অতঃপর অর্জ্জুন প্রশ্নার্থ কহিতেছেন) অর্জ্জুনঃ উবাচ [অর্জ্জুন বলিলেন] কিম্ তৎ ব্রহ্ম [তুমি পুরুষোত্তমের যে ষট্‌পাদের উপদেশ দিয়াছ তাহার মধ্যে সেই প্রথম ব্রহ্ম-পাদটীর স্বরূপ কাহাকে বলা হয়] কিম্ অধ্যাত্মং [তোমার উপদিষ্ট দ্বিতীয় অধ্যাত্ম-পাদটীই বা কি] কিং কর্ম্ম [তৃতীয় কর্ম্ম-পাদটীই বা কি ?] হে পুরুষোত্তম [গীতায় এই সর্ব্ব প্রথম পুরুষোত্তম শব্দ আসিয়াছে ; এই পুরুষোত্তম-বস্তুরই দুইটী পাদ পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে পুরুষোত্তম নিজ মুখেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থানে পুরুষোত্তম-শব্দটীর প্রয়োগ বিশেষ অর্থদ্যোতক] অধিভূতং চ [এবং পুরুষোত্তমের চতুর্থপাদ অধিভূতই বা কি] প্রোক্তম্ [বলা হয়] অধিদৈবং কিং উচ্যতে [পুরুষোত্তমের পঞ্চমপাদ অধিদৈবই বা কাহাকে বলা হয় ?] অধিযজ্ঞঃ [পুরুষোত্তমের ষষ্ঠপাদ অধিযজ্ঞই] কঃ [কে ?] অত্র [বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে] কথং [কি প্রকারে ভাবিতে হইবে] অস্মিন্ দেহে [এই দেহে] হে মধুসূদন, প্রয়াণকালে চ [এবং মরণকালে] কথং [কি প্রকারে] জ্ঞেয়ঃ অসি [জ্ঞাত হইয়াছ] নিয়তাত্মভিঃ [পুরুষোত্তমের সহজ কলা বিধানে সংযত হইয়াছে দেহ হইতে আত্মা পর্য্যন্ত সব-কিছু যাহাদের, তাহাদের দ্বারা]।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ কি ? অধ্যাত্ম কি ? কর্ম্ম কি ? কাহাকে অধিভূত বলে ? কাহাকেই বা অধিদৈব বলা হয় ? অধিযজ্ঞ কে ? কি করিয়া তাহাকে ভাবিতে হয় ? হে মধুসূদন, বর্ত্তমান

পরিস্থিতিতে এই দেহে এবং প্রয়াণকালে নিয়তাত্মাগণ কেমন করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন? ৮।১-২

শ্রীভগবান্ উবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৮।৩

শ্রীভগবান উবাচ [এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবার জন্য শ্রীভগবান বলিলেন] অক্ষরম্ [যিনি ক্ষরিত হন না, immutable] পরমং [সকল বিশ্লেষণের চরম রূপ, সকল ন-এর ঘন স্বরূপ ; পরমং-পদটী অক্ষরের বিশেষণ। সাংখ্যের 'অক্ষর' ও অদ্বৈতবাদী বেদান্তের 'অক্ষর' যে অক্ষরে সমন্বিত, তিনিই গীতার 'পরম' অক্ষর পুরুষোত্তম] ব্রহ্ম [পুরুষোত্তম-তনুরই আভা হইতেছেন অদ্বৈতবাদী বেদান্তের ব্রহ্ম, যদদ্বৈতং ব্রহ্ম উপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা— উপনিষদে যাহা অদ্বৈত ব্রহ্ম, তাহা পুরুষোত্তমের তনুর আভা। ইনিই গীতার শুদ্ধতত্ত্ব] স্বভাবঃ [স্বস্য পুরুষোত্তমস্য ভবনম্ ('হওয়াই' Becoming) হইতেছে স্বভাব ; প্রকৃতির বুকে পুরুষোত্তমের জীবভূত অংশ-সত্তা, অংশ-অভিপ্রায়, অংশ-ক্রিয়া, অংশ-লীলাই স্ব-ভাব ; পুরুষোত্তম-স্বভাব এই জীবের স্বভাবেও তাই আত্মভাব ও অনাত্মভাবের সমন্বয় রহিয়াছে। সে এই দুই ক্ষেত্রকেই সমন্বয় করিয়া চলিতেছে ; তাই স্বধর্ম্মের অর্থ হইতেছে আত্মধর্ম্ম ও অনাত্মধর্ম্মে সমন্বয় রূপ দিব্য পুরুষোত্তম-ধর্ম্ম] অধ্যাত্মম্ উচ্যতে [অধ্যাত্ম-শব্দ দ্বারা উক্ত হয় ; কেননা এই পুরুষোত্তম-স্বভাব আত্মাকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মা পর্য্যন্ত সবটুকু সমন্বয়কে অধিকার করিয়াই প্রবৃত্ত হইতেছে] ভূতভাবোদ্ভবকরঃ [যাহা 'ভূত' (স্বতঃসিদ্ধ সত্য), তাহাকেই 'ভাব' রূপে উদ্ভব করিবার উপযোগী যাহা-কিছু তাহাই ভূত-ভাবোদ্ভবকর। জীবের সব খানি অতীত তাহার বর্ত্তমান রূপে জমাট বাঁধিয়া আছে ; সেই জমাট-বাঁধা অনন্ত অতীতকে (ভূতকে) জ্ঞানের ভিতর জাগাইয়া তুলিয়া বর্ত্তমান ভাবের সঙ্গে, বর্ত্তমান আবেষ্টনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া অভিনব 'ভাবে' চলিবার উপযোগী যাহা-কিছু] (সেই যাহা কিছুটা কি, তাহাই বলিতেছেন) বিসর্গঃ [হোম, নিজকে বিসর্জ্জন করা, দিব্যরূপে রূপান্তরিত হইবার জন্য প্রেরণা দান করা] কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ [কর্ম্ম-সংজ্ঞাদ্বারা অভিহিত ; এই বিসর্জ্জনই জীবের 'কর্ম্ম'। যজ্ঞই মানুষের কর্ম্ম ; তাই তো শ্রুতি বলিয়াছেন—"পুরুষো বৈ যজ্ঞঃ"—পুরুষের জীবনের সব-কিছু কর্ম্মই যজ্ঞ।

আমি সত্য বাস্তব যাহা, আমার সেই সত্য বাস্তব সত্তাকে প্রকৃতির সব জটিলতা কুটিলতার বুকে জ্ঞান বিজ্ঞানে আস্বাদন করা বা অভিজ্ঞান লাভ করাই কর্ম্মের নিগূঢ় অর্থ]।

শ্রীভগবান কহিলেন, পরম অক্ষরই ব্রহ্ম ; স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলা হয় ; ভূতকে ভাবরূপে উদ্ভব করার যোগ্য যে বিসর্জ্জন, তাহাই কর্ম্ম সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত। ৮।৩

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥ ৮।৪

অধিভূতং [ভূত অর্থাৎ প্রাণী সমূহকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান, অধিভূত] (অধিভূত কে ?) ক্ষরঃ ভাবঃ [যাহা-কিছু ক্ষরিত হয় তাহাই ক্ষর ; ক্ষরণশীল পদার্থই ক্ষরভাব] পুরুষঃ চ [এবং অন্তর্য্যামী, পরমাত্মা পুরুষই—ইহাদ্বারাই বিশ্বের সব-কিছু স্বয়ম্পূর্ণ, তাই তিনি পুরুষ ; ইনি সকলের অগ্রে গমন করেন, তাই বলিয়াও তিনি পুরুষ, 'পুর্ অগ্র গমনে' ; যিনি সকলের পুর্ব্বে মন্দ পাপ পুড়িয়া ছিলেন, তিনিই পুরুষ—'স যৎ পুর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষঃ"—বৃঃ আঃ ১।৪। যিনি হৃদয় পুরে শয়ন করিয়া আছেন—'পুরি শেতে—তিনিও পুরুষ। 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি'—ইনিই গীতার গুহ্যতর। উত্তম পুরুষই পরমাত্মা, ঈশ্বর। 'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মাঃ উদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি অব্যয় ঈশ্বরঃ॥' ঈশ্বরই গুহ্যতর তত্ত্ব, তাহা ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতম্ গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্ ময়া"—এই বাক্য দ্বারা বলিয়াছেন। "য আত্মা অন্তর্য্যামী পুরুষঃ সোঽস্য অংশবৈভবঃ"—যিনি শাস্ত্রে আত্মা অন্তর্য্যামী পুরুষ বলিয়া কথিত, তিনি পুরুষোত্তমের অংশ-বিভূতিই ; কেননা, ইহার যাহা-কিছু ক্ষেত্র, সব অন্তরে, বাহিরের ক্ষেত্রে ইহার কোনও অধিকার নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহার বিভূতি বর্ণনা প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম শ্লোকে বলিতেছেন—'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ"—সর্ব্বভূতগুহাশয়স্থিত আত্মাই 'আদর্শঃ', ইহা আমার বিভূতি] অধিদৈবতম্ [সর্ব্বদেবশক্তিকে অধিকার করিয়া স্থিত, অধিদৈবত] অধিযজ্ঞঃ [যজ্ঞময় পুরুষের সব যজ্ঞ-কর্ম্মকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান যজ্ঞেশ্বর, মূর্ত্তিমান "কাল"। 'রূপভেদাস্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে। ভূতানাং মহদাদীনাম্ যতো ভিন্নদৃশাং ভয়ম্॥ যোঽন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ। স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ

কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥' ভাগবত, ৩।২৯।৩৭।৩৮—মহদাদি ভূত সমূহের বিবিধ রূপভেদের আস্পদই কাল বলিয়া অভিহিত হন। এই কাল হইতেই ভিন্নদৃক্‌গণের ভয়। অখিলাশ্রয় যিনি ভূতসমূহের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভূতসমূহদ্বারাই ভূতসমূহকে ভক্ষণ করেন, তিনিই বিষ্ণুনামা অধিযজ্ঞ, সকল বশীকরণ-কামীদের প্রভু কাল। দেহকে আশ্রয় করিয়াই সম্পাদিত হয় যজ্ঞ-কর্ম্ম, সেই যজ্ঞ-কর্ম্মের ঈশ্বর যজ্ঞেশ্বরের কৃপায় দেহ ভগবদ্ভাবে রূপান্তরিত হয়। জীবনে যখন পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন-রূপ পরম যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে, সেদিন দেহ গড়িয়া উঠিবে দিব্য পুরুষোত্তমতনুতে। এই যজ্ঞের দেবতা যজ্ঞেশ্বর পুরুষোত্তম স্বয়ম্। তাই বলিতেছেন] অহম্ এব [আমিই যজ্ঞেশ্বর। পুরুষোত্তম যে একান্ত অধিযজ্ঞই, তাহা নয়; তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অধ্যাত্ম, তিনিই কর্ম্ম, তিনিই অধিভূত, তিনিই অধিদৈব। একমাত্র তাঁহাকেই এই ছয় পাদে (dimension) সমভাবে সমন্বয় ভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং উপলব্ধি করিতেও হইবে। ইনিই গীতার সর্ব্বগুহ্যতম তত্ত্ব, পুরুষোত্তম] অত্র দেহে [বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে স্থিত এই দেহে সকলের সঙ্গে অভেদ-প্রভেদ ভাবে] হে দেহভৃতাং [দেহভরণকারীদের মধ্যে] বরঃ [শ্রেষ্ঠ; তুমি দেহকে ভরণ করিতেছ পুরুষোত্তম সেবার জন্য, দেহকে যজ্ঞের হবিরূপে পুরুষোত্তম যজ্ঞে বিসর্জ্জন দিবার জন্য; তাই তোমার দেহভরণ সার্থক]।

ক্ষরণশীল বস্তুমাত্রই অধিভূত, পুরুষই অধিদৈবত, হে দেহভরণকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ, যজ্ঞেশ্বর। ৮।৪

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৮।৫

(প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়ঃ —এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন) অন্তকালে চ [মরণকালেও] মাম্ এব [সকল অন্তকে হজম করিয়া, অন্তকে অতিক্রম করিয়া, অনন্তে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ অনন্ত আমাকেই। স্মরন্ [পুর্ব্বানুভূত বিষয়স্বরূপ আমাকে যেমন তেমনটী যথাযথ ভাবে স্মরণ করিতে করিতে] মুক্ত্বা [পরিত্যাগ করিয়া] কলেবরং [শরীর] যঃ [যিনি] প্রয়াতি [প্রয়াণ করেন] সঃ [তিনি] মদ্ভাবং [তাহার স্বরূপভূত মৎ সত্তা, মৎ স্বভাব, মদ-ভিপ্রায়] যাতি [প্রাপ্ত হয়] ন অস্তি [নাই] অত্র [এ সম্বন্ধে] সংশয়ঃ [পাইবে কি না পাইবে এরূপ সংশয়]।

মরণ সময়ে অনন্ত আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ

করিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ৮।৭

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৮।৬

[ইহা যে শুধু আমার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তাহা নয় ; ইহা সর্ব্বসাধারণের নিয়ম] যং যং বা ভাবং অপি [যে কোনও ভাবই হউক না কেন] স্মরন্ [স্মরণ করিতে করিতে] ত্যজতি [ত্যাগ করে] অন্তে [প্রাণবিয়োগ কালে কলেবরং [শরীর] তং তং [স্মৃত সেই সেই ভাবই] এবৈতি [জীব প্রাপ্ত হয়] হে কৌন্তেয় সদা [সর্ব্বকালে] তদ্ভাব-ভাবিত [তাহার ভাব তদ্ভাব, তদ্ভাব দ্বারা ভাবিত ; যে যাহাকে যেভাবে ভাবনা করে, ভাবনার ফলে সে তাহাই বনিয়া যায়, যেমন কীট পেশস্কৃতকে ধ্যান করিতে করিতে পেশস্কৃতই বনিয়া যায়]

হে কৌন্তেয়, অন্তকালে যে যে-ভাবকে স্মরণ করিয়া করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে সেই ভাববিশেষের ভাবনায় ভাবিত হইয়া সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হয়। ৮।৬

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনো বুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৮।৭

[যে হেতু যে যাহা ভাবে, সে তাহাই হয়] তস্মাৎ [অতএব] সর্ব্বেষু কালেষু [সর্ব্বকালে, দিনক্ষণ না বাছিয়া, শুক্লগতি, কৃষ্ণগতির অপেক্ষা না করিয়া] মামনুস্মর [প্রকৃতির উপাশ্রিত হইয়া যে-স্মরণ আমি প্রকৃতির এবং আমার করিতেছি, সেই স্মরণের অনুগমন করিয়া, জীবনের সব অণুতে অণুতে আমার সঙ্গে তোমার সহজ উপাধি-বিধুর স্বরূপসিদ্ধ প্রগাঢ় মিলন স্মরণ কর] যুধ্য চ [এবং যুদ্ধ কর ; জীবনের ঘটনাই যুদ্ধময় ; সর্ব্ব ঘটনাকে এইভাবে যজ্ঞে পরিণত করিয়া গড়িয়া যাও] ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ [পুরুষোত্তম আমিতে অর্পিত হইয়াছে মন বুদ্ধি যাহার, সে] মাম্ এব [আমাকেই] এষ্যসি [প্রাপ্ত হইবে] অসংশয়ঃ [নিঃসংশয়ে]।

সেই কারণে সকল সময় আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি পুরুষ নিঃসংশয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৮।৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮।৮

(আরও বক্তব্য এই যে) অভ্যাসযোগযুক্তেন [চিত্ত মধ্যে বিরুদ্ধী-ভূত এক আধারেতে তুল্য প্রত্যয়বৃত্তিলক্ষণ অথচ বিলক্ষণ প্রত্যয়ারহিত যে অভ্যাস, সেই অভ্যাসরূপ যোগদ্বারা (উপায় দ্বারা) যুক্ত, ব্যাপৃত] চেতসা [যোগীর চিত্ত দ্বারা] নান্যগামিনা [অনন্য ; অন্যবৃত্তিকে বিষয়ান্তরে যাওয়াই যাহার শীল নয়, এমন নান্যগামী] পরমং [পরা প্রকৃতির ভর্তা ; পরা মা অর্থাৎ শক্তি যাহার, তিনিই পরম] দিব্যং [জ্যোতিঃঘন, ক্রীড়াময়] যাতি [প্রাপ্ত হন] হে পার্থ অনুচিন্তয়ন্ [যে স্মরণ আমি প্রকৃতিকে করিতেছি এবং প্রকৃতির ভিতর দিয়া নিজের করিতেছি, সেই স্মরণের অনুবর্তন করিয়া জীবনের সবটুকু দিয়া চিন্তা করিতে করিতে]

হে পার্থ, অনন্য ও অভ্যাসযোগযুক্ত চিত্তদ্বারা অনুচিন্তন করিতে করিতে যোগী দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ৮।৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্ অণোরণীয়াংসমনুস্মরেৎ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৮।৯

(কি প্রকার বিশেষণযুক্ত পুরুষকে প্রাপ্ত হয়, তাহাই বলিতেছেন) কবিং [কবিকে ; সৃষ্টির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ক্রমগুলি যাহার অনুভূতিতে প্রকট হইয়াছে, তিনিই কবি] পুরাণম্ [চিরপুরাতন ও চির নবীন] অনুশাসিতারম্ [সকল শাসক ও শাসিতদের দ্বন্দ্বমোহ ভাঙ্গিয়া শাসিতদের মধ্যে নিজকে হোম-করিয়া, তাহাদের অঙ্গ নিংড়াইয়া শাসিতদেরও শাসিতরূপে অনুশাসন প্রদাতা] অণোঃ [রাগদ্বেষ স্তরের অণু হইতেও] অণীয়াংসম্ (অণীয়ানকে ; এই অণীয়ান্ স্থূলের বিপরীত অণু নয় ; রাগদ্বেষের স্তরে যাহা অণু, তাহাও পুরুষোত্তম স্তরের তুলনায় স্থূলই ; অণীয়ান্ শব্দদ্বারা পুরুষোত্তম স্তরকেই ইঙ্গিত করিতেছেন] অনুস্মরেৎ [জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্মরণ করেন] যঃ [যিনি] সর্বস্য [সকলের] ধাতারম্ [বিশ্বময় পুরুষোত্তম নববিধানের প্রবর্তক, ধারক ও পালক] অচিন্ত্যরূপম্ [কোনওরূপ চিন্তাপ্রণালীর ছকের মাঝেই যিনি নিঃশেষে ধরা পড়েন না] আদিত্যবর্ণম্ [আদিত্যের মত নিত্য চিদানন্দ প্রকাশরূপ বর্ণ যাহার, সেই আদিত্যবর্ণকে] তমসঃ [মিথ্যাজ্ঞানময় দ্বন্দ্বমোহে বিদ্ধ তমসাচ্ছন্ন রাগদ্বেষস্তর হইতে] পরস্তাৎ [ও-পারে, প্রাণবল্লভ পুরুষোত্তম-স্তরে]

অন্ধকারের ও-পারে আদিত্যবর্ণ, অচিন্ত্যরূপ, সকল নববিধানের প্রবর্তক, অণু হইতেও অণীয়ান্ অনুশাসিতা, পুরাণ, কবিকে সব দিয়া যিনি স্মরণ করিয়া থাকেন। ৮।৯

—ক্রমশঃ

বুনিয়াদী শিক্ষার সংস্কার সাধন

মৃত্যুঞ্জয় রক্ষী

কর্ম মাধ্যমে শিশু শিক্ষা বা Activity Education যে শিশু শিক্ষার সবচেয়ে উন্নততর সংস্করণ, তা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে অনেক আগেই স্বীকৃত হ'য়েছে ও তার ক্রমপ্রসারও ঘটছে সে সব দেশে। কিন্তু মাত্র ১০।১২ বছর আগেও আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ এদেশে ঐ শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে হতাশ ছিলেন। গান্ধীজী প্রথম বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা প্রকাশ করার পর একদল শিক্ষাবিদ্ তাঁর এই পরিকল্পনার মধ্যে আমাদের দেশের শিশুদের জন্য ব্যাপক আকারে কর্ম মাধ্যমে শিক্ষাপদ্ধতি চালু করার সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। তাঁরা এর আগে কর্মকেন্দ্রী শিশুশিক্ষার পাশ্চাত্য সংস্করণকেই এদেশের শিশুদের জন্য চালু করার কথাই ভাবতেন। কিন্তু ঐ শিশুশিক্ষা রীতিমত খরচের ব্যাপার—তাই এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পক্ষে অসুবিধা জনক। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রী এবং তার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ব্যয় বাহুল্যবর্জ্জিত—সুতরাং আমাদের দেশের পক্ষে অনুকূল। তাছাড়া এর সঙ্গে আমাদের দেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও সামাজিক চিন্তাধারার মিল আছে। সুতরাং এই শিক্ষাপদ্ধতি যে আমাদের দেশের শিশু সাধারণের উপযোগী বলে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল অন্য ভাবে। গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে অভিনব মতবাদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ও যাকে একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদে পরিণত করে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন—তাঁর এই নূতন আবিষ্কারকে (বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতিকে) তিনি সেই দার্শনিক মতবাদসম্পৃক্ত করে প্রচার করলেন। ফলে—বুনিয়াদী শিক্ষা ও সেই দার্শনিক মতবাদ এমন ভাবে ওতঃপ্রোত সংযুক্ত হয়ে গেল যে, জনসাধারণ থেকে শিক্ষাবিদ্‌গণ পর্য্যন্ত দুটির ভাগ্যকে এক সঙ্গে জড়িয়ে দিলেন,—বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির ভালমন্দ গান্ধীজীর দার্শনিক মতবাদের ভালমন্দ বিচারের নিক্তিতেই বিচার্য্য হয়ে দাঁড়ালো। আজ রাষ্ট্রের কর্ণধার থেকে জনসাধারণ—কেউই গান্ধীজীর দার্শনিক মতবাদকে

পুরাপুরি মেনে নিচ্ছেন না, আর তাই বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধেও জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধার অভাব ঘটেছে। শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে গুণাগুণ বিচার না করে এই ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে এক কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ফলে শিক্ষা জগৎই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—কারণ এই শিক্ষাপদ্ধতির এমন কতকগুলি দিক আছে যা আমাদের দেশের শিশু শিক্ষায় সত্যই সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা বহন করে। এখানে গান্ধীবাদের সঙ্গে বিযুক্তভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার সেই দিকগুলি আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে চাই।

কর্ম্মকেন্দ্রী শিশু শিক্ষার দুইটি মহত্ত্ব (১) ইহা শিশুর স্বাভাবিক প্রেরণা কর্ম্মচাঞ্চল্যের অনুকূল শিক্ষাপদ্ধতি, সুতরাং মনস্তত্ত্ব সম্মত; (২) ইহা শিক্ষাকে কর্ম্মমুখীন করে। এজন্য শিক্ষা ফলপ্রসূ হয় ও শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্ব্বতোমুখী স্ফুরণ ঘটায়। বর্ত্তমানে শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাজ কর্ম্মের যোগ না থাকায় শিক্ষিতের মধ্যে যাঁরা লেখাপড়ার কাজকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন, তাঁদের শিক্ষাটাই জীবনের কাজে লাগে—যাঁরা সে সুযোগ হ'তে বঞ্চিত হ'ন, তাঁরা শিক্ষাকে নেহাৎ পোষাকী জিনিষ করে রাখতে বাধ্য হ'ন। হয়তো তাতে সাধারণ মনুষ্যত্বের কিছু বিকাশ ঘটে ও জীবনকে অপেক্ষাকৃত আনন্দময় করে কিন্তু বিশেষ ব্যবহারে না লাগায় তার স্থায়িত্ব ঘটেনা। শুধু তাই নয়, জীবনের যে অংশটা ঐ শিক্ষা লাভের জন্য ব্যয় করা হয়, সেই সময়টা কর্ম্ম জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে তাদের কর্ম্মাগ্রহ ও কর্ম্মকুশলতা খর্ব্বিত হয়। এজন্যই অনেকে মনে করেন যে, যাদেরকে খেটে খেতে হ'বে তাদের পক্ষে বিদ্যার্জ্জন না করাই ভালো। বস্তুতঃ আজ যে বয়স্কশিক্ষার কাজ অগ্রসর হ'চ্ছেনা তার প্রধান কারণই- জনসাধারণের এই বিশ্বাস যে, শিক্ষা কর্ম্মাগ্রহ ও কর্ম্মকুশলতার পরিপন্থী। লেখাপড়া কাজে লাগে এমন জীবিকার সংখ্যা আজও দেশে খুব কম— কাজেই শিক্ষাবিস্তার কিছুতেই এগোতে চায় না। বুনিয়াদী শিক্ষার কাজের সঙ্গে শিক্ষার বিরোধ তো নাই-ই—বরং এই শিক্ষা কর্ম্মাগ্রহ ও কর্ম্মকুশলতার পরিপোষক। সুতরাং এই শিক্ষা বিস্তার দ্বারা ঐ সমস্যাটির সমাধান হ'বে। পাশ্চাত্ত্যের Activity Education জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ কাজের মাধ্যমে হয় না—কাজেই তার এই বিশেষ গুণটি নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষার সব চেয়ে বড় বাধার কথা আগেই বলেছি। বিকেন্দ্রিত সমাজ ও অর্থনীতির চিন্তা গান্ধীবাদের প্রধান কথা এবং আজকের শিক্ষিত

লোকের খুব কম লোকই এই চিন্তা ধারায় বিশ্বাস রাখেন। গান্ধীজীর বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি ও সমাজ চিন্তার প্রধান প্রতীক হ'চ্ছে চরকা ও খদ্দর এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর অনুপ্রেরণাতে ও অন্যান্য কতকগুলি সুবিধার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষাতে কাতাইকে অন্যান্য কাজের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এতে করেই জনসাধারণের মনে এই শিক্ষা সম্বন্ধে বেশী সমালোচনার ভাব জেগেছে। আজকের দিনে কি চরকা তাঁত প্রভৃতির দ্বারা দ্রব্য উৎপাদন—অর্থাৎ বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা লাভজনক? এই প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই তাদের মনে উঠে ও সমগ্র শিক্ষাপরিকল্পনার প্রতিই মন সন্দেহাকুল হয়। এইখানে তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে বিলাতী Activity Educationএ শিশুরা ঘুড়ি তৈরী, খেলনা তৈরী কাজের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু তারা বড় হ'য়ে ঘুড়ি তৈরী বা খেলনা তৈরীকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে-না—তেমনি চরকা কাটার মাধ্যমে যে শিশু লেখাপড়া শিখবে, সেও চিরকাল সুতাই কাটবে এটা সত্য নয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও ভাবতে হবে আমাদেরকে। যখন আজ উৎপাদন যন্ত্র হিসাবে চরকা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি এবং তার অদূর সম্ভাবনাও আজ নেই, তখন বুনিয়াদী শিক্ষা কর্ম্মীগণেরও এই অহেতুক চরকা কেন্দ্রিকতা ছাড়াই কর্ত্তব্য। চরকা থাকে থাকুক—কিন্তু আর পাঁচটা কাজের মত সেটা থাকুক—অধিক প্রাধান্য দেবার প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে তবে কি আমরা কাজকে মাত্র শিক্ষার বাহন হিসাবেই দেখবো ও বিলাতী activity education-এরই সস্তা সংস্করণ চালু করার চেষ্টা করবো বুনিয়াদী শিক্ষার নামে? তা কেন। আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয় ছোট খাট কাজগুলি—("আমাদের" অর্থে এখানে সহরের লোক নয়—সর্ব্বসাধারণ) সব কলে হ'বে, এমন দিন আসতে শুধু আমাদের দেশে কেন—অগ্রসরশীল ইংল্যাণ্ড আমেরিকাতেও অনেক দিন দেরী আছে। আজ আমরা ঐ সব কাজের জন্য কতই না পরমুখাপেক্ষী। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ঐ সব কাজই শিশুরা সাধারণ ভাবে কিছুটা শিখে নিতে পারলে তাদের জীবন সমৃদ্ধই হবে; সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মকেন্দ্রী শিক্ষা ব্যয়বাহুল্য-বর্জ্জিত ও উন্নত ধরণের হবে। বাগানের কাজ, প্রাথমিক ধরণের চামড়ার কাজ, ছুতারের কাজ, কামারের কাজ—জুতো সেলাই হ'তে চণ্ডীপাঠ জীবনের প্রয়োজনীয় সবরকম কাজেরই ছোটখাট কর্ম্মশালা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে থাকুক এবং জীবনের প্রয়োজন বুঝেই শিশুরা ঐ কাজগুলি শিখুক। তার মাধ্যমেই

তাকে শিক্ষা দেওয়া হোক। তাদের কাটারীটি পাজিয়ে নিতে হ'বে—তারা বিদ্যালয়ের ছোট কামার শালে তা করে নিক—সেটির ধার দিয়ে নিক তাদের সান যন্ত্রে—হাতল লাগিয়ে নিক তাদের ছুতার শালে। তাদের নিজের খাতা বই তারা বাঁধাই করুক, তাদের জামা তারা রীপু ও সেলাই করুক। এই সব ছোটখাট কাজ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় দেবে বাড়িয়ে, আর তার সহায়ে শিক্ষাদান কাজ হ'বে সহজ ও স্বাভাবিক। এই বুনিয়াদী শিক্ষার সার্থকতা সহজেই জনসাধারণ বুঝতে পারবে বলেই মনে করি। অথচ এই কাজে শিশুর বাস্তব কর্মে আগ্রহ, নাগরিকতা বোধ প্রভৃতি সব গুণেরই বিকাশ হ'বে। বিদ্যালয়ে চরকা চালালেই যে বিকেন্দ্রিত সমাজ ব্যবস্থা এনে দেওয়া যাবে তা নয়—তার জন্য অনেক টাটা বিড়লা ইস্পাহানী প্রভৃতি অনেক কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে লড়তে হ'বে।

যাইহোক আমরা গান্ধীজীর শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বড় অবদানের শ্রেষ্ঠ দিকটিকে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হই—যা আমাদের উত্তর পুরুষের জীবনকে করবে উর্বরতর ও মহত্তর।

"কবি বলেন, 'চরাচর সম্বন্ধে তাঁরা (আমাদের দেশের মণীষীরা) যে 'জগৎ' ও 'সংসার' শব্দ ব্যবহার করচেন, তাতে তো গতিই বুঝায়। মায়াবাদীরা অবশ্য সেইকারণেই জগৎ ও সংসারকে মায়া বলেচেন, কিন্তু বেদে সত্যের যে মহণীয় নাম 'ঋত' তা'তো 'ঋ' ধাতু হতেই নিষ্পন্ন। 'ঋ' অর্থই তো গতি।...

......কাজেই পরম সত্যকে 'চলচে' ও 'চলচে না' এই দুইই বলা চলে। উপনিষৎ তাই বলেচেন, তা চলচে, তা চলচে না।"

—বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, ক্ষিতিমোহন সেন

শ্রীনিত্যগোপাল জন্মশতবার্ষিকী

স্মৃতিপূজার প্রস্তুতি

৫

প্রাণ-ধারা

"All things are in a state of flux.'—Heraclitus

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী প্রাণের ভাষায় বাজিত ; তাই তাহা দেবতা বুঝিত মানুষ বুঝিত, পশুপক্ষী বুঝিত। যমুনা সেই বাঁশীর তানে উজান বহিত, পৃথিবী রোমাঞ্চিত হইত, জড়ে প্রাণ স্পন্দন ফুটিয়া উঠিত, চেতনে স্তব্ধতা নামিয়া আসিত, জড় চেতন হইত, চেতন জড় হইত। শ্রীরাধা শুনিতেন, বাঁশী রাধা রাধা বলিয়া ডাকিতেছে, যশোদা শুনিতেন বাঁশী বাজিতেছে মা মা বলিয়া। বাঁশীর ভাষা ছিল সার্ব্বজনীন ভাষা, সর্ব্বকে আকর্ষণ করিবার মহামন্ত্র। বাঁশী ছিল সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী, জড় অজড়ের অন্তরে 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী'। এমন ভাষা শিখিবার জন্যই আজ বিশ্ববাসীকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। তবেই 'One World' গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে।

এই বাঁশীর ভাষা যাহার কাণে পৌঁছিয়াছে, তাহার জীবনের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তিকে, কার্য্যকে বিজয় করিয়া পরিপাক করিয়া বহিয়া চলিয়াছে প্রাণ-ধারা— 'বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্'। এই প্রাণধারা প্রবাহিত হয় 'প্রত্যক্ষ'কে আশ্রয় করিয়া, 'বর্ত্তমান'কে অবলম্বন করিয়াই। প্রাণধারা তাই প্রবর্ত্তন করিতে চায় বিশ্বের বুকে প্রত্যক্ষ ভজন বা বর্ত্তমান ভজন। এই প্রত্যক্ষ সম্বলকে আশ্রয় করিয়াই মানুষকে যাত্রা করিতে হইবে জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের পথে। অতীতের নিংড়ানো রসফলই বর্ত্তমান ; আবার বর্ত্তমানের বুকেই রহিয়াছে অনন্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। অতীত ভবিষ্যতের যোগসূত্রও ঐ বর্ত্তমান। বর্ত্তমানকে ধরিতে পারিলে, বর্ত্তমানকে জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহারই বুকে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যতের মহামিলন সম্ভব হইতে পারে। বর্ত্তমান অতীত ভবিষ্যতের সম্বন্ধাত্মক। বর্ত্তমান বর্ত্তমান থাকিয়াই অতীত ভবিষ্যৎ হইতে পারে যে স্তরে, সেই স্তরই 'Eternal present' পুরুষোত্তম স্তর। প্রাণ তাই বর্ত্তমান ক্ষণের ভজনা করিবার জন্য পাগল.

অন্ধকারের রাজ্য পাড়ি দিতে প্রাণ ছাড়া দ্বিতীয় অবলম্বনও আর নাই। মানুষের কাছে অতীত অতীত বলিয়াই অন্ধকার, ভবিষ্যৎ অনাগত বলিয়াই অন্ধকার। মানুষের 'প্রাণ' সম্বল ছিল বলিয়াই সে এই অন্ধকারের মাঝে আলোর সন্ধান করিতে পারে। প্রাণের আলোই বর্ত্তমান মানুষের সামনে একমাত্র আলো।

প্রাণ-ধারা প্রত্যক্ষ বা বর্ত্তমানকেই সর্ব্বপ্রধান মূল্য প্রদান করে। শ্রীনিত্য-গোপাল এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, 'আমরা প্রমাণ করিয়াছি—আকার, সাকার এবং নিরাকার এই তিনই সত্য। আমরা যে সাকার, তাহা স্পষ্টই বুঝিতেছি। আমাদের আকার আমরা আপনারাই দর্শন করিতেছি। অতএব সেইজন্য আকারাভাব স্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে প্রত্যক্ষের সঙ্গে যে যুক্তির সম্বন্ধ আছে, আমরা সেই যুক্তিই বিশ্বাস করি। ,সোঽহম্ঽ' অর্থাৎ 'আমি সেই' এবং 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ 'তুমি সেই' আনুমানিক যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে ; কিন্তু আমি-সেই বা 'সোঽহম্', 'আমি-শিব' বা 'শিবোঽহম্', 'আমি-বিষ্ণু' বা 'অহম্ বিষ্ণুঃ' বলিতে পারি ; কিন্তু 'আমি-সেই' বা 'সোঽহম্' জ্ঞানদ্বারা বুঝি না।……উহা তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বুঝিতে হয়। যদি বল, আত্মজ্ঞান লাভ হইলে 'আমি-সেই' বা 'সোঽহম্' বুঝি—যদি বল, আত্ম জ্ঞান লাভ হইলে 'তুমি-সেই' বা 'তত্ত্বমসি' বলার তাৎপর্য্য বুঝিবে, তাহা তোমার বলা উচিত নহে। কারণ অদ্বৈতমতানু-সারে আত্মার বা ব্রহ্মের সহিত আমি-আমার বা তুমি-তোমার প্রভেদ না থাকিলে, আমি-আত্মা বা আমি-ব্রহ্ম, তুমি-আত্মা বা তুমি-ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমার এবং তোমার অজ্ঞান থাকিতে পারে না। তাহা হইলে আমি-তুমি-আত্মার নিয়ত 'সোঽহম্' এবং 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান থাকা উচিত। তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে কখনই ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নহে।'—সিদ্ধান্তদর্শন, পৃঃ ২৬২—২৬৬। আমি-তুমি-আত্মার বাস্তব প্রভেদকে একদল দার্শনিক আনুমানিক যুক্তিদ্বারা অস্বীকার করিয়া একান্ত অভেদমূলক বস্তুজ্ঞানের কথাই শুনাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিত্যগোপাল বলিতেছেন প্রভেদকে প্রভেদ রাখিয়া অভেদ স্থাপনের কথা। তাই তিনি লিখিয়াছেন, আমি অভেদবাদীও বটে, প্রভেদবাদীও বটে।' প্রভেদ সত্যের কিছুই প্রকাশ করিতেছে না, অভেদই শুধু সত্যার্থপ্রকাশক—ইহা ধরিয়া লইয়াই প্রভেদকে উড়াইয়া দিবার জন্য 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত আনুমানিক

যুক্তির আশ্রয় ইহারা নিয়াছেন। ইহাতে যুক্তি কল্পনা গৌরব দোষে দুষ্ট হয়। কেমন করিয়া একান্ত 'নির্ম্মল' মলিনতাযুক্ত হইল, কেমন করিয়াই বা এক বহু হইল, নির্ব্বিকার বিকারী হইল—ইহার কোনও সদুত্তর ইহাদের যুক্তিতে মেলে না, যে জন্য অনির্ব্বচনীয়তার আশ্রয় নিতে ইহারা বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন—'বস্তু দুই। বোধে এক।'

বাস্তবের ক্ষেত্রে আমি-তুমি-তিনি সর্ব্বতোভাবে কত পৃথক্! সেই পৃথকত্বকে বাদ দিয়া অনুমানের পথে চলিলে প্রতি পদবিক্ষেপেই বাস্তবের সঙ্গে ঠোকর খাইতে হয়, বাস্তব প্রতিমুহূর্ত্তেই পথ আগুলিয়া দাঁড়ায়। তখন বাস্তবকে 'মিথ্যা' বলিয়া 'চোখ বুজিয়া' বাস্তবকে অস্বীকার করা ছাড়া পথ থাকে না; অথচ অভিজ্ঞতায় প্রমাণিতও হইয়াছে যে, রাজহংসদ্বয়ের সাহায্যে আকাশপথে মানসসরোবরগামী কচ্ছপের মত ধরার বুকে পড়িয়া চুরমার হইবার মত কত মহান মহান মানুষ 'আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্তি অধঃ'। আজ ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া নূতন করিয়া সব দেখিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মাটীর দাবী আকাশের দাবীর মতই সত্য। মাটীর দাবী একান্তই 'মায়া' নয়, একান্ত মিথ্যা নয়। মিথ্যা হইলে উহা কাহাকেও বিব্রতও করিতে পারিত না। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন: 'মিথ্যা যাহা, তাহা নাই। তোমার মতে মায়া মিথ্যা, সুতরাং তাহা নাই। সুতরাং তাহা কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারে না।' —সিদ্ধান্তদর্শন, প্রথম সিদ্ধান্ত। জীব যে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিলে মুক্তিরও প্রয়োজন অস্বীকৃত হয়। মুক্তি যখন প্রয়োজন, তখন বন্ধন অবশ্যই আছে, এবং তাহা সত্য। এই কল্পনাকে এড়াইতে চাহিলে বা আনুমানিক যুক্তিদ্বারা অস্বীকার করিলেই বন্ধন অস্বীকৃত হয় না। বন্ধনের কাছে তখন সকল জীবন দিয়া মুখোমুখি দাঁড়াইতে হয়, পরিপাক করিতে হয়। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন: 'তুমি কেবল কথায় স্ত্রী পুরুষ অভেদ বলিয়া থাক; তোমার যদি স্ত্রী পুরুষ অভেদ বোধ হইত, তাহা হইলে তোমার পত্নীতে বা অন্য রমণীতে কামবশতঃ তোমার যে রতি বা আসক্তি হইয়া থাকে, তাহা তোমার তাহার প্রতি হইত না। কারণ তোমার সেই পত্নীর প্রতি যে প্রকার রতি বা আসক্তি কামবশতঃ হয়, তাহা ত তোমার নিজের প্রতি ঐ প্রকার কামবশতঃ হয় না। তাহা হইলে তুমি কি প্রকারে বলিতেছ, তুমি এবং তোমার পত্নী অভেদ? তুমি এবং তোমার পত্নী অভেদ বোধ হইয়া

থাকিলে তোমার নিজের প্রতি যেমন কামবশতঃ রতি বা আসক্তি হয় না, তদ্রূপ কামবশতঃ রতি বা আসক্তি তোমার পত্নীর প্রতিও হইত না। ... শ্রুতিবেদান্ত প্রভৃতি মতে তুমি যে আত্মা, তোমার পত্নীও সেই আত্মা। কিন্তু ঐ প্রকার অভেদত্ব যদ্যপি তোমার থাকিত, তাহা হইলে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলে তোমার পত্নীর ক্ষুধাও নিবৃত্তি হইত। তাহা হইলে তোমার তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইলেই তোমার পত্নীর তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইত। তোমার পত্নীর জ্ঞানে তোমার জ্ঞান হইত। তাহা হইলে তোমাদের উভয়ের সকল বিষয়েই একতা থাকিত। সমস্তই এক বোধ হইলে আর সমস্তকে সমস্ত বোধও হয় না। তাহা হইলে সমস্তকে একই বোধ হয়। তাহা হইলে এক ব্যতীত সমস্ত আছেও বোধ হয় না।'—নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা—১ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা :৩৩-৩৪ পৃঃ। এই বিশ্বের সমস্তই যদি পারমার্থিক ভাবে একান্তই এক হইত, তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্র, প্রভেদের ক্ষেত্র সৃষ্ট হইবারই কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিত না। অনির্ব্বচনীয়তার আশ্রয়ে একের বহু হওয়ার যুক্তি প্রত্যক্ষবাদী স্বীকার করিতে পারিবেন কেন? প্রত্যক্ষে যখন দেখি যে, আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার সময়ে তাঁহার সমসাময়িক কোটি কোটি লোকের ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, তখন কি শঙ্করের ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার কালেও শঙ্কর অন্যান্য জীবদের সঙ্গে নিজকে 'এক' মনে করিতেন? সমাধিতে তিনি 'এক' হইতে পারেন, জাগ্রতে নিশ্চয়ই তাঁহার বহুত্ববোধ ছিল। অবশ্য 'বুত্থানে'র আমদানী করিয়া জাগ্রতাবস্থার বহুদর্শনকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল প্রত্যক্ষের দর্শনকে হুবহু মানিয়া লইয়া তাহারই ভিত্তিতে বেদান্তের অদ্বৈত ভাবকে আস্বাদন করিতে চাহিতেছেন। বিশ্বের যাবতীয় নরনারী তাহাদের প্রভেদ-ভাব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া কি করিয়া জাগ্রতের স্তরে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, তাহার খোঁজই নিত্যগোপাল দিয়াছেন। প্রত্যক্ষও সমাধিরই মত সত্য। প্রত্যক্ষ যদি মায়া প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া প্রত্যক্ষের সহযোগিতায় প্রাপ্ত সমাধিও মায়া। শ্রীনিত্যগোপাল তাই লিখিয়াছেন: 'সকল প্রকার অবস্থাই মায়িক। প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমি আছি এ বোধও থাকে না, কিন্তু সে অবস্থাও মায়িক। সকল প্রকার সমাধি অবস্থাও মায়িক, নির্ব্বাণ প্রাপ্তিও মায়িক। যা কিছু হয়, যা কিছু ঘটে তাহাই মায়িক। নির্ব্বাণও একটা ঘটনা, সুতরাং তাহাও অমায়িক বলা যায় না।' সর্ব্বধর্ম্ম-নির্ণয়সার, ২য় পৃষ্ঠা। ভগবান বুদ্ধদেব বৈশাখীপূর্ণিমার দিন জন্মগ্রহণ ও মহাপরিনির্ব্বাণ

লাভ করিয়াছেন। তাহাও যখন কালের বুকে একটা ঘটনামাত্র, তখন তাহাও মায়িক। সবিকল্প সমাধির মত নির্ব্বিকল্প সমাধিও মায়িক। সবিকল্প যদি মায়িক, তবে সবিকল্পের আপেক্ষিক নির্ব্বিকল্পই বা মায়িক না হইবে কেন? মায়ায়ই নির্ব্বিকল্প স্তরকে ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে 'এক' বলিয়া উপলব্ধি করিতে দিতে শ্রীনিত্যগোপাল প্রস্তুত নন। তিনি প্রচলিত নির্ব্বিকল্পতার অন্তরেও অব্যক্ত সবিকল্পতার খোঁজ দিয়া গিয়াছেন। সবিকল্প-নির্ব্বিকল্পের সমন্বয়ই সত্য বাস্তব নির্ব্বিকল্প। নির্ব্বিকল্পের মধ্যে বিকল্প 'অব্যক্ত', সবিকল্পে মাত্র উহা 'ব্যক্ত'। সবিকল্প-নির্ব্বিকল্প সমন্বিত আছে বলিয়াই নির্ব্বিকল্প কখনও নির্ব্বিকল্প থাকিতে পারেন, কখনও বা সবিকল্প হন। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন, 'ব্রহ্ম যখন নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকেন, তখনও তাঁহাতে অব্যক্তভাবে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি থাকে। ব্রহ্ম যেমন নিত্য-সত্য, তদ্রূপ তাঁহাতে যে ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি আছে, তাহারাও নিত্য।—সিদ্ধান্তদর্শন পৃঃ ১৯। ব্রহ্মে গুণ-ক্রিয়া ছিল না, হঠাৎ কোনও অনির্ব্বচনীয় কারণে ব্রহ্মে তাহা ফুটিয়া উঠিল, শ্রীনিত্যগোপাল ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। তিনি বারবার বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হওয়ার দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল মতে ব্রহ্ম জীবন্ত বাস্তব বস্তু। এই ব্রহ্ম হইতেই জগতের উদ্ভব একটা সহজ ব্যাপার। এই সৃষ্টি সহজ বলিয়াই ইহা অনির্ব্বচনীয়। 'ব্রহ্ম হইতে অনির্ব্বচনীয় ভাবে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে' না বলিয়া তিনি বলিতে চান যে, ব্রহ্ম হইতে যে জগৎ সহজ স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সহজভাবেই বিশেষ কোনও বচনের বন্ধনের কবলে কবলিত না হইয়া অনির্ব্বচনীয় হইয়াই রহিতেছে। ব্রহ্মকে ও তাঁহার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিরূপ এই জগৎকে অনন্ত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায় বলিয়া ইহা নিত্য 'অনির্ব্বচনীয়'। এই তত্ত্বকে ভাষার মাধ্যমে পরিস্ফুট করিবার জন্য ব্রহ্ম, পরমাত্মা ভগবান ও পুরুষোত্তম শব্দ-চতুষ্টয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। (A group of new words will be necessitated by a group of new facts.)

বিশ্ব সম্বন্ধীয় নূতন নূতন তথ্য যখন আবিষ্কৃত ও উপলব্ধ হইতে লাগিল, তখন সেই তথ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া ব্রহ্মকেই ক্রমপরিণতরূপে পরমাত্মা, ভগবান ও পুরুষোত্তম বলিতে হইল। সকল বিশেষত্বহীন যে-এক তাহাই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম যখন প্রকৃতির 'দ্রষ্টা' হইয়াও ব্রহ্ম, তখনই তিনি পরমাত্মা। সেই

পরমাত্মা আবার যখন তাঁহার ব্রহ্মত্ব ও ব্রহ্মত্ব রক্ষা করিয়াও প্রকৃতির ভোক্তা, তখনই তিনি ভগবান। আবার এই ভগবান যখন ব্রহ্মত্ব, পরমাত্মত্ব ও ভগবত্তায় অচ্যুত থাকিয়াও প্রকৃতির সকল পরিণাম সকল বিকার গায়ে মাখিয়া, সম্পূর্ণ বিকারী হইয়াও ব্রহ্ম, তখনই তিনি পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম একাধারে নির্গুণ-সগুণ, নিষ্ক্রিয়-সক্রিয়, নির্ব্বিকার-বিকারবান। নির্ব্বিকারের এই অনন্ত মাত্রা আমরা অবতার-জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি। নির্গুণ ঘন হইয়াই সগুণ, নিষ্ক্রিয় ঘন হইয়াই সক্রিয়। এবং নির্গুণের এই সগুণ হওয়া নিতান্ত সহজ ভাবেই সম্ভব হইয়াছে, ইহার মধ্যে আছে জীবনেরই পরিপূর্ণ আস্বাদন। বিমূর্ত্ত বুদ্ধির মানদণ্ডে বুঝিতে গেলে ইহা অনির্ব্বচনীয় বটে; কিন্তু জীবনের মধ্যে বীজ হইতে বৃক্ষ হওয়ার মত ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। জীববিদ্যা দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হইলে ইহা এমনই 'সহজ' হইয়া যায়। ব্রহ্ম-পর্য্যায়ের সকল শব্দের মধ্যে সাক্ষাৎ-অপরোক্ষাৎ 'বর্ত্তমান' পুরুষোত্তমই হইল 'last term'. এই last term'-এর আলোতে আজ ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবানের উপলব্ধি করিতে হইবে। পুরুষোত্তম 'বর্ত্তমান' ভজনেরই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন: 'সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের মতে বর্ত্তমান ভজন। তাহা ঐ তিন বেদের তিন মহাবাক্যদ্বারাই বোঝা যায়। সামবেদ অনুসারে 'তত্ত্বমসি' বলিলেও বর্ত্তমান ভজন বোঝা যায়, যজুর্ব্বেদ অনুসারে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' বলিলেও বর্ত্তমান ভজন বোঝা যায়। অথর্ব্ববেদ অনুসারে 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' বলিলেও বর্ত্তমান ভজন বোঝা যায়।'—নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃ: ১৩৫। 'তত্ত্বমসি'-র মধ্যস্থ 'অসি'-পদে, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'-র 'অস্তি'-পদ, 'অহম্-ব্রহ্মাস্মি'-র 'অস্মি'-পদ বর্ত্তমান কালের। ভজনার জন্য 'বর্ত্তমান'কেই আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে। 'বর্ত্তমান'কে বুঝিবার জন্য অতীতকে লইয়া টানাটানি করিবার দরকার নাই, সম্ভবও নয়; অথচ ইহাই এতদিন চলিয়া আসিয়াছে। লাভের মধ্যে ফল দাঁড়ায়—মানুষ অতীত লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে বর্ত্তমানও তাহার বোঝা হয় না, অতীত তো তাহার হাত-ছাড়াই। অতীত-ভবিষ্যতের মাঝখানে থাকিয়া বর্ত্তমান তাহারই বুকে অতীত-ভবিষ্যতের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিতেছে। তাই বর্ত্তমান ভজনার লক্ষ্য বর্ত্তমানেই তাঁহাকে পাওয়া, 'ইহৈব ব্রহ্ম সমশ্নুতে।' পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের সন্ধান চাহিলে তাহাও মিলিতে পারে বর্ত্তমানকে পুরুষোত্তম-আলোকে বিশ্লেষণ করিলে।

শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও সাধকসুহৃৎ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন : 'মহাত্মা অর্জ্জুনেরও মানুষ-কৃষ্ণের ভজনা প্রীতিজনক ছিল। তিনি সৌম্যমানুষরূপ-কৃষ্ণ ভালবাসিতেন। সেইজন্যই তিনি কৃষ্ণের প্রতি বলিয়াছিলেন—

> 'দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
> ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥'

অর্জ্জুন মহাশয়ের……ঐ কথা কর্ত্তাভজনকারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অর্জ্জুনের ঐ প্রকার বাক্যদ্বারা ঐ গীতার মতেও কর্ত্তাভজার মত আছে প্রমাণিত হইয়াছে। অন্যান্য অনেক শাস্ত্রেও কর্ত্তাভজার মত নিহিত আছে। সামবেদের মহাবাক্য তত্ত্বমসিও কর্ত্তাভজা মতের অনুকূল। আনুমানিক ভজনা করিবার সময় যাহার ভজনা করা হয়, তাঁহাকে সে সময় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে ভজনাদ্বারা সেই ভজনীয়কে প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহাই বর্ত্তমান ভজন বা বর্ত্তমান ভজনা। ব্রজের নন্দ যশোদারও বর্ত্তমান-ভজনা ছিল। তাঁহারা বাৎসল্য ভাবদ্বারা আনুমানিক-কৃষ্ণের ভজনা করিতেন না। তাঁহাদের বর্ত্তমান-কৃষ্ণ-ভজনা ছিল।...কৌশল্যা-দশরথেরও বর্ত্তমান-ভজনা ছিল। তাঁহারাও আনুমানিক-শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করেন নাই। তাঁহারাও বাৎসল্য-ভাবদ্বারা প্রত্যক্ষ-রামচন্দ্রেরই ভজনা করিয়াছিলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপের শচী-জগন্নাথ মিশ্রেরও বর্ত্তমান-ভজনা ছিল।... প্রসিদ্ধ ঈশার মাতার, তাঁহার আত্মীয়-গণের, তাঁহার বন্ধুগণের, তাঁহার দাসত্বসম্পন্ন শিষ্যগণের বর্ত্তমান-ভজনা ছিল। ……ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বা পয়গম্বর মহম্মদের শিষ্যগণেরও বর্ত্তমান-ভজনা ছিল।……কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই বর্ত্তমান-ঈশ্বরের বা বর্ত্তমান-কর্ত্তার বর্ত্তমান-ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুমানে আস্থা নাই। প্রকৃত কথায় বর্ত্তমান পাইলে কে-ই বা অনুমান চায়? সমস্ত জীবেরই বর্ত্তমান-ভজনা। মাতার বর্ত্তমান-ভজনা, পিতার বর্ত্তমান-ভজনা।……পতিরও বর্ত্তমান ভজনা। ……পত্নীরও বর্ত্তমান ভজনা।……পুত্রকন্যাগণেরও বর্ত্তমান-ভজনা।…… অন্নপ্রভৃতি আহার্য্যের সঙ্গেও বর্ত্তমান-সম্বন্ধ। আমরা তাঁহাদেরও বর্ত্তমানে ভজি।… সেইজন্যই বলি বর্ত্তমান-ভজনা ভিন্ন ভজনীয়ের ভজনা করিবার আমাদের অন্য আর প্রশস্ত অবলম্বন নাই। সেইজন্য শুদ্ধভক্ত ও শুদ্ধ প্রেমিক-গণের পক্ষে কেবলমাত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বর্ত্তমান-ভজনাই বিশেষ মঙ্গলদায়িনী।'—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও সাধকসুহৃৎ, পৃঃ ১২৭-১২৯

এই বর্ত্তমান ভজনার মহিমাই ভগবান বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। বিশ্ব 'ক্ষণিকের মেলা'। আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে প্রকৃতির সকল্ পরিণামই ক্ষণে ক্ষণে হয় এবং উহা লাফাইয়া লাফাইয়া চলে; উহাদের মধ্যে যেন কোনও সন্ততিই নাই। 'It exists in jumps.' 'An extension of Planck's ideas, due to Prof Niel Bohr of Copenhagen, went on to suggest that, viewd through a microscope of sufficient power (this being far beyond anything attainable in practice), the ultimate particles of matter would be seen to move, not like railway trains running smoothly on tracks, but like kangaroos hopping about in a field.'—Physics and Philosophy by Jeans. P 126-127 প্রতি ক্ষণই বর্ত্তমান! প্রতি ক্ষণের মাঝে অতীত-ভবিষ্যৎ ঘুমাইয়া রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ অবলম্বন ব্যতীত মানুষ এক পা'ও অগ্রসর হইতে পারে না। অথচ এই ক্ষণকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য অতীতকে লইয়া কি টানাটানি না বুদ্ধিমান মানুষ করিয়াছে! 'The scientific mind, thinking causally, is incapable of understanding what is ahead; it only understands what is past, that is retrospective. Like Ahriman, the Persian Devil, it has the gift of After-knowledge. But this spirit is only one-half of a complete comprehension. The other more important half is perspective or construction; if we are not able to understand what lies ahead, then nothing is understood.'—Content of the Psychology by Dr C. G. Jung.—'বৈজ্ঞানিকমন কার্য্যকারণ-সূত্র ধরিয়া ভাবনা করে বলিয়া যাহা সামনের দিকে তাহাকে কখনও বুঝিতে পারে না। যাহা অতীত, তাহাই সে শুধু বোঝে। ইহাই উজান-স্রোতে চলা, পিছনের দিকে চলা। পারস্যের দৈত্য আরহ্‌মনের মত বৈজ্ঞানিক মনের সম্পদ হইতেছে 'ঘটনা ঘটিবার পরের জ্ঞান।' কিন্তু এই মনোবৃত্তি পরিপূর্ণ ধারণার অর্দ্ধেক মাত্র। অধিকতর মূল্যবান অপর অর্দ্ধ হইতেছে 'সামনের দিকের জ্ঞান'। ইহাই গঠনাত্মক মনোবৃত্তি। সামনে কি আছে, তাহাই যদি বুঝিতে না পারিলাম, তাহা হইলে কিছুই বোঝা হইল না'। তাই মনীষী Jung বর্ত্তমানকে আশ্রয় করিয়া চলিবারই নির্দ্দেশ দিতেছেন। বর্ত্তমান যেখানে সামনে অগ্রসর হইবার পথে বাধা পাইতেছে, সেই বাধাকে

পরিপাক করিবার কৌশল যদি আয়ত্ত করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, অতীতের দিকে সরিয়া গিয়া বর্ত্তমানের প্রতিবন্ধকগুলির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে না। অর্জ্জুন সামনে অগ্রসর হইতে ভয় পাইতেছিলেন; অথচ পুরুষোত্তম চাহিতেছেন অর্জ্জুনকে যুদ্ধের পথে আগাইয়া নিতে। অর্জ্জুনের এই পথে প্রতিবন্ধক হইতেছে ভীষ্মদ্রোণাদির প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্বজন বধের প্রতি বিদ্বেষ, কুল ধর্ম্ম হানি প্রভৃতির জন্য মহাপাপের ভীতি। পুরুষোত্তম এই সব প্রতিবন্ধককে পরিপাক করিয়া অগ্রগতি লাভ করিবার শিক্ষাই দিতেছিলেন। ইহাই 'Constructive method'.

'While recognising fully the influence of the parents and of the sexual constitution of the child, Jung refuses to see in this infantile past the real cause for the later development of the illness. He definitely places the cause of the pathogeine conflict *in the present moment* and considers that in seeking for the cause in the distant past is only following the desire of the patient, which is to withdraw himself so much as possible from the present important period.'—'Analytic psychology' by Dr Bentrice.

—'পরিপূর্ণভাব পিতামাতা ও শিশুর যৌন কাঠামোর প্রভাব স্বীকার করিয়াও ইউং ক্রমবিকশিত রোখের বাস্তব কারণকে শিশুর অতীতের মধ্যে দেখিতে অস্বীকার করেন। তিনি নিশ্চিতরূপে pathogenic সংঘাতের কারণ-কে স্থাপন করেন কারণ 'বর্তমান ক্ষণের মধ্যে এবং মনে করেন যে, রোগের নিদানকে দূর অতীতের মধ্যে খোঁজা শুধু রোগীর মনোবৃত্তিরই অনুসরণ করা মাত্র। রোগী যে যতদূর সম্ভব এই পথ ধরিয়া পিছনে সিরয়া থাকিতে চায়, তাহা শুধু গুরুত্বপূর্ণ 'বর্ত্তমান' হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিবার জন্যই।'

যাবতীয় রোগ ও রোগী সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে মানুষ কি দৈহিক রোগে কি মানসিক রোগে নিজকে কঠোর বাস্তব হইতে সরাইয়া আনিবার জন্য ব্যাকুল। ইহা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ভাষায় 'বুড়ো মনের পরিচয়। 'কঠিন বাস্তব'কে পরিপাক করিবার সামর্থ্য যখন রোগী হারাইয়া ফেলে, বাস্তব যখন রোগীর অগ্রগতির পথ বোধ করিবার জন্য দাঁড়ায়, তখন আঘাতপ্রাপ্ত লালসা (libido) সেখানে সংহত হয়; কিন্তু সামনে পথ না পাইয়া উহা পিছনে সরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করে।

সমস্ত প্রত্যাহার সাধনার রহস্য এই খানেই। ইউং লিখিতেছেন, 'With this interference in the path of progression libido is stored up and a regression takes place whereby there occurs a reanimation of past ways of libido occupations which were already normal for the child but which for the adult are no longer of value. These regressive infantile desires and phantasams now alive and striving for satisfaction are converted into symptoms, and in these surragate forms obtain a certain gratification, there creating the external manifestations of the neurosis. Jung does not ask for what psychic experiences or points of fixation in childhood the patient is suffering, but what is the present duty or task he is avoiding or what obstacle in his life's path he is unable to over come. What is the cause of his regression in past psychic experiences?'—'অগ্রগতির পথে বাধাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লালসা সঞ্চিত হয় এবং পিছনে সরিয়া আসিতে বাধ্য হয় যাহার ফলে লালসার অতীত অভিব্যক্তিগুলির পুনরুজ্জীবন সংঘটিত হয়, যাহা শিশুর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সহজ ছিল কিন্তু যাহার কোনও মূল্যই এখন বয়স্কদের পক্ষে নাই। যে সব শিশু-সুলভ আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা এখনও জীবিত আছে এবং তৃপ্তি পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই উপসর্গ (symptom) আকারে পরিবর্ত্তিত হয় এবং এই সব প্রতিনিধি স্থানীয় রূপগুলির মধ্যে কিছুটা আস্বাদন লাভ করে। এই ভাবে মানসিক রোগের বাহ্যিক অভিব্যক্তি স্পষ্ট হয়। সুতরাং ইউং শৈশবের কোন্ মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা কিম্বা আটকাইয়া যাওয়া বিন্দু সমূহ (points of fixation) হইতে রোগী ভুগিতেছে, তাহা জানিতে চান না; কিন্তু তিনি জানিতে চান বর্ত্তমানের কোন্ কর্ত্তব্য বা খাটুনির কাজ রোগী এড়াইতে চাহিতেছে কিম্বা জীবন পথের কোন্ বাধা সে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। অতীত মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতায় ফিরিয়া যাইবার হেতু কি?

বর্ত্তমান (present moment) যখন আমার সামনে, অতীতের সঙ্গে যখন আমার আনুমানিক সম্বন্ধ ছাড়া প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনের সম্ভাবনা নাই এবং আইনস্টিনের সিদ্ধান্তানুযায়ী যখন চতুর্থ পাদে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যতের কোনও পাকাপোক্ত বিভাগ নাই, তখন বর্ত্তমানকে ভজনা করিয়া চলিলে

কেন অতীত ভবিষ্যতের সকল conflict-এর সূত্র পাইব না? জেমস্ লিখিতেছেন 'We can no longer say that the past creates the present; past present no longer have any objective meanings since the four-dimensional continuum can no longer be divided into past present and future.'—Physics and Philosophy. P. '119। এই 'অতীত' ও 'বর্ত্তমান' লইয়া ফ্রয়েড ও ইউং এর মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। ইউং যতখানি জোর 'বর্তমানের উপর দেন, ফ্রয়েড তদনুরূপ জোর দেন অতীতের উপর। মানুষ যেভাবে বর্ত্তমানকে ছাড়িয়া জন্মের গোড়ার উপর, অতীত জন্মের উপর দৈবের উপর, পূর্ব্ব জন্মাদির কর্ম্মের উপর জোর দিয়া বর্ত্তমানকে একেবারে অতীতেরই পুনরাবৃত্তি মনে করিয়া বর্ত্তমান সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে বর্ত্তমানের উপরে এই জোর দিবার প্রয়োজন ছিল। তাই 'বর্ত্তমান ভজনা'র প্রসঙ্গ আজ উঠিয়াছে। এই দিক দিয়া ফ্রয়েডের পরে ইউংএর সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয়।

'বর্ত্তমান' হইতে রওয়ানা হইবার সাধনাই বর্ত্তমান যুগের মানুষ গ্রহণ করিয়াছে। যে ক্ষণটী মানুষের সামনে বর্ত্তমান, সেই ক্ষণটীর পরিপূর্ণ সার্থকতা যদি মানুষ করিতে পারে, অতীত ক্ষণটীর মধ্যে যাহা কিছু চাপা পড়িয়া ছিল, তাহা তো পরিপাক হইবেই, ভবিষ্যৎ ক্ষণটীও পরিপূর্ণ সার্থকতা দিবার জন্য সাধকের সামনে উপস্থিত হইবে। আবেষ্টন-সহিত সমগ্র 'বর্ত্তমান' ক্ষণের সঙ্গে সাধকের সম্পর্কটীর পরিপূর্ণ সার্থকতার দিকেই থাকিবে সাধকের দৃষ্টি। বাল্য একটী ক্ষণ, কৌমার্য্য একটী ক্ষণ, কৈশোর একটী ক্ষণ, যৌবন একটী ক্ষণ, বার্দ্ধক্য-মৃত্যুও ক্ষণ। প্রতিটী ক্ষণ সার্থকভাবে আস্বাদিত হইতে থাকিলে এই সার্থক আস্বাদন একটী সন্ততিধারার সৃষ্টি করে; অথচ তখন ক্ষণগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই আস্বাদিত হয়। ইহাই প্রাণ-ধারা। 'All development is by breaks and yet makes for continuity'—'সব ক্রম-উন্নতিই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া (by breaks) হয় অথচ সেখানে একটী সন্ততিধারাও (continuity) থাকিয়া যায়।'

ভগবান বুদ্ধের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ও বেদান্তের সন্ততধারা এই ভাবে প্রাণধারার মাঝে সমন্বিত। শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নের' কমল হইতেছে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের প্রতিভূ, আর আশুবাবু হইতেছেন বেদান্তের সন্তত-

ধারার। জীবনে কোনও একটীই একান্ত ভাবে সত্য নয়; দুই-ই সমন্বিত ভাবে সত্য। প্রকৃতির সমস্ত পরিণামই 'ক্ষণে' 'ক্ষণে' হয়। প্রাণধারার মধ্যে প্রতিটী ক্ষণ স্বয়ং মূল্যবান, এবং স্বয়ং মূল্যবান এই ক্ষণগুলি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও অন্যোন্যাপেক্ষ। কাল-পরিণামগুলির এই পরস্পর নিরপেক্ষতা ও পরস্পরাপেক্ষতার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে জীবনের মধ্যে একটী transcendental দিক ও introvert দিক; এবং তাহারই পাশাপাশি থাকিয়া যায় একটী immanent দিক, ও extravert দিক। প্রাণধারা পরস্পর বিরোধী এই দুই ধারারই সমন্বয়মূর্ত্তি। প্রাণধারার মধ্যে প্রতিটী অংশ-'ক্ষণ' 'পূর্ণ'। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন: 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ। অল্প অগ্নিও অধিক হইতে পারে। পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও অপরিমিত সচ্চিদানন্দ হইতে পারেন।' নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা—২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। সচ্চিদানন্দ যখন অপরিমেয়, কোন পরিমাণেই যখন তিনি ধরা পড়েন না এবং অল্প ও 'অধিক' যখন পরিমাণবাচক শব্দ মাত্র, তখন সচ্চিদানন্দ অল্প-পরিমাণ ও অধিক-পরিমাণে কেন 'পূর্ণ' ভাবে থাকিতে পারিবেন না? ব্রহ্ম যদি একান্ত বৃহৎ-পরিমাণ বিশিষ্ট হইতেন, তবে তিনি কিছুতেই অল্প পরিমাণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেন না। যাহা-কিছু আপনি এব আপনা পূর্ণ (self-contined), তাহাই সত্য বাস্তব পূর্ণ। সচ্চিদানন্দ অল্প অধিকে সমভাবে পূর্ণ। প্রতি অংশ-দেশে, প্রতি অংশ-কালে তিনি স্বয়ম্পূর্ণ। কলিকাতা তাহার প্রতি অংশের মধ্যে—কালীঘাট, শ্যামবাজার, খিদিরপুর, বেলিয়াঘাটা প্রভৃতির মধ্যে পূর্ণ ভাবে আছে বলিয়াই কালীঘাটবাসী বলিতে পারে, 'আমি কলিকাতায় আছি', শ্যামবাজারবাসীও বলিতে পারে, 'আমি কলিকাতায় আছি।' ইহাই নিত্যগোপালের অংশে পূর্ণত্ব। ব্রহ্ম সর্ব্ব-পদবাচ্য, বহু-পদবাচ্য নন। 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'। 'সর্ব্ব' ও 'বহু' শব্দ একার্থবাচক নয়। 'সব জলটুকু খাও' বলিলে এক পোয়াও বুঝা যাইতে পারে, এক সেরও বুঝা যাইতে পারে। সর্ব্ব শব্দ অপরিমেয়; তাই সকল পরিমাণ সম্বন্ধেই উহা প্রযোজ্য। গঙ্গার যে কোনও অংশে স্নান করিলেই গঙ্গা-স্নান হয়। 'গঙ্গাস্নান করিয়াছি' বলিলে কেহ বোঝে না যে, সে হরিদ্বার হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গার সকল অংশেই স্নান করিয়া আসিয়াছে। গঙ্গার প্রতি অংশেও গঙ্গা পূর্ণ। আবার প্রতি অংশ-

গঙ্গাসমূহের সমন্বয়ে যে গঙ্গা, তাহা পূর্ণতম গঙ্গা। গঙ্গার এই ভাবে চারিটি রূপ রহিয়াছে। প্রতি অংশের অতীত যিনি, তিনি 'পূর্ণ' গঙ্গা, প্রতি অংশে যিনি পূর্ণ, তিনি পূর্ণতর গঙ্গা; অংশ-গঙ্গা সমূহের সমন্বয়ে যিনি পূর্ণ, তিনি পূর্ণতম গঙ্গা। সর্ব্বশেষ এই পূর্ণতম গঙ্গার সঙ্গে পূর্ণ গঙ্গার সমন্বয়ে যিনি পূর্ণ, তিনিই পরিপূর্ণ গঙ্গা। ব্রহ্মও এই ভাবে পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম ও পরিপূর্ণ। "প্রত্যক্ষ জগৎ যে দিন হইতে দার্শনিক দৃষ্টিতে একান্ত জড়, মৃত (dead, block), সেদিন হইতেই অজড় রহিয়াছে জড়ের একান্ত বাহিরে। জড় সম্বন্ধে এই দৃষ্টি নিউটনের যুগের দৃষ্টি। কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান জড়কে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে পারিতেছে। জড়ের প্রতি অংশের বুকে নিজেকে ডিঙাইয়া পূর্ণ হওয়ার একটী খোঁজ আছে বলিয়াই জড় আগে পিছে, আশে পাশের অনন্ত খণ্ড সমূহের বুকে বুক মিলাইয়া সেই পূর্ণতমকে আস্বাদন করিবার জন্য অনবরত আগাইয়া চলিয়াছে। এমন করিয়া কালের প্রতি অংশ ঐ ক্ষণের বুকেও নিজকে ডিঙ্গাইয়া সনাতন হওয়ার একটী খোঁচা রহিয়াছে, যাহার জন্য সে অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের বুকে বুক মিলাইয়া সেই সনাতনকে আস্বাদন করিবার জন্য আগাইয়া চলিয়াছে। এই ভাবে জড়ের বুকেই জড়ের অতিরিক্ত একটী অজড় ধর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে; অজড় একান্ত ভাবে জড়ের বাহিরেও নয়, একান্ত ভাবে ভিতরেও নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই সাক্ষ্যই দিতেছে। 'Reality lies ahead, not behind.'—Bosanquet'—মৎপ্রণীত ঈশোপনিষদের অবধূত ভাষ্য।

ভগবান বুদ্ধের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ আজ বিজ্ঞান দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে এবং এই ক্ষণিকত্ব ও বেদান্তের সন্ততধারার সমন্বয়ও বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 'A wonderful philosophy of dynamism was formulated by Budha 2,500 years ago, a philosophy which is being recreated for us by the discoveries of modern science and the adventures of modern thought. The electro magnetic theory of matter has brought about a revolution in the general concept of the nature of physical reality. It is no more static stuff but radiant energy. An analogous change pervaded the world of psychology, and the title of a recent book by M. Bergson, Mind Energy, indicates the the change in the theory of psychical reality. Impressed by

the transitoriness of objects, the ceaseless mutation and transformation of things, Buddha formulated a philosophy of change. He reduces substances, souls, monads, things to forces, movements, sequences and processes, and adopts a dynamic conception of reality. Life is nothing but a series of manifestations of becomings, and extinction. It is a stream of becomings. The world of sense and science is form moment to moment. It is a recurring rotation of birth and death. Whatever be the duration of any state of being, as brief as flash of lighting or as long as millenium, yet all is becoming. All things change. All schools of Buddism agree there is nothing human or divine that is permanent. Buddha gives us a discourse on fire to indicate the ceaseless flux of becoming called the world.

World on worlds are rolling ever,
From creation to decay,
Like the bubbles on a river,
Sprinkling, bursting, borne away.

—Indian Philosophy by Rhadhakrishnan. P. 307 308

অধ্যাত্মক্ষেত্রে ভগবান বুদ্ধ ছাড়া কেহই গতিধর্ম্মের দর্শন প্রবর্ত্তন করেন নাই। বিশ্বে তিনিই 'Father of dynamism'. তিনি দিয়া গিয়াছেন change-এর দর্শন। কিন্তু তাহারই পাশাপাশি প্রবর্ত্তিত ছিল 'permanence'-এর দর্শন। change ও permanence পরস্পর বিরুদ্ধ। ভগবান বুদ্ধ যেখানে বলিতেছেন 'ক্ষণিকেষ্বপি একত্বাদি ভ্রান্তি অবিদ্যা', ক্ষণ সমূহের মধ্যে একত্ব স্থিরত্বাদি রূপ ভ্রান্তি অবিদ্যা, শঙ্কর সেইখানে বলিতেছেন যে, একত্বস্থিরত্বাদি দর্শনই বিদ্যা। ইহাদের মধ্যে মূলগত ভেদ রহিয়াছে। একান্ত একত্ব বা একান্ত বহুত্ব কোনটীর দ্বারাই জীবন চলে না। জীবনের কতগুলি ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন হয় একত্বের, কতকগুলির জন্য প্রয়োজন হয় বহুত্বের। কিন্তু এ যাবৎ তাহাদের মধ্যে কোনও পরস্পরাপেক্ষতা বা সমন্বয় সাধিত হয় নাই। বিশ্ব তাই এই দুই মতবাদের ফলে দুই ব্লকে বিভক্ত। আজ সমন্বয় সাধিত হইবার সময় আসিয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল এই গুরু দায়িত্ব লইয়াই বর্ত্তমান। তিনি লিখিয়াছেন: 'আমাদের বিবেচনায় তিনি এক এবং বহুর অতীত। তিনি একত্বে এবং বহুত্বে লিপ্ত নহেন।'—নিত্যধর্ম্ম

পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ; পৃঃ ১৬৪। আত্মা যখন একত্বে লিপ্ত নন, তখন তিনি বুদ্ধের ইষ্ট, আবার যখন তিনি বহুত্বে লিপ্ত নন, তখনই তিনি শঙ্করের ইষ্ট। বহু হইতেছে ক্ষণপরিণামের সমষ্টি ; দুইটী ক্ষণের মাঝে একাত্মা রহিয়াছে ক্ষণ দুইটীর পরস্পরনিরপেক্ষতা ও পরস্পরাপেক্ষতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া একটী 'রাসচক্র' রচনা করিবার জন্য। রাসচক্রের প্রতিটি গোপী হইতেছেন বিশ্বের এক একটী 'ক্ষণ'। প্রতি দুইটী গোপীর মাঝে যেমন রহিয়াছেন কৃষ্ণ দুইয়ের মাঝে 'গৃহীত কণ্ঠ' হইয়া এবং সেই দুইটী যেমন 'অন্যোন্যবদ্ধবাহু', ঠিক তেমনি প্রতি দুইটী ক্ষণ-পরিণামের মাঝে রাহয়াছে এক আত্মা দুইয়ের মাঝে 'গৃহীতকণ্ঠ' হইয়া, এবং এই দুইটী ক্ষণ-পরিণাম রহিয়াছে 'অন্যোন্যবদ্ধবাহু' হইয়া। বিশ্বময় এই অদ্ভুত ভাগবত রাসচক্র দেদীপ্যমান।

বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ভারতবর্ষ অক্ষরের, অচলের উপাসনায় বিভোর ছিল ; তাহার ফলে ক্ষরের ক্ষেত্র, চঞ্চলতার ক্ষেত্র এই বিশ্বে আমরা ছিলাম একান্ত বিদেশী। আজ শ্রীনিত্যগোপাল স্বদেশ বিদেশের ভেদ গলাইয়া বুদ্ধ-শঙ্করের সমন্বয় বিধান করিয়া পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ক্ষর-অক্ষর সমন্বয় তত্ত্ব, নিত্য-অনিত্য সমন্বয় তত্ত্ব। বুদ্ধ-শঙ্করের সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল। শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন। বন্দে মাতরম্।

'সূর্য-চন্দ্রকে দূর হতে দেখলে মনে হয় অচল, সামনে গেলে দেখা যায় তাদের প্রচণ্ড গতি। কাজেই এই আমাদের দুই রকমের সিদ্ধান্তের মধ্যে দূর বা নিকট থেকে দেখায় একই সত্য আপেক্ষিকভাবে দুই সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েচে—তাই সচল, আবার তাই অচল, তাই দূরে, তাই নিকটে।'

—রবীন্দ্রনাথ

আলো, একটু আলো

মানবেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকার নামছে পৃথিবীর পরে
কালো ডানা মেলে।
একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে বিকেলের সোনা আলো
পশ্চিমের রক্ত মেদুর আকাশ থেকে,—
রাতের কালো কুয়াশা নামছে পৃথিবীর বুকে
ধীরে ধীরে শ্লথ, ক্লান্ত ভংগীতে।
অন্ধকারের গরল বিষিয়ে তুলছে আকাশ বাতাস,
বরফের মতো জমাট বেঁধে যাচ্ছে
বিষের ক্রিয়ায় ভারী করে দিয়ে মানুষের বিদীর্ন মন।
নৈশব্দের ঘন-নিবিড় কুয়াশায় চেতনার দীপ যাচ্ছে নিভে,
জাগরণ ক্লান্ত, কর্ম চঞ্চলতার জল-তরংগ বাজিয়ে চলা পৃথিবীর
চোখের পাতায়
ঘুমের অরণ্য আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার সীমানা।
কালো অন্ধকারের অতলান্ত রহস্য নিয়ে
রাত্রি আসছে নেমে,
ঘন হয়ে আসছে ছায়া-ভরা আবছায়া।

ময়াল সাপের সম্মোহন দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে শিকার—
অক্টোপাশের আট বাহুর নিষ্পেষনে
রাতের পৃথিবীর আটকে আসে দম,
দুর্বহ ব্যথায় ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে।

দুর্মদ, দুর্বার ঝ'ড়ো গতিতে
অক্টোপাশের আট বাহু পড়ছে ছড়িয়ে—
অজগরের সম্মোহন দৃষ্টির প্রভাবে
আপনাকে ভুলে যেতে বসেছে পৃথিবী।
আলোর পৃথিবী অন্ধ-ঘুমের যাদু কাঠির যেই লাগলো ছোঁয়া
জেগে উঠতে লাগলো তখুনি

রাত্রিচরের দল নিকষ অন্ধকারে আড়মোড়া ভেংগে
রক্তের লালসায়, শ্বাপদ হিংস্রতায়।
মৃত্যু-ক্ষুধায় ব্লাড্ হাউণ্ড, অজগর আর তীক্ষ্ণচঞ্চু ঈগল
উঠলো তখুনি জেগে,

অন্ধকারে
দানবের মতো ডালপালা ছড়িয়ে-দেয়া শ্যাওড়া গাছে
ডেকে উঠলো অলক্ষ্মী প্যাঁচা
অশুভ পাশবিক জিঘাংসায়।
প্রবঞ্চনার উল্লাসে, অদ্ভুত মাদকতার শিহরণে
পিশাচের দল হাসতে লাগলো অট্টহাসি,
তাদের চোখের মণি শ্বাপদের চোখের মতো
জল্‌জল্ করে উঠলো রক্তশোষণের স্পর্ধায়।
সুষুপ্তি জমাট বাঁধতে শুরু করলো
আরো সাংঘাতিক ভয়ংকরতায়!
দুষ্কৃতির পংকিলতায় ডুবে যাচ্ছে
রাত্রি-ঘন পৃথিবী!
হিংস্র রক্তলোভী নেকড়ের মতো
রাত্রিচরের দল প্রচণ্ড আক্রোশে
টুঁটি টিপে ধরেছে পৃথিবীর।
সর্বনাশের পিচ্ছিল পথে রাত্রির পদপাতে
সাপের চাইতেও খল ও হিংস্র কালো ছায়া
স্তূপ বেঁধে গেছে।

ঝিম্‌-ঝিম্‌ করে ওঠা নিশুত রাত্রে
মৃত্যুর মতো হিম শীতল বরফ-স্তব্ধতা
ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে
চরম নিষ্ঠুরতার সংগে আঘাত-দেয়া অভিশপ্ততার অট্টহাস্যে!
নিকষ আক্রোশে ইস্পাতের চেয়েও কাঠিন্য নিয়ে
নেমে এসেছে সর্বনাশের পর্দা।
রাত্রির কী শেষ নেই?
পূর্বাচলের রাঙা আলো কী অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করে
আসবে না ছুটে?
ভাঙবে না কী পৃথিবীর ঘুম?
পেছনের সমস্ত কালো হিংস্রতা, সব সংশয়
দ্বিধা-ব্যর্থতা গ্লানি ঝেড়ে ফেলে
জীবন কী হেটে চলবে না নতুন দিগন্তের পথে?

আদিম পাশবিকতার ফেনিল স্রোত
ঘূর্নাবর্তের পর ঘূর্নাবর্ত
রচনা করে চলেছে রাত্রির পৃথিবীতে—
অন্ধকারের আড়ালে ভয়াবহতার সংক্রমতা
বেড়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে।
ডাইনীর বোবা-কাঠির যাদু-ছোঁয়ায়
নিঃসীত স্তব্ধতায় মুখ গুঁজে আছে পৃথিবী—
প্রতিবাদের অগ্নিরাগে জ্বলে ওঠে না
আলোর খানিক আভাও।
দুঃস্বপ্নের সাইক্লোনে
হাল-হারা পৃথিবী গেছে হারিয়ে।
পিলসুজে বসানো মাটির প্রদীপগুলো অবধি
রাত্রিচর দানবের নির্মম হাতের আঘাতে
ভেংগে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে
দিশেহারা পৃথিবীর বুকে আশংকার ঘন কালোরাত।

কোথায় আলোর ক্ষীণ আভা ?
বোবা বীভৎসতায় অন্ধকারের মধ্যে
থা-খা করে পৃথিবী।

এতো অন্ধকার কেন ?
পৃথিবীর বুকের ওপর কেন ড্রাগণের মতো
রাত্রির অন্ধকার এসেছে নেমে ?
আলো, একটু আলো !
একটু আলোর আভা, সামান্যতম আলোর রেশ।
আলো, একটু আলো, হে জ্যোতির্ময় দেবতা,—
সূর্য-তপস্যার পরম লগ্নে
একটু আলো করো বিকীর্ণ !
তমসো মা জ্যোতির্গময় !!

সাময়িকী

'হতভাগ্য অভিভাবক' : গত ২৫শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় একখানি পত্র বাহির হইয়াছে, পত্রখানি নানাকারণে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমরা হুবহু পত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য বলিব। পত্রখানি আনন্দবাজার সম্পাদককে লিখিয়াছেন সদানন্দ রোড, কলিকাতা-বাসী শ্রীযুত বিপিনবিহারী বসু মল্লিক।

"মহাশয়, আমাদের পুত্রকণ্যাগণের শিক্ষাসঙ্কট দূর করিবার জন্ম যে কলিকাতায় শিক্ষাসঙ্কট প্রতিরোধ কমিটি বলিয়া একটী শিক্ষানুরাগী প্রতিষ্ঠান আছে, তাহা জানিতাম না (অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি)। এই সেদিন সহসা দেখিলাম, ছাত্রদিগকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে তাঁহারা আহ্বান করিয়াছেন। ছাত্রগণ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছে। অতঃপর সংবাদপত্রে দেখি, ছাত্রগণ নাকি ট্রামবয়কট ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ও অগ্রণী। ছাত্রগণের শিক্ষা-সঙ্কট এই পথে কতটা দূর হইতেছে, শিক্ষানুরাগী মহাশয়গণই জানেন ; কিন্তু অভিভাবক হিসাবে আমরা প্রমাদ গণিতেছি, পুত্র এই গোলযোগে পুলিশের লাঠি খাইবে, গ্রেপ্তার হইবে, কি কখন ফিরিবে। হতভাগ্য অভিভাবকগণের কোন মতও নাই, মতামতের কোন মূল্যও নাই, কিন্তু প্রতিরোধ বা সংগ্রাম কমিটির নেতাগণের নিকট করজোড়ে নিবেদন করিতে পারি কি যে, ছাত্রগণকে এর মধ্যে না-ই টানিলেন।"

উপরোক্ত চিঠি বাহির হইয়াছে ২৫শে আষাঢ়। ২৬শে আষাঢ়ের দৈনিক পত্রিকায় দেখিলাম, বড় বড় অক্ষরে খবর বাহির হইয়াছে—"ডালহৌসী স্কোয়ারে ছাত্রদের উপর পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচালনা। ৩১ জন আহত : দুই জনের অবস্থা সঙ্কটজনক।" তাহার পরের দিন ২৭শে আষাঢ় আবার বাহির হইল, "ছাত্রদের উপর লাঠিচালনায় তীব্র ক্ষোভ। শুক্রবার স্কুল কলেজের ছাত্রদের হরতাল, বিক্ষোভযাত্রা ও প্রতিবাদ সভা। ট্রামের উপর পটকা, ইষ্টক ও এসিড নিক্ষেপ : পুলিশের লাঠিচালনা ও ধরপাকড়।"

সুকুমারমতি বালকদিগকে এই রাজনৈতিক খেলার মধ্যে টানিয়া আনিবার কি অধিকার এই সব প্রতিরোধ কমিটির কর্তৃপক্ষদের আছে?

'অর্থনৈতিক' বলিয়া ঘোষিত এই আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক কি? তাহারা অর্থ উপায় করে না, অর্থ উপার্জ্জনের জন্য তাহাদের ভাবিবার প্রয়োজনও নাই। ট্রামের ভাড়া কমিলে অভিভাবকগণেরই সুবিধা। তাহাদিগকে লইয়া কিম্বা তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় সমাজের বয়স্কদের লইয়া আন্দোলন করিলে তাহাতে সুফল ফলিতে পারে। কিন্তু এই সব সুকুমার বালকদের সামনে রাখিয়া ডালহৌসী স্কোয়ারে—বিধান সভার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কি কোনও যৌক্তিকতা আছে? অভিভাবকগণের অর্থনীতি লইয়া কি এই সব বালকগণ মাথা ঘামায়, না মাথা ঘামাইবার মত বয়সই তাহাদের হইয়াছে? যাহারা অর্থ-কৃচ্ছ্রতার জন্য দুর্ভোগ ভোগে, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি হইলে যাহারা বিপদ গণে, এ আন্দোলনে তাহাদেরই তো ডাকা উচিত? এই সব ছাত্রগণ যে লাঠি খাইল, কাহারও নাকি চক্ষের মণি বাহির হইল—এজন্য দায়ী এই সব কমিটির কর্তৃপক্ষ। ইহারা যদি 'পিতা' হইতেন, পিতৃস্নেহ লইয়া যদি ইহারা বালকদের সমস্যা বিচার করিতেন, তবে তাঁহারা এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইতেন না। এই আন্দোলনের কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকেই 'পিতা' হন নাই। তাঁহারা কেমন করিয়া বুঝিবেন কি দুর্ভাবনায় পিতামাতারা থাকেন, যখন তাঁহারা শোনেন যে, তাঁহাদের পুত্রগণকে অর্থসঙ্কট দূর করিবার জন্য পুলিশের লাঠির সামনে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রতি বৎসরই পরীক্ষায় ছাত্রদের অকৃতকার্য্যতার জন্য গবেষণা হইতে দেখি। দৈনিক কাগজগুলির খবর গণিয়া রাখিলে দেখা যাইবে বৎসরে কতদিন ছেলেরা স্কুল কলেজ বর্জ্জন করে। রাজনৈতিক জুয়াখেলায় ছেলেদের ভবিষ্যৎকে এইভাবে বিপন্ন করিবার কোনও অধিকার ইহাদের নাই। ইহা জাতির অন্তরাত্মার কাছে মহা অপরাধ। সারাবছর নানা ছোটখাট ব্যাপার লইয়া ছাত্ররা এইভাবে ধর্ম্মঘট করিলে বৎসরান্তে যখন পাশের হার কমিয়া যায়, তখনও আবার সেজন্যও ধর্ম্মঘট! ইহা তো জাতিগঠনের পথ নয়! একদিন মহাত্মাজী স্কুল কলেজ বর্জ্জন আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সে ছিল স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে এবং জাতীয় শিক্ষার ভিতর দিয়া জাতিকে গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনে। এত ছোট উদ্দেশ্য লইয়া ছেলেদিগকে এইভাবে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলা গুরুতর অপরাধ। অভিভাবকগণ ইহা ক্ষমা করে না, করিতে পারে না, ইহা যেন

এই প্রতিরোধ কমিটির কর্তৃপক্ষ মনে রাখেন। শ্রীযুত বিপিনবিহারী বসু মল্লিকের ভিতর দিয়াই সমস্ত অভিভাবকদের অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, ইহা স্মরণ থাকিলে নিশ্চয় বিক্ষোভপরিচালকগণ বুঝিতেন।

গান্ধীজী যখন ছাত্রদের আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন তিনি অহিংস আন্দোলনেই তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া ছিলেন। কিন্তু আজ চারিদিকের আবহাওয়া এমনই একটা বিদ্বেষপূর্ণ হিংসায় ভরিয়া গিয়াছে যে, ইহার মধ্যে ছাত্রদের টানিয়া আনিলে তাহাদের ভবিষ্যৎকে একেবারেই ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়া হইবে।

তীব্র অসন্তোষ আজ বাঙ্গালার আকাশে বাতাসে। অসন্তোষকে বাড়াইয়া তুলিলে তাহা হইবে জাতির জীবনে মারাত্মক। উত্তেজনা বা অসন্তোষ কোনোদিন কিছু সৃষ্টি করে না, উহা সর্ব্বদাই ধ্বংসাত্মক, শেষ পর্য্যন্ত উহা নিজেরই সর্ব্বনাশ নিজে করে। মহাত্মাজী একদিন এই অসন্তোষকে মন্থন করিয়া অমৃতে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এবং এই অমৃতকে আন্দোলনে পরিণত করিয়া ব্রিটিশকে গদীচ্যুত করিয়াছিলেন। আজ এমনই একজন পুরুষের প্রয়োজন, যিনি বর্ত্তমান অসন্তোষকে অমৃতরূপে পরিণত করিয়া দেশীয় সরকারকে বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে। আজ অহিংস পন্থায় ও গঠনাত্মক উপায়ে সর্ব্বসমস্যার সমাধান খুঁজিতে হইবে। উত্তেজনা সৃষ্টিদ্বারা পথ সুগম হয় না, আরও জটিলই হয়—ইহা ভুলিলে চলিবে না। এ কথা শুনিবার বা ভাবিবার মত আবহাওয়া আজ আর নাই, তবুও দেশের দীন সেবক হিসাবে আমরা স্বার্থহীন ভাষায় ইহা বলিব। আমরা বর্ত্তমান সরকারের আচরণও বুঝি না, সরকার-বিরোধীদের বর্ত্তমান মনোবৃত্তিও বুঝি না। এই দুইদলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আমরা মহাত্মাজীর দেওয়া পতাকা বহন করিয়া চলিব। তাঁহার সত্য ও অহিংসা জয়যুক্ত হউক।

পরলোকে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ : বিগত ২২শে জুন শ্রীনগরে রাত্রি প্রায় ৩-৪০ মিনিটের সময় নিখিলভারত জনসঙ্ঘের সভাপতি ও সংসদসদস্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন।

অকস্মাৎ ডা: শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হইল। অকস্মাৎ মৃত্যু বড়ই পীড়াদায়ক। ঘটনায় জন্ম কাহাকেও প্রস্তুত হইবার সময় না দিয়া যে ঘটনা ঘটে, তাহা মানুষকে অভিভূত করিয়া দেয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু এইজন্যই

আমাদিগকে বড়ই অভিভূত করিয়াছে। আরও দুঃখের কারণ এই যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হইল দূরদেশে, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের আকুল দৃষ্টির বাহিরে। নিজের ঘরে সকলের মধ্যে যদি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ চলিয়া যাইতেন—তবে আজ আমাদের এত ক্ষোভের কারণ থাকিত না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের বৃদ্ধা মায়ের কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও একদিন দূরদেশে যাইয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, আজ শ্যামাপ্রসাদও সেইভাবেই চলিয়া গেলেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা সত্যিই নাই। আমাদের এত ক্ষোভের অপর কারণ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু আমাদের কাছে খানিকটা রহস্যাবৃত বলিয়াই বোধ হইতেছে। কাশ্মীর সরকার উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া আমরা বুঝিতেছিনা। এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ও কাশ্মীর সরকারের বিস্তৃত ও স্পষ্ট বিবরণের অপেক্ষায় আমরা আছি।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, সমাজসেবার ক্ষেত্রেও তাঁহার দান অনেক। রাজনীতিক্ষেত্রে আসিয়া তিনি কিছুদিন হইল যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জনপ্রিয়তারই জন্য। রাজনীতিক্ষেত্রে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের তেজস্বিতার পরিচয় আমরা বহু পূর্ব্বেই পাইয়াছি। ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবের সময় মেদিনীপুরের জনগণের উপর পুলিশ ও সৈনিকেরা অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। এই লইয়া তৎকালীন গভর্ণর হার্বার্টের সহিত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের প্রবল মতবিরোধ হয় এবং তিনি অর্থমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। সমাজসেবা, রাজনীতি প্রভৃতির সঙ্গে যেমন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ যুক্ত ছিলেন, তেমনই বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গেও তাঁহার যুক্ততা ছিল। বাঙ্গালোর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের সহিত তিনি বহুবৎসর সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং শিক্ষা ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার দান সকলেই অবগত আছেন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের কার্য্য পরিচালক সভার সদস্য-হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থা তিনি কিছুদিন পরিচালনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যিক শ্যামাপ্রসাদকেও আমরা তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত পঞ্চাশের মন্বন্তর, ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল, বঙ্কিম-পরিচয় প্রভৃতি পুস্তকগুলির মধ্যে দেখিতে পাইব।

এভারেষ্ট বিজয় : কিসে যে মানুষকে এমন ঠেলিয়া লইয়া যায়—ভাবিলে

ভারী বিস্ময় লাগে। মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল মাটীতে হাটা। কিন্তু সে বলিল আমি পাহাড়ে উঠিব। চেষ্টা চলিল। একই রকম মনোবৃত্তির লোক বিভিন্ন দেশে জন্মিয়া থাকে। তাহারা বারে বারে একত্র হইয়া বারে বারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একবার দুইবার করিয়া দশবার এ চেষ্টা ব্যর্থ হইল—কৈলাশ পর্ব্বতের শীর্ষদেশে মানুষের পদচিহ্ন স্থাপনা করিবার গৌরব মানুষ লাভ করিতে পারিল না।

তারপরে এই ১৯৫৩ সালের মে মাসে ব্রিটিশ পর্ব্বতারোহীদল যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করিল—আশানিরাশার মধ্য দিয়া আসিয়া গত ২৯শে মে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

এই এভারেষ্ট বিজয় সম্বন্ধে দুইটী কথা ফুটিয়া উঠে। প্রকৃতিকে বিজিত করিতে পারিয়া মানুষের সে কি উল্লাস! দেশবিদেশে এই বিজয় মানুষকে—শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মানুষকে কি রকম উন্মাদের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা খুলিলেই তাহা বোঝা যাইবে। কেন এ উল্লাস?—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে বলিয়াই প্রকৃতি কেবলই মানুষকে হাতছানি দিয়া ডাকে, আর মানুষ কেবলই সেই ডাকে সারা দিতে ঝাপাইয়া পড়ে। অত্যুচ্চ পর্ব্বত তাহাকে আহ্বান করে, অতল সমুদ্র তাহাকে নেশা ধরাইয়া দেয়। এই ডাকে সারা দিতে পারিলে মানুষেরও আনন্দ, প্রকৃতিরও আনন্দ। প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ে উভয়কে চায়—তাই বিরাটের এই ডাকে সারা দিতে পারিলে মানুষ ও প্রাকৃতি পরস্পরকে নিকটতর করিয়া পায়। এই পাওয়ার নেশাই মানুষকে এমন উন্মাদ করিয়া তোলে। এভারেষ্ট বিজয়বার্ত্তা এইজন্যই সকলকে এমনভাবে নাচাইয়া তুলিয়াছে।

তেনজিং নোরেকে একজন নেপালী বটে কিন্তু তিনি বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেরই অধিবাসী। সেই তেনজিং শেরপাই সর্ব্বপ্রথমে এভারেষ্টে পদার্পণ করিয়াছেন—ইহাই এভারেষ্ট বিজয়ের অন্যতম সংবাদ। ঠিকই হইয়াছে—বিশাল হিমালয় কাহারও একার সম্পত্তি নহে, তাই তাহার বিজয়ের গৌরবও ভগবান বণ্টন করিয়া দিলেন। তবু একজন ভারতীয় যে এ সম্মান লাভ করিতে পারিয়াছে—ভারতবাসীর পক্ষে ইহা খুবই গৌরবজনক হইয়াছে। আমরা অপর এভারেষ্ট বিজয়ী ই, পি, হিলারীর সহিত তেনজিং নোরকেকে আমাদের বিশেষ অভিনন্দন জানাইতেছি।

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বল ভারত

৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৬০

'সর্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীল'

রেণু মিত্র

সব চেয়ে সহজ হয়েও যিনি সব চেয়ে দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছেন, সকলের চেয়ে প্রশংসিত হয়েও সকলের চেয়ে বেশী নিন্দা যাঁর ভাগ্যে জুটেছে, সবচেয়ে সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিত হয়েও যিনি সমাজের নিম্নতম লোকের অকুণ্ঠ পূজা লাভ করে গেছেন, তিনি সর্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীল ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। এই ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে অধিকতর কৃষ্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাশে সেই কত, কত দিন আগেই না তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন! তবু ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার কাছে আজও তিনি প্রোজ্জ্বল। সত্যে আর কল্পনায়, ইতিহাসে আর কিংবদন্তীতে, বোঝায় আর না বোঝায়, বৃন্দাবনে আর কুরুক্ষেত্রে সব কিছুতে মিলিয়ে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র এমন সীমাহীন রহস্যময় হয়ে পড়েছে যে, বিশ্বের মানুষকে তিনি যা দিতে এসেছিলেন, আজও তা দুর্বোধ্য হয়েই রইল। মানুষ ক্ষুদ্র হয়েও বিরাট, গভীর হয়েও বিস্তৃত, সীমার মধ্যে বাস করেও অসীম তার বুকের মধ্যে থেকে কেবলই তাকে ঠেলাঠেলি করে—এই কথাগুলি মনে করিয়ে দিতেই তিনি এসেছিলেন। বিশ্বের রূপজগৎ যে মানুষকে আকর্ষণ করে বিপদে ফেলবার জন্যেই সৃষ্ট হয় নি, বিশ্বের রসজগৎ যে মানুষের মোহ সৃষ্টি করবার জন্যেই নয়, বিশ্বের গন্ধ স্পর্শ ও শব্দজগৎ যে মানুষের কাছে শুধু ধরা পড়বার জন্য জালই নয়—এই

কথাগুলি সপ্রমাণ করবার জন্যেই তাঁর জন্ম। তিনি এই রূপরসের জগতকে তাঁর জীবনের সদর দরজা দিয়েই ভেতরে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন, অথচ তাতে তাঁর ব্রহ্মত্বের বা বিরাটত্বের হানি হয় নি একটুকু। তিনি নাচলেন, তিনি গাইলেন, তিনি খেললেন, তিনি ভালবাসলেন—অথচ বলছি তিনি ব্রহ্ম—আমাদের জানার সাথে এ বলা মেলে না। ব্রহ্ম শব্দটির সাথে একটা অচলত্ব, একটা চিরস্থিরত্ব, একটা অমরত্বের ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাই এ বিস্ময় কিছুতে আমাদের কাটতে চায় না যে, যিনি নাচলেন, গাইলেন, ভালবাসলেন, তিনি আবার ব্রহ্ম হলেন কি করে? ব্রহ্ম শব্দটির সঙ্গে আমাদের আরও যে-একটা ধারণা হয়ে গেছে সেটা এই যে, তিনি এক, তিনি একক। অথচ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কখনই একক নন, তিনি গোগোপসংঘাবৃত। সংঘ ছাড়া কখনও তাঁকে দেখতে পাই নে। তিনি কখনও গরুদের মধ্যে, কখনও গোয়ালাদের মধ্যে, কখনও গোপীদের মধ্যে, কখনও রাজ্য-শাসনের জটিলতার মধ্যে, কখনও যুদ্ধের মধ্যে—তাঁকে কখনও দেখলাম না তিনি মনে বনে ও কোণে বসে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

এমন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বোঝা সম্ভব হল না। মানুষের একটা মনোবৃত্তি এই যে, যা কিছু সে করে, তাই কিছু তার ভগবানও করবেন এমন যদি দেখে, তাহলে তেমন ভগবানকে আর তার পছন্দ হয় না। মানুষ খায়-দায়, কাজ-কর্ম করে, দশজনকে নিয়ে বাস করে; ভালমন্দ সুখদুঃখ নিয়ে তাকে কারবার করতে লয়—তাতে তার সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কত দিক দিয়ে কত রকম সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত এই নানা রকমের সমস্যা নিয়ে সে ভারাক্রান্ত। মানুষের বিবেচনা হল, যা কিছু নিয়ে সে পীড়িত, তার মুক্তি বা তার ভগবান হচ্ছেন সেই সব কিছুর বাইরে। তাই সে ঠিক করলে তার ভগবান কোন ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে থাকবেন না, থাকবেন সব কিছুকে ছাড়িয়ে। কিন্তু এ কথাটা মানুষ ভেবে দেখলে না যে, এই যা-কিছু সে করে তার সাথে যদি তার ভগবানের সত্য সম্বন্ধ না থাকে, তবে এই যা-কিছুর গৌরবই বা রইল কি, আর এ সবের ব্যাখ্যাই বা হবে কি করে! আমার যা-কিছুর সঙ্গে যদি আমার ভগবানের সম্পর্ক নাই রইল, তবে সে গুলি ভগবানের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে পৃথক অস্তিত্ব ও পৃথক মর্যাদা দাবী করে বসবে। আসলে আমার সমস্ত আচরণ

পরিকল্পিত হবে ব্রহ্মের আচরণ দেখে ও শুনে। না হলে ভগবানেরই গড়া এই বিশ্বে আমি জানব কেমন করে চলাফেরার ছন্দটা হবে কি? তাঁর গড়া বিশ্বে তিনি এসে যদি না বলে দেন আমার অসন বসন শয়ন, চলাফেরা কথাবার্তা কেমন হবে—এক কথায় আমার জীবনের মানদণ্ড হবে কি—তাহলে মানুষের সাধ্য কি সে অনন্তদেবকে হৃদিস্থ করে? মানুষের বুদ্ধি তো বিচ্ছিন্নতার বুদ্ধি; তার ভগবানের সঙ্গে সে তো এই সব কিছুকে একাত্ম করে দেখতে পায় নি, সে তো উভয়কে পৃথক করেই জানে। তাই তার সাধনাও বিচ্ছিন্নতা থেকেই। জপতপ ধ্যানধারণা দ্বারা এই রূপরসের জগৎকে পার হয়ে ব্রহ্মকে লাভ করবে—এই তার সাধনা।

শ্রীকৃষ্ণ আসলেন মানুষের এই ভুল সারাতে। তিনি বললেন ভগবান আর তাঁর সৃষ্টি একান্ত পৃথকই নয়। তিনি নিজে যদি জন্মাতে না পারেন, তবে তাঁর পক্ষে সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়। তিনি তাই জন্মেন—শুধু জন্মেন না—তাঁর অনন্ত জন্ম হয়। কিন্তু জন্মে'ও তিনি অজ। জন্ম-ভীতি না থাকাটাই জন্ম থেকে মুক্তি—অনন্ত জন্মেও যিনি আটকে পড়েন না, তিনিই অজ। অনন্ত বিশেষে যিনি আটকে নেই, তিনি নির্বিশেষ। কোন বিশেষত্ব না থাকার যে নির্বিশেষত্ব, সেটা নির্বিশেষের আংশিক অর্থ মাত্র। তাই তিনি জন্মালেন—জন্মে আমাদের জানালেন এই বিশ্বটার মধ্যে কেমন হবে আমাদের চলাফেরা অসনভূষণ—কেমন হবে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনযাপন। ব্রহ্ম-কৃষ্ণের আচরণ দেখে ঠিক করে নেব আমরা আমাদের আচরণ—এই জন্যেই তাঁর জন্ম নেওয়া, এই জন্যেই তদানীন্তন রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে তিনি জড়ীভূত। কেমন করে ব্রহ্মত্ব অটুট রেখেও হাসা যায়, গাওয়া যায়, নাচা যায়, ভালবাসা যায়, রাজনীতিতে শত্রুপক্ষের সঙ্গে কেমন ব্যবহার কোন্ দৃষ্টি নিয়ে চালান যায়, শ্রীকৃষ্ণ জীবনে আমরা তাই-ই দেখতে পাব, দেখে শিখে নেব।

এই সব কারণেই শ্রীকৃষ্ণচরিত্র এমন দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর সবটুকুকে ধারণা করা মানুষের পক্ষে ভারী অসুবিধা হয়। আমরা কেউ তাঁর বৃন্দাবন লীলা নিয়ে বাকিটুকুকে বাদ দেই, বলি বৃন্দাবনের কৃষ্ণের সাথে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নেই। কেউ বলি পার্থসারথীত্বই শ্রীকৃষ্ণের সত্যকার রূপ, তাঁর বৃন্দাবনলীলা কিংবা তাঁর আর কিছু প্রক্ষিপ্ত। এমনি বিচ্ছিন্নতার মাপকাঠী থাকাতেই তাঁকে আমাদের বুঝতে পারা এমন অসম্ভব হয়ে

পড়েছে। তাই তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টির বিভিন্ন ব্যাখ্যা এমন করে তাঁকে দুর্বোধ্য করে তুলেছে। কিন্তু তাঁকে আজ জীবনের দৃষ্টিতে বুঝতে হবে—একটা জীবন্ত অবস্থায় বিভিন্ন রকমের ঘটনা থাকবেই—সেখানে রাজনীতিরও প্রয়োজন হয়, আবার ভগবানকেও আস্বাদন করার দরকার হয়। নিজেদের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি এমনি পরস্পরবিরোধী ভাবসমূহ ও ঘটনাবলী রয়েছে সেখানে, নেই শুধু তাদের সমাধান, তাদের ব্যাখ্যা, তাদের গৌরব। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনেও তেমনি পরস্পরবিরোধী ভাব ও ঘটনাসমূহ দেখতে পাই—অথচ পাই তার ব্যাখ্যা, তার সামঞ্জস্য। তাই আজকের দিনের আমাদের পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী ঘটনাবলী ও চিন্তাধারার সংঘর্ষে আজ আমরা ক্লান্ত, অবসন্ন। একান্ত অজড় অমর ব্রহ্মবস্তু লাভের নেশা আজও আমাদের কাটে নি, কিন্তু একটা জড়ীয় সভ্যতার অক্টোপাস আমাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলেছে। আজ তাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে—যিনি আমাদের জীবনের হাসিখেলাকে ব্যক্তিগত পরিচ্ছিন্নতা ও ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদেরকে ব্যাপকতর জীবনের অধিকারী করে দেবার সাধনা শিখিয়ে দেবেন। তাই এই ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে আমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে আজ তাঁকেই আমরা ধ্যান করি, একদিন যিনি প্রকৃতিকে, নারীকে তার স্বয়ংমূল্যে স্বীকার করে তাকে গৌরবান্বিত করেছিলেন, জীবনের এই রূপরসের জগৎটাকে পদাঘাত করে এর প্রাপ্য মূল্য থেকে যিনি একে বঞ্চিত করেন নি, সামাজিক ও রাজনৈতিক নিপীড়নের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত যাজ্ঞসেনীকে অপমানমুক্ত করবার জন্যে যিনি একদিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন—বলে পাঠিয়ে ছিলেন, 'ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি। যৎ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥' এমন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আজ আমাদের বড় প্রয়োজন। নিপীড়িতের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মধ্যে অবতরণ করুণ, আমরা যেন তাঁরই গড়া এই বিশ্বে তাঁর মর্যাদা রেখে বেঁচে থাকতে পারি।

জন্মাষ্টমী তিথির সাথে সাথেই আরও একটী উৎসবক্ষণ মনে পড়ছে, যা উজ্জ্বল হয়ে আছে পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধার আবির্ভাবদ্বারা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম নামে পরিচিত—একজন পুরুষ মানুষ কত খানি মুক্তির আস্বাদন এই জীবনের ক্ষেত্রে লাভ করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত স্থাপনা করেই শ্রীকৃষ্ণ

পুরুষোত্তম। আর একটি নারী প্রকৃতি নিজের পরিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদাকে কতখানি গৌরবোজ্জ্বল প্রকাশ দান করতে পারেন, তারই দৃষ্টান্ত শ্রীরাধা ; তাই তিনি পরাপ্রকৃতি। শ্রীরাধার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পারস্পরিক সম্বন্ধদ্বারা মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে এইটেই প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষপ্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধটি ভোক্তা ভোগ্যের সম্বন্ধ নয়—কি পার্থিব ক্ষেত্রে কি অপার্থিব ক্ষেত্রে উভয়ের সম্বন্ধটি হচ্ছে দুইটি স্বতন্ত্র সত্তার পারস্পরিক মূল্য দানের, পারস্পরিক স্বীকৃতির। অর্থাৎ যে-কোনো দুইটী বস্তুর বা সত্তার সম্বন্ধ পরকীয় ; তারা পরস্পর যুক্তও বটে, পরস্পর অযুক্তও বটে।

শ্রীরাধা ঐতিহাসিক এ যখন বলা হয়, তখন বুঝি তাঁর জীবনের এই যে তত্ত্ব, তা-ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে আস্বাদন করা সম্ভব। মেয়েরা এমন হতে পারে যখন তাদের ক্ষুদ্র-আমিত্বকে, অপরা প্রকৃতিকে জয় করে তারা তাদের বড়-আমি বা পরাপ্রকৃতির প্রকাশকে ফুটিয়ে তুলতে পারে—শ্রীরাধা জীবনের সেই প্রকাশকেই প্রমাণিত করে গেছেন। জীবনের পরাপ্রকাশকে রূপ দিতে গেলে মেয়েদের কেমন হতে হয়, শ্রীরাধার জীবন থেকে তাঁর এই শুভরাধাষ্টমী তিথিতে আমরা তাই-ই অনুধ্যান করবার প্রয়াস পাব।

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরাধার অনন্ত গুণ সম্বন্ধে লিখছেন :

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা॥
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সংগীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্নর্মপণ্ডিতা॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্যাদা ধৈর্যগাম্ভীর্যশালিনী॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুলপ্রেমবসতির্জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ॥
গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা॥
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব।
ইত্যজোক্তিমনঃস্যাস্তে পরসংবন্ধগাস্তথা॥
গুণা বৃন্দাবনেশ্বর্যা ইহ প্রোক্তাশ্চতুর্বিধাঃ।
মাধুর্যং চারুতা নব্যং বয়ঃ কৈশোরমধ্যমম্॥

বিশেষণগুলি এই—মধুরা, নববয়া, চলাপাঙ্গা, উজ্জ্বলস্মিতা, চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা, গন্ধোন্মাদিতমাধবা, সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা, রম্যবাক্, নর্মপণ্ডিতা, বিনীতা, করুণাপূর্ণা, বিদগ্ধা, পটবাম্বিতা, লজ্জাশীলা, সুমর্যাদা, ধৈর্যগাম্ভীর্যশালিনী, সুবিলাসা, মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী, গোকুলপ্রেমবসতি, জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশা গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা, সখীপ্রণয়িতাবশা, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা, সন্ততাশ্রবকেশবা প্রভৃতি।

এই যতগুলি বিশেষণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই দুটো ভাগ দুটো বিভিন্ন প্রকৃতিকে প্রকাশ করছে। একদিকে তিনি মধুরা, নববয়া, চলাপাঙ্গা, সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা, রম্যবাক্, নর্মপণ্ডিতা, বিদগ্ধা, পটবাম্বিতা, সুবিলাসা; আর একদিকে তিনি উজ্জ্বলস্মিতা, চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা, গন্ধোন্মাদিতমাধবা, বিণীতা, করুণাপূর্ণা, লজ্জাশীলা, সুমর্যাদা, ধৈর্যগাম্ভীর্যশালিনী, মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী, গোকুলপ্রেমবসতি, জগৎচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশা, গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা, সখীপ্রণয়িতাবশা, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা, সন্ততাশ্রবকেশবা ইত্যাদি। অবশ্য এর মধ্যে কতকগুলি আছে যেগুলি তাঁর গুণের ফলস্বরূপ তিনি পেয়েছেন—যেমন গন্ধোন্মাদিতমাধবা, গোকুলপ্রেমবসতি, সন্ততাশ্রবকেশবা ইত্যাদি। যাই হোক, এই দুই জাতীয় বিশেষণ যে-দুইটী প্রকৃতি বা স্বভাবকে প্রকাশ করছে, তারা পরস্পরবিরুদ্ধ। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

'আমি যৈছে পরস্পরবিরুদ্ধধর্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে বিরুদ্ধধর্মময়॥'

মানুষ মনের একটা উচ্চতম স্তর লাভ না করলে পরস্পরবিরুদ্ধ গুণাবলীর অধিকারী হতে পারে না। মানুষের সভ্যতার মধ্যে এইটে সবচেয়ে সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম অবস্থা। একজনের পক্ষে নিজের মনটাকে এমন নমনধর্মশীল করা যে, সে বিনীতাও বটে বিদগ্ধাও বটে—এ খুবই কঠিন। এ অত্যন্ত মুক্ত মনের পরিচায়ক। বিনীতা হওয়া যে-প্রকৃতির ধর্ম, বিদগ্ধা হওয়ায় অর্থাৎ বিশেষভাবে দগ্ধ বা পরিপক্ক অর্থাৎ নিপুণ, চতুর বা রসিক হওয়ায় ঠিক তার বিপরীত চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন। তেমনি বিপরীতধর্মী চলাপাঙ্গ হওয়া ও সেই সঙ্গে লজ্জাশীলা হওয়া। আমাদের ঠাকুমা দিদিমারা ছিলেন বিনীতা, আর আজকের দিনে বিনয় আমরা ভুলে গেছি একেবারেই—একেবারে শিশু থেকে বড় পর্যন্ত প্রত্যেকে কেমন যেন বেখাপ্পাভাবে বিদগ্ধা হয়ে উঠেছি।

কিন্তু এতে যে আমরা ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সুস্থ ও সৌন্দর্যপূর্ণ হইনি, একথা সমাজ জীবনে আজ প্রত্যেকে পদে পদে অনুভব করছি। আবার আমাদের ঠাকুমা দিদিমা দলের স্বাতন্ত্র্যহীন একান্ত আত্মবিলুপ্তির মনোবৃত্তিও যে নারীর পক্ষে কিম্বা সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়, একথাও অনস্বীকার্য। তাই বাস্তবের দিকে চাইলেই দেখি একটা পরিপূর্ণ জীবন লাভের পক্ষে বিনীতা হওয়া যেমন নিতান্ত প্রয়োজন, তেমনি বিদগ্ধা হওয়া, নিপুণ, চতুর বা রসিক হওয়াও ততখানিই প্রয়োজন। অথচ আমরা তা হতে পারছি না বলেই আজকের দিনে আমরা জীবনে শুচিতা লাভ করতে পারছি না। তাই একটা ব্যাপকতর জীবনলাভের আহ্বান যখন আজকের পৃথিবীর আকাশে বাতাসে, তখন শ্রীরাধার জীবন আমাদের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে নারী তৎকাল-প্রচলিত সীমাবদ্ধ সামাজিক ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে পুরুষোত্তমকে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর এত বড় বিপ্লবাত্মক মনোবৃত্তির পরেও তাঁর সম্বন্ধে বিশেষণ দেওয়া হচ্ছে তিনি লজ্জাশীলা, ধৈর্যগাম্ভীর্যশালিনী, মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী; তিনিই আবার গোকুলপ্রেমবসতি—গোকুলবাসী সকলেরই স্নেহপ্রীতির বসতি স্বরূপ; তিনি জগচ্ছ্রেণীলসদ্যশা—যাহার যশে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তিনি গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা—গুরুজনের অতিশয় স্নেহের পাত্রী। এত বড় বিপ্লব করেও এতখানি মর্যাদা এই জন্যই তিনি লাভ করেছিলেন যে, তাঁর বিপ্লব ছিল সংগঠনাত্মক, তাঁর বিপ্লব ছিল জীবনের ব্যাপকতা ও গভীরতাকে রূপ দেবার প্রয়াস, পরস্পরবিরুদ্ধকে এক সূত্রে গেঁথে তোলবার সাধনা। সে সূত্র স্বয়ং সর্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীল পুরুষোত্তম। বিভিন্ন মতবাদের অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধতাকে সামঞ্জস্যীভূত করে যিনি প্রত্যেকটির বিষয়বস্তুরূপে প্রতিভাত হতে পারেন তিনিই সর্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীল পুরুষোত্তম। আজকের সভ্যতায় সর্ববাদ—সব রকম মতবাদ—আত্মপ্রকাশ করে বসে আছে—অথচ তাদের মধ্যে নেই সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, সৌন্দর্য। তাই আজকের দিনে সর্ব মতবাদকে স্বয়ংমূল্য দিয়ে একসূত্রে গেঁথে তুলবার জন্য যেমন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে প্রয়োজন, তেমনি বিপ্লব করেও, সনাতন বিধির বাইরে গিয়েও কি করে গৌরবময়, স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল অথচ সকলের প্রীতিজনক একটা ব্যাপক জীবন লাভ করা যায়, তারই জন্য দরকার শ্রীরাধাকে। আজ তাঁদের শুভ জন্মতিথি বাসরে তাঁদেরকে আমরা গভীরভাবে অনুধ্যান করি। আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে তাঁরা সুস্থ ও সার্থক করে তুলুন।

শ্রীরাধার এই যে জটিলতম জীবন, আর নায়িকারূপে বৈষ্ণব কবিদের হাতে তাঁর যে-রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে, এমন সূক্ষ্ম, এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন কোন বাস্তব নারীর হতে পারে—এ প্রত্যয় আমাদের হতে চায় না। নিজেরা আমরা স্বল্প, নিজেরা আমার একদেশদর্শী, তাই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে যতটুকু বা বুঝতে বা ধারণা করতে পারি, শ্রীরাধাজীবনকে একেবারেই আমাদের বোধের মধ্যে আনতে পারি না। মনে হয় দার্শনিক, কবি আর কিংবদন্তীর মিলিত সৃষ্টি ঐ অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য চরিত্র কখনও বাস্তব হতেই পারে না—ইতিহাসের মধ্যে তাঁর পায়ে-চলার পথ নয়। কিন্তু কিংবদন্তী বা কবি-কল্পনা যতই থাকুক না কেন, একজন বাস্তব ঐতিহাসিক শ্রীরাধা যদি না থাকতেন, তাহালে মানুষের সাধ্য ছিল না কেবল কল্পনাদ্বারা তাঁকে এমন দার্শনিক তত্ত্বগত অথচ জীবন্তরূপ প্রদান করতে পারে। সামঞ্জস্যের মনস্তত্ত্বে শ্রীরাধা চরিত্র একান্তই স্বাভাবিক। শ্রীরাধা সব চেয়ে সহজতম জীবনধারার একটি বাস্তব প্রকাশ; অথচ নিজেরা আমরা এমন অসহজ হয়ে পড়েছি যে, তাঁকেই বলি অবাস্তব। বাস্তব শ্রীরাধাই দার্শনিককে সন্তুষ্ট করেছেন. কিংবদন্তীকেও সন্তুষ্ট করেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একদিন এই বাস্তব শ্রীরাধাতত্ত্বকেই পরিস্ফুট করে গিয়েছিলেন। আমরা এই শ্রীরাধাকেই আমাদের জীবনে বরণ করে নিতে প্রয়াসী।

'When we talk of intuitional truths, we are not getting into any void beyond experience. It is the highest kind of experience when the intellectual conscience of the philosopher and the soaring imagination of the poet are combined.' —Radhakrishnan

জন্মাষ্টমী

যতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

দ্বাপরের কৃষ্ণপক্ষ ভাদরের ভরা অষ্টমীতে,
আজি কি ফিরিলে কৃষ্ণ স্মরি তব নব জন্মদিন ?
জীবনের কারাগারে, মানুষের কান্না শুনি ক্ষীণ,
শোন কি দেবকী কাঁদে, কংসাগারে ভয়ে আচম্বিতে ?

কংসেরা নিয়েছে জন্ম, এ কলিতে মানুষের ঘরে,
মহানিদ্রা ত্যজি কৃষ্ণ, ফিরে এসো আবার গোকুলে ;
দানবের অত্যাচারে, গোপনারী কাঁদে ফুলে ফুলে,
দেখনা শিশুরা কাঁদে নরনারী অনাহারে মরে ?

কেন জানি মনে হয়, কৃষ্ণ তুমি এসেছো গোপনে,
রাখাল বালক দলে সঙ্গোপনে চড়াইছো ধেনু ;
গোপিনীরা দিয়াছে কি আনি তব করপদ্মে বেণু ?—
হয়তো যশোদা তোমা পাঠাইবে কংসের নিধনে !

তাই হোক্, এসো কৃষ্ণ, ধরো অস্ত্র, কংস ধ্বংস করো,
মানুষের রূপে আসি, আজি পুনঃ রাজদণ্ড ধরো ।

চীনদেশ ও চীনদেশবাসী

লিন্-ইউ-তান্—অনুবাদক : মনোরঞ্জন গুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৬) অল্পে সন্তুষ্টি

চীন দেশে যারা বেড়াতে আসেন—বিশেষতঃ যারা পথের দুর্গমতা অগ্রাহ্য করে চীনের এমন সব দূর প্রদেশে যান, যেখানে কেউ বড় যায় না, তাঁরা দেখে অবাক হয়ে যান যে, জন-সাধারণের জীবন-যাত্রার মান এত নিকৃষ্ট, অথচ মনের প্রফুল্লতা ও সন্তুষ্টির অভাব নেই। এমন কি শেন্‌সি-র মত দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশেও চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত দু চার জন ছাড়া প্রায় সকলেই অতিশয় দুরবস্থা সত্বেও মোটামুটি খুসিই আছে এবং কোনো কোনো শেন্‌সি কৃষকের মুখে হাসিও দেখতে পাওয়া যায়।

চীনবাসীদের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে লোকের ধারণা অবশ্য অনেকটাই ভ্রান্ত ইউরোপীয় বিকৃত মানদণ্ডে ওজন করার ফল। এই মানদণ্ডের বিচারে অতিশয় উত্তপ্ত কোঠায় বাস না করলে এবং এক প্রস্ত রেডিও যন্ত্র না থাকলে মানুষ সুখী হতে পারে না। তাই যদি সত্য হয়, তবে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পৃথিবীতে কেউ সুখী ছিল না এবং বর্ত্তমানে ব্যাভেরিয়া থেকে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সুখী লোকের সংখ্যা হাজার গুণ লক্ষ গুণ বেশী। কেন না যুক্তরাজ্যের মত ব্যাভেরিয়াতে বিজলীর সাহায্যে বহুপ্রকারের কাজ হাসিল করার জন্যে সুইচ ও বোতামের নিশ্চয়ই এত ছড়াছড়ি নেই কিংবা সেখানে নাপিতের এমন সব চেয়ার থাকার সম্ভাবনা খুবই কম, যা ঘুরানো ফিরানো যায়, ভেঙ্গে তুলে রাখা যায়, উলটে বসা যায় কিংবা বসার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী আকার ধারণ করে। চীনের দেশ গাঁয়ে তো এরূপ সুইচ ও বোতামের আরো অসদ্ভাব, যদিও নাপিতদের পুরোনো ধরণের চেয়ার—যাকে সত্যিকারের চেয়ার বলা যায় এবং লণ্ডনের কিংস-ওয়ে ও প্যারী সহরের মণ্টমারটর্ অঞ্চলে যার দু চার খানা খুঁজলে এখনো পাওয়া যেতে পারে,—তা প্রগতিশীল সাংহাই নগর থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু যে-মানুষ

সত্যিকার চেয়ারে বসতে পায় এবং দিনের বিশ্রামোপযোগী যে সোফা, তাতে না ঘুমিয়ে সত্যিকার বিছানায় ঘুমুতে পায়, আমার মতে, সেই লোকই বেশী সুখী। অতএব একটা দিনের মধ্যে মানুষ ক'টা যান্ত্রিক বোতাম টিপে তার কাজ-কর্ম হাসিল করে, সেই সংখ্যার মাপকাঠিতেই যদি সংস্কৃতির বিচার করা হয়, তবে সে মাপকাঠিই ভ্রমাত্মক এবং ইউরোপীয়গণ এই ভুল মাপকাঠিতেই চৈনিকদের বিচার করে বলে তাদের অফুরন্ত সন্তুষ্টি ইউরোপীয়দের কাছে অবোধ্য রহস্যজনক বলে মনে হয়।

একথা অবশ্য সত্য যে, একই অবস্থায় পড়লে চীনের যে কোনো শ্রেণীর লোক ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অনুরূপ শ্রেণীর লোকদের চেয়ে হয়তো অধিকতর মানসিক প্রফুল্লতা ও সন্তুষ্টি রক্ষা করতে পারবে। চীনের জাতীয় ঐতিহ্য জাতির অন্তরে এমন গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে যে, মনের এই প্রফুল্লতা ও সন্তুষ্টি দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকের ভিতরেই তুল্য ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এই তুষ্টি-তৃপ্তির ভাব পিকিং সহরের অতিভাষী রহস্য-প্রিয় রিকশা-ওয়ালাদের ভিতরেও দেখতে পাওয়া যাবে। তারা যাত্রী নিয়ে যায়—পথে পথে সমস্তটা পথ তাদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করে এবং কাউকে পড়ে যেতে কিংবা অন্য কোনো ছোট খাট অসুবিধায় পড়তে দেখলে, অমনি কৌতুকের হাসি হেসে উঠবে। যে সব কুলি যাত্রীদের সিডান-চেয়ারে করে বয়ে নিয়ে কুলিং পাহাড়ের উপরে উঠতে অতিমাত্র শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেই অবস্থায়ও তাদের মনে প্রফুল্লতার অভাব হয় না। নৌকার মাঝিদের সম্বন্ধেও সেই কথা। তারা হয়তো যাত্রী নিয়ে সেচুয়ান প্রদেশের খর-স্রোতা নদীতে অতিকষ্টে উজান বেয়ে চলে, কিন্তু তারা যদি তাদের রোজগারে দুই বেলা সাধারণ খাবারও পেট ভরে খেতে পায়, তবে আর তাদের মনের আনন্দে ভাটা পড়ে না। চৈনিক তুষ্টি-তৃপ্তির আদর্শ অনুসারে খুব ক্লেশকর পরিশ্রম না করে সাধারণ খাবারও পেট ভরে খেতে পাওয়াই লোকে সৌভাগ্য বলে মনে করে এবং তাতেই তারা খুসী। জনৈক চৈনিক লেখক বলেছেন—"পেট ভরে খেতে পাওয়াই হচ্ছে বড় কথা এবং আসল কথা—তার অতিরিক্ত যা কিছু, সবই অনাবশ্যক সৌখিনতা।"

চীনবাসীদের একটা প্রথা আছে—তারা নববর্ষের প্রথম দিনে এক খণ্ড লাল কাগজে "দয়ার্দ্র-চিত্ততা" "শান্তি-প্রিয়তা" এবং তার সঙ্গে "সন্তোষ"—এই তিনটে কথা লিখে বাড়ীর দরজার উপরে আঁঠা দিয়ে এঁটে রেখে দেয়।

সংযম সম্বন্ধে চৈনিক উপদেশ প্রচারের কার্য্যকরী পন্থা হিসেবে এই প্রথা উদ্ভূত এবং এরূপ উপদেশ মানুষের পরিপক্ক জ্ঞানের ফল, যে জ্ঞান বলে—যখন সৌভাগ্য আসে, তখন রয়ে সয়ে সুখ ভোগ করতে হয়। এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন সিং রাজত্বের সময়কার এক লেখক এই বলে যে, "সুখ ভোগের বিষয়গুলির মধ্যে যা সাধারণ, যাতে সুখের উগ্র উন্মত্ততা নেই, সুখ ভোগের ব্যাপারে সেই গুলিই বেছে নিতে হয়।" লায়োৎসে-র উপদেশ-সূচক সংক্ষিপ্ত উক্তিগুলির মধ্যে এইটে একটা প্রবাদ-বাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, "নিজের অবস্থায় যে সুখী, তার কোনো অপযশের সম্ভাবনা নেই।" এই প্রবাদ-বাক্যটি এ ভাবেও বলা হয় যে, "যা আছে, তাতেই যে সুখী, সে চির সুখী।" সাহিত্যে এই ভাবটা রূপ লাভ করেছে পল্লীজীবনের প্রশংসায় এবং এরূপ লোকের গুণ-গানে, যে উদ্বেগ-অশান্তিতে বিশেষ ক্লিষ্ট হয় না। যে কোনো কবিতা এবং ব্যক্তিগত চিঠি পত্রে এই ভাবটারই প্রাবল্য দেখা যায়। মিং লেখকদের চিঠি পত্রের সঙ্কলন থেকে কিছুমাত্র বাছাবাছি না করে একটা চিঠির খানিকটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। লু সেন তার এক বন্ধুকে লিখেছেন :— "আজ রাত্রে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হবে। একখানা চিত্রিত পানসী নৌকা এবং তাতে কয়েকটি গায়িকা—যোগাযোগটা কেমন মনে হয়?..............শরতের এই প্রারম্ভে একটা রাত আমার এখানে এসে কাটিয়ে যেতে পারো না? আমি পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর এক আলখাল্লা বানাতে দিচ্ছি এবং এর পরে আমার পদ-ত্যাগপত্র গৃহীত হ'লে, আমি সত্যি সত্যি সকল দুর্ভাবনা-মুক্ত পাহাড়-বাসী বা বন-বাসী বৃদ্ধ বনে যাবো।" এরূপ ভাব যখন চীনের শিক্ষিত ব্যক্তিদের চিন্তা ও অনুভূতির বিষয় হয়ে ওঠে, তখন তার ফলে তারা সামান্য কুটিরেও সুখে শান্তিতে ও মনের আনন্দে কাল কাটাতে সমর্থ হয়।

মানুষের সুখ অতিশয় ক্ষণ-ভঙ্গুর। স্পষ্টতঃ দেবতারাই যেন তাতে বাদী। জীবনে সুখের সমস্যাই সব চেয়ে কঠিন সমস্যা—সমাধান মিলেও যেন মেলে না। সংস্কৃতি ও প্রগতি সম্বন্ধে যা বলবার ও যা করবার, সব বলা ও করা হয়ে গেলেও, এ সমস্যা অমীমাংসিতই থেকে যায় এবং চির দিন মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা এ সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত থাকবে। চীনবাসীরা তাদের স্বাভাবিক সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝেছে যে, এই সমস্যার সমাধানই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা এবং সেই চেষ্টায় তারা তাদের শ্রেষ্ঠ শক্তি নিয়োগ করেছে এবং

ইউরোপীয় হিতবাদীদের মত তারাও প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে প্রগতির সমস্যা থেকেও সুখের সমস্যাকেই বড় স্থান দিয়েছে।

বারট্রাণ্ড্ রাসেলের পত্নী ঠিকই বলেছেন যে, সুখের অধিকার বলে যে একটা অধিকার মানুষের থাকতে পারে, পাশ্চাত্যের লোকেরা তা ভুলেই গিয়েছে—সে সম্বন্ধে কারোরই যেন কোনো গরজ নেই—তারা অন্যান্য গৌণ অধিকারের ব্যাপার নিয়েই মহা ব্যস্ত—যেমন, ভোটের অধিকার, রাজকীয় ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করার অধিকার, গ্রেপ্তার হ'লে পরে আইনতঃ বিচার-লাভের অধিকার, যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার ইত্যাদি। গ্রেপ্তার হ'লে পরে বিচার লাভের অধিকার কখনো বিবেচনার বিষয় বলে চীনবাসীরা মনে করেনি। কিন্তু সুখী হওয়ার অধিকার সম্বন্ধে তারা সর্ব্বদা সজাগ—তাদের বিশ্বাস যে দারিদ্র্য, অপযশ, যা-ই আসুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই এ অধিকার থেকে কেউ তাদের বঞ্চিত করতে পারে না। সুখের সমস্যা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের দৃষ্টি-ভঙ্গি ইতি-মূলক কিন্তু চৈনিকদের দৃষ্টি-ভঙ্গি নেতি-মূলক। বস্তুতঃ এই প্রশ্নের বিচার-বিশ্লেষণের পরে, শেষ পর্য্যন্ত যা গিয়ে দাঁড়ায়, তা হচ্ছে আসলে মানুষের কামনা-বাসনার প্রশ্ন।

প্রকৃত পক্ষে আমরা কি যে চাই, কি যে আমাদের সত্যিকার কামনা বাসনা, সে সম্বন্ধেই আমাদের বুদ্ধির ঠিক নেই। এই কারণেই ডায়োজিনিস্-এর গল্প আধুনিক কালের মানুষের অনিবার্য্য হাস্য ও খানিকটা বিদ্বেষ উদ্রেক করে। তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি পরিপূর্ণ রূপে সুখী, যে হেতু তিনি সংসারে কিছুই চান না। তাঁর জীবনের আর একটা ঘটনা হচ্ছে এই যে, একটা ছেলেকে হাতে করে জল পান করতে দেখে তাঁর নিজের হাতে যে পানপাত্র ছিল, তা তিনি ফেলে দিয়েছিলেন। এই হচ্ছে ডায়োজিনিসের গল্প। কিন্তু এই আত্ম-সংযমের গল্প শুনে আধুনিক কালের মানুষ বক্র হাসি হাসে। আধুনিক কালের মানুষ বহু সমস্যারই কূল-কিনারা খুঁজে পায় না। ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে তো কথাই নেই—সে সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেকেই অতিমাত্র সংশয়বাদী। সুখ-ভোগের মাঝে থেকে সে ডায়োজিনিসের সংযমাদর্শ সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষের ভাব পোষণ না করে পারে না, অথচ একটা ছায়া-চিত্র অথবা ভাল একটা প্রদর্শনী দেখবার সুযোগ উপস্থিত হ'লে, সে সুযোগ ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়।

এর ফলেই আসে চিত্তের অস্থিরতা, যা বর্ত্তমান যুগের মানুষের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চীনবাসীরা কোনো বিষয়েই আতিশয্য পছন্দ করে না। তাই তারা সংযম সম্বন্ধে ডায়োজিনিসের মত অতটা আতিশয্যের ভিতরে কখনই যায় না। তাদের প্রকৃতিগত সন্তুষ্টি-বাদ সুখ সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি নেতি-বাচক করে গড়ে তোলে। ডায়োজিনিসের সঙ্গে তাদের পার্থক্য এই যে, ডায়োজিনিস্ কিছুই চান না, কিন্তু তারা সামান্য কয়েকটী জিনিষ মাত্র কামনা করে। সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবার জন্যে যে কয়টী জিনিষ না হ'লেই নয়, শুধু তা-ই তারা চায় এবং তা-ও যদি পাওয়ার সম্ভাবনা না দেখে, তবে আর তা পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে না। এক জোড়া পরিষ্কার কামিজ অন্ততঃ পক্ষে তাদের চাই। কেন না, গল্পের ডায়োজিনিস হয়তো আধ্যাত্মিক সুরভি বিস্তার করতে পারেন, কিন্তু সত্যি সত্যি সে মানুষটি যদি ঘরের মানুষ হয়, তবে তাকে নিয়ে চলা মুস্কিলের কথা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোনো চীনবাসী যদি এত গরিব হয় যে, একটার বেশী জামা জোটাতে পারে না, তাহলেও তার মনে কোনো নালিশ জমবে না—একটা জামাতেই সে খুসি থাকবে। ডায়োজিনিসের থেকে তাদের আর একটা পার্থক্য এই যে, তারা খানিকটা জাক-জমক ভালবাসে এবং তা করতে পারলে খুব একটা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু তা যদি করতে না পারে, তা হলেও যে মনে খুব একটা দুঃখ পাবে—নিজেদিগকে অসুখী মনে করবে তা নয়। অনেক দিনের প্রাচীন কতগুলি লম্বা লম্বা গাছ তাদের বাড়ীর আশে পাশে থাকে, এটা তারা চায়; তবে বাড়ীর প্রাঙ্গণের একটা সামান্য খেজুর গাছ নিয়েও তারা তুল্য রূপেই সুখী হবে। যে কোনো চৈনিক বহু সন্তান কামনা করে এবং এমন একটি পত্নী, যে নিজের হাতে তার পছন্দ-সই খাবার তৈয়ের করে দেবে। যদি সে ধনবান হয়, তবে তার আরো চাই একটি ভাল পাচক এবং একটি সুন্দরী পরিচারিকা, যে লাল একটি পা-জামা পরে' তার পড়া বা ছবি আঁকার সময়ে ঘরে ধূপ-ধুনো বা অন্য কোনো সুগন্ধী দ্রব্যের ধূয়োঁ দেবে।

আর চাই তার কয়েকটি ভাল বন্ধু এবং বন্ধুস্থানীয়া এমন একটি মহিলা যে তার মনের ভাব বুঝবে এবং আলাপ আলোচনায় যোগ দিতে পারবে। সব চেয়ে ভাল হয় যদি তার বিবাহিত স্ত্রীর সে যোগ্যতা থাকে। তা যদি না হয়, তবে কোনো একটি ব্যবসাদার গায়িকা হ'লে চলে। কিন্তু এরূপ

বিপুল সুখ ভোগের অদৃষ্ট নিয়ে যদি সে জন্ম গ্রহণ করে না থাকে, তা হলেও এত সব নেই বলে যে সে নিজেকে বিশেষ অসুখী মনে করবে, তাও নয়। আসল কথা তার পেট ভর্ত্তি খেতে পেলেই হ'ল এবং তার জন্যে কাঁজি বা ফেণ-ভাত ও গাজোরের আচার যোগাড় করা এমন কিছু খরচের ব্যাপারও নয়। তার আর দরকার বেশ বড় এক পেয়ালা মদ। কিন্তু খেনো মদ সে অনেক সময় নিজের ঘরেই তৈয়ের করে নেয় এবং তা যদি নাও করে, তবে দু চার পয়সা দিয়েই সে যে-কোনো মদের দোকান থেকে এক পেয়ালা ভাল পুরানো মদ কিনে নিতে পারে। আর চাই তার খানিকটা বিশ্রামের অবসর, যার অভাব নেই চীন দেশে কোনো লোকেরই বড় একটা এবং সে যদি কোনো বেণুবনাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে কোনো সংসার-বিরাগী সাধুর সান্নিধ্যে দিনের অর্দ্ধেকটা সময় আরামে ও শান্তিতে কাটাতে পারে, তবে সে মুক্ত বিহঙ্গের মতই নিজেকে সুখী মনে করে। যদি বড় একখানা প্রমোদ-কুঞ্জের ব্যবস্থা সম্ভবপর নাও হয়, তবে অন্ততঃপক্ষে একখানা নিরিবিলি কুটির তার চাই কোনো পাহাড়ের এমন জায়গায়, যার পাশ দিয়ে ছোট্ট একটি পার্ব্বত্য নদী কুল্‌ কুল্‌ রবে বয়ে যাচ্ছে; অথবা এমন কোনো উপত্যকা প্রদেশে যেখানে সে বিকেল বেলায় বড় নদীর তীরে গুন্‌ গুন্‌ করে গান গেয়ে বেড়াতে পারে এবং ইচ্ছামত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করমোর‍্যাণ্ট পাখীর মাছ ধরা দেখতে পারে। কিন্তু এরূপ সুখ ভোগের সৌভাগ্য যদি তার অদৃষ্টে না জোটে এবং যদি তাকে সহরেই বসবাস করতে হয়, তবে তাতেও যে সে বিশেষ অসুখী হবে তা নয়। কেন না, সে ক্ষেত্রেও সে খাঁচায় পাখী পুষতে পারে, দু চারটা ফুলের টব রাখতে পারে—আর চাঁদ তো আছেই। চাঁদের দাক্ষিণ্য থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। কবি সু তুংপো চাঁদের দাক্ষিণ্য সম্বন্ধে অমূল্য মণি-হার সদৃশ চমৎকার এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন—"চেংটিয়েনে নিশা-ভ্রমণ"। তার খানিকটা উদ্ধৃত করে দেওয়া যাচ্ছে :—

"ইউয়ানফেং অব্দের ষষ্ঠ বছরের দশম শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে রাত্রিবেলা পোষাক ছেড়ে ঘুমুতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে দেখলাম চাঁদের আলো দোর পেরিয়ে ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে। হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে আমি উঠে পড়লাম। ভাবলাম—আমার এ আনন্দের ভাগ নিতে কেউ নেই—আমি একা। তাই হুয়েইমিনের খোঁজে আমি চেংটিয়েন মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। হুয়েইমিন-ও তখনো শুতে যায়নি। আমরা দুজনে

জোছনা-ভরা প্রাঙ্গনে পায়চারি করতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল, প্রাঙ্গণটা যেন স্বচ্ছ একটি ক্ষুদ্র জলাশয়—তার বুকে জলীয় ঘাসের ছায়া। কিন্তু আসলে তা হচ্ছে চাঁদের আলোয় পাইন ও বেণু-বনের ছায়া। রাতের বেলায় চাঁদের আলোর কি কখনো অভাব হয়? বেণু ও পাইন গাছই বা নেই কোথায়? কেবল আমাদের দুজনের মত চিন্তা-ভাবনাহীন মানুষই দুর্লভ"।

জীবনের মধু-চক্র থেকে যতটা মধু আহরণ করা যায়, তার জন্যে একটা সবল দৃঢ়-সঙ্কল্প, নিজের যা আছে, তা নিয়েই সুখে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং অকৃতকার্য্যতার জন্যে মনে কোনো আক্ষেপ পোষণ না করা—স্বভাবের এই সব বিশেষত্বই হচ্ছে সর্ব্বদার তরে মনের সন্তোষ বজায় রাখা সম্বন্ধে চৈনিক প্রতিভার গুপ্ত রহস্য।

ক্রমশঃ

পল্লী-সন্ধ্যা

মীরা চট্টরাজ

দূর পথরেখা আঁধারে ঢাকিল
সন্ধ্যা নামিছে ধীরে।
সাঁঝের তারাটি উঠিয়াছে ফুটি
ফিরিতেছে পাখী নীড়ে॥
পল্লীর বধূ ফিরিয়াছে পথে
কলস তুলিয়া কাঁখে।
ক্লান্ত কৃষাণ বিদায় ছন্দে
গাহি ফেরে বন বাঁকে॥

'ক্ষণিকের চির মায়া'ময় এই বিশ্বে নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির কোন স্থান আচার্য্য শঙ্কর স্বীকার করিতে পারেন নাই। কেননা একবার প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে তাহার উপরম আর সম্ভব হয় না। উপরম সম্ভব না হইলে তো ক্ষণিকবাদই আর দাঁড়ায় না। অথচ ক্ষণ সমূহের মধ্যে প্রবৃত্তি না থাকিলে তাহারা 'সমুদায়' সৃষ্টিই বা করিবে কি করিয়া? ক্ষণিকের তো কোনও ব্যাপার সৃষ্টি করিবার যো নাই। অথচ একটা ব্যাপার সৃষ্টি করিতে হইলে 'সমুদায়' চাই-ই। তবেই দেখিতেছি যে, ক্ষণকে প্রবৃত্ত হইতে হইলে চাই 'সমুদায়'; আবার সমুদায়কে দাঁড়াইতে হইলেও চাই 'ক্ষণ'। ক্ষণ ও সমুদায়ের মধ্যে এই vicious circle আসিয়া পড়ে। ক্ষণ ছাড়া সমুদায় হয় না, সমুদায় ছাড়াও ক্ষণ হয় না। ইহাই রবীন্দ্রনাথের 'ভেসে যদি যাও যাবে এক সাথে সকলের সাথে রহি।' ক্ষণ-সমুদায়ের এই ঝগড়ার মূল রহিয়াছে সৃষ্টি-ব্যাপারকে এমন একটা মৃতযন্ত্র বলিয়া মানিয়া লওয়ার ভিতর, যে মৃতযন্ত্রের ক্ষুদ্রতম অংশটাও ব্যাপক মৃতযন্ত্রের সমস্ত বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য। এখানেই চলে সমুদায়ের অত্যাচার ক্ষণের উপর, এইখানেই সৃষ্টি হয় আলোর পথ ও আঁধারের পথের মাঝে ঝগড়া। জীবন্ত যন্ত্রের ভিতর ক্ষুদ্রতম অংশও স্বয়ংপূর্ণ, এবং তাহার বিধিও ভিন্ন। 'সমুদায়' সেখানে ক্ষণের সাথী। সমুদায়ের সঙ্গে ক্ষণগুলির সম্বন্ধ এইরূপই যে, প্রতি ক্ষণটী এখানে এক একটী 'সমুদায়' বলিয়া যায়; এবং এইরূপ অনন্ত সমুদায়-ক্ষণগুলির অন্যোন্য-মৈথুনের ফলেই গড়িয়া উঠে আবার একটী নূতন সমুদায়, নূতন বিশ্ব। 'The organised being is the being in which all is reciprocally end and means'—Kant. 'There is no contradiction in this, that an independent being should be at the same time a member of a system; it lives at once *by* and *for* it; it is therefore, as Kant said, both *means* and *end*. And, finally, that in the cell itself, considered as nucleus of life, all the parts are correlatives to the whole, and the whole to the parts.'—Final Causes by Paul Janet. P 48 (foot note).

যে মৃতযন্ত্রের ভিতর ক্ষণ ও সমুদায়ের স্বার্থ পরস্পরবিরুদ্ধ, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'ভিৎ ফেঁদে যারা তুলিছে দেয়াল' ইত্যাদি লিখিয়াছেন।

যেদিন বিশ্বের দার্শনিকবৃন্দ প্রাণধারাকে গৌণ স্থান দিয়া একান্ত প্রজ্ঞাকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর শক্ত দেওয়াল তুলিল এবং সেই ভিত্তির উপর

সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা দাঁড় করাইল, তখনই যে তাহারা বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিয়াছিল, আজ তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা দাঁড় করাইয়া 'বিজয়-তোরণ গাঁথে তারা যত আপনার ভারে ভেঙ্গে পড়ে তত।' ভারতবর্ষ উচ্চনীচ ভেদের উপর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া একরূপ চলিয়াছিল, কিন্তু সেই top-heavy (মাথা-ভারী) ব্রাহ্মণপ্রধান, সত্ত্বপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা যে আজ আপনা আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আর সমাজের সকল মাথাগুলি অসহায় ভাবে ধরার ধূলায় লুটাইতেছে, তাহা বুঝিবার জন্য বেশী বুদ্ধি খরচ করিবার প্রয়োজন নাই। উচ্চ অভিমানে প্রমত্ত যাহারা নীচে অবাঞ্ছিতদের এতদিন অপমান করিয়াছে, আজ তাহারাই এতদিনকার সমাজ ব্যবস্থায় নীচদের সমান আসনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কালের বিধানে আজ উচ্চ-নীচ সমস্তরে দাঁড়াইয়া। প্রচলিত বর্ণাশ্রম আজ ভাঙ্গিয়া চৌচির। তাই 'কাল' আজ বালকের মত এই সব 'ভাঙ্গা ঢেলা' লইয়া খেলা করিতেছে। সব উচ্চ বর্ণ, সব উচ্চ আশ্রম আজ ভাঙ্গা ঢেলার মত তুচ্ছ মলিন। তাই শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন: 'আধুনিক চতুর্বর্ণ শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণ নহেন। শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণ অদ্যাপি নাই। শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণের বিরুদ্ধে আমার কোন কথাই বলিবার নাই।'—জাতিদর্পণ, পৃঃ ৪১৫।

প্রাণধারা-স্পর্শহীন এ-দেশের প্রচলিত বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সর্ব্বপ্রথমে আত্মা ও অনাত্মার ভেদের উপর। বর্ণাশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে আত্মাকে ভিত্তি করিয়া; আত্মাই এখানে পারমার্থিকভাবে সত্য, অনাত্মার আছে শুধুই একটা ব্যবহারিক সার্থকতা; পারমার্থিকভাবে অনাত্মার কোনও মূল্যই নাই। অনাত্মার স্পর্শ ও সম্পর্ক ছিল এতদিন আত্মার পক্ষে 'হেয়'। আত্মাই মুখ্য, অনাত্মা গৌণ; আত্মাই শুধু end (উদ্দেশ্য), অনাত্মা শুধুই means (উপায়)। আত্মা-অনাত্মা দুই-ই যে প্রাণধারার মাঝে সমভাবে উদ্দেশ্য ও উপায়, এই যান্ত্রিক বর্ণাশ্রমে তাহা স্বীকৃত হয় নাই। এই বর্ণাশ্রমে আত্মার জন্যই অনাত্মা—অনাত্মার জন্য কোনও দিনই আত্মার কোন অপেক্ষা নাই। স্বতন্ত্র আত্মা অনাত্মা-নিরপেক্ষ থাকিতে পারে; কিন্তু পরতন্ত্র অনাত্মা কোনও কালে বা কোনও অবস্থায়ই আত্মার অপেক্ষা না করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু একান্ত নিরপেক্ষ একান্ত নির্ম্মল আত্মা কেমন করিয়া মলিন-অনাত্মার সঙ্গে যুক্ত হইল, তাহা কোনও যুক্তিতে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। আত্মা-অনাত্মার সম্পর্ক হইলেও আত্মা থাকিয়া যায় অনাদি-অনন্ত, আর অনাত্মা হয়

অনাদি কিন্তু বিনাশশীলা। বিনাশশীলা এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া অবিনাশী আত্মাকে পাওয়ার দিকেই তখন সাধকের থাকে লক্ষ্য; সাধকদের অনাত্মার ক্ষেত্রের উপর তাই কোনও 'দরদ' থাকা স্বাভাবিক নয়। ইহার ফলে অনাদৃত অনাত্মার ক্ষেত্র গ্লানিগ্রস্ত হইয়া, পুঞ্জীভূত মলিনতায় ভারী হইয়া আত্মাকে পর্যন্ত টানিয়া নামায় ও পদদলিত করে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের 'আপনার ভারে ভেঙ্গে পড়ে তত।' অনাত্মার সঙ্গে সমন্বিত না হইলে আত্মা নিজের কাছেও নিজে ভারী হয়।

আত্মা অনাত্মার এই সম্পর্ক একবার যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করা হইলে ইহাকে ভিত্তি করিয়া পরে যুক্তিযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বরচনার ক্ষেত্রে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের একটী hierarchy (উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থা) বা ladder system (সিঁড়িতন্ত্র), যাহার মধ্যে সত্ত্বগুণ হইয়া পড়ে সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপ, রজোগুণ তাহার নিম্ন ধাপ, তমোগুণ হইল সর্ব্বনিম্ন ধাপ। সাধক তমোগুণ হইতে ধাপে ধাপে উপরে উঠিতে উঠিতে আত্মার ক্ষেত্রে উপনীত হইবে, তখন সিঁড়ির আর কোনও প্রয়োজনই থাকিবে না। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপ হইবার যোগ্যতা এই জন্যই লাভ করিয়াছে যে, সর্ব্বগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণই বেশি স্থিতিশীল (static) এবং এই স্থিতিধর্ম্মী সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিলে সহজেই স্থিতিধর্ম্মী আত্মাকে লাভ করা সম্ভব হইবে। সত্ত্বগুণ তাই রজোগুণ হইতে কুলীন। সত্ত্ব-রজো-তমঃ-র মধ্যে এই উচ্চ-নীচ বিভেদ একবার স্থাপিত হইলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, উহাদের মধ্যে আপনা হইতেই সঙ্ঘর্ষ আসিয়া পড়িবে; প্রত্যেকেই চাহিবে স্ব স্ব প্রাধান্য, একে অপরকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য একটা হুড়াহুড়ি। 'রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।' রজস্তমোগুণের প্রীতিস্পর্শহীন, সঙ্ঘর্ষক্লান্ত সত্ত্বগুণ আপনার 'ভারে' একদিন রজস্তমের চরণতলে লুটাইবেই। সত্ত্বগুণ যেমন স্থিতি-ধর্ম্মপ্রধান, রজোগুণ তেমনি বেগ-ধর্ম্মপ্রবল। সত্ত্ব-রজ-এর টানাটানিতে রজঃই প্রাধান্য লাভ করে, বেগ-ধর্ম্ম স্থিতিকে বানচাল করিয়া দেয়। রজোগুণের নিকট সাত্ত্বিকদের আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত সাধন ক্ষেত্রে মোটেই বিরল নয়।

কিন্তু পুরুষোত্তম দর্শনে গুণত্রয়ের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া কাড়াকাড়ির কোনও অবসরই নাই। এখানে আত্মা ও অনাত্মা, ব্রহ্ম ও মায়া, পুরুষ ও প্রকৃতি সমকক্ষ। দুইই অনাদি ও অনন্ত। এমন অবস্থা কোনও দিনই আসিবে না,

যেদিন অনাত্মা থাকিবে না, থাকিবে শুধু আত্মা ; মায়া থাকিবে না, থাকিবে শুধু ব্রহ্ম ; প্রকৃতি থাকিবে না, থাকিবে শুধু পুরুষ। যে অবস্থাকে আমরা 'নির্গুণ' বলি, সেখানেও অনাত্মা প্রকৃতি অব্যক্তভাবে থাকিয়াই যায়। ইহা নিত্যগোপাল সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। পুরুষোত্তম দর্শন প্রথমতঃ বিশ্ব-বিশ্বাতীতের এবং পরে বিশ্বস্থিত একের সঙ্গে অপরের উচ্চ নীচ শ্রেণী-বিভাগ স্বীকার করে না। এই দর্শনের মধ্যে আত্মার সঙ্গে অনাত্মার প্রতিটি বিকাশেরই সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে; এখানে আত্মা-অনাত্মা দুই-ই correlative (পরস্পরাপেক্ষ)। বর্ণাশ্রম যে-দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-দর্শনে সত্ত্বগুণের মধ্য দিয়া ছাড়া কেহ সিধাসিধি আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। পুরুষোত্তমদর্শন সত্ত্বগুণীর এই মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকার করে না। কৃষ্ণার্পিত সত্ত্বগুণ হইতে কৃষ্ণ যতদূর, কৃষ্ণার্পিত রজোগুণ হইতেও কৃষ্ণ ততদূর, কৃষ্ণার্পিত তমোগুণ হইতেও কৃষ্ণ ততদূর। গুণকৌলীন্য এবং গুণকৌলীন্য হইতে জাত কর্ম্মকৌলীন্য পুরুষোত্তমদর্শনে নাই।

'গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসঃ দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ঃ নৃপাঃ।
সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং বয়ং ভক্ত্যা বিভো॥'

—'হে বিভু যুধিষ্ঠির, গোপীগণ কাম হইতে, কংস ভয় হইতে, শিশুপালাদি দ্বেষ হইতে, বৃষ্ণিকুলোদ্ভূত যাহারা তাহারা সম্বন্ধ হইতে, আপনারা স্নেহ হইতে এবং আমরা নারদাদি ভক্তিদ্বারা পাইয়াছি'। তাহা হইলে কামদ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায়, ভয়দ্বারাও কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, দ্বেষ দ্বারাও কৃষ্ণকে পাওয়া যায় ; সম্বন্ধদ্বারা কৃষ্ণ মিলে, স্নেহ দ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায়, ভক্তিদ্বারাও কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। অথচ কাম রজোগুণ, ভয় তামস, নারদীয়া ভক্তি সাত্ত্বিকী। এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, সাত্ত্বিক কর্ম্ম, রাজস কর্ম্ম ও তামস কর্ম্মদ্বারাও 'সাক্ষাৎ অপরোক্ষ' ভাবে ভগবানের অর্চ্চনা করা যাইতে পারে ; এবং বর্ত্তমান যুগে ইহাই পরধর্ম্ম। আজ বিশ্ববাসী উচ্চ-নীচ সকলেই পুরুষোত্তমের খাস তালুকে বাস করিতেছে।

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥'

ক্লীবলিঙ্গ 'যৎ'-পদদ্বারা সাত্ত্বিক, রাজস, তামস যে কোনো কর্ম্মই বুঝাইবে। অর্জ্জুন পুরুষোত্তমকে স্বকর্ম্মদ্বারা, রাজস কর্ম্মদ্বারাই অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ভগবদর্চ্চনার জন্য একান্ত সত্ত্বগুণ বা সাত্ত্বিক কর্ম্মের প্রয়োজন নাই।

যে যেখানে যে অবস্থায় আছে, সে সেস্থানে সেই অবস্থার মধ্যে থাকিয়া তাহা দ্বারাই ভগবানের আরাধনা করিতে পারে। ইহাই পুরুষোত্তমদর্শনের বৈশিষ্ট্য। পুরুষোত্তমের সঙ্গে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অণুটীরও equal and direct relation. বিশ্বের প্রতিটী গুণ, প্রতিটী কর্ম্ম, প্রতিটী অংশ, স্বয়ম্পূর্ণ, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এ বিশ্ব যে 'অনন্ত একে'র দেশ। এখানে কেহ কাহারও মত নয়; প্রত্যেকের বুকেই রহিয়াছে পুরুষোত্তমের এক একটী বিশেষ অভিপ্রায়। বিশ্বের প্রতিটী কণা আজ নিজ নিজ স্বতন্ত্র সার্থক অস্তিত্বের দাবী বিশ্বেশ্বরের কাছে পেশ করিয়া রাখিয়াছে। সকলের দাবী আজ সমভাবে পুরুষোত্তমকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এখানে উচ্চ নীচ নাই। Hierarchy-র স্থান এ বিশ্বে আজ আর নাই। Ladder system আজ অচল। এখানে প্রত্যেকে পুরুষোত্তমকে সাক্ষাৎ ভাবে ভজনের সুযোগ পাইবে; এবং এইভাবে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে অনন্তবুদ্ধিতে দেখিবে। সকলেই এখানে independent অথচ interdependent. বিশ্বের বুকে প্রাণধারা এক জীবন্ত যন্ত্র (organism) গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। জীবন্ত বিশ্বে ব্রহ্মমায়া পরস্পর-নিরপেক্ষ থাকিয়াও পরস্পরাপেক্ষ; তাই তাহারা সমকক্ষ। বিশ্বের ত্রিগুণও এইভাবে সমকক্ষ, বিশ্বের সর্ব্ব সাধনপন্থাও সমকক্ষ; বিশ্বের নরনারী সমাজ ব্যবস্থায় ও সাধনার ব্যাপারে সমকক্ষ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সামনে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পশ্চাতে। এখানে অংশ ও সমগ্র পরস্পরাপেক্ষ। পরস্পরাপেক্ষ এই দেশ প্রতিষ্ঠার জন্যই আজ শ্রীনিত্যগোপাল অবতীর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন: 'পরম প্রেমযোগে যে সকল দিব্য ভাব হইয়া থাকে, সেই সকল দিব্য ভাবের মধ্যে দিব্য মধুর ভাবকেই মধুর প্রেমাচার্য্যগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত করিয়া থাকেন। মহাত্মা শান্তদেবের বিবেচনায় পরমেশ্বর বিষয়ক সমস্ত ভাবই উৎকৃষ্ট, মহাত্মা শান্তদেবের বিবেচনায় পরমেশ্বর বিষয়ক সমস্ত ভাবই শ্রেষ্ঠ। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক শান্তভাবের শ্রেষ্ঠতা ও উৎকৃষ্টতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক দাস্য ভাবেরও উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক সখ্য ভাবেরও উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক বাৎসল্য ভাবেরও উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন।'—ভক্তিযোগদর্শন, পৃ ৩২। সংসারে কোন্ 'রস' শ্রেষ্ঠ? তিক্তরস না অম্লরস, না ঝাল না মধুর? প্রতিটি রসই নিজ নিজ স্বতন্ত্রতায় অদ্বিতীয়। শুধু মধুর রসে কি জীবন চলে? তিক্তের

প্রয়োজনীয়তা কি কোনও দিনই মধুর মুছিয়া ফেলিতে পারে? স্ত্রী কি কোন দিনই মায়ের আসন অধিকার করিতে পারিবে? মা মা, স্ত্রী স্ত্রী—ইহা ছাড়া অপর কিছুই বলিলে ভুল বলা হইবে। এইভাবে বর্ত্তমানে পঞ্চীকরণের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মধুর রসের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা আজ আর চলে না। সত্য বটে মাটীর মধ্যে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম আছে। কিন্তু মাটীর মধ্যে মাটী আছে আট আনা, অপর চারিটী আছে দুই আনা করিয়া। জলের মধ্যে জল আট আনা, অপর চারিটী দুই আনা করিয়া। কাজেই ষোল আনা মাটীকে বুঝিতে হইলে মাটীর ভিতরে আট আনা মাটী এবং জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের ভিতরকার দুই আনা করিয়া মাটীর তত্ত্ব আস্বাদন করিতে হইবে। মাটীর ভিতরে যে জল বা আগুন আছে, সেই জল দ্বারা পিপাসা মিটানো যায় না, মাটীর ভিতরকার আগুন দিয়া রান্নার কাজ চালানো কি সম্ভবপর? রান্নার জন্য প্রয়োজন হয় সেই আগুনেরই, যাহার ভিতর আগুন আট আনা এবং মাটী জল বায়ু আকাশ প্রত্যেকটী দুই আনা করিয়া। একান্ত মাটী, একান্ত জল, একান্ত আগুন, একান্ত বায়ু ও একান্ত আকাশ বলিয়া কিছু নাই। একান্তত্ব একটী ভাব মাত্র, আইডিয়া মাত্র। উহাদের অন্যোন্যমিলনের ফলেই এই বাস্তব বিশ্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। একান্ত মাটী জল প্রভৃতি ব্রাডলির ভাষায় bloodless category মাত্র। মাটী জলের পঞ্চীকরণের মূল রহস্য এই ভাবে বিশ্লেষিত হইলে এবং তাহাকে শান্ত দাস্য বাৎসল্য মধুরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই দেখা যাইবে যে, ষোল আনা মধুর রসের আস্বাদন করিতে হইলেও মধুর রসের ভিতরকার আট আনা মধুর রস এবং শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য রসের অন্তর্গত দুই আনা মধুর রস আস্বাদন করিতে হইবে। এই বিশ্ব যে প্রত্যেকের কেবলত্ব ও অন্যোন্যত্বের সমন্বয়ে গঠিত, এই সর্ব্বগুহ্যতম রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল অদ্বিতীয়। বিশ্বে গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ আছে, থাকিবেও। 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।' কিন্তু যে বর্ণাশ্রম গুণ-কৌলীন্য ও কর্ম্ম-কৌলীন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মাথা-ভারী হইয়াছে, এবং যাহার ফলে সমাজ-ব্যবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ, শ্রীনিত্যগোপাল সেখানে এক নূতন দার্শনিক ব্যবস্থা এবং তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত একটী সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প লইয়া অবতীর্ণ। তাঁহার এ আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক। বন্দেমাতরম্।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে: শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রণীত এবং এ, মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ২ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় টাকা।

ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন: 'বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার একটী 'কমলিণী'-রূপ দেখাইয়াছেন, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেও শ্রীরাধার একটী 'কমলিণী'-রূপ ধরা পড়ে। 'কমলিণী'র যেমন বহু স্তরের ভিতর দিয়া একই ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে, শ্রীরাধারও তেমনি ভারতীয় দর্শন এবং সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া বহুদিনের একটী ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। বর্তমান গ্রন্থে শ্রীরাধার এই ক্রমবিকাশের ধারাটিই লক্ষ্য করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসের মধ্যে দর্শনের ধারা এবং সাহিত্যের ধারা কি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।' অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন: 'রাধাবাদের বীজ রহিয়াছে ভারতীয় সাধারণ শক্তিবাদে।......বৈষ্ণব ধর্মে ও দর্শনে শক্তিবাদের যে ক্রমপরিণতি তাহার পিছনে মূখ্য কারণ হইল দুইটী; প্রথমতঃ বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন কালের যে বিভিন্ন বৈষ্ণব-তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত, তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবদর্শনের শক্তিবাদের ভিতরে নানা পরিবর্তন সাধিত হইল: দ্বিতীয়তঃ, আবার বিভিন্ন কালের বহু লৌকিক উপাখ্যান বৈষ্ণব ধর্মে ও সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করার ফলে উপাখ্যানগুলির সহিত মূল সিদ্ধান্তের সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য কিছু কিছু তত্ত্বদৃষ্টির পরিবর্তন বা পরিবর্ধন প্রয়োজন হইল। এই উভয়বিধ কারণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই ভারতীয় শক্তিবাদের রাধাবাদে ক্রমপরিণতি।'—ভূমিকায় লিখিত লেখকের এই উক্তি আমরা গ্রন্থ পাঠ কালেই উপলব্ধি করিয়াছি।

লেখক বহু গবেষণাপূর্ণ, মূল্যবান, অলিখিতপূর্ব এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য দুই শতাধিক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, তন্ত্র, ভারতের সর্ব প্রাদেশিক শাস্ত্রসমূহ ও সাধন পন্থার বিবরণ-গ্রন্থ। ভারতীয় শক্তিবাদের তত্ত্ব ও ইতিহাস অতি

ব্যাপক, এতবড় ব্যাপক আলোচনাকে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার মত পাণ্ডিত্য, মননশীলতা ও নিপুণতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার পাণ্ডিত্য যেখানে জীবনের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, সেখানে আমরা আরও মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার এই আলোচনার মধ্যে তথ্য ও তত্ত্বের এমন সমন্বয় সংসাধিত হইয়াছে, যাহা সকলকেই আনন্দ দান করিবে। শ্রীরাধাকে সার্বদেশিক শক্তিসাধনার সমন্বয়মূর্তি-রূপে উত্থাপিত করিয়া তিনি সাহিত্য ও ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন।

আমরা এই গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে কিছু আলোচনা করিব। শক্তিবাদের আলোচনা করিতে গিয়া লেখককে স্বাভাবিকভাবেই শক্তি-শক্তিমানের সম্পর্কের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইয়াছে। লেখক যদি সত্যসত্যই আস্বাদন করিতে চান যে, 'এই রাধার সৃষ্টিতে তাই দেখিতে পাই, বাঙ্গালী কবি এখানে বাঙলাদেশ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান নাই, বৃন্দাবনভূমি দূর হইতে আসিয়া ক্ষণে ক্ষণে বাঙ্গালী কবির মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে বাঙ্গালীর কবিমানসের প্রেম-প্রতিমা তাহার প্রাকৃত রূপের ভিতরেই দিব্য জ্যোতিতে অপ্রাকৃতের মহিমা লাভ করিয়াছে। আমাদের রাধা-প্রেমে প্রাকৃত কোন স্থানেই অস্বীকৃত নয়—প্রাকৃতই ধীরে ধীরে দিব্য মূর্তিতে উদ্ভাসিত।' লেখক যদি প্রাকৃতের বুকে অপ্রাকৃতকে আস্বাদন করিতে চান, তবে বাঙ্গলার গোস্বামিগণের পর কেন 'পরকীয়া' রসের আবির্ভাব হইল, তাহার মূল রহস্য অবগত হইতে হইবে। 'পরকীয়া' তত্ত্ব লইয়া দার্শনিকগণ মহা ফাঁপরে পড়িয়াছেন। লেখক লিখিয়াছেন: 'ভগবান বাসুদেবের যে প্রথম স্পন্দনাত্মক সৃষ্টি-সঙ্কল্প, ইহাই তাঁহার সুদর্শনরূপ; এই সুদর্শনতত্ত্ব হইতেই শক্তিতত্ত্বের অভিব্যক্তি। মূলতত্ত্ব-দৃষ্টিতে এই শক্তির কোন পৃথক সত্তা নাই বলিয়া শক্তিতত্ত্ব যেন একটী উৎপ্রেক্ষা মাত্র; এইজন্য সুদর্শনতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত শক্তিকে বলা হইয়াছে উৎপ্রেক্ষারূপিণী।' অন্যত্র লিখিয়াছেন: 'শক্তি-শক্তিমানের ভিতরে যে ভেদ-কল্পনা, উহা একটী ভেদের ভানমাত্র। শক্তির যাহা পৃথক্ সত্তা উহা পরমপুরুষের অবভাসনমাত্র, তথাপি তাহা যে কিছুই নয়, তাহা নহে; প্রতীতিরূপেই তাহা বাস্তব।' শক্তি যদি শক্তিমানের উৎপ্রেক্ষা, শক্তি যদি শক্তিমানের অবভাস মাত্র, শক্তি-শক্তিমানের ভেদ যদি ভানমাত্র, তবে রাধার প্রাকৃত রূপকে কিছুতেই দার্শনিকভাবে পারমার্থিকরূপে স্বীকার করা সম্ভব নয়। ইহা কেবলাদ্বৈত-

বাদীদের মায়াবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। মায়াবাদের বিরুদ্ধে ছিল শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অভিযান। 'মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।' শক্তি-শক্তিমানের ভিতরকার সম্বন্ধের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই মায়াবাদই রহিয়া গিয়াছে। যখন শ্রীরূপগোস্বামীপাদ লিখিতেছেন, 'তদ্বঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতম্ তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম্। নিত্যপ্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য।', তখন মায়াবাদ ইহার মধ্যে স্পষ্টভাবেই রহিয়া যাইতেছে।

রাধা-কৃষ্ণের সম্বন্ধের অন্তর্গত পরকীয়তত্ত্বকে বঞ্চনাত্মক 'মিথ্যা' বলিয়া মুছিয়া ফেলিয়া তাহাদের সম্বন্ধকে স্বকীয় বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলে রাধার আর স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় না। অথচ কৃষ্ণ-নিরপেক্ষ রাধার এই স্বাতন্ত্র্য হইল পরকীয় রসের প্রাণ-কথা। স্বতন্ত্র কৃষ্ণ ও স্বতন্ত্র রাধার প্রেমই পরকীয় প্রেম। এখানে দুই-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ভানমাত্র নয়। উহা নিতান্ত বাস্তব। একবার ব্রহ্মকে পারমার্থিকভাবে 'নির্গুণ' স্বীকার করিলে তাহা হইতে শক্তির প্রকাশ 'ভান' ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মতে ব্রহ্মেতেই স্বাতন্ত্র্য আছে, মায়া বা প্রকৃতি পরতন্ত্র মাত্র। কিন্তু বাস্তব জগতের কোনও নিজস্ব মহিমা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে দর্শনের ক্ষেত্রেও তাহার স্বতন্ত্রত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই বিশ্বের প্রতিটী কণার সঙ্গে অপর কণার সম্বন্ধই পরকীয়। শক্তি শক্তিমানের সম্বন্ধ পরকীয়। যেখানে দুই-ই অন্যোন্য-নিরপেক্ষ অথচ পরস্পরাপেক্ষ, সেইখানেই পরকীয় তত্ত্বের প্রকাশ। স্বকীয় পরকীয় ভেদ স্তরগত মাত্র। যাহা মায়া প্রকৃতির স্তরে (mechanical nature) স্বকীয়, যোগমায়া প্রকৃতির স্তরে (organic nature) তাহাই পরকীয়। পতি-পত্নীর স্বকীয় সম্বন্ধ বাধ্যবাধকতার দ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া উহার মধ্যে ভাগবত প্রেমের প্রকাশ সম্ভব নয়। পতি-পত্নীর সম্বন্ধ যদি শুধু প্রেমমূলক হয়, তাহারা যদি ভালবাসার জন্যই পরস্পরকে ভালবাসে, তবে সেই প্রেমই হয় পরকীয় প্রেম। উপপতি-উপপত্নীর মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নাই, অথচ একটা আকর্ষণ আছে নিশ্চয়ই, বাধ্যবাধকতাশূন্য এই আকর্ষণ যদি ভগবানে অর্পিত হয়, তখন সেই প্রেমের সাধনাই বৃন্দাবনে আস্বাদিত হইয়াছে। এই প্রেমের ভিতর সব দেশের সব কিম্বদন্তী, সব দেশের সব প্রেম-উপাখ্যান, বিশ্বের সব দর্শন ও সাহিত্য সমন্বিত হইয়া গিয়াছে। এইখানেই সাংখ্যের 'সম্পূর্ণরূপে দুই' প্রকৃতিপুরুষ বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সমন্বিত। লেখক লিখিয়াছেন: 'লেখকের মতে এই জাতীয় সাংখ্যকার''ঋষি' বটে, কিন্তু

মহর্ষি নহেন, অল্প ঋষি মাত্র।' সাংখ্যের মতবাদই শক্তি-শক্তিমানের পরস্পর-নিরপেক্ষতা প্রচার করিয়াছে, তাহার সঙ্গে যখন বেদান্তের অদ্বৈতবাদ সমন্বিত হইল, তখনই বাঙ্গলার আধুনিকতম পরকীয়বাদের উদ্ভব হইল। লেখকের এই সম্বন্ধে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। সাংখ্যকার 'ঋষি' হইলেও তাঁহার মত উপেক্ষণীয় নহে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'ইতি নানা প্রসংখ্যানাং তত্ত্বানাং ঋষিভিঃ কৃতম্। সর্ব্বং নায্যং যুক্তিমত্তাৎ বিদুষাং কিমশোভনম্।' সাংখ্যের মতও অশোভন হয় নাই। তবে তাহা সমগ্র সত্যের একটী দিক মাত্র।

মোটের উপর এই গ্রন্থ অপূর্ব হইয়াছে। ইহার মুদ্রণ পারিপাট্য ও অঙ্গসৌষ্ঠবও চিত্তাকর্ষক। ভারতীয় শক্তিবাদের নিগূঢ় তাৎপর্য ও তাহার ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে যাহারা অবহিত হইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অবশ্যপাঠ্য। আমরা এই গ্রন্থের বিপুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থকার এই জাতীয় গবেষণামূলক আলোচনা জনসাধারণকে উপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। গ্রন্থকার আমার স্নেহের পাত্র, আমি তাঁহার দীর্ঘ জীবন ও প্রতিষ্ঠা কামনা করি।

বয়ঃসন্ধি *

সরোজেন্দ্রনাথ রায়

আজকাল, বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে এমন লোক খুব কমই আছেন, যিনি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচিত নন। মানবজীবনকে মোটামুটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়; যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য। এই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকালকেই আমরা কিন্তু সাধারণভাবে বয়ঃসন্ধি বলি।

এখন এই যে পাঁচটি অবস্থার বিষয় উল্লেখ করলাম, তাদের প্রত্যেকটিরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন শৈশবে অপরিণত দেহ ও দন্তহীনতা, যৌবনে দৈহিক সবলতা ও পরিপুর্ণতা, বার্ধক্যে পলিত কেশ ও লোলচর্ম ইত্যাদি লক্ষণগুলি মিলিয়ে নিয়েই কে শিশু অথবা কে বৃদ্ধ, সেটা অতি সহজেই আমরা ধরে নেই। কিন্তু মানুষের জীবনে দেহটাই সব নয়, তার আরও একটা অংশ আছে এবং সেটি হচ্ছে মন। এই দেহ ও মন এমন অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে থাকে যে, দুয়ের কোন একটীকে বাদ দিয়ে জীবনের কোন অবস্থা বিশেষের পুর্ণ আলোচনা সম্ভব হয় না। অবশ্য শারীরিক কোন পরিবর্তনের লক্ষণগুলি যেমন আমরা চাক্ষুস উপলব্ধি করি, মনের বেলায় কিন্তু ঠিক সে রকম নয়। আপনাদেরও মন আছে, আমারও আছে সেটা অবশ্য ঠিক, কিন্তু মনের সঙ্গে চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের কারুরই নেই। তা সত্ত্বেও মানবজীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে মনের যে প্রকাশ হয়, তা থেকে মনের রূপ বা ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করে নিয়ে থাকি। যেমন ধরুন, শৈশবে পুতুল নিয়ে খেলা, কৈশোরে চঞ্চলতা, যৌবনে আত্মসচেতনতা ও বার্ধক্যে স্থৈর্য প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাভাবিক ব্যবহার বিভিন্ন অবস্থায় মানসিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত করে না কি? অর্থাৎ মনের প্রকাশভঙ্গী থেকেও কে বৃদ্ধ, কে শিশু, তা মোটামুটি আমরা অনুমান করে নিতে পারি। শুধু তাই নয়, গভীর ও কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে মনোবিদ্‌গণ মনের অবস্থা সম্বন্ধে যে সব সিদ্ধান্তে এসেছেন এবং যে সব তত্ত্বের

---

* জ্ঞান ও বিজ্ঞান—জুলাই ১৯৫৩ সংখ্যা হইতে গৃহীত।

সন্ধান দিয়েছেন, বিশদভাবে সে সব আলোচনা না করে উপস্থিত এইটুকু মাত্র বলতে পারা যায় যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মে দেহের সমান্তরালে মনেরও বিশিষ্ট প্রণালী অনুযায়ী ধারাবাহিক পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম যে হয় না, তা নয়, তবে সেটা হলো অস্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন—কিকংঙের মত দানবাকৃতি বিশাল দেহ অথবা তার বিপরীত খর্বাকৃতি বামনের মত দেহ এবং মনের ক্ষেত্রে রাম-খোকা বা কচিবুড়ার মত ব্যবহার স্বাভাবিক না হলেও অসম্ভব তো নয়!

এবার বয়ঃসন্ধিকালে দেহগত ও মনোগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি। ছেলেদের বারো থেকে সতেরো এবং মেয়েদের এগারো থেকে ষোলো মোটামোটি এই বয়সকালটিকে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকাল বলে ধরা যেতে পারে। এই সময়ে শরীরের আকৃতি ও শক্তি দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে তো বটেই, তা ছাড়া যৌনসংক্রান্ত কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তনও এসে পড়ে। শরীরের এই যৌনবিষয়ক পরিবর্তন দুই রকমের হয়। প্রথমটি হলো মুখ্য এবং মুখ্য পরিবর্তন প্রকাশ পায় জননেন্দ্রিয়ের পুর্ণ বিকাশে। আর অপরটি হলো গৌণ, যার জন্যে কতকগুলি গ্রন্থি (যেমন—অ্যাড্রিন্যাল, পিটুইটারী, থাইরয়েড ইত্যাদি) থেকে নির্গত হরমোন বা রসবিশেষের প্রভাব মূলতঃ দায়ী। এই গৌণ পরিবর্তনের লক্ষ্য হলো ছেলেদের ক্ষেত্রে মুখে দাড়ী ও গোঁফের উন্মেষ, গম্ভীর ও কর্কশ গলার স্বর ইত্যাদি এবং মেয়েদের বেলায় ত্বকের নীচে চর্বি জমতে সুরু হওয়ার ফলে দেহে সমতা, মসৃণতা ও পুর্ণতার সঞ্চার।

দেহের কোন পরিবর্তন আবার মনের ওপর রেখাপাত করে। ছেলে-মেয়েরা নিজেদের সম্বন্ধে আগের চেয়ে আত্মসচেতন হয়। দৈহিক স্বাস্থ্য উন্নত বা বলিষ্ঠ হলে মনে একটা স্বাচ্ছন্দ্য আসে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটি প্রকৃষ্ট ভাবের সঞ্চার হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য যদি ক্ষীণ হয় অথবা দেহের গঠনে যদি কোন খুঁত থাকে তা হলে অনেক সময় একটি হীনতাভাব মনকে ভারাক্রান্ত করে। দৈনন্দিন জীবনে এরকম দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। আবার দেহে যে থাইরয়েড গ্রন্থি আছে, সেটা যদি প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পরিমাণে কার্যকরী হয়, তাহলে ব্যক্তিবিশেষ একটু বেশী রকমের চঞ্চল ও কর্মতৎপর হয়। আর পরিমাণ কম হলে মানসিক বিষণ্ণতা ও নিষ্ক্রিয়তা রূপে সেটা প্রকাশ পায়। একটু আগে যে হরমোনের উল্লেখ করছি তার

প্রভাব আবার শরীরের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। হরমোন কিভাবে মনকেও কিছুটা প্রভাবান্বিত করে, বিশেষজ্ঞেরা তাহাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গ কামনা বা পরিহার করে, অথবা একপক্ষ অপর পক্ষকে নানাপ্রকার বাক্যবিন্যাস, ছল, কৌশল প্রভৃতির আশ্রয় নিয়ে আকর্ষণ করার প্রবণতা দেখায়। কিংবা 'বিপদে আপদে স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করা পুরুষমাত্রেরই কর্তব্য,' কোন কোন ছেলেদের ব্যবহারে এই রকম বীরত্ব-ব্যঞ্জক ভাবের প্রকাশ, বা 'স্ত্রীজাতি রক্ষণেরই বস্তু—তারা পুরুষের কাছ থেকে বিপদে-আপদে রক্ষা পাবার দাবী রাখে' অনেক মেয়েদের ব্যবহারে পরনির্ভরতার এই ভাব—ইত্যাদি, ব্যবহারের এই সব বৈচিত্র্যময় বিশেষত্বের জন্যে হরমোনের কিছুটা দায়িত্ব আছে। যাই হোক, বয়ঃসন্ধিকালে দেহের এবং দেহের জন্যে মনের যে সব পরিবর্তন প্রকাশ পায়, সংক্ষেপে সে বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা গেল। এইবার বলতে হয় মনের কথা।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের মন অবিভাজ্য, অর্থাৎ দেহের ন্যায় কতকগুলি অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু দৈনন্দিন কার্যক্ষেত্রে আমাদের মন যে নানারকমে প্রকাশ পায়, সেগুলি বিশ্লেষণ করে মনেরও যে কতকগুলি মৌলিক অবয়ব বা গুণ আছে, মনোবিদ্‌গণ তার প্রমাণ পেয়েছেন। সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি, ক্ষেত্র বা কার্যবিশেষে বিশিষ্ট নিপুণতা বা বিচক্ষণতা, মেজাজ, বিভিন্ন ভাবানুবর্তিতা ইত্যাদি হলো মানসিক অবয়বের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। প্রথমেই দেখা যায় যে, বাল্যকাল থেকে সুরু করে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমোন্নতি হতে থাকে, কিন্তু ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধিবৃত্তি আর সরাসরি বৃদ্ধিলাভ না করে সাধারণতঃ বিভিন্ন চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েদের কল্পনাপ্রবণতা বিশেষভাবে জাগ্রত হয়। অর্থাৎ বুদ্ধি-বৃত্তির চেয়ে ভাবরাজ্যেরই বিশেষ প্রসার ও পরিবর্তন ঘটে। তারপর বলতে হয় তাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কথা। ছোট ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃ সঙ্গপ্রিয় বলে দল বেঁধে খেলা করে। এ থেকে তারা ব্যক্তিগত বহু স্বার্থ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং ব্যক্তিগত অপেক্ষা দলগত স্বার্থকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে। পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করা, সহযোগিতা করা বা অন্যের কোন উপকারে আসবার বিষয়ে তারা একটা স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করে। খেলাধূলার রকম একই বলে ছেলেমেয়েরা বাল্যকালে একত্রিত হয়ে খেলাধূলা করে। তারপর ক্রমশঃ খেলার প্রকারে ভিন্নতা আসার জন্যে ছেলেরা ও মেয়েরা

কিছুদিন পৃথক দল করে খেলা করে। কিন্তু এই ব্যবধানটি ক্রমশঃ আবার আল্‌গা হয়ে যায় এবং ছেলেমেয়েরা মিশ্রদল করে খেলাধূলা করবার প্রবণতা দেখায়, যদিও আমাদের সামাজিক অনুশাসনের জন্যে তাদের এই ইচ্ছা সব সময় ফলবতী হয় না। যাই হোক, এই মেলামেশার ফলে অনেক সময়ে ছেলেদের, মেয়েদের বা ছেলেমেয়ের পরস্পরের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়। মেয়েদের মধ্যে সই বা গঙ্গাজল পাতানো, অথবা একপক্ষ অপর পক্ষকে ছেড়ে কোন দিনই থাকতে পারবে না—এই রকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা ইত্যাদি নানারকম ব্যবহারের সঙ্গে আপনারা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত আছেন। কিন্তু এই সময়ের বন্ধুত্ব আপাতদৃষ্টিতে খুব ঘনিষ্ঠ বলে প্রতীয়মান হলেও আসলে সেটা যে নিতান্তই বাহ্যিক, তার প্রমাণ পরবর্তী জীবনে পাওয়া যায়। সে যাই হোক, ছেলেমেয়েদের এই সামাজিক জীবনে কিছুকালের জন্যে হঠাৎ আবার একটা ভাটা এসে পড়ে। সে কেমন যেন সবসময়ে একরকম আত্মস্থ হয়ে থাকে, নিজেকে পাঁচজনের কাছ থেকে গুটিয়ে নিয়ে একলা থাকতে ভালবাসে—এক কথায় সে রীতিমত অসামাজিক হয়ে ওঠে। এই অবস্থাটি অবশ্য সাময়িক মাত্র। এর পরে সে আবার সামাজিক হয় এবং আগের মত পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করে। তার একটু পরিবর্তন হয় এই যে, এখন সে এমন একজনকে খোঁজে যার সঙ্গে সত্যিই বন্ধুত্ব করা চলে, যে তাকে ঠিকমত বুঝতে পারে, যার কাছে সুখদুঃখের বা অন্যান্য ব্যক্তিগত সব কথা চলে, অর্থাৎ এক কথায় যার ওপর সর্বতোভাবে নির্ভর করা যায়।

তারপর বলতে হয় নৈতিক চরিত্রের কথা। নৈতিক চরিত্রের সুষ্ঠু ও পূর্ণবিকাশের অর্থই হলো সমাজ-স্বীকৃত নিয়ম বা কৃষ্টির অনুবর্তিতা। কোনো একটি কাজ ভাল কি মন্দ—আমরা বিচার করি সমাজের দিকে চেয়ে, অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি বা বিধিনিষেধের সঙ্গে ঠিক মত খাপ খেলে বলি ভাল এবং খাপ না খেলে বলি মন্দ। এখন ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ গুরুজনেরা যা শিখিয়ে দেন, বাল্যকালে ছোট ছেলেমেয়েরা সেটি নির্বিবাদে মেনে নেয়। সুতরাং নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিস্থাপন হয় বাল্যকালে। সেই ছেলেমেয়েরা আবার কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে নিজেরাই ভালমন্দ বা ন্যায়-অন্যায় বিচার করবার চেষ্টা করে এবং সেটা তারা করে কার্যবিশেষের ফলাফল দেখে। শুধু তাই নয়—মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এখন তারা এই বিচারকার্যে গুরুজনদের চেয়ে বরং নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের মতামতের উপর বেশী আস্থাবান হয়।

এটা হলো এই বয়সের ধর্ম এবং এ বিষয়ে পিতামাতা বা শিক্ষকদের অবহিত থাকা উচিত। ছেলেমেয়েরা কথার অবাধ্য হলো মনে করে তাঁরা যদি ক্ষুব্ধ হন বা তাদের ওপর রাগ প্রকাশ করেন তাহলে তাঁরা কিন্তু মস্ত ভুল করে বসবেন। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ' এই উক্তিটি এ জায়গায় খুবই প্রযোজ্য সন্দেহ নেই।

শারীরিক পরিবর্তনের জন্য যৌনবোধের যে নতুন অধ্যায় এ সময়ে সুরু হয়, সে কথা আগেই কিছুটা বলেছি। নতুন হলেও যৌনবিষয়ে কৌতূহল অবশ্য কমবেশী সব ছেলেমেয়ের মধ্যে বাল্যকাল থেকে বর্তমান থাকে এবং তার প্রমাণ তাদের ঐ বিষয়ে নানারকম প্রশ্ন থেকেই পাওয়া যায়। অশ্লীলতার অজুহাতে এই স্বাভাবিক কৌতূহল বা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তাদের দেওয়া তো হয়ই না—উপরন্তু তারা ধমক খায়; কিম্বা এড়িয়ে যাওয়া হয় অথবা ভুল বা মিথ্যা উত্তরে তাদের শান্ত করা হয়। ছেলেমেয়েরা কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে না। তারা অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে এর, ওর কাছ থেকে, বা আজেবাজে বই পড়ে তাদের কৌতূহল বা প্রশ্নের সমাধান করে নেয়। এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তারা যৌনবিষয়ে একটি অসম্পূর্ণ, ভুল বা বিকৃত ধারণা নিয়ে বসে আছে। এই সব ছেলেমেয়ের নিজেদের যখন যৌনজীবন সুরু হয় তখন তারা পূর্বার্জিত ভুল বা বিকৃত ধারণার সঙ্গে আসল ব্যাপার, অর্থাৎ নিজেদের জীবনে এখন যা উপলব্ধি করলো তার কোন মিল খুঁজে পায় না। ফলে তাদের মনে একটা বিরাট সংঘাত বাঁধে এবং নানা-রকম অসহনীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য, হিষ্টিরিয়া জাতীয় মানসিক ব্যাধি, অব্যবস্থিতচিত্ততা, এমন কি কোন কোন আত্মহত্যার মূলে অনেক সময় এই জাতীয় দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। বয়সের অনুপাতে ছেলেমেয়েরা যাতে উপযুক্ত যৌনশিক্ষা পায়, শিক্ষক বা অভিভাবকদের, বিশেষ করে মায়েদের সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এই সময়ে লক্ষ্য করবার মত আর একটি জিনিষ আছে সেটা হচ্ছে—ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে কেমন যেন একটা আলস্য, অস্থিরতা ও চাপা অসন্তোষের প্রকাশ হয়—বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যেই এই ভাবটি বেশী মাত্রায় দেখা যায় এবং তার কারণও অবশ্য আছে। যাই হোক, এরকম অবস্থাটি বয়সোচিত, সুতরাং স্বাভাবিক। ভাল কথায় বা বুঝিয়ে বলে তাদের কাছ থেকে এ সময়ে যেটুকু কাজ বা সহযোগিতা আদায় করা যায়, সেই চেষ্টা করা

উচিত; কারণ জোর-জবরদস্তির ফল অনেক ক্ষেত্রে খারাপই হয়ে থাকে। এই রকম অসামাজিক ভাব বেশীদিন থাকে না—জননেন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিকাশ হবার পর থেকেই এই ভাবগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আবার পূর্বের সুস্থ-ভাব ফিরে আসে।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের জীবনে যে আমূল ও প্রচণ্ড পরিবর্তন হয় তার মোটামুটি পরিচয় আমরা পেলাম। এই পরিবর্তনের সময় যে উত্তেজক অবস্থার ও উদ্দাম শক্তির সঞ্চার হয় তার সঙ্গে বন্যাস্ফীত নদীর তুলনা করা যেতে পারে। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা নদীর এই ধ্বংসাত্মক শক্তিকে রূপান্তরিত করে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, কৃষির জন্য জল সরবরাহ ইত্যাদি নানারকম সৃষ্টিমূলক কাজে নিয়োজিত করছেন। তেমনি বয়ঃসন্ধিকালের এই নিহিত শক্তি—যে কোন কারণেই হোক না কেন, সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজের পক্ষে অনুকূল হয়ে প্রকাশ পায় না। প্রত্যেক ছেলেমেয়ে যাতে সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে জীবনে সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করে, সে বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবক এবং দেশের নেতাদের পূর্ণ দায়িত্ব আছে এবং তার জন্যে তাঁদের একত্র চেষ্টা ও সহযোগিতা যে একান্তই প্রয়োজন সে কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের ছেলেমেয়েদের উজ্জল ভবিষ্যতের চিরন্তন এই আশা ফলবতী করতে হলে বয়ঃসন্ধিকালের এই উদ্দাম শক্তিকে অবরুদ্ধ রাখলে বা অগ্রাহ্য করলে চলবে না। তাকে উচিতমত সৃষ্টিমূলক কাজে লাগাতে হবে, তাকে ব্যক্তিবিশেষ, সমাজ ও দেশের কল্যাণের জন্যে প্রয়োজনানুযায়ী রূপান্তরিত করতে হবে। কি প্রণালী অবলম্বন করলে বা কোন্ পথে অগ্রসর হলে এই সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যায়, মনোবিদ্‌গণের গভীর ও ব্যাপক গবেষণা থেকে তার নির্দেশ পাওয়া যায়।

'ক্ষণিকের চির মায়া'ময় এই বিশ্বে নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির কোন স্থান আচার্য্য শঙ্কর স্বীকার করিতে পারেন নাই। কেননা একবার প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে তাহার উপরম আর সম্ভব হয় না। উপরম সম্ভব না হইলে তো ক্ষণিকবাদই আর দাঁড়ায় না। অথচ ক্ষণ সমূহের মধ্যে প্রবৃত্তি না থাকিলে তাহারা 'সমুদায়' সৃষ্টিই বা করিবে কি করিয়া? ক্ষণিকের তো কোনও ব্যাপার সৃষ্টি করিবার যো নাই। অথচ একটী ব্যাপার সৃষ্টি করিতে হইলে 'সমুদায়' চাই-ই। তবেই দেখিতেছি যে ক্ষণকে প্রবৃত্ত হইতে হইলে চাই 'সমুদায়'; আবার সমুদায়কে দাঁড়াইতে হইলেও চাই 'ক্ষণ'। ক্ষণ ও সমুদায়ের মধ্যে এই vicious circle আসিয়া পড়ে। ক্ষণ ছাড়া সমুদায় হয় না, সমুদায় ছাড়াও ক্ষণ হয় না। ইহাই রবীন্দ্রনাথের 'ভেসে যদি যাও যাবে এক সাথে সকলের সাথে রহি।' ক্ষণ-সমুদায়ের এই ঝগড়ার মূল রহিয়াছে সৃষ্টি-ব্যাপারকে এমন একটী মৃতযন্ত্র বলিয়া মানিয়া লওয়ার ভিতর, যে মৃতযন্ত্রের ক্ষুদ্রতম অংশটীও ব্যাপক মৃতযন্ত্রের সমস্ত বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য। এখানেই চলে সমুদায়ের অত্যাচার ক্ষণের উপর, এইখানেই সৃষ্টি হয় আলোর পথ ও আঁধারের পথের মাঝে ঝগড়া। জীবন্ত যন্ত্রের ভিতর ক্ষুদ্রতম অংশও স্বয়ংপূর্ণ, এবং তাহার বিধিও ভিন্ন। 'সমুদায়' সেখানে ক্ষণের সাথী। সমুদায়ের সঙ্গে ক্ষণগুলির সম্বন্ধ এইরূপই যে, প্রতি ক্ষণটী এখানে এক একটী 'সমুদায়' বলিয়া যায়; এবং এইরূপ অনন্ত সমুদায়-ক্ষণগুলির অন্যোন্য-মৈথুনের ফলেই গড়িয়া উঠে আবার একটী নূতন সমুদায়, নূতন বিশ্ব। 'The organised being is the being in which all is reciprocally end and means'—Kant. 'There is no contradiction in this, that an independent being should be at the same time a member of a system; it lives at once *by* and *for* it; it is therefore, as Kant said, both *means* and *end*. And, finally, that in the cell itself, considered as nucleus of life, all the parts are correlatives to the whole, and the whole to the parts.'—Final Causes by Paul Janet. P 48 (foot note).

যে মৃতযন্ত্রের ভিতর ক্ষণ ও সমুদায়ের স্বার্থ পরস্পরবিরুদ্ধ, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'ভিৎ ফেঁদে যারা তুলিছে দেয়াল' ইত্যাদি লিখিয়াছেন।

যেদিন বিশ্বের দার্শনিকবৃন্দ প্রাণধারাকে গৌণ স্থান দিয়া একান্ত প্রজ্ঞাকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর শক্ত দেওয়াল তুলিল এবং সেই ভিত্তির উপর

সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা দাঁড় করাইল, তখনই যে তাহারা বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিয়াছিল, আজ তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রজ্ঞাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা দাঁড় করাইয়া 'বিজয়-তোরণ গাঁথে তারা যত আপনার ভারে ভেঙে পড়ে তত।' ভারতবর্ষ উচ্চনীচ ভেদের উপর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া একরূপ চলিয়াছিল, কিন্তু সেই top-heavy (মাথা-ভারী) ব্রাহ্মণপ্রধান, সবপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা যে আজ আপনা আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আর সমাজের সকল মাথাগুলি অসহায় ভাবে ধরার ধূলায় লুটাইতেছে, তাহা বুঝিবার জন্য বেশী বুদ্ধি খরচ করিবার প্রয়োজন নাই। উচ্চ অভিমানে প্রমত্ত যাহারা নীচে অবাঞ্ছিতদের এতদিন অপমান করিয়াছে, আজ তাহারাই এতদিনকার সমাজ ব্যবস্থায় নীচদের সমান আসনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কালের বিধানে আজ উচ্চ-নীচ সমস্তরে দাঁড়াইয়া। প্রচলিত বর্ণাশ্রম আজ ভাঙ্গিয়া চৌচির। তাই 'কাল' আজ বালকের মত এই সব 'ভাঙ্গা ঢেলা' লইয়া খেলা করিতেছে। সব উচ্চ বর্ণ, সব উচ্চ আশ্রম আজ ভাঙ্গা ঢেলার মত তুচ্ছ মলিন। তাই শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন: 'আধুনিক চতুর্বর্ণ শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণ নহেন। শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণ অদ্যাপি নাই। শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণের বিরুদ্ধে আমার কোন কথাই বলিবার নাই।'—জাতিদর্পণ, পৃ: ৪১৫।

প্রাণধারা-স্পর্শহীন এ-দেশের প্রচলিত বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সর্ব্বপ্রথমে আত্মা ও অনাত্মার ভেদের উপর। বর্ণাশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে আত্মাকে ভিত্তি করিয়া; আত্মাই এখানে পারমার্থিকভাবে সত্য, অনাত্মার আছে শুধুই একটা ব্যবহারিক সার্থকতা; পারমার্থিকভাবে অনাত্মার কোনও মূল্যই নাই। অনাত্মার স্পর্শ ও সম্পর্ক ছিল এতদিন আত্মার পক্ষে 'হেয়'। আত্মাই মুখ্য, অনাত্মা গৌণ; আত্মাই শুধু end (উদ্দেশ্য), অনাত্মা শুধুই means (উপায়)। আত্মা-অনাত্মা দুই-ই যে প্রাণধারার মাঝে সমভাবে উদ্দেশ্য ও উপায়, এই যান্ত্রিক বর্ণাশ্রমে তাহা স্বীকৃত হয় নাই। এই বর্ণাশ্রমে আত্মার জন্যই অনাত্মা—অনাত্মার জন্য কোনও দিনই আত্মার কোন অপেক্ষা নাই। স্বতন্ত্র আত্মা অনাত্মা-নিরপেক্ষ থাকিতে পারে; কিন্তু পরতন্ত্র অনাত্মা কোনও কালে বা কোনও অবস্থায়ই আত্মার অপেক্ষা না করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু একান্ত নিরপেক্ষ একান্ত নির্ম্মল আত্মা কেমন করিয়া মলিন-অনাত্মার সঙ্গে যুক্ত হইল, তাহা কোনও যুক্তিতে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। আত্মা-অনাত্মার সম্পর্ক হইলেও আত্মা থাকিয়া যায় অনাদি-অনন্ত, আর অনাত্মা হয়

অনাদি কিন্তু বিনাশশীলা। বিনাশশীলা এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া অবিনাশী আত্মাকে পাওয়ার দিকেই তখন সাধকের থাকে লক্ষ্য; সাধকদের অনাত্মার ক্ষেত্রের উপর তাই কোনও 'দরদ' থাকা স্বাভাবিক নয়। ইহার ফলে অনাদৃত অনাত্মার ক্ষেত্র গ্লানিগ্রস্ত হইয়া, পুঞ্জীভূত মলিনতায় ভারী হইয়া আত্মাকে পর্যন্ত টানিয়া নামায় ও পদদলিত করে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের 'আপনার ভারে ভেঙ্গে পড়ে তত।' অনাত্মার সঙ্গে সমন্বিত না হইলে আত্মা নিজের কাছেও নিজে ভারী হয়।

আত্মা অনাত্মার এই সম্পর্ক একবার যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করা হইলে ইহাকে ভিত্তি করিয়া পরে যুক্তিযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বরচনার ক্ষেত্রে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের একটী hierarchy (উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থা) বা ladder system (সিঁড়িতন্ত্র), যাহার মধ্যে সত্ত্বগুণ হইয়া পড়ে সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপ, রজোগুণ তাহার নিম্ন ধাপ, তমোগুণ হইল সর্ব্বনিম্ন ধাপ। সাধক তমোগুণ হইতে ধাপে ধাপে উপরে উঠিতে উঠিতে আত্মার ক্ষেত্রে উপনীত হইবে, তখন সিঁড়ির আর কোনও প্রয়োজনই থাকিবে না। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপ হইবার যোগ্যতা এই জন্যই লাভ করিয়াছে যে, সর্ব্বগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণই বেশি স্থিতিশীল (static) এবং এই স্থিতিধর্ম্মী সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিলে সহজেই স্থিতিধর্ম্মী আত্মাকে লাভ করা সম্ভব হইবে। সত্ত্বগুণ তাই রজোগুণ হইতে কুলীন। সত্ত্ব-রজো-তমঃ-র মধ্যে এই উচ্চ-নীচ বিভেদ একবার স্থাপিত হইলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, উহাদের মধ্যে আপনা হইতেই সঙ্ঘর্ষ আসিয়া পড়িবে; প্রত্যেকেই চাহিবে স্ব স্ব প্রাধান্য, একে অপরকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য একটা হুড়াহুড়ি। 'রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।' রজস্তমোগুণের প্রীতিস্পর্শহীন, সঙ্ঘর্ষক্লান্ত সত্ত্বগুণ আপনার 'ভারে' একদিন রজস্তমের চরণতলে লুটাইবেই। সত্ত্বগুণ যেমন স্থিতি-ধর্ম্মপ্রধান, রজোগুণ তেমনি বেগ-ধর্ম্মপ্রবল। সত্ত্ব-রজ-এর টানাটানিতে রজঃই প্রাধান্য লাভ করে, বেগ-ধর্ম্ম স্থিতিকে বানচাল করিয়া দেয়। রজোগুণের নিকট সাত্ত্বিকদের আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত সাধন ক্ষেত্রে মোটেই বিরল নয়।

কিন্তু পুরুষোত্তম দর্শনে গুণত্রয়ের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া কাড়াকাড়ির কোনও অবসরই নাই। এখানে আত্মা ও অনাত্মা, ব্রহ্ম ও মায়া, পুরুষ ও প্রকৃতি সমকক্ষ। দুইই অনাদি ও অনন্ত। এমন অবস্থা কোনও দিনই আসিবে না,

যেদিন অনাত্মা থাকিবে না, থাকিবে শুধু আত্মা ; মায়া থাকিবে না, থাকিবে শুধু ব্রহ্ম ; প্রকৃতি থাকিবে না, থাকিবে শুধু পুরুষ। যে অবস্থাকে আমরা 'নির্গুণ' বলি, সেখানেও অনাত্মা প্রকৃতি অব্যক্তভাবে থাকিয়াই যায়। ইহা নিত্যগোপাল সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। পুরুষোত্তম দর্শন প্রথমতঃ বিশ্ব-বিশ্বাতীতের এবং পরে বিশ্বস্থিত একের সঙ্গে অপরের উচ্চ নীচ শ্রেণী-বিভাগ স্বীকার করে না। এই দর্শনের মধ্যে আত্মার সঙ্গে অনাত্মার প্রতিটি বিকাশেরই সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে; এখানে আত্মা-অনাত্মা দুই-ই correlative (পরস্পরাপেক্ষ)। বর্ণাশ্রম যে-দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-দর্শনে সত্ত্বগুণের মধ্য দিয়া ছাড়া কেহ সিধাসিধি আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। পুরুষোত্তমদর্শন সত্ত্বগুণীর এই মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকার করে না। কৃষ্ণার্পিত সত্ত্বগুণ হইতে কৃষ্ণ যতদূর, কৃষ্ণার্পিত রজোগুণ হইতেও কৃষ্ণ ততদূর, কৃষ্ণার্পিত তমোগুণ হইতেও কৃষ্ণ ততদূর। গুণকৌলীন্য এবং গুণকৌলীন্য হইতে জাত কর্ম্মকৌলীন্য পুরুষোত্তমদর্শনে নাই।

'গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসঃ দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ঃ নৃপাঃ।
সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং বয়ং ভক্ত্যা বিভো॥'

—'হে বিভু যুধিষ্ঠির, গোপীগণ কাম হইতে, কংস ভয় হইতে, শিশুপালাদি দ্বেষ হইতে, বৃষ্ণিকুলোদ্ভূত যাহারা তাহারা সম্বন্ধ হইতে, আপনারা স্নেহ হইতে এবং আমরা নারদাদি ভক্তিদ্বারা পাইয়াছি'। তাহা হইলে কামদ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায়, ভয়দ্বারাও কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, দ্বেষ দ্বারাও কৃষ্ণকে পাওয়া যায় ; সম্বন্ধদ্বারা কৃষ্ণ মিলে, স্নেহ দ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায়, ভক্তিদ্বারাও কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। অথচ কাম রজোগুণ, ভয় তামস, নারদীয়া ভক্তি সাত্ত্বিকী। এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, সাত্ত্বিক কর্ম্ম, রাজস কর্ম্ম ও তামস কর্ম্মদ্বারাও 'সাক্ষাৎ অপরোক্ষ' ভাবে ভগবানের অর্চ্চনা করা যাইতে পারে ; এবং বর্ত্তমান যুগে ইহাই পরধর্ম্ম। আজ বিশ্ববাসী উচ্চ-নীচ সকলেই পুরুষোত্তমের খাস তালুকে বাস করিতেছে।

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥'

ক্লীবলিঙ্গ 'যৎ'-পদদ্বারা সাত্ত্বিক, রাজস, তামস যে কোনো কর্ম্মই বুঝাইবে। অর্জ্জুন পুরুষোত্তমকে স্বকর্ম্মদ্বারা, রাজস কর্ম্মদ্বারাই অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ভগবদর্চ্চনার জন্য একান্ত সত্ত্বগুণ বা সাত্ত্বিক কর্ম্মের প্রয়োজন নাই।

যে যেখানে যে অবস্থায় আছে, সে সেস্থানে সেই অবস্থার মধ্যে থাকিয়া তাহা দ্বারাই ভগবানের আরাধনা করিতে পারে। ইহাই পুরুষোত্তমদর্শনের বৈশিষ্ট্য। পুরুষোত্তমের সঙ্গে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অণুটীরও equal and direct relation. বিশ্বের প্রতিটী গুণ, প্রতিটী কর্ম্ম, প্রতিটী অংশ স্বয়ম্পূর্ণ, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এ বিশ্ব যে 'অনন্ত একে'র দেশ। এখানে কেহ কাহারও মত নয়; প্রত্যেকের বুকেই রহিয়াছে পুরুষোত্তমের এক একটী বিশেষ অভিপ্রায়। বিশ্বের প্রতিটী কণা আজ নিজ নিজ স্বতন্ত্র সার্থক অস্তিত্বের দাবী বিশ্বেশ্বরের কাছে পেশ করিয়া রাখিয়াছে। সকলের দাবী আজ সমভাবে পুরুষোত্তমকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এখানে উচ্চ নীচ নাই। Hierarchy র স্থান এ বিশ্বে আজ আর নাই। Ladder system আজ অচল। এখানে প্রত্যেকে পুরুষোত্তমকে সাক্ষাৎ ভাবে ভজনের সুযোগ পাইবে; এবং এইভাবে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে অনন্তবুদ্ধিতে দেখিবে। সকলেই এখানে independent অথচ interdependent. বিশ্বের বুকে প্রাণধারা এক জীবন্ত যন্ত্র (organism) গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। জীবন্ত বিশ্বে ব্রহ্মমায়া পরস্পর-নিরপেক্ষ থাকিয়াও পরস্পরাপেক্ষ; তাই তাহারা সমকক্ষ। বিশ্বের ত্রিগুণও এইভাবে সমকক্ষ, বিশ্বের সর্ব্ব সাধনপন্থাও সমকক্ষ; বিশ্বের নরনারী সমাজ ব্যবস্থায় ও সাধনার ব্যাপারে সমকক্ষ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সামনে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পশ্চাতে। এখানে অংশ ও সমগ্র পরস্পরাপেক্ষ। পরস্পরাপেক্ষ এই দেশ প্রতিষ্ঠার জন্যই আজ শ্রীনিত্যগোপাল অবতীর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন: 'পরম প্রেমযোগে যে সকল দিব্য ভাব হইয়া থাকে, সেই সকল দিব্য ভাবের মধ্যে দিব্য মধুর ভাবকেই মধুর প্রেমাচার্য্যগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত করিয়া থাকেন। মহাত্মা শান্তদেবের বিবেচনায় পরমেশ্বর বিষয়ক সমস্ত ভাবই উৎকৃষ্ট, মহাত্মা শান্তদেবের বিবেচনায় পরমেশ্বর বিষয়ক সমস্ত ভাবই শ্রেষ্ঠ। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক শান্তভাবের শ্রেষ্ঠতা ও উৎকৃষ্টতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক দাস্য ভাবেরও উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক সখ্য ভাবেরও উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক বাৎসল্য ভাবেরও উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন।'—ভক্তিযোগদর্শন, পৃ ৩২। সংসারে কোন্ 'রস' শ্রেষ্ঠ? তিক্তরস না অম্লরস, না ঝাল না মধুর? প্রতিটি রসই নিজ নিজ স্বতন্ত্রতায় অদ্বিতীয়। শুধু মধুর রসে কি জীবন চলে? তিক্তের

প্রয়োজনীয়তা কি কোনও দিনই মধুর মুছিয়া ফেলিতে পারে? স্ত্রী কি কোন দিনই মায়ের আসন অধিকার করিতে পারিবে? মা মা, স্ত্রী স্ত্রী—ইহা ছাড়া অপর কিছুই বলিলে ভুল বলা হইবে। এইভাবে বর্ত্তমানে পঞ্চীকরণের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মধুর রসের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা আজ আর চলে না। সত্য বটে মাটীর মধ্যে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম আছে। কিন্তু মাটীর মধ্যে মাটী আছে আট আনা, অপর চারিটী আছে দুই আনা করিয়া। জলের মধ্যে জল আট আনা, অপর চারিটী দুই আনা করিয়া। কাজেই ষোল আনা মাটীকে বুঝিতে হইলে মাটীর ভিতরে আট আনা মাটী এবং জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের ভিতরকার দুই আনা করিয়া মাটীর তত্ত্ব আস্বাদন করিতে হইবে। মাটীর ভিতরে যে জল বা আগুন আছে, সেই জল দ্বারা পিপাসা মিটানো যায় না, মাটীর ভিতরকার আগুন দিয়া রান্নার কাজ চালানো কি সম্ভবপর? রান্নার জন্য প্রয়োজন হয় সেই আগুনেরই, যাহার ভিতর আগুন আট আনা এবং মাটী জল বায়ু আকাশ প্রত্যেকটী দুই আনা করিয়া। একান্ত মাটী, একান্ত জল, একান্ত আগুন, একান্ত বায়ু ও একান্ত আকাশ বলিয়া কিছু নাই। একান্তত্ব একটী ভাব মাত্র, আইডিয়া মাত্র। উহাদের অন্যোন্যমিলনের ফলেই এই বাস্তব বিশ্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। একান্ত মাটী জল প্রভৃতি ব্রাডলির ভাষায় bloodless category মাত্র। মাটী জলের পঞ্চীকরণের মূল রহস্য এই ভাবে বিশ্লেষিত হইলে এবং তাহাকে শান্ত দাস্য বাৎসল্য মধুরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই দেখা যাইবে যে, ষোল আনা মধুর রসের আস্বাদন করিতে হইলেও মধুর রসের ভিতরকার আট আনা মধুর রস এবং শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য রসের অন্তর্গত দুই আনা মধুর রস আস্বাদন করিতে হইবে। এই বিশ্ব যে প্রত্যেকের কেবলত্ব ও অন্যোন্যত্বের সমন্বয়ে গঠিত, এই সর্ব্বগুহ্যতম রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া শ্রীনিত্য-গোপাল অদ্বিতীয়। বিশ্বে গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ আছে, থাকিবেও। 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।' কিন্তু যে বর্ণাশ্রম গুণ-কৌলীন্য ও কর্ম্ম-কৌলীন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মাথা-ভারী হইয়াছে, এবং যাহার ফলে সমাজ-ব্যবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ, শ্রীনিত্যগোপাল সেখানে এক নূতন দার্শনিক ব্যবস্থা এবং তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত একটী সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প লইয়া অবতীর্ণ। তাঁহার এ আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক। বন্দেমাতরম্।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে: শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রণীত এবং এ, মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ২ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় টাকা।

ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন: 'বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার একটী 'কমলিনী'-রূপ দেখাইয়াছেন, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেও শ্রীরাধার একটী 'কমলিনী'-রূপ ধরা পড়ে। 'কমলিনী'র যেমন বহু স্তরের ভিতর দিয়া একই ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে, শ্রীরাধারও তেমনি ভারতীয় দর্শন এবং সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া বহুদিনের একটী ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। বর্তমান গ্রন্থে শ্রীরাধার এই ক্রমবিকাশের ধারাটিই লক্ষ্য করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসের মধ্যে দর্শনের ধারা এবং সাহিত্যের ধারা কি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।' অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন: 'রাধাবাদের বীজ রহিয়াছে ভারতীয় সাধারণ শক্তিবাদে।......বৈষ্ণব ধর্মে ও দর্শনে শক্তিবাদের যে ক্রমপরিণতি তাহার পিছনে মুখ্য কারণ হইল দুইটী; প্রথমতঃ বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন কালের যে বিভিন্ন বৈষ্ণব-তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত, তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবদর্শনের শক্তিবাদের ভিতরে নানা পরিবর্তন সাধিত হইল: দ্বিতীয়তঃ, আবার বিভিন্ন কালের বহু লৌকিক উপাখ্যান বৈষ্ণব ধর্মে ও সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করার ফলে উপাখ্যানগুলির সহিত মূল সিদ্ধান্তের সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য কিছু কিছু তত্ত্বদৃষ্টির পরিবর্তন বা পরিবর্ধন প্রয়োজন হইল। এই উভয়বিধ কারণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই ভারতীয় শক্তিবাদের রাধাবাদে ক্রমপরিণতি।'—ভূমিকায় লিখিত লেখকের এই উক্তি আমরা গ্রন্থ পাঠ কালেই উপলব্ধি করিয়াছি।

লেখক বহু-গবেষণাপূর্ণ, মূল্যবান, অলিখিতপূর্ব এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য দুই শতাধিক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, তন্ত্র, ভারতের সর্ব প্রাদেশিক শাস্ত্রসমূহ ও সাধন পন্থার বিবরণ-গ্রন্থ। ভারতীয় শক্তিবাদের তত্ত্ব ও ইতিহাস অতি

ব্যাপক, এতবড় ব্যাপক আলোচনাকে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার মত পাণ্ডিত্য, মননশীলতা ও নিপুণতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার পাণ্ডিত্য যেখানে জীবনের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, সেখানে আমরা আরও মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার এই আলোচনার মধ্যে তথ্য ও তত্ত্বের এমন সমন্বয় সংসাধিত হইয়াছে, যাহা সকলকেই আনন্দ দান করিবে। শ্রীরাধাকে সার্বদেশিক শক্তিসাধনার সমন্বয়মূর্তি-রূপে উত্থাপিত করিয়া তিনি সাহিত্য ও ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন।

আমরা এই গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে কিছু আলোচনা করিব। শক্তিবাদের আলোচনা করিতে গিয়া লেখককে স্বাভাবিকভাবেই শক্তি-শক্তিমানের সম্পর্কের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইয়াছে। লেখক যদি সত্যসত্যই আস্বাদন করিতে চান যে, 'এই রাধার সৃষ্টিতে তাই দেখিতে পাই, বাঙ্গালী কবি এখানে বাঙলাদেশ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান নাই, বৃন্দাবনভূমি দূর হইতে আসিয়া ক্ষণে ক্ষণে বাঙ্গালী কবির মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে বাঙ্গালীর কবিমানসের প্রেম-প্রতিমা তাহার প্রাকৃত রূপের ভিতরেই দিব্য জ্যোতিতে অপ্রাকৃতের মহিমা লাভ করিয়াছে। আমাদের রাধা-প্রেমে প্রাকৃত কোন স্থানেই অস্বীকৃত নয়—প্রাকৃতই ধীরে ধীরে দিব্য মূর্তিতে উদ্ভাসিত।' লেখক যদি প্রাকৃতের বুকে অপ্রাকৃতকে আস্বাদন করিতে চান, তবে বাঙ্গলার গোস্বামিগণের পর কেন 'পরকীয়া' রসের আবির্ভাব হইল, তাহার মূল রহস্য অবগত হইতে হইবে। 'পরকীয়া' তত্ত্ব লইয়া দার্শনিকগণ মহা ফাঁপরে পড়িয়াছেন। লেখক লিখিয়াছেন: 'ভগবান বাসুদেবের যে প্রথম স্পন্দনাত্মক সৃষ্টি-সঙ্কল্প, ইহাই তাঁহার সুদর্শনরূপ; এই সুদর্শনতত্ত্ব হইতেই শক্তিতত্ত্বের অভিব্যক্তি। মূলতত্ত্ব-দৃষ্টিতে এই শক্তির কোন পৃথক সত্তা নাই বলিয়া শক্তিতত্ত্ব যেন একটী উৎপ্রেক্ষা মাত্র; এইজন্য সুদর্শনতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত শক্তিকে বলা হইয়াছে উৎপ্রেক্ষারূপিণী।' অন্যত্র লিখিয়াছেন: 'শক্তি-শক্তিমানের ভিতরে যে ভেদ-কল্পনা, উহা একটী ভেদের ভানমাত্র। শক্তির যাহা পৃথক্ সত্তা উহা পরমপুরুষের অবভাসনমাত্র, তথাপি তাহা যে কিছুই নয়, তাহা নহে; প্রতীতিরূপেই তাহা বাস্তব।' শক্তি যদি শক্তিমানের উৎপ্রেক্ষা, শক্তি যদি শক্তিমানের অবভাস মাত্র, শক্তি-শক্তিমানের ভেদ যদি ভানমাত্র, তবে রাধার প্রাকৃত রূপকে কিছুতেই দার্শনিকভাবে পারমার্থিকরূপে স্বীকার করা সম্ভব নয়। ইহা কেবলাদ্বৈত-

বাদীদের মায়াবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। মায়াবাদের বিরুদ্ধে ছিল শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অভিযান। 'মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।' শক্তি-শক্তিমানের ভিতরকার সম্বন্ধের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই মায়াবাদই রহিয়া গিয়াছে। যখন শ্রীরূপগোস্বামীপাদ লিখিতেছেন, 'তদ্বঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতম্‌ তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম্‌। নিত্যপ্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য।', তখন মায়াবাদ ইহার মধ্যে স্পষ্টভাবেই রহিয়া যাইতেছে।

রাধা-কৃষ্ণের সম্বন্ধের অন্তর্গত পরকীয়তত্ত্বকে বঞ্চনাত্মক 'মিথ্যা' বলিয়া মুছিয়া ফেলিয়া তাহাদের সম্বন্ধকে স্বকীয় বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলে রাধার আর স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় না। অথচ কৃষ্ণ-নিরপেক্ষ রাধার এই স্বাতন্ত্র্য হইল পরকীয় রসের প্রাণ-কথা। স্বতন্ত্র কৃষ্ণ ও স্বতন্ত্র রাধার প্রেমই পরকীয় প্রেম। এখানে দুই-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ভানমাত্র নয়। উহা নিতান্ত বাস্তব। একবার ব্রহ্মকে পারমার্থিকভাবে 'নির্গুণ' স্বীকার করিলে তাহা হইতে শক্তির প্রকাশ 'ভান' ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মতে ব্রহ্মেতেই স্বাতন্ত্র্য আছে, মায়া বা প্রকৃতি পরতন্ত্র মাত্র। কিন্তু বাস্তব জগতের কোনও নিজস্ব মহিমা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে দর্শনের ক্ষেত্রেও তাহার স্বতন্ত্রত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই বিশ্বের প্রতিটী কণার সঙ্গে অপর কণার সম্বন্ধই পরকীয়। শক্তি শক্তিমানের সম্বন্ধ পরকীয়। যেখানে দুই-ই অন্যোন্য-নিরপেক্ষ অথচ পরস্পরাপেক্ষ, সেইখানেই পরকীয় তত্ত্বের প্রকাশ। স্বকীয় পরকীয় ভেদ স্তরগত মাত্র। যাহা মায়া প্রকৃতির স্তরে (mechanical nature) স্বকীয়, যোগমায়া প্রকৃতির স্তরে (organic nature) তাহাই পরকীয়। পতি-পত্নীর স্বকীয় সম্বন্ধ বাধ্যবাধকতার দ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া উহার মধ্যে ভাগবত প্রেমের প্রকাশ সম্ভব নয়। পতি-পত্নীর সম্বন্ধ যদি শুধু প্রেমমূলক হয়, তাহারা যদি ভালবাসার জন্যই পরস্পরকে ভালবাসে, তবে সেই প্রেমই হয় পরকীয় প্রেম। উপপতি-উপপত্নীর মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নাই, অথচ একটা আকর্ষণ আছে নিশ্চয়ই, বাধ্যবাধকতাশূন্য এই আকর্ষণ যদি ভগবানে অর্পিত হয়, তখন সেই প্রেমের সাধনাই বৃন্দাবনে আস্বাদিত হইয়াছে। এই প্রেমের ভিতর সব দেশের সব কিম্বদন্তী, সব দেশের সব প্রেম-উপাখ্যান, বিশ্বের সব দর্শন ও সাহিত্য সমন্বিত হইয়া গিয়াছে। এইখানেই সাংখ্যের 'সম্পূর্ণরূপে দুই' প্রকৃতিপুরুষ বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সমন্বিত। লেখক লিখিয়াছেন: 'লেখকের মতে এই জাতীয় সাংখ্যকার 'ঋষি' বটে, কিন্তু

মহর্ষি নহেন, অল্প ঋষি মাত্র।' সাংখ্যের মতবাদই শক্তি-শক্তিমানের পরস্পর-নিরপেক্ষতা প্রচার করিয়াছে, তাহার সঙ্গে যখন বেদান্তের অদ্বৈতবাদ সমন্বিত হইল, তখনই বাঙ্গলার আধুনিকতম পরকীয়বাদের উদ্ভব হইল। লেখকের এই সম্বন্ধে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। সাংখ্যকার 'ঋষি' হইলেও তাঁহার মত উপেক্ষণীয় নহে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'ইতি নানা প্রসংখ্যানাং তত্ত্বানাং ঋষিভিঃ কৃতম্। সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাৎ বিদুষাং কিমশোভনম্।' সাংখ্যের মতও অশোভন হয় নাই। তবে তাহা সমগ্র সত্যের একটী দিক মাত্র।

মোটের উপর এই গ্রন্থ অপূর্ব হইয়াছে। ইহার মুদ্রণ পারিপাট্য ও অঙ্গসৌষ্ঠবও চিত্তাকর্ষক। ভারতীয় শক্তিবাদের নিগূঢ় তাৎপর্য ও তাহার ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে যাহারা অবহিত হইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অবশ্যপাঠ্য। আমরা এই গ্রন্থের বিপুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থকার এই জাতীয় গবেষণামূলক আলোচনা জনসাধারণকে উপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। গ্রন্থকার আমার স্নেহের পাত্র, আমি তাঁহার দীর্ঘ জীবন ও প্রতিষ্ঠা কামনা করি।

বয়ঃসন্ধি *

সরোজেন্দ্রনাথ রায়

আজকাল, বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে এমন লোক খুব কমই আছেন, যিনি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচিত নন। মানবজীবনকে মোটামুটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়, যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য। এই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকালকেই আমরা কিন্তু সাধারণভাবে বয়ঃসন্ধি বলি।

এখন এই যে পাঁচটি অবস্থার বিষয় উল্লেখ করলাম, তাদের প্রত্যেকটিরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন শৈশবে অপরিণত দেহ ও দন্তহীনতা, যৌবনে দৈহিক সবলতা ও পরিপূর্ণতা, বার্ধক্যে পলিত কেশ ও লোলচর্ম ইত্যাদি লক্ষণগুলি মিলিয়ে নিয়েই কে শিশু অথবা কে বৃদ্ধ, সেটা অতি সহজেই আমরা ধরে নেই। কিন্তু মানুষের জীবনে দেহটাই সব নয়, তার আরও একটা অংশ আছে এবং সেটি হচ্ছে মন। এই দেহ ও মন এমন অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে থাকে যে, দুয়ের কোন একটাকে বাদ দিয়ে জীবনের কোন অবস্থা বিশেষের পূর্ণ আলোচনা সম্ভব হয় না। অবশ্য শারীরিক কোন পরিবর্তনের লক্ষণগুলি যেমন আমরা চাক্ষুস উপলব্ধি করি, মনের বেলায় কিন্তু ঠিক সে রকম নয়। আপনাদেরও মন আছে, আমারও আছে সেটা অবশ্য ঠিক, কিন্তু মনের সঙ্গে চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের কারুরই নেই। তা সত্ত্বেও মানবজীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে মনের যে প্রকাশ হয়, তা থেকে মনের রূপ বা ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করে নিয়ে থাকি। যেমন ধরুন, শৈশবে পুতুল নিয়ে খেলা, কৈশোরে চঞ্চলতা, যৌবনে আত্মসচেতনতা ও বার্ধক্যে স্থৈর্য প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাভাবিক ব্যবহার বিভিন্ন অবস্থায় মানসিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত করে না কি? অর্থাৎ মনের প্রকাশভঙ্গী থেকেও কে বৃদ্ধ, কে শিশু, তা মোটামুটি আমরা অনুমান করে নিতে পারি। শুধু তাই নয়, গভীর ও কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে মনোবিদ্‌গণ মনের অবস্থা সম্বন্ধে যে সব সিদ্ধান্তে এসেছেন এবং যে সব তত্ত্বের

* জ্ঞান ও বিজ্ঞান—জুলাই ১৯৫৩ সংখ্যা হইতে গৃহীত।

সন্ধান দিয়েছেন, বিশদভাবে সে সব আলোচনা না করে উপস্থিত এইটুকু মাত্র বলতে পারা যায় যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মে দেহের সমান্তরালে মনেরও বিশিষ্ট প্রণালী অনুযায়ী ধারাবাহিক পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম যে হয় না, তা নয়, তবে সেটা হলো অস্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন—কিকংঙের মত দানবাকৃতি বিশাল দেহ অথবা তার বিপরীত খর্বাকৃতি বামনের মত দেহ এবং মনের ক্ষেত্রে রাম-খোকা বা কচিবুড়ার মত ব্যবহার স্বাভাবিক না হলেও অসম্ভব তো নয়!

এবার বয়:সন্ধিকালে দেহগত ও মনোগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি। ছেলেদের বারো থেকে সতেরো এবং মেয়েদের এগারো থেকে ষোলো মোটামোটি এই বয়সকালটিকে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকাল বলে ধরা যেতে পারে। এই সময়ে শরীরের আকৃতি ও শক্তি দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে তো বটেই, তা ছাড়া যৌনসংক্রান্ত কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তনও এসে পড়ে। শরীরের এই যৌনবিষয়ক পরিবর্তন দুই রকমের হয়। প্রথমটি হলো মুখ্য এবং মুখ্য পরিবর্তন প্রকাশ পায় জননেন্দ্রিয়ের পুর্ণ বিকাশে। আর অপরটি হলো গৌণ, যার জন্যে কতকগুলি গ্রন্থি (যেমন—অ্যাড্রিন্যাল, পিটুইটারী, থাইরয়েড ইত্যাদি) থেকে নির্গত হরমোন বা রসবিশেষের প্রভাব মূলতঃ দায়ী। এই গৌণ পরিবর্তনের লক্ষ্য হলো ছেলেদের ক্ষেত্রে মুখে দাড়ী ও গোঁফের উদ্গম, গম্ভীর ও কর্কশ গলার স্বর ইত্যাদি এবং মেয়েদের বেলায় ত্বকের নীচে চর্বি জমতে সুরু হওয়ার ফলে দেহে সমতা, মসৃণতা ও পুর্ণতার সঞ্চার।

দেহের কোন পরিবর্তন আবার মনের ওপর রেখাপাত করে। ছেলে-মেয়েরা নিজেদের সম্বন্ধে আগের চেয়ে আত্মসচেতন হয়। দৈহিক স্বাস্থ্য উন্নত বা বলিষ্ঠ হলে মনে একটা স্বাচ্ছন্দ্য আসে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটি প্রকৃষ্ট ভাবের সঞ্চার হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য যদি ক্ষীণ হয় অথবা দেহের গঠনে যদি কোন খুঁত থাকে তা হলে অনেক সময় একটি হীনতাভাব মনকে ভারাক্রান্ত করে। দৈনন্দিন জীবনে এরকম দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। আবার দেহে যে থাইরয়েড গ্রন্থি আছে, সেটা যদি প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পরিমাণে কার্যকরী হয়, তাহলে ব্যক্তিবিশেষ একটু বেশী রকমের চঞ্চল ও কর্মতৎপর হয়। আর পরিমাণ কম হলে মানসিক বিষণ্ণতা ও নিষ্ক্রিয়তা রূপে সেটা প্রকাশ পায়। একটু আগে যে হরমোনের উল্লেখ করছি তার

প্রভাব আবার শরীরের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। হরমোন কিভাবে মনকেও কিছুটা প্রভাবান্বিত করে, বিশেষজ্ঞেরা তাহাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গ কামনা বা পরিহার করে, অথবা একপক্ষ অপর পক্ষকে নানাপ্রকার বাক্যবিন্যাস, ছল, কৌশল প্রভৃতির আশ্রয় নিয়ে আকর্ষণ করার প্রবণতা দেখায়। কিংবা 'বিপদে আপদে স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করা পুরুষমাত্রেরই কর্তব্য,' কোন কোন ছেলেদের ব্যবহারে এই রকম বীরত্ব-ব্যঞ্জক ভাবের প্রকাশ, বা 'স্ত্রীজাতি রক্ষণেরই বস্তু—তারা পুরুষের কাছ থেকে বিপদে-আপদে রক্ষা পাবার দাবী রাখে' অনেক মেয়েদের ব্যবহারে পরনির্ভরতার এই ভাব—ইত্যাদি, ব্যবহারের এই সব বৈচিত্র্যময় বিশেষত্বের জন্যে হরমোনের কিছুটা দায়িত্ব আছে। যাই হোক, বয়ঃসন্ধিকালে দেহের এবং দেহের জন্যে মনের যে সব পরিবর্তন প্রকাশ পায়, সংক্ষেপে সে বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা গেল। এইবার বলতে হয় মনের কথা।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের মন অবিভাজ্য, অর্থাৎ দেহের ন্যায় কতকগুলি অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু দৈনন্দিন কার্যক্ষেত্রে আমাদের মন যে নানারকমে প্রকাশ পায়, সেগুলি বিশ্লেষণ করে মনেরও যে কতকগুলি মৌলিক অবয়ব বা গুণ আছে, মনোবিদ্‌গণ তার প্রমাণ পেয়েছেন। সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি, ক্ষেত্র বা কার্যবিশেষে বিশিষ্ট নিপুণতা বা বিচক্ষণতা, মেজাজ, বিভিন্ন ভাবানুবর্তিতা ইত্যাদি হলো মানসিক অবয়বের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। প্রথমেই দেখা যায় যে, বাল্যকাল থেকে সুরু করে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমোন্নতি হতে থাকে, কিন্তু ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধিবৃত্তি আর সরাসরি বৃদ্ধিলাভ না করে সাধারণতঃ বিভিন্ন চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েদের কল্পনাপ্রবণতা বিশেষভাবে জাগ্রত হয়। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে ভাবরাজ্যেরই বিশেষ প্রসার ও পরিবর্তন ঘটে। তারপর বলতে হয় তাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কথা। ছোট ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃ সঙ্গপ্রিয় বলে দল বেঁধে খেলা করে। এ থেকে তারা ব্যক্তিগত বহু স্বার্থ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং ব্যক্তিগত অপেক্ষা দলগত স্বার্থকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে। পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করা, সহযোগিতা করা বা অন্যের কোন উপকারে আসবার বিষয়ে তারা একটা স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করে। খেলাধূলার রকম একই বলে ছেলেমেয়েরা বাল্যকালে একত্রিত হয়ে খেলাধূলা করে। তারপর ক্রমশঃ খেলার প্রকারে ভিন্নতা আসার জন্যে ছেলেরা ও মেয়েরা

কিছুদিন পৃথক দল করে খেলা করে। কিন্তু এই ব্যবধানটি ক্রমশঃ আবার আলগা হয়ে যায় এবং ছেলেমেয়েরা মিশ্রদল করে খেলাধূলা করবার প্রবণতা দেখায়, যদিও আমাদের সামাজিক অনুশাসনের জন্যে তাদের এই ইচ্ছা সব সময় ফলবতী হয় না। যাই হোক, এই মেলামেশার ফলে অনেক সময়ে ছেলেদের, মেয়েদের বা ছেলেমেয়ের পরস্পরের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়। মেয়েদের মধ্যে সই বা গঙ্গাজল পাতানো, অথবা একপক্ষ অপর পক্ষকে ছেড়ে কোন দিনই থাকতে পারবে না—এই রকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা ইত্যাদি নানারকম ব্যবহারের সঙ্গে আপনারা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত আছেন। কিন্তু এই সময়ের বন্ধুত্ব আপাতদৃষ্টিতে খুব ঘনিষ্ঠ বলে প্রতীয়মান হলেও আসলে সেটা যে নিতান্তই বাহ্যিক, তার প্রমাণ পরবর্তী জীবনে পাওয়া যায়। সে যাই হোক, ছেলেমেয়েদের এই সামাজিক জীবনে কিছুকালের জন্যে হঠাৎ আবার একটা ভাটা এসে পড়ে। সে কেমন যেন সবসময়ে একরকম আত্মস্থ হয়ে থাকে, নিজেকে পাঁচজনের কাছ থেকে গুটিয়ে নিয়ে একলা থাকতে ভালবাসে—এক কথায় সে রীতিমত অসামাজিক হয়ে ওঠে। এই অবস্থাটি অবশ্য সাময়িক মাত্র। এর পরে সে আবার সামাজিক হয় এবং আগের মত পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করে। তার একটু পরিবর্তন হয় এই যে, এখন সে এমন একজনকে খোঁজে যার সঙ্গে সত্যিই বন্ধুত্ব করা চলে, যে তাকে ঠিকমত বুঝতে পারে, যার কাছে সুখদুঃখের বা অন্যান্য ব্যক্তিগত সব কথা চলে, অর্থাৎ এক কথায় যার ওপর সর্বতোভাবে নির্ভর করা যায়।

তারপর বলতে হয় নৈতিক চরিত্রের কথা। নৈতিক চরিত্রের সুষ্ঠু ও পূর্ণবিকাশের অর্থই হলো সমাজ-স্বীকৃত নিয়ম বা রুচির অনুবর্তিতা। কোনো একটি কাজ ভাল কি মন্দ--আমরা বিচার করি সমাজের দিকে চেয়ে, অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি বা বিধিনিষেধের সঙ্গে ঠিক মত খাপ খেলে বলি ভাল এবং খাপ না খেলে বলি মন্দ। এখন ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ গুরুজনেরা যা শিখিয়ে দেন, বাল্যকালে ছোট ছেলেমেয়েরা সেটি নির্বিবাদে মেনে নেয়। সুতরাং নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিস্থাপন হয় বাল্যকালে। সেই ছেলেমেয়েরা আবার কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে নিজেরাই ভালমন্দ বা ন্যায়-অন্যায় বিচার করবার চেষ্টা করে এবং সেটা তারা করে কার্যবিশেষের ফলাফল দেখে। শুধু তাই নয়—মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এখন তারা এই বিচারকার্যে গুরুজনদের চেয়ে বরং নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের মতামতের উপর বেশী আস্থাবান হয়।

এটা হলো এই বয়সের ধর্ম এবং এ বিষয়ে পিতামাতা বা শিক্ষকদের অবহিত থাকা উচিত। ছেলেমেয়েরা কথার অবাধ্য হলো মনে করে তাঁরা যদি ক্ষুব্ধ হন বা তাদের ওপর রাগ প্রকাশ করেন তাহলে তাঁরা কিন্তু মস্ত ভুল করে বসবেন। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ' এই উক্তিটি এ জায়গায় খুবই প্রযোজ্য সন্দেহ নেই।

শারীরিক পরিবর্তনের জন্য যৌনবোধের যে নতুন অধ্যায় এ সময়ে স্নুরু হয়, সে কথা আগেই কিছুটা বলেছি। নতুন হলেও যৌনবিষয়ে কৌতূহল অবশ্য কমবেশী সব ছেলেমেয়ের মধ্যে বাল্যকাল থেকে বর্তমান থাকে এবং তার প্রমাণ তাদের ঐ বিষয়ে নানারকম প্রশ্ন থেকেই পাওয়া যায়। অশ্লীলতার অজুহাতে এই স্বাভাবিক কৌতূহল বা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তাদের দেওয়া তো হয়ই না—উপরন্তু তারা ধমক খায়; কিম্বা এড়িয়ে যাওয়া হয় অথবা ভুল বা মিথ্যা উত্তরে তাদের শাস্ত করা হয়। ছেলেমেয়েরা কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে না। তারা অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে এর, ওর কাছ থেকে বা আজেবাজে বই পড়ে তাদের কৌতূহল বা প্রশ্নের সমাধান করে নেয়। এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তারা যৌনবিষয়ে একটি অসম্পূর্ণ, ভুল বা বিকৃত ধারণা নিয়ে বসে আছে। এই সব ছেলেমেয়ের নিজেদের যখন যৌনজীবন স্নুরু হয় তখন তারা পূর্বার্জিত ভুল বা বিকৃত ধারণার সঙ্গে আসল ব্যাপার, অর্থাৎ নিজেদের জীবনে এখন যা উপলব্ধি করলো তার কোন মিল খুঁজে পায় না। ফলে তাদের মনে একটা বিরাট সংঘাত বাঁধে এবং নানা-রকম অসহনীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য, হিষ্টিরিয়া জাতীয় মানসিক ব্যাধি, অব্যবস্থিতচিত্ততা, এমন কি কোন কোন আত্মহত্যার মূলে অনেক সময় এই জাতীয় দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। বয়সের অনুপাতে ছেলেমেয়েরা যাতে উপযুক্ত যৌনশিক্ষা পায়, শিক্ষক বা অভিভাবকদের, বিশেষ করে মায়েদের সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এই সময়ে লক্ষ্য করবার মত আর একটি জিনিষ আছে সেটা হচ্ছে—ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে কেমন যেন একটা আলস্য, অস্থিরতা ও চাপা অসন্তোষের প্রকাশ হয়—বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যেই এই ভাবটি বেশী মাত্রায় দেখা যায় এবং তার কারণও অবশ্য আছে। যাই হোক, এরকম অবস্থাটি বয়সোচিত, স্নুতরাং স্বাভাবিক। ভাল কথায় বা বুঝিয়ে বলে তাদের কাছ থেকে এ সময়ে যেটুকু কাজ বা সহযোগিতা আদায় করা যায়, সেই চেষ্টা করা

উচিত; কারণ জোর-জবরদস্তির ফল অনেক ক্ষেত্রে খারাপই হয়ে থাকে। এই রকম অসামাজিক ভাব বেশীদিন থাকে না—জননেন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিকাশ হবার পর থেকেই এই ভাবগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আবার পূর্বের স্বভাব ফিরে আসে।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের জীবনে যে আমূল ও প্রচণ্ড পরিবর্তন হয় তার মোটামুটি পরিচয় আমরা পেলাম। এই পরিবর্তনের সময় যে উত্তেজক অবস্থার ও উদ্দাম শক্তির সঞ্চার হয় তার সঙ্গে বন্যাস্ফীত নদীর তুলনা করা যেতে পারে। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা নদীর এই ধ্বংসাত্মক শক্তিকে রূপান্তরিত করে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, কৃষির জন্য জল সরবরাহ ইত্যাদি নানারকম সৃষ্টিমূলক কাজে নিয়োজিত করছেন। তেমনি বয়ঃসন্ধিকালের এই নিহিত শক্তি—যে কোন কারণেই হোক না কেন, সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজের পক্ষে অনুকূল হয়ে প্রকাশ পায় না। প্রত্যেক ছেলেমেয়ে যাতে সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে জীবনে সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করে, সে বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবক এবং দেশের নেতাদের পূর্ণ দায়িত্ব আছে এবং তার জন্যে তাঁদের একত্র চেষ্টা ও সহযোগিতা যে একান্তই প্রয়োজন সে কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিরন্তন এই আশা ফলবতী করতে হলে বয়ঃসন্ধিকালের এই উদ্দাম শক্তিকে অবরুদ্ধ রাখলে বা অগ্রাহ্য করলে চলবে না। তাকে উচিতমত সৃষ্টিমূলক কাজে লাগাতে হবে, তাকে ব্যক্তিবিশেষ, সমাজ ও দেশের কল্যাণের জন্যে প্রয়োজনানুযায়ী রূপান্তরিত করতে হবে। কি প্রণালী অবলম্বন করলে বা কোন্ পথে অগ্রসর হলে এই সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যায়, মনোবিদ্‌গণের গভীর ও ব্যাপক গবেষণা থেকে তার নির্দেশ পাওয়া যায়।

সাময়িকী

১৫ই আগষ্ট: আধুনিক ভারতবর্ষের বিজয়া দশমী ১৫ই আগষ্ট। শ্রীরামচন্দ্র সেই কোন্ অতীত যুগে শরৎকালে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিয়া রাবণের হাত হইতে অপহৃতা সীতাকে দশমী তিথিতে উদ্ধার করিয়া ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের বিপ্লব আন্দোলনের শেষ ঋত্বিক মহাত্মা গান্ধীও মহাশক্তি পূজার সিদ্ধিরূপ অপহৃত ভারতবর্ষকে বৃটিশের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতবাসীদের হাতে ভারতবর্ষকে প্রত্যর্পণ করিয়া বৃটিশ এদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে। কোটি কোটি ভারতবাসীর বুকের তাজা রক্তে মহাশক্তির পূজা সাধিত হইয়াছিল। এই দিনের মহিমা ও মাধুর্য্য অবর্ণনীয়, আমরা এই বিজয়া দেবীকে আমাদের সকল দেহপ্রাণ মন দিয়া বরণ করিতেছি এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে আমাদের প্রীতি-আলিঙ্গন—'কোলাকুলি' নিবেদন করিতেছি।

মহাত্মাজী 'স্বরাজ' সাধনার জন্যই মহাশক্তির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; শুধু স্বাধীনতা প্রাপ্তিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। আমরা কিন্তু স্বরাজের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া স্বাধীনতাই চাহিয়াছিলাম। মহাত্মাজীর স্বরাজ যদি আমাদের কাম্য হইত, যদি তাঁহার অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠনকর্ম্মকে প্রাণপণে অনুসরণ করিতাম, তবে সব দিক দিয়াই জাতির কল্যাণ সাধিত হইত। বৃটিশ গিয়াছে, কিন্তু আমরা নিজেদের ঘর গুছাইবার শক্তি লাভ করি নাই। স্বরাজ সাধনার ভিতর বৃটিশের কবল হইতে মুক্তি এবং ঘর গুছাইবার কৌশল সবই নিহিত ছিল। এ দেশের কয়জন সত্যই গঠন কর্ম্মের প্রতি বিশ্বাসী ছিল? তাহারা রাজনীতি করিয়াছে, সে দিন খেয়াল হয় নাই যে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান না হইলে রাজনৈতিক মুক্তি 'ভূয়া' হয়। আজ যাহারা বর্ত্তমান স্বাধীনতাকে 'ভূয়া' বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, একদিন তাহারা কিংবা তাহাদের নেতারাই —'স্বরাজে'র স্থানে 'স্বাধীনতা' চাহিয়াছিলেন। বর্ত্তমানের এই 'অপূর্ণ' স্বাধীনতার জন্য দায়ী ইহারাই। রাজনৈতিক মুক্তি আমরা পাইয়াছি, এ কথা নিঃসন্দেহ। মহাত্মাজীকে বুঝিতে পারিলে আজ এই আর্ত্তনাদ করিবার প্রয়োজন হইত না। যে স্বাধীনতা মিলিয়াছে, তাহাকে সর্ব্বক্ষেত্রে

আস্বাদন করিবার দায়িত্ব জাতিরও। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব আনিবার ভার জনসাধারণের। সরকার এই দিকে প্রাণপণ করিবেন কিন্তু জনসাধারণকে আজ প্রস্তুত হইতে হইবে এই বিপ্লবের জন্য। জনসাধারণ ও সরকার যদি এখন পারস্পরিক সহযোগিতায় অগ্রসর হইতে পারে, তবে ভারতের মুক্তি সর্ব্বাঙ্গীণ হইবে। 'প্রতিরোধ' করিয়া জাতির আত্মশক্তির উদ্বোধন হইতে জাতির দৃষ্টিকে বিপথে পরিচালিত করিয়া শুধু বিপদকেই ডাকিয়া আনা হইবে। সরকারই একমাত্র সত্য নয়, সমগ্র সত্যের এক অর্দ্ধেক সরকার এবং অপর অর্দ্ধ জনসাধারণ। জনসাধারণ যদি গঠনকর্ম্মে আত্মনিয়োগ না করেন, সরকার একা কি করিবেন? হিংসা বিদ্বেষের সাধনায় জাতিগঠন হয় না, উহাতে শক্তির শুধু অপচয়ই হয় এবং উহা পরিণামে পরস্পরের মধ্যেই হিংসা আনিয়া দেয়। ভারতের বিজয়া ভারতবাসীকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন, জাতি সংগঠনের উপযোগী বুকের বল ও কর্ম্মশক্তি প্রদান করুন।

বিনোবাজী ও ভূমি-বিকেন্দ্রীকরণ: আজ বিশ্বের সর্ব্বস্তরে—আধ্যাত্মিক, সমাজনৈতিক, বৈষয়িক—বিকেন্দ্রীকরণের দর্শন জমিয়া উঠিতে চাহিতেছে। এই বিকেন্দ্রীকরণকে ভূমির ক্ষেত্রে বহু রক্তপাতের ভিতর দিয়া রূপায়িত করিয়াছে রাশিয়া এবং চীনও তাহার পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহাতে বর্ত্তমান যুগের অন্তরাত্মা সায় দেয় নাই। বর্তমান যুগ সমন্বয়ের যুগ, পরস্পর-বিরুদ্ধদের একই সমগ্রের মাঝে মিলনের যুগ। ভারতবর্ষ এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য মহাত্মাজীর সাধনলব্ধ পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই পথ আত্মশক্তি-উদ্বোধনের পথ, এই পথ ভূমিহীন জনগণের আত্মশক্তিকে সংহত করিয়া তাহার ভিতর ভূমিপতিদের, শক্তিমানদের পরিপাক করিবার পথ, সমগ্র সমাজ গড়িবার পথ। মহাত্মাজীর প্রিয়তম শিষ্য আচার্য্য বিনোবাজী বর্ত্তমানে এই অহিংস পথ অবলম্বন করিয়া কতদূর এই পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার একটী চিত্র গত ৪ঠা আগষ্টের অমৃতবাজার পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দেবেন সেন এম, এল, সি দিয়াছেন। আমরা তাহা হুবহু উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য বলিব।

'Liquidation of the feudal system of property relationship accompanied by equitable re-distribution of land is the begining of any social and economic revolution in India.

That is why congress has given first priority to the abolition of land-lordism in India. In some states, already bills abolishing land-lordism have been passed.

But as the abolition of land-lordism has not been accompained by equitable re-distribution of land, people's enthusiasm has not been roused. Discontent is spreading fast. Faith in the efficacy of parliamentary methods is dwindling.

With the same object of having equitable re-distribution of land, the communists tried an entirely different method—that of violence. They started a communist state at Telengana in the state of Hyderabad, about 4 years ago, murdered three thousand land-lords, big or small and forcibly seized 30,000 acres of land in the course of two years of their murderous campaign. These 30,000 acres of land have not been distributed as yet. And what is these 30 000 acres of land in a vast country like India ?

A third method, for the same purpose of equitable re-distribution of land, has now been initiated by Saint Vinobha Bhave, disciple of Mahatma Gandhi and man of unique personality.

This method consists in appealing to people for parting with their surplus land for re-distribution amongst those who have not. The movement has come to be known as the 'Bhoodan' or the 'Land-gift' movement.

Curiously enough Saint Vinobha got the glimse of this new method while addressing a meeting at Telengana in Hyderabad about *2* years ago. It was in that meeting that the land-lords, in a body, offered their surplus land for distribution amongst the landless section.

Since then Vinobhaji has been going from village to village and door to door making this appeal for land-gift with magnificient success. In course of two years, he has succeeded in collecting 20 lakhs of acres of land. By 1957, he expects a complete solution of this great land-problem of India. The fundamental basis of this movement is faith in the moral values of man which in its turn depends upon faith in God. The task is to appeal to this moral sense and rouse the moral conscienceness in man. When that is done, a man's attitude towards ownership of property undergoes

a re-volutionary change. He then ceases to be the owner of a property for his own gain. He becomes a trustee of that property for the benefit of the society.

This in essence is the 'Theory of Trusteeship' propounded by Mahatma Gandhi. Vinobhaji is trying to translate that into practice.

Application of this theory has no limit. The gift of a poet or a singer or a painter does not belong to him. It is a social product. One is a mere trustee of that gift for use in the society.

2

The 'Theory of Trusteeship', when properly applied, therefore, brings about in essence abolition of private property in a peaceful manner and through appeal to moral values.

It will be argued that such moral appeals had failed in the past, and are bound to fail now also.

One or two persons may be imbued with such lofty ideals ; but there is no possibility for the vested interest as a class to respond to such moral values.

In the present case, however, the method of appeal has not proved to be ineffective. As we have seen, in the course of two years, more than twenty lacks acres of land have been collected. The movement is gathering momentum every day and quicker results are expected.

3

But the movement does not depend upon appeals and persuation only. That is only the first phase of the movement. If that fails, the second phase, that of non-violent mass action, comes into operation. In fact the first phase of the movement creates the background for the second phase to come and operate, if necessary. Wherever Vinobhaji is going, thousands of people gather to hear him and to participate in the movement. Since those great

days of Mahatma Gandhiji's Civil Disobedience movement, nothing has stirred the villagers so profoundly as this movement of 'Land-gift'.

In case the land-lords refuse to respond to the appeal for land-gift, the villagers are gathering strength for non-co-operation with the land-lords. It will then be very easy for them to refuse to cultivate the land of the land-lords and to refuse them other services. A peaceful occupation of surplus lands is also within the scope of non-violent mass action.

4

Thus Vinobhaji's movement is no beggars movement, neither it is the movement of a philanthrophist. It is the unfoldment of a revolutionary urge amongst the masses. Its immediate object is the equitable distribution of land. Equitable distribution of all wealth is the ultimate goal.'

বিনোবাজীর এই পথ কংগ্রেস সমর্থন করিয়াছে, সরকার অনুমোদন করিয়াছেন। যাহাদের হাতে রহিয়াছে শাসনযন্ত্র, তাহাদিগকে আইনের পথেই সমতা আনিতে হয়; সেখানে ভূমিমালিকগণ আইনের সাহায্যে তাহাদের কেন্দ্রীভূত ভূমি আঁকড়াইয়া ধরিবার যথেষ্ট আইনগত সুযোগ পায়। সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত বিনোবাজীর পক্ষে তাই এ কাজ হৃদয়ের ভিতর দিয়া করা সহজ হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট আইনের পথে ইহা করিলে গলদঘর্ম হইতেন। বিধি ও হৃদয় যদি সহযোগিতা করিয়া চলে তবে এই পথে সিদ্ধি অদূরে। বিনা রক্তপাতে ভারতবর্ষ এই দুরূহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে, আবার মহাত্মাজীর সাধনা জয়যুক্ত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

গোটা ভারতবর্ষ এই পথে আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেখানে বাঙ্গালা কই? বাঙ্গালী কোনও দিনই প্রাণ খুলিয়া মহাত্মাজীর অহিংসা ও গঠনকর্ম্মকে স্বীকার করিয়া লয় নাই। সজ্ঘর্ষই সে ভালবাসিত। স্বরাজ শব্দের স্থলে 'স্বাধীনতা' শব্দ বসাইবার জন্য যে তুমুল আন্দোলন মহাত্মাজীর সময়ে চলিয়াছিল, তাহার নেতৃত্ব অনেকটা ছিল বাঙ্গালীর। হিংসাপূর্ণ বিপ্লব বাঙ্গালী সার্থকতার সহিতই করিয়াছে। কিন্তু তাহা যখন স্তিমিত হইল, তখনই না মহাত্মাজী ভারতবর্ষে অহিংসা-মন্ত্র লইয়া আবির্ভূত হইলেন? বাঙ্গালার 'constructive programme' লইয়া মাথা ঘামাই-

বার কে আছে? এখানে শুধু 'প্রতিরোধ।' গণশক্তিকে অহিংসার পথে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কোন্ কৌশলে পরিচালিত করিলে কেন্দ্রকে গণদাবীর কাছে মাথা নোয়াইতে হয়, তাহা মহাত্মাজী হাতে কলমে দেখাইয়া গিয়াছেন। মহাত্মাজী দাঁড়াইয়া পুলিশের লাঠি খাইবার ও আত্মশক্তির উদ্বোধনে পশুশক্তিকে জয় করিবার সাধনা দেখাইয়াছিলেন। দেশ কি তাহা ইতোমধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছে? গভর্ণমেণ্ট পশুশক্তির আশ্রয় লইলে কি জনসাধারণকেও তাহাই লইতে হইবে? বড় হিংসাকে কি ছোট হিংসা দ্বারা ঠেকানো যায়? জাতির ভিতরে ব্যর্থ উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে হিংসার পথে পরিচালিত করিবার দুঃসাহস যেন ভারতবর্ষে কাহারও না হয়। বিনোবাজী আজ আর একবার অহিংসার মহিমা ও মাধুর্য্য ভূমি-সমস্যার ভিতর দিয়া জাতিকে শিক্ষা দিবার জন্য আগাইয়া চলিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ তাঁহার সাধনাকে জয়যুক্ত করিবেন। বাঙ্গালী এই পথকে চিনিয়া লউক, সঙ্ঘর্ষ-মূলক রাজনীতির ক্লেদোক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের পথে চলুক। বাঙ্গালী তাহা হইলে আবার ভারতবর্ষের সামনে দাঁড়াইতে পারিবে। 'No method is too mean'-নীতি বাঙ্গালীকে ডুবাইয়াছে। বাঙ্গালী আজ সর্ব্বক্ষেত্রে পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে। বাঙ্গলার বুদ্ধি ছিল, হৃদয়ও ছিল—নাই তাহার সমন্বয়। বুদ্ধি ও হৃদয়ের সমন্বয় বিধান করিতে পারিলে বাঙ্গালীর সম্বন্ধে উক্তি, 'What Bengal thinks to day, India does tomorrow' সার্থক হইবে। সময় থাকিতে বাঙ্গলা অবাহত হউক। বিনোবাজী প্রবর্ত্তিত ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনকে সে দেহ প্রাণ মন দিয়া বরণ করিয়া লউক। বাঙ্গলার গৌরব আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। বন্দে মাতরম্।

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৬০

পূজার দিনে

রেণু মিত্র

আবার পূজা এসে গেল। মানুষের যেমন একটা দৈনন্দিন সাধনা আছে, তেমনি আছে একটা বাৎসরিক সাধনা। শারদীয়া দুর্গোৎসব আমাদের তেমনি একটা বাৎসরিক সাধনা। এ সাধনা শক্তি আরাধনার। আমাদের দৈনন্দিন সাধনায় আমরা একদিনের দিনযাপনের ও বৃহত্তমের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের ঐ অল্প সময়ের হিসাব নিকাশ করে থাকি। শারদীয়া পূজার এই বাৎসরিক সাধনায় আমরা হিসাব করব দীর্ঘ বা সুদীর্ঘ দিন ধরে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই যে একটা ব্যাপার ঘটে আসছে, তার তাৎপর্যকে আমরা কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পেলাম। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের এই অত্যন্ত মূল্যবান কথাটা যেন আমরা মনে রাখি যে, বৃহত্তমকে হৃদিস্থ করবার কিংবা ভাষান্তরে আমার ক্ষুদ্র আমি-কে বিস্তারিত করে তাতে বৃহত্তমের প্রবেশকে সম্ভব করে তোলবার যে যে প্রয়াস আজ পর্যন্ত যত প্রাণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটী ন্যায্য, যুক্তিসহ এবং তা অশোভন নয়। তাই দীর্ঘদিনের চলে-আসা এই যে পূজার আচরণ, এর অর্থ, প্রয়োজন ও মর্যাদাকে আজ ব্যক্তির ও জাতির জীবনে আমাদেরকে বুঝতে হবে।

পূজা আসে, শেষ হয়ে যায়—অথচ তার সম্বন্ধে আমাদের কিছু ভাবনা নেই বললেই হয়। একদল হৈ হৈ করি, প্রায় সপ্তাহকাল ধরে লাউডস্পীকার চালিয়ে যাই আর কেউ বা চিরাচরিত মন্ত্রোচ্চারণে পূজা সমাধা করি। কিন্তু শক্তির আরাধনা করি কোথায় ?

শক্তিকে আজ কি ভাবে ভাবব ?

শক্তির দুইটি রূপ আছে—একটা অহংকারের প্রকাশ, অপরটি অহং বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ। শুম্ভ নিশুম্ভের শক্তি আর মায়ের শক্তি কি এক রকমের শক্তি? হিটলারের কিংবা আমেরিকা রাশিয়ার শক্তি আর গান্ধীজীর শক্তি কি একই রকমের শক্তি? মালানের শক্তির স্বরূপ বা রূপটা কি জাতীয়?

শুম্ভনিশুম্ভের শক্তি অহংকারের শক্তি। এটা আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার পরিচয়। শুম্ভনিশুম্ভের যে তপস্যা ছিল না তা নয়। তারা দীর্ঘ অযুত বৎসর পবিত্র পুষ্কর তীর্থে ব্রত দান জপ ইত্যাদি কঠোর ও কঠিন তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু সে তপস্যা তাদের অহংকারকেই শুধু পুষ্ট করেছিল, বিশ্ব, বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বের যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিপরায়ণ করে নি। শুম্ভ নিশুম্ভ মনে করলে বিশ্বটা তাদের ভোগের বস্তু। দেবীর কথা যখন তাদের জানান হল, তারা বললে তাকে আন, তাকে আমাদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করব। নিজেদের শক্তিমত্তার কথাও তারা তাঁকে বলে পাঠালে। স্ত্রীরূপা শক্তিকে যখন তারা দেখলে, তখন সে শক্তিকে তারা নিজেদের করে মনে করলে—কিন্তু সেই শক্তিরও যে একটা পৃথক ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাকে যে শ্রদ্ধা করেই, স্বীকার করেই আয়ত্ত করা চলতে পারে—শুম্ভনিশুম্ভ এ কথা জানতো না। তারা তাঁকে নিজেদের অহংকারের শক্তি দিয়েই লাভ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনিও যে বলে পাঠালেন, যে আমাকে সংগ্রামে জয় করবে, যে আমার দর্প চূর্ণ করবে, যে আমার প্রতি বল, আমি তাকেই ভর্ত্তা বলে বরণ করতে পারব। তাহলে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে শুম্ভ নিশুম্ভের যেমন একটা শক্তি আছে, দেবীরও তেমনি শক্তি আছে, এবং দুটো শক্তির স্বরূপ একরকমের নয়। আগেই বলেছি একটা অহংকারের দাম্ভিক প্রকাশ, অপরটা আত্মিক শক্তির স্বপ্রকাশ দীপ্তি। এই আত্মিক শক্তি স্বপ্রকাশ—আমাদের অহংকারের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে, তাই তাকে আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে এত কঠিন; অথচ আত্মার পক্ষে তা স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধাক্কাধাক্কি একটা চলেই আসছে। শুম্ভ নিশুম্ভ তাদের নাম ও অস্তিত্বে সেই সুপ্রাচীন কালেই নিঃশেষ হয়ে যায় নি—আজকের দিনের আমাদের সকলের মধ্যেই সেই শুম্ভ নিশুম্ভ বাসা বেঁধে আছে—আমাদের আজকের শক্তি অহংকারের দাম্ভিকতা। এই শক্তিরই ঠোকাঠুকিতে আজকের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন বিপন্ন। কিন্তু

শক্তির এ তো সত্যিকারের সার্থক রূপ নয়। ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সেই স্বরূপ শক্তির প্রকাশ কি সম্ভব নয়, অন্যের অস্তিত্বকে যা অস্বীকার করে না, অন্যকে গ্রাস করে যা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে না? এ কথায়ই প্রশ্ন উঠবে সংসারময় এই নিয়মই সনাতন সত্য যে, তোমাকে মেরে আমি বাঁচব, আমাকে মেরে তুমি বাঁচবে। এ কথাটা খানিকটা সত্য তো বটেই, কিন্তু এই অদ্ভুত বিশ্বে এ কথাটাও সত্য যে, আমার প্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে বাঁচাই, তোমার প্রাণ দিয়ে তুমি আমাকে বাঁচাও। তাই এ বিশ্বে প্রাণধারা আজও অম্লান, তা না হলে কবে এ বিশ্বটা ইটপাথরে পরিণত হতো। তাই কেবল মানুষের সন্তানকেই তার পিতামাতা বাঁচান না, পাখী তার বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখে কোন্ প্রেরণার বলে? সে প্রেরণাও তো ভগবান জীবমাত্রেরই মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন! আত্মকেন্দ্রিকতা যেমন মানুষের স্বভাব, অপরকে অস্বীকার করে চলবার একটা প্রবণতা যেমন তার আছে, তেমনি গায়ে গায়ে লাগিয়ে চলবার একটা আসঙ্গ লিপ্সা কি মানুষের রক্তের কণায় কণায় নেই? সেই প্রবৃত্তিটাকে বাড়িয়ে তুলে মানুষকে যদি এ কথা মনে করিয়ে রাখতে শেখান যায় যে, এই যে তার ঘরে সে নিশ্চিন্ত বসে আছে, তার এই থাকার মধ্যে কি লক্ষ মানুষের থাকা মিশে যায় নি? আমি কি একটা শূন্য প্রান্তরের মধ্যে বাস করতে পারি এবং এমনি নিশ্চিন্তে বাস করতে পারি? তাই শক্তিমান হওয়া মানেই অপরকে অস্বীকার করা বোঝাবে কেন? সেটাকেই মানুষের স্বরূপ বলে বলব কেন? অহংকারের দৃপ্ত প্রকাশটাকেই—অন্যকে অস্বীকার করাটাই যার স্বভাব—শক্তি বলে মেনে নেব কেন? শারদীয়া পূজার এই শক্তি আরাধনার দিনে এই ভাবনাটাই আজ আমাদের শিখতে হবে, এই প্রার্থনাই করতে হবে যে, আমাদের শক্তি দাও, আমাদের বীর্য দাও; কিন্তু অপরকে শক্তিহীন করবার, অপরকে নিবীর্য করবার মনোবৃত্তির দুর্বলতা থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। ব্যক্তিগত ও জাতিগত একটা নিবীর্যতার দিনে, শক্তির বিকৃতির এই পৌরুষহীনতার আবেষ্টনের মধ্যে শক্তির এই সাধনাই আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। আমি বড় হয়ে যাব, কিন্তু অপরকে ছোট করব না—শক্তিতত্ত্বের এইটেই আজকের দিনে আমাদের সব চেয়ে বড় সাধনা হোক।

শক্তি তখনই অহং-এর বিকৃতিতে পরিণত হয়, যখন সে যান্ত্রিক। জীবনের সমগ্রতার সঙ্গে যা অঙ্গীভূত নয়, তাই-ই যান্ত্রিক। এই বিরাট বিশ্বটার

দিকে যদি একবার সত্যিকরে চোখ মেলে তাকাই তাহালে দেখি আমি কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য! আমার বাইরে অনন্ত দেশ, অনন্ত বস্তু—এই পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র কোণে আমি পড়ে আছি। আকাশের দিকে তাকালে দেখি কোটী কোটী গ্রহ নক্ষত্র, বিরাট চন্দ্র সূর্য—আমার দেশ কালের সীমাবোধের মাঝে কোথাও তার থই মেলে না। জলের দিকে তাকালেও আমার ক্ষুদ্রত্ব তেমনি করেই প্রমাণিত হয়। আর এই মাটির জগতেই বা আমার স্থান কোথায়? চারদিকে এই যে আমার ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণিত হল, তাহলে আমার অস্তিত্ব রইল কোথায় কতটুকু কেমন করে? কিন্তু তবু তো আমার অস্তিত্ব আছে। আমার যে মনে হয়

> তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে
> সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে।
>
> — — —
>
> নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকায় আমার পানে সে,
> লক্ষ যোজন দূরের তারকা মোর নাম যেন জানে সে।

তাই আমি যে নেই তা তো নয়! তবে কেমন করে মিল হবে? চারদিকের এই বিরাটত্ব এই বিশালত্বের কাছে আমার থাকার অর্থ কি? আমার বাইরে যে অনন্ত শক্তির খেলা চলছে তার সাথে আমার সম্পর্ক কি? যতক্ষণ মনে করি এই বিরাট শক্তি একেবারেই আমার বাইরে, ততক্ষণ সে শক্তি আমার কাছে যন্ত্রদানবের শক্তি, ততক্ষণ সে আমার কাছে ভীষণ হতেও ভীষণ, ততক্ষণ সে আমার ভীতিউৎপাদকই শুধু। নিজের বাইরের এই শক্তিকে মানুষ কিছুই কি আয়ত্ত করতে পারে না? পারে, এই যন্ত্রদানবের শক্তিরই কণামাত্র লাভ করে মানুষ অহংকৃত হয়ে ওঠে। যে শক্তিকে একান্তই আমার বাইরের বলে জানি, বিবিধ রকম তপস্যাদ্বারা সেই শক্তিরই কণামাত্র লাভ করতে পারি—কিন্তু সেই শক্তিই বিকৃত হয়, অপরকে তাই-ই অস্বীকার করে। কিন্তু বুকের মধ্যে যে বোধ করি 'বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতি কণা মোরে টানিছে,' তাহালে সেই শক্তিই আমার বুকের মধ্যেও তো আছে! বাইরের শক্তিকে যখন বুকের ভিতরে পাই, তখনই তার সাথে আমার আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। শক্তিকে বাঙ্গালী তাই মা বলে ডেকেছে—মা আমার চেয়ে অনেক বড়, তাঁর কাছে আমি শক্তিহীন, তবু তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে; আর নিঃশক্তি আমাকে

তিল তিল করে তিনিই শক্তিমান করে তোলেন। মায়ের শক্তিতে যখন শক্তিমান হতে চাই, তখন সে শক্তি যন্ত্রদানবের শক্তি নয়, সে শক্তির অহংতাতে বিকৃত পরিণতি ঘটে না। মা যখন আমাকে শক্তিমান করেন, তখন তাতে আমার আত্মারই স্ফূর্তি ঘটে। মায়ের শক্তিতে শক্তিমান হওয়ার পরে আমার মধ্যে যে সৃষ্টির প্রেরণা জাগে—শক্তিতত্ত্বের সেটা তৃতীয় অধ্যায়। এই তৃতীয় পর্যায়ে শক্তি সৃষ্টিধর্মী, বিশ্বের স্রষ্টার সঙ্গে তখন সে সাধর্ম্য লাভ করে। বাঙ্গালীর ঘরে শক্তি তখন মেয়ের রূপ পরিগ্রহ করেন,—বাঙ্গালীর শারদীয়া পূজা তাই মেয়ের পূজা। শক্তি যখন সত্যিকারের সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করে, তখন সে শক্তি বিকৃত হয় না।

বিরাটের সঙ্গে ক্ষুদ্র আমির সম্পর্ক প্রাণের মধ্য দিয়ে—সেই প্রাণের মধ্যে

'জগতের এই অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব—
বহিছে একটি চিরগৌরব, এ কথা না যদি শিখিলে
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।'

এই প্রাণের মধ্য দিয়ে বিরাট শক্তিকে আমি পুনর্বার সৃষ্টি করি। বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ের পূজার তাই এত আদর। স্রষ্টাকেও সৃষ্টি করে তোলবার যে মনস্তাত্ত্বিক কল্পনা বাঙ্গালী বহু আগেই করে রেখেছিল, সেই কল্পনা তার বাস্তব জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে রূপ লাভ করুক, সত্যিকারের সৃষ্টি ক্ষমতা সে লাভ করুক, আজ শারদীয়া পূজা অবসরে আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রার্থনায় এই সাধনাই গ্রহণ করি।

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

\- - - -

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

\- - - -

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

মায়ের আবাহন

প্রতিভা রায়

শরতের প্রকৃতিদেবী শুভ্র স্নিগ্ধ সাজে সাজিয়া তাহার মাতৃ হৃদয়ের স্নেহামৃত ধারা সর্বত্র যেন ছড়াইয়া দিয়াছে। একদিন প্রকৃতির এই মহিমময়ী স্নিগ্ধ সুষমা পল্লী জীবনে কত সুন্দর, কত মধুর হইয়া দেখা দিয়াছে। পল্লীর আকাশ বাতাস, জল স্থল, পল্লীর ঘাট মাঠ, পল্লীর সিউলী ঝরা ফুল, পল্লীর রাম প্রসাদী সুরের আগমনী গান, সে যেন প্রাণে কি এক অব্যক্ত আবাহন গীতি জাগাইয়া তুলিত। কোথায় আজ মায়ের আবাহন? সে দিন যে সহজ ভাবেই প্রাণের তন্ত্রীগুলি মা মা বলিয়া ডাকিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিত, সেই তো মায়ের আগমনী, সেই তো মাতৃপদশব্দে ব্যাকুল শিশু সন্তানের সচকিত পথ-চাওয়া। ইহাই তো মায়ের আবাহন। মা সন্তানের সম্পর্ক সহজ প্রাণের সম্পর্ক। কিন্তু আজ বিকৃত সভ্যতার চাপে প্রকৃতির সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত আবাহন আমাদের জীবনে থামিয়া গিয়াছে। আজ তাই আমরা আমাদের মাকে শিশুর মত মা মা বলিয়া ডাকিতে পারিতেছি না। প্রতি বৎসর মায়ের পূজার বিকৃত উৎসবই কলিকাতাকে মুখরিত করিয়া একটা তাণ্ডব নৃত্যেরই অভিনয় করিয়া থাকে। এই কি মায়ের পূজা? এই কি স্নেহময়ী জননীর সন্তানের নিকট আসিবার উপযুক্ত পরিস্থিতি? এই কি শিশু সন্তানের ব্যাকুল মাতৃ-আবাহন?

জীবভৃতা সনাতনী মা আমার আসেন, প্রতি বৎসরে জীবের জীবন দোলায় দোল দিয়া তিনি আসেন, আমাদের পূজা মণ্ডপে দশভুজা দশ দিকপালিনীরূপে তিনি আসেন। মা আমাদের শুধু একা আসেন না। তাঁহার সঙ্গে আসেন ধন-ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, জ্ঞানরূপিণী বেদমাতা সরস্বতী, আসেন দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, আর আসেন সিদ্ধিদাতা গণেশ। মা কেন এইরূপে আসেন ইহার কোনই কি অর্থ নাই? মা আসেন সন্তানকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিতে, জ্ঞানদান করিতে, বীর্য্যবান করিতে, সকল ক্ষেত্রে তাহাদের সিদ্ধিদান করিতে। এমন মাকে কি আমরা পূজা করি? প্রাণের ফুলে মায়ের পূজা করিলে দেশ আজ অন্নাভাবে, শিক্ষাভাবে, বীর্য্যাভাবে, ব্যর্থতায় এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত না; মায়ের আগমনকে আমরা বরণ করি না, মায়ের পূজা আমরা করি না। মাকে পুতুল রূপে পূজা মণ্ডপে বসাইয়া আমরা স্ত্রী পুরুষ,

বালক বালিকা, যুবক যুবতী সকলেই পুতুল সাজে সাজিয়া মাকে লইয়া পুতুল খেলাই খেলিয়া থাকি, তাই বিশ্বের বুকে আমরা জগন্মাতার সন্তান হইয়াও জীবনহীন পুতুলে পরিণত হইতে চলিয়াছি। জীবনের বাহিরে মাকে রাখিয়া এই কি মায়ের আবাহন ?

মা কি শুধু আমাদের উৎসবের বস্তু, খেলনার পুতুল ? তাই তাঁহাকে মাটী দিয়া গড়িয়া তিন দিন নাচানাচি করিয়া আবার বিসর্জ্জন দেই ? আমাদের মধ্যে মায়ের আগমনকে এত হাল্কা করিয়া দেখা নিতান্তই অজ্ঞতার পরিচয় নয় কি ! যে-মা একদিন সর্ব্বহারা রাজা সুরথের পূজা লইতে এই মূর্ত্তিতে আসিয়াছিলেন, যে-মা একদিন শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধনের আহ্বানে এই মূর্ত্তিতে আসিয়াছিলেন, আজও সেই মাই আসেন। রাক্ষস গৃহে অবরুদ্ধ সীতা, দৈববলে বলীয়ান রাবণ, স্বয়ং পশুপতি শিব যাহার রক্ষক, সে হেন রাবণকে বধ করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের কষ্টলব্ধ অষ্টোত্তরশত নীলপদ্মের পূজার অর্ঘ্যে সে দিন মা আসিয়াছিলেন, সে কোন্ পরিস্থিতি তাহা আমরা আজ ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের বোধ নাই, তাই এই দুর্দ্দিনে আমরা সেই মাকে লইয়া খেলা করি। পূজা করার অর্থ দেব ভূত্বা দেবং যজেৎ—দেবতা হইয়া দেবপূজা করিতে হয়। মা হইয়া তবে মায়ের পূজা করিতে হয়। মা যে মাটীর জগতে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে আসেন সে শুধু জীব-হৃদয়ে মাতৃশক্তি, জীবের স্বরূপ শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিবার জন্য, স্রষ্টা আসেন সৃষ্টের বুকে সৃষ্ট হইবার জন্য। তাই না জগৎ জননী মা আমার মেনকা দুলালী। অভিমান শূন্য হইয়া মাতৃ চরণে অবনত হৃদয়ের আবাহনেই সৃষ্টের বুকে মা অবতরণ করেন। 'জীবনে তোমারে পুজিবারে চাই'—জীবন দিয়া, জীবনেই মায়ের আবাহন করিতে হয়। জীবন বাদ দিয়া জীবনের বাহিরে মাকে রাখিয়া আমাদের পূজার সকল অনুষ্ঠান ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

এ দেশ কি দেখে নাই সে দিনও সরল প্রাণের মা ডাকের মাঝে মায়ের সার্থকরূপের বিকাশ ? লক্ষ লক্ষ প্রাণের মাতৃ আবাহনে ইংরাজের রাজদণ্ড কি খসিয়া পড়ে নাই ? মা আমার অপরাজিতা, মা আমার বিজয়া, মাকে মা বলিয়া ডাকিলে আমরা জগতে অপরাজেয় বিজয়া লাভ করিব না কেন ? মাকে মা বলিয়া ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছি তাই আমরা সর্ব্বক্ষেত্রে পরাজিত, শ্রীহীন বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছি। মাকে মা বলিয়া ডাকিলে অন্ন আসিত, জ্ঞান আসিত, বীর্য্য আসিত, সিদ্ধি আসিত। সন্তান যখন অহঙ্কারদৃপ্ত হইয়া

শুম্ভ নিশুম্ভের মত ভোগ লিপ্সায় মত্ত, মা তখনই যো মাং জয়তি সংগ্রামের বার্ত্তা পৌঁছান। মা তখনই হন রুদ্রাণি।

যে দেশ অন্নাভাবে শিক্ষাভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সেই দেশের মাতৃ পূজার দাম্ভিক আয়োজনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে, মা কি সে পূজা গ্রহণ করেন? করেন না, করিতে পারেন না। তিনি জগদ্ধাত্রী, জগৎ জননী। তাই আমাদের এত অনাদর অবহেলা সত্বেও মা আসেন আকাশে বাতাসে তাহার আগমনী বার্ত্তা ছড়াইয়া। আমরা মায়ের সে আগমনকে জীবনে বরণ করিতে পারি না, তাই তো মায়ের প্রতি বৎসরের আগমন আমাদের জীবন পথের কোনও পাথেয় রাখিয়া যায় না।

ভারতবর্ষ আজ তাহার স্বরূপচ্যুত, আদর্শ ভ্রষ্ট। ভক্তিহীন দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা করিয়া তাহার সিদ্ধি মিলিতেছে না। 'ঘরে ঘরে গীতা পাঠ হয় কেন ফলছে না, দেশলাইয়ের কাঠির দোষে একটা কাঠিও জ্বলছে না।' শ্রদ্ধাহীনতাই ইহার মূল কারণ। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। শ্রদ্ধান্বিত জীবনের কাছেই যুগে যুগে নররূপে ভগবান দেখা দিয়াছেন, সব সমস্যার সমাধান করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শ্রদ্ধা-হীনতাই আজ ভারতকে ডুবাইতে বসিয়াছে। বিদেশীর অনুকরণে আমরা চলি, আমাদের না আছে দেব দেবীতে ভক্তি, না আছে পূজ্য পূজার প্রতি শ্রদ্ধা। পূজ্য পূজার অবমাননায় আজ দেশের এই পরিণতি। আজও কি আমাদের আদর্শের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার সময় হয় নাই? আজও কি কোনও কিছুর অর্থ না বুঝিয়া দেব দেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া নাচানাচি করিবার দিন আমাদের রহিয়াছে? এখনও সময় আছে, মা আসিয়াছেন, শিশুবিশ্ববাসী, মায়ের চরণ তলে বসিয়া মা মা বলিয়া ডাকিয়া তোমার হৃত শৌর্য, বীর্য্য, জ্ঞান গরিমা সব চাহিয়া লও ধনং দেহী, জনং দেহী, যশং দেহী বলিয়া।

মহিষমর্দ্দিনী শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী মা যদি আসিয়াছ, আমাদের জীবনের অহঙ্কারদৃপ্ত অসুরকে পরাজিত করিয়া তোমার সৌম্য শান্ত বরাভয়া ধনদা জ্ঞানদা যশোদা মূর্ত্তিতে আমাদের জীবনে অবতরণ কর। তোমার আগমনকে আমাদের জীবনে আবাহন করিতেছি। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, আজ আমরা সর্ব্বহারা, আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

স্মৃতি

নিশিকান্ত

(১)

হারিয়ে যাওয়া লগ্নগুলি
আনব তুলি :
সাজিয়ে দেবো রঙিন ফুলে
চরণ মূলে,
হে দেবী আজ এনেছি মোর স্মৃতির বীণা,
তারগুলি তা'র হারাদিনের ছোঁয়ায় লীনা
তারায় তারায় তন্ত্রী লাগে,
কোন্ যামিনী প্রহর যাপে ;
জীবনবনে কোন্ চাঁদিনীর আলোক লাগে,
তোমার পরশ-মন্ত্র জপি' কোন্ রজনীগন্ধা জাগে,
তোমার চলায় ধন্য হ'ল এই ধরণীর কোন্ সে ধূলি।
আনব তুলি'
হারিয়ে যাওয়া লগ্ন গুলি।

(২)

কোন্ দামিনী চমকে উঠে
গেল ছুটে !
আজকে আমি আনব তারে
তোমার দ্বারে।
হে দেবী, আজ এনেছি মোর স্মৃতির বাঁশি,
হারাদিনের পলাতকার কান্নাহাসি ;
কান্নাহাসির লহর তুলে
কোন্ তটিনী চলছে দুলে ;
কোন্ সে পথে কাঁটার সাথে ফুলের মেলা ;
আঁধার-আলোয় শাদা-কালোয় তোমার সাথে আমার খেলা ;
দুঃখ-সুখের মন্থনধন কোন্ অতলে রয় আকুলি।

আনব তুলি'
হারিয়ে যাওয়া লগ্নগুলি।

(৬)

কোন্ গোধূলি আমায় সেধে
গেছে কেঁদে,
স্বর্ণ রাগ বিলিয়ে গেছে—
মিলিয়ে গেছে !
হে দেবী, আজ এনেছি মোর স্মৃতির ডালা,
হেলা ফেলায় হারিয়ে যাওয়া মনির মালা ;
যে মণিহার অন্তরালে
পরশ দিল আমার ভালে,
অজানতে মোর দুলছিল তা' তোমার হাতে
অদৃশ্য বৈভবের লীলায় সঙ্গোপণের আশীর্বাদে ;—
অগোচরের চুম্বনে আজ অন্তর মোর উঠছে দুলি।
আনব তুলি'
হারিয়ে যাওয়া লগ্নগুলি।

(৭)

অন্তরে যা'র কপোল চুমি'
আছো তুমি,
তা'র কি কিছু যায় গো ফেলা
কোনো বেলা ?
হে দেবী, তা'র ঘুমের ঘোরেও চেতন মাঝে
তোমার দুটি নূপুরপরা চরণ বাজে ;
সেই চরণের পরশ লয়ে,
স্বপ্ন তরী যায় যে ব'য়ে,
সেই স্বপনের মাঝে তোমার মূর্তি দোলে,
জীবন লোকের অলক্ষ্যে কোন্ রহস্য লোক দুয়ার খোলে—
অলক্ষ্যে মোর ভাগ্য-কমল বর্ণে গন্ধে যায় যে খুলি।
আনব তুলি'
হারিয়ে যাওয়া লগ্নগুলি।

(৫)

হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নরাজি
আনব আজি,
সাজিয়ে দেবো চরণ-মূলে
রঙিন ফুলে।
হে দেবী, আজ ধরো আমার স্মৃতির বীণা,
হোক সে তোমার নীরব সুরের মর্ম-লীনা ;
কাঁদাও মোরে, হাসাও মোরে,
গভীর গানে ভাসাও মোরে,—
হারিয়ে যাওয়া তারার দোলে, হাওয়ার সাথে,
হারা-প্রাতের কুঞ্জবনের না পাওয়া ফুল পাওয়ার সাথে,
তোমার পূর্ণ পরশে আজ বাজুক বীণা আপনা ভুলি।'
আনব তুলি'
হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নগুলি।

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পুরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ।
সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ

মহাভারতের বিরাট পর্ব

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতচর্যার এক বৎসরের ইতিহাস মহাভারতের বিরাট পর্বে লিখিত হয়েছে। রসসুন্দর এই বিরাট পর্ব। ক্ষুদ্রায়তন হলেও এই পর্বটি হাসি-কান্না, রঙ্গ-কৌতুকের অফুরন্ত উৎস। অর্জুনের বহুমুখী প্রতিভা, তাঁর কীর্তি ও মহিমায় সমুজ্জ্বল বিরাট পর্ব। মহাভারতে এমন কোন পর্ব নেই যেখানে মহাবীর অর্জুনের চরিত্র এমন সুস্পষ্ট ভাষায় অঙ্কিত হয়েছে। অর্জুনের বীরত্বের পূর্ণ পরিচয় বিরাট পর্বের উত্তর গোগৃহ উপলক্ষ্য করে যে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল, সেখানেই দেখান হয়েছে, যুদ্ধপর্বগুলিতে নয়। পর্বটি সমাপ্ত হয়েছে একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে। উত্তরা অভিমন্যুর বিবাহ বাসর বিরাট পর্বের শেষ কাহিনী। বাংলা দেশে বিরাট পর্বের বড় আদর। এ-হেন বিরাট পর্বের কয়েকটি কথা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও প্রথমেই একটা বিষয়ের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। অষ্টাদশ সংখ্যাটি মহাভারত রচয়িতার বড় প্রিয়। তাঁর মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত। বিশাল ভারতগ্রন্থের যা কেন্দ্রস্থ ঘটনা, সেই কুরুক্ষেত্রের রণমেধ যজ্ঞ অষ্টাদশ দিবস-ব্যাপী। কৌরব-পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধের জন্য যে সেনা সংগৃহীত হয়েছিল তাও অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেব যে কৃষ্ণার্জুন সংবাদ গ্রথিত করেছেন তাও অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী অষ্টাদশাধ্যায়িনী। আঠার সংখ্যাটার উপর কেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এত আকর্ষণ তাও আচার্যগণ কল্পনা করেছেন। তাঁরা বলেন, মহর্ষির ইষ্টমন্ত্র ছিল অষ্টাদশাক্ষরী, তাই পরম যোগী ব্যাসের এত পক্ষপাতিত্ব এই সংখ্যাটার উপর।

দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব দ্বাদশ-বৎসর অতিকষ্টে বনবাস সমাপ্ত করেছেন। আগামী ত্রয়োদশ বর্ষে তাঁদের সম্মুখে কঠিন সমস্যা—তাদের চরম পরীক্ষার কাল। দুর্যোধনের শত শত গুপ্তচর বেরিয়েছে পাণ্ডবদের সন্ধানে। সর্ত ছিল ত্রয়োদশ বর্ষে অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবদের সন্ধান পেলে আবার তাঁদের দ্বাদশ বৎসর বনবাসের ক্লেশ সহ্য করতে হবে।

এযুগে সম্মিলিত জাতির সাক্ষরিত treaty গুলি সুবিধা মত scrap of paper এ পরিণত হতে বেশী সময় লাগে না। মহাভারতীয় যুগের মানুষের মনোবৃত্তি ছিল অন্য রকম। এযুগের মাপকাঠি নিয়ে আমরা পাঁচ হাজার বছর আগের যুগের বিচার করতে বসলে ভুল করব। যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুধিষ্ঠির রাজ্যত্যাগ করেছেন, তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন, সেজন্য ভীমের অনেক তিরস্কার, দ্রৌপদীর অনেক গঞ্জনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল; সে সব কাহিনী মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে বিশেষতঃ বনপর্বে অতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে।

বিখ্যাত কুরুকুলে যাঁদের জন্ম, আসমুদ্র হিমাচল ভারতে যাঁরা দিকপাল-তুল্য, দেশের কোন স্থানে তাঁরা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন? এ প্রশ্ন মহারাজ জনমেজয়ের মনেও জেগেছিল। বিরাট পর্বের আরম্ভেই তিনি বৈশম্পায়নকে প্রশ্ন করছেন—

> কথং বিরাটনগরে মম পূর্বপিতামহাঃ।
> অজ্ঞাতবাসমুষিতা দুর্যোধনভয়ার্দিতাঃ॥
> পতিব্রতা মহাভাগা সততং ব্রহ্মবাদিনী।
> দ্রৌপদী চ কথং ব্রহ্মন্নজ্ঞাতা দুঃখিতাঽবসৎ॥

পঞ্চ পাণ্ডবের ব্যক্তিত্ব যে কত বিরাট তা অব্যবস্থিতচিত্ত ধৃতরাষ্ট্রের মুখ দিয়েও একদিন বেরিয়েছিল। ঘটনাটা এইরূপ।

আচার্য্য দ্রোণের অধ্যাপনায় কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। বিদেশাগত অসংখ্য দর্শক মণ্ডলীর সমক্ষে কুমারগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে একে একে অস্ত্রনৈপুণ্য দেখাচ্ছেন। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, দুর্যোধনের অস্ত্রকৌশল দেখান শেষ হলে অর্জুন রঙ্গস্থলে প্রবেশ করেছেন। রণবাদ্য বাজছে। এমন সময় শুভ্রকেশ আচার্য্য দ্রোণ রঙ্গাঙ্গনের মধ্যস্থলে এসে মেঘমন্দ্র স্বরে বল্লেন, "বাজনা থামাও। এইবার আমার পুত্র অপেক্ষাও প্রিয় শিষ্য অর্জুন তাঁর অস্ত্রনৈপুণ্য প্রদর্শন করবেন, আপনারা অবহিত হয়ে দেখুন।"

> যো মে পুত্রাৎ প্রিয়তরঃ সর্বশস্ত্রবিশারদঃ
> ঐন্দ্রিরিন্দ্রানুজসমঃ স পার্থো দৃশ্যতামিতি॥

ক্ষত্রিয় জাতির অস্ত্রগুরু দ্রোণের মত বীরের এতবড় আশীর্বাদ অর্জুনের উপর বর্ষিত হ'ল।

বাজনা থামল বটে, কিন্তু দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি উঠল। বিদুর অন্ধ

ধৃতরাষ্ট্রের পাশে বসে তাঁকে সব বোঝাচ্ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—বিদুর, এত গুণ্ গুণ্ শব্দ হচ্ছে কেন? উত্তরে বিদুর বললেন—দর্শকগণ পরস্পরে কুন্তীর পুত্রদের অজস্র প্রশংসা করছেন, তাই এত গুণ্ গুণ্ শব্দ। ধৃতরাষ্ট্র বল্লেন—

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি রক্ষিতোঽস্মি মহামতে
পৃথারণিসমুদ্ভূতৈস্ত্রিভিঃ পাণ্ডব বহ্নিভিঃ ॥

আহা! তা বলবে না, এরা তিন ভাই কুরুকুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। পৃথারূপ অরণি (অগ্নি উৎপাদনের কাষ্ঠ) হতে উদ্ভূত এরা তিনটী ভাই যেন তিনটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আমি আজ ধন্য, অনুগৃহীত, রক্ষিত হলাম।

অর্জুনের গুণের কথা বর্ণনা করে মহাভারতের মহাকবিরও আশ মেটেনি। তিনি একস্থলে বলেছেন—

স্বভাবাদগমচ্ছব্দো মহীং সাগরমেখলাম্।
অর্জুনস্য সমো লোকে নাস্তি কশ্চিদ্ধনুর্ধরঃ ॥

খোঁটার জোরে, propaganda করে অর্জুন বড় হন নি, তিনি বড় হয়েছিলেন—স্বভাবাৎ—নিজের কৃতিত্বের জোরে, by dint of sheer merit.

এহেন অর্জুন আত্মগোপন করবেন কি করে? তারপর মহাবলশালী ভীমসেন, অপূর্ব লাবণ্যময়ী কৃষ্ণা। দ্রৌপদী যে কত বড় রূপসী, তা প্রকাশ পেয়েছে বিরাট মহিষী সুদেষ্ণার কথায়। দ্রৌপদী যখন বিরাট ভবনে সৈরিন্ধ্রীরূপে এলেন তখন রাজমহিষী তাকে দেখে বলেছিলেন—তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি দাসীবৃত্তির যোগ্যা নও, তোমার সেবা করে কত দাসী ধন্য হয়ে যাবে।

গূঢ়গুল্ফা সংহতোরু ত্রিগম্ভীরা ষড়ুন্নতা।
রক্তা পঞ্চসু রক্তেষু হংসগদ্গদভাষিণী ॥
সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণিপয়োধরা।
তেন তেনৈব রূপেণ কাশ্মীরীব তুরঙ্গমী ॥

তোমার করতল পদতল ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, তুমি হংস-গদ্গদ ভাষিণী, সুকেশী, সুস্তনী, কাশ্মীরী তুরঙ্গমীর ন্যায় সুদর্শনা। সুন্দরী, তোমার অলৌকিকরূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা তোমাতেই আসক্ত হবেন। এই আশঙ্কাতেই সুদেষ্ণা পরে দ্রৌপদীকে কীচকের কবলে ফেলতে রাজী হয়েছিলেন।

অনেক পরামর্শের পর স্থির হল তাঁরা মৎস্যরাজ বিরাটের ভবনে রাজার কর্মচারী হয়ে ছদ্মবেশে বিভিন্ন নাম নিয়ে অবশিষ্ট বার মাস কাটাবেন। ভীমার্জ্জুনদ্রৌপদীর পক্ষে বাইরে কাজ নেওয়া অসম্ভব, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত থাকে না, তাঁরা অন্তপুরের কাজ নেবেন। কঙ্ক নাম নিয়ে যুধিষ্ঠির হলেন রাজার একজন পারিষদ, গ্রন্থিক নাম নিয়ে নকুল অশ্বরক্ষক, তন্তিপাল নাম নিয়ে সহদেব গোপালক, বল্লব নাম নিয়ে ভীম সেন বিরাটের পাচক। সৈরিন্ধ্রী নাম নিয়ে দ্রৌপদী রাণী সুদেষ্ণার কেশ বিন্যাসের পরিচারিকা। অদ্ভুত সাজে (make up) সাজলেন অর্জ্জুন। ক্লীব বেশে, নইলে অন্তঃপুরে চাকরি মিলবে না, কর্মের প্রার্থী হয়ে অর্জ্জুন যখন রাজ দরবারে দাঁড়ালেন, সকলের দৃষ্টি আগন্তুকের উপর পড়ল—

অথাপরোঽদৃশ্যত রূপসম্পদা স্ত্রীণামলঙ্কারধরো বৃহৎ পুমান্।
প্রাকারবপ্রে প্রতিমুচ্য কুণ্ডলে দীর্ঘে কম্বু পরিহাটকে শুভে॥

রূপবান বিরাট পুরুষ কিন্তু নারীর মত অলঙ্কার পরেছেন, কর্ণে কুণ্ডল, হাতে শাঁখা ও স্বর্ণবলয়, পৃষ্ঠে দীর্ঘবিলম্বিত বেণী। হাতের জ্যাঘর্ষণ চিহ্ন অস্ত্রের দাগ ঢাকবার জন্য অর্জুন অলঙ্কার পরে ছিলেন। যখন তিনি প্রবেশ করলেন, মনে হল সভা যেন কাঁপছে—গতেন ভূমিং হ্যভিকম্পয়ংস্তদা।

অর্জুনের রূপ দেখে বিরাট ভাবাবেগে বলে উঠলেন—আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার মনে হচ্ছে মৎস্য রাজ্যের ভার তোমার উপর অর্পণ করে আমি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করি। মরি মরি! এমন ভুবনমোহন রূপ যার, কি করে সে নপুংসক হ'ল।

বৃদ্ধোহ্যহং বৈ পরিহারকামঃ সর্বাংশ্চ মৎস্যাংস্তরসাভিপালয়।
নৈবংবিধাঃ ক্লীবরূপা ভবন্তি কথঞ্চনেতি প্রতিভাতি মে মতিঃ॥

অর্জুন বললেন :—

গায়ামি নৃত্যাম্যথ বাদয়ামি ভদ্রোঽস্মি নৃত্যে কুশলোঽস্মি গীতে।
ত্বমুত্তরায়ৈ পরিদৎস্ব মাং স্বয়ং ভবামি দেব্যা নরদেব নর্ত্তকঃ॥
ইদন্তু রূপং মম যেন কিন্তু তৎ প্রকীর্ত্তয়িত্বা ভূশশোকবর্দ্ধনম্।
বৃহন্নলাং মাং নরদেব বিদ্ধি বৈ সুতং সুতাংবা পিতৃমাতৃবর্জিতাম্॥

মহারাজ, আমি নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণ, আপনার কন্যা উত্তরার শিক্ষার ভার আমাকে দিন। যে কারণে আমার এই ক্লীবরূপ, শোকময় সে কাহিনী অবসর মত আমি আপনাকে বলব। এখন এই মাত্র জানুন, আমার নাম

বৃহন্নলা, আমি পিতৃমাতৃহীন, আপনি আমাকে আপনার পুত্র বা কন্যা বলে মনে করুন।

বিরাট নগরে পঞ্চ পাণ্ডব তাঁদের ঈপ্সিত কর্মে নিযুক্ত হলেন। কর্তৃত্ব মর্য্যাদা অভিমান—সব বিসর্জন দিয়ে পঞ্চ পাণ্ডব এখন মৎস্য রাজের বেতন ভোগী সামান্য কর্মচারী। কিরাতরূপী শঙ্করের স্পর্শ লাভ করে যিনি পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছিলেন, সেই অর্জুন আজ উর্বশীর অভিশাপে—অপুমানিতি বিখ্যাতঃ ষণ্ডবৎ বিচরিষ্যসি। স্বর্গের নটীর অভিশাপ অর্জুনের পক্ষে এখন বর হয়ে উঠেছে।

অজ্ঞাতচর্য্যার প্রথম দশ মাস নির্বিঘ্নে চলে গেল। পাণ্ডবদের ব্রত শেষ হতে আর মাত্র দু মাস বাকী, এমন সময় দ্রৌপদীকে নিয়ে মহাভয় উপস্থিত হল। বৃদ্ধ বিরাট ছিলেন মৎস্য রাজ্যের (বর্তমান জয়পুর, ভরতপুর ও আলোয়ার) নাম মাত্র রাজা। কার্য্যতঃ রাজা ছিলেন বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি মহাবলশালী কীচক। রাজান্তঃপুরে কীচকের অবারিত গতি। সৈরিন্ধ্রীর রূপে মুগ্ধ হল কীচক।

তথা চরন্তীং পাঞ্চালীং সুদেষ্ণায়া নিবেশনে।
সেনাপতির্বিরাটস্য দদর্শ জলজাননাম্॥
তাং দৃষ্ট্বা দেবগর্ভাভাং চরন্তীং দেবতামিব।
কীচকঃ কাময়ামাস কামবাণপ্রপীড়িতঃ॥

সহজ উপায়ে যখন কার্য্য সিদ্ধি হল না তখন রাণী সুদেষ্ণা ও কীচক দ্রৌপদীকে বশীভূত করবার জন্য ষড়যন্ত্র করলেন কিন্তু তাঁদের সকল উদ্যম ব্যর্থ হল। দ্রৌপদীকে স্পর্শ করতে উদ্যত হলে দ্রৌপদী পাপীষ্ঠকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে কীচকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার জন্য বিরাটের সভায় ছুটে এলেন। তাঁর পিছনে পিছনে ছুটে এসে কীচক রাজার সমক্ষেই কৃষ্ণার কেশাকর্ষণ করে তাঁকে পদাঘাত করল। রাজ সভায় ভীমসেন ও যুধিষ্ঠির তখন উপস্থিত। কীচকের অন্যায় কর্মের প্রতিবাদ করতে কারও সাহস হল না। রাজা নীরব। পত্নীর অপমানে উত্তেজিত ভীমসেন সভাতেই কীচককে বধ করবার জন্য দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করছেন।

তস্য ভীমো বধং প্রেপ্সুঃ কীচকস্য দুরাত্মনঃ।
দন্তৈর্দন্তাংস্তদা রোষান্নিষ্পিপেষ মহাবলঃ॥

পাছে তাঁদের প্রচ্ছন্নবাস প্রকাশ হয়ে পড়ে যুধিষ্ঠির কটাক্ষে ভীমকে নিবারণ

করলেন। দ্রৌপদী নিরুপায়, সভা নিস্পন্দ। এখন না হয় স্বামীরা প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য অজ্ঞাত বাস করছেন, কিন্তু তাঁর মনে ছিল কাপট্যপূর্ণ কুরুসভায় স্বামীদের আচরণ। তখন দ্রুপদনন্দিনী রুদ্র নয়নে রাজাকে যেন দগ্ধ করে—দহমানেব রৌদ্রেণ চক্ষুষা দ্রুপদাত্মজা—বললেন :—

ময়া তু শক্যং কর্তুং বিরাটে ধর্মদূষকে।
যঃ পশ্যন্ মাং মর্ষয়তি বধ্যমানামনাগসম্॥
ন রাজন্ রাজবৎ কিঞ্চিৎ সমাচরসি কীচকে।
দস্যূনামিব ধর্মস্তে নহি সংসদি শোভতে॥

রাজা, আমি নিরপরাধ, এখানে আপনার চোখের উপর কীচক আমাকে পদাঘাত করল, তা দেখেও আপনি কোন প্রতীকার করছেন না। রাজাই যদি ধর্মকে এভাবে কলুষিত করেন, নারী হয়ে আমি কীচককে কি করতে পারি? রাজা সুবিচার না করলে, অধর্মের দণ্ড না দিলে, আমি কার কাছে বিচারের প্রার্থনা করব? তবে কি আমি কোন রাজার রাজত্বে বাস করছি না, হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে বাস করছি? কীচকের প্রতি আপনি যে ব্যবহার করলেন তা রাজার ব্যবহার নয়। পবিত্র রাজধর্ম হতে আপনি স্খলিত হয়েছেন, আপনি দস্যুর ধর্ম অনুসরণ করেছেন। এই কি রাজসভা, মনুষ্য সমাজ, না জঙ্গলের পশু রাজ্য!

তেজস্বিনী দ্রৌপদীর বাগ্মিতার প্রকাশ, তাঁর আত্মস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় মহাভারতের বহুস্থানে মহর্ষি স্পষ্টাক্ষরে লিখে রেখেছেন।

দ্রৌপদী সর্ব্ববিষয়ে অসামান্যা। শুধু মহাভারতে কেন, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অন্য কোন নারী চরিত্র এমন জীবন্তরূপে অঙ্কিত হয়নি। তবু দ্রৌপদীকে সীতা সাবিত্রীর শ্রেণীতে উন্নীত করা হল না। তিনি নিত্য স্মরণীয়া পঞ্চ কন্যার একজন মাত্র হয়ে রইলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় তাঁরা বলেন, দ্রৌপদীর আত্মস্বতন্ত্রতা।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

সীতা এই আদর্শে গড়া। সীতা রাজরাণী হয়েও কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হয়েও রাজরাণী, বীরেন্দ্রাণী। পাশাপাশি তাঁরই সপত্নী সুভদ্রা সীতার ছাঁচে গড়া। মহাভারতকার উক্ত লিখিত মনুর শ্লোকটী ভারতগ্রন্থের বহুস্থানে উদ্ধৃত করেছেন, তথাপি তাঁর দুঃসাহস এই যে, সেই যুগে দ্রৌপদীর মত এক-

খানি ছবি এমন স্পষ্ট ভাষায় এঁকে রেখেছেন। প্রাচীন ভারতের মহিমময়ী সকল নারীচরিত্র সীতা সাবিত্রীর আদর্শে গড়া, একা দ্রৌপদীতে কেবল সীতার ছায়া স্পর্শ করে নি। তাই বলে তেজস্বিনী দ্রৌপদী কখনও ধর্মকে অতিক্রম করেন নি। দ্রৌপদী চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনা বারান্তরে করবার ইচ্ছা রইল।

সেইদিনই গভীর নিশীথে যখন রাজপুরী ঘুমে অচেতন, দ্রৌপদী ভীমসেনের কক্ষে উপস্থিত হ'লেন। বিপদের সময় দ্রৌপদী ভীমের উপরই বেশী ভরসা রাখতেন এবং শক্ত কাজের ভার ভীমের উপরই অর্পণ করতেন, ভীমও তাতে কৃতার্থ হয়ে যেতেন। চোখের জলে জীবনের অনেক দুঃখের কথা তিনি ভীমকে বললেন। বিরাট পর্বের সুদীর্ঘ দ্রৌপদী-বিলাপ সাহিত্যের এক দুর্লভ সামগ্রী। গভীর মর্ম বেদনা হালকা করে তিনি শেষে বললেন—

ইদমন্তু দুঃখং কৌন্তেয় মমাসহ্যং নিবোধ তৎ।
যা ন জাতু স্বয়ং পিংষে গাত্রোদ্বর্তনমাত্মনঃ।
অন্যত্র কুন্ত্যা ভদ্রং তে সা পিনষ্মাদ্য চন্দনম্॥
পশ্য কৌন্তেয় মে পাণী নৈবং যৌ ভবতঃ পুরা।
ইত্যস্য দর্শয়ামাস কিণবন্তৌ করাবুভৌ॥

মধ্যম পাণ্ডব, দেখ আমার হাতের অবস্থা। রাণী সুদেষ্ণার জন্য চন্দন ঘষে ঘষে আমার হাতে কড়া পড়েছে। দেবী কুন্তী ভিন্ন আর কারও জন্য আমি চন্দনাদি প্রসাধন পেষণ করিনি, নিজের জন্যও না।

নাল্পং কৃতং ময়া ভীম দেবানাং বিপ্রিয়ং পুরা।
অভাগ্যা যত্র জীবামি মর্তব্যে সতি পাণ্ডব॥

দেবতার কোন অপ্রিয় কার্য আমি জীবনে করিনি, আমার মরণই ভাল; অভাগিনী বলেই বেঁচে আছি।

দ্রৌপদীর বিলাপ ভীমের মর্মস্পর্শ করল। দ্রৌপদীর সঙ্গে ভীম তখন কীচক বধের পরামর্শ করলেন এবং পরের দিন রাত্রির প্রথম প্রহরেই দুর্বৃত্ত কীচকের দেহ কচ্ছপের ন্যায় একটা সুবৃহৎ মাংস পিণ্ডে পরিণত হল। প্রচারিত হল সৈরিন্ধ্রীর পঞ্চ গন্ধর্ব স্বামী কীচককে বধ করেছে। স্থলে উদ্ধৃত কচ্ছপের ন্যায় একটা পিণ্ড দেখে কীচকের বান্ধবরা রোমাঞ্চিত হল। শ্মশানে

যাবার সময় উপকীচকগণ দ্রৌপদীকে জীবন্ত দগ্ধ করবে বলে তাঁকে বেঁধে নিয়ে চলল। তখন দ্রৌপদী উচ্চস্বরে সঙ্কেত করলেন—

জয়ো জয়ন্তো বিজয়ো জয়সেনো জয়দ্বলঃ।
তে মে বাচং বিজানন্তু সূতপুত্রা নয়ন্তি মাম্॥

অজ্ঞাত বাসের সময় যুধিষ্ঠিরাদি নিজেদের পাঁচটী গুপ্ত নাম করেছিলেন—তা যথাক্রমে, জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়সেন, জয়দ্বল। ভীমসেন দ্রৌপদীর ইঙ্গিত পেয়ে শ্মশানে উপকীচকদের বধ করে দ্রৌপদীকে ভয়মুক্ত করলেন। রাত্রির অন্ধকার তখনো রয়েছে। তারপর দুজনে ভিন্ন পথে রাজ ভবনের দিকে প্রস্থান করলেন। ভীমসেন দ্রুতবেগে এসে মহানসে (রন্ধন মহল) তাঁর শয়ন কক্ষে নিদ্রিত হলেন।

দুঃখভারে প্রপীড়িতা দ্রৌপদীর ফিরতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হল। দ্রৌপদী আজ অত্যন্ত বিষণ্ণ। পূর্ব্বস্মৃতি তাঁকে বড় বিচলিত করেছে। সুখে লালিতা রাজকন্যা হয়ে, দিকপালতুল্য পঞ্চ স্বামীর সহধর্মিণী হয়ে কত দুঃখই তিনি পেলেন জীবনে। দুঃখ দিয়েই যেন তাঁর জীবন গড়া। মনে পড়ছে হস্তিনাপুরে দ্যূত সভায় দুঃশাসনের মর্মান্তিক লাঞ্ছনা, মনে পড়ছে কাম্যক বনে বনবাসিনীর উপর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অত্যাচার, তারপর গতকাল মৎস্য রাজ্যে কীচকের নারকীয় তাণ্ডব লীলা। মর্মচ্ছেদী হাহাকারে কৃষ্ণার মর্মস্থল সমাচ্ছন্ন হল। তিনি যখন রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন, তখন রোদ উঠেছে। প্রভাতের আলো দ্রৌপদীর ভাল লাগছে না। ম্রিয়মাণা দ্রৌপদী নৃত্যশালার পাশ দিয়ে মন্থর পদক্ষেপে যেতে যেতে দেখলেন, রাজকন্যাদের সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে, বৃহন্নলা ছাত্রীদের পাঠ দিচ্ছেন।

এদিকে প্রভাতে রাজ ভবনে খুব হৈ হল্লা হয়েছে। সৈরিন্ধ্রীকে কেন্দ্র করে রাজ্যে মহাভয় উপস্থিত। সর্বত্র কীচক-উপকীচক বধের আলোচনা চলছে। তারা বলছে, সৈরিন্ধ্রীকে নিয়েই যখন রাজ্য বিপন্ন তখন তাকে বিদায় দিতে রাজাকে অনুরোধ কর। রাজকুমারীগণও সে-সব আলোচনা কিছু কিছু শুনেছে। এমন সময় সৈরিন্ধ্রীকে দেখে তারা শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে এসে বললে,

দিষ্ট্যা সৈরিন্ধ্রি মুক্তাসি দিষ্ট্যাসি পুনরাগতা।
দিষ্ট্যা বিনিহতা সূতা যে ত্বাং হিংসন্ত্যনাগসম্॥

সৈরিন্ধ্রী! ভাগ্যবশে তুমি কীচকের কবল থেকে মুক্ত হয়েছ আর সেই দুর্বৃত্তেরা নিহত হয়েছে। আহা, নিরপরাধিনী হয়ে কত কষ্ট পেলে তুমি!

ছাত্রীরা সৈরিন্ধ্রীর দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করছে, এ অবস্থায় শিক্ষকের কিছু বলা কর্তব্য, উদাসীন হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে ভাল দেখায় না; তাই অর্জুন বললেন—

কথং সৈরিন্ধ্রি মুক্তাসি কথং পাপাশ্চ তে হতাঃ।
ইচ্ছামি বৈ তব শ্রোতুং সর্বমেতদ্ যথাতথম্॥

সৈরিন্ধ্রী, কেমন করে তুমি মুক্ত হলে, আর কেমন করেই বা সেই পাপীষ্ঠেরা নিহত হ'ল—সে সব কথা তোমার মুখে সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছা করি।

অভিমানের প্রবল জোয়ার আজ দ্রৌপদীর অন্তরে। বৃহন্নলার প্রশ্নে মানিনীর সুন্দর অধর স্ফুরিত হল, তাঁর দুই কমলনয়ন জলে ভরে গেল। উদ্গত অশ্রু সংবরণ করে তিনি উত্তর দিলেন—

বৃহন্নলে কিং নু তব সৈরিন্ধ্র্যাঃ কার্যমদ্য বৈ।
যা ত্বং বসসি কল্যাণি সদা কন্যাপুরে সুখম্॥
নহি দুঃখমবাপ্নোষি সৈরিন্ধ্রী যদুপাশ্নুতে।
তেন মাং দুঃখিতামেবং পৃচ্ছসে প্রহসন্নিব॥

সৈরিন্ধ্রীর বার মাসের দুঃখের পালা শুনে তোমার আর কি হবে, বৃহন্নলে? তোমার আবার দুঃখ কিসের? রাজকন্যাদের নিয়ে তুমি ত অন্তঃপুরে পরম সুখে দিন যাপন করছ। সৈরিন্ধ্রীর দুঃখসাগরের সীমাহীন গভীরতা তুমি উপলব্ধি করতে পারবে না, তাই হাসিমুখে পরিহাসের সুরে আমার দুঃখের ইতিহাস শুনতে চাইছ।

অর্জুনের হৃদয়েও অনেক আক্ষেপ পুঞ্জীভূত ছিল। সৈরিন্ধ্রীর অভিমান-ভরা কথায় অর্জুনের নিভৃত শোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

বৃহন্নলোবাচ

বৃহন্নলাপি কল্যাণি দুঃখমাপ্নোত্যনুত্তমম্।
তির্যগ্‌যোনিগতাং বালে ন চৈনামববুধ্যসে॥
ত্বয়া সহোষিতা নিত্যং ত্বঞ্চ সর্বৈঃ সদূষিতা।
ক্লিশ্যন্ত্যাং ত্বয়ি সুশ্রোণি কো নু দুঃখং ন চিন্তয়েৎ॥
ন চ কেনচিদত্যন্তং কস্যচিদ্ধৃদয়ং ক্বচিৎ।
বেদিতুং শক্যতেহন্যেন তেন মাং নাববুধ্যসে॥

কল্যাণি, বৃহন্নলার হৃদয়েও তীব্র জ্বালা। বৃহন্নলা আর মানুষ নেই, পশুযোনি প্রাপ্ত হয়ে, ক্লীব হয়ে সে যে অনন্ত দুঃখ ভোগ করছে তাও তুমি

বুঝতে পারবে না। নিরপরাধিনী হয়ে তুমি কত ক্লেশ পাচ্ছ, একস্থানে বাস করে তা নিত্য আমি দেখছি, তা দেখেও আমি ব্যথা পাই না, একি কখনও সম্ভব হতে পারে। তবে একথাও সত্যি যে, কোন মানুষই কোন সময়ে পরের মনের ব্যথা ঠিক অনুভব করতে পারে না, তাই তুমিও আমার মনের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছ না।

সৈরিন্ধ্রী ও বৃহন্নলার মধ্যে এই যে ছোট একটু মান অভিমানের অভিনয় হয়ে গেল, রাজকুমারীরা তার কিছুই ধরতে পারল না। তারপর চোখের জল আঁচলে মুছে দ্রৌপদী কন্যাদের সঙ্গে অন্তঃপুরে রাণী সুদেষ্ণার কাছে চলে গেলেন।

চলবে

হে সুকন্যা—

অরুণবরণ চক্রবর্ত্তী

যৌবনের রুদ্ধদ্বার সিংহদরজায়, হে সুন্দরী,
যষ্ঠি হাতে বসে আছে রুদ্ধানন কর্তব্য প্রহরী।
রাজপুত্র বন্দী আজ কঠিন কর্মের কারাগারে।
জীবনের যত গান কাঁদে তার প্রাণের দুয়ারে।
তবু যদি অসতর্ক কোন এক অলস মুহূর্ত
হারানো গানের সুরে ঝংকারিয়া উঠে স্বতঃস্ফূর্ত,
জাগ্রত বিবেক এসে শাসনের ভঙ্গীতে দাঁড়ায়—
কখনো আঘাত হেনে মন থেকে মরিচা ছাড়ায়।
যান্ত্রিক জীবনে আজ মানুষ তো কলের পুতুল।
ক্রমশঃ ক্ষয়িত হয়ে ক্ষীণ অতি হৃদয়ের মূল।
পথের ধূলার মত প্রেম তাই পিষ্ট পদতলে;
সে জ্বালা হৃদয় হতে দেহের আগুনে আজ জ্বলে।
প্রতীক্ষার দীপালোক, হে সুকন্যা, কর নির্বাপিত
প্রেমের সুষমাহীন কামনারে দেখে হবে ভীত।

মিসরের বিপ্লবীনেতা 'আব্দুহু'

রেজাউল করীম

ইটালির বিখ্যাত নেতা মহাত্মা জোসেফ ম্যাজিনির সহিত মিসরের নবজীবনের অগ্রদূত মহম্মদ আব্দুহুর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। অষ্ট্রিয়ার করতলগত ইটালির প্রাণে ম্যাজিনি নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন। বিদেশী শাসনের চাপে ইটালি তাহার পূর্ব গৌরব ভুলিতে বসিয়াছিল। এমন কি মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কোনদিন যে ইটালি আবার জাগিবে সে বোধ তাহার ছিল না। ম্যাজিনি সেই মরণোন্মুখ জাতিকে নূতন ভাবে জাগাইয়া তুলিলেন। ম্যাজিনির মতই আব্দুহু মিসরে নবজীবনের বন্যা বহাইয়া ছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মিসরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। মিসরের নিজস্ব কোন সত্তা রহিল না। বৃটেনের টাকা আর বিলাস ব্যসন আর মাতলামি এবং সঙ্গে মিসরের অভিজাতদের মধ্যে একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিল। ঠিক সেই সময় আব্দুহুর মত একটি প্রতিভাশালী মানুষ আবির্ভূত হইয়া মিসরের আত্ম-চেতনা ফিরাইয়া আনিলেন। বস্তুতঃ বর্তমান মিসর আব্দুহুর সৃষ্টি। পরাধীনতার নিদারুণ মুহূর্তে আব্দুহুর প্রেরণা না পাইলে হয়ত মিসর অত শীঘ্র জাগিতে পারিত না। শুধু রাজনীতিতে না ধর্ম ও সমাজনীতিতেও আব্দুহুর দান অপরিসীম। তিনি বর্তমান যুগের ইসলামের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইসলামকে বর্তমান যুগোপযোগী করিতে যাহারা সাধনা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের শীর্ষ স্থানীয়। বেশীদিনের কথা নয়। ১৯০৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি যুগের অনেক পূর্বে আসিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার ধর্মনীতি ও সংস্কারের প্রভাব প্রথম প্রথম কেহই গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মিসর বুঝিল কি বিরাট বিপ্লবীকে তাহারা হারাইল।

আব্দুহু মিসরের খাঁটি কৃষক পরিবারের সন্তান। তিনি আরব বংশ সম্ভূত ছিলেন না। মিসরের মৃত্তিকার সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মিসরের বেহিরা প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। গ্রামটির নাম তানতা। গ্রামের ক্ষুদ্র পাঠশালাতেই তাঁহার প্রথম শিক্ষা

আরম্ভ হইল। ক্ষুদ্র বালকের প্রতিভা ছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান নীতি তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। শিক্ষকদের সহিত মাঝে মাঝে বচসা হইতে লাগিল। ফলে হয়ত তাঁহাকে চির জীবনের জন্য লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হইত। কিন্তু তাঁহার খুল্লতাত শেখ দরবেশ তাঁহাকে লেখাপড়া ছাড়িতে দিলেন না। এই খুল্লতাতের চেষ্টায় তাঁহার জীবনের মোড় ফিরিয়া গেল। শেখ দরবেশ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন; কেমন করিয়া বালকদের শিক্ষা দিতে হয় ও কেমন ভাবে তাহাদের মনে চিন্তাশক্তি জাগাইতে হয় সে সম্পর্ক তাঁহার জানা ছিল। তিনি নানাভাবে আব্দুহুর মনে উচ্চ চিন্তার ভাব জাগাইতে সচেষ্ট হইলেন। সেই সঙ্গে বালকের মনে জাগাইয়া দিলেন মিস্টিসিজমের মরমী আদর্শের প্রেরণা। পরবর্ত্তী যুগে আব্দুহু দেশের ধর্ম্মচিন্তার মধ্যে যে সব সংস্কার ও বিপ্লব আনিয়াছিলেন তাহার কোন সংবাদই এই খুল্লতাত জানিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বালকের মনে স্বাধীন চিন্তার বীজ এমন ভাবে প্রবেশ করাইয়া দিলেন যে, দেশব্যাপি রক্ষনশীল মনোভাব তাহা বিনষ্ট করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ খুল্লতাতের শিক্ষা তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিল। তাঁহার লেখাপড়া পরিত্যাগ করা হইল না। বরং গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া এই বার তিনি কাইরোর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় "আল আজহারে" প্রবেশ করিলেন। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া আল আজহার ইসলামিক আদর্শ অনুসারে উচ্চশিক্ষা দিয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ সব দেশেই দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রক্ষনশীল আদর্শের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। নবযুগের বিপ্লবী ভাবধারা যখন মিসরের সর্ব্বত্র বহিতেছিল তখনও আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় সেই মান্ধাতার আমলের রক্ষণশীল নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল একেবারে প্রাচীন। নূতন যুগের আলোক তথায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। আব্দুহুর বিপ্লবী মন আল আজহারের শিক্ষাব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। ইতিমধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বৈপ্লবিক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। আল আজহার তাঁহাকে শিখাইতে লাগিল প্রাচীন ধরণের শিক্ষা ও ইসলামের প্রাচীন ব্যাখ্যা ও ভাষ্য। আর তাঁহার অন্তরে রহিয়াছে বিপ্লবের বিস্তুভিয়াস যাহা সবকিছুকে ভস্মীভূত করিতে উদ্যত। প্রাচীন ও নবীন ভাবধারার মধ্যে তিনি কোন সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিলেন

না। তাঁহার সম্মুখে দেখা দিল একটা প্রচণ্ড সঙ্কট। প্রত্যেক মহাপুরুষের নিকটই এইরূপ সঙ্কটের মুহূর্ত উপস্থিত হয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি নির্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আর কঠোর ভাবে কৃচ্ছ্র সাধনা আরম্ভ করিলেন। কথায় বলে সৎগুরুর আশ্রয় পাইলে অনেক সময় মানুষের সঙ্কট কাটিয়া যায়। আব্দুহুর সৌভাগ্য বশতঃ এই সময় তিনি একজন সৎগুরুর আশ্রয় পাইলেন। এই গুরু আর কেহই নহেন—তিনি হইতেছেন সে যুগের মহা বিপ্লবী নেতা সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানী। জামালুদ্দিন আফগানী তাঁহার বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রভাবে সে সময় সমস্ত মুসলিম প্রধান দেশের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল প্রচণ্ড, বিদ্যা ছিল অগাধ আর কর্ম্মোৎসাহ ছিল অসীম। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে সমগ্র ইসলামিক জগৎকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন। তিনি জনসাধারণকে কেবল রাজনীতি বুঝান নাই। তাহাদের মনে সংস্কার মুক্ত সত্যধর্ম্মের প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছেন। সে যুগে জামালুদ্দিন আফগানী সমগ্র আরব জগতের মুক্তির প্রধান পুরোহিত বলিয়া সর্বত্র অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। এক দিন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্ষুদ্র ছাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। ছাত্রটির প্রতিভাদীপ্ত মুখে তেজোদ্দীপ্ত কথা শুনিয়া আফগানী মুগ্ধ হইলেন। এই ছাত্রই হইতেছেন মিসরের পরবর্ত্তী যুগের বিপ্লবী নেতা আব্দুহু। বলা বাহুল্য অতঃপর আব্দুহু কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর জামালুদ্দিনের শিষ্য হইয়া পড়িলেন। জামালুদ্দিন তাঁহাকে বিপ্লবের পথ দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার ভাব জাগ্রত করিলেন। ইহার পর জামালুদ্দিন আল আজহারের ছাত্রদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করিলেন। এইসব ছাত্রগণ এতদিন কেবল ট্রাডিসনের মোহে থাকিয়া নবযুগের দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছিল। তাহারা এখন নবযুগের দাবী চাহিয়া বসিল। ইতিমধ্যে আব্দুহু নবযুগের দাবী সমর্থন করিয়া আরবী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। আর সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিপ্লোমা পাইবার জন্য কঠোর ভাবে পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন। জামালুদ্দিন আফগানীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল না। সমগ্র মিসরে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। মিসরে বিপ্লবের সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কুসংস্কারপুর্ণ চিন্তাধারা, বিদেশী প্রভাব, আদর্শহীন জীবনযাত্রা—এই সবই দূর করিতে হইবে এবং মিসরকে

সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে হইবে—এই ভাব জনগনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। আব্দুহু এই বৈপ্লবিক আদর্শ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে কূপমণ্ডকের মত দেশের ও ঐতিহ্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে মিসরের মুক্তি নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবের ও চিন্তার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য সম্বন্ধে পুস্তকাদি পড়িলেন। সেই সময় মিসরের শাসন কর্ত্তা ছিলেন খেদিভ তৌফিক (Khediv Tawfik)। মিসরের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ওয়াকিয়াতে মিসর' বিপ্লবী আদর্শ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ না করিলেও বিপ্লবী লেখকগণকে উৎসাহ দিতে কুণ্ঠিত হইত না। আব্দুহু এই পত্রিকায় রীতিমতভাবে প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সৎসাহস ও সমালোচনা শক্তির পরিচয় পাইয়া দেশবাসী তাঁহাকে নবযুগের নেতা বলিয়া বরণ করিল। এই সময় মিসরের রাজনীতিতে দেখা দিল সঙ্কট। সুনিপুন নেতার মতই তিনি এই সঙ্কটকালে মিসরের তরুণ দলকে পরিচালিত করিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে মিসরের ইতিহাসে বিপ্লবের প্রথম সঙ্কেতধ্বনি শোনা গেল। ১৮৭৯ সালে কুখ্যাত নুবির পাশার মন্ত্রিত্বের পতন হইল। ইহার তিন বৎসর পরে আরবী পাশার নেতৃত্বে বৃটিশ বিরোধী প্রথম গণবিপ্লব আরম্ভ হইল। বৃটিশের অস্ত্রশস্ত্র, কূটকৌশল ও দেশবাসীর রক্ষণশীল দলের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আরবী পাশার বিদ্রোহ নির্দয়তার সহিত দমিত হইল। বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলে বৃটেন সমস্ত মিসরকেই কুক্ষিগত করিয়া লইল। বিপ্লব ব্যর্থ হইলে বিপ্লবের নেতাগণ হতাশ হইয়া পড়েন। স্বদেশের এত অপমান, এই নিদারুণ ব্যর্থতা দেখিয়া আব্দুহুও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি যে মর্ম্মবেদনা পাইলেন তাহা সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু তবুও তিনি উদ্যম পরিত্যাগ করিলেন না। জলন্ত দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি মিসরের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে বৃটিশের প্ররোচনায় তিনি তিন বৎসরের জন্য স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সিরিয়াতে নির্ব্বাসিত হইলেন। এই নির্ব্বাসন কালেও তিনি হতোদ্যম হইয়া পড়েন নাই। তিনি সেইখান হইতে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ঠিক এই সময় তাঁহার গুরু জামালুদ্দিন আফগানী প্যারিস নগরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। আব্দুহু বহুকষ্টে সিরিয়া পরিত্যাগ করিয়া প্যারিসে জামালুদ্দিনের

সহিত মিলিত হইলেন। জামালুদ্দিন প্যারিসে একটি আরবী সংবাদপত্র পরিচালন করিতেছিলেন। আব্দুহুর সাহচর্য্য পাইয়া তাঁহার অনেক সুবিধা হইল। তাঁহাদের এই পত্রিকা মিসর প্রদেশে নিষিদ্ধ হইল। প্যারিস হইতে আব্দুহু লণ্ডন আসিলেন এবং সেখান হইতে মিসরের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু রাজনৈতিক জীবন তাঁহার প্রতিভার সহিত খাপ খাইল না। একদল চাহিয়াছিল ধর্ম্মদ্রোহী রাজনীতি। আর তিনি চাহিয়াছিলেন কুসংস্কারমুক্ত উন্নত ধর্ম্মবোধের সহিত রাজনীতির সমন্বয়। জগতের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, যাহারা বিপ্লবের সূচনা করে তাহারা শেষের দিকে বিপ্লবের ধ্বংসকর প্রভাবের সামনে দাঁড়াইতে পারে না। আব্দুহু চিন্তার দিক দিয়া বিপ্লবী ছিলেন। সুতরাং রাজনীতি ছাড়িয়া দিলেও অন্যত্র যে কাজ আরম্ভ করিলেন সেখানেও বৈপ্লবিক ভাবেই চিন্তা করিলেন। তিনি এখন রাজনীতির সহিত সংশ্রব বর্জ্জন করিয়া সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে সংস্কৃতির দিক দিয়া দেশবাসীর মন উন্নত না হইলে শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব দ্বারা সত্যকার স্বাধীনতা হইবে না। প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া তিনি বেরুতে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার আবাসগৃহ আরবী কালচারের কেন্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষতঃ ঈশ্বরের একত্ববাদ সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ইসলাম ধর্ম্মের যাহারা সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা করে তিনি তাহাদের কঠোর সমালোচনা করিলেন ও দেখাইলেন যে অপরাপর ধর্ম্মের মনীষীদের সহিত ইসলামের বিরোধ নাই। ইসলাম ধর্ম্মে সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত সম্প্রীতি ও সদ্ভাব রক্ষা করিবার নির্দ্দেশ আছে। এই সময় তিনি একটি সমিতি স্থাপন করেন যাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মসমন্বয়। এই সমিতিতে বিভিন্ন বক্তৃতা দ্বারা তিনি বুঝাইলেন যে, অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত সমন্বয় ও বুঝাপড়া করা সম্ভব। ইহাতে ইসলামের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হয় না। রক্ষণশীল তুর্কি সুলতান তাঁহার এই উদার ধর্ম্মমত বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং আব্দুহু বেরুত হইতে বিতাড়িত হইলেন। তাহার পর মিসর সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। সুতরাং দীর্ঘদিন পরে তিনি আবার মিসরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৮৮৮ সালে আব্দুহু স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এইভাবে তাঁহার জীবনের প্রথম অধ্যায় শেষ হইল। বিদ্রোহ বিপ্লবের মধ্যে এই কয় বৎসর

তিনি সংকটের মধ্যে কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি অক্লান্ত ভাবে মিসরের সেবা করিয়া গিয়াছেন। এই সন্ধিক্ষণে রাজনীতি অপেক্ষা দেশের মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়া তিনি আরও বিরাট কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই সময় তাহার ব্যক্তিত্ব একটি নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিল। তিনি দেশবাসীর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা পাইলেন। আর রাজনীতি নয়, এখন হইতে তিনি মন দিলেন ইসলামের সংস্কার সাধন ও মুসলিম সমাজের মধ্যে নৈতিক চেতনা সম্পাদন করিতে। তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন পরিষদের সদস্য মনোনীত হইলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মান্ধাতার আমলের শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিবার সুবর্ণ সুযোগ এইবার আসিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন করিবার জন্য তাহার প্রস্তাবক্রমে কয়েকটি নূতন পদ্ধতি গৃহীত হইল। কিন্তু তাহার আদর্শ মত সমস্ত প্রকার জঞ্জাল দূর করিতে পারিলেন না। কারণ রক্ষণশীল দল তাঁহাকে প্রচণ্ড বাধা দিল। তিনি চাহিয়াছিলেন প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুকরণ একেবারেই বর্জ্জন করিতে। তিনি ধর্ম্মের খুঁটিনাটি ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তা ও সমালোচনার স্পিরিট ও যুক্তি প্রয়োগ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীলগণ তাহা চাহে নাই। সেইজন্য তাহাদের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিল। কিন্তু তবুও তিনি নিজ সাধ্যমত আল আজহারের মধ্যে কিছুটা বৈপ্লবিক শিক্ষানীতি সন্নিবিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি এখন বুঝিলেন যে রাজনৈতিক বিপ্লব অপেক্ষা সমাজ বিপ্লব কঠিন কাজ। তবুও তিনি সংস্কারের উদ্যম ত্যাগ করিলেন না।

১৮৯৯ সালে আব্দুহ মিসরের গ্রাণ্ড মুফতি (Grand Mufti) নিযুক্ত হইলেন। ইহা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ। ইহার পূর্ব্বে যাহারা এই পদ অধিকার করিয়াছিলেন মতের দিক দিয়া তাঁহারা ছিলেন একেবারে প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁহারা জনসাধারণের ধর্ম্মবোধের মধ্যে কোন বৈপ্লবিক চিন্তা জাগ্রত করিতে পারিলেন না। কিন্তু আব্দুহ মুফতি পদ পাইয়া নূতন ভাবে কাজ আরম্ভ করিলেন। তিনি সমগ্র দেশবাসীর প্রাণে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে সক্ষম হইলেন। এই সময় তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। তাহার মধ্যে প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে, সকল ধর্ম্মই সত্য। সাধারণতঃ মুসলিম সমাজে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে 'ইসলাম' ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মেই মুক্তি নাই। মুফতি আব্দুহ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিলেন যে, এই ধারণা ঠিক নহে। তিনি সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার মত অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন।

যদি কেবল মাত্র একটি ধর্মই সত্য হয় তবে জগতের অধিকাংশ নরনারীকে নরকে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মানব সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, যুগের প্রয়োজন ও দাবী অনুসারে মানুষকে চলিতে হইবে। ইসলাম ধর্মকেও যুগোপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রাচীন আমলের বহু রীতিনীতি আজ অচল হইয়া গিয়াছে। সেগুলিকে কেবলমাত্র প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়া ধরিয়া রাখিবার কোন সার্থকতা নাই। তিনি অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। ইহাতে তিনি দেখাইলেন যে কর্ম্মহীন জীবন ও শুধুমাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভর করা ইসলামের মূলনীতির বিরোধী। যে যুগ ধরিয়া রক্ষণশীল সমাজ কোরআনের যে সব ব্যাখ্যা করিতেন, তিনি তাহার তীব্র সমালোচনা করিলেন। এবং দেখাইলেন যে কোরআন সত্য ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অলৌকিক কথা প্রচারের জন্য কোরআন আসে নাই। রক্ষণশীলগণ কোরআনের যে ব্যাখ্যা করে, তাহা ইসলাম ধর্মকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেই সব ব্যাখ্যা বা ভাষ্য যুগের উপযোগী নহে। এই ব্যাপারে আব্দুহুকে মার্টিন লুথারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তবে তাঁহার সহিত লুথারের পার্থক্য এইখানে যে, আব্দুহু কোন নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠন করেন নাই। তাঁহার এই সব সিদ্ধান্তের জন্য তিনি প্রাচীন পন্থীদের নিকট প্রচণ্ড বাধা পাইলেন। মিসরের এই বিপ্লবী নেতা এই সময় যে দৃঢ়তা, সুযুক্তি ও দৃষ্টি ভঙ্গীর উদারতা দেখাইলেন, তাহা তাঁহার অন্তরের মহত্বই প্রমাণ করিল। তিনি ধর্ম্মব্যাপারে আধুনিক মত পোষণ করিতেন। ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনের সময় লোকে ধর্ম্মমত লইয়া নানাপ্রকার অসৎ পন্থা অবলম্বন করে, ধর্ম্ম ব্যাপারকে নির্ব্বাচনী প্রচার পত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধর্ম্মের আদর্শকে অবমানিত করে। তিনি ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। জ্ঞান ও নীতি এই দুইটি কথার উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেন। জগতের পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে চলিবে না। প্রত্যেক মানুষের একটা ব্যক্তিগত দায়িত্ব আছে। গোপনে বসিয়া নির্জ্জন চিন্তায় সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিলে এই দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। চাই বাস্তব জীবনে কর্ম্মের প্রেরণা। এইভাবে তিনি যে সব কথা প্রচার করিলেন তাহা মিসরের জীবনে নূতন প্রেরণা সৃষ্টি করিল। বস্তুতঃ বর্ত্তমান মিসর তাঁহারই আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত, তাঁহারই হাতের সৃষ্টি।

তিনি সংস্কার মুক্ত উদার ইসলামের উচ্চ আদর্শ মিসরবাসী ও সমগ্র মুসলিম সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। প্রত্যেক যুগে কুসংস্কার ও যুক্তিহীন প্রথাই ধর্ম্মকে বিকৃত করে। ধর্ম্মের সার সত্য বুঝিতে হইলে সংস্কারমুক্ত মন, স্বাধীন চিন্তা, মনের উদারতা চাই। তবেই সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের আদর্শ সফল হইবে। সব সময় বুদ্ধিকে রিপুচয়ের কবল হইতে মুক্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যাপারকে সত্যের কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। নতুবা ধর্ম্ম কখনই কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবে না।

শুধু মিসরেই নহে, মিসরের বাহিরে অপরাপর মুসলিম-প্রধান দেশেও তাঁহার মতবাদ ছড়াইয়া পড়িল। অবশ্য সকলেই যে এই মত গ্রহণ করিল তাহা নহে। অনেকেই ইহার বিরোধিতা করিল। কিন্তু তিনি মানুষের চিন্তা ধারার মধ্যে একটা বিপ্লব আনিয়া দিলেন। তিনি মিসরের মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবন ধারার মধ্যে আনয়ন করিলেন এক বিরাট পরিবর্ত্তন। তাঁহার বহু অনুরক্ত ও ভক্ত শিষ্য মিসরের পরবর্ত্তী রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিপ্লব আনয়নে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। কাসিম আহমদ ও সাদ জগলুল পাশা তাঁহারই হাতের সৃষ্টি। মিসরে বর্ত্তমানে এমন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি নাই যিনি আব্দুহুর দ্বারা প্রভাবিত হন নাই।

জগলুল পাশাকে যদি মিসরের গ্যারিবল্ডি বলা হয়, তবে আব্দুহুকে বলিতে হইবে মিসরের ম্যাজিনি। কারণ ম্যাজিনির মতই তিনি মিসরবাসীকে বৈপ্লবিক আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া ছিলেন।

'The old physics showed us a universe which looked more like a prison than a dwelling-place. The new physics shows us a universe which looks as though it might conceivably form a suitable dwelling-place for free men.'

James Jeans

পঞ্চুখুড়ো

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

পৃথিবীতলে পঞ্চুখুড়োকে কে যে প্রথমে খুড়ো বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল সে কথা পঞ্চুখুড়ো নিজেও হয়ত এখন ঠায় ঠিকানায় বলিতে পারিবেন না। কিন্তু পথে ঘাটে হাটে মাঠে আবালবৃদ্ধবণিতা যাহার সঙ্গেই পঞ্চুখুড়োর সাক্ষাৎ হয় সেই জোর গলায় ডাক দেয় 'পঞ্চুখুড়ো'—এবং তাহার পরে যথার্থ প্রণাম ঠিক সকলেই না করিলেও, 'পেন্নাম' বলিয়া প্রণামের ভঙ্গি একটা সকলেই করিত। আমাদের সদানন্দ আশুতোষ পঞ্চুখুড়ো তাহাতেই মোটামুটি খুশী। কিন্তু ঐটুকু অন্ততঃ চাই-ই; খুড়ো বলিয়া বড় গলায় ডাকটা, আর ঐ প্রণামের ভঙ্গিটি। বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের ঠিক প্রথমক্ষণে পঞ্চুখুড়ো একটি কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনও প্রকার অক্ষরের সহিত তাহার কোনও সাক্ষাৎ পরিচয় তিনি কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না এবং সমগ্র গ্রামবাসীর একান্ত বিস্ময় স্বরূপে এই সঙ্কল্পে তিনি আমরণ অটুট ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে উমেশ বিদ্যারত্নের সাক্ষাৎ পৌত্র এবং ও-অঞ্চলে উমেশ বিদ্যারত্ন যে কত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন এই দুইটি তথ্য সম্বন্ধে অবহিত পঞ্চুখুড়োর মতন কেহই ছিলেন না। আর গ্রামবাসী কর্তৃক এইটুকু স্বীকৃতি ছিল তাঁহার ন্যূনতম দাবী।

ও পাড়ার ধনঞ্জয় রায়ের মেজমেয়ের ছেলে সব পরীক্ষায়ই ভাল পাশ দিয়া অল্প বয়সেই সদরে মুন্সেফি পাইয়াছে। বড় দিনের ছুটিতে সে মামা বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। এত বড় কৃতবিদ্য নাতিকে ঘরে বসাইয়া রাখিতে ধনঞ্জয় রায়ের আপত্তি, নাতি আসিলেই তাই তিনি তাহাকে সময়ে সময়ে জোর করিয়া বাস্তায় ঘাটে এবং পাড়ায় পাড়ায় লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বিকাল বেলা তাঁহারা খালপাড়ের রাস্তা ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে নিজেদের গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া পাশের গ্রামের দিকে আগাইয়া যাইতেছেন, দেখা গেল পঞ্চুখুড়ো লাল গামছায় বাঁধা একটা ভিজা চালের পুঁটলি মাথায় করিয়া হন্ হন্ বেগে বাড়ি ফিরিতেছেন। ধনঞ্জয় রায় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই দূর হইতে—'এই যে পঞ্চুখুড়ো, পেন্নাম' বলিয়া নুইয়া পড়িলেন; কিন্তু

পঙ্কুখুড়োর দৃষ্টি ঐ ডেঁপো ছোকরাটার দিকে, সে ঘাড় টান করিয়া আর একদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পঙ্কুখুড়ো ভুরু কুঁচকাইয়া ছোকরাটিকে লক্ষ্য করিয়া ধনঞ্জয় রায়কে বলিলেন,—'ছোকরাটি কে হে বটে?' ধনঞ্জয় রায় বলিলেন, 'আজ্ঞে আমার বিনির ছেলে—সেই যে মেঝো মেয়ে বিনি ইদিল চকে বে দিলুম'—

পঙ্কুখুড়ো বলিলেন,—'বুঝেছি, বুঝেছি—আরে সেই যে তোমার মুন্সেফ নাতি—

'আজ্ঞে হ্যাঁ হ্যাঁ'—বলিয়া ধনঞ্জয় হাত জোড় করিয়া মাটির দিকে আরও ঝুঁইয়া পড়িলেন।

'তা দেখ, বেশ বেশ,—তা দেখ—একটু মান মজ্জদা শিখিয়ে দিও হে, শুধু মুন্সেফ হ'লেই ত হয় না।'

'তা বটে বটে—। নেরে সতু, পঙ্কুখুড়োকে একটা পেন্নাম কর—উমেশ বিদ্যারত্নের নাতি—জানিস্'—বলিয়াই ধনঞ্জয় রায় তাঁহার নাতির ঘাড়টা ধরিয়াই খানিকটা নোয়াইয়া দিলেন।

পঙ্কুখুড়ো বলিলেন, 'আরে থাক্ থাক্, ওতেই হয়েছে, এমনিই—আশীর্বাদ করছি—ধন হোক—মান হোক—দীর্ঘ আয়ু হোক'—বলিয়াই তিনি তাঁহার অপরিষ্কৃত দন্তবাজি বিকশিত করিয়া গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন। ধনঞ্জয় রায় পথে পথে নাতিকে বুঝাইতে বুঝাইতে ফিরিলেন যে, লোকটা একটু পাগলাটে হইলেও মানী মানুষ—উমেশ বিদ্যারত্নের নাতি।

পরের দিন সকাল বেলা—সেই ধনঞ্জয় রায় আর তাহার নাতি সতু—সেই খালের পাড়ের রাস্তা ধরিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। খালে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে একটি লোক, কোমরের কাছে ঝুলান একটি বাঁশের খালুই। শীতের কুয়াসায় দূর হইতে ভাল করিয়া চেনা যায় না,—কাছে আসিতেই দেখা গেল স্বয়ং শ্রীপঙ্কুখুড়ো। একখানি গামছা পরিহিত—তাহাও উপরের দিকে যতটা সম্ভব টানিয়া ওঠান; গায়ে একটি পাতলা কাঁথা আঁট করিয়া জড়ান, আর পরিধানের বস্ত্রখানি দ্বারা দুই কান ভাল করিয়া ঢাকিয়া একটি পাগড়ি বাঁধা। পিছন হইতে ধনঞ্জয় রায় ডাকিয়া জিজ্ঞাস করিলেন,—'হেঁই যে পঙ্কু খুড়ো, মাছ মিলল কিছু'?

পঙ্কুখুড়ো জাল টানিতে টানিতে বলিলেন, 'খাটলে দু'চারটা মেলে বই কি? এই দু' চারটে ইচা (চিংড়ি) পুঁটি চেলা—আর বড় নয় কিছু।'

পঞ্চুখুড়োকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া নাতি সতু বলিল,—'দাদু, শামুক ঝিনুক জালে যা উঠছে সবই লোকটি খালুইতে ভর্তি ক'রে নিচ্ছে কেন?' কণ্ঠস্বর নিচু করিয়া ধনঞ্জয় রায় বলিলেন,—'পঞ্চুখুড়োর অনেক হাঁস, সেই হাঁসের জন্য নিচ্ছেন।'

মাছ ধরিতে পঞ্চুখুড়ো শুধু ওস্তাদ নন, প্রায় অদ্বিতীয়। একথা তল্লাটের জেলে-জিয়ানীরা পর্যন্ত বিবিধ উপলক্ষ্যে নত মস্তকে স্বীকার করিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ মৎস্য-মারাই পঞ্চুখুড়োর আসল পেশা; যজনাদি কার্যে দুপুরের দিকে মাঝে মাঝে একবার বাহির হইতে হয়, নিজের গ্রাম বা আশপাশের গ্রামের কাজ সারিয়া ফিরিতে ফিরিতে বিকাল হইয়া যায়। তারপরে কোনও রূপে নাকে-মুখে কিছু গুজিয়া লওয়া,—তারপরেই বড়শি লইয়া বাহির হওয়া, রাত্রির অন্ধকার একেবারে ঘনীভূত হইয়া আসিবার পুর্ব পর্যন্ত। জাল বাহিয়া হোক, বড়শি ফেলিয়া হোক, বাঁশের 'চাই' পাতিয়া হোক, মৎস্য-শিকারের যত প্রণালী আছে এবং সেই প্রণালীগুলির সংশ্লিষ্ট আবার যতগুলি ফন্দি ফিকির রহিয়াছে—পঞ্চুখুড়োর কিছুই অজানা ছিল না। কোন্ জাতীয় বড়শিতে কোন্ জাতীয় মাছ ধরিবার জন্য চালের পিটুলি গাঁথিতে হয়, কখন কেঁচো দিতে হয়, কখন বোল্‌তার ডিম—কখন ছোট ছোট সোনা ব্যাঙ—এ-সকল তথ্য পঞ্চুখুড়োর নখদর্পণে। এই জন্য আড্ডা জমে তাঁহার সব চেয়ে বেশি জেলে-জিয়ানীর সঙ্গে।

একবার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই ধনঞ্জয় রায়ের মুন্সেফ নাতি সতুকে লইয়াই। ছেলেবেলায় সতু মাইনর পর্যন্ত মামা বাড়ি থাকিয়াই পড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং এই মামা বাড়ি শুধু নয়—সমস্ত গ্রামটার সঙ্গেই সমস্ত শৈশবের মধুর স্মৃতি জড়িত হইয়া কেমন একটা নাড়ীর টান দেখা দিয়াছে। মাইনরের পর হইতেই শহরে অধ্যয়ন, সুতরাং শহরেই বাস; এই শহরবাস ঐ গ্রামটাকে আরও অনেকখানি তাহার মনের কাছে আনিয়া দিয়াছে। তাই ছুটি পাইলেই সতু মামা বাড়ি চলিয়া আসে—আর সকাল-সন্ধ্যা তাহার শতস্মৃতি মাখা রাস্তাঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়।

সে বারে আশ্বিনের প্রথমেই দুর্গা পুজা পড়িয়াছে, সতু পুজার ছুটি পাইয়াই মামা বাড়ি চলিয়া আসিয়াছে। পুর্ববঙ্গের পাড়া-গাঁ—তখন পর্যন্ত চারিদিকে জল থৈ থৈ। একবাড়ি হইতে অন্যবাড়ি যাইতেও পথে হয় একহাঁটু জল—

নয় এক হাঁটু কাঁদা। আজ অষ্টমী পূজা, পাশের বাড়িতে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আরতির ঢাক-কাঁসর বাজিয়া উঠিয়াছে। সতু অল্প অল্প জ্যোৎস্নায় পা টিপিয়া টিপিয়া পাশের বাড়ি গেল আরতি দেখিতে। গৃহস্থটি গরীব ছিল, সতুকে দেখিয়া তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, তথাপি মুহূর্ত মধ্যে একখানি হাতলভাঙা চেয়ার আনিয়া তাহাকে বসিতে দিল এবং একটু চা করিয়া দিবার জন্য সকলে যেন হন্তদন্ত হইয়া ছুটাছুটি লাগাইয়া দিল। কিন্তু পূজা মণ্ডপের ভিতরের দিকে তাকাইয়া সতুর তো চক্ষু স্থির—দেবীর পূজারী হইয়া আরতি করিতেছেন একখানি নামাবলী গায়ে সেই পঞ্চুখুড়ো। প্রথমে ধূপের ধোঁয়ায় লোকটিকে ঠিক ধরা যায় নাই, তারপরে তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিয়া সতু এমন আচমকা ভাবে এবং এমন একটা অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া চেয়ার খানি ছাড়িয়া বেদম বাড়ির বাহির হইয়া গেল যে, বাড়ির সমস্ত লোকই তাহার গর্বে এবং অসৌজন্যে ব্যথিত এবং বিরক্ত হইল। কথাটা পঞ্চুখুড়োর কানে পৌঁছাইল,—এই ছোঁড়া দেমাকী লোকটার কথা ভাবিয়া রাগে পঞ্চুখুড়োর গা'টা রিম্ রিম্ করিতে লাগিল। আরতি সমাপ্ত করিয়া তিনিও চলিয়া গেলেন।

পূজা-মণ্ডপের সামনে হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সতু বাড়ি ফিরিল না, হাঁটিতে হাঁটিতে সেই খালপাড়ের রাস্তাতেই গিয়া পড়িল। খোলা রাস্তা দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সতুর মনে হইতেছিল, কাজটা সে তেমন ভাল করে নাই—মনটা কেমন যেন একটু খারাপ খারাপ লাগিতেছিল। কিন্তু ঐ পঞ্চুখুড়োর চণ্ডীমণ্ডপে পূজা এবং দেবীর আরতি জিনিসটা সতু কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিল না।

দিনের বেলায় দুই-এক পশলা পাতলা বর্ষা হইয়া গিয়াছে, আকাশে এখনও একটু আধটু মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে—তাহারই ফাঁকে ফাঁকে ঝরিয়া পড়িতেছে অষ্টমীর জ্যোৎস্না। পাশের শীর্ণ খালটা আজ কেমন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। বেশ ভাল লাগে সতুর এই রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়াইতে। হাঁটিতে হাঁটিতে সোজা পশ্চিমমুখে আগাইয়া চলে সতু। গ্রামের প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা কাঠের পুল, তাহার চওড়া হাতলগুলির উপরে বেশ বসিয়া থাকা চলে। সতু তাহারই একটার উপরে পা তুলিয়া দিয়া খানিকটা কাৎ হইয়া বসিয়া রহিল। রাস্তার ডান পাশে খাল—আর দুই দিকে জলে থৈ থৈ ধানের মাঠ। ধানগাছগুলি এখন বেশ লম্বা হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাদের

গলা অবধি জল। মাঝে মাঝে দু'এক খানা মাঠে জল গিয়াছে, তাহাতে ধান জন্মে নাই—ফুটিয়া আছে লাল সাদা অসংখ্য শাপলা। দুই পাশের মাঠেরই দূরে দূরে গাছ-পালা ঢাকা গ্রাম, জলভরা মাঠের মাঝে মাঝেও পড়িয়াছে এক আধটা বাড়ি। এখান হইতে সেখান হইতে ভাসিয়া আসিতেছে বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যধ্বনি নিঃসৃত আরতির বাজনা, তাহার সবটাই পটু বাদ্যকারের হাত হইতে নহে, অনেকটাই অত্যুৎসাহী বালক-যুবকগণের অপটু বা অর্দ্ধপটু হাত হইতে। দুই পাশের মাঠের জল চলাচলের সংযোগস্থল হইল এই প্রশস্ত পুলটি। উত্তর দিকের সকল মাঠের জল ঢালু হইয়া এই পুলের নীচ দিয়া আসিয়া পড়িতেছে দক্ষিণের খালের একটানা জলে। পুলের কাছ দিয়া একটানা জল পড়িতে পড়িতে জায়গাটা মাঠ হইতে আস্তে আস্তে ঢালু হইয়া পুলের নিকটে বেশ খাদ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক বৎসর ছেলেরা এখানে বাঁশের 'চাই' পাতিয়া মাছ ধরে; তাই তাহারা বর্ষাকাল পড়িলেই বাঁশ পুঁতিয়া এবং তাহার সঙ্গে বাঁশের চ্যাটাই বাঁধিয়া 'গড়া' বাঁধিয়া লয়। বাঁশের এই ঘেরান বেড়া মাঠ হইতে আগত নিম্নাভিমুখী জলকে প্রচণ্ড বাধা দেয়, সেই বাধা পাইয়া জল যেন ফুঁসিয়া উচ্ছ্রিয়া উঠিতে থাকে, মৃদু গর্জনে কল্-কল্ ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ করিয়া সবেগে আগাইয়া আসিয়া ঘন আবর্তের সৃষ্টি করিতে করিতে খালের একটানা জলে মিশিয়া যায়। মেটে মেটে জ্যোৎস্নার ভিতরে এই অর্দ্ধবৃত্তাকারে উচ্ছ্রিয়মান জলের শুভ্ররজতরেখা-কান্তি—তাহাদের একটানা কল্-কল্—ছল্-ছল্—ঝুপ্-ঝাপ্ শব্দধারা স্তিমিত চেতনার মধ্যে কেমন একটা একতানভাব সৃষ্টি করে। কাছেই মাঠের মধ্যে ছেলেদের 'টঙ্-ঘর',—অর্থাৎ লম্বা বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া জলের উপরে মঞ্চাকৃতি ছোট ঘর। লম্বা বাঁশের চোঙের মধ্যে রান্নার সকল মসলা ঢুকাইয়া একটা ছোট সরু মুগুরের আকৃতি কাঠি দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া মসলা প্রস্তুত করা হইতেছে—তাহার শব্দও ঐ জলের শব্দের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে।

সন্তু খানিক পরে লক্ষ্য করিল, মাঠের ভিতর দিয়া লগি ঠেলিয়া একখানি জীর্ণ ভাঙা ছিপ নৌকায় দুইটি লোক আসিয়া টঙের কাছে পৌছিল। টঙের একটা খুঁটির সঙ্গে নৌকার দড়ি বাঁধা হইল। তারপরে সামনের লোকটি নৌকার আগায় পা দিয়া যেমনি টঙের উপরে উঠিতে যাইবে অমনি মট করিয়া আগাটি ভাঙিয়া গেল। লোকটি জলে পড়িতে পড়িতেই টঙের বাঁশ ধরিয়া কোনও রকমে উপরে উঠিয়া গেল। হাসিতে

হাসিতে অপর লোকটিও উপরে উঠিয়া গেল, ভিতরে একটা হাসির রোল উঠিল। তারপরে খানিকক্ষণ তামুক টানার ফুরুক ফুরুক শব্দ, পুটপাট দুই একটি কথা—তার পরেই একটু গুন্‌গুন্ সুর টানার শব্দ। সুরটি বড় মধুর লাগিতেছে। আস্তে আস্তে বাড়িয়া উঠিল—বেশ স্পষ্ট গান শোনা যাইতেছে—

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী!
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিনী?
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,—
মা ব'লে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী।

কি মধুর কণ্ঠ—কি মধুর সুর—কি মধুর কথা! সতু যেন এমন কণ্ঠ, এমন সুর, এমন কথা কোনও দিন শোনে নাই। মাঠের থৈ থৈ করা জল, সবুজ ধানের মোটা মোটা শীস, অষ্টমীর পাতলা মেঘে মেঘে ঢাকা জ্যোৎস্না—সকলের সঙ্গে যেন এই সুর—এই কথা মিশিয়া যাইতেছে; উচ্ছ্বসিয়মান জলের একটানা শব্দ যেন ইহার সঙ্গে অপূর্ব সঙ্গতে যোগ দিয়াছে; সতুর মন আস্তে আস্তে কেমন মোহাবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

গান থামিয়া গেল। বেশ খানিকক্ষণ গল্প স্বল্প করিবার পর এবং পুনরায় দু'এক ছিলিম তামাক টানার পর আগন্তুক লোক দুইটি আবার টঙ হইতে ছিপ নৌকায় নামিয়া পড়িল। একটি লোক লগি ঠেলিয়া নৌকাখানিকে এবার পুলের কাছে রাস্তার পাশে আনিয়া লাগাইল। দ্বিতীয় লোকটি একটা লাফ দিয়া পাড়ে পড়িয়া বলিল,—'যাইরে মঙ্গল,—দেড়পর রাতে আবার সন্ধি-পূজা বাকি আছে।' কণ্ঠস্বরে সতু বুঝিতে পারিল, এই লোকটিই গায়ক। পুল ছাড়িয়া লোকটির দিকে আগাইয়া আসিল সতু, চাহিয়া দেখিল সেই পঞ্চুখুড়ো; কেমন অভিভূত হইয়া আগাইয়া আসিয়া সতু পঞ্চুখুড়োর কাদা-ভরা পা ছুঁইয়াই একটা প্রণাম করিল। পঞ্চুখুড়ো বলিলেন,—'কেরে, সেই ধনঞ্জয়ের মুন্সেফ নাতি নয়রে? একটা পেন্নাম ক'রে তবে ছাড়লি?' বলিয়াই কেমন একটা কদর্য বোকাহাসি হাসিয়া পঞ্চুখুড়ো আগাইয়া চলিয়া গেলেন।

কণ্ঠস্বর ছেলেবেলা হইতেই পঞ্চুখুড়োর অপূর্ব, এই পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তাহাতে একটু মরিচা ধরিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহার বৈশিষ্ট্য একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এই কণ্ঠস্বরের জন্যই পঞ্চুখুড়োকে তাঁহার ছেলেবয়সে দুই দুই

সেই একবার পাশের গাঁ রত্নপুরে বিজয়াদশমীর প্রশস্তি-বন্ধনের সময়ে, দত্তবাড়ির ছেলেবুড়ো সব সভা করিয়া বসিয়া আছে। মায়ের ঘটসহ সমস্ত মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজান রহিয়াছে নূতন একখানি কুলার উপরে, তাহারই সঙ্গে লালগামছায় জড়ান একখানি ‘চণ্ডী’-পুঁথি। পুরোহিত পঞ্চুখুড়ো সেই কুলাখানি একজনের একজনের করিয়া ছোঁওয়াইয়া যাইতেছেন ছেলে-বুড়ো সকলেরই কপালে। সেজকর্তার কপালে ছোঁওয়াইবার বেলা ঠাকুর মহাশয় কি করিয়া পিছন হইতে বেশ একটু ধাক্কা পাইলেন—কুলাখানি—এবং তৎসহ ‘চণ্ডী’পুঁথিখানির সজোর ধাক্কা লাগিল গিয়া সেজকর্তার প্রশস্ত কপালে। কি যেন একটা কিছু কপালে বিঁধিয়া গিয়াছে বুঝিয়া সেজকর্তা কপালে হাত দিয়া বলিলেন,—‘কপালে এটা বিঁধিল কি ঠাকুর মশাই’? ঠাকুর মহাশয় একটু অপ্রস্তুতের ভান দেখাইয়া বলিলেন, ‘পুরণো ‘চণ্ডী’ বাবু—বোধ হয় তাল-পাতার শলা ঢুকে থাকবে।’ সেজকর্তার বড় ছেলে চট্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেজকর্তার কপাল হইতে শলাটি টানিয়া বাহির করিয়া বলিল,—‘কোথায় ঠাকুর তালপাতার শলা, এ যে নারকেল পাতার শলা, দেখি আপনার চণ্ডী’—বলিয়াই কুলার উপর হইতে চণ্ডীখানা লইয়াই একটানে তাহার আবরণ-বস্ত্র গামছাখানি খুলিয়া ফেলিল,—দেখা গেল, আর কিছুই নহে, গামছায় মোড়ান একখানি নারিকেলের শলা-নির্মিত ঝাঁটা! ছেলের দল সহসা যতই উত্তেজিত হইয়া উঠুক না কেন—বিজয়ার দিনে বৃদ্ধেরা কিছুতেই কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতে দিলেন না, কিন্তু পঞ্চুখুড়োর এত বড় এক ঘর যজমান চিরদিনের জন্য হাতছাড়া হইয়া গেল।

আর একদিনের ঘটনাটি ছিল আরও একটু জটিল প্রকৃতির। সে আরও একটু দূরের গাঁ বেতঘাটায়। পুরণো তালুকদার বাড়ি, এখন লেখাপড়া শিখিয়া সকলেই বিদেশবাসী। শুধু একমাত্র মধু পিপলাইয়ের নিঃসন্তান বিধবা স্ত্রী রাজুবালা ধর্মকর্ম পালা-পার্বণাদি রক্ষা করিতে বাড়িতে আছেন। এবারে আষাঢ়ের পূর্ণিমায় গুরু-পূর্ণিমা পড়িয়াছে; রাজুবালার ইচ্ছা এই পূর্ণিমায় লক্ষ্মী-নারায়ণের অভিষেক করিয়া একটু শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে এই পিপলাই বাড়ির বহু প্রাচীনকালের স্বর্ণচক্রধারী শাল-গ্রাম শিলাটি চুরি হইবার পরে রাজুবালা সকল পূজারী ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া সশব্দে অনেক গাল পাড়িয়াছেন, সে গালির ব্যঞ্জনা ছিল এই যে, এই

চৌর্যকার্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কীর্তি! ইহার পরে চট করিয়া কোনও পুরোহিতই আবার এ বাড়ি আসিয়া যাজনিক কার্য করিতে রাজী হইলেন না। একটু দূর সম্পর্কে পরিচয় ছিল পঞ্চুখুড়োর সঙ্গে রাজুবালার, অগত্যা লোক পাঠাইয়া রাজুবালা ডাকাইয়া আনাইলেন পঞ্চুখুড়োকে; সব শুনিয়া মাথা নাড়িয়া পঞ্চুখুড়ো বলিলেন, তিনিই সব কাজ সুষ্ঠু ভাবে করাইতে পারিবেন। রাজুবালা বলিলেন,—'আমার যে শালগ্রাম শিলা নেই।' পঞ্চুখুড়ো হাসিয়া বলিলেন, 'সে সব ভাবতে হবে না, সব যোগাড় করে আনব'।

যথা-নির্দিষ্ট দিনে এবং যথা-নির্দিষ্ট সময়ে পঞ্চুখুড়ো শালগ্রাম-শিলাসহ যখন আসিয়া পিপলাই বাড়ি উপস্থিত হইলেন, তখন পিপলাই গিন্নীর মনটা বড় বিরূপ হইয়া গেল। তেল চিটচিটে ময়লা ছেঁড়া একখানি নামাবলী কাঁধের উপরে ভাঁজ করিয়া ফেলান আছে, পায়ে এক হাঁটু কাঁদা, মাঝে মাঝে ধান-গাছের এবং জোলো ঘাসের আঁচড়ের দাগ; পরিধানে আটহাতী মোটা ধুতি—জল-কাদার ভয়ে তাহাও যতখানি সম্ভব উপরে গুটানো; ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথার চুল—ঠিক যেন পুরণো আমের ডালে কাকের বাসা। বুদ্ধিমান পঞ্চুখুড়ো রাজুবালার মনের ভাবটা খানিকটা আঁচ করিলেন, বলিলেন,—পা-টা ধুয়ে আসছি বৌমা। শুকনো রাস্তা দিয়েই বেশ ফিট্‌ফাট্ আসা যেত—তা বড় ঘুরা পথ হে; তাই জল-কাদায় একটু কষ্ট হ'লেও এলুম এই মাঠের পথেই।' রাজুবালা আর বাক্যব্যয় করিলেন না, পঞ্চুখুড়োও চট্‌পট্ করিয়া প্রাথমিক প্রস্তুতির পালা শেষ করিয়া পূজায় মনোনিবেশ করিলেন। কালো রঙের শালগ্রাম-শিলাটি যখন পঞ্চুখুড়ো তাম্রকুণ্ডের ভিতরে স্থাপিত করিয়া পঞ্চকষায় এবং পঞ্চগব্যদ্বারা স্নান করাইতেছিলেন রাজুবালা তখন লক্ষ্য করিলেন, শালগ্রাম-শিলাটির অর্ধেকের বেশির ভাগ একখানি লালবস্ত্র-খণ্ডের দ্বারা আবৃত। রাজুবালা বলিলেন,—'অভিষেকের সময়ও ঐ কাপড়টা জড়িয়ে রাখলেন কেন ঠাকুর মশাই?' পঞ্চুখুড়ো তাঁহার অর্ধনিমীলিত নেত্রদ্বয়কে আরও নিবিড়ভাবে নিমীলিত করিয়া বলিলেন,—'বড় প্রত্যক্ষ শালগ্রামশিলা বৌমা, সর্বদাই একটু আবরণ রাখতে হয়'—বলিয়া তুলসী-চন্দনের উপরে শালগ্রামশিলা আসনে স্থাপিত করিয়া তাহাতে অনেক ফুল চাপাইয়া শালগ্রামশিলাটিকে একেবারে ঢাকিয়া দিলেন; তারপরে তিনি একেবারে টান হইয়া ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ যায়, খুড়ো আর চোখ মেলেন না; রাজুবালাও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া কাছে

বসিয়াছিলেন, মাঝখানে তিনি চোখ খুলিয়া দেখেন, একি আসনের ফুলগুলি যেন নড়িতেছে ; আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন—আবার তাকাইলেন, না, ভুল ত নয়, ফুল নড়িতেছে—বেশ নড়িতেছে—। রাজুবালা প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ঠাকুর মশাই,—ব্যাপার কি ?—ফুলগুলো যে নড়ছে—!' চোখ খুলিয়াই সামনের দিকে তাকাইয়া খুড়ো ভক্তিবিগলিত হইয়া বলিলেন,—'নারায়ণ,—মধুসূদন—প্রত্যক্ষ হয়েছেন—ঠাকুর প্রত্যক্ষ হয়েছেন—।' রাজুবালার সহসা কণ্ঠ শুকাইয়া গেল—হাত-পা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'বলেন কি ঠাকুর, বলেন কি ?'

'বলেছি ঠিক,—ওই চেয়ে দেখছ না ফুলগুলো কিরকম নড়ছে ? আহা হা—ভক্তের ভগবান্—দয়াল ঠাকুর প্রত্যক্ষ হয়েছেন,—প্রত্যক্ষ—!'

আরও বিহ্বলকণ্ঠে রাজুবালা বলিলেন, 'এখন কি করি ঠাকুর, কি করি—?'

'দক্ষিণা দাও—দক্ষিণা,—ঠাকুরকে আমার দক্ষিণা দাও—। সোণা আছে ? সোণার মোহর ?'

উত্তেজিত কণ্ঠে রাজুবালা বলিলেন, 'আছে, আছে'—বলিয়াই তিনি দৌড়াইয়া পাশের কক্ষে ঢুকিলেন—সরাৎ করিয়া লোহার সিন্ধুকটা খুলিয়া বহুদিনের সঞ্চিত সাতখানি মোহর বাহির করিয়া প্রায় দৌড়াইয়া আসিলেন। সেই সাতখানি মোহর পঞ্চুখুড়োর পায়ের কাছে রাখিয়া রাজুবালা প্রথমে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে টান হইয়া পড়িলেন। একটু পরেই চিৎকার করিয়া বাড়ির বুড়ী ঝিকে বলিলেন পাড়ার লোক সব ডাকিয়া আনিতে। বুড়ী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া দৌড়িয়া ছুটিয়া গেল এবং চিৎকারে পাড়ার লোক জড়ো করিতে লাগিল। রাজুবালা প্রায় অচেতনের মত সাষ্টাঙ্গে হত্যা দিয়া পড়িয়া অস্ফুটস্বরে 'নারায়ণ, নারায়ণ' নাম জপিতে লাগিলেন।

দুইচারি মিনিটের ভিতরেই আট-দশজন লোক আসিয়া ঘরে জমা হইল, কেহ স্নান করিতেছিল, ভিজা কাপড়েই উপস্থিত ; কেহ খাইতে বসিয়াছিল, এঁটো হাতেই দৌড়িয়া আসিয়াছে ; কেহ ঠাকুর পূজায় বসিয়াছিল—ঠাকুর আসনে রাখিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত। সবাই বলিতেছে—কি কি ব্যাপার কি ? লোকজনের সাড়া পাইয়া রাজুবালা ধরমর করিয়া উঠিয়া বসিয়াই বলিল,—'দেখছ না, ঠাকুর প্রত্যক্ষ হয়েছেন—ঐযে নড়ছেন !'

সত্যই ত, ঠাকুর নড়িতেছেন—নড়িয়া নড়িয়া ঠাকুর এতক্ষণে ফুলের ভিতর হইতে অনেকখানি বাহিরে সরিয়া আসিয়াছেন। 'নারায়ণ-মধুসূদন'

বলিয়া রাজুবালা আবার পড়িয়া যাইতেছিলেন, প্রতিবেশিনী রাখালের মা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

দীনু কবিরাজ বলিলেন, 'ভায়া, ব্যাপারটা কি?'

তিনু ঘরামি বলিল,—'তাইত, কিছুই যে বোঝা যাচ্ছে না।'

'দেখি কি ব্যাপার'—বলিয়া অল্পবয়সের রাখাল শালগ্রামশিলার দিকে আগাইয়া যাইতেই রাজুবালা চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ছুঁস্‌নি হতভাগা, ছুঁস্‌নি'—

রাখাল তবুও আগাইয়া গেল, নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'এ কি রকম শালগ্রামশিলা—দেখি—' বলিয়াই সে শালগ্রামশিলাটি হাতে তুলিয়া জড়ান কাপড়খানি খুলিয়া ফেলিয়া বলিল,—'এঁ্যা, এ যে মস্ত বড় এক শামুক'—জল পেয়ে ন'ড়ে বেড়াচ্ছে—'

'এঁ্যা—বলিস্ কিরে হতভাগা' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই রাখাল কালো বড় শামুকটি রাজুবালার একেবারে সামনে আনিয়া ধরিল। রাজুবালা এতক্ষণ লক্ষ্যই করেন নাই পঞ্চুখুড়ো ঘর হইতে কখন উধাও হইয়া গিয়াছেন; তিনি এদিক ওদিক তাকাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—'ওরে কোথায় গেলরে সর্ব্বনাশা পুরুত—আমার সাত-সাতখানা সোনার মোহর'—আর কিছু বলিতে না পারিয়া রাজুবালা এবারে সত্যসত্যই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। 'ধর শালার বামুনকে—ধর'—বলিয়া পাড়ার লোক তক্ষুণি চারিদিকে বাহির হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কেহই পঞ্চুখুড়োর টিকিটিও আর দেখিতে পাইল না।

কথাটা থানার পুলিশের কানে পর্যন্ত গিয়া পৌঁছাইয়াছে শুনিয়া পঞ্চুখুড়ো তৎকালের জন্য একটু গা-ঢাকা দিলেন বটে, কিন্তু মাস ছয়েক পরে একদিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে তাঁহাকে যথারীতি একটি খালুই কোমরে বাঁধিয়া একখানি জাল হাতে করিয়া খালপাড়ে যথারীতি ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গেল।

পঞ্চুখুড়োর স্ত্রী মারা গিয়াছে বহুদিন হয়। একছেলে, সে বড় হইয়া বিবাহ করিয়া শ্বশুর বাড়িতেই গিয়া ঘর করিয়া আছে. ঘরে শুধু এক মেয়ে, বিশ-বাইশ বছর তাহার বয়স। মেয়ের বিবাহ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখে নাই কেহ কোন দিন পঞ্চুখুড়োকে—মেয়েরই অদৃষ্ট বলিতে হইবে। মেয়ের পনর-ষোলো বছর বয়স হইতেই সম্বন্ধ যোগাড় করিয়া মেয়ে দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন পঞ্চুখুড়ো, কিন্তু হয় কেহ মেয়ে পছন্দ করে না, নয় কেহ বেশি টাকা চায়। কিন্তু তবু সম্বন্ধ যোগাড় করিয়া মেয়ে দেখাইতে

বিরাম ছিল না তাঁহার, পাড়া-প্রতিবেশী বলিত, মেয়ে দেখানর এক বাতিক হইয়াছে পঞ্চুখুড়োর। এই মেয়েকে লইয়াই শেষ পর্যন্ত এক মহা দুর্ভাবনায় পড়িয়াছিল পঞ্চুখুড়ো।

কিন্তু খুব বেশি দিন দুর্ভাবনায় ভুগিতে হইল না পঞ্চুখুড়োকে, একদিনের কলেরাকে উপলক্ষ্য করিয়া নিষ্কৃতি দিয়া গেল তাহাকে তাহার মেয়ে। সবাই ভাবিল, বৃদ্ধবয়সে এইবারে ভাঙিয়া পড়িবে পঞ্চুখুড়ো; কিন্তু পরম বিস্ময়ে গ্রামবাসী দেখিতে পাইল, ঠিক তৃতীয় দিবসেই আবার কোমরে খালুই বাঁধিয়া, গামছা পরিধানে—পরণের কাপড়খানা মাথায় পাগড়ি করিয়া জাল হাতে খাল-পাড়ে বাহির হইয়াছেন পঞ্চুখুড়ো। সবাই ভাবিল, লোকটা কি একেবারেই অমানুষ!

কথাটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না বেঙ্গু তিলি! একদিন সকালে খুড়ো খালে জাল বাহিতেছে, কাছে বসিয়া দেখিতেছে বেঙ্গু! তারপরে সে একবার বলিয়াই ফেলিল,—'বড় শক্ত তোমার বুক খুড়োঠাকুর!'

'কেন রে, কেন রে' বলিয়া সাগ্রহে আগাইয়া আসেন খুড়ো।

বেঙ্গু বলিল,—'শেষের সম্বল ত তোমার ছিল ঐ মেয়েটা, আমরা ত দেখেছি তার জন্যে তুমি কিই না করেছ—দিন-রাত 'মা' ছাড়া তোমার ডাকটি ছিল না! সেই মেয়েটা অমনি ঠাস্ ক'রে ম'রে গেল, তোমাকে ত দু'ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে দেখলুম না ঠাকুর!'

'কথাটা তুই যখন তুললিই বেঙ্গু, তখন মনের কথাটা তোকে খু'লে বলি,—সকলকে ত আর সব কথা বলা যায় না!' বলিয়াই জালটা হাত হইতে খুলিয়া বেঙ্গুর একান্ত কাছে আগাইয়া বসিল—পঞ্চুখুড়ো। 'দেখ, এই মেয়েটার একটা বিয়ের জন্য কত চেষ্টা করেছি, দেখেছিস্ ত তোরা? করেছি কি করি নি,—বল তোরা।'

হাঁ-সূচক মাথা নাড়ে বেঙ্গু।

'আর মেয়েও ত তোরা দেখেছিস্—কেমন সাক্ষাৎ শ্যামা-মূর্ত্তি!' আবার মাথা নাড়ে বেঙ্গু।

'কিন্তু হ'লে হবে কি, কারোর পছন্দ নেই আমার মেয়েকে, সবারই চাই স্বর্গের ফুটফুটে ডানা-কাটা পরী; তা আমি কোথায় গিয়ে পাব বল দেখি? আর তা না হ'লে ত দাও একডোল টাকা—তাই বা আমি কোথায় পাব? এক-একজনে ত এসে মেয়ে দেখে নাক সিঁটকে ঠোঁট উলটে চলে যেতেন, বা

হয়ত লম্বা লম্বা টাকার ডাক ডেকে যেতেন সব নবাবপুত্তুরেরা। তারা সব চ'লে গেলে তারপরে মেয়েটাকে ত বুঝ-প্রবোধ একটা কিছু দিয়ে সামলাতে হবে? ঘরে ত আর লোক নেই—জানিসই—আমি ব'সে রাতের বেলা মেয়েটাকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বলতুম, দেখ পছন্দ ওদের তোকে খুব হয়েছে, কিন্তু ব্যাপার কি জানিস, আমি এ ঘরে তোকে কিচ্ছুতে বিয়ে দেব না। আমি তন্ন তন্ন করে খোঁজ-খবর ক'রে জানতে পেরেছি অনেক কথা, ও ছেলেটার স্বভাব-চরিত্তির তেমন সুবিধের নয়। তখন বানিয়ে বানিয়ে ব'লে দিতুম অনেক কথা। কখনও বা দিয়েছি বরের দোষ, কখনো দিয়েছি ঘরের দোষ, কখনও বলেছি কুলের কলঙ্ক! কিন্তু বাবা, রোজ রোজ কত আর এমন ধারা বানিয়ে বলা যায় তুই-ই একবার ভেবে দেখ দেখি। এ-সব বলতে বলতে শেষটায় মেয়েটাও কেমন পাগল হ'য়ে যেত—আমিও কেমন পাগল হ'য়ে যেতুম। কিন্তু এও ত বোঝ, বাপ হ'য়ে চেষ্টা না ক'রেও ত আর ঘরে ব'সে থাকা যায় না! কিন্তু শেষের দিকে কেউ মেয়ে দেখতে এলেই আমার মনে হ'তে থাকত—অপছন্দ ত শালার ব্যাটারা করবেই—তারপরে—আজকে আবার কি কথা মাকে বানিয়ে বলব! দুর্ভাবনায় আমার মাথাটা ছিঁড়ে পড়ত—শেষে আর কিছু বানিয়ে বলতেও পারতুম না, আবার সারারাত ঘুমোতেও পারতুম না। সে যে আমার কি যন্ত্রণা! যাক্ বাবা, এক দুশ্চিন্তা ত গেল! জানিস্ ত বেঙ্গু—মা যে আমার বড় অভিমানী ছিল।' —বলিয়াই পঞ্চুখুড়ো হাসিয়া পড়িল, বেঙ্গু তিলি দেখিল, এইবারে এই হাসির সঙ্গে পঞ্চুখুড়োর দুই গাল বাহিয়া টপ্-টপ্ করিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালজন্ম-শতবার্ষিকী

স্মৃতিপূজার প্রস্তুতি

৭

প্রাণধারা ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ

"এক বীজের অংশ কত বীজ। এক বীজ বৃক্ষ হইলে সেই বৃক্ষে কত ফল হয়। প্রত্যেক ফলের বীজই সেই এক আদি বীজের অংশ। এক আত্মাই আদি বীজ। তাহা হইতে জীবাত্মা সকলের প্রকাশ। এক আত্মার অংশ কত আত্মা।

'একই বীজ বৃক্ষ হইলে একে বহুর বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সে অবস্থায় এক যে বীজ, তাহা অব্যক্তভাবে থাকে। ঐ প্রকারে এক বৃক্ষে বহুর বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ প্রকারে একই ব্রহ্ম বহু হইয়া রহিয়াছেন।

'বৃক্ষ যেন পরমাত্মা। তাহার বহু ফলের প্রত্যেকটী যেন এক-একটী জীব।

'বৃক্ষ বৃহৎ। তাহার প্রত্যেক ফলই তাহা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। বৃহৎ বৃক্ষ এবং তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র ফলও দেখিতে একপ্রকার নহে; অথচ সেই বৃক্ষের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ফলের মধ্যেই ঐ প্রকার এক-একটী বৃহৎ বৃক্ষ অব্যক্তভাবে আছে। ক্ষুদ্র জীবাত্মারূপ ফলে বৃহৎ পরমাত্মারূপ বৃক্ষ অব্যক্তরূপে আছে। ফলই বৃক্ষ, বৃক্ষই ফল যে প্রকারে, সেই প্রকারে জীবাত্মাই পরমাত্মা, এবং পরমাত্মাই জীবাত্মা। অথচ ফল যতক্ষণ না বৃক্ষ হয়, ততক্ষণ তাহাকে যেমন বৃক্ষ বলা যায় না, তদ্রূপ জীবাত্মা যতকাল না পরমাত্মা হয়, ততকাল পর্য্যন্ত তাহাকেও পরমাত্মা বলা যায় না।

'প্রত্যেক ফলের মধ্যেই বৃক্ষ অব্যক্তভাবে থাকে। সকল ফল হইতে এক সময়ে বৃক্ষ বিকশিত হয় না। সকল জীবাত্মা হইতে এক সময়ে পরমাত্মা বিকশিত হন না।

'কখন বীজ অব্যক্তভাবে থাকে, কখন বা বৃক্ষ অব্যক্তভাবে থাকে। কখন জীব অব্যক্তভাবে থাকে, কখন বা পরমাত্মা অব্যক্তভাবে থাকেন।

'কখন বীজ ব্যক্তভাবে থাকে। কখন বা বৃক্ষ ব্যক্তভাবে থাকে, কখন জীবাত্মা ব্যক্তভাবে থাকে। কখন বা পরমাত্মা ব্যক্তভাবে থাকেন।

'যখন বীজ অব্যক্তভাবে থাকে, তখন তাহা নিরাকার। যখন জীবাত্মা অব্যক্তভাবে থাকে, তখন তাহাও নিরাকার।

'যখন বীজ ব্যক্তভাবে থাকে, তখন তাহা আকার। যখন বৃক্ষ অব্যক্তভাবে থাকে, তখন তাহা নিরাকার। যখন পরমাত্মা অব্যক্তভাবে থাকেন, তখন তিনি নিরাকার।

'যখন বৃক্ষ ব্যক্তভাবে থাকে তখন তাহা আকার। অব্যক্ত নিরাকার বৃক্ষ যখন আকার-বীজবিশিষ্ট হয়, তখন সেই অব্যক্ত নিরাকার বৃক্ষকেই সাকার বলা যায়। যখন পরমাত্মা নিরাকার-আকার জীবাত্মা বিশিষ্ট হন তখন সেই অব্যক্ত নিরাকার পরমাত্মাই সাকার হন।

'যখন বীজ অব্যক্ত-নিরাকার ভাবে বৃক্ষ মধ্যে থাকে, তখন সেই বীজ সাকার-সংজ্ঞক। নিরাকার জীব অব্যক্ত ভাবে যখন আকার পরমাত্মাতে থাকে, তখন সেই জীবাত্মাও সাকার-সংজ্ঞক হয়।

'যে প্রকারে জীবাত্মাও আকার, সাকার এবং নিরাকার তদ্রূপ পরমাত্মাও আকার সাকার এবং নিরাকার।

'এক বৃক্ষ হইতে বহু ফল বিকশিত হইতে পারে, তদ্রূপ বহু ফল হইতে বহু বৃক্ষ বিকশিত হইতে পারে। এক পরমাত্মা-বৃক্ষ হইতেই বহু জীবাত্মা-ফল বিকশিত হইয়াছে বহু জীবাত্মা-ফল হইতে বহু পরমাত্মারূপ বৃক্ষও প্রকাশিত হইতে পারেন।

'এক বৃক্ষ হইতে বহু ফল প্রকাশিত হয়। কিন্তু এক ফল হইতে একই বৃক্ষ বিকশিত হয়, বহু বৃক্ষ বিকশিত হয় না। এক পরমাত্মা হইতে বহু জীবাত্মা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এক জীবাত্মা হইতে বহু পরমাত্মা প্রকাশিত হন না।

'এক জীবাত্মাই জ্ঞানপ্রভাবে এক পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন। ঐ যে বীজটী দেখিতেছ, ঐ বীজটিই বৃক্ষ। আপাততঃ ঐ বীজকে বৃক্ষ দেখিতেছ না। ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিলে ঐ বীজকেই বৃক্ষ দেখিবে। আপাততঃ বীজ ব্যক্ত, বৃক্ষ অব্যক্ত। স্বরূপতঃ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত পরস্পর অভেদ। স্বরূপতঃ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহে। বীজ বৃক্ষ একই, বীজ বৃক্ষ অভেদ। বীজই অব্যক্ত বৃক্ষ, জীবাত্মাই অব্যক্ত পরমাত্মা।

'জীবাত্মাই পরমাত্মা। পরমাত্মাই জীবাত্মা। বীজই বৃক্ষ, বৃক্ষই বীজ।

'বীজ যখন, তখনও সেই বীজই বৃক্ষ। বৃক্ষ যখন, তখনও সেই বৃক্ষও

বীজ। জীবাত্মা যখন, তখনও সেই জীবাত্মা পরমাত্মা। পরমাত্মা যখন, তখনও সেই পরমাত্মাই জীবাত্মা।

'কখন পরমাত্মা জীবাত্মা হইয়া প্রকাশিত হন। কখন বা জীবাত্মা পরমাত্মা হইয়া প্রকাশিত হন।

'বৃক্ষ অব্যক্ত বীজ। বীজ অব্যক্ত বৃক্ষ, পরমাত্মা অব্যক্ত জীবাত্মা। জীবাত্মা অব্যক্ত পরমাত্মা। অতএব পরমাত্মাই জীবাত্মা, জীবাত্মাই পরমাত্মা।

'বৃক্ষ যেমন বৃহৎ, তদ্রূপ পরমাত্মাও বৃহৎ।

'বীজ যেমন ক্ষুদ্র, তদ্রূপ জীবাত্মাও ক্ষুদ্র। কিন্তু বীজ যেমন অব্যক্ত-বৃহৎ, তদ্রূপ জীবও অব্যক্ত বৃহৎ।

'সেই জীবই আত্মজ্ঞান প্রভাবে ব্যক্ত-বৃহৎ হইতে পারেন, যেরূপে অব্যক্ত-বৃহৎ বীজ ব্যক্ত-বৃহৎ বীজ ও বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে পারে, সেই প্রকারে।"

— শ্রীনিত্যগোপাল — নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা
৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা; পৃঃ ১০৫-৭

বীজ-বৃক্ষ-ফলের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ (Cause-effect relation) লইয়া শ্রীনিত্যগোপাল যে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন, এবং তাঁহারই অনুসরণ করিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ-এর, জীবাত্মা-পরমাত্মার যে সম্বন্ধতত্ত্ব নির্দ্ধারণের পথ সুগম করিয়াছেন, তাহা অভিনব, অভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমানযুগের বিজ্ঞানসম্মত। ইহাই আজ বর্ত্তমান যুগের সমস্যাসঙ্কুল মানুষকে পথপ্রদর্শকরূপে আগাইয়া নিয়া চলিবে। ধর্ম্মে-দর্শনে-বিজ্ঞানে-সমাজে-রাষ্ট্রে যে-সব পরস্পরবিরোধী-আদর্শবাদের আজ উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মীমাংসা কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ নির্ণয়ের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

কে আগে, কে পরে? বীজ না বৃক্ষ না ফল? বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ হইতে ফল হয়—ইহাও যেমন সত্য, আবার বৃক্ষ হইতে ফল হয়, ফল হইতে বীজ পাওয়া যায়—ইহাও তুল্যভাবেই সত্য; আবার ফল হইতে বীজ হয়, বীজ হইতে বৃক্ষ হয়—ইহাও কি সমভাবেই সত্য নয়? বীজকে 'আদি' ধরিলে যে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়, বৃক্ষ বা ফলকে ধরিলেও কি সেই একই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না? প্রত্যেককে কেন্দ্র করিয়াই বীজ-বৃক্ষ-ফলের তত্ত্ব-আস্বাদনের জন্য রওয়ানা হওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই পূর্ব্বে, প্রত্যেকেই পশ্চাৎ। অর্থাৎ বীজ-বৃক্ষ-ফল এমনই একটা সূত্রে সমন্বিত,

উহারা এমনই একটী-সমগ্রের মাঝে প্রত্যেকে স্বয়ংপূর্ণ ও স্বতন্ত্র থাকিয়া অপর দুইটীর সঙ্গে সমন্বিত যে, যে-যাহার দৃষ্টিকোণ হইতে প্রত্যেকের বিশিষ্ট বিশিষ্ট দেশ ও কালের (Space and time) মধ্যে ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, ও আস্বাদন করিতে পারে। এই সমগ্রের স্বরটীই হইতেছে 'Space-time-unity' (দিক্-কাল-সমন্বয়)। দেশ-কাল-সমন্বয়ের এই স্বর পরমার্থ সত্য বলিয়াই কোনও দেশে এবং কোন কালে যখন বীজ ব্যক্তাবস্থায় থাকে, তখনই বৃক্ষ-ফল তাহার মধ্যে থাকে অব্যক্তভাবে, আবার কোনও দেশে এবং কোনও কালে ফল যখন থাকে ব্যক্ত, তখন তাহারই মধ্যে বীজ বৃক্ষ থাকে অব্যক্ত। তবেই দেখা যাইতেছে যে বীজ-বৃক্ষ-ফল এমনই ভাবে ব্যক্ত-অব্যক্তের দোললীলায় দোল খাইয়া চলিয়াছে যে, কাহাকেও একান্তভাবে ব্যক্ত বা কাহাকেও একান্তভাবে অব্যক্ত বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার নাই। বীজ-বৃক্ষ-ফলের ব্যক্ত-অব্যক্তের অবস্থার সমন্বয়ের ভিতর যেমন বীজ-বৃক্ষ-ফল সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার প্রশ্নের সমাধান রহিয়াছে, এবং এই সিদ্ধান্তের ছাচে চলিলে সকল বিশ্বরহস্যই যেমন উদ্‌ঘাটিত হয়, ঠিক তেমনি জীবাত্মা-পরমাত্মা-বিশ্বের ভিতর সেই একই ব্যক্ত-অব্যক্তের সমন্বয় থাকার ফলে সর্ব্বমতবাদ আজ যে-যাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া একই রাসচক্রে মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। 'কার্য্যোপাধিঃ ভবেৎ জীবঃ কারণোপাধিঃ ঈশ্বরঃ।' কার্য্য-জীব ও কারণ-পরমাত্মা যখন পরস্পরকে সৃষ্টি করে এবং পরস্পরের বুক নিংড়াইয়া পরস্পর উদ্ভূত হয়, তখনই উভয়ের উপাধি বিগলিত হইয়া যায়, এবং তখনই উভয়ের ভিতর স্থাপিত হয় উপাধিবিধুর স্বাভাবিক সম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তি। এইস্থলে মনীষী Whitehead-এর 'It is as true to say that God creates the world, as that the world creates God'—এই লেখাটি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

'The question of causality has assumed a new aspect. We can no longer say that the past creates the present; past and present no longer have any objective meaning, since the four-dimensional continuum can no longer be sharply divided into past, present and future'—Physics and Philosophy.—'কার্য্যকারণ-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। অতীতই বর্ত্তমানকে সৃষ্টি করে—ইহা আর আমরা বলিতে পারি না। অতীত-

বর্ত্তমানের কোনও বস্তুতন্ত্র অর্থ আজ আর নাই, কেননা চতুষ্পাদ সন্ততির মাঝে অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের কোন পাকা-পোক্ত বিভাগ নাই!' অতীত বীজ বর্ত্তমান বৃক্ষকে সৃষ্টি করে, বর্ত্তমানের বৃক্ষ ভবিষ্যৎ ফল ও বীজকে সৃষ্টি করে, অতীত পরমাত্মা বর্ত্তমান জীবাত্মাকে সৃষ্টি করে, বর্ত্তমানের প্রতিটী জীবাত্মা হইতেও এক একটী পরমাত্মা ব্যক্ত হইতেছে বা সৃষ্ট হইতেছে—ইহা শ্রীনিত্য-গোপাল স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন। 'এক বৃক্ষ হইতে বহু ফল বিকশিত হইতে পারে। তদ্রূপ বহু ফল হইতেও বহু বৃক্ষ বিকশিত হইতে পারে! এক পরমাত্মা-বৃক্ষ হইতেই বহু জীবাত্মা-ফল বিকশিত হইয়াছে। বহু জীবাত্মা-ফল হইতে বহু পরমাত্মারূপ বৃক্ষ প্রকাশিত হইতে পারেন।' মনে পড়িতেছে পূর্ব্বে উদ্ধৃত হোয়াইটহেডের লেখা: 'It is as true to say that God is one and world many, as that the world is one and God many.'—'ভগবান এক, বিশ্ব বহু'—ইহা যেমন সত্য, তুল্যভাবেই ইহাও সত্য যে 'বিশ্ব এক এবং ভগবান বহু।'

কালগত কার্য্যকারণের পাকা শৃঙ্খলা পুরুষোত্তম জীবনে নাই। কিন্তু বুদ্ধি কারণ ও কার্য্যের একটা পাকাপাকি শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে ব্যস্ত। জীবনকে রসরূপ (flux) রাখিয়া কোনও ব্যবস্থা বুদ্ধি স্থাপন করিতে অক্ষম। অথচ জীবনের অভিজ্ঞতা পাকাপাকি কোনও কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার সাক্ষ্য দেয় না। কারণ অগ্রে, কার্য্য পরে—ইহা অভিজ্ঞতা সায় দেয় না। পিতা অগ্রে না পুত্র অগ্রে? কার্য্য কারণকে একটী সমগ্রের মধ্যে দেখিলে এবং সেই সমগ্রের মধ্যে একটী ভাগবত পরিকল্পনার (plan) খোঁজ পাইলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গিতে কার্য্য-কারণ দুইই অগ্রে বা পশ্চাতে থাকিতে পারিতেছে। সমগ্র জীবনের স্তরে পাকা পৌর্ব্বাপর্য্যস্থাপন অসম্ভব বা মারাত্মক। পিতা হওয়ার পূর্ব্বেই পুরুষ নিজ দেহ প্রাণ মনে পুত্র-স্বরূপের টের পায়—যাহারই নাম কাম। এই কামের প্রেরণায়ই না পুরুষ পিতা হইবার জন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে এবং স্বতঃসিদ্ধ পুত্রসত্তাকে তাহার গর্ভে আধান করে? তাহা হইলে কাহাকে 'পূর্ব্বে' বলিব? পুত্র বীজরূপে প্রথমে পুরুষ কারণে আছে, পরে স্ত্রীতে আহিত হইয়া পুত্র কার্য্যরূপে পরিণত হয়। পুত্ররূপ 'বীজ' অগ্রে, তাহার পরে সেই বীজই পিতা-মাতার দেহ চুয়াইয়া পুত্ররূপ ফলে দ্বিতীয়বার রূপ গ্রহণ করে। বিধির (Law & Order) অনুশাসন রক্ষায় নিযুক্ত যমদূত যেদিন কুক্রিয়াসক্ত অজামিলের সামনে

দাঁড়াইয়া গণিয়া-গণিয়া অজামিলের শাস্তির ব্যবস্থা দিতেছিল, সেদিন কারণ ও কার্য্যের, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের অবকাশসূত্র ধরিয়া যে-কৌশলে শ্রীনারায়ণ অবতরণ করিয়াছিলেন, এবং যে-কর্ম্মের যে-ফল বিধি-নির্দ্দিষ্ট ছিল, কর্ম্মের সেই ফল-উৎপাদনের পথ রোধ করিয়াছিলেন, ভাগবত তাহার চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন। আমাদের বিধি নির্দ্দিষ্ট ধরা-বাঁধা পথে কর্ম্মের ফল সব সময়ে ফলে না;—সাবিত্রীর ফলে নাই, কুব্জার ফলে নাই, বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গলের কর্ম্মের সহিত কর্ম্মফল মেলে নাই, জগাইমাধাইরও মেলে নাই; আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের মিলিতেছে না। নিয়তিবাদের (Determinism) ভবিষ্যদ্বাণী বর্ত্তমান পদার্থবিজ্ঞানে চলিতেছে না। পাশ্চাত্য মনীষী হাইসেনবার্গ পদার্থ-বিদ্যার ক্ষেত্রে Principle of Indeterminism প্রচার করিয়া পদার্থবিদ্যার এক নূতন গতিপথ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

কিন্তু প্রজ্ঞাবাদ যখন দর্শনে বিজ্ঞানে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, অর্থাৎ কণাবাদ (Quantum-theory) ও অনিশ্চয়তাবাদ (Priniple of Indeterminism) প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, 'The principle of Uniformity of nature that like causes produce like effects—had been accepted as a universal and undisputable fact of science'—'প্রকৃতির সমতাবাদ—সমজাতীয় কারণ সমজাতীয় কার্য্য উৎপাদন করে'—বিজ্ঞানের একটি বিশ্বজনীন ও অবিতর্ক্য তথ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।'

প্রাণবাদ যেখানে কার্য্যকারণের মধ্যে অনিশ্চয়তা এবং সম্ভাব্যতা (probability) স্থাপন করিতেছে, কার্য্যকারণের মাঝে কোনও পাকাপাকি যোগাযোগ স্থাপন করিতে সাহস করে নাই, অতিসাহসী প্রজ্ঞাবাদ সেখানে কার্য্য-কারণের মধ্যে একটি পাকাপাকি যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। 'This theory of a rigorous and universal Determinism was laid down particularly by Laplace in his *Essay on the Calculus of Probability*, in which that great geometrician wrote the words justly famous for the exactness of the idea, and the elegance with which it is conveyed: "An intelligence, knowing at a given instant all the forecs operating within nature, and the respective position of all the entities

of which it is composed, and further possessing the scope to analyse these data, could comprehend within one formula the motion of the greatest bodies within the Universe and of the least atom ; nothing would be indeterminate for it, and present and future alike would be present before its eyes.'—'কঠোরভাবে সঠিক এবং বিশ্বজনীন নিয়তিবাদের তত্ত্ব মনীষী ল্যাপলেস কর্ত্তৃক তাঁহার Essay on the Calculas of Probability গ্রন্থে বিশেষভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, যাহার মধ্যে এই মহৎ জ্যামিতিবিৎ এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, যাহা সঙ্গতভাবেই বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে তাহার আইডিয়ার নির্ভুলতা ও পরিচ্ছন্নতায়—যাহা ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে সব শক্তি কার্য্য করিতেছে তাহাদিগকে কোনও এক নির্দ্ধারিত (given) মুহূর্ত্তে যদি কোন বুদ্ধিমান অবগত হন, এবং যাহা দিয়া বিশ্বপ্রকৃতি গঠিত সেই সকল বস্তুর (entity) স্ব স্ব অবস্থানও জানেন, এবং যাহার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় সেই সব বিষয়গুলিকে (data) বিশ্লেষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগও পান, এমন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বের অন্তর্গত সাধারণ বস্তু সমূহের এবং ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণুর গতি-প্রকৃতিকে সাধারণ একটী সূত্রের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এই বুদ্ধির কাছে কিছুই অনিশ্চিত বলিয়া থাকিবে না : অতীত এবং ভবিষ্যৎ তুল্যভাবেই ইহার চোখে 'বর্ত্তমান' বলিয়া প্রতিভাত হইবে।'

নিয়তিবাদ অতীতকে ধরিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের একটী নিশ্চিত রূপ আঁকিবার দুঃসাহস রাখে, যাহার ফলে মানুষ একান্তভাবে নিয়তিবাদী হইয়া পড়ে। এই নিয়তির খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা নাই ; মানুষকে নিয়তির মার খাইতেই হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে দার্শনিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেও ইহা অচল, কোনও একটী অতিরিক্ত শক্তি (Something extra) যেন কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মের বিধিনির্দ্দিষ্ট ফলের নিশ্চয়তাকে মুছিয়া ফেলে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে অজামিলের ক্ষেত্রে তাহার বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফল ফলে নাই, সাবিত্রীর ক্ষেত্রে ফলে নাই। ইহাকেই উক্ত দার্শনিকগণ 'করুণা' শব্দ দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন।

'করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়া
কোথা নিয়া যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া
এনেছ তোমারি দুয়ারে।'

করুণা মানুষের বুদ্ধির জানা-শুনা পথ ধরিয়া আসে না, অথচ আসে যে, ইহা তো সহস্র সহস্র অভিজ্ঞতার ফলে অস্বীকার করিবার যো নাই। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে চাহিলেও এই অনিশ্চয়তাবাদের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলিবে।

কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ 'সরল রেখার' সম্বন্ধ নয়। উভয়ের মধ্যে বিরাট এক ফাঁক রহিয়াছে বলিয়া 'কারণ' (cause) হইতে ধরা-বাঁধা নিয়মে কার্য্য (effect) প্রকাশিত হয় না, কর্ম্ম হইতে ধরা-বাঁধা নিয়মে কর্ম্মফল বিকশিত হয় না। কারণ ও কার্য্য গুণগত, আকারগত কতই যে পৃথক্, তাহা বুঝাইতে গিয়া শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন: 'পলতালতা হইতে পটলোৎপত্তির বিবরণ আছে, তাহা দর্শন করা হয়। পলতাব বিকাশ পটল। অথচ পলতালতার যে প্রকার আকার, পটলের সেই প্রকার আকার নহে। পলতার যে তিক্ততা গুণ আছে, তাহাও পটলের নাই। রূপগুণে পটল পলতার ন্যায় নহে, অথচ স্বরূপতঃ উভয়েই এক বস্তু। জীব ব্রহ্ম স্বরূপতঃ ঐ প্রকারে অভেদ।'—নিত্যধর্ম্ম, ৩য় বর্ষ, পৃঃ ২০৮।

বীজ, বৃক্ষ ও ফল, পলতা ও পটল রূপরসের ক্ষেত্রে কত পৃথক্! অথচ ইহারা স্বরূপতঃ একই তো বটে। বীজের আকার বৃক্ষের নয়, বৃক্ষের আকার ফলের নয়! বীজের গুণ-কর্ম্ম বৃক্ষের নয়, বৃক্ষের গুণ-কর্ম্ম ফলের নয়। পরিণামের প্রতিটী স্তরে ইহাদের গুণগত কত পার্থক্য! ইহারা একান্ত সদৃশও নয়, একান্ত বিসদৃশও নয়। অথচ কারণে ইহারা এক। সর্ব্বকারণ-কারণ বাস্তব ব্রহ্মবস্তু (Reality) হইতেই এই জীবজগৎ উৎপন্ন। অথচ ইহারা কত পৃথক! এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া একদল দার্শনিক অনির্ব্বচনীয়তাবাদের আশ্রয় নিয়াছেন। তাঁহারা 'Like causes produce like effects'-নীতির উপাসক। তবে তো অনাম অরূপ ব্রহ্ম-কারণ হইতে উৎপন্ন বিশ্বের অন্তর্গত যাবতীয় বস্তুরও উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী অনাম অরূপ হওয়া সঙ্গত। কিন্তু বিশ্বের সব কিছুই তো নাম-রূপাত্মক, পরিণামী। কাজেই এই সব কার্য্য ব্রহ্ম-কারণ হইতে উৎপন্ন নয়; তাই

ইহাদের উৎপত্তির জন্য তখন আর একটী মায়া-উপাধির (condition) প্রয়োজন হইল। এই মায়া-উপাধি ব্রহ্মের আছেও বটে, নাইও বটে; অর্থাৎ সদসদাত্মিকা। অনির্ব্বচনীয়া মায়াকে বুদ্ধির দিক হইতে স্বীকারও করা যায় না, অস্বীকারও করা যায় না।

শ্রীনিত্যগোপাল প্রত্যক্ষ এই বিশ্বের সহজ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাহির হইতে কোনও অনির্ব্বচনীয় কিছু আমদানী করিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে বা তাহা হইতে উৎপন্ন বিশ্বের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া বিশ্বকে এবং তাহার জননী পরাশক্তিকে স্বরূপতঃ অস্বীকার করিবার আত্মঘাতী নীতির আশ্রয় নিবার প্রয়োজনই নাই। সেইজন্য তিনি সর্ব্বপ্রশ্নের মূলীভূত অবিদ্যা-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা দিয়া উহারও 'নিত্যসত্যতা' স্বীকার করিয়াছেন। এই সহজ প্রাণদর্শন বিশ্বে একমাত্র দুঃসাহসী শ্রীনিত্যগোপালই দিয়া গিয়াছেন।

পরমাত্মার ভিতরে অব্যক্তভাবে স্থিত নাম-রূপ হইতে সৃষ্টি-প্রণালীর ভিতর দিয়া সহজভাবে ভিন্ন ভিন্ন রসযুক্ত নামরূপের ব্যক্তি হইয়াছে, যেমন বীজের অন্তর্গত অব্যক্ত বৃক্ষ হইতে ব্যক্ত বৃক্ষ হইয়াছে এবং ব্যক্ত বৃক্ষের অন্তরে অন্তরে লুক্কায়িত অব্যক্ত ফল হইতে ব্যক্ত বৃক্ষ হইয়াছে। ব্যক্ত-অব্যক্তের এই সম্বন্ধটুকু (relation) ধরিতে না পারিলে বীজ-বৃক্ষ-ফলের সম্বন্ধ হয় যান্ত্রিক। তখন ব্যক্ত-বীজের মধ্যে যাহা নাই, তাহা ব্যক্ত-বৃক্ষে দেখিলে অবশ্যই বলিব যে, ব্যক্ত-বৃক্ষের নাম রূপ যখন ব্যক্ত-বীজে নাই, তখন উহা নিশ্চয়ই মিথ্যা। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের এবং জীবজগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ জীবনগত (organic) বলিয়া বুঝিয়াছে। যান্ত্রিক বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক দর্শনের মূল রহিয়াছে নিউটনীয় যুগের classical Physics-এ।...'While the older Mechanics claimed to apply exact and inexorable laws to every phenomenon, the new physics only gives us laws of probability, and though these can be expressed in exact formulae, they still remain laws of probability. Thus in every physical phenomenon there remain a margin of uncertainty.'—Matter & Light by Broglie. P246.—'যখন পুরাতন বলবিজ্ঞান প্রতিটী ঘটনার সম্বন্ধে সঠিক ও নির্ম্মম বিধি প্রয়োগ করে, নবীন পদার্থবিদ্যা আমাদিগকে সম্ভাব্যতার বিধিই প্রদান করে, এবং যদিও এইগুলিকে সাধারণ সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে, তথাপি ইহারা সম্ভাব্যতার বিধি বজায় রাখিয়া চলে।

প্রত্যেকটী জড়ীয় ঘটনার মধ্যে অনিশ্চয়তার একটু ভেদ-রেখা (margin) থাকিয়াই যায়।' অতীত-কারণ হইতে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ কার্য্যের এই ভেদ-রেখা বিশ্বময় অনুস্যূত আছে বলিয়াই বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ হইতে ফল হয়, বীজের ভিতর নিরাকার-বৃক্ষ হয়, আবার আকার-বৃক্ষের মধ্যে নিরাকার ফল থাকা সম্ভব হয়, আবার ফলের মধ্যে নিরাকার বৃক্ষ ও বীজ থাকে। এই ভাবে বীজ অনিশ্চয়তার ভেদ-রেখা পরিপাক করিয়া বৃক্ষে পরিণত হয় এবং বৃক্ষও অনিশ্চয়তার ভেদ-রেখা বুকে লইয়া ফল হয়। অতীত দর্শনশাস্ত্রে যে ব্রহ্ম ছিলেন একান্ত অনাম-অরূপ, একান্ত নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়, তিনিই বর্ত্তমান যুগে নিত্যগোপাল-দর্শনে এই অনিশ্চয়তার ভেদ-রেখা অঙ্গে মাখিয়া সগুণ-সক্রিয় হইলেন, নাম-রূপবান বিশ্বরূপে গড়িয়া উঠিলেন। ব্রহ্ম এই অনিশ্চয়তার বরণ গায়ে মাখিয়াই যেন একান্ত-বিসদৃশ জগৎরূপে পরিণত হইলেন।

ব্রহ্মকারণেরই হুবহু ছবি হইবে এই বিশ্ব, তাহা মনে করিবার কোন যুক্তিযুক্ত অধিকার বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান বা দর্শন দেয় না। এইভাবে অদ্বৈতবাদীদের ব্যবহারিক (Phenomenal world) ও পারমার্থিক ব্রহ্মের সীমারেখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, গলিয়া গিয়াছে। পারমার্থিক ব্রহ্মবস্তু (Reality) যখন জগৎরূপে পরিণত হন, তখন ব্রহ্ম হইতে কত বিসদৃশই না তাহা বস্তুতঃ হয়। বিশ্ব ও ব্রহ্মবস্তু একই পুরুষোত্তম জীবনের দুইটী অভেদ-প্রভেদযুক্ত বিকাশ মাত্র। এই জগতে একান্ত নিয়তিবাদ নাই। 'There is an *apparent* Determinism in macroscopic phenomena, which in no way conflicts with a certain indeterminateness even in phenomena on the microscopic scale', —Matter & Light—P. 247. 'বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আপাতপ্রতীয়মান একটী নিয়তিবাদ রহিয়াছে, যাহা কোনও রকমেই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনা সমূহের মধ্যস্থ কিছুপরিমাণ অনিশ্চয়তার সঙ্গে বিরুদ্ধ হয় না।' ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তার এই পার্থক্য শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়াই যায়। যাহারা ভগবদ্ভক্ত, বিশ্বসংগঠনের সঙ্গে যাহারা কায়মনোবাক্যে যুক্ত, তাহাদের জীবনে প্রারব্ধও এই ভাবে গলিয়া যায় অর্থাৎ অতীত কর্ম্মের যে অংশ প্রারব্ধরূপে বিদ্যমান, তাহা পর্য্যন্ত বদলাইয়া যায়। তাই শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন, 'ভক্তিতে প্রারব্ধ কাটে'। ব্রজগোপীদের প্রারব্ধ কাটিয়াছিল। যাহারা ভক্তিমান, তাহাদের উপর বিশ্বের অন্তর্নিহিত এই 'অনিশ্চয়তা'-রূপিনী মহাশক্তির অযাচিত করুণা অহর্নিশ বর্ষিত হয়। এইখানে দাঁড়াইয়াই প্রহ্লাদ আগুনে পুড়িলেন না, হস্তীর পদতলে নিষ্পে-

বিত হইলেন না, বিষপানে মরিলেন না। তখনই বিশ্ব ধরা-বাঁধা নিয়তির শক্ত নিগড় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মুক্তের বেশে ভক্তকে অমৃত পান করান। ইহা এতদিন মিস্টিসিজমই ছিল; আজ ইহাই বিজ্ঞানের আওতায় আসিয়া পড়িয়াছে। 'এদেশে ওদেশে বস্তুত অন্তর কহয়ে সকল লোকে। এদেশে ওদেশে, মেশামিশি আছে একথা কয়ো না কাকে'। এ দেশ ওদেশ, পারমার্থিক ব্রহ্ম ও ব্যবহারিক ইহলোক আজ নিরন্তর মেশামিশি করিয়া রহিয়াছে!—ইহাই বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান ও দর্শন তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে।

নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় হইতে সগুণ-সক্রিয়ের প্রকাশ শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে সহজ বুদ্ধির গোচর, অনাম-অরূপ হইতে নামরূপের প্রকাশের ব্যাখ্যার জন্য বাহির হইতে অবিদ্যাকে আমদানী করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীনিত্যগোপাল মতে 'ব্রহ্ম যখন নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকেন, তখনও তাহাতে অব্যক্তভাবে ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি থাকে; ব্রহ্ম যেমন নিত্য সত্য, তদ্রূপ তাহাতে যে ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি আছে, তাহারাও নিত্য, ব্রহ্ম যেমন সত্য, তাহারাও সত্য।'—সিদ্ধান্ত দর্শন, পৃঃ ১৯। শ্রীনিত্যগোপাল 'অবিদ্যা' সম্বন্ধে লিখিতেছেন: "শ্রুতিমতে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে বলিয়া অনাত্মা অবিদ্যাকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। কারণ অনাত্মা অবিদ্যাও সর্ব্বের অন্তর্গত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে অনাত্মা অবিদ্যারও নিত্য সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে সেই অনাত্মা অবিদ্যাও ব্রহ্ম বলিয়া সেই অনাত্মা অবিদ্যাকেও হেয় বলিতে পার না। ঐ শ্রৌত বচনে ব্রহ্মই এই সমস্ত বা সর্ব্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্ম কেবল অদ্বৈত নহেন। ব্রহ্ম এক এবং বহু উভয়ই বটেন।"—নিত্যধর্ম্মপত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৭৭। এইভাবে অজড় ব্রহ্ম হইতে জড়ের প্রকাশ সহজভাবেই সিদ্ধ হইতেছে। কষ্ট কল্পনা করিয়া অপর একটি শক্তিকে ব্রহ্মের স্কন্ধে চালাইবার প্রয়োজন নাই। অজড় হইতে জড়ের প্রকাশ, নির্ব্বিকার হইতে বিকারশীল জগতের প্রকাশ ব্রহ্মের সহজ বিধানেই যুক্তিযুক্ত হইতেছে।

'We may picture the world of reality as a deep-flowing stream; the world of appearance is its surface, below which we cannot see. Events deep down in the stream throw up bubbles and eddies on to the surface of the stream. These are the transfers of energy and radiation of our common life, which affect our senses and so activate our minds;

below these lie deep waters which we can only know by inference. These bubbles and eddies show atomicity, but we know of no corresponding atomicity in the currents below.

This dualism of appearance and reality pervades the history of philosophy, again dating back to Plato. In a famous parable, Plato depicts mankind as chained in a cave in such a way that they can look only on the wall which forms the back of the cave ; they cannot see the busy life outside, but only the shadows—the appearances—which objects moving in the sunshine cast on the walls of the cave. For the captives in the cave, the shadows constitute the whole world of appearance—the phenomenal world—while the world of reality lies for ever beyond there ken.

Our phenomenal world consists of the activities of matter and photons ; the theatre of this activity is space and time. Thus the walls of the cave in which we are imprisoned are space & time ; the showdows of reality which we see projected on the walls by the sunshine outside are the material particles which we see moving against a background of space and time, while the reality outside the cave which produces these shadows, is outside space and time.

Many philosophers have regarded the world of apperance as a kind of illusion. some sort of creation or selection of our minds which had in some way less existence in its own right than the underlying world of reality. Modern physics does not confirm this view ; the phenomena are seen to be just as much a part of the real world as the causes, which produce them, being simply those parts of the real world which affect our senses, while the space and time in which they occur have the same sort of reality as the substratum which orders their motions. The walls of the cave and the shadows are just as real as the objects outside in the sunshine.

As the new physics has shown, all earlier systems of physics from the Newtonian mechanics down to the old quantum theory, fell into the error of identifying appearance with reality ; they confined their attention to the walls of the cave, without even being conscious of a deeper reality beyond. The new quantum theory has shown that we must probe the deeper substratum of reality before we can understand the world of appearance, even to the extent of predicting the results of experiment.

For whatever may happen in reality, there is no reason why the shadows on the wall should change in accordance with a causal law. There will be many different arrangements of the figures out in the sunshine which all produce the same arrangement of shadows on the wall ; these many arrangements will be followed by new arrangements which will not only be different in themselves but are likely to produce different shadows on the wall. It is the same with the happenings in the world of appearance ; experiments that are precisely identical so far as the phenomena go may produce entirely different results. In this way causality disappears from the world of phenomena. —Physics and Philosophy by J. Jeans. P. 193—194.

—'আমরা এই বাস্তবের দেশকে একটি গভীর-প্রবাহিনী নদী বলিয়া অঙ্কিত করিতে পারি। এই আভাস-জগৎ ইহার উপরিভাগ, যাহার তলা আমরা দেখিতে পারি না। এই নদীর গভীরে অবস্থিত ঘটনাসমূহ (events) নদীর উপরিভাগে বুদ্বুদ ও আবর্ত্ত নিক্ষেপ করে। ইহাই সাধারণ জীবনে আলোক-বিকীরণ ও শক্তির স্থানান্তরী করণ ; এবং ইহারাই আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং আমাদের মনকে কার্য্যে উৎসাহিত করে। ইহাদের তলদেশে রহিয়াছে গভীর জলরাশি যাহা আমরা শুধু অনুমান দ্বারাই অবগত হইতে পারি। এই বুদ্বুদ ও আবর্ত্তই পরমাণুর খেলা দেখায়। কিন্তু আমরা তদনুরূপ কোন পরমাণুর খেলাই তলদেশের স্রোতের মধ্যে দেখিনা।

'এই আভাস-জগৎ ও বাস্তব বস্তুর এই দ্বৈত-ধর্ম্ম অতীতের প্লেটো হইতে দর্শনের ইতিহাসে ছড়াইয়া রহিয়াছে। একটি প্রসিদ্ধ নীতিকথার সাহায্যে প্লেটো মানবজাতিকে চিত্রিত করিয়াছেন একটি গুহার মধ্যে এমনভাবে

শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিয়া যে, তাহারা শুধু দেওয়ালের দিকেই তাকাইতে পারে, যে দেওয়াল হইতেছে ঐ গুহার পিঠ। তাহারা বাহিরের কর্ম্মব্যস্ত জীবনকে দেখিতে পারে না; তাহারা শুধু সেই ছায়াগুলিই—আভাসগুলি দেখিতে পারে, যাহাদিগকে বাহিরের সূর্য্যালোকে চলমান বস্তুসমূহ গুহার দেওয়ালের উপরে নিক্ষেপ করে। গুহাস্থিত এই বন্দীদের কাছে সমস্ত জগৎ বলিতে এই ছায়াগুলিই বুঝায়—পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এই জগৎই বুঝায়। বাস্তব জগৎ কিন্তু চিরকালের জন্য রহিয়াছে তাহাদের জ্ঞানের বহির্ভূত।

'আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এই জগৎ জড় এবং আলোককণার সক্রিয়তা দ্বারা গঠিত; এই সক্রিয়তার রঙ্গমঞ্চ হইতেছে এই দেশ এবং এই কাল। এই ভাবে গুহার যে প্রাচীরের মধ্যে আমরা বন্দী হইয়া আছি, তাহা হইতেছে দেশ ও কাল। বাস্তবের যে ছায়া আমরা বাহিরের সূর্য্যকিরণ দ্বারা প্রাচীরের উপর বিক্ষিপ্ত দেখিয়া থাকি, তাহাই হইতেছে জড়ীয় এই অণুগুলি। এই অণুগুলিকেই আমরা দেশকালের পটভূমিকায় চলমান দেখি। কিন্তু গুহার বাহিরের যে-বাস্তব এই সব ছায়া সৃষ্টি করে তাহা রহিয়াছে দেশকালের বাহিরে।

'বহু দার্শনিক পরিদৃশ্যমান এই জগৎকে একরূপ মায়া-মরীচিকা, আমাদের মনেরই কোনরূপ সৃষ্টি কিম্বা নির্ব্বাচিত কিছু বলিয়া মনে করেন। ইহারা ইহাদেরই অন্তর্নিহিত বাস্তব জগতের তুলনায় নিজস্ব অধিকার বলেই সত্তাংশে কোনও না কোনরূপে স্বল্প মূল্যবান। আধুনিক পদার্থবিদ্যা কিন্তু এই মতবাদ অনুমোদন করে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সকল (phenomena) বাস্তব বিশ্বের ততখানিই অংশ, যতখানি হইতেছে সেই কারণ সমূহ যাহা ইহাদিগকে সৃষ্টি করে। তফাৎ শুধু এই যে, এই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সকল আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পক্ষান্তরে যে দেশ-কালের মধ্যে ইহাদের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই দেশ-কাল সেই রকমেরই বাস্তব, যে রকমের বাস্তব হইতেছে সেই ভিত্তিভূমি যাহারা ইহাদের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। গুহার প্রাচীর এবং ছায়াসমূহ ঠিক ততখানিই বাস্তব, যতখানি বাস্তব হইতেছে বহিঃস্থ সূর্য্যকিরণ-মধ্যস্থ বাস্তব বস্তু-সমূহ।

'নূতন পদার্থবিদ্যা যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহ যে, নিউটনের বলবিদ্যা হইতে পুরাতন কোয়ান্টাম থিওরি পর্য্যন্ত পদার্থবিদ্যার পূর্ব্বেতর সর্ব্ববিধ প্রণালী সমূহ আভাস-জগৎকেই বাস্তব বলিয়া মনে করিবার

ভুলে পতিত হইয়াছে। তাহারা এই আভাস-জগতের ওপারে অবস্থিত গভীরতর বাস্তবের সম্বন্ধে মোটেই সচেতন না হইয়া উহার প্রাচীরের উপরই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে। নূতন কোয়াণ্টাম থিওরি দেখাইয়াছে যে, এই আভাস-জগৎকে বুঝিবার পুর্ব্বে আমরা নিশ্চয়ই বাস্তবের গভীরতর স্তর এমন ভাবে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া বাহির করিব, যাহাতে এই পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পর্য্যন্ত করা সম্ভব হয়।

'কেননা বাস্তবের দেশে যাহাই সংঘটিত হউক না কেন, কার্য্য-কারণ বিধি অনুযায়ী প্রাচীরের উপরকার ছায়ারও তদনুরূপ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইবে, ইহার কোনও কারণ নাই। বাহিরের সূর্য্যকিরণের বুকে আকারগত ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস প্রকাশিত হইবে, যাহারা প্রত্যেকে দেওয়ালের উপর একই রকমের ছায়ার বিন্যাস উৎপাদন করিবে। এই সব বিভিন্ন বিন্যাসগুলিকে অনুসরণ করিবে নূতন নূতন বিন্যাস সমূহ, যাহারা শুধু যে পরস্পরের মাঝেই ভিন্ন হইবে তাহাই নয়, পরন্তু প্রাচীরগাত্রে খুব সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন ছায়াও উৎপাদন করিবে। প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান এই জগতের ঘটনা সমূহের সম্বন্ধেও ইহা এইরূপই। ঘটনা সম্বন্ধে যে-সব পরীক্ষা স্পষ্টতঃই একজাতীয়, তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ফলই উৎপাদন করিতে পারে। এই ভাবে কার্য্য-কারণ-বিধি ঘটনাময় এই জগৎ হইতে অন্তর্হিতই হইতেছে।'

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, Reality (বাস্তব ব্রহ্মবস্তু), দেশকালের উপর পতিত তাহার ছায়া এবং প্রাচীর স্বরূপ দেশ-কাল একই Reality-র বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। গুহার প্রাচীর-রূপ দেশকাল যেমন বাস্তব সত্য, তাহাদের উপর পতিত ছায়াও তদ্রূপ বাস্তব সত্য। ইহাও উপলব্ধ হইবে যে, বিশ্বের ঘটনাসমূহ যেমন Reality-র অংশ, যে-কারণ এই ঘটনাসমূহ সৃষ্টি করে, তাহাও সেই Reality-রই অংশ। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, Reality-র মধ্যে যত প্রকারের আকারগত বিন্যাস ফুটিয়া উঠুক না কেন, তাহারা ঘটনাজগতে একই রকমের ছায়া সৃষ্টি করিতে পারে, এবং বাস্তবের দেশের এই ভিন্ন ভিন্ন আকার-বিন্যাসকে আশ্রয় করিয়া যে বিভিন্ন নূতন নূতন আকার-বিন্যাস প্রকটিত হইতে পারে, তাহারা একান্ত বিভিন্ন হইতে পারে এবং ইহারা প্রাচীরের উপর একান্ত-বিভিন্ন ছায়াও সৃষ্টি করিতে পারে। পুরুষোত্তমলোকের মধ্যে গোলোক-বৈকুণ্ঠ-শিবলোক-কালী-কৈবল্যধাম প্রভৃতি কত ভিন্ন ভিন্ন আকারের-বিন্যাস ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা

হইতে আবার কত নিত্য নব নব লোকের প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু ইহারা সকলেই দেশ-কাল প্রাচীরের উপর একই ফল সৃষ্টি করিতেছে। সাধনার ভাষায় বলিলে বলা যায় যে, ইহারা সকলেই একই মুক্তিফল প্রদান করিতেছে। বহু লোক হইতে যেমন এক ফল প্রকাশিত হয়, বহু লোক হইতে বহু ফলও তেমনি আস্বাদিত হয়। কোনও লোকের উপাসনায় মিলে কর্ম্ম, কোনও লোকের উপাসনায় জ্ঞান, কাহারও উপাসনায় ভক্তি। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, Reality-রূপ কারণ হইতে এক কার্য্য, বিভিন্ন কার্য্য প্রকাশিত হইতে পারে এবং তাহারা বাস্তব হইতে ভিন্ন হইতে পারে। আলকাতরা দেখিতেও যেমন, গন্ধও তাহার তেমনি। কিন্তু সেই আলকাতরা হইতে যখন সুগন্ধ দ্রব্য, সুমিষ্ট চিনি প্রভৃতি নিষ্কাসিত করা হয়, তখন কারণ-আলকাতরা হইতে সুগন্ধ সুমিষ্ট কার্য্য কত পৃথক্ ভাবিলে বিস্ময় লাগে। ইহা চোখে না দেখিলে কি কেহ বিশ্বাস করিত? ব্রহ্ম-কারণ হইতেও তেমনি স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়-ভেদযুক্ত অনন্ত কার্য্য অহরহ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেই সব ভেদকে উপাধির খেলা বলিয়া 'ন স্যাৎ' করিয়া দিবার দুঃসাহস আজ আর কাহারও নাই। আলকাতরা-রূপ বাস্তব বস্তুর বুকে কত বিচিত্র বিচিত্র আকারের বিন্যাস ফুটিয়া উঠে, সেই বিন্যাস আবার পরস্পরবিরুদ্ধ কত বিন্যাসই না সৃষ্টি করে, এবং সেই সব বিন্যাস হইতে কত ভিন্ন প্রকারের রূপ, গন্ধই না আজ বিজ্ঞান সৃষ্টি করিতেছে! ইহা এক হিসাবে সত্যই আশ্চর্য্য, 'মায়া'। কিন্তু ইহার সঙ্গে মূলকারণ আলকাতরার স্বরূপগত যোগ রহিয়াছে—শুধু উপাধিগত নয়—বলিয়াই এই মায়া প্রাণধর্ম্মী দার্শনিকদের কাছে 'যোগমায়া' বলিয়া পুজিতা। যান্ত্রিক দর্শনে যিনি মায়া, অনির্ব্বচনীয়া বলিয়া বুদ্ধির অগম্যা, তিনিই জীবনের ক্ষেত্রে রূপায়িত হন যোগমায়ারূপে, পুরুষোত্তমার্পিতা বুদ্ধির গম্যা রূপে।

পুরুষোত্তমদর্শনে ব্রহ্মবস্তু, মায়া, উপাধি, জীবজগৎ সব একেরই বিভিন্ন প্রকাশ ও আস্বাদন। শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ব্রহ্ম তাই অনন্ত ব্যক্তিসম্পন্ন পরম অব্যক্ত। অব্যক্তের এই অনন্ত ব্যক্তি-বিন্যাসের ইয়ত্তা কে করিবে? ইহাকে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার ভিতরে আনিবার কাহার দুঃসাহস আছে? তবে আপাত-প্রতীয়মান একটা কার্য্যকারণ ব্যবস্থা না থাকিলে মানুষের চিন্তাধারা দানা বাঁধিতে পারে না, তাই একটা কার্যকারণ-ব্যবস্থা স্বীকার করা হইলেও উহা 'সম্ভব' (probable) ছাড়া আর কিছুই নয়। জেম্স্ জিনস্ সত্যই লিখিয়াছেন:

'In practicle affairs all life is a compromise, and most things reside in precisely the middle region which the law attempts to abolish.'—Physics and Philosophy. P.95—'ব্যবহারিক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যেক জীবনই আপোষ-মীমাংসার জীবন। প্রায় সব বস্তুই স্পষ্টতঃ মধ্যম প্রদেশে বাস করে, যাহাকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য 'নির্ম্মধ্যম নীতি' প্রাণপণ প্রচেষ্টা করে।' একান্ত অক্ষর ব্রহ্ম ও একান্ত ক্ষর সর্ব্বভূতের 'মাঝখান'টুকুকে নির্ম্মধ্যম মুছিয়া ফেলিবার জন্য কৃতসংকল্প; তাই ব্রহ্মের সঙ্গে অযৌক্তিক একটী উপাধির যোগ বিধান করিয়া উপাধিময় এই জগতের ব্যাখ্যা সে করিয়াছে। কিন্তু আজ নির্ম্মধ্যম নীতি অচল হইয়া পড়ায় ক্ষর-অক্ষরের মধ্যস্থলে থাকিয়া অনিশ্চয়তাবাদ দুইয়ের সমন্বয় বিধান করিতেছে। অনিশ্চয়তা, অনির্ব্বচনীয়তাও ব্রহ্মেরই স্বরূপগত ধর্ম্ম। ইহার সঙ্গে ব্রহ্মের পরকীয় সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়াই ব্রহ্ম হইতে অনন্ত ভেদযুক্ত বিশ্বের সহজভাবেই প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে। পুরুষোত্তমদর্শনে 'উপাধি' যোগায় 'রস', যাহার ভিতর ব্রহ্ম-মায়ার অন্যোন্য-মিলনের আস্বাদন ঘন হইয়া উঠে। পুরুষোত্তম জীবনে কেমন করিয়া ব্রহ্ম, মায়া ও উপাধি একই রস-সম্বন্ধে গলিয়া এক হইয়াছে, তাহা মৎপ্রণীত ঈশোপনিষদের অবধূত ভাষ্য আলোচনা করিলে পরিষ্কার হইবে। শ্রীনিত্যগোপাল এই মহাসমন্বয়তত্ত্ব প্রচার করিয়াই বিশ্বে অদ্বিতীয় দার্শনিক। সর্ব্বদর্শনসমন্বিত এত বড় বৈপ্লবিক দর্শন এই বিশ্বে, এই ভারতবর্ষে এমন স্পষ্ট ভাবে এ যাবৎ কেহ জীবনে আচরণ করিয়া প্রচার করিয়া যান নাই। তিনি তাই সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম; তাঁহারই শ্রীচরণতলে বিশ্ব আজ বারবার সকল দেহ প্রাণমন লইয়া লুণ্ঠিত হইতেছে।

বন্দেমাতরম্

নাল্পে সুখমস্তি

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

অল্পে মোদের তৃপ্তি নাই গো, তৃপ্তি নাই,—
অপরিমেয়ের দরশ এবং পরশ চাই।
টিলা টিপি নয়, চাই হিমালয় আমরা গো,
অন্ত-বিহীন ওই নীলাকাশ সমগ্র,
করি মহাকাল মহাসাগরের বন্দনাই।

২

অল্পে আমরা পাইনাকো সুখ, মেটেনা আশ,
বিশাল, বিপুল, বিরাট গড়িতে পাই প্রয়াস।
গড়ি অজন্তা, ইলোরা, আমরা কাটি ভূধর,
গড়ি কনারক, মাদুরা, এবং 'বড়বুদর'
অফুরন্তের পাই ইঙ্গিত, দিই আভাষ।

৩

কষ্টকে মোরা দুঃখকে মোরা করিনে ভয়,
সেই বিষ চাই যাতে অমৃতের কণিকা রয়।
সে যুদ্ধ চাই যাহাতে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
সারথি যাহাতে নিজে শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর,
গীতার উদয়, ধর্ম্মের যাতে অভ্যুদয়।

৪

অল্পে তুষ্ট নহি কো, চাহিনা ক্ষুদ্র সুখ,
ভূমানন্দের পরশন শুধু চায় এ বুক।
যে সুখ অশোক, অবসাদ নাই অন্তে যার,
উন্নত করা, বিশুদ্ধ করা ধর্ম্ম যার—
যে সুখ পরমানন্দ-সঙ্গ সমুৎসুক।

৫

ফিরিতেছি পরিপূর্ণতার যে সন্ধানে
রত অপরূপ রাস মণ্ডল নির্ম্মাণে।
　　বিচিত্র তার অন্ত নাই সে রূপ ধারায়—
　　বিশ্বরূপেতে গিয়া শেষে মেশে রূপ হারায়,
সামান্যে তার তিয়াসা মিটেনা মন জানে।

৬

মোদের লেখনী, ছেনী, তুলি প্রতি রেখায় রে
ভূমার কথাই স্মরায় এবং দেখায় রে।
　　ঋতুগণ কয় তাদের দানের প্রাচুর্য্যে,
　　সঙ্গীত কয় তাহার সুরের মাধুর্য্যে,—
সাধকেরা তাহা কৃচ্ছ্র সাধনে শেখায় রে।

৭

করি সুরভির বাহন মলয় পবনকে,
বদ্ধ কুসুম মুক্তির পথ দেয় এঁকে।
　　মাটির প্রদীপ তাহার শিখাও তুচ্ছ নয়,
　　জানায় তাহার সঙ্গে যুক্ত জ্যোতির্ম্ময়,
এক করে দেয় ভুবন এবং ভবনকে।

৮

প্রার্থনা নীড় বাঁধেনা কেবল, ছুটতে চায়,
সে শুধু উধাও অসীম উর্দ্ধে উঠ্‌তে চায়।
　　চায়নাকো সে যে ধরার দেওয়া ও পক্ষ ক্ষীণ,
　　গরুড় পাখীর পাখা পেতে কাঁদে রাত্রি দিন,
সে যে স্বরগের অমৃত ভাণ্ড লুট্‌তে ধায়।

শিক্ষা ও সাঙ্গীতিক পরিবেশ

অনিলরঞ্জন গুহ

গান-বাজনা ভালবাসেনা এমন লোক খুব কম ; বোধ হয় একটিও নাই। এই সার্বজনীন ভালবাসার ফলে মানুষ যেখানেই যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সঙ্গীতকেও কোন রকমে সে পুষিয়া রাখিয়াছে। মনুষ্য সমাজের বহু পরিবর্ত্তন ও অগ্রগতির সাথে সাথে গান-বাজনারও বহু স্রোত, বহু আবর্ত্ত দেখা দিয়াছে। বহু স্রোত, বহু আবর্ত্ত লইয়া বিপুল বেগে সঙ্গীতের ধারা অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। মানুষের জীবন ধারণের জন্য অনেক জিনিষের দরকার। সুস্থ দেহ সংগঠনের জন্য যেমন অন্নবস্ত্র, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট প্রভৃতি বহু বাস্তব উপাদানের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি আবার সুস্থ মনের সংগঠনের জন্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টির, রূপসজ্জার, সুখ কল্পনার বহু বিমূর্ত্ত (abstract) উপাদান আবশ্যক। তাই শস্যক্ষেত, কলকারখানা ইত্যাদি লইয়া যেমন আমাদের পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি আবার চোখের সামনে একটু ফুলের বাগান, ঘরের দেওয়ালে দুই একটি ছবি, টেবিলক্লথের কোণে ফুল-তোলা, নক্‌সা করা, গল্প উপন্যাস সাহিত্য রচনা, নানাসুরের গান বাজনা, প্রভৃতি লইয়া আর একটি পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই পরিবেশে মন ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়ায় ও সুস্থ হয়। আমি এখানে বিশেষ করিয়া সাঙ্গীতিক পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলিতেছি।

উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে বাস করিলে পরিবেশের প্রভাবে আপনা হইতেই অনেক বিষয় জানা হইয়া যায়। টাটা নগরের লোক লোহা তৈরীর কথা আপনা হইতেই অনেক কিছু জানে, খড়্গপুরের বাসিন্দার রেলকারখানার সম্বন্ধীয় দু'চার কথা অমনি জানা হইয়া যায়। গায়ক-বাদকের বাড়ীর লোক গানবাজনার খুঁটিনাটি বিষয় কিছু জানে। চিত্রকরের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ছবি আঁকার কথা কিছু কিছু বলিতে পারে। যেখানে পরিবেশ সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ আমাদের আয়ত্তের মধ্যে সেখানে ইচ্ছা করিলে আমরা এমন ব্যবস্থাও করিতে পারি যাহাতে অনেক তথ্যই সকলের কাছে সহজ বোধ্য হয়। সমস্ত চারুকলার মত সঙ্গীতেরও দুটি দিক আছে। একটি টেক্‌নিক্‌ বা কলাকৌশলের দিক, আর একটি application বা প্রয়োগের দিক। প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিষয়-বস্তু

নির্বাচনের উপর effective environment বা কার্য্যকরী পরিবেশ সৃষ্টির সার্থকতা নির্ভর করে। ধরা যাক একজন সঙ্গীত কুশলী, যিনি সঙ্গীতের টেক্‌নিকে বিশেষ পারদর্শী, এবং তিনি অনভিজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করিতে ইচ্ছুক। একাদশ শতাব্দীর লোক হইলে তিনি বৌদ্ধ চর্য্যাপদ গানের বিষয়-বস্তু হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন, কারণ তখন চর্য্যাপদ চিন্তা বিশেষ জনপ্রিয়,—যেমন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের চর্য্যাগীত। তিনি 'স্বদেশী অন্দোলনের' যুগের লোক হইলে স্বদেশ চিন্তা তাঁর সঙ্গীতের বিষয় বস্তু হইতে পারে,—যেমন মুকুন্দ দাস বিশুদ্ধ রাগ রাগিনী তাললয়ের সাহায্যে সমাজ সংস্কার বা স্বদেশীভাব পরিবেশন করিয়া জনসাধারণকে উদ্বেলিত করিয়াছেন। আবার একালের লোক হইলে, আধুনিক জীবন-কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে সাধারণ লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারেন। সোজা কথায় অন্য দশজনের বুদ্ধির নাগালের মধ্যে আনিতে গেলে বিষয় নির্বাচনের প্রতিই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার কেবল টেকনিক্‌ জানিলে চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া টেক্‌নিকে অযথা জল মিশাইয়া তরল করিয়া দেওয়াও উচিত হইবে না। (—এরকম একটা প্রচেষ্টা আজকালকার চলতি গানের বেলায় খুবই লক্ষ্য করা যাইতেছে) কারণ তাহা হইলে কতগুলি বিষয়বস্তুই আমাদের জানা হইবে মাত্র, সুরের ঐতিহ্য সম্পর্কে কোন তথ্যই আমরা পরিবেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারিব না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখা কর্ত্তব্য। শিল্পীমন যখন শিল্প সৃষ্টি করেন তখন তিনি অপরের চাহিদা মত, অথবা অপরের অনুভূতি লইয়া শিল্প রচনা করেন না! নিজের অনুভূতিকেই তিনি রচনা কৌশলে এমনভাবে প্রকাশ করেন যে তাঁহার অনুভূতিকেই সকলে নিজের বলিয়া মনে করেন। যেমন 'মল্লার' সুরে বর্ষাকে ক্রন্দন-মুখরা রূপে রূপায়িত দেখিয়া শিল্পীর ভাবেই ভাবিত হই। আবার একই বর্ষাকে অপর গানে শিল্পীর বর্ণনা শুনিয়া নৃত্যপরায়না রমণীরূপে কল্পনা করি। অর্থাৎ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিল্পী তাঁর অনুকূলেই পরিবেশ সৃষ্টি করেন। শিল্পী বস্তুকে এক বিশেষ দৃষ্টি দিয়া দেখেন। শিল্পী নিজের দেখা বিশ্বজগৎ আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। আমরাও তখন তাঁহার চোখ দিয়াই দেখি। কিন্তু তবুও শিল্পের একটা commercial applicationএর দিকও আছে। শিল্পরসের অনুপান দিয়া শিল্প বহির্ভূত বিষয়বস্তুকে সরস করিয়া জনগণের অন্তরে পৌছাইয়া দেওয়ার প্রয়োজনবোধে অনেক সময় শিল্প সৃষ্টি করিতে হয়। এইটাই শিল্পের

commercial application। যেমন 'চা' এর চাহিদা বাড়াইতে চিত্তাকর্ষক ছবি আঁকিতে হয়, চানাচুর ভাণ্ডার বিক্রয় বাড়াইতে ঘুঙুর বাজাইয়া, গান গাহিয়া চানাচুরের গুণ কীর্ত্তন করিতে শোনা যায়।

বহুপ্রাচীনকালে, বৈদিক যুগে, যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়েই কেবল সঙ্গীতের রীতি ছিল। পরে দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সঙ্গীতের প্রচলন হইল। 'গান্ধর্ব্ব' ও 'দেশী' নামে এই সঙ্গীত পরিচিত। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি বহু উপলক্ষে সঙ্গীত সমাজ জীবনে স্থান লাভ করিল। রামায়ণ-গান, কথকতা, কবিগান, যাত্রাগান প্রভৃতির পরিবেশে আপনা হইতেই অনেক পৌরাণিক কাহিনী, অনেক ইতিহাস, অনেক সুকুমার ভাবধারার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিল। 'মঙ্গল' গান, পদাবলী গান সাহিত্য সমৃদ্ধ করিল। কবীর, নানক, মীরাবাঈ, আউল, বাউল, সুফি সম্প্রদায় প্রভৃতি সাঙ্গীতিক পরিবেশ রচনা করিলেন,—যে পরিবেশে ধর্মভাবই পরিপুষ্ট হইল। নিধুবাবুর টপ্পা, শ্যামাসঙ্গীত কেবল মাত্র ভৈরবী, খাম্বাজ, কাফি প্রভৃতি কতগুলি রাগ-রাগিনী আর একতাল, ঝাঁপতাল, আদ্ধা বয়ং প্রভৃতি তালমান-ই আমাদের কাছে আনিয়া দেয় নাই, বহুব্যক্তি ইহাতে ভক্তিরসেরও সন্ধান পাইয়াছেন। গম্ভীরাগান, দেশাত্মবোধক গান, স্বদেশী আন্দোলনে প্রেরণামূলক গান সাঙ্গীতিক কৌশলের প্রসার যতটুকুই করুক, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে অনেকখানি সাধিত করিয়াছে এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। এই ভাবে applied music বা ফলিত সঙ্গীতের প্রসার অনেককাল হইতেই গতি লাভ করিয়াছে। আবার তানসেন, নায়ক গোপাল, আমীর খস্রু, আবদুল্ করিম, ফৈয়জ খাঁ প্রভৃতি রাগসঙ্গীতের যে পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নিছক সঙ্গীতকলার উত্তর সাধকগণ উপকৃত হইয়াছেন।

আধুনিক কালে রেডিও গ্রামোফোন চলচ্চিত্র প্রভৃতি সাঙ্গীতিক পরিবেশ সৃষ্টির সহায়তা করিতেছে। সঙ্গীতমুক্ত পরিবেশ পাওয়া আজকাল অসম্ভব। যেখানেই যেকাজেই ব্যস্ত থাকি না কেন বহুপ্রচলিত রেডিও, গ্রামফোন সিনেমার গানের দু এক কলি কাণে আসিবেই। তাই সুদূর পল্লীতেও ছোট শিশু বা বয়স্ক ব্যক্তির মুখ দিয়া 'লারেলাপ্পা' বা 'কোন এক গাঁয়ের বধুর' কথা বা জাতীয় গানের দুই এক লাইন হঠাৎ বাহির হইতে শোনা যায়। কিন্তু এই পরিবেশ লোকশিক্ষা ও জনকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে সক্ষম হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কারণ আজিকার সাঙ্গীতিক পরিবেশে যাত্রা

কথকতা প্রভৃতির লোকশিক্ষামূলক কাহিনী ও তথ্যসমৃদ্ধি লোপ পাইতেছে। ভক্তিরস ও ধর্মপ্রেরণামূলক শ্যামাসঙ্গীত, পালাকীর্ত্তন ইত্যাদি শ্রেণীর গান ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। স্বদেশীগানের মত উদ্দীপনাময় গান হীনবল হইয়াছে। টেক্‌নিকের দিকেও জলমিশানো চলিয়াছে, অর্থাৎ রাগসঙ্গীতের কোনো ছাপ অলক্ষ্যে সাধারণের মনের উপর রেখাপাত করিবার সম্ভাবনা আর প্রায় নাই বলিলেই চলে।

জনকল্যাণের অনুকূলে সাঙ্গীতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইলে ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক মিশন গঠন করা একান্ত আবশ্যক। এইরূপ কতগুলি সংস্থা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সঙ্গীতানুষ্ঠান করিবে। অনুষ্ঠানে যাত্রাগান, গীতি-কথকতা, গীতি-নাট্য, নৃত্য-নাট্য, পটুয়া-সঙ্গীত, রাগ-সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রলাল—অতুলপ্রসাদ—নজরুলের গান ও আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীত বিশেষভাবে স্থানলাভ করিবে। আধুনিক জীবন যাত্রা ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হইবে। রামায়ন, মহাভারত, পৌরাণিক উপাখ্যান, ভারতের ইতিহাস, বিখ্যাত সাহিত্যিকদের গল্প উপন্যাস লইয়া যাত্রাগান রচিত হইতে পারে! গীতি কথকতার বিষয়বস্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, ঋতুবৈচিত্র্য, বিখ্যাত ব্যক্তি-বিশেষের জীবন-আলেখ্য প্রভৃতি হইতে বাছিয়া লওয়া যায়। 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা' জাতীয় উচ্চাঙ্গ গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লোকনৃত্যের মধ্য দিয়া যে কোনো বিষয়বস্তু পরিবেশন করিতে পারা যায়। পুতুলনাচের প্রচলন আজকাল প্রায় নাই বলিলেই চলে। ইহাকে জনপ্রিয় করিতে হইলে প্রগতি-শীল ভাবধারাসমূহ ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। কোন কাহিনীর ধারাবাহিক পট দেখাইয়া গীত গাওয়া এদেশের একটা বহু প্রাচীন পুরাতন রীতি। বিষয়বস্তু আধুনিক ভাবধারার সহিত সঙ্গতি রাখিলে পটুয়া সঙ্গীতও বিশেষ উপভোগ্য হইবে। বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীত ও সহজভাবের রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশকে যথেষ্ট উন্নত করিতে পারে। আঞ্চলিক লোকগীত, লোকনৃত্য উপযুক্ত পরিবেশে খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য গায়ক বাদক-দের সন্ধান করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠান করা বাঞ্ছনীয়। এইরকম ভ্রাম্যমান সঙ্গীত সংস্থা রেডিও গ্রামোফোনের সাহায্যেও সঙ্গীত পরিবেশন করিতে পারেন। রেডিও কর্ত্তৃপক্ষ যদি জন কল্যাণের বিষয়ে সচেতন থাকেন তবে উপযুক্ত সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সহযোগিতা করিতে

সচেষ্ট হইবেন। সরকারী শিক্ষাবিভাগও যে সমস্ত 'লোকশিক্ষা-কেন্দ্র' স্থাপন করিতেছেন সেখানে যদি রেডিও গ্রামোফোন ও সাংস্কৃতিক দলের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন তবে যথার্থই উপকার হয়।

সুতরাং আধুনিক জীবনযাত্রা, আধুনিক সমাজ, আধুনিক ভাবধারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি প্রাচীন যাত্রাগান, কথকতা, গীতিনাট্য প্রভৃতিকে নতুন ঢঙে ঢালিয়া সাজা যায় তবে ব্যাপক ও কার্য্যকরী সাঙ্গীতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। একটা কথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে এইরূপ গণ-সঙ্গীত বা গণ-নাট্য রচনায় 'রিয়ালিজ্‌ম্' বস্তুতান্ত্রিক রিয়ালিজ্‌ম্ নয়। শিল্পকলার 'রিয়ালিজম' ব্যবহারিক রিয়ালিজম নয়। ওটা নিছক 'আর্টিষ্টিক্ রিয়ালিজম্'। অভিনয়ের 'কান্না' সত্যিকারের কান্নার মত নয়। শোকের অভিনয় করিতে গিয়া অভিনেতা কাঁদে কিন্তু সে কান্না শিল্প-নৈপুণ্যে বাস্তব হইতে পৃথক হয়, সে কান্না আর্টিষ্টিক্। আধুনিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া কোনো সঙ্গীতালেখ্য রচিত হইলে তাহা পুরাপুরি বাস্তবের নকল হইবে না,—শিল্পীর আঙ্গিকের কৌশলে বাস্তব হইতে পৃথক হইয়া নূতনত্ব লাভ করিবে। ফটোগ্রাফ বাস্তবের নকল, কিন্তু চিত্রকলার রূপ বাস্তব হইতে কিছু পৃথক, তাই হৃদয়গ্রাহী। আর একটা কথা,—শিল্পসৃষ্টির কৌশল অনায়াসলব্ধ নয়। রীতিমত সাধনা করিয়া টেক্‌নিক্ আয়ত্ত করিতে হয়। তবেই টেক্‌নিককে চাপা দিয়া, আড়াল করিয়া, প্রকৃত শিল্পরচনার ক্ষমতা জন্মে।

সঙ্গীত রচনার এই মূল তত্ত্বগুলি এবং সঙ্গীত প্রকাশের পূর্ব্বোক্ত শৈলী বা 'স্টাইল' গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বিদ্যালয়েও কার্য্যকরী সাঙ্গীতিক পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগ রহিয়াছে। বিদ্যালয় এমন একটি স্থান যেখানে ভাবীকালের দেশবাসী পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শে গঠিত হইতে পারিবে, এবং যেখানে জাতীয় ভাবধারা এবং সাহিত্য, শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি জাতীয় ঐতিহ্য বর্ত্তমান দেশবাসীর নিকট হইতে বুঝিয়া লইবে! এই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বিদ্যালয়ের সাঙ্গীতিক পরিবেশ রচিত হইবে। বিদ্যালয়ে সঙ্গীত পরিবেশনের এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাহাতে স্মৃতিশক্তি, শ্রুতিশক্তি দেহ ও মনের বিকাশের সহায়তা করে আবার ভবিষ্যৎকালের সঙ্গীতকুশলী, সঙ্গীতস্রষ্টাকে পথ প্রদর্শন করে। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব অনুসারে আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়াই যে কোনো বিষয়ের শিক্ষা সহজ হয়। আবার আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সঙ্গীতের ক্ষমতা অসাধারণ। সুতরাং যে কোনো শিক্ষা

সহজ করিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। কাজেই রুটিন্ করিয়া বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল শিক্ষার যেমন সুযোগ দেওয়া হয়, সঙ্গীতের স্থানও বিদ্যালয়ের কার্য্যসূচীর মধ্যে নানা উপায়ে করিয়া দেওয়া দরকার। স্কুলের কাজের প্রথমে ও শেষে কিছু গান গাওয়া অপ্রাসঙ্গিক নয়; মাঝে মাঝে সভা ও সঙ্গীতের আসর করিয়া সঙ্গীতের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। খেলা-ধূলার সাথে শরীর চর্চ্চার সাথে কৌশলে সঙ্গীতকে যুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। উৎসব অনুষ্ঠানগুলিকে বিদ্যালয়ের কর্ম্মসূচীতে স্থান দিলে সঙ্গীত পরিবেশনের স্বাভাবিক সুযোগ মিলে। তাছাড়া ভাল সঙ্গীত কুশলীকে আমন্ত্রণ করিয়া, সম্ভব হইলে রেডিও গ্রামোফোন রাখিয়া বিদ্যালয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠানের সুযোগ দেওয়া চলিতে পারে। ভাল গান শুনাইয়া ছোট বেলা হইতেই রসোপলব্ধি ও রুচি বোধ (music appreciation) উন্নত করা সম্ভব। বিদ্যালয়ের পরিবেশে লঘুচিত্ততাসম্পন্ন হীন রুচির সঙ্গীতকে স্থান না দেওয়াই ভাল। গীতানুভঙ্গী (Action songs), ছন্দানুভঙ্গী (Rhythmics), কথা-গীতি (Story music), পটুয়া সঙ্গীত, ঋতু সঙ্গীত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদানকেও (subject teaching) সাহায্য করিতে পারে। বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষক না থাকিলেও যে সমস্ত ছেলেমেয়ে গান বাজনা জানে (প্রত্যেক স্কুলেই এমন কিছু ছেলেমেয়ে থাকেই) তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া বিদ্যালয়ে সাঙ্গীতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। কেবল মনে রাখিতে হইবে যে, এই পরিবেশে গানের কথার মধ্য দিয়া যেমন বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা চলিবে তেমনি আবার আঙ্গিকের বা খাঁটি টেকনিকের প্রচার এবং প্রসারও যেন অবহেলিত না হয়।

বাংলার পটচিত্র

রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার পল্লী-জীবন আজ বড় নিরানন্দ ও বৈচিত্র্যহীন। অর্থনৈতিক প্রভৃতি সমস্যার চাপে প'ড়ে তা আজ সব দিক দিয়েই বড় নির্জ্জীব হ'য়ে পড়েছে। মনকে তার প্রাপ্য খোরাক দিয়ে জীবনকে প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভ'রে তুলতে আজ পল্লীবাসীরা যেন ভুলে গিয়েছে। অথচ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত যাত্রা, পুতুল নাচ, পাঁচালী গান, কথকতা প্রভৃতি সরল ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দিয়ে বাংলার প্রাণকেন্দ্র পল্লীগুলি যেন আনন্দমুখর হ'য়ে থাকতো! অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত হলেও সরল ও ধর্ম্মপ্রাণ পল্লীবাসীরা এ সবের মধ্যে পেতো তাদের প্রাণের ক্ষুধা মেটাবার অপর্য্যাপ্ত সুযোগ।

কেবল আনন্দ দানই এই সব অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। নিরক্ষর ও স্বল্পজ্ঞ সাধারণ পল্লীবাসীদের মধ্যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি আদর্শ ও ভাব ছড়িয়ে দিয়ে তাদের অজ্ঞতা দূরীকরণ ও যথার্থরূপে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রেও অবদান কম ছিল না। পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে পটুয়া নামে এক শ্রেণীর লোকশিল্পীদের আঁকা ছবি। পটুয়ারা দীর্ঘ কাগজ বা কাপড়ের উপর পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত, শ্রীচৈতন্য, বেহুলা, নরমেধ যজ্ঞ, কমলে-কামিনী প্রভৃতির কাহিনী অবলম্বনে পট নামে একপ্রকার ছবি আঁকত। ৮।১০ হাত হ'তে ২০।২৫ হাত পর্য্যন্ত বহুচিত্র সম্বলিত এই দীর্ঘ পটগুলির দুই প্রান্তে দুটি বাঁশের দণ্ড লাগানো হোতো। সাধারণতঃ পটটি শেষের দিক হ'তে গুটোনো অবস্থায় রাখা হোতো ব'লে এই প্রকার পটকে বলা হোতো "জড়ানো পট।" পট দেখাবার সময় প্রদর্শক বা পটুয়া জড়ানো পটটি একটি বাঁশের ছোট চারপায়ায় উপর রেখে বাঁ হাতে উপরের দণ্ডটি ধ'রে ধীরে ধীরে সেটিকে ঘুরিয়ে ডান হাতে পটে আঁকা ছবির বিষয়গুলি নির্দ্দেশ করত ও সে সম্বন্ধ তাদের স্বরচিত কাহিনীগুলি সুর সহযোগে দর্শকদের কাছে বিবৃত করত। এই ভাবে বিভিন্ন পল্লীতে ঘুরে ঘুরে পট দেখিয়ে ও ছড়া গেয়ে পল্লীবাসীদের মনে আনন্দবর্দ্ধন ক'রে বাংলার পটুয়াগোষ্ঠী যুগ যুগ ধ'রে শুধু তাদের জীবিকা অর্জনই ক'রে

আসেনি—তাদের এই শিল্প-সাধনা এবং দেশবাসীর মধ্যে এই ধর্ম্মভাব ও সৎ আদর্শ প্রচার দেশের গৌরবময় কৃষ্টিকেও বহুল পরিমাণে উজ্জ্বল ও পরিপুষ্ট ক'রে এসেছে।

'পট' শব্দটির উৎপত্তি হয় সংস্কৃত 'পট্ট' শব্দ থেকে। পট্ট অর্থে একখণ্ড বস্ত্র বা কাপড়। কাপড়ের উপর ছবি আঁকার পদ্ধতি প্রাচীন ভারতে সবিশেষ চালু ছিল। ক্রমে পট্ট শব্দের অর্থ হ'য়ে দাঁড়ায় একপ্রকার চিত্র বা ছবি এবং পটকার বা পট্টিকার বলতে বোঝায় সমগ্র চিত্রকর শ্রেণী বা লোকশিল্পী গোষ্ঠী! পরিশেষে পটকার বা পট্টিকারেরা বাংলাদেশে পটুয়া নামে পরিচিত হয় এবং তাদের আঁকা ছবিকে বলা হয় পটচিত্র বা পট।

বাংলার বিভিন্ন জেলায় আজ পর্য্যন্ত যে সব পট পাওয়া গেছে তার কোনটাই দেড়শ' বছরের পুরোনো নয়। কিন্তু তাই ব'লে আমরা যেন একথা মনে না করি যে পটচিত্রের ইতিহাস মাত্র কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস। পটচিত্রের উৎপত্তি হয় সম্ভবতঃ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে। গৌতম বুদ্ধ এক সময় চরণচিত্র নামে সে যুগের এক রকম ছবির খুব প্রশংসা করেন। বুদ্ধঘোষ (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) এই প্রসঙ্গে বলেন যে শিল্পীর মানসপটে উত্থিত চিন্তাকে নিয়ে একাধিক ছবির সমাবেশে এই চরণচিত্র গঠিত ছিল ও এই চিত্রে ছবিগুলি একটির নীচে আর একটি ক'রে সাজানো হোতো। চরণ অর্থে পাদদেশ বা নিম্নভাগ ও চিত্র অর্থে ছবি। প্রাচীন ভারতের অমূল্য শিল্প সম্পদ ভারত ও সাঁচীর (খৃঃ পূঃ ২য়-১ম শতাব্দী) রেলিং স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্যকলার মধ্যেও আমরা শিল্পের বিন্যাস ভঙ্গিমার এই একই পদ্ধতি নিয়োজিত হ'তে দেখি। বাংলার পটচিত্রের ক্ষেত্রেও ছবি আঁকার এই একই রীতি প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে।

কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে আমরা পটচিত্রের উল্লেখ পাই। বানভট্টের হর্ষচরিতে (৭ম শতাব্দী) যমপট্টের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে সে যুগে আমাদের দেশে যমপট্টের প্রচলন ছিল। রাজ্যবর্দ্ধনের পীড়ার খবর পেয়ে মৃগয়া থেকে রাজধানী থানেশ্বরে ফেরার পথে রাজা হর্ষবর্দ্ধন এক যমপট্টিক বা পট ব্যবসায়ীকে উৎফুল্ল একদল বালককে যমপট দেখাতে ও সে সম্বন্ধে সুর সহযোগে ছড়া গেয়ে শোনাতে দেখেন। কবিবর ভবভূতির উত্তররামচরিতেও (৮ম শতাব্দী) আমরা

পটচিত্রের উল্লেখ পাই। বিশাখাদত্তের মুদ্রারাক্ষসে (সম্ভবতঃ ৮ম শতাব্দীতে লিখিত) আমরা যমপটের স্পষ্ট উল্লেখ দেখে থাকি।

সুতরাং আমরা দেখতে পারছি যে সম্ভবতঃ বহুকাল আগে থেকেই আমাদের দেশে পটচিত্রের প্রচলন ছিল। অনেকের মতে আগে এই পটচিত্রের নাম ছিল যমপট। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত পটুয়া মহলে এই নাম চালু ছিল। পটচিত্রের এরূপ নামকরণের কারণটি কিন্তু অতি সাধারণ। রামায়ন, মহাভারত প্রভৃতি যে কোন কাহিনীই পটচিত্রের বিষয় বস্তু হোকনা কেন, প্রত্যেক পটের শেষ ভাগে যমরাজার কাহিনীই দেখানো হোতো। যমপটে চিত্রিত যমরাজার সভায় চিত্রগুপ্তের অভ্রান্ত খাতায় অনেক সময় দেখা যায় লেখা আছে, "ভাল কর ভাল হবে, মন্দ কর শাস্তি পাবে।" কাজেই যমপটের আসল উদ্দেশ্য হোলো জনসাধারণকে জগতের সব রকম পাপ সম্বন্ধে সচেতন করা ও সব সময় তাদের মনে পবিত্র ধর্ম্মভাব জাগিয়ে রাখা। এই ধরনের সহজ সরল ভাব ও আদর্শ যে অনায়াসেই সকল শ্রেণীর লোকেদের অন্তর স্পর্শ করবে তা খুবই স্বাভাবিক। এক কথায় পটচিত্র ছিল সরল ও ধর্ম্মপ্রাণ পটুয়াদের মনের প্রতিলিপি ও বাংলার জনসাধারণের সত্যিকার চিত্র এবং অতি সহজ উপায়ে তাদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রচার সাধনই ছিল পটচিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আজকালকার শিল্পীদের মত পটুয়াদের পট-আঁকার ব্যাপারে রকমারি বিলিতী রঙ ও তুলির ব্যবহারের কোন বালাই ছিল না। রঙ, তুলি, মাধ্যমিক, বার্নিশ সবই তারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ঘরে তৈরী ক'রে নিত। এলামাটি, গিরিমাটি, খড়িমাটি, হরিতাল, দেশী নীল, মেটে সিন্দুর প্রভৃতি দেশী ধাতব ও উদ্ভিজ্জ রঙের সাহায্যেই তারা তাদের ছবি আঁকতো। কালো রঙ পেতো তারা প্রদীপের শিখার উপর উপুড় করা একটা সরা থেকে। সাধারণতঃ কাগজ অথবা কাগজে মোড়া কাপড়ের উপর এই পট আঁকা হোতো। কখনো কখনো কয়েকটি কাগজ একটির উপর আর একটি জুড়ে পটটিকে পুরু ক'রে নেওয়া হোতো। কাগজের বদলে কাপড়ের উপর গোবরের প্রলেপ ও পরে তা রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়ে চুন কিংবা খড়িমাটি প্রয়োগে সৃষ্ট ভূমির উপরও পট আঁকা হোতো। খবরের কাগজের উপর পট আঁকার কথাও আমরা শুনে থাকি। পটুয়ারা সাধারণতঃ ছাগলের লোমের তুলি ব্যবহার করত। সূক্ষ্ম তুলি তৈরী করত তারা কাঠবেড়ালী

অথবা বেড়ালের লোম দিয়ে। কখনো কখনো ছাগলের বাচ্চার ঘাড়ের লোম দিয়েও তারা সরু তুলি তৈরী করতো। মোটা তুলি তৈরী করত তারা পাট দিয়েই। কখনো কখনো একটা তুলির পেছনে খানিকটা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া বা কাপড় জড়িয়েও তারা তুলির কাজ চালিয়ে নিত। তুলিগুলো রাখতো তারা একটা বাঁশের খোপের মধ্যে। রঙের পাত্র ছিল নারকেলের মালা কিংবা মাটির সরা। সাধারণতঃ তেঁতুল বিচি-সিদ্ধ আঠা রঙের মাধ্যমিক হিসেবে ব্যবহৃত হোতো। কখনো কখনো তার বদলে বেলের বা বাবলার আঠার ব্যবহারও চালু ছিল। রঙের সঙ্গে ডিম মিশিয়ে রঙকে সহজ লেপ্য করে তোলার পদ্ধতিও পটুয়াদের অজানা ছিল না। সাদা রঙ ছিল সব রঙেরই মাধ্যমিক। কখনো কখনো স্বর্ণপাত বা স্বর্ণরেণু, রৌপ্যপাত বা রৌপ্যরেণুও পটের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি ও শোভা বর্দ্ধন করতো। যে কোন পট আঁকার আগেই চুণ বা খড়ি মাটির প্রলেপ দিয়ে প্রথমে ভূমি তৈরী করে নেওয়া হোতো। তারপর লাল বা কালো রঙ দিয়ে প্রথমে ছবিগুলির outline বা সীমারেখা এঁকে নেওয়া হোতো এবং শেষে সেগুলি নানান রঙের সাহায্যে পুরণ করা হোতো। নানা রঙের সংমিশ্রনে বিচিত্র রঙ সৃষ্টির কৌশলও পটুয়াদের জানা ছিল। মোট কথা অতি অল্প খরচে ও সাদাসিদে পদ্ধতিতে এই পট আঁকা হোতো। তাতে কোনরকম বাহুল্য বা পারিপাট্যের প্রয়োজন হোতো না।

পটগুলো সব সময় যে খুব উঁচুদরের হোতো তা নয়। সরল শিশুর কাঁচা হাতের মত খেলো কাজ, অপটু বর্ণবিন্যাস ও রচনাভঙ্গীরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি বহু পটেই বহুল পরিমাণে রয়ে যেতো। কিন্তু তাই বলে পটে যে কোথাও রসভঙ্গ হোতো তা নয়। কারণ পটের প্রাণই হচ্ছে সরলতা—ভাবের, রচনাভঙ্গীর, বর্ণ-বিন্যাসের ও কল্পনার সরলতা। পটুয়ারা ত ছবি আঁকে না, আঁকে ঘটনা, এমন সব ঘটনা যা তারা সত্য বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। তাই পটচিত্রের মধ্যে আমরা পাই—"একটা বিরাট মনুষ্য সমাজ—যারা বাস করে পল্লীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে, বিশ্বাস করে অসংখ্য দেবদেবীতে, জীবনের আদর্শের সন্ধান নেয় পৌরাণিক গল্প-উপাখ্যানের মধ্যে, উচ্চ রাজনীতির মর্ম্ম যারা বোঝে না তাদের কথা, তাদের বিশ্বাস, তাদের ধর্ম্ম, তাদের আদর্শ, তাদের সমাজ জীবন সব কিছুরই নিখুঁত চিত্র।" একটা পট দেখে যেন মনে হয় পল্লীর মেটে পথ বেয়ে কোন বাউল হাতে একটা একতারা নিয়ে সরল মনে, সরল বিশ্বাসে

কোন রকম ওস্তাদি কালোয়াতির ধার না ধেরে একটানা তার প্রাণের গান গেয়ে চলেছে—যে গানের কোথাও ছেদ নেই, রসভঙ্গ নেই, যে গান শাশ্বত ও চিরন্তন, চিরমধুর ও চিরনূতন, চিরসত্যেরই অপূর্ব্ব প্রতিধ্বনি, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি।

পটচিত্রের বিষয়বস্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী থেকে নেওয়া হলেও মুসলমানী বিষয়বস্তুও পটচিত্রে বিরল নয়—যেমন গাজীর পট, মানিকপীরের পট, সত্যপীরের পট প্রভৃতি। এর কারণ আর কিছুই নয়। কারণ আসলে হিন্দুরা পট আঁকা সুরু করলেও পরে সামাজিক বিপর্য্যয়ের ফলে পটুয়ারা বেশীর ভাগই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। পটুয়ারা পট আঁকার কাজে বরাবরই যথেষ্ট স্বাধীনতা-প্রিয়তার পরিচয় দেয়। হিন্দু শিল্প-শাস্ত্রের বাধা ধরা নিয়ম তারা মোটেই পালন করতে পারত না। সম্ভবতঃ তারই ফলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা তাদের উপর রুষ্ট হয় এবং তাদের সমাজচ্যুত এমন কি ধর্ম্মচ্যুতও করে। তখন বাধ্য হ'য়ে পটুয়ারা সব মুসলমান হ'য়ে যায়। কিন্তু জাতিগত পেশা বর্জ্জন করতে না পারায় তাদের হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীকে নিয়ে হিন্দুদের কাজেই পট আঁকতে হয় এবং তাদের নামগুলোও হিন্দুদের মতই থেকে যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার মুসলমানী বিষয়বস্তু নিয়েই পট আঁকতে সুরু করে। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, মানভূম, সাঁওতালপরগণা প্রভৃতি জেলায় পটচিত্রের প্রচলন ছিল খুব বেশী। জড়ানো পট পূর্ব্ববঙ্গের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গেই অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়। বাংলার বিভিন্ন জেলার পটচিত্রের একটী তুলনামূলক আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো যে, তাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তাই বিষয়বস্তু ও চিত্রপদ্ধতিতে সেগুলি মোটেই এক রকম নয়। কিন্তু সব পটের মর্ম্ম কথা আসলে একই—ধর্ম্মপ্রাণ পটুয়াদের নির্ম্মল অন্তরের অভিব্যক্তি, তাদের সরলতা ও ভক্তিবিশ্বাসের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ।

যাদু পটুয়া নামে বিশেষ একশ্রেণীর পটুয়ার কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। তাদের আসল কাজ ছিল ধাতব শিল্পদ্রব্য তৈরী করা। পরে তাদের অধিকাংশই পট আঁকতে সুরু করে। তবে তাদের আঁকা পটগুলি অন্যান্য পটের তুলনায় একটু বিশিষ্ট ধরণের। এগুলি আকারে ছোট ও অপ্রশস্ত। প্রথমে শুধু সাঁওতালদের মধ্যেই এই পট আঁকার প্রচলন ছিল। পরে ক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানেই এই পটের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এই পটের

বিষয়বস্তু নির্ব্বাচিত হোতো কিন্তু মৃত ব্যক্তিদের নিয়ে। সাঁওতালদের মধ্যে নারী, পুরুষ অথবা শিশু যে কোন লোকের মৃত্যু হ'লেই যাদু পটুয়া মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে সদ্য আঁকা তার একটী কাল্পনিক ছবি নিয়ে হাজির হোতো। ছবিটি যে ঠিক মৃত ব্যক্তিটির মত হোতো তা নয়—আসলে সে নারী কি পুরুষ ও তার বয়সই বা কত সেই ভাবটিই ছবিটির মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হোতো। ছবির একটি অংশ যাদু পটুয়ারা অসম্পূর্ণ রাখতো—সেটি হচ্ছে চোখের মণির চারদিকের গোলাকার অংশটুকু। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনকে যাদু পটুয়া সেই ছবিটা দেখিয়ে বলত মৃত ব্যক্তিটি তখনও অন্ধের মত অন্য জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং অর্থ বা অন্য কোন দ্রব্য দান হিসেবে যাদু পটুয়ার মারফৎ যদি তারা না পাঠায় ত বরাবর সে অন্ধই থেকে যাবে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা যাদু পটুয়াকে তখন কিছু দান করলে সে চক্ষুদান কার্য্য সমাধান ক'রে অর্থাৎ চোখের মণির চারপাশে গোলাকার অংশটুকু যোগ ক'রে দিয়ে মৃত ব্যক্তির সদ্‌গতির পথ পরিষ্কার ক'রে দিত। সম্ভবতঃ এ রকম আংশিক ঐন্দ্রজালিক কাজের জন্যেই এই শ্রেণীর পটুয়াদের নামকরণ হয় যাদু পটুয়া (যাদু অর্থে ইন্দ্রজাল এবং পটুয়া অর্থে চিত্রকর)।

সুদীর্ঘ জড়ানো পট ছাড়াও আরও এক প্রকার পট পটুয়াদের আঁকতে দেখা যেত। এগুলি আকারে অনেক ছোট ও অপ্রশস্ত এবং একটি মাত্র ছবিই এতে স্থান পেত। এগুলিকে বলা হয় "চৌকা পট"। এই পটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হোলো কালীঘাটের পট। অন্যান্য পটের তুলনায় কালী-ঘাটের পটের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মহিমায় কালীঘাটের পট মহিমান্বিত। কালীঘাটের পটুয়ারা শুধু প্রচলিত দেবদেবীকে নিয়েই ছবি আঁকতো না, সমাজের দুর্নীতির উপর তীব্র কশাঘাত ক'রে কঠোর ব্যঙ্গাত্মক ও সাধারণ নারী-পুরুষদের নিয়েও তারা অনেক ছবি আঁকতো। কালীঘাটের পটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোলো তাদের অপুর্ব্ব রেখার কাজ ও আলোছায়ার সমাবেশ যা আমাদের অজন্তার গুহার প্রসিদ্ধ চিত্রাবলীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রেখার কাজে কালীঘাটের পটুয়ারা এমনই পটু যে, কখনো কখনো একটি পট দেখে কোথায় তার আশ্চর্য্য তুলির টান আরম্ভ হয়েছে আর তা শেষই বা হয়েছে কোথায়, তা নির্দ্ধারণ করা একটা দুরূহ সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। নরনারীর দেহাবয়বের স্থূলত্ব-যোজনা ক'রে সারা দেহের সামঞ্জস্যকে সুন্দররূপে ফুটিয়ে তোলাও কালীঘাটের পটের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

কালীঘাটের পট সবই প্রায় 'তুলট' কাগজে আঁকা হোতো। কালোকালি বা ভুসোকালিতে আঁকা রৈখিক চিত্রই অনেক আছে। কালীঘাটের পটে আঁকা দেবদেবী শাস্ত্রোক্ত দেবদেবী নয়—পটুয়াদের নিজস্ব কল্পনা-প্রসূত দেবদেবী। তাদের মধ্য দিয়ে আসলে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের মর্য্যাদা অতুলনীয়রূপে প্রকাশ পেয়েছে। শিবদুর্গার লীলা-চিত্রের বর্ণনার ছলে বাংলার সাধারণ গৃহস্থ দম্পতির জীবনের নিবিড় কৌতুক রসাত্মক দিকটাই অতি মধুর ও জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। শিব এখানে দেবাদিদেব মহাদেবও নন আর ভোলা মহেশ্বর মহাযোগী শঙ্করও নন—তিনি গিরিরাজের আদুরে কন্যা উমার নিত্যসহচর। আর দেবী পার্ব্বতী যতটা উমা, তার চেয়ে ঢের বেশী বাঙালী পিতার আদুরে কন্যা, স্নেহের দুলালী।

বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য ও অঙ্কনকার্য্যের নিপুনতার জন্য কালীঘাটের পট খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। শুধু ধর্ম্মের বিষয় ও পৌরাণিক কাহিনী ছাড়াও সে যুগের সমাজ জীবনের সব রকম ঘটনা, সব রকম দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসাত্মক ছবিও কালীঘাটের পটের বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত হ'ত বলে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত এই পটের জনপ্রিয়তার সীমা ছিল না। তখন এ পটের দামও ছিল খুব অল্প। একখানা ছবির দাম ছিল একপয়সা দু পয়সা থেকে বড় জোর সাত আট আনা। কিন্তু ক্রমে জনসাধারণের মনগত রুচি বদলে যাওয়ায় ও বিলিতী ছাপানো ছবির প্রচলনের ফলে কালীঘাটের পট বাজার থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে শুধু কালীঘাটের পটই আজ লোপ পায়নি, সমগ্রভাবে বাংলার লোকশিল্প, বিশেষতঃ বাংলার পট এবং সমগ্র পটুয়া সম্প্রদায় আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হ'তে চলেছে। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, দরিদ্র দেশবাসীর মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও বন্যার ঘন ঘন অভিযান শুধু দেশের অগণিত অসহায় জনসাধারণের জীবনই গ্রাস করেনি—জাতীয় ভাবধারাকেও নানান দিক দিয়ে বহুল পরিমাণে করেছে ব্যাহত এবং যে প্রেরণা ও শক্তির বশে মানুষ সৃষ্টির অমূল্য সম্পদ রচনা করে, অতুলনীয় শিল্প সম্ভার করে সৃষ্টি, তাকেও বহুল পরিমাণে করেছে অপহরণ। এ ছাড়া জাতীয় শিল্পের উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব ও আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশবাসীর পরিবর্ত্তিত রুচি অনুযায়ী শিল্প সৃষ্টির প্রসারতা, নগর জীবনের প্রতি দেশবাসীর অত্যধিক আকর্ষণ ও আরও কতকগুলি সমস্যার ফলে পল্লীগুলির জনশূন্যতা ও শ্রীহীনতা

এবং পল্লীবাসীদের প্রাণপ্রাচুর্য্য বিহীনতা প্রভৃতি কারণগুলিও দেশের এই গৌরবময় সম্পদের দ্রুত বিলোপ সাধনের কাজে বিশেষ সহায়তা করছে। এই সকল কারণে বর্ত্তমানে সমগ্র পটুয়া সম্প্রদায় বাংলা দেশ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে, তারা অনন্যোপায় হয়েই হয় কুলীমজুরের কাজ অথবা সেরূপ কোন পেশা অবলম্বন করেছে, না হয় তাদের পুরোনো জাতিগত পেশাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে নগণ্য শিল্পীর মত চরম দরিদ্র ও ঘৃণিত জীবন যাপন ক'রে কোনরকমে টিকে আছে। বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অমূল্য সম্পদ এই পটচিত্র ও পটুয়াগোষ্ঠীকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে, যাতে দেশের কৃষ্টি ও জাতীয় গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখা যায়, সে সম্বন্ধে সরকার ও জনসাধারণ সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত।

অনর্থপাত

মৃত্যুঞ্জয় বক্সী

আমার স্বমুখ পথে—
　ছোট্ট শিশুটি "ঠাকুর পূজার"
　　　　খেলায় আছিল মেতে
সঙ্গী একটী কুকুরের ছানা ছিল
　কখনো তাহার পিছনে কখনো
　　　　কোলে স্থান পেতেছিল।
উদাসীন মনে বসিয়া দাওয়ার পরে
ছেলেটির খেলা দেখিতে দেখিতে, কখন জানিনা মনটি আমার
　　　　গিয়াছে অতীতে ফিরে।
তখনও স্বরু হয়নি বিদ্যা শেখা
　অল্পই শেখা হয়েছে পড়া ও লেখা
ঠাকুর মায়ের রূপ কথা আর রূঢ় বস্তুর মাঝে—
　কলহ তখনো হয় নাই স্বরু, জ্ঞান-বিজ্ঞান হয় নাই জানা শেখা।

আপনার মনে ঠাকুর গড়িয়া

সাজায়ে যতন ভরে

রঙিন কাগজে আর কাঠি দিয়া মন্দির বিরচিয়া

পূজার জোগাড় করিতাম খেলা ঘরে

বসিয়া পূজায় মনে মনে হত আশা

প্রহ্লাদ আর ধ্রুব সম বুঝি ভক্তি আমারো—

পাব তাঁর ভালবাসা।

তার পরে গেছে বছর অনেকগুলি,

যুক্তি তর্ক শিখেছি অনেক শুনেছি অনেক বুলি—

বিশ্বাসভরা সে জীবন আর নাই

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করার হদিস কিছু না পাই!

তবুও আজিকে ঐ শিশুটীর খেলা

আমারি হারানো শৈশব স্মৃতি চিত্তে জাগালো দোলা!

কি সুখ পেয়েছি জ্ঞান আর তর্কেতে?

আবার ফিরি না সহজ ভক্তি পথে!

ঐ শিবালয়ে প্রতি প্রত্যূষে

অর্ঘ্য সাজায়ে মনের হরষে

পূজা দিই পুনঃ বিগ্রহে বিধি মতে!

চিন্তার খেই কাটিল অকস্মাৎ

মহা অনর্থ পাত!

শিশু আর পশু পরশ লেগেছে পুরুতের গায়ে

চলে অভিসম্পাত!

পূজা উপচার নিক্ষেপি দূরে নিষ্ঠুর আক্রোশে

বাম হাতে ধরি শিশুর কর্ণ ডান হাতে চড় মারিলেন তিনি কষে

কাঁদে ঐ শিশু—কাঁদুক আবার ভুলে যাবে তার

আঘাত জনিত জ্বালা

পুরুত মশাইও সাজাবেন পুনঃ নৈবিদ্যের থালা;

কিন্তু আমার মনোরাজ্যেতে হল অনর্থপাত

শিশু জীবনের ভক্তির হলো সমূলেই উৎখাত!

শ্রীঅরবিন্দ ও বিশ্বমানবিক ঐক্য

মণি বাগচি

১৯১০ সালে বাংলা দেশের ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে রাজবিদ্রোহী অরবিন্দ ঘোষের আকস্মিক অন্তর্ধান সেদিন অনেককেই বিস্মিত করে ছিল, এমন কি তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মিরা পর্যন্ত এই অন্তর্ধানকে রাজনীতি থেকে পলায়ন বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তারপর ১৯১৪ সালে 'আর্য' পত্রিকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রান্ত ধারণার কিছুটা নিরসন হতে থাকে। কিন্তু যাঁর যৌবনের রাজনীতিক চিন্তা ও কর্মকে যিনি তপস্যা বলে অভিহিত করেছেন, একমাত্র সেই রবীন্দ্রনাথ সেদিন এই মানুষটিকে ঠিক মত বুঝেছিলেন। Prayer, petition এবং protest-এর রাজনীতির যিনি মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন অকুণ্ঠ ভাষায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে, সেই অরবিন্দ ঘোষের রাজনৈতিক জীবন এদেশে অদ্যাবধি অনালোচিতই রয়ে গেছে। রাজনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অরবিন্দ অরবিন্দই ছিলেন, "নিরালম্ব স্বামী" হয়ে যান নি এবং পরবর্তিকালে সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিবেশ থেকে দূরে থেকে এক সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকায় তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সে ভূমিকা জয়মাল্য ও করতালি-প্রলুব্ধ সাধারণ রাজনেতার ভূমিকা নয়, সে ভূমিকা রাজনৈতিক-দার্শনিকের অর্থাৎ Political Philosopher-এর গৌরবময় ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের সত্য দৃষ্টি যেমন একদিন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সদ্য প্রত্যাগত একটি অপেক্ষাকৃত ও অজ্ঞাত মানুষের মধ্যে ভাবীকালের 'মহাত্মা' গান্ধীকে আবিষ্কার করেছিল, তেমনি তাঁর নিবিড় উপলব্ধি একদিন অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে আগামীকালের পৃথিবীর এমন একটি রাজনৈতিক-দার্শনিকের সন্ধান পেয়েছিল যাঁর চিন্তায় সর্বপ্রথম ধরা দিয়েছিল বিশ্বমানবিক ঐক্যের আদর্শ—Ideal of human unity এবং তাঁর বহুমুখী রচনাবলীর মধ্যে এই বইখানির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

ইতিহাসে রাজনৈতিক-দার্শনিক হিসাবে আমরা যে কয়জনকে পেয়েছি তাঁদের মধ্যে টমাস হবস্, জন লকি, ষ্টুয়ার্ট মিল, রুশো আর থোরো—এই কয়জনই প্রকৃত Political Philosopherএর মর্যাদা পেয়েছেন। এঁদের

প্রত্যেকেরই মৌলিক চিন্তা বিশ্বরাজনীতিকে সমৃদ্ধিশালী করেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারে নি। যেটুকু বাকী ছিল—বিশ্বমানবিক ঐক্য—তা শ্রীঅরবিন্দের চিন্তায় ধরা দিয়েছে। আর কিছুর জন্য না হোক, একমাত্র এরই জন্যে ইতিহাসে তাঁর অমরত্বলাভ সুনিশ্চিত। তাঁর The Ideal of Human Unity এবং Psychology of Social Development—এই দুখানি বই-ই অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বরাজনীতি ও সমাজনীতিকে যে প্রভাবান্বিত করে তুলবে, এর আভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা প্রথম বইখানিকে কেন্দ্র করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসঙ্ঘের বা লীগ্ অব নেশনস্-এর সৃষ্টি হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই তার অপমৃত্যু ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'আর্য' পত্রিকায় "The Ideal of Human Unity" সম্পর্কে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। পরমযোগী শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর ইতিহাসে, সভ্যতার ইতিহাসে একটা নতুন যুগের সূচনা বুঝতে পেরে আত্মহনন থেকে মানবজাতি কি উপায়ে বাঁচতে পারে সেই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেন তাঁর নিভৃত তপস্যার আসনে বসে। জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার পর চিরস্থায়ী ও নিরাপদ শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের ওপর আজ গড়ে উঠেছে 'সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ' বা United Nations. লীগ অব্ নেশনস্ এসেছিল প্রথম যুদ্ধের ফল হিসেবে, ইউ-এন-ও এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফল হিসেবে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ, অনেকের মতে, আসন্ন এবং অনিবার্য। The Ideal of Human Unity বইখানির নূতন সংস্করণে (১৯৪৮) সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি গভীরভাবে এবং নিপুণভাবে আলোচনা করে একটা নতুন অধ্যায়ের এক জায়গায় লিখেছেন: "মানুষ যদি বেঁচে থাকতে চায়, এগিয়ে নিতে চায় বিবর্তনকে, তাহলে তাকে বর্তমান বিশৃঙ্খল আন্তর্জাতিক জীবনক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, শুরু করতে হবে শৃঙ্খলাপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়া, পৌঁছতে হবে কোনরকম একটা বিশ্বরাষ্ট্রে তা হোক এককৈন্দ্রিক (Unitary), অথবা বহুকৈন্দ্রিক (Federal) অথবা একটা মহা সম্মিলনী (Confederacy) কিম্বা সংহতি (Coalition); অন্য কোন ক্ষুদ্রতর বা বিকলাঙ্গ প্রতিষ্ঠান দিয়ে আদর্শ সিদ্ধ হবে না। বিবর্তনশীল প্রকৃতি আজ যে প্রশ্ন মানুষের সামনে তুলে ধরেছে তা হলো বর্তমান যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, তার বদলে সুচিন্তিত, সুনিয়মিত একটা

স্থায়ী ব্যবস্থা, সত্যকার একটা ব্যবস্থা স্থাপন করা যায় কি না এবং পরিশেষে একটা যথার্থ ঐক্য বা পৃথিবীর সকল দেশের লোক একই স্বার্থ সেবা করে চলবে···বিশ্বমানবিক ঐক্যের আদর্শ আর অলভ্য আদর্শ হয়ে থাকবে না।"

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে কয়জন রাজনৈতিক-দার্শনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে একটা চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন, শ্রীঅরবিন্দ তাঁদেরই সমগোত্রীয়। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা যেমন জগৎকে জীবনকে মানব সমাজকে পরিত্যাগ করে নয়, এ সবকে গ্রহণ করেই, তেমনি দেখতে পাই তাঁর রাজনৈতিকে চিন্তার পরিধি স্বদেশ ও স্বজাতির গতি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বিশেষভাবেই স্পর্শ করেছে। বিশ্ব-রাজনীতিতে তাঁর পরিকল্পিত বিশ্বমানবিক ঐক্যের আদর্শ আজ এক নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ মানবজাতি ও নির্দোষ সমাজের দৃঢ় ভিত্তিতে মানব-ঐক্যের আদর্শ এতকাল দিবাস্বপ্নের মতই ছিল। নীতিগত ও আদর্শগত বিভেদ সত্ত্বেও বর্তমান বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে ঐক্যবোধ দেখা দিয়েছে, তার প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন শ্রীঅরবিন্দ। লীগ অব নেশনস্ প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগেই তিনি লিখলেন—"মূল প্রশ্ন হলো 'নেশন্'। সমষ্টিগত জীবনের সহায়ক হিসেবে যে বৃহত্তম স্বাভাবিক গোষ্ঠী মানুষ একদিন গড়ে তুলবে, তাই হবে অদূরভবিষ্যতে বিশ্বমানবিক ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি।"

এই মানব-ঐক্যের আদর্শ কি ভাবে নিশ্চিত বাস্তবে পরিণত হবে, কেমন করে শান্তি ও সৌষম্যের দৃঢ় ভিত্তির ওপর আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে, সে বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ যেকথা বলেছেন, তা তাঁর মত একজন বাস্তবপন্থী রাজনীতিকের পক্ষেই সম্ভব। লীগ্ অব নেশনশ্-এর গঠন তন্ত্রে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল, সেই সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ তাঁর মত আর কেউ-ই আজ পর্যন্ত করেন নি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও লোকের মন থেকে নৈরাশ্য একেবারে দূর হয় নি, এখনও মানুষ বিশ্বমানবিক ঐক্যের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। সকলের মনে তাই আশঙ্কা জেগেছে, মানব সভ্যতার অস্তিত্ব আজ সত্যিই বুঝি সংশয়াপন্ন।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, এইরকম নিরাশাবাদী হবার কোনো কারণ নেই। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই তিনি বলে গেছেন—"পৃথিবীর আশা চূর্ণবিচূর্ণ হতে দেওয়া চলবে না কোনমতেই। ঐক্যের দিকে ক্রমোন্নতির দ্বিতীয় পর্যায়ে

যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-পরিষদের গঠনগত ত্রুটিতে নয়, তা হলো দেশগুলির দুই দলে ভাগ হয়ে দাঁড়ানোয়, এরা যেন স্বভাবতই একে অপরের বিরোধী এবং যে কোনো সময়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে পরস্পরের ঘোর শত্রু বলে।...এই জিনিসটি দূর না হলে একটি বিশ্বরাষ্ট্র কিম্বা বিশ্ব ঐক্যও সম্ভব নয়।...এই ত্রুটিবহুল জাতিপুঞ্জকেই কেন্দ্র করে এমন একটি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে, যার ভেতর পৃথিবীর সকল দেশ একটা অদ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ঐক্যের মধ্যে পরস্পরকে দেখতে পারে, বিশ্বরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা, এই ধরণের গতিধারার পক্ষে একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ ও অমোঘ চরম পরিণাম। মানবজাতির বিবিধ প্রয়োজনের মিলিত দাবী আর তার আত্ম-সংরক্ষণের আবশ্যকতাই এই লক্ষ্যে পৌছানর জন্যে যথেষ্ট বলে নির্ভর করা যেতে পারে। শেষ পরিণতিতে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য, আর তার সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় রূপ হবে সব স্বাধীন দেশের এক সম্মিলন যেখানে প্রভুত্ব কিম্বা কৃত্রিম অসাম্য এবং পরবশ্যতার কোনো চিন্তা থাকবেনা। মানবজাতির ভবিষ্যৎ একেই চায়।"

মানবসমাজের ক্রমোত্তরণে বিশ্বমানবিক ঐক্য একটা বিশিষ্ট ধাপ। ইতিহাসে পট-পরিবর্তন হতে বাধ্য। সমবেত জীবনের আমূল পরিবর্তনের ভেতর দিয়েই আসবে বিশ্বমানবিক ঐক্য ; বহুযুগের বহুরকমের রাজনৈতিক আদর্শকে অতিক্রম করে আজকের মানুষ তাই মুখ ফিরিয়েছে এই দিকে। মানুষের জীবনধারা, তার অভিব্যক্তি জগতের জন্যে—এই কথা বিংশ শতকের মানুষ যতবেশী উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, এমন আর কোন যুগের মানুষে পারেনি। মনে হয়, আজকের মানুষ যেন মুক্ত উদার দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বের পানে চাইছে ; মনে হয়, সে নিজের মধ্যে ব্যক্তি বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে একসঙ্গে দেখবে। মনে হয় বিশ্বমানবিক ঐক্যের পথে মানুষের বিজয়যাত্রা নিয়তি নির্দিষ্ট, যদিও এখনও সে নিজে তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারছেনা।

আমার বন্দনা গান

শান্তশীল দাশ

সে কোন দেবতা লাগি'
আমার বন্দনা গান নিত্য ওঠে জাগি'
অন্তরের অন্তস্থল হ'তে ;
ভেসে চলি জীবনের অন্তহীন স্রোতে—
কখন আলোর পথে,
কখন বা গভীর আঁধারে ;
আনন্দের তরংগেতে,
কখন বা বেদনাশ্রুধারে।
আমার অন্তর মাঝে
প্রতিদিন একই সুরে বাজে,
একই গান, একই সে আরতি ;
জানি না সে কার লাগি'
কারে নিত্য জানায় প্রণতি
আমার অন্তর খানি ;
কোন সে অদৃশ্য দেবতারে
বারে বারে,
প্রতিদিন, প্রতিটি সন্ধ্যায়,
হৃদয় সহস্রদলে ফুটে ওঠে,
পুজার্ঘ্য সাজায়।
অন্তরের অন্তরেতে নানারূপে মূর্তি রচি তার ;
বারে বারে মুছে যায় ; এতো নয় আরাধ্য আমার।
রূপের অতীত সে যে,
অধরা সে ধরা নাহি যায় ;
আমার আরতি-মন্ত্র
নিশিদিন তারই পানে ধায়।

কী পেয়েছি তার কাছে,
কেন এই অর্ঘ্য রচনা ?
আমার জীবন-ভোর সুগভীর দুঃখ বেদনা,
কিছু কি কমেছে তার বরে ?
আমার অন্তরে
পুঞ্জীভূত বেদনার রাশি
নিত্য মোরে দগ্ধ করে,
অশ্রুজলে নিত্য যায় ভাসি'
আমার নিশীথ উপাধান ;
তবু তো জাগে না অভিমান
অদৃশ্য সে দেবতার 'পরে ;
আমার জীবন ভরে
দেয়নি সে দান তার করুণা ধারায়,
নিঃশেষে হরণ করে
সর্ব দুঃখ-ব্যথা-বেদনায়।
কিছু কী চেয়েছি তার কাছে ?
আরতির বিনিময়ে কিছু কী প্রসাদ তার
আর্ত হৃদয় মোর যাচে ?
বারে বারে করেছি সন্ধান ;
আমার বন্দনা গান
নির্ঝরের ধারা সম স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ের অর্ঘ্য রচনা।
অদৃশ্যের আরাধনা
নহে কোনো প্রত্যাশা-মলিন ;
আমার হৃদয় মন তৃপ্ত হয়, তাই প্রতিদিন
অর্ঘ্য রচি নিরলস সংগীতের হারে ;
জানে না সে কার লাগি, সে আরতি
তুষ্ট করে কোন দেবতারে।

সমবায় যৌথ-কৃষি

যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

গত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ ভারতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক কৃষিতথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এইক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করা গিয়াছে কিন্তু কৃষক সমাজের ভিতর এই সব আবিষ্কারের ফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেরূপ সাফল্য লাভ সম্ভব হয় নাই, কৃষিবিভাগের চেষ্টার দ্বারা খাদ্য সমস্যার সমাধানের চেষ্টা— আশানুরূপ ফলবতী না হওয়ার ইহাই প্রধান কারণ। ব্যক্তিগত অথবা সরকারী শৈথিল্য ব্যতীতও ইহার কতকগুলি মূলগত কারণ আছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব, অর্থের অনটন, জমিদারী ও ভূমিবণ্টন প্রথা এই প্রচেষ্টার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, বিভিন্নরাজ্যে জমিদারী প্রথা বিলোপের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত মন্থর গতিতে। জমিদারী প্রথার বিলোপদ্বারাই ভূমিবণ্টন প্রথার কুফল দূর হইবে না। সাধারণ কৃষকদিগের জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম, তাহাও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত গ্রামের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। ইহার ফলে নানপ্রকার উন্নত কৃষিপ্রণালীর প্রচলন কষ্টসাধ্য অথবা একেবারে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, ফসলের জন্য আমাদের কৃষকদিগকে সর্ব্বদাই প্রকৃতির মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। যৌথ চেষ্টা ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে সুষ্ঠুভাবে জলসেচের ব্যবস্থা সম্ভব নয়। একই কারণে শ্রমলাঘবের জন্য যন্ত্রের ব্যবহার অথবা ব্যাধি-কীট-পতঙ্গ প্রতিষেধের উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্ভব হয় না। দূরে দূরে অবস্থিত জমিতে যাওয়া-আসা শ্রমসাধ্য এবং এরকম জমিতে চাষও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই সব জমির সীমানার আলগুলি অসংখ্য কীট-পতঙ্গের বাসা—শস্যের হানিকর। জলপ্লাবন-নিরোধ অথবা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও সমষ্টিগত চেষ্টা ভিন্ন সম্ভব নয়। বর্ত্তমান ভূমিবণ্টন প্রথার এই সব কুফলের জন্য ভারতের কৃষি বহু পরিমাণে পিছনে পড়িয়া আছে, অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপন্নের হার অত্যন্ত কম অথচ কর্ম্মকুশলতায় আমাদের কৃষকরা কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে। কৃষিবৈজ্ঞানিকগণ গত ৫০ বৎসর চেষ্টার ফলে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয়, এই কর্ম্মকুশলতা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলের সংযোগের অভাবেই ভারতের কৃষি এখনও এত পশ্চাৎপদ হইয়া আছে এবং খাদ্য সমস্যাও মিটিতেছে না। কৃষকেরা

পরিশ্রমের উপযুক্ত ফললাভ করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য দেশে দুইপ্রকারে এই অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা আছে। ক্ষুদ্র চাষীদের অধিকার বিলোপ করিয়া সঙ্গতিপন্ন ভূম্যধিকারীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কৃষিকার্য্য পরিচালনা। আমেরিকা, গ্রেটবৃটেন, পশ্চিম ইউরোপ প্রভৃতি দেশে এই প্রথারই প্রাধান্য। দ্বিতীয় উপায়টী কৃষকদিগের স্বত্ব লোপের পর গ্রামের সমস্ত জমি একত্র করিয়া একটী কৃষিক্ষেত্র হিসাবে কমিটীর দ্বারা তাহার পরিচালনা। গ্রামের সমস্ত অধিবাসীদের এই সব ক্ষেত্রে কাজকরা বাধ্যতামূলক এবং লভ্যাংশও সমভাবে বণ্টন করা হয়, কমিউনিষ্ট প্রভাবান্বিত অধিকাংশ দেশেই এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে যদিও স্থান কাল পাত্র ভেদে কিছু ইতর-বিশেষ আছে। কিন্তু এর কোনটী ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। শতশত বৎসরের প্রথা এবং ঐতিহ্যের ইহা পরিপন্থী। ইহার যে কোনটী প্রবর্ত্তনের ফলে বহু কৃষকের বেকার হওয়ার সম্ভাবনা এবং তাহার ফলে বিপ্লবও অসম্ভব নহে। এই সব বিষয়ে চিন্তা করিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিশন যে ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়াছেন তাহা মোটামুটী এইরূপ, গ্রামের সমস্ত কৃষকগণ কৃষিকার্য্য পরিচালনার জন্য তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত জমি একটী নির্ব্বাচিত গ্রাম্য পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত করিবেন। এই পঞ্চায়েৎ এই সমস্ত বিভক্ত জমির সীমানা লোপ করিয়া গ্রামের সমস্ত জমি কয়েকটী বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়া একটী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কৃষিকাজ পরিচালনা করিবেন। কোন কৃষকই জমির স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইবেন না। গ্রামের কৃষকেরাই সমস্ত কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু এই কাজ স্বেচ্ছামূলক এবং ইহার জন্য তাহারা উপযুক্ত মজুরী পাইবেন। ব্যয় বাদে উৎপন্ন ফসল বিক্রয়লব্ধ অর্থ অথবা ফসল জমির পরিমাণের অনুপাতে কৃষকদিগের ভিতর ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রণালীর প্রবর্ত্তনের ফলে কৃষকদিগকে মালিকানা স্বত্ব হইতে বিচ্যুত না করিয়াও বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে উন্নত কৃষিপদ্ধতির অনুসরণ করা সম্ভব হইবে। কার্য্যকালে নানারূপ খুঁটিনাটী বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য, তাহা অপসারণের ব্যবস্থাও করিতে হইবে, মালিকানা স্বত্ব হইতে বিচ্যুত না হইলেও কৃষকেরা সহজে জমির পরিচালনার ভার অপরের হাতে দিতে সম্মত হইবে না। অধিকাংশ কৃষক সম্মত হইলেও অন্ততঃপক্ষে কিয়দংশ কৃষক নানারূপ বাধা সৃষ্টি করিবে। ফসল ভাগের সময়ও অত্যন্ত সাবধানতা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে হইবে। পূর্ব্বে গ্রামস্থ নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তিদিগকে এই প্রথার তাৎপর্য্য বিশেষরূপে বুঝাইয়া তাহাদের মাধ্যমে কৃষকদিগের সহযোগিতার চেষ্টা করা দরকার। নানাক্ষেত্রে একযোগে কাজ করা ভারতীয় কৃষিজীবিদের অজ্ঞাত নহে। মরসুমের সময় একত্র চাষ, ধানকাটা, ধান মাড়াই প্রভৃতি কাজ করিতে তাহারা অনভ্যস্ত নহে। কোন কোন প্রদেশে কৃষকাদগের ভিতর সমবায় প্রথার প্রচলনও কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। সরকার ও জনগণের একান্ত সহযোগিতার দ্বারা ধৈর্য্যসহকারে চেষ্টা করিলে এই প্রথার প্রচলন নিতান্ত কষ্টসাধ্য হওয়া উচিত নহে। এপর্য্যন্ত ভূমিবণ্টন প্রথার কুফল নিবারণের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। অবশ্য শুধু ইহার প্রবর্ত্তনের ফলেই সমস্ত সমস্যা মিটিয়া যাইবে না, ইহা প্রাথমিক সোপানমাত্র। কিন্তু এই সোপান অতিক্রম করিতে না পারিলে অন্যান্য উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। যাহাতে ইহা সাফল্য লাভ করে কৃষির উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই সেই চেষ্টা কর্ত্তব্য।

দুঃখের বিষয় পরিকল্পনা কমিশন ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিলেও কোন প্রদেশেই ইহা প্রবর্ত্তনের চেষ্টার কথা বিশেষ শোনা যায় না। উত্তর প্রদেশে কয়েকটী গ্রামে ইহার সূচনা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের মাধ্যমে ইহার সামান্য চেষ্টা করা হইতেছে।

বেতারে পঞ্চবার্ষিকী পারকল্পনার নানাবিধ প্রচার প্রত্যহই শোনা যায়, কিন্তু ভূমিবণ্টন পরিবর্ত্তনের চেষ্টার কোন উল্লেখ থাকে না। ভূদান যজ্ঞের দ্বারা ভূমিহীন শ্রমিকদের কতকাংশের কিছু কিছু জমি মিলিতে পারে বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা ক্ষুদ্র জমির কুফল দূরীভূত হইবে না। এই বিরাট সমস্যার সমাধান ব্যক্তিগত বদান্যতার দ্বারা সম্ভব নহে; ইহা রাষ্ট্রের একটী গুরুতর কর্ত্তব্য। যাহাতে পরিকল্পনা কমিশনের এই সুপারিশ কার্য্যকরী হয় তাহা সরকার এবং দেশবাসী উভয়েরই কর্ত্তব্য। উত্তম বীজ সার প্রভৃতি অধিক পরিমাণে সরবরাহের দ্বারাই খাদ্য-সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। কৃষকগণ যাহাতে এই সমস্ত উন্নত প্রণালীর যথাযথ ব্যবহার করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই মূলবাধা দূর করা সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যতদিন ইহা না হয় ততদিন সরকার এবং কৃষক তাঁহাদের অর্থব্যয় এবং পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন; ভারতের কৃষির মানও অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় পিছনে পড়িয়া থাকিবে।

জড় এবং শক্তি

প্রিয়দারঞ্জন রায়

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে আমরা দু'টি সত্তার নিদর্শন দেখতে পাই। একটি হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় বস্তু, আর একটি হচ্ছে শক্তি যা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, শব্দ ইত্যাদি শক্তির কোন রূপ, আকার, রস বা গন্ধ নাই; কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর কোন না কোন প্রকারে এরা ঘা দিয়ে এদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। বিজ্ঞানীরা এসব শক্তিকে তরঙ্গ বা কণিকারূপে কল্পনা করে। কিন্তু কিসের তরঙ্গ বা কার কণিকা এ কথা বুঝিয়ে বলা সহজ নয়। অবশ্য শব্দকে বলা হয় বায়ুতরঙ্গ। কিন্তু বায়ুতরঙ্গকে শব্দশক্তির কারণ বলা ঠিক হয় না,—উহাকে শব্দশক্তির ক্রিয়ার পরিণাম বললেই সঙ্গত হয়; অথবা তার বাহক বলা যায়। জড়ের আশ্রয় ব্যতিরেকে শক্তির উৎপত্তি ও প্রকাশ আমরা কল্পনা বা অনুভব করতে পারিনা। জড় ও শক্তির এরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্বীকার করেও বিজ্ঞানীরা বহুকাল যাবৎ জড় এবং শক্তিকে দুটি বিভিন্ন সত্তা হিসাবে কল্পনা করতেন। আধুনিক বিজ্ঞান পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেছে যে এ দু'এর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, এরা একই সত্তার শুধু এপিঠ ওপিঠ মাত্র। জড় কণিকাকে শক্তিতে পরিণত করে এবং শক্তিতরঙ্গকে জড় কণিকায় রূপান্তরিত করে আধুনিক বিজ্ঞানীরা এ সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সত্যকেই ভিত্তি করে এটম্ বোমার সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে পরস্পর বিনিময়ের মূল্যও নির্দ্ধারিত হয়েছে বিজ্ঞানীদের গণনা ও গবেষণায়। কি পরিমাণ জড় বস্তু হতে কি পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হতে পারে এর হিসাব স্থির করে দিয়েছেন পরম বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন। এ হতে দেখা যায় যে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম জড়াণু হতে অপরিমেয় শক্তির উদ্ভব হয়। জড় এবং শক্তির পরস্পর এই রূপান্তর এবং প্রতিক্রিয়া অবলম্বন করেই চলছে সৃষ্ট জগতের যত কাজ কারবার।

পৃথিবীতে যেখানে যা শক্তির ক্রিয়া এবং প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তা সবারই উৎস হচ্ছে জড় পরমাণু। এক কথায় বলা যায় যে পৃথিবীর সকল প্রকার সঞ্চিত এবং সক্রিয় শক্তির মূল আধার হচ্ছে সূর্য্য। সূর্য্য-দেহের প্রচণ্ড

উত্তাপে (প্রায় ২০ কোটি ডিগ্রী তাপ মাত্রায়) তার বাষ্পমণ্ডলীর মধ্যে হাইড্রোজেনের পরমাণু সমূহ অহরহ হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। ৪টি হাইড্রোজেনের পরমাণু এক সঙ্গে জুড়ে গেলে একটি হিলিয়াম পরমাণুর সৃষ্টি হতে পারে। একটি হিলিয়াম পরমাণু ওজনে ৪টি হাইড্রোজেন পরমাণু হতে কিঞ্চিৎ বা অতি সামান্য মাত্রায় কম। তাই যখন ৪টি হাইড্রা-জেনের পরমাণু মিলে একটি হিলিয়াম পরমাণুর সৃষ্টি করে, তখন হাইড্রোজেন পরমাণুর সমবেত বস্তুভারের কিঞ্চিৎ হ্রাস ঘটে। ওই ক্ষয় প্রাপ্ত বস্তুভারের হয় তেজশক্তিতে (আলোক এবং তাপ) রূপান্তর। এ হতেই বজায় থাকে সূর্য্যদেহের প্রচণ্ড দীপ্তি এবং তাপ, এ তাপ ও আলোকের কিয়দংশ সূর্য্যদেহ হতে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠে, পৃথিবীর সকল সৃষ্টির কাজ চলছে সূর্য্যদেহ হতে বিকীর্ণ এ তেজশক্তির প্রভাবে। গাছপালার সবুজ পাতায় সূর্য্যের আলোক পরে' বাতাসের অঙ্গারাম্ল এবং উদ্ভিদ্‌দেহের জলের সঙ্গে সংযোজনের সৃষ্টি করে, যার ফলে উদ্ভিদ্‌দেহে প্রস্তুত হচ্ছে শর্করা এবং শ্বেতসার। উদ্ভিদ্ হতে আসে সকল জীবের এবং মানুষের খাদ্য। খাদ্য হতে জন্মায় তাদের শক্তি—মাংসপেশীর জীবনীশক্তি এবং মানুষের পক্ষে আরো তার মস্তিষ্কের বা চিন্তার শক্তি। এ সবারই মূলে রয়েছে সূর্য্যদেহের তেজশক্তি। সূর্য্যের তাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে, সেখানে সে বাষ্প হয়ে যায় মেঘ, মেঘ হতে হয় বৃষ্টি, বরফ এবং শিলা। এরা জোগায় নদীর জল, যাতে বাঁধ বেধে উৎপন্ন করা হয় বিদ্যুতশক্তি। যুগযুগান্তর মাটীতে চাপা পড়ে উদ্ভিদ্‌দেহ হয় কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম। সূর্য্যের তেজ শক্তি রয়েছে তাই এদের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে। কয়লা পুড়িয়ে তার তাপে জলকে বাষ্প করে আমরা চালাচ্ছি রেল্, ষ্টীমার কল কারখানা। পেট্রোলিয়াম হতে তৈয়ার হচ্ছে পেট্রোল, যা দিয়ে চলছে মটরকার এবং এরোপ্লেন। মোটের উপর পৃথিবীতে যে কোন শক্তির প্রকাশ বা ক্রিয়া আমরা দেখতে পাই, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তার মূলে রয়েছে সূর্য্যদেহ হতে বিকীর্ণ তেজশক্তি। সূর্য্যের তেজশক্তি আসছে আবার অণুপরমাণু হতে। সুতরাং সকল শক্তির উৎস হচ্ছে আণবিক শক্তি। কেন না, এক একটা জড় পরমাণু হচ্ছে কেন্দ্রীভূত শক্তির আধার।

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে দু'রকমে শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে। পশু এবং মানুষের খাদ্যের সাহায্যে যে শক্তির উৎপত্তি হয়, তাকে আমরা **জৈবশক্তি** বলতে

পারি। কয়লা, তৈল এবং কাঠ ইত্যাদি পুড়িয়ে যে শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে তার নাম দেওয়া যায় **অজৈব শক্তি** বা **জড়শক্তি**।

জৈবশক্তির মালমশলা, পশু এবং মানুষের খাদ্য তৈয়েরি হচ্ছে প্রকৃতির বিশাল কারখানায় সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে। সূর্য্য দেহ হতে বিকীর্ণ তেজশক্তি রশ্মিরূপে এসে পড়ছে তরুলতার সবুজপাতায় এবং মিষ্টি ও লোনাজলের সবুজ শেওলায়। সবুজপাতার রং ক্লোরোফিল এবং জলের মধ্যে প্ল্যাঙ্কটন জীবাণু এই তেজশক্তির ব্যবহার করে জীবের খাদ্য শর্করা, শ্বেতসার এবং আমিষ ইত্যাদি পদার্থের স্জন করছে। জল, বায়ু এবং মাটীর উপাদান নিয়েই হয় এসব খাদ্যের সৃষ্টি। সবুজ তরুলতা হচ্ছে সূর্য্যের তেজশক্তির পরভৃৎ। মানুষ, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ নানাবিধ জীব এবং ছত্রাক প্রভৃতি জীবাণুগুলি হচ্ছে সবুজ তরুলতার খাদ্যপরভৃৎ, সুতরাং দেখা যায় যে সূর্য্য হতে আরম্ভ করে উদ্ভিদের সাহায্যে, পশুপক্ষী ও অন্যবিধজীব এবং মানুষের ভিতর দিয়া জল বাতাস ও মাটী হতে উপাদান গ্রহণ এবং বিনিময় করে প্রকৃতিতে শক্তির একটি বিরাট চক্র আবর্ত্তিত হচ্ছে। ঐ চক্রের অনুবর্ত্তী ও অধীন জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে পরস্পর খাদ্যখাদকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অথবা বলা যায়, এক সনাতন শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ ; জীবন এবং মৃত্যুর, বিনাশ এবং সৃষ্টির অঙ্গাঙ্গী সংযোগ। একই অনন্ত শক্তির যেন তরঙ্গায়িত আন্দোলন বা উত্থান পতন, সূর্য্য হতে তেজরশ্মি উদ্ভিদের পাতায় পাতায় তৈয়ের করছে মানুষ, পশুপক্ষী এবং অন্যবিধ জীবের জন্য শর্করা শ্বেতসার এবং আমিষ প্রভৃতি খাদ্য সম্ভার, বাতাস হতে অক্সিজেন ও কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড মাটী হতে লবণ এবং জল হতে জল গ্রহণ করে। উদ্ভিদ হতে তাই মানুষ পশু এবং অন্যবিধ জীব গ্রহণ করছে তার খাদ্য এবং খাদ্য হতে শক্তি। অক্সিজেন এবং কারবন ডাইঅক্সাইড জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে আবার বায়ুমণ্ডলে যাচ্ছে ফিরে, জীবজন্তু ও মানুষের মৃত্যুতে এবং তাদের পরিত্যক্ত মলমূত্রাদির সঙ্গে, তথা উদ্ভিদের ও ধ্বংস এবং মৃত্যুতে, তাদের শরীরের উপাদনগুলি যাচ্ছে আবার মাটীর সঙ্গে মিশে। এ ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে, এ ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে জীবের এবং উদ্ভিদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে সংরক্ষিত হয়ে, মৃত্যুই জোগাচ্ছে জীবনের শক্তি এবং জীবনের পরিণতি হচ্ছে মৃত্যুতে, এ চিরন্তন চক্রের মধ্যে মানুষ পড়েছে ধরা—তারই একটি অংশ হিসাবে ধূলি হতে জন্ম নিয়ে সে ধূলিতে যাচ্ছে আবার মিশিয়ে। কিন্তু

মানুষ নিতান্ত অসহায়ভাবে এতে ধরা পড়েনি ; কেননা সে এ চাকার গায়ে নিজের হাত লাগাচ্ছে। যদিও সে এ চাকার ঘুরণি বন্ধ করতে পারে না তথাপি তার ঘুরণির বেগ পারে কিছু বদলে দিতে, এবং তার পেষণ হতে নিজেকে পারে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তি দিতে। তাই মানুষ আজ তার শারীরিক শক্তিকে, যা সে তার খাদ্যে সঞ্চিত সূর্য্যের শক্তি হতে গ্রহণ করে, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জেনে অন্য উপায়ে সূর্য্যের শক্তিকে নিজের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছে। শর্করা ও শ্বেতসার রূপে উদ্ভিদে সঞ্চিত সূর্য্যের তেজ-শক্তিকে সে সুরায় পরিণত করে মটর চালাচ্ছে; কয়লা পুড়িয়ে রেলষ্টীমারে যাতায়াত করছে এবং কাঠ পুড়িয়ে আগুণ জ্বালাচ্ছে। এ ছাড়া, মানুষের জীবনী এবং মস্তিষ্কের শক্তিও আসছে তাদের খাদ্যের মারফৎ সূর্য্যের তেজশক্তি হতে, এদের বাহ্যিক প্রকাশ প্রবল না হলেও এরা হচ্ছে সকল শক্তির কলকাঠি।

তাই বলা যায় বিশ্বরাজ্যে চলছে শুধু এক আদিম অনন্ত শক্তির উত্থান পতন ও লীলাখেলা। এ শক্তিচক্রে বাধা রয়েছে জড এবং জীব। ঘূর্ণিপাকে বাঁধা পড়ে শক্তি হয় জড়ের ধর্ম্মী ; তাই জড় এবং শক্তিতে নাই কোন ভেদাভেদ। অনুপরমাণুর অন্তর হতে উদ্ভব হচ্ছে সকল শক্তি, আবার শক্তির ঘূর্ণি হতে জন্ম নিচ্ছে অনুপরমাণু, সূর্য্য হতে যে তেজশক্তি পৃথিবীতে আসছে তার অতি সামান্য অংশ মাত্র মানুষের কাজে লাগে, বাকী বেশির ভাগ অকেজো হয়ে ছড়িয়ে আছে। এই অকেজো শক্তিকে যতই কাজের উপযোগী করে তোলা যাবে, ততই মানুষের অভাব অনটন যাবে কমে। এরই প্রচেষ্টায় ব্যবহারিক বিজ্ঞান আছে মেতে, কিন্তু এটম্ বোমার মত যদি একে শুধু ধ্বংসের কাজের উপযোগী করে তোলা হয়, তবে মানুষের ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার, এবং মানব সভ্যতার হবে নিদারুণ অপঘাত।

মৃত নদী

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

নদীর দুকূলে অরণ্য ঘনতর :
মরা মজা নদী শান্ত দুখানি চর
ভগ্ন ডানার মতন ফেলেছে আজ,
রংছুট তার পুরাতন কারুকাজ !
সেখানে সূর্য সোনার স্বচ্ছ আলো
দিতেও পারে না, এ-আঁধার এত কালো,
নিঃসীম সেই রাত্রির নির্জনে
যদি কোন এক অতর্কিতের ক্ষণে
দেখি ধু ধু কাশ শ্বেতাভা ছড়িয়ে যায়,
—প্রবীণ বৃদ্ধ অনেক জেনেছে হায়—
ভাল লাগে তার করুণায় ছলছল
দুটি চোখে কিছু পুরাতন কল্লোল
গ্রামগঞ্জ ও বন্দরকাহিনীর,
মর্মর জাগে হৃদয়ের তন্ত্রীব—
বৃদ্ধ সেই যে নদীর নিরালা তীরে
কত কথা শুনি কত কাহিনীর ভিড়ে !

সাময়িকী

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল জন্ম-শতবার্ষিকী : ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের জন্ম-শতবার্ষিকী কমিটীর ১৯শে ভাদ্র ১৩৬০ তারিখের দ্বিতীয় অধিবেশনে নিম্নোক্ত কার্য্যক্রম গৃহীত হইয়াছে :—

যেহেতু বর্ত্তমান বিবদমান বিশ্বের জটিল সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধান কল্পে ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের জড়-চৈতন্য সমন্বিত সহজ জীবন ও জীবন-দর্শন জনসাধারণের সম্মুখে অনতিবিলম্বে উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া এই কমিটী মনে করেন, এবং যেহেতু ব্যক্তি জীবনের আত্মশুদ্ধি, সমষ্টিজীবনের সঙ্ঘবদ্ধতা ও কল্যাণের জন্য এবং ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের প্রবর্ত্তিত মিশনের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকীর একটী সার্ব্বজনীন

উৎসবের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, যেহেতু সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের মহা-মিলনের বীজ-শক্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের জীবনদর্শনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে এবং তাহার ভিতরেই সর্ব্বসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র রচিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই হেতু অদ্যকার এই সভা ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের জন্ম-শতবার্ষিকী কমিটীর অনুমোদন ক্রমে নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচী গ্রহণ করিতেছেন :

১। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-দর্শন বিষয়ে অভিজ্ঞ বক্তা ও প্রচারক নিযুক্ত করিয়া এখন হইতেই সহর ও মফঃস্বলে তাঁহার বিষয়ে প্রচার-কার্য আরম্ভ করা হউক।

২। ১৩৬০ সালের বাসন্তী অষ্টমী তিথি হইতে ১৩৬১ সালের বাসন্তী অষ্টমী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীদেবের শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হউক।

৩। সমসাময়িক দৃষ্টিতে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থাবলম্বন করা হউক।

৪। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি-বিজড়িত প্রসিদ্ধ স্থানগুলিতে স্মৃতি-ফলক রাখিবার ব্যবস্থা করা হউক।

৫। শ্রীশ্রীদেবের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হউক।

৬। শ্রীশ্রীদেবের লিখিত যে সকল প্রবন্ধ অথবা গ্রন্থ এখনও পর্য্যন্ত অমুদ্রিত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে, সম্ভব হইলে তাহা এই জন্ম-শতবার্ষিকীর মধ্যেই প্রকাশ ও মুদ্রনের ব্যবস্থা করা হউক।

৭। যে যে স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন সময়ে সাময়িকভাবে গিয়াছেন ও অবস্থান করিয়াছেন সেই সেই স্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা হউক।

৮। জনসাধারণের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষার বহুল প্রচারের নিমিত্ত সহর ও মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা ও সভার অনুষ্ঠান করা হউক।

৯। মহানগরী কলিকাতা কেন্দ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদর্শিত সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয়ের ভিত্তিতে ধর্ম্ম সম্মেলনের ব্যবস্থা এবং তৎপর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি ও বিভিন্ন স্থানে অনুরূপ সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হউক।

১০। পাণিহাটী, হুগলী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তিথি বিশেষে গমনের ব্যবস্থা করা হউক।

১১। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকাশিত গ্রন্থাদি সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য উপযুক্ত

গৃহ, লাইব্রেরী ও গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া পাঠক-পাঠিকাদের অধ্যয়নের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক।

বেকার সমস্যা: বেকার সমস্যার বিভিন্ন সংস্থায় অতঃপর অধিক সংখ্যায় বাঙ্গালীদের নিয়োগ সম্পর্কে সরকার হইতে কোন নির্দ্দেশ দেওয়া যায় কিনা, এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে বাঙ্গলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ১৪ই সেপ্টেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা কালে বলেন যে, নির্দ্দেশ দিলেই বা কতদূর কাজ পাওয়া যাইবে, যে কাজ যাহারা করিতে পারেন। সেই কাজে তাহাদের নিয়োগ করায় কিছু লাভ আছে কি? তিনি আরও দুঃখ করিয়া বলেন যে, কিছুকাল আগে পাট- কল গুলিতে প্রায় ৫০০০ উদ্বাস্তু নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষণে তন্মধ্যে ৫০০ জনও সেই কাজে নিযুক্ত আছে কিনা সন্দেহ। তিনি আরও বলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (শ্রীকিরণ শঙ্কর রায়ের কার্য্যকালে) গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীদের মধ্যে ২০০ ট্যাক্সির লাইসেন্স দেন, তন্মধ্যে এক্ষণে মাত্র ৪টী ট্যাক্সি বাঙ্গালীদের হাতে আছে, নূতন যে ১০০ লরী ও ট্যাক্সির লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে, সে গুলিও যাহাতে মূলগ্রহীতাদের হাতে থাকে, তজ্জন্য কতকগুলি সর্ত্ত আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তাহাদেরও উদ্দেশ্য সফল হইবেনা। ডাক্তার রায় অবশ্য বলেন যে সব বাঙ্গালীই এইরূপ তাহা তিনি বলেন না। অগ্রগামী দলে অনেক বাঙ্গালী যুবক দুইমণ পর্য্যন্ত মোট মাথায় বহন করিতেছে, অনেক ষ্টেসনে অনেক বাঙ্গালী কুলিগিরি করিতেছে, জাহাজেও অনেক বাঙ্গালী শ্রমসাধ্য কাজ করিতেছে।

বাঙ্গালী যুবকদের এই কর্ম্মবিমুখতার জন্য দায়ী কে? বাঙ্গালী বহুদিন হইতেই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতেছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের এজন্য দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। সর্ব্বক্ষেত্র একরূপ বাঙ্গালীর হাতছাড়া। তাই বাঙ্গালাদেশ আজ বেকার-সমস্যায় জর্জ্জরিত। কোনও নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিবার যোগ্যতা তো দূরে থাকুক, যে কর্ম্ম তাহাদের সামনে 'বৃত্তি' হিসাবে পুরুষানুক্রমে গচ্ছিত ছিল, তাহাও তাহারা ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে। বাঙ্গালী ধোপা-নাপিতের ক্ষেত্র অবাঙ্গালী আসিয়া দখল করিয়াছে। কুলী-মুটে-মজুর কয়জন বাঙ্গালী আছে? ট্যাক্সি-চালকদের মধ্যে বাঙ্গালী কয়জন? ২০০টী লাইসেন্স-প্রাপ্ত টাক্সি-চালকদের সংখ্যা কমিয়া ৪টীতে পরিণত হইয়াছে। ফলওয়ালা, কাপড়-ফেরিওয়ালা, কেন

বাঙ্গালী হয় না? কেন ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর মধ্যে বাঙ্গালীর স্থান নাই? কেন মারোয়াড়ি, বোম্বাইওয়ালা বাঙ্গালার ব্যবসার ক্ষেত্র দখল করিয়া বসিয়া আছে? বাঙ্গলার পাচক ব্রাহ্মণের মধ্যে কয়জন বাঙ্গালী? কেন এমন হইল?

যেদিন ভারতবর্ষ 'নৈষ্কর্ম্ম্য'কেই জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, সেই দিনই এই কর্ম্মবিমুখতার বীজ এদেশে উপ্ত হইয়াছে। কর্ম্মশূন্য জ্ঞান-সাধনা মানুষকে তাহার স্বস্থান ও স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত করিল। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার বিশেষভাবে বাঙ্গলা যখন কর্ম্মশূন্য ভক্তি-সাধনার আস্বাদন পাইল, তখন সে আরও কর্ম্মবিমুখ হইল। মহাত্মাজী এই দুর্দ্দশার কথা জানিয়াই লিখিয়াছিলেন, এদেশে কর্ম্মের সঙ্গে বুদ্ধির বিরোধ চলিয়া আসিয়াছে, যাহার ফলে এদেশে মহা অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সামনে তাই তিনি গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার ভিতর ছিল দেশ সম্বন্ধে দিব্যকর্ম্ম, দিব্যজ্ঞান ও দিব্যভক্তির সমন্বয়। বাঙ্গালী সে কর্ম্মপদ্ধতি নেয় নাই। যাহারা নিজের কর্ম্ম নিজেরা করে না, তাহারা নিজের কর্ম্ম নিজেরা সু-কৌশলে না করার জন্যই স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরে। তখন স্ব-ভাবতঃই সে নিজের বিপদের জন্য পরকে দায়ী করে, পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজের সাফাই নিজেরা গায়। যাহারা খোলা মাঠ পাইয়া বাহির হইতে আসিয়া 'বাঙ্গলাকে' ওষ্ঠে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের গালাগালিতে আমাদের যে উৎসাহ, সে উৎসাহ নিজেদের কর্ম্ম নিজেদের হাতে করিবার জন্য নাই। আমরা তাই ভাল সমালোচক, কর্ম্মী নই। বহির্ম্মুখ কর্ম্মবিমুখ একটি জাতিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া তাহাদের স্বকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করা, এই স্বকর্ম্মের সাধনার ভিতর দিয়া সঙ্ঘবদ্ধ একটি জাতি সৃষ্টি করা এবং এই সঙ্ঘবদ্ধতার ভিতর দিয়া যাহারা আমাদের কর্ম্ম-ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত বা লুপ্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে ও করিবে, তাহাদিগকে গ্রাস করিবার একটী সহজ কৌশলের খবর গান্ধীজী পৌঁছাইয়াছিলেন। আমরা তাহা নেই নাই।

ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার একরূপ-সহজাত এই কর্ম্মবিমুখতার প্রশ্রয় দিল, ইন্ধন যোগাইল ব্রিটিশ সরকার। তারা একদল কেরাণী সৃষ্টি করিবার জন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিল। বাঙ্গালীর বুদ্ধিকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়া জয় করিল। বাঙ্গালী ভাল কেরাণী বনিল। এইভাবে একদল 'ভদ্রলোক'

পরগাছারূপে উচ্চস্তরে অবস্থিত শোষক ও নিম্নস্তরে অবস্থিত শোষিতদের মাঝখানে থাকিয়া শোষকদের হাতের পুতুল হইয়াই রহিল। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইহাদের অন্তর্গত। ইহারা রাজা-মহারাজা-জমিদার, বড় বড় ব্যবসায়ীদের দালালরূপে কাজ করিতে লাগিল এবং উচ্চ-নীচের মধ্যের ব্যবধানকে আরও বাড়াইয়া চলিল। ধনী-দরিদ্রের মধ্যবর্ত্তী এই শ্রেণী ধনী-দরিদ্রের উভয় কূলে যাতায়াত করিতে পারে বলিয়া সমাজের কল্যাণও যেমন করিতে পারে, ক্ষতিও করিতে পারে ইহারা তদ্রূপ। ব্রিটিশ এই মধ্যবিত্তদের শোষণের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছিল। ইহারা নিম্নস্তরে আসিয়া তাহাদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করিতেও সক্ষম নয়; আবার বড়দের মধ্যে ঠিক তাহাদের মত মেজাজী ও শোষক হইবার সামর্থ্যও রাখে না। যাহাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বেশ চলিয়াছিল, সেই ব্রিটিশ চলিয়া যাইবার পর ইহারা অথই জলে পড়িয়াছে। আজ বিশ্বময় সর্ব্বক্ষেত্রে 'Middle man' তুলিয়া দিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলিতেছে। 'Middle'-কে exclude করিয়া এতদিন ধনিক শ্রেণীর হাতে নিয়াছিল সমাজ গড়িবার দায়িত্ব, সে দায়িত্ব তাহারা সুষ্ঠুভাবে পালন তো করিতে পারেন নাই, বরং সমাজ আজ তাহাদের হাতে পড়িয়া দুর্দ্দশার চরমে আসিয়াছে। Middle-কে বাদ দিয়া চলিবার সেই নীতিই আবার শ্রমিকদের হাতে সমাজ সঁপিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত। দুই-ই একদেশদর্শী নীতির উপাসক, কাজেই উহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বাদ দিয়া ধনিক বা শ্রমিক কেহই ধনিক-শ্রমিক সমন্বিত, রাজা-প্রজা সমন্বিত সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিবে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বিপ্লবের অধিকারী; কেননা, তাহারা অতি-ধনিকও নয়, অতি-শ্রমিকও নয়। তাই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গলা দেশে বিপ্লবের আগুন লইয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধন ও শ্রম দুই-ই একান্তভাবে বন্ধনের সৃষ্টি করে। তাই অল্প-ধনী ও অল্প-শ্রমিক মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীই বাঙ্গলায় বিপ্লবের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু ধন ও শ্রমের অল্পতার ফলে বিপদেও পড়িয়াছেন তাঁহারা সব চেয়ে বেশী; তাঁহাদের সম্বল প্রচুর ধনও নয়, প্রচুর শ্রমও নয়। তাঁহাদের সামনে কোনও পজিটিভ দর্শন না থাকার ফলে, ধন ও শ্রমের সমন্বয় দর্শন না থাকারফলে তাহারা আজ ধনীর যোগ্যতা এবং শ্রমিকের যোগ্যতা কোনটাই অর্জ্জন করিতে পারিতেছে না। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ ধনিকের দলেও ভিড়িতে পারিতেছে না, শ্রমিকের দলেও মিশিতে

পারিতেছে না; অথচ শক্তি রহিয়াছে ঐ দুইটি শ্রেণীর মধ্যেই। ধনশক্তি ও শ্রমশক্তিই সমাজের মূল শক্তি। বাঙ্গালীরা ধন-সন্ন্যাস ও শ্রম-সন্ন্যাস ভাল বোঝে; তাই তাহারা ভাল বিপ্লবী হয়। তাহারা ধন-সৃষ্টি ও শ্রম-সৃষ্টির কৌশল শেখে নাই। কিন্তু এই নেতিবাদের সাধনায় তো শেষ রক্ষা হইবে না; চাই আজ ধন-শ্রম সমন্বয়। এই সমন্বয় বিধান করিতে ধনিকও পারিবে না, শ্রমিকও পারিবে না; একমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এই সমন্বয় বিধানে সক্ষম।

ব্রিটিশ এই শ্রেণীটী গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহারা একরূপ ধন-নিরালম্ব ও শ্রম-নিরালম্ব; এবং এই নিরালম্ব মধ্যবিত্তদিগকে ব্রিটিশ পঙ্গু করিয়া রাখিতেই চাহিয়াছিল। যাহা ছিল এতদিন 'অযোগ্যতা', আজ ব্রিটিশ চলিয়া যাওয়ার পর তাহাই পরিণত হইতে চলিয়াছে 'যোগ্যতা'য়। মধ্যবিত্ত না ধনিকের না শ্রমিকের বলিয়াই সে দুইয়ের মধ্যে একটি নিবিড় সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে পারিবে। ধন-পঙ্গু ও শ্রম-পঙ্গু মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ধন-শ্রমের সমন্বয় দ্বারা বাঙ্গলাকে উদ্ধার করিবে, ধনিক-শ্রমিকের বিশ্বময় সঙ্ঘর্ষ হইতে ভারতকে ও তাহার মাধ্যমে বিশ্বকে রক্ষা করিবে।

যেদিন ভারতসরকার পররাষ্ট্রনীতি হিসাবে কোন ব্লকে যোগদান না করিয়া দুই ব্লকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দুই ব্লককে সমন্বিত করিবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সেইদিন হইতে স্বরাষ্ট্রের মধ্যেও ধনিক-শ্রমিক কোন ব্লকে যোগদান না করিয়া দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া দুইয়ের মধ্যে দুইকে গলাইয়া এক অখণ্ড রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাই ভারত সরকারের উপর ধনিক বা শ্রমিক কেহই সন্তুষ্ট নয়। শ্রমিকেরা বলে, 'এ গভর্ণমেণ্ট ধনিকদের'; পক্ষান্তরে ধনিকগণ বলে 'এ সরকার শ্রমিক-ঘেসা'। যাহারা মাঝখানে থাকিয়া সালিশী করিতে চায়, তাহারা দুইপক্ষের কাহারও মনোরঞ্জন করে না। ভারতবর্ষ 'arbitration' দ্বারাই, পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই, হৃদয়ের আদান-প্রদান দ্বারা ধনিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের সমাধান করিতে চায়। এই পন্থা বর্ত্তমান বিশ্বে অভিনব, অথচ ইহা যুগাদর্শ-সম্মত। বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ও দর্শন 'Law of Excluded Middle' পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরবিরুদ্ধদের 'half-tone' এর মধ্যে আলো-ছায়ার সমন্বয়ের মত সমন্বয় বিধান করিতে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্রক্ষেত্রেও ইহার অন্যথা হইবে না। শিক্ষিত ভারতীয় ও বাঙ্গালী বেকার যুবকদের দশা বর্ত্তমান ভারত

সরকারেরই মত আকাশস্থ, নিরালম্ব, বায়ুভূত ও নিরাশ্রয়। ভারত সরকার যত শীঘ্র এই সব যুবকদেব আকর্ষণ করিতে পারিবেন, তত শীঘ্র বিশ্বে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। সর্ব্ব প্রথমে ভারতসরকারের কর্ত্তব্য হইবে দার্শনিকভাবে শ্রম-ধনের সমন্বয়দর্শনকে ঝড়ের মত ছড়াইয়া দেওয়া। এই সমন্বয়দর্শন প্রচারিত হইলে ধনিক শ্রমিকমুখী হইবে, শ্রমিকও ধনিকমুখী হইবে। তখন মধ্যবর্ত্তী মধ্যবিত্ত বেকার যুবকদল শ্রমের বার্ত্তা ধনিকদের কাণে, ধনের বার্ত্তা শ্রমিকদের কাণে পৌছাইতে পারিবে। যতই ধনিক-শ্রমিকদের মধ্যে আনা-গোনা মধ্যবর্ত্তীদের পক্ষে সহজ সরল হইবে, ধনিক-শ্রমিকদের ব্যবধান কমিয়া আসিবে এবং মধ্যবর্ত্তী দল হিসাবে যুবকগণ দুইয়ের সেবা করিয়া নিজেদের জীবিকার সংস্থান তো ছোট কথা, সমস্ত জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আঁকিয়া তুলিতে পারিবে। একান্ত ধনও কর্ম্ম সৃষ্টি করিতে পারে না, একান্ত কর্ম্মও কর্ম্ম সৃষ্টি করিতে পারে না। একান্ত দুই-ই ক্লৈব্যে পরিণত হয়। সরকার ও মধ্যবর্ত্তী দল যদি এই ধন-শ্রম সমন্বয়-দর্শন, বুদ্ধি-শ্রম সমন্বয়দর্শন প্রাণ খুলিয়া বরণ করে, তবে প্রত্যেকের শোষণ করিবার শক্তি পোষণ শক্তিতে গড়িয়া উঠিবে। ভারতসরকারের কোনও ব্লকে যোগদান নীতি সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান ছিল। কিন্তু ভারতের এই নীতি যে বিশ্বসমস্যা সমাধানে কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে এবং উদ্ভূত প্রভাব যে কতদূর রাষ্ট্রসমূহের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের রাষ্ট্রপুঞ্জে সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোনও ব্লকে যোগদান না করিয়া আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া যদি ভারতের যুবকদল গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে, তবে সরকারও যদি কখনও ধনিকদের দিকে ঘেঁসিয়া পড়েন বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তাহারা সরকারকেও সংযত করিবার শক্তি পাইবে। উচ্ছৃঙ্খল ভাবালুতা—তাহা ধনিকদের বিরুদ্ধেই হউক, বা কোনও শ্রেণীর বিরুদ্ধেই হউক, কোনও স্থায়ী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে পারে না, ভারতের যুবকগণ আজ সংযত হউক, সংহত হউক, বিশ্বসমস্যা সমাধানের ভার তাহাদের হাতেই।

বন্দেমাতরম্

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গ্রিয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উদ্বোধন

৬৫ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৩৬০

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালজন্ম-শতবার্ষিকী

স্মৃতিপূজার প্রস্তুতি

৮

প্রাণসাধনা

শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন: 'এক ব্যক্তি হীরক পাইয়াছে, অথচ সে হীরক চেনেনা। সুতরাং সে হীরকের মর্ম্মও বোঝে না। ছদ্মবেশী ভগবান পাইয়াছ, অগ্রে তাঁহাকে চেন, তবে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিবে।' শুধু পাইলেই মানুষের পাওয়া হয় না। মানুষ পায় বিশ্বের যাবতীয় বড়-কিছু অযাচিত করুণায়। কিন্তু সেই পাওয়াকে সকল দেহপ্রাণমন দিয়া পাইতে হইলে পাওয়ার অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়। শিশু হীরক পাইয়াছে; কিন্তু যতক্ষণ না সে উহা চিনিতেছে, উহার মূল্য অবধারণ না করিতে পারিতেছে, ততক্ষণ সে উহা একটী মার্ব্বেলের বদলে অনায়াসেই দিয়া দিতে পারে। হীরক পাইলেও উহাকে না-চেনা পর্য্যন্ত, মূল্য সম্বন্ধে দিব্য জ্ঞান না জন্মান পর্য্যন্ত সত্য বাস্তব রূপে উহা পাওয়া হয় নাই। পাওয়ার পরই আসে পাওয়ার অধিকার অর্জ্জন করিবার জন্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান ও প্রেম। কোন বস্তু পাইয়াছি জানা পর্য্যন্ত জ্ঞান-সাধনা এবং তাহাকে সযত্নে রক্ষা করা ও আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা প্রেম-সাধনা। পাইয়াছি জানিতে হইবে এবং 'হারাই হারাই সদা বাসি ভয়' এই আকুতি দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। কোন বস্তু পাইয়া পকেটে রাখিলাম, জানিলাম পাইয়াছি। কিন্তু তাহাকে যদি রক্ষা করিতে না জানি, সে বস্তু তো পকেটমার হইয়া খোয়া যাইতে পারে। ভগবানকেও পাওয়ার পরে প্রেমের সচেতনতা দ্বারা তাঁহাকে রক্ষা করিলেই পাওয়া হয়।

আলো-বাতাস আমরা অযাচিত ভাবে পাই, মাতৃস্নেহ আমরা অযাচিত ভাবে পাইয়াছি। সাধনা করিয়া কেহ আলো-বাতাস পায় না, মায়ের কাছে সাধ্য-সাধনা করিয়া কেহ মাতৃস্নেহ পায় না। সহজভাবেই মানুষ আলো-বাতাস পায়, মায়ের স্নেহ পায়। কিন্তু পাইলেই তো পাওয়া হয় না। পাওয়ার পর উহাদিগকে ব্যবহারে লাগাইবার জন্য, অধিকার অর্জ্জন করিবার জন্য সাধনার আশ্রয় লইতে হয়। প্রাণ-সাধনায় পাওয়া আগে, অধিকারী হওয়া পরে ; সিদ্ধি আগে, সাধনা তাহার পরে। মানুষ সব-কিছু বড়কে, ব্রহ্মবস্তুকে 'পাইয়াই' আছে ; নাই শুধু তাহার সঙ্গে জ্ঞান। স্বতঃসিদ্ধ এই পাওয়াকেই সকল দেহপ্রাণমন দিয়া পাওয়ার নামই সাধনা। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা পরস্পরকে পাইয়াছে সারা বিশ্বের অন্তরালে কণ্বের আশ্রমে। তাহার সাক্ষী ছিলেন কণ্বের আশ্রমের কয়েকটী অন্তরঙ্গ মানুষমাত্র। কিন্তু সেই পাওয়াও না-পাওয়ায় পরিণত হইল, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে একেবারেই চিনিতে পারিলেন না, যখন শকুন্তলা দুষ্মন্তের দেওয়া অভিজ্ঞান-আংটী হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রথমে একবার পাওয়া, মাঝখানে পরস্পর-বিচ্ছেদ, শেষে আবার পাওয়া—ইহাই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে 'পাওয়ার' ক্রম। জীবনে স্বতঃসিদ্ধ পাওয়াও যেমন অনিবার্য্য অপরিহার্য্য পরম সত্য, হারানোও তেমনি পরম সত্য, এবং হারানোর পর আবার পাওয়াও অনিবার্য্য পরম সত্য। এই দ্বিতীয়বা্র পাওয়াই 'অভিজ্ঞান'—ইহাই গীতার 'অভিজানাতি' পদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। শ্রীভগবান বার বার 'অভিজানাতি' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি'। পূর্ব্বজ্ঞাতস্য জ্ঞানম্ অভিজ্ঞা।' পূর্ব্বে যাহা একবার জানিয়াছি, আবার তাহা না-জানায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহার পর আবার জানাই অভিজ্ঞান। মানুষ ভগবানকে পাইয়াই আছে। 'পাই নাই, পাইব'—ইহা প্রজ্ঞাবাদের সাধনা। প্রাণবাদের সাধনা হইতেছে স্বতঃসিদ্ধ সহজ পাওয়াকে সাধকের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে আস্বাদন করা। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা যে-পাওয়া পাইয়াছিলেন বিশ্ববাসীর অন্তরালে গোপনে কণ্বের আশ্রমে, সেই পাওয়াকে দুনিয়ার বুকে দিবালোকে প্রকাশ্যে রাজদরবারে পাওয়ার জন্যই না-পাওয়া রূপ একটী স্তরের প্রয়োজনীয়তা ছিল। জীব যেমন 'হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্' বস্তুকে পাইয়াই আছে, তেমনি তাঁহাকে প্রকাশ্য দিবালোকে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে সর্ব্ব সাধারণের মধ্যেও পাইবে। প্রকৃতির ও-পারে পাওয়া ব্রহ্মবস্তুকে পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে

সর্ব্ব তত্ত্ব দ্বারা পাইবার জন্যই প্রাণসাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সাধনার ধারক ও বাহক শ্রীনিত্যগোপাল ; তাঁহার আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক।

শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন : 'অধিকাংশ বৃক্ষের আগে ফুল, পরে ফল, কোন কোন বৃক্ষের আগে ফল, পরে ফুল। আমার নিকটও আগে ফল, পরে ফুল।' এই তত্ত্বকে সাধনার ভাষায় ব্যক্ত করিয়া তিনিই লিখিতেছেন : 'ভক্তিযোগ সাধনাদ্বারা সিদ্ধি লাভ না করিলে শ্রীভগবানের আশ্রিত হওয়া যায় না, ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু স্বয়ং শ্রীভগবান কৃপা করিয়া কোন ব্যক্তিকে তাঁহার আপনার শরণাপন্ন করিলে ভক্তিযোগ সাধনাদ্বারা সিদ্ধি-লাভের অপেক্ষা করিতে হয় না। শ্রীভগবানের কৃপায় ভক্তিযোগ সাধনা না করিয়াও সে ব্যক্তি তদ্বিষয়িণী সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীভগবানের আশ্রিত হইতে পারিলে—শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারিলে, ভক্তিযোগ বিষয়িণী কোনপ্রকার সিদ্ধিরই অভাব হয় না। উত্তম ফলের বৃক্ষলাভ হইলে উত্তম ফলও লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান নামক পরম-বৃক্ষ লাভ হইলে, সেই বৃক্ষের সমস্ত ফলই লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানই পরম সাধ্য। সেই সাধ্য-বস্তুকে লাভ করিলে পরমা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে—সেই সাধ্যবস্তুকে লাভ করিলে আর সাধনার প্রয়োজন হয় না।'—ভক্তিযোগদর্শন (শ্রীনিত্য-গোপাল প্রণীত), পৃঃ ১২৬—২৭। উপরে উদ্ধৃত বাক্য হইতে স্পষ্টতঃই উপলব্ধ হইবে যে, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সাধনা নিরপেক্ষ স্বরূপসিদ্ধ একটী যোগসূত্র রহিয়াছে, যাহার ফলে সাধনা-শক্তির সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়ায় পরকীয়। ভক্তের ভগবানকে পাওয়া সাধনার ফল নয়। ভক্ত ভগবানকে সহজভাবেই অসাধনে পাইয়া আছে। ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধ নিতান্ত সহজ বলিয়াই এইরূপ সম্ভব হয়।

সাধনা-নিরপেক্ষ ভক্ত-ভগবানের এই সহজ সম্বন্ধের উপর দাঁড়াইয়াই শ্রীনিত্যগোপাল সব সাধ্যসাধন তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এতদিনের সাধনা আরব্ধ হইয়াছে জীবের বিচ্ছিন্ন 'আমি' হইতে, যে আমির কাছে আমি ও ভগবান পৃথগ্‌ভূত। ভক্ত-ভগবানের এই পৃথগ্‌ভূত সম্বন্ধকে ভিত্তি করিয়াই কর্ম্মসাধনা, জ্ঞানসাধনা, ভক্তিসাধনা ও যোগসাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; যাহার ফলে কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগও পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িল এবং সর্ব্বসাধনাই সগুণ স্তরে রহিয়া গেল। এই ভাবে কর্ম্মী-জ্ঞানী-ভক্ত-যোগী পরস্পর বিরুদ্ধ

পৃথক পৃথক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিল; ইহার ফলে সর্ব্বসাধন সমন্বয়, সর্ব্বসিদ্ধি সমন্বয়, সর্ব্বসাধক সমন্বয় অসম্ভব হইয়া রহিল। শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছেন ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সহজ নিত্যযুক্ততার উপর দাঁড়াইয়া সর্ব্বসাধন সমন্বয়, সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বয়, সর্ব্বসাধকসমন্বয়ের বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য। ইহার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ এই সংসারের মাতাপুত্র সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিতেছেন: 'শৈশবে মাতা-পিতার সহিত কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারা যায় না। জীবের জীবনের যৌবনকালেই মাতাপিতার সঙ্গে কি সম্বন্ধ তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। সন্তানের, তাঁহাদের সম্বন্ধে, সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি হয়। মাতাপিতাকে সন্তান যত বুঝিতে পারেন, ততই তাঁহার নিজ মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়। পরমেশ্বরের সঙ্গে জীবের কি সম্বন্ধ তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদয় হয়। বিশেষতঃ শিশু অথবা বালক আপনাকে নিজ পিতা-মাতার অংশ নিজ পিতা-মাতা জানে না। তাহার পিতামাতা এবং সে অভেদ জানে না। যে অবস্থায় সেই শিশু বা বালক নিজ পিতা-মাতার সহিত নিজেকে অভেদ বোধ করে, তখনই তাহার স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাভক্তি হয়। তাহা হইলে অদ্বৈত জ্ঞান বশতঃ শ্রদ্ধাভক্তি হয় স্বীকার করাও যায়।' শ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৫০-৫১।

সন্তানের সঙ্গে তাহার মাতাপিতার সম্বন্ধ 'সহজ' বলিয়াই সন্তান মাতা-পিতার অংশ মাতাপিতা, অদ্বৈত। অদ্বৈতানুভূতি ব্যতীত মাতাপিতার প্রতি সন্তানের কখনও শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে না। তাই শিশুগণকে মুখস্থ করান হয় 'দশ মাস দশদিন ধরিয়া জঠরে' মাতা মাতা হন। সন্তান যতই এই সহজ সম্বন্ধকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে, ততই সহজে তাহার মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি হইবে। কিন্তু সন্তানের এই অদ্বৈতানুভূতি ও তাহার ফলস্বরূপ শ্রদ্ধাভক্তির উদয় মোটেই স্বাভাবিক হইবে না, যদি না মাতাপিতার নিজ সন্তান সম্বন্ধে সহজ একটী অদ্বৈতানুভূতি থাকিত, সন্তানের প্রতি একটী সহজ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত। মাতা দশমাস ধরিয়াই উপলব্ধি করিয়াছে যে, সন্তান একদিন তাহারই জঠরে ছিল, একাত্ম হইয়া ছিল। মায়ের পক্ষে এই উপলব্ধি এতই সহজ যে, সে ও তাহার সন্তান এক ও অদ্বৈত। মূলে মায়ের এই সহজ অদ্বৈতানুভূতি আছে বলিয়াই সন্তানের পক্ষে একদিন অদ্বৈতানুভূতি সম্ভব হয়। 'মাতাপুত্র এক অদ্বৈত'—মায়ের এই সহজ জ্ঞানের উপরে সন্তান

না দাঁড়াইয়া নিজের বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া মাতাকে বুঝিতে চাহিলে সন্তানের পক্ষে কি মাতার সঙ্গে তাহার কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি কিছুই সহজলভ্য হইবে? মাতাই সন্তানকে চায়; কেননা সে জানে সে ও তাহার সন্তান এক। সন্তান তো মায়ের মত মাকে চায় না; কেননা মায়ের সঙ্গে তাহার অদ্বৈতসম্বন্ধ তাহার কাছে আনুমানিক, শোনা কথা। সন্তান মায়ের পক্ষে যেমন যতখানি 'প্রয়োজন', মা কি সন্তানের পক্ষে তেমন ততখানি প্রয়োজন? সন্তানের মৃত্যু হইলে মায়ের যে বেদনা, তাহার শতাংশও কি মায়ের অভাবে সন্তানের হয়? শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি-বিরহ অদ্বৈতজ্ঞানেরই বিভিন্ন আস্বাদন মাত্র।

এতদিনের সাধনায় ভক্ত নিজকে ধরিয়া ভগবানকে চিনিতে ও ভালবাসিতে চাহিয়াছে; ব্যবধান তাহাতে শুধু বাড়িয়াই চলিয়াছে। আজ সাধনার আরম্ভ হইবে ভগবানকে আশ্রয় করিয়া। সামঞ্জস্য করিবার শক্তিও ভক্তের নাই। সাধক হয় কর্ম্মী হইবে, নয়তো বা জ্ঞানী, নয়তো ভক্ত বা যোগী। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন: 'সর্ব্বধর্ম্ম সামঞ্জস্য করিবার ক্ষমতা নারায়ণ ভিন্ন আর কাহার নাই।'—নিত্যধর্ম্মপত্রিকা, ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃ ৩০০। নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে নারায়ণেরই। নর নিজের কাছেও নিজে যে অপ্রত্যক্ষ, পর। নারায়ণই সমগ্র—'ময়ি তে'; নারায়ণের মধ্যেই নরসমূহ আছে। নরের মধ্যে নারায়ণ আছেন—এই উপলব্ধি কি নরের আছে? তাই নরের নিজকে কেন্দ্র করিয়া অনুস্থত সর্ব্ববিধ সাধনা আজ ব্যর্থ। ভাগবত বলিতেছেন:

বিদ্যাতপপ্রাণনিরোধমৈত্রী
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতে অন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥ ১২।৩।৪৮

—'অনন্ত ভগবান হৃদিস্থ হইলে অন্তরাত্মা যেমন অত্যন্ত শুদ্ধিলাভ করে, বিদ্যা, তপ, প্রাণনিরোধ, মৈত্রী, তীর্থাভিষেক, ব্রত, দান ও জপমন্ত্রাদি দ্বারা তেমন অত্যন্তশুদ্ধি লাভ করেনা।'

আমি আমার 'পরে', আমারও 'আগে' তিনি। তাঁহার অযাচিত করুণায় তিনিই আমায় চান; আমি তো সত্যই তাঁহাকে চাহি না। 'তোমার খুশী চেয়ে আছে আমার খুশীর পানে।' আমার প্রতি তাঁহার এই আকুল

দৃষ্টিকে ধরিয়াই তাঁহাকে চিনিতে হইবে, তাঁহাকে চিনিতে চিনিতে আমিকে ও আমার বিশ্বকে চিনিতে হইবে। বিশ্ব কি যেমন-তেমন সত্য? বিশ্ব যে তাঁহারই মত নিত্য সত্য। কত তপস্যার ধন এই জগৎ ও আমি! 'সঃ তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমসৃজত।' যে-তপস্যায় আমি জাত, সেই তপস্যার সূত্র ধরিয়াই না প্রবর্ত্তিত হইবে আমার সাধনা? নারায়ণ আমাকে 'চান'। তাঁহার এই চাওয়াকে সার্থক করিয়া তোলাই হইবে আমার সাধনা। নরই নারায়ণের ইষ্ট—'ইষ্টোঽসি মে'। শ্রীনিত্যগোপালকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'ঠাকুর আপনার ইষ্ট কে?' ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, 'তোমরাই আমার ইষ্ট।' আমাকে কোলে পাইয়া মা যে-সুখ পান, সে সুখ কি কল্পনাও করিতে পারি? আমাকে না পাইলে তাঁহার যে বেদনা হয়, আমাকে না-পাওয়ার সেই বেদনা দূর করার জন্য প্রাণপণ করাই তো আমার সাধনা। আমার সারাদিনের প্রার্থনা হইবে, 'ওগো আমার ঠাকুর, কবে তুমি আমাকে পাইবে? আমি কবে তোমার কাছে ধরা দিব?' প্রজ্ঞাবাদীর প্রার্থনা—'কবে আমি তোমায় পাইব?' পক্ষান্তরে প্রাণবাদীর প্রার্থনা—'কবে তুমি আমায় পাইবে? তোমার চাওয়ার কাছে কবে আমি ধরা দিব? তুমি আমায় পাইয়া কবে পূর্ণ হইবে? তোমার কাছে ধরা না দিবার জন্য তোমার বুকে যে জ্বালা, তাহা আমি কবে জুড়াইব? তোমার পাওয়াই হইবে আমার পাওয়া। আমার চাওয়া পাওয়া তোমার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে মহানির্ব্বাণ লাভ করুক। কবে তোমার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই আমার বিশেষ চাওয়া-পাওয়া সার্থক হইবে?' ভগবানের চাওয়া-পাওয়াই ভক্তের চাওয়া-পাওয়া, ভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তনেই ভক্তের শ্রবণ-কীর্ত্তন, ভক্তের জন্য ভগবানের অপেক্ষাতেই ভক্তের অপেক্ষা। ভাগবতে শ্রীমান প্রহ্লাদের মুখে এই সুরটীই বাজিয়া উঠিয়াছে:

> 'নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণঃ
> মানং জনাদবিদুষঃ করুণঃ বৃণীতে।
> যদ্ যদ্ জনঃ ভগবতে বিদধীত মানম্
> তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥

এই আত্মার প্রভু নিজকে লাভ করিয়াও পূর্ণ নন, তাই করুণায় তিনি অজ্ঞান লোকের নিকট হইতে মান বরণ করেন। মানুষ যে মান ভগবানে বিধান করেন, তাহা তাহারই হয়, যেমন মুখকে শ্রীমণ্ডিত করিলে তাহা প্রতি-

মুখের আপনাআপনি হইয়া যায়। নারায়ণকে সজ্জিত করিলেই নরের সজ্জিত হওয়া হয়, নারায়ণের পাওয়া হইলেই নরের পাওয়া হয়। স্বতন্ত্র করিয়া নরের পাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

ভাগবত এই সাধনার কথাও ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদের মাধ্যমে বলিয়াছেন :

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেৎ নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

'বিষ্ণুর শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চ্চন বন্দন দাস্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণা ভক্তি যদি পুরুষের দ্বারা অর্পিত হইয়া কৃত হয়, তবে তাহাকেই উত্তম অধীত বলিয়া আমি মনে করি।' 'অর্পিতা এব ক্রিয়েত' পদটীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রীধর স্বামীপাদ ইহাকে আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন : 'নতু কৃতা সতী অর্প্যেত।'—অর্থাৎ 'করার পর অর্পণ করিবে না।' শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি নবলক্ষণা ভক্তি অর্পণ করিয়াই করিতে হইবে, করার পর অর্পণ করিবে না। সাধককে আশ্রয় করিয়া যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন স্ফুরিত হয়, তবে তাহা হইবে 'করার পর অর্পণ', কিন্তু ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া যদি সাধনার আরম্ভ হয়, তবে তাহাই হইবে অর্পণ করার পর করা।

'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥'

—শ্রীরূপগোস্বামীকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

—'অতএব শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-লীলা কখনই ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গ্রাহ্য হইবে না। উহারা সেবার জন্য উন্মুখ জিহ্বাদিতে স্বয়ংই স্ফুরিত হয়।' ভগবানের নাম-রূপ-লীলাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিতে গেলে, 'গ্রহ'-ধাতুর কর্ম্মকারক করিতে গেলে উহাদের চিন্ময়ত্বের হানি হয়; উহারা সাধকের মুঠার ভিতরে আসিয়া পড়ে, পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। নাম-রূপ-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন তখন শ্রোতা-কীর্ত্তনীয়াদের ভোগের উপাদানই যোগায় মাত্র। কিন্তু সাধক যখন সেবোন্মুখ হয়, আত্মসমর্পিত ইন্দ্রিয়দ্বারা নাম-সেবা, রূপ-সেবা, লীলা-সেবার জন্য উন্মুখ হয়, তখনই শুধু নাম-রূপ-লীলা তাহাদের চিন্তামণিত্ব, চৈতন্যরসবিগ্রহত্ব, পূর্ণশুদ্ধত্ব, নিত্যমুক্তত্ব বজায় রাখিয়া স্বয়মেব স্ফুরিত হয়। তুমি লইবে তোমার বিচ্ছিন্ন

অহঙ্কারপুষ্ট জিহ্বাদ্বারা তাঁহার নাম? তুমি দেখিবে তাঁহার রূপ তোমার অহঙ্কৃতস্বভাবযুক্ত নয়নদ্বারা? শরণাগত তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের কাছেই তিনি স্ফুরিত হইতে পারেন, ধরা দিতে পারেন। নচেৎ তিনি নিত্য অধর। তাই 'পরশ নইলে হাজার কইলে ত্যক্ত হবে বলে বলে'! শেষে নাম কীর্ত্তন পরিণত হয় এক যান্ত্রিক ব্যাপারে।

আগে তিনি, তাহার পর তাঁহার ভজন। শ্রীনিত্যগোপাল স্পষ্টই লিখিতেছেন: "পরাশরাত্মজ ভগবান বেদব্যাসের মতে পূজাদিতে অনুরক্তিই ভক্তি। সেইজন্যই বলা হইয়াছে 'পূজা'দিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ।' অনেকে শ্রীভগবানের পূজা করেন বটে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই শ্রীভগবানের পূজাতে অনুরক্ত হইয়া পূজা করেন। যাঁহার শ্রীভগাবানের পূজাতে অনুরক্তি আছে, তিনিই শ্রীভগবানের প্রকৃত পূজক। **অগ্রে** শ্রীভগবানে অনুরক্তি না হইলে তাঁহার পূজাতে অনুরক্তি হয় না। শ্রীভগবানে অনুরক্তিই তাঁহার পূজাদিতে অনুরক্তির কারণ। যাহার শ্রীভগবানে অনুরাগ হইয়াছে, তাঁহার শ্রীভগবানের পূজাতেও অনুরাগ হইয়াছে—তাঁহার শ্রীভগবানের সেবাতেও অনুরাগ হইয়াছে—তাঁহার শ্রীভগবানের জপধ্যানাদিতেও অনুরাগ আছে। তাঁহার শ্রীভগবানের স্তুতি-বন্দনাতেও অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের বিষয় শ্রবণেও অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের বিষয় কীর্ত্তনেও অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানবিষয়ক স্বাধ্যায়েও অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবদ্বিষয়িনী আলোচনাতে অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের চরিত্র স্মরণে অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের চরিত্র মননে অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের চরিত্র কথনে অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের দিব্য চরিত্র পঠনে অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের দিব্য চরিত্র শ্রবণে অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের দিব্য চরিত্র আলোচনায় অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের গুণকর্ম্ম সকলের আলোচনায় অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব স্বভাব পর্য্যালোচনায় অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য কীর্ত্তনে অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের রূপ এবং স্বরূপ বর্ণনায় অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের শক্তি বর্ণনায় অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের শক্তিতে ভক্তিভাবাত্মক অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের ভক্তে অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের ভক্তিতে অনুরাগ আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের প্রেমে অনুরাগ

আছে—তাঁহার শ্রীভগবানের প্রেমাস্পদে অনুরাগ আছে।'—ভক্তিযোগদর্শন: পৃ-৯৩-৯৪

উর্দ্ধমূল শ্রীভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর সেই যুক্ততাকে যখন সকল দেহপ্রাণমনে সঞ্চারিত করিবার জন্য, জমাইয়া তুলিবার জন্য ভক্তের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে, তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিয়াই শ্রীনিত্যগোপাল প্রাপ্ত সাধনপন্থার স্বয়ংমূল্যত্ব এবং অন্যোন্যমিথুনত্ব প্রচার করিলেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বসাধন-সমন্বয়। সাধক যদি নিজ অংস্কৃতভাব লইয়া সাধ্যবস্তুকে পাইবার জন্য যাত্রারম্ভ করে, তখন তাঁহার অবলম্বিত সাধনপন্থা অন্যের অনুসৃত সাধনপন্থা হইতে পৃথক্ হইতেই শুধু বাধ্য হয় না, পরন্তু উহারা পরস্পরস্পর্দ্ধী হয়। এই ভাবে সাধকে সাধকে সাধনার ক্ষেত্রেও বিরাট পার্থক্য আসিয়া পড়ে। যে যে-সাধনপন্থার অনুসরণ করে, তাহার অভ্যাসের ফলে তাহার দেহপ্রাণমন এমনই একটী ছাঁচে গড়িয়া উঠে, এমন ভাবেই তাহার দেহপ্রাণের বিন্যাস (arrangement) সাধিত হয় যে, অন্যের অনুসৃত সাধনপন্থা তখন তাঁহার কাছে নিতান্ত বিজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। ইহারই ফলে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী বলিতে পারেন—'অদ্বৈতবাদ শুনিলে জীবের হয় সর্ব্বনাশ'। যাহার 'জপ' ভাল লাগে, তাহার আর ধ্যান ভাল লাগে না; যাহার কীর্ত্তন ভাল লাগে, তাহার স্বাধ্যায় ভাল লাগে না। প্রতিটী সাধনপন্থার এক একটী বিশেষ অবদান রহিয়াছে; কোনও একটী দ্বারাই মানুষ সম্পূর্ণ হয় না। চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিলেই কি কর্ণ তৃপ্তি পায়? অথচ মানুষ যখন ভগবানের একান্ত রূপকেই আশ্রয় করিয়া সাধনা করে, তখন তাহার অন্যান্য ইন্দ্রিয় থাকে উপবাসী। এতদিনের প্রচলিত সাধনায় রূপসাধক স্বরূপ-সাধক হয় না, স্বরূপ-সাধকও রূপ-সাধক হয় না। রূপ-সাধনা ও স্বরূপ-সাধনার এই সঙ্ঘর্ষ মায়াবাদের প্রবর্ত্তনার পর হইতে কি তীব্রভাবেই না এদেশে চলিয়া আসিয়াছে। ভগবানের রূপ মায়িক, স্বরূপ অমায়িক—এ ভেদদর্শন শ্রীনিত্য-গোপালদর্শনে নাই। কিন্তু কোনও বিশেষ সাধনপন্থাকে একান্ত বলিয়া ধরিয়া লইলে এ গোঁড়ামি নিশ্চয়ই অনিবার্য্য। এই একান্ত সাধন-নিষ্ঠার গোঁড়ামি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই শ্রীনিত্যগোপাল এই সর্ব্বসাধনসমন্বয়ের বার্ত্তা প্রচার করিলেন। একটী সমগ্র সাধকের জন্য সর্ব্বসাধন পন্থারই বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সাধককে সমগ্রভাবে সার্থক হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই সমগ্র ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ। তখন সেই সমগ্র ভগবানকে

সমগ্র পন্থায়ই আস্বাদন করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। জীবনের সকল সুর দিয়া, আমার জীবনের সকল কর্ম্ম দিয়া, সকল সাধনপন্থা দিয়া তাঁহাকে পাইব, তবেই না আমার প্রজ্ঞা ও প্রাণ সমগ্রভাবে পরিতৃপ্ত হইবে?

কিন্তু সাধককে তাহার সব কিছু দিয়া ভগবানকে আস্বাদন করিতে হইলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ 'ছদ্মবেশী ভগবান' শ্রীগুরুগীতায় বর্ণিত লক্ষণযুক্ত বর্ত্তমান শ্রীগুরুকেই সর্ব্বাগ্রে আশ্রয় করিতে হইবে। এতদিন সাধক ধরিতে চাহিয়াছিল স্ব স্ব সাধনা দ্বারা শ্রীভগবানের হাত; তাই ইন্দ্রিয় সমূহের পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষে দুর্ব্বল তাহার হস্ত ভগবানকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। এইবার ভগবান ধরিয়াছেন ভক্তের হাত, পিতা ধরিয়াছেন পুত্রের হাত। তাই ভক্তের আর আছাড় খাইবার সম্ভাবনা নাই। আরও বিশেষতঃ শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া সাধনার আরম্ভ হইলে আত্মনিবেদিত সাধকের দেহপ্রাণমন নমনধর্ম্মশীল থাকে বলিয়া ঐ দেহ সর্ব্বসাধনার উপযোগী হয়; এবং ঐ দেহে সর্ব্ব সাধনা-সমন্বয় স্ফুরিতও হয়। শ্রীনিত্যগোপাল জীবনেই বর্ত্তমান বিশ্ব সর্ব্ব সাধনা-সমন্বয় সর্ব্ব সিদ্ধি-সমন্বয় ও সর্ব্ব সাধ্য-সমন্বয় সর্ব্ব সাধক-সমন্বয় দেখিয়া ধন্য হইবে। 'আমি' হইতে যে সাধনার সুরু, সে সাধনার ফলে দেহ এমনই শক্ত হইয়া দাঁড়ায়, এমন ভাবেই উহা বিন্যস্ত হয় যে, ধ্যান-সাধক কীর্ত্তন-সাধক হইতে পারে না। ইহা আমরা উপলব্ধি করিয়াছি, যখন বারানসী ধামে প্রকাশানন্দ সরস্বতী পাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'কীর্ত্তন' ও নর্ত্তনকে ভাবুকতাময় বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ধ্যানের মধ্যে গলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। অহঙ্কৃত ভাবযুক্ত সাধকের পক্ষে ধ্যান ও নৃত্য পরস্পরবিরুদ্ধ তো বটেই। ধ্যান দেহপ্রাণমনের একতানতা স্থাপন করিতে চায়, দেহকে স্থির করে। নৃত্য দেহকে নাচাইয়া তোলে, চঞ্চল করিয়া দেয়।

ধ্যানের সময় দেহমনপ্রাণের যে বিন্যাস হয়, তাহা কখনও কীর্ত্তন-কালীন দেহপ্রাণমনের বিন্যাসকে আসিতে দেয় না, বরদাস্ত করে না। অথচ ইহাকেই এতদিন সাধন নিষ্ঠা বলা হইত। কোনও বিশেষ পথ ধরিয়া চলিলে সেই পথ একটী নেশার সৃষ্টি করে। তখন সেই পথের নেশায় অন্য পথের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি তো হয়-ই না, বরং তাহাকে এড়াইয়া চলাটাই তখন সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্পষ্ট ধারণা হয়। ফলে কোনও দিনই পথ সাধককে গন্তব্যস্থলে পৌছাইয়া দেয় না, গন্তব্যস্থল অনন্ত কাল পথকে ডিঙ্গাইয়া চলে।

কিন্তু সাধনার আরম্ভ যদি হয় গন্তব্যস্থল হইতে, তখন সমস্ত পথই তাহার বলিয়া মনে হইবে ; সমস্ত পথ তখন গন্তব্য স্থলেরই বিশেষ বিশেষ আস্বাদনরূপে পরিণত হইবে। তখন পথ হয় গন্তব্যস্থলেরই আস্বাদন ধারা মাত্র ; পথ ও গন্তব্যস্থল এক।

'পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা।
আনন্দে তাই এক হলো তার পৌছানো আর চলা ॥' —রবীন্দ্রনাথ।

পথ-পথিক-গন্তব্যস্থল এক সচ্চিদানন্দেরই বিভিন্ন রস-আস্বাদন।

পাইয়া সাধনা ও না পাইয়া সাধনার মধ্যে বহুত অন্তর রহিয়াছে, যদিও কখনও কখনও উহারা দৃশ্যতঃ এক হইতে পারে। একই 'কর্ম্ম' অহঙ্কৃত-ভাবযুক্ত মানুষ করে, আবার সেই কর্ম্মই নাহঙ্কৃতভাবমুক্ত সাধক করেন।

দুই কত পৃথক! এ দেশ না পাইয়া সাধনপন্থায় অভ্যস্ত। কিন্তু শ্রীনিত্য-গোপাল শিখাইয়া গিয়াছেন পাওয়ার পর সাধন করিবার কৌশল। শ্রীনিত্য-গোপাল মতে আমরা তো **'ছদ্মবেশী ভগবানকে'** পাইয়া আছি। ইহা যুক্তিসিদ্ধ, অনস্বীকার্য্য। এই পাওয়ার পরের সাধনা অবলম্বন করিতে পারিলে তাঁহার এই ছদ্মবেশ উন্মোচিত হইত এবং তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার সহজ জীবন ধরা দিত, আত্মপ্রকাশ করিত আমাদের দেহপ্রাণমন সর্ব্বক্ষেত্রে। কিন্তু আমরা অতীতের কর্ম্মসাধনা, জ্ঞানসাধনা, ভক্তিসাধনা ও যোগসাধনার সংস্কারে শক্তভাবে আটকাইয়া থাকিয়া তাহারই সাহায্যে পাওয়া ভগবানকে পাইতে চাহিয়াছিলাম। আমরা তাই বঞ্চিত হইয়াছি, পাওয়া ব্রহ্মবস্তুকে ঘন করিয়া আস্বাদন করিতে পারি নাই। না-পাইবার সাধনাও হয় নাই, যেহেতু উহার উপর তিনি জোর দেন নাই। পাওয়ার পরের সাধনা তো করিতে পারিলাম না, যেহেতু উহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। না-পাওয়ার সাধনা না হইবার কারণ এই যে, শ্রীনিত্যগোপাল যখন বলিলেন যে 'তোমরা পার না পার সমস্ত ভার আমার উপর রহিল,'—'ভয় কি টেনে তুলব' কিংবা 'মা'ঝি শক্ত আছে', তখন তাঁহার কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারি নাই। তিনি যখন ভার নিয়াছেন, মাঝি যখন শক্ত আছে, তখন আমাদের কিছু না করিলেও চলে—ইহাই আমরা বুঝিয়াছিলাম। অথচ যিনি অযাচিতভাবে ভার নেন, তাঁহাকে জীবনে শিষ্যের কত বড় স্বীকৃতি দিতে হয়, স্বীকৃতি দিলে কতখানি কৃতজ্ঞ হইতে হয়, কৃতজ্ঞতার ফলস্বরূপ কতখানি একাত্ম হইতে হয় এবং একাত্ম হইলে তাঁহার অনুপ্রবেশ দ্বারা

আমার জীবনের সব-কিছু কতখানি ওলটপালট হইয়া নূতন হইয়া তাঁহার জীবনের ছাঁচে গ'ড়িয়া ওঠে, তাহা আমরা বুঝি নাই, কেহ বুঝাইয়াও দেয় নাই। আজ বহুকাল পরে বু'ঝিবার দিন আসিয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনে তিনি আমি এক বলিয়া তাঁহার নিজের ভার ও আমার ভার একই কথা। তিনি উহা সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। কিন্তু আমি কি তাঁহার সঙ্গে একাত্মতার, নিত্যযুক্ততার উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার উপর ভার ছাড়িয়া দিয়াছি, তাঁহার ভার নেওয়ায় তৃপ্ত হইয়াছি? তিনি তো ভার নিলেন, আমি তো ভার দেই নাই; তাই তাঁহার ভার নেওয়ার সার্থকতা আমাদের জীবনে হয় নাই। তবে ইহা সত্য যে, তিনি যখন প্রত্যক্ষভাবে আমার সঙ্গে অদ্বৈতভাবাপন্ন থাকিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতেছেন, তখন এই টান আমার পক্ষে দীর্ঘদিন সামলাইয়া থাকা অসম্ভব হইবে। আমাকে ধরা দিতেই হইবে। তাঁহার এই টান আনুমানিক নয়, ইহা নিতান্তই বর্ত্তমান।

প্রজ্ঞাচুম্বিত এই প্রাণ সাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে বিশ্বসঙ্ঘ গড়িয়া উঠা। প্রজ্ঞাবাদীর সাধন 'মনে বনে কোণে।' মনে বনে কোণের সাধনায় মানুষ কুনো হয়, তাহাতে কি কখনও সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে? ভক্ত চূড়ামণি প্রহ্লাদের সাধনা প্রাণসাধনা ছিল বলিয়াই তিনি শ্রীনৃসিংহদেবের সামনে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিলেন :

প্রায়েন দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামাঃ।
মৌনং চরন্তি বিজনে নৈতে পরার্থনিষ্ঠাঃ॥
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো।
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥ ভাগবত ৭।৯।৪৪

—'হে দেব, মুনিগণ প্রায়ই স্ববিমুক্তিকাম; তাঁহারা পরার্থনিষ্ঠ নন বলিয়া বিজন বনে মৌন আচরণ করেন। আমি কিন্তু একা এই সব কৃপণদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিমুক্তি চাহি না। অথচ তুমি ছাড়া অন্য কোন শরণও তো দেখিতেছি না।'

প্রাণসাধক রাজা রন্তিদেবও বলিতেছেন :

ন কাময়েঽহম্ গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তাং অপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাম্
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥ ভাগবত ৯।২১।১২

'আমি ঈশ্বর হইতে অষ্টসিদ্ধিযুক্ত পরাগতি চাই না, পুনরায় না-হওয়াও চাই না। আমি অখিলদেহভজনকারীদের অন্তরে স্থিত থাকিয়া তাহাদের আর্ত্তির প্রপন্ন হইব, যাহার ফলে তাহারা অদুঃখ হইবে।'

প্রজ্ঞাচুম্বিত প্রাণধারা আজ বিশ্বসঙ্ঘরচনার জন্য আবির্ভূত। এই প্রাণধারাই বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বসৃষ্টিশক্তিকে বিশ্বসঙ্ঘের কাছে ন্যস্ত করিতে চাহিতেছে। বিশ্ব বিশ্বেশ্বরকে সৃষ্টি করিবে—ইহাই প্রাণসাধনার চরম পরিণতি। বিশ্বনাথ আজ বিশ্বের রক্তমাংস নিংড়াইয়া দিব্য জন্ম নিবেন, চৈতন্য জড়ের বুক মন্থন করিয়া জড়ের কোলে প্রকাশিত হইবেন, স্রষ্টা আজ সৃষ্টের দ্বারা সৃষ্ট হইবেন—ইহাই প্রাণধারার বিশেষত্ব। সৃষ্টি করিবার কি উন্মাদ লালসা লইয়াই না জীবজগৎ ছুটিয়া চলিয়াছে! 'সৃষ্টি কর', 'সৃষ্টি কর'—চতুর্দ্দিক হইতে কেবল ইহাই ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টির জন্য জীব পাগল। স্রষ্টা সৃষ্টের হাতে সৃষ্টি-ক্ষমতা দিবার জন্য আজ উন্মত্ত। যে সৃষ্টি করিতে পারিল না, সে তো ক্লীব, ব্যর্থ। অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান সৃষ্টির জন্যই আহ্বান করিয়াছিলেন; অর্জ্জুন চাহিতেছেন সৃষ্টি না করিতে। শ্রীভগবান সস্নেহ তিরস্কার করিয়া বলিলেন: 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।' সব সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি হইবে বিশ্বকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা, বিশ্বেশ্বরকে সৃষ্টি করা। যতদিন বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর জীবের সাধনার ভিতর দিয়া না জন্মিতেছেন, ততদিন বিশ্বের জ্বালা, বিশ্বেশ্বরের তপস্যা কিছুতেই সার্থক হইবে না। ভগবান কেন 'তপঃ তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত'? তাঁহার তপস্যায় সৃষ্ট এই সর্ব্ব আবার তাঁহাকে সৃষ্টি করিবে, এতদিনের বিশ্বাতীত ব্রহ্ম বিশ্বের মধ্য দিয়া নিতুই নবীন হইয়া সম্ভূত হইবেন—ইহাই না সৃষ্টির গূঢ় প্রয়োজন? পিতা যেমন পুত্রকে সৃষ্টি করেন পুত্রের পুত্র হইবার লালসায়, বিশ্বপিতাও তেমনি বিশ্ব-জীববৃন্দের পুত্র রূপে সৃষ্ট হইবার জন্য বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাণসাধনা এই সৃষ্টির কথা বলিয়াই ধন্য। একদিন ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন বিশ্বকে; এইবার বিশ্ব সৃষ্টি করিবে বিশ্বেশ্বরকে। এই উভয় সৃষ্টির সমন্বয়ের খবর পৌঁছাইয়াই শ্রীনিত্যগোপাল অদ্বিতীয় স্রষ্টা। কমুনিজম জড় হইতে চৈতন্যের সৃষ্টি কথা শুনাইয়াছে; হেগেল শুনাইয়াছেন চৈতন্য হইতে বিশ্বসৃষ্টির কথা। কোনও একটীই একান্ত সত্য নয়। দুইয়ের সমন্বয়ই পূর্ণ সত্য, পর সত্য। শ্রীনিত্যগোপাল এই পর সত্যের প্রচার করিয়াই বিশ্বের সর্ব্ব সমস্যার একমাত্র সমাধান-কর্ত্তা। ইহাই তাঁহার জড়-অজড় সমন্বয়ের গভীর তাৎপর্য্য। তিনি মার্ক্সের জড়বাদ ও হেগেলের অজড়বাদের

সমন্বয় করিয়া জগতে এক নূতন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মার্ক্‌স্‌ ও হেগেল সমন্বিত মূর্ত্তি।

তিনি যে মার্ক্‌সীয় দর্শনের পরিপূর্ণ সমর্থক, তাহা তাঁহার মায়াকে, এই 'বিশ্ব'কে সত্য বলিয়া উপস্থাপিত করার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ তিনিই আবার মার্ক্‌সীয় দর্শনের সঙ্গে হেগেলীয় দর্শনের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন, যাহা মার্কসের ও হেগেলের কল্পনারও অতীত ছিল। শ্রীনিত্য-গোপাল লিখিতেছেন: 'পরমহংস শঙ্করাচার্য্য রচিত আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তচত্বারিংশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

'আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোহন্যন্ন বিদ্যতে।
মৃদো যদ্বৎ ঘটাদী'ন স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে॥'

উক্ত শ্লোকানুসারে দ্বৈতাদ্বৈত অভেদ বলা যাইতে পারে। কারণ, উক্ত শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয়, যে প্রকার মৃৎ বা মৃত্তিকাই ঘট প্রভৃতি বিশিষ্ট মৃত্পাত্র সকল, তদ্রূপ আত্মাই সমস্ত জগৎ। আত্মা ব্যতীত অন্য পদার্থ দৃষ্ট হয় না। অতএব সকল পদার্থই আত্মা দেখিতে হয়। আত্মাই সকল জগৎ স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া আত্মাকে প্রকারান্তরে অনাত্মাই বলিতে হয়। কারণ **'জগৎ সর্ব্বং'** ত অনাত্মারই বিকাশ। সেইজন্যই শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে আত্মা এবং অনাত্মা অভেদ বলিতে হয়। সেইজন্যই দ্বৈত এবং অদ্বৈত অভেদ বলিতে হয়। উক্ত সপ্তচত্বারিংশৎ শ্লোকের মতানুসারে আত্মা এবং অনাত্মা অভেদ স্বীকার করা হয় বলিয়া আত্মা ও অনাত্মা উভয়েরই নিত্যতা ও সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। কারণ শ্রৌত উপনিষৎ, বেদান্ত-দর্শন ও বেদান্তসার মতে আত্মা নিত্য সত্য। সেই আত্মার সঙ্গে যাহা অভেদ, সুতরাং তাহাও নিত্য-সত্যাত্মা স্বীকার করিতে হয়। অথচ অনাত্মা অনিত্য-অসত্য বলিয়া,—আত্মাও সেই অনাত্মা বলিয়া,—সেই আত্মাকেও অনিত্য-অসত্য বলিতে হয়, কিংবা আত্মাকে নিত্য-সত্যও বলিতে হয়। এক্ষণে অনাত্মার সঙ্গে নিত্য-সত্য-আত্মার অভেদত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া সেই অনিত্য-অসত্য-অনাত্মাকেও নিত্য-সত্য বলিতে হয়। আর সেই অনাত্মা অদ্বৈতমতানুসারে অনিত্য অসত্য বলিয়া সেই অনিত্য নিত্য-অসত্যও স্বীকার করিতে হয়।'—সিদ্ধান্তদর্শন, পৃঃ ১৭০—১৭১। 'বিশ্বের' সত্যতা সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন: 'আমরা স্পষ্টই এই বিশ্বে অবস্থান করিতেছি, অতএব আমরা কি প্রকারেই বা আমাদের অবস্থিতির স্থান এই 'বিশ্ব'কে

কল্পিত বা মিথ্যা বলি? আমাদের এই 'প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান বিশ্ব' সত্যই বলিতে হইতেছে। এই 'বিশ্ব' দর্শন, স্পর্শন এবং বোধ দ্বারা অবধারিত হইতেছে। এই বিশ্বের সত্যতা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তদর্শনের তৃতীয় ভাগে বিস্তৃতরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে।'—সিদ্ধান্তদর্শন : পৃ: ২২৯—৩০

শ্রীনিত্যগোপাল আত্মাকে একান্ত 'নিত্য সত্য' এবং অনাত্মাকে একান্ত অনিত্য অসত্য ধরিয়া লইয়া বিশ্ব-সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াটাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছেন। নিত্য, অনিত্য, সত্য, অসত্য সবই আপেক্ষিক শব্দমাত্র। আত্মা বা অনাত্মা কিছুই absolute নিত্য বা অনিত্য নয়, সত্য বা অসত্য নয়। শ্রীনিত্যগোপাল আত্মার মধ্যে অনিত্য অনাত্মার অব্যক্তভাবে থাকার এবং অনাত্মার মধ্যেও অব্যক্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে নিত্যের মধ্যে অনিত্য এবং অনিত্যের মধ্যে নিত্য অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। আত্মা নিত্য সত্য, আত্মা অনিত্য-অসত্য এবং অনাত্মা অনিত্য-অসত্য, অনাত্মা নিত্য-সত্য—দুইকেই লীলার বিবর্ত্তনে বর্ত্তমান বিশ্ব আস্বাদন করিবে। 'অনিত্য তারা তব ইতিহাসে নিত্য নাচন নাচে।' —রবীন্দ্রনাথ। ইহাই শ্রীনিত্যগোপালের নিত্যানিত্য সমন্বয়। এই তত্ত্ব আস্বাদন করাইবার জন্য তিনি 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' এবং 'মরুভূমিতে মরিচীকা দর্শন'কে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন: 'সর্প আছে তাই রজ্জুতে সর্প-ভ্রমও কখন কখন হইয়া থাকে। সর্প যদি না থাকিত তাহা হইলে কখনই রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইত না। অসত্য আছে তাই সত্যে অসত্যের ভ্রম হয়। অসত্য যদি না থাকিত তাহা হইলে সত্যে অসত্যের ভ্রমও হইত না।' 'জলেরই রূপান্তর তুষার যেমন, তদ্রূপ প্রকৃতিরই রূপান্তর পুরুষ। তুষারেরই রূপান্তর জল যেমন, তদ্রূপ পুরুষেরই রূপান্তর প্রকৃতি। পুরুষও যাহা প্রকৃতিও তাহা, উভয়ই আত্মা।'—শ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকা, ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা, পৃ ২৩৮।

আকাশে নীলত্ব দর্শন, মরুস্থলে মরীচিকা দর্শন, স্থাণুতে পুরুষ দর্শন প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশ্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া শ্রীনিত্য-গোপাল লিখিয়াছেন: 'তোমার নিকট হইতে মরুস্থলের যে অংশ অতি দূরস্থ, তথায় তুমি ভ্রমবশতঃ যে জল-দর্শন কর তাহার সহিত, তুমি যে বিশ্বে বাস কর তাহার সহিত, যে বিশ্ব তোমার অতি নিকট, সে বিশ্বের তুলনা করিয়া তাহার ন্যায় তোমার সেই অতি নিকটস্থ বিশ্বকে মিথ্যা বলিতে পার না।

নিকটস্থ স্থাণুকে কেহই ত ভ্রমবশতঃ পুরুষ-দর্শন করে না। যে বিশ্বে বাস করিতেছ তাহাও তোমার অতি নিকট; তাহা যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে তাহা তুমি দর্শনই করিতে না। তাহা যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে তাহা তুমি স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইতে না। সেইজন্যই বলি,—

'যথৈব ব্যোম্নি নীলত্বং যথা নীরং মরুস্থলে।

পুরুষত্বং যথা স্থাণৌ তদ্বদ্বিশ্বং চিদাত্মনি॥' ৬১

বলা সঙ্গত হয় নাই।'—সিদ্ধান্তদর্শন, পৃঃ ৫১

'রজ্জুতে সর্পভ্রম' প্রভৃতির দৃষ্টান্তদ্বারা বিশ্বকে অসত্য প্রতিপন্ন করার মধ্যে শ্রীনিত্যগোপাল কোনও যৌক্তিকতা দেখেন নাই। ঐ দৃষ্টান্তসমূহ একান্ত সে-কালের। উহা নিউটনের যুগের 'dead inert block universe'-এর দৃষ্টান্ত। আজিকার মানুষের জগৎটা জীবন্ত। জীবন হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবার যুগ আসিয়াছে। 'মড়া' দৃষ্টান্ত সাহায্যে বিশ্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সুযোগ আজ আর মার্কসের যুগে চলিবে না। অনুমান-উপমান শব্দ প্রমাণ যেমন সত্য, প্রত্যক্ষ প্রমাণ তদ্রূপই তুল্য সত্য। তাই শ্রীনিত্যগোপাল বার বার লিখিয়াছেন: 'প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে।' শ্রীনিত্যগোপাল মতে বাচ্যার্থ অপেক্ষা শব্দের 'লক্ষ্যার্থ' বেশী সত্য নহে। চার্ব্বাক-শঙ্কর-সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল সর্ব্বপ্রমাণ সমন্বয় দ্বারা, বাচ্যার্থ-ব্যঙ্গার্থের সমন্বয় দ্বারা বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি প্রাণ-দর্শন প্রবর্ত্তক; তিনি প্রাণের ভাষা লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার জীবন হইতেই বর্ত্তমান বিশ্বে প্রাণধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনেই প্রাণসাধনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রাণদর্শন এই বিশ্বকে সত্যং শিবং সুন্দরম্ রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য, বিশ্বকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সৃষ্টি করিবার জন্য, আকাশের আদর্শকে ধরার ধূলায় রূপদান করিবার জন্য, নিজে বিশ্বের কোলে বিশ্বশিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য, বিশ্বকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার এই সর্ব্ব মঙ্গল আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক। বন্দেমাতরম্

———

সেতু

বিভা সরকার

এ পক্ষ মেলেছে ডানা দূর নীল নভে
সেথা হতে ফিরে ফিরে বার বার দেখি
সোনালি ফসলে ভরা এই বসুন্ধরা
প্রাণের স্পন্দন দেয় সোনালি রোদ্দুরে-

আশা আনে নব জীবনের—
অন্ধকার রাত্রি বুঝি হয়ে আসে শেষ !
বুঝিবা হয়েছে ভীত ক্ষুব্ধ শ্বাপদেরা
নবীন প্রভাত আসে আলোঝলমল

প্রার্থী আমি সুদূরের—
যাত্রা মোর অজানা সে সাগরের পার
অসীম দিগন্তে হারা নীলাকাশ পথে
যাত্রা মোর নহে নিরুদ্দেশ

ভালবাসি ধরণীরে আমি
ভালবাসি এর ধূলিকণা
অণুতে অণুতে জাগে মহা সম্ভাবনা
নিরাশায় পড়ে কাঁদা জাগায় ধিক্কার
অমৃত ইসারা আছে জলেস্থলে মিশে
তাহার সন্ধান মাগি যাত্রা যে আমার !

সাহিত্যে জীবন-দর্শন

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক আগুনের সঙ্গে তার দাহিকা শক্তির মত এবং সাহিত্য সৃষ্টির মূলে যে-ক্রিয়া আছে, তা নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের স্বল্পায়ু জীবনে স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা। মানুষ যেমন কেবল ব্যক্তিগত মানুষ নয়—একই সঙ্গে সে সমাজ ও বিশ্বগত মানুষ, তেমনি তার সাহিত্য কেবল ব্যক্তিজীবনের কাহিনী নয়, তার সমাজ ও বিশ্বজীবনের কাহিনীও বটে। এককথায় সাহিত্য তার সামগ্রিক জীবনের দর্পণ। ঐ দর্পণে তার সমগ্র রূপ প্রতিফলিত হয়। আবার প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক কালে এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে যেমন এক একটা বিশিষ্ট সাধন সংস্কার দেখা দেয়, তেমনি সাহিত্যের দর্পণেও তার মূর্ত্তির রূপ-বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে।

কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের সভ্যতার যাত্রারম্ভ হয়েছে, পথে কত বাধা বিপত্তি দেখা দিয়েছে, মানুষের অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময় সত্তা কেমন করে বিকশিত ও বিবর্ত্তিত হয়ে উত্তরণের প্রতীক্ষা করছে—গুহাবাসী অরণ্যচারী জীব প্রস্তর, তাম্র, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি ধাতুর যুগ অতিক্রম করে আধুনিক বিজ্ঞানের নিদান অণুপরমাণুকে আত্মসাৎ করেও কেন স্থির হতে পারছেনা, তার সবিস্তার কাহিনী সাহিত্যের আধারে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এ হ'ল সাহিত্যের ব্যাপক সংজ্ঞা।

সাধারণ অর্থে সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তা হ'ল ব্যক্তিমনের সঙ্গে সমাজ মনের সংযোগ স্থাপন। অর্থাৎ যে-কালে, যে-দেশে এবং যে-পরিবেশে স্রষ্টা জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি সেই দেশকালের ভাবনা চিন্তা, আশা আকাঙ্ক্ষা শিক্ষা দীক্ষা ও ঐতিহ্য সংস্কারের প্রতিভূ হিসেবে এমন কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে দেন, যা কেবল তাঁর সমসাময়িক সমাজমনকেই উন্নত করেনা—অধিকন্তু যে পাথেয় লাভ করে উত্তর পুরুষ স্বচ্ছন্দে সম্মুখপানে অগ্রসর হন।

অতএব দেখা গেল যে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যেমন নিকট সম্বন্ধ, স্রষ্টার মনের সঙ্গে সমাজমন যেমন অন্বিত, তেমনি একই সঙ্গে আরও একটি বস্তুর প্রয়োজন অপরিহার্য্য, যেটির নামকরণ হতে পারে ধারাবাহিকতা—অর্থাৎ

বিগত যুগের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের মেল বন্ধন। বস্তুতঃ সাহিত্যে ধারাবাহিকতা তার প্রাণধর্ম্মের একটি মূল্যবান লক্ষণ। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা আছে বলেই আমরা বুঝতে পারি যে নূতন প্রাক্তনের অনুস্মৃতি, অন্ত্যতনী চিরন্তনীর উত্তর কাল এবং বর্ত্তমান অতীতের স্বাভাবিক পরিণতি। এই ধারাবাহিকতায় বিশ্বাস কেবল মাত্র আমাদের দেশের মনীষীগণই বোধ করেন নি, প্রকৃতপক্ষে সব দেশের চিন্তানায়কই এ বিষয়ে অল্পবিস্তর যে সকল মতামত প্রকাশ করেছেন, সেগুলির সামান্যতা লক্ষণীয়। বর্ত্তমান যুগের ইংলণ্ডের অন্যতম প্রতিভাশালী লেখক (সমালোচক ও কবি) টি, এস্ এলিয়ট (T. S. Eliot) বলেছেন : 'Tradition is a matter of much wider significance. It involves in the first place the historical sense. Historical sense involves a perception not only of the pastness of the past, but of its presence. No poet, no artist of any art has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists."

কাবগুরু রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যতীত পূর্ব্বপুরুষদের সহিত সচেতন মানসিক যোগ কখনও রক্ষিত হইতে পারে না।" পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে মানসিক যোগের অর্থ তাঁদের চিন্তাদর্শ, মূল্যমান, নীতিবোধ ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এক কথায় তাঁদের জীবন-দর্শনকে গ্রহণ করা। এখানে প্রশ্ন উঠবে এই জীবন-দর্শন বস্তুটি কি? এক কথায় বলা যায় যে, জীবন-দর্শন হ'ল সত্যানুভূতি। অর্থাৎ জগৎব্যাপারের মধ্যে যে রহস্য প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—ধ্বংস ও সৃষ্টি-লীলার মধ্যে যে শাশ্বত চিরন্তনী ধারার আভাষ পাওয়া যায়, তাকে প্রাণের রসে রসায়িত করে জীবনের আবেগে উপলব্ধি করা। এই প্রসঙ্গে একজন চিন্তাশীল সমালোচকের একটি উক্তি স্মরণ করতে বলি : "যাহার প্রাণশক্তি যত বেশী, অর্থাৎ যত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, সে এই জগৎ সমুদ্রে স্নান করিয়া সাঁতার দিয়া ইহার তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়াই তত আনন্দ পায়। যে মানুষের প্রাণে আনন্দ ঘনীভূত হইয়া উঠে, তাহার প্রাণে সৃষ্টির বেদনা সঙ্গীতরূপে উৎসারিত হয়, ব্যক্তির সুখ দুঃখ নির্ব্যক্তিক হইয়া উঠে। এই ব্যক্তির নাম কবি।"

আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে শাশ্বত সত্যানুভূতির এবং আনন্দঘন প্রাণের স্পন্দনের চরম প্রকাশ ঘটেছিল। তাই তাঁদের কৃতি ও

কীর্তি জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে আজও বন্দিত হচ্ছে এবং তাঁদের জীবন-দর্শন সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের গ্রহণযোগ্য বস্তু হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে। বৈদিকযুগের সাহিত্যের জীবন-দর্শন হল মানবাত্মার অন্ধকার থেকে আলোকে, অসৎ থেকে সৎ-এ এবং মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে উদ্ধারণ। উপনিষদের ঋষি বলেছেন: "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রায়ন্ত্যভি-সংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ ব্রহ্ম।" অর্থাৎ যাঁর থেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, যাঁর দ্বারা জীবন ধারণ করছে, যাঁতে প্রয়াণও প্রবেশ করছে, তাঁকে জানতে ইচ্ছা করো, তিনিই ব্রহ্ম। বিশ্ব জগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যে ব্রহ্মের স্বরূপকে, অনন্তের স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনায় ভারতবর্ষের ঋষিরা এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, যা অন্যদেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা কল্পনাই করতে পারতেন না। উপনিষদের ঋষি আরও বলেছেন: 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' অর্থাৎ জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখবে। 'আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন'—ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি সর্ব্বত্র জানতে পেরেছেন, তিনি আর কিছুতেই ভয় পান না। উপনিষদের যুগ অতিক্রান্ত হয়ে রামায়ণ মহাভারতের যুগে আমরা যে জীবন-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হই, তাও অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের, পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের লড়াই এবং প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলব, 'রামায়ণে দেবতা নিজকে খর্ব্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষ নিজ গুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় স্বামী স্ত্রীতে যে ধর্ম্মের বন্ধন, যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। ...গৃহ ও গৃহধর্ম্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি, ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।' মহাভারতও একইভাবে কর্ম্ম ও বৈরাগ্যের, ত্যাগ ও প্রেমের শাশ্বত ইতিহাস। যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান-স্নেহ, কর্ণের ত্যাগনিষ্ঠা, বিদুরের প্রজ্ঞা মহাভারতের সমস্ত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পাপ ও মালিন্যের পুঞ্জীভূত কালিমাকে বিধৌত করে স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে এবং মহাভারতের মহানাট্যের ট্র্যাজেডীর শেষ অঙ্কে শুধু একটি বাণী অমৃতমূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হয়ে ভারতবর্ষের সহস্র বছরের হৃৎপিণ্ডকে আজও স্পন্দিত করছে —'যতোধর্ম্মস্ততোজয়।'

এর পরই উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ যুগের সাহিত্য। যদিও বৌদ্ধধর্ম নাস্তিক্য বুদ্ধি ও দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি বৌদ্ধধর্ম্মের মূলকথা—অহিংসা, জীবে দয়া, দুঃখের নিবৃত্তি, সত্যের অনুরাগ এবং কল্যাণ চিন্তা—পূর্ব্বযুগের সাধন-লক্ষ্যের পরিপন্থী নয়।

বৌদ্ধ যুগের পর সাহিত্যের নবযুগ হিসেবে বৈষ্ণবযুগই উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশে এই যুগের পুনরভ্যুত্থান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে দেখা দেয়। তাঁহার দেহাবসানে তাঁহার অসংখ্য ভক্ত-শিষ্যবৃন্দের দ্বারা যে সব সাহিত্য রচিত হয়, (তাতে মহাপ্রভুর জীবনলীলার বর্ণনাই অধিক) তাতে ভারতবর্ষের চিরাগত ধর্ম্মসংস্কারের এবং ঐ তত্ত্বসাধনার কথাই ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম প্রচারের বহু পূর্ব্বে বৃন্দাবনে বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্রের যে সকল অনুশীলন হয়েছিল, এবং তারও পরে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ইত্যাদি একাধিক বৈষ্ণব কবি যে সব ভক্তিরসাশ্রিত কবিতা রচনা করেছিলেন, তাতে এই ধর্ম্মের শক্তি এবং সামর্থ্য সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা পাওয়া গেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কাব্য এই মর্ত্ত্যজগতের নরনারীর আত্মা ও দেহের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। একাধিক ভাষ্যকার তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাটিপ্পনি দিয়ে এই কাব্যের যে রস-বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান পিপাসার এবং ঐ কবিদের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে তাঁদের অবিচলিত শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া গেছে। চণ্ডীদাসের 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' বৈষ্ণব সাহিত্যের জীবন-দর্শনের অতুলনীয় নিদর্শন। বিদ্যাপতির 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল' একই সঙ্গে স্মরণীয়।

তারপর আমরা চৈতন্যোত্তর যুগে বড় যে-পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হই, তা মঙ্গলকাব্য ও ভক্তি কাব্যের যুগ। একদিকে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম এবং অন্যদিকে রামপ্রসাদ—শিব ও শক্তির পূজারী হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের জীবন-দর্শনে আর্যভাবের সঙ্গে অনার্য্যভাব, অভিজাত চরিত্রের সঙ্গে অনভিজাত চরিত্রের, দৈবশক্তির সঙ্গে মানুষী শক্তির যে সামঞ্জস্য এবং ধর্ম্মকে একমাত্র পরিত্রাতারূপে স্বীকার করে নেবার যে দৃষ্টান্ত আছে, তা ভারত-সংস্কৃতির একটা মূল্যবান আদর্শ। রামপ্রসাদের ইষ্টদেবীর নিকট ভক্তি বিনম্র আত্মসমর্পণও যোগীর উপযুক্ত এবং সাধকের কাম্য।

মঙ্গল কাব্যের যুগের অবসানে আমরা যে যুগে অবতীর্ণ হই, তা বাঙালীর ভাবজীবনে বিরাট বিপ্লবের যুগ—যে-যুগে তার সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আধ্যাত্মিক জীবনের সকল অংশে একটা আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। বিদেশী শিক্ষা ও বিদেশী সভ্যতার সংঘাতে ও সংস্পর্শে তার বহির্জীবন এবং অন্তর্জীবন চঞ্চল হয়ে ওঠে —সে তার পুরুষ পরম্পরাগত সমস্ত বিশ্বাস বন্ধনকে অস্বীকার করে, শিক্ষা সাধনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে ভয়াবহ পরধর্ম্ম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু যা তার স্বভাবের অন্তর্গত নয়, যে সংস্কার তার রক্তগত, তাকে অস্বীকার করব বললেই ত আর ত্যাগ করা যায় না। তাই সাময়িক অস্থিরতা, চিত্তের বিকার ও চাঞ্চল্য, ভাবের উন্মাদনা যেদিন কাটল, সেই মোহভঙ্গের পর তার মধ্যে নবজীবনের এবং নবজাগৃতির রূপ লাবণ্য ফুটে উঠল। যে দেহ অজ্ঞতার অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে রক্তহীন হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরুদ্দীপ্ত হয়ে প্রাণের হিল্লোলে বলে উঠল: 'গাহিব মা বীর রসে ভাসি মহাগীত'; —বলল, 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী', কমলাকমল-দল-বিহারিণীং বাণীবিদ্যাদায়িনীং নমামি ত্বাং', 'বন্দেমাতরম্'।

বাংলা সাহিত্যের এই যুগ—যা মধু-বঙ্কিমের যুগ নামে আমাদের সবার কাছে পরিচিত, তার মূলে যে প্রেরণা ছিল, তার সঙ্গে বৈদিক যুগ, বৌদ্ধযুগ বা বৈষ্ণবযুগের জীবন-দর্শনের সাদৃশ্য বা সামাঞ্জস্য ক্ষীণ মাত্রায় থাকলেও এবং বৈদেশিক চিন্তাপ্রভাবে পুষ্ট হলেও যে ভারতীয় জীবধর্ম্ম-বিরোধী ছিল না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ সেক্ষেত্রে এই যুগ কখনই সৃষ্টি সম্ভারে এত সার্থকতা প্রদর্শন করতে পারত না, যা এর দ্বারা সম্ভব হতে আমরা দেখেছি। কার্য্যের সার্থকতায়, পরিণতির সাফল্যে যেমন কারণের সত্যতা বা সূচনার শুভ লক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টিকর্ম্মের সিদ্ধিলাভই ঐ যুগের অনুকূল শক্তির অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দর্শনের মানবপ্রেম (Humanism) ভারতীয় ভাবকল্পনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তার সুপ্ত বৃত্তিকে জাগ্রত করে বাঙলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিকে শুধু ত্বরান্বিত করে নি, সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী মনীষার একটা অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনা করেছে। শতাব্দীর অন্ধকারের অবসানে ঊনবিংশ শতকের প্রতিভার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কাব্যকুঞ্জ মুখরিত হল। 'ভোরের পাখী'র মত বিহারীলাল সুমধুর স্বরে রসিকের চিত্ত জয় করলেন। কুহেলিকা বিদূরিত করে পূর্ব্বাচলে উদিত হলেন অরুণরাগে রঞ্জিত প্রভাত রবি। সেও যেন বৈদিকযুগের ঋষিগণের মন্ত্রের

'আবিরাবীর্ম এধিঃ'—'হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও'—সাকার বিগ্রহ। কেননা ঋষিগণের মত তিনিও বুঝলেন : ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নেই, এবং বললেন :

'আমি ঢালিব করুণা ধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।'

রবীন্দ্র সাহিত্যের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলার অপেক্ষা রাখেনা। কারণ এ বিষয়ে আজ কেহই অবিদিত নেই যে, আমাদের দেশে যা কিছু নিঃশ্রেয়স, আমাদের যা কিছু আরাধ্য এবং কাম্য, তার সবই কোন না কোন আকারে রবীন্দ্রসাহিত্যে বর্ত্তমান। একদিকে বৈদিক রীতি অনুযায়ী শিক্ষালাভ এবং অপর দিকে বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে চিন্তা আহরণ—ঔপনিষদিক সংস্কৃতির সঙ্গে বৈষ্ণব নীতি-নিষ্ঠা, শান্ত রসসৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনাকে পরিশীলিত করেছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আজ বাঙালীর চিন্তা, রুচি ও বিচার বুদ্ধির মধ্যে যে মার্জ্জিত রূপের, সূক্ষ্ম ধারণাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তার প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ কারণ রবীন্দ্রনাথ। উপরন্তু আজও যে আমাদের বাংলা দেশে কতকগুলি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের জন্ম সম্ভব হয়েছে, তারও মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষার অমেয় প্রাণশক্তি, যা আমাদের মননের মধ্যে প্রবেশলাভ করে নবকলেবরে স্ফুরিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য থেকে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আহরণ করে তাঁর জীবন-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে তার অবকাশ নেই। প্রসঙ্গতঃ দু একটি কথা শুধু বলব যার ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানেনা—সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করেনা। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন "যাহা নাই তাহারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না—ছুটাছুটিই যে চরম সার্থকতা, একথা

ভারতবর্ষের নহে। যাহা অন্তরে বাহিরে চারিদিকেই আছে, যাহা অজস্র, যাহা ধ্রুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়—কারণ তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য। যিনি অন্তরে আছেন তাঁহাকে অন্তরে লাভ করিতে ভারতবর্ষ বলে, যিনি বিশ্বে আছেন তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যেই উপলব্ধি করা ভারতবর্ষের সাধনা।”

রবীন্দ্রনাথের পর বড় স্রষ্টা বলতে শরৎচন্দ্রকেই বোঝায়। শরৎ-সাহিত্যের জীবন-দর্শনে নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনার এবং সমাজ বহির্ভূত ব্যক্তিগণের প্রতি করুণায় ভারতবর্ষের বৈষ্ণবধর্ম্মোক্ত সর্ব্বাশ্রয়ী প্রেমকল্পনার এক নবকলেবর সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত দীর্ঘ সত্তর বৎসর কালে জগৎ-সত্যের এবং জীবন-রহস্যের যে স্বরূপ ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে প্রকাশমান হয়েছে, তার উপাদানমূলে কোনও পার্থক্য বা বৈষম্য নেই—যদিও তাদের বাইরের আবরণে এবং আমাদের স্থূলদৃষ্টিতে যে বিষয়টি প্রতিফলিত হয়, তাতে তার মূর্ত্তি বিভিন্ন ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। জীবন-দর্শনের এই আকৃতিগত বৈষম্য সম্বন্ধে যারা প্রশ্ন করবেন, তাঁদের উত্তরের জন্য প্রমথ চৌধুরীর একটি কাব্যের চারটি চরণ স্মরণ করতে বলব। সেই অর্থপূর্ণ চরণগুলি এই :

> “ভাষায়-যা-কিছু ধরি, উপরেই ভাসে,
> স্বেচ্ছায় করেছে যাহা আলোক বরণ।
> সত্য কিন্তু তারি নীচে মুখ ঢেকে হাসে,
> কভু নাহি দেখা দেয় বিনা আবরণ ”

মানুষের মনের যে সকল ভাব ভাষায় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, তাদের আকৃতিতে বৈষম্যের অন্তরালে একটি সুনিশ্চিত ঐক্য বা প্রকৃতিগত সত্য বিরাজ করে। এই হিসেবে বা এই সাধারণ সূত্রের বিচারে একথা সহজেই প্রতীয়মান হবে যে. ‘রোহিনী-বিনোদিনী-সাবিত্রী’—‘সত্যানন্দ-গোরা-সব্যসাচী’—‘প্রতাপ-রমেশ-মহিম’ মূলতঃ একই সৃষ্টির, একই সত্তার, একই সত্যের ভিন্ন বহিঃ-প্রকাশ। তাদের আধার বা পরিধী অনুযায়ী যাদের বৈসাদৃশ্য সম্ভবপর হয়েছে। এই আধারের মাপকাঠি শাশ্বত সত্য নয়—ক্রম পরিবর্ত্তনশীল সমাজ চেতনা। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে যে সমাজ-সত্তা নীতির কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে মানুষকে ঘিরে রেখেছিল, রবীন্দ্রনাথের যুগে সেই বেড়া ডিঙ্গিয়ে তাকে আর একটা সূক্ষ্ম জালের মধ্যে আবদ্ধ হতে হয়েছে এবং শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট মানুষগুলি জী

আচার ও রীতি-নীতির বন্ধন মুক্ত হয়ে, বেড়াজালের বাইরে এসেও শান্তি লাভ করেনি—পুনরায় সেই বন্ধনদশার আশায় বেড়ার আগলের সামনে মাথা কুটে মরেছে—বলেছে 'সমাজ আমাকে না মানলেও, আমি তাকে না মেনে পারি না।'

বাংলা সাহিত্যে জীবন-দর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি একটি পরিচয় দেওয়া গেল। শরৎচন্দ্রের পর বাংলাসাহিত্যের অবস্থা কোন্ পর্য্যায়ে এসেছে এবং তাতে বিগত যুগের সাহিত্যের জীবন-দর্শনের কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা, সে সম্বন্ধে প্রামাণ্যভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নয়; কারণ এ সাহিত্য এখনও সম্পূর্ণরূপে মীমাংসিত হয়নি এবং কালের ব্যবধান না গেলে এর আসল মূল্য নির্দ্ধারিত হবে না। তবুও আমরা এ বিষয়ে একটা ধারণা করার চেষ্টা করব এবং আলোচনার শেষে একটা সিদ্ধান্তও উপস্থাপিত করব যাতে করে সাহিত্য-পিপাসু ব্যক্তিগণ অন্ততঃ আধুনিক সাহিত্যের মূলগত সত্যরূপটি আবিষ্কার করতে ভ্রমে না পড়েন। কিন্তু তার আগে বিদেশী সাহিত্যের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক্ এবং আমাদের সাহিত্যের জীবন-দর্শনের মত তাদের প্রাণেও কিছু জিজ্ঞাসা আছে কিনা এবং সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাক্।

পৃথিবীর যে কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, সকল উৎকৃষ্ট কাব্যই জীবনের সত্য ও সুন্দরের প্রতিরূপ। এবং জগৎ ও জীবনকে মহিমান্বিত করা সকল কবিকীর্ত্তির আন্তরিক প্রেরণা। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে ইস্কিলাস (Æschylus) থেকে আরম্ভ করে প্লেটো (Plato) অ্যারিষ্টটল (Aristotle) সফোক্লিস (Sophocles) হোমার (Homer) ইউরিপেডিস (Euripedes) সকলেই এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, কবি হলেন শিক্ষক, যাঁর প্রধান কাজ মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং তার বৃত্তিগুলিকে উন্নততর করে তোলা। দার্শনিকপ্রবর অ্যারিষ্টটলের মতে কবি হলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, যিনি বর্ত্তমানের মধ্যে অবস্থান করেও অনাগতের আভাষ পাচ্ছেন। তিনি বলেছেন "The poet's business is not to write of events that have happened, but of what may happen, of things that are possible in the light of probability or necessity." গ্রীক পুরাণ এবং ট্র্যাজেডী গুলিতে মানবজীবনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা যেমন আদর্শবাদিতায় রঙীন, তেমনি মানুষের জীবনের যে সংঘাত-ময় আবর্ত্ত-ফেনিল ঘটনাস্রোত তার মাঝে বহে গেছে, তার পরিণতির শুভাশুভ

নির্ভর করেছে জগতের নিয়ামক এক অমোঘ মহাশক্তির পাদমূলে বিশ্বাস স্থাপন বা বিদ্রোহ ঘোষণার ওপর। তারপর প্রাচীন ল্যাটিন সাহিত্যে দান্তে (Dante) ভার্জিল (Virgil) ইত্যাদির কাব্যে মধ্যযুগীয় শৌর্য্যবীর্য্যের অনাচারের মধ্যেও একটা অধ্যাত্ম-গভীর সান্ত্বনা মানুষকে আশ্বস্ত করেছে। মরজগতের প্রেম স্বর্গীয় মহিমার রসসিঞ্চনে অভিসিক্ত হয়ে চিরন্তন অমৃতনিস্যন্দী বাণীরূপ ধারণ করেছে। ইংরাজী সাহিত্যে সেক্সপীয়ার (Shakespeare) মানবজীবন ও মানবপ্রকৃতির রস-রহস্য সন্ধানে যত গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং যে-পরিমাণ সাফল্য অর্জ্জন করেছেন, উত্তরকালে আর কোন কবির পক্ষে তাঁর সমকক্ষতা লাভ করা অচিন্তনীয় এবং দুঃসাধ্য। সেক্সপীয়র মানবজীবন সম্বন্ধে যে সব তথ্য ও সত্য আবিষ্কার করেছেন, তা একমাত্র তাঁর মত প্রতিভারই পক্ষে সম্ভব। তিনি যেমন দেখেছেন—

"All the world's a stage,
And all the men and women merely players"

তেমনি একথাও তাঁর মনে উদ্ভূত হয়েছে : "Life is but an empty shadow

... .

it is a tale
Told by an idiot full of sound and fury
Signifying nothing"

সেক্সপীয়রের পর বড় কবিপ্রতিভার অধিকারী মিল্টন (Milton)। তাঁর বিখ্যাত কাব্য প্যারাডাইস লষ্ট (Paradise Lost) মানবজীবনের উত্থান পতনের অমর আলেখ্য। সেই কাব্যের প্রারম্ভে কবির প্রাণের যে কথাটি ব্যক্ত হয়েছে, তা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। কথাটি এই :

"That I may assert Eternal Providence,
And justify the ways of God to man"

মিল্টনের পর ড্রাইডেন (Dryden) চিন্তার ক্ষেত্রে একটা সাড়া জাগিয়েছিলেন। তিনি প্রথম এই কথা ঘোষণা করলেন যে, জীবদেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধির ন্যায় সাহিত্যেরও ক্রমবিকাশ আছে। তাঁর মতে শিল্পী হলেন বাস্তব জীবনের চেয়ে সুন্দর বস্তুর নির্ম্মাতা। তিনি আরও বললেন যে, কেবলমাত্র জীবনকে প্রত্যক্ষ করলেই কাব্য হবে না—তাকে কল্পনার রঙে অনুরঞ্জিত করে বিচারবুদ্ধির উপযোগী করে তুলতে হবে। ড্রাইডেন যে সৌন্দর্য্য চেতনার দীক্ষা দিলেন, তাই পরবর্ত্তীকালে রোমান্টিক কবিকুলকে নতুন রস-

প্রেরণার ইঙ্গিত দিল। তাই দেখি যে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যে তন্ময় হয়ে তার মধ্যে এক বিশ্বচেতনার অনুভূতি লাভ করে আবেগ ভরে বলছেন: 'To me the meanest flower that blow can give thoughts that do often lie too deep for tears'. শেলী (Shelley) রূপাতীত রূপময়ীর প্রেমসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে আবিষ্টভাবে বলছেন: 'Be it love light, harmony or universal soul'. কীটস্‌ (Keats) আকুলভাবে প্রেমিক হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলছেন—

"Beauty is truth truth beauty,"—that is all,
Ye know on earth and all ye need to know.

জীবনসত্যের উপলব্ধি ব্যতীত যে বড় কবি বা রসস্রষ্টা হওয়া যায় না, একথা সব দেশের মনীষীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। কবিসমালোচক কোলরিজ (Coleridge) বলেছেন: "No man was ever yet a great poet, without being at the same time a profound philosopher"। ইংরেজী সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড (Mathew Arnold) সাহিত্যের প্রথম প্রয়োজনীয় সামগ্রী কি, তার নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—'Truth and seriousness' অর্থাৎ সত্য এবং যাথার্থ্যই হবে তার প্রধান মাপকাঠি। অধিকন্তু গ্রীকসাহিত্যের এবং অন্যান্য ক্লাসিক সাহিত্যের জ্ঞান আহরণ করার ফলে এই বিশ্বাস তাঁর মনে জন্মেছিল যে, সমাজের কল্যাণ সাধনই হবে সাহিত্যের একমাত্র প্রচেষ্টা— the moral and social passion for doing good'।

এ পর্যান্ত যে সব শিল্পীদের পরিচয় দেওয়া হল, তাঁরা ছাড়া আর যাঁরা মহৎ শিল্পী হিসাবে অমরত্ব লাভ করেছেন, যেমন জার্ম্মানীর কাব্যগুরু গোটে (Goethe), রাশিয়ার অপরাজেয় কথাশিল্পী টলষ্টয় (Tolstoy) কিম্বা ফরাসী সাহিত্যের দিক্‌পাল হুগো (Hugo) সকলেই মানুষের জীবনের বা ভাগ্যের যে দিকটা মহান, সেই দিকটাই প্রতিফলিত করেছেন এবং মনীষী লঙ্গিনাসের (Longinus) মত তাঁদেরও এই বিশ্বাস সামান্য ছিল যে, 'the sublime effect of literature is attained not by argument but by revelation or illumination'। অর্থাৎ সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ তর্কের দ্বারা লাভ করা যায় না—জীবনসত্যের প্রকাশ ও দীপায়নেই তা সম্ভব।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত সাহিত্যের যে কালানুক্রমিক আলোচনা করেছি, তাতে ঐ সাহিত্যের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা গেছে। তারপর প্রসঙ্গতঃ ইংরেজী সাহিত্যের সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাতেও ঐ সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রস-সত্যটি বিচক্ষণ পাঠকের বুদ্ধিগম্য হয়েছে। এখন আমরা আমাদের মূল আলোচনার সূত্র ধরে আর কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করব। কারণ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করলে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যদিও পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিই যে, আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে যে কথা বলা হবে, তা অবিসম্বাদী এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রাহ্য হবার দাবী রাখে না।

বাংলাসাহিত্যের পাঠক মাত্রেই একথা স্বীকার করবেন যে, আদিযুগ থেকে শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত সাহিত্যের রূপ নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হলেও, এবং সমাজ-চেতনা এবং যুগধর্ম্মের প্রভাবে তার বাইরের কাঠামোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অদল-বদল হলেও তার আত্মার বা প্রাণধর্ম্মের কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়নি। অর্থাৎ তার অন্তর্নিহিত রস-সত্য কখনও বিকার বা ব্যাভিচারের কাছে আত্মসমর্পন করেনি। বাস্তবতার নামেই হোক, অতি আধুনিকতার নামেই হোক, প্রগতির নামেই হোক বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দেওয়া নিৰ্জ্জান মনঃসমীক্ষণের নামেই হোক—বাংলা সাহিত্য তার চিন্ময় আদর্শ, সত্যধর্ম্ম, অধ্যাত্মচেতনা এবং ভারতীয় জীবনবোধের বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হয় নি। একথা সত্য যে, শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত সব সাহিত্যিকই মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, কেননা সকলেই সে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। তথাপি তাঁরা যে সকলেই নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী জীবনের জয়গানে এবং প্রাণধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন এবং সে বিষয়ে তাঁদের সততা বা নিষ্ঠার অভাব দেখা যায় নি, একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রের পরের যে সব কবি ও সাহিত্যিক এই পথ অনুসরণ করেছেন এবং আজও অবিচলিতভাবে বাণীর আরাধনা করছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে আজ বর্ত্তমান এবং তাঁদের সৃষ্টিকর্ম্ম রসিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে যোগ্য সমাদর ও পুরস্কার লাভ করেছে। এঁদের সম্বন্ধে ভয় বা ভাবনার কোনও কারণ নেই। কিন্তু সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে যে একটি ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে অবহিত ও সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সেই ব্যাধিটি একদেশদর্শী চিন্তা-

প্রসূত, খণ্ডিত-সত্য বা কপট ভাবকল্পনাপূর্ণ ও বিকৃত বাস্তবাশ্রয়ী সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টা।

একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা যাক্। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে আমাদের দেশে ও জাতীয় জীবনে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে গণ অভ্যুত্থান (আগষ্ট বিপ্লব), মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ ইত্যাদি অবিস্মরণীয়। কিন্তু এইসব ঘটনা অবলম্বন করে যে-সাহিত্য রচিত হয়েছে তাতে অধিকাংশই সাহিত্যিকের সত্য দৃষ্টির, অবিকৃত তথ্য পরিবেশনের সাধু চেষ্টার, অতিভাষণ বা অতিরঞ্জন ত্যাগের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এর কারণ সাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার, সহানুভূতির এবং সহমর্মিতার অভাব ছাড়া আর কিছু নয়। আরও একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। ধরা যাক্ 'বাস্তুত্যাগী ও শরণার্থীর'-জীবন কেন্দ্র করে একটা চমকপ্রদ ও বাস্তবানুগামী সাহিত্য রচিত হল। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই দেখা যাবে, তাতে নরনারীর দুঃখদুর্দ্দশা, অভাব রোগ শোকই কেবল বর্ণিত হয়েছে,—নৈরাশ্য ব্যর্থতা হতাশ্বাস তার পাতায় পাতায় ধ্বনিত হচ্ছে—কোথাও সান্ত্বনার কথা নেই, আশ্বাসের ইঙ্গিত নেই, মানবিক মহত্বের পরিচয় নেই। আত্মার দীনতা এবং দেহজীবনের গ্লানিকর ক্ষুৎপিপাসাই সব জায়গা জুড়ে বসে আছে। হয়তো প্রবৃত্তির কুৎসিৎ মূর্ত্তি নিরাবরণ ভাবে এবং অসঙ্কোচে আঁকা হয়েছে। যুক্তিস্বরূপ এর লেখক বলতে পারেন, তিনি যেমনটি প্রত্যক্ষ করেছেন, ঠিক তেমন ভাবেই তুলে ধরেছেন। তবু বিচক্ষণ পাঠকের প্রশ্ন থাকবে এই যে, আশ্রয়চ্যুত, ছিন্নমূল ও স্রোতের মুখে ভাসমান নরনারীর জীবনের অতি সাময়িক ঘটনাই কি মানবজীবনের সম্পূর্ণ সত্য? অনাহারে, রোগক্লিষ্ট হয়ে ও শোকতপ্ত হয়ে বাস্তুত্যাগী নরনারীর জীবনদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হওয়ার কাহিনী যেমন সত্য, কাল বৈশাখীর উন্মাদ ঝড়ে সামান্য আশ্রয় গৃহের চালা উড়ে গিয়ে বা বর্ষার প্লাবনে অতর্কিত ভাবে গৃহচ্যুত হওয়ার কাহিনী যেমন সত্য, শীতের রাত্রে রোগাক্রান্ত সন্তানকে ঔষধপথ্যহীন অবস্থায় নিয়ে জাগরণের কাহিনী যেমন সত্য অথবা বিষধর সর্পাঘাতে স্বামীর কিম্বা স্ত্রীর মৃত্যু যেমন সত্য, বন্য জন্তুর আক্রমণে শিশুর জীবন নাশ যেমন সত্য—তেমনি আবার শত শত নরনারীর জীবনের আহ্বানে আশ্রয় রচনা, শান্ত কুটীরের প্রাঙ্গনে ক্রীড়ামত্ত বালকবালিকাদের

কোলাহল, কর্ম্মপটু যুবকযুবতীর নিরলস পরিশ্রম, সন্ধ্যাকালে তুলসীমঞ্চে ভক্তিনম্র প্রণাম ও দীপায়ন, প্রত্যূষে গৃহকর্ম্মে আত্মনিয়োগ, উৎসব অনুষ্ঠানে মুখরিত জনতার শোভাযাত্রা—আশায় আনন্দে সুখে শান্তিতে অতীত জীবনের ক্ষতস্মৃতিকে ভোলার কাহিনীও সমান সত্য এবং বড় সত্য। এই সত্য না থাকলে—'জীবনে জীবন যোগ করা না হলে' লেখকের সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কেননা সত্য কখনও খণ্ডিত হতে পারে না। সত্য মানেই সম্পূর্ণ সত্য। আর সম্পূর্ণ সত্যই জীবন-সত্য, যার দর্শনে স্পর্শনে ও চিত্রণে সাহিত্য হয় সৃষ্টি।

ভাববার কথা

ধীরেন্দ্র চৌধুরী

(১)

প্রায় দুইশত বৎসর গত হইতে চলিল বর্ত্তমান যন্ত্রসভ্যতার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। বলিতে গেলে অতি অল্পকালের মধ্যেই এই সভ্যতা সমগ্র মানব সমাজের মনপ্রাণ হরণ করিয়া বিপুলায়তন হইয়াছে এবং ক্রমান্বয়ে বাষ্প, তেল ও বিদ্যুৎশক্তির যুগ অতিক্রম করিয়া অধুনা একেবারে আণবিক শক্তির যুগে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছে। এই সভ্যতার জয়জয়কারে আজ আকাশ বাতাস মুখরিত, তথাপি কিন্তু শুনিতে পাই জগতের মনীষীবৃন্দ এমন কি আইনষ্টাইন প্রমুখ ঋষি-বৈজ্ঞানিকগণ পর্য্যন্ত এই সভ্যতার পরিণাম সম্বন্ধে বার বার সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতেছেন। পক্ষান্তরে আবার ইহাও দেখিতেছি যে, বিশ্বরাজনীতিবিদ্‌গণ বিদ্যুৎশক্তি অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন আণবিক শক্তিকে যন্ত্রপরিচালন কার্য্যে নিয়োগ করিয়া এই সভ্যতাকে আরও বহুগুণে স্ফীত করিয়া তুলিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।

অতএব ধর্ম্মের কুসংস্কারের মত, হট-বৈজ্ঞানিকগণ (Technicians) যাহা কিছু সৃষ্টি করেন, তাহাই বরণীয়—এই কুসংস্কারকেও বর্জ্জন করিয়া আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা মানব সমাজ,

দেহ ও মনে কি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার ফলই বা কি হইয়াছে ; আবার ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যেই উদ্দেশ্য নিয়া এই সভ্যতার প্রবর্ত্তন করা হইল, তাহাই বা কতদূর সাফল্য লাভ করিল। যন্ত্রযুগ যখন প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল, তখন একথাই তারস্বরে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, এতদ্দ্বারা মানুষ অতি অল্প সময়ে, অল্প আয়াসে ও অল্প ব্যয়ে তাহার প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইতে পারিবে এবং ফলে যে প্রচুর অবসর মিলিবে, তাহা নানা মানসিক বৃত্তির অনুশীলনে ব্যয় করিয়া সে দ্রুত ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইবে। সুতরাং এই কেন্দ্রীভূত যন্ত্রব্যবস্থায় মানুষের সকল দুঃখ ঘুচিবে—শান্তি আসিবে।

এখন দুইশত বৎসর পরে আমরা যদি এই সভ্যতায় গড়া মানব সমাজের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিপাত করি, তবে কি দেখি? দেখি, অগ্নিশিখায় প্রলুব্ধ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ভোগৈকসর্ব্বস্ব পতঙ্গের ন্যায় মানুষও এই সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যে ও আপাতঃ সুবিধার মোহে সম্মোহিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু আবার পরক্ষণেই শুনিতে পাই তাহাদেরই কাতর আর্ত্তনাদ—"বাঁচাও বাঁচাও! শান্তি চাই।" সুতরাং হট-যোগীর ন্যায় হট-বৈজ্ঞানিকগণও নানা আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইয়া মানুষের মন মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেও, তাঁহারা যে যন্ত্ররচনা দ্বারা মানুষকে আসলে কোন শান্তি দিতে পারেন নাই, ঐ বিশ্বব্যাপী আর্ত্তনাদ তাহারই নিদর্শন নহে কি?

কথা এই যে, শান্তি বা সুখপ্রদ অবসর মানুষ পাইতে পারে শুধু তখনই, যখন তাহার প্রয়োজনেরও একটা সীমা থাকে এবং ঐ সসীম প্রয়োজনকে সে মিটাইতে পারে পরিপূর্ণরূপে অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে। কিন্তু যে-সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিবার তাগিদেই একান্ত দরকার মানুষের প্রয়োজনের পর প্রয়োজন তথা অভাবের পর অভাব সৃষ্টি করা, সেই সভ্যতায় শান্তি বা সন্তোষ আসিয়া স্থিতি লাভ করিবে কোন্ সুরে? সুতরাং দেখিতে পাই ঘড়ির কাটায় কাটায় কর্ম্ম করিয়াও মানুষ প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না, যদিবা কখনও একটু অবসর মিলিতেছে, সেই অবসরও মানসিক বৃত্তির সাধনায় ব্যয়িত হইতে পারিতেছে না, ব্যয়িত হইতেছে নানা হালকা আমোদ প্রমোদ, গল্প ও পড়ায়, অতৃপ্ত বাসনা ও কর্ম্মজনিত অবসাদগ্রস্ত দেহ ও মনকে একটু চাঙ্গা করিয়া তুলিবার জন্য।

তারপর যন্ত্রের রকমারি ও গতিবেগ যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে সভ্যতার অগ্রগতির নামে, তেমনই জটীল হইতে জটীলতর হইয়া পড়িতেছে মানুষের জীবনযাত্রা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। এখন এইরূপ একটা সদা পরিবর্ত্তনশীল অর্থনৈতিক ও জটীল জীবনের পারিস্থিতির মধ্যে কোন শান্তি মিলিতে পারে কি? না, প্রকৃত সভ্যতা যাহাকে বলে, মানুষের সূক্ষ্মানুভূতির বিকাশ এবং যদ্দ্বারা মানুষ পশুশ্রেণী হইতে বিভিন্ন, তাহাই গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায়?

একথা ঠিক যে, যন্ত্রবলে আমরা আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে শিখিয়াছি, জলের নীচেও ডুবিয়া বেড়াইতে পারি, কিন্তু কেমন করিয়া যে বাস করিতে হয় এই মাটিতে মানুষের মত—শান্তিতে, তাহা শিখিতে পারিয়াছি কি?

যানবাহনের গতিবেগ আজ বাড়িয়াছে কত! পৃথিবীটাও হইয়া গিয়াছে কত ছোট! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, কালায় ধলায়, ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে ভেদ রহিয়াছে, অন্তরে অন্তরে তাহার দূরত্ব কমিয়াছে কি এতটুকুও? প্রথমে গিয়াছে খণ্ডযুদ্ধ, তারপর যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছে মহাযুদ্ধ। ঐ মহাযুদ্ধও শেষ হইল দুইটী অল্পদিনের মধ্যেই, তথাপি শান্তি আসে নাই বরং দেখিতে পাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংস-স্তূপ অপসারিত হইতে না হইতেই আরম্ভ হইয়াছে তৃতীয় মহাযুদ্ধের মহড়া।

মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার হইল, রেডিও আসিল, আর কতই না উন্নত হইল প্রচার ও শিক্ষা বিভাগ বিজ্ঞানবলে। কিন্তু একান্ত ভোগের বাসনা ভিন্ন অপর কোন উচ্চ আদর্শে আজিও অনুপ্রাণিত হইতে পারিল কি মানব-সমাজ? অথচ যখন মুদ্রাযন্ত্র বা রেডিও ছিল না, যাতায়াতের পথও ছিল বিঘ্নবহুল, তখন কিন্তু সামান্য কয়েকখানা হাতে লেখা পুঁথি আর মুষ্টিমেয় পরিব্রাজকের সাহায্যেই ভারতীয় উচ্চ ভাবধারা সমগ্র এশিয়া খণ্ডে এবং যীশুখৃষ্টের আদর্শ সমগ্র ইউরোপে প্রচারিত হইতে পারিয়াছে।

কেবল তাহাই নহে, ঐসব উচ্চ আদর্শের ভিত্তিতে যে সব মহান সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল দেশে দেশে, সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যবধানে এবং সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান যন্ত্রসভ্যতার নিষ্পেষণে আজিও তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। অতএব যন্ত্রবিজ্ঞানের এমন আশাতীত উন্নতি সত্ত্বেও এই সভ্যতা

মানবতা বিকাশের দিক হইতে কতটুকু সার্থকতা লাভ করিয়াছে, মানুষ হিসাবে সে কথা আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে না কি?

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যন্ত্রের কোন দোষ নাই, দোষ তাহাদের—যাহারা ঐ যন্ত্রকে বিকৃত ভাবে ব্যবহার করেন। আমরা কিন্তু এ কথায় সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিলাম না এবং কেন পারিলাম না তাহাই বলিতেছি।

কেন্দ্রীভূত যন্ত্রব্যবস্থাকে চালু রাখিতে হইলে একান্ত প্রয়োজন (১) প্রচুর কাঁচামাল সংগ্রহ (২) প্রচুর উৎপাদন এবং (২) শিক্ষা, বিজ্ঞাপন ও রাজনৈতিক কৌশলে মানুষের মনে নানা প্রয়োজনের বোধ সৃষ্টি করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের প্রচুর বিক্রয়।

এই ত্রিনীতির উপরেই নির্ভর করে কেন্দ্রীভূত যন্ত্রের জীবন এবং ইহার কোন একটির উপর আঘাত পড়িলেই যন্ত্র হয় বন্ধ, সভ্যতা হয় অচল।

অতএব অবস্থা দাঁড়াইল এই যে, প্রথমতঃ চাই বিস্তৃত বাজার সুতরাং বিভিন্ন দেশের উপর রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অথবা প্রথমে আদর্শগত ও পরে ঐ ছিদ্রপথে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার এবং (২) কল ও বাজারের মাঝখানে যে পথ-ঘাঠ—তাহার নিরাপত্তা। সুতরাং প্রচুব সৈন্যসামন্ত ও রণসম্ভার চাই আর চাই ছলে বলে কৌশলে অপরাপর দেশের কতগুলা প্রয়োজনীয় স্থান দখলে রাখা, যেমন বৃটেনের কলকারখানার জন্য চাই স্পেনের জিব্রালটার, মিশরের সুয়েজ এবং আরবের এডেন। তারপর আছে আবার বিভিন্ন যন্ত্রপ্রধান দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার ফলে যখন কোন দেশের কল বন্ধ হইবার উপক্রম হয় বা লাভের অঙ্ক নিম্নগামী হয়, তখনই আরম্ভ হয় রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজির খেলা যাহাকে ভদ্রভাষায় বলে ডিপ্লোমেটিক লড়াই এবং এই লড়াইও যখন ব্যর্থ হয়, তখনই আরম্ভ হয় যুদ্ধ গণতন্ত্র মানবতা অথবা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা রক্ষার অছিলায়।

দ্বিতীয়তঃ চাই সমাজে একান্ত ভোগের বাসনাকে জীবনের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করা, নচেৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং নানা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে (পরোক্ষে যন্ত্র ব্যবস্থার অবাধ চলনকে অব্যাহত রাখিতে) মানুষ উৎসাহিত হইবে কেন? এই ব্যবস্থাটির ফলস্বরূপেই আজ আমরা দেখিতেছি যে, মানবতা বিকাশের পরিবর্ত্তে ভোগবিলাস তথা অর্থই হইয়া দাঁড়াইয়াছে সভ্যতার মানদণ্ড। চরিত্র যেমনই হউক তাহাতে কিছু আসে যায়

না, যাহার ক্রয়-শক্তি যত অধিক, সেই তত বেশী ভদ্র বলিয়া বিবেচিত হয় সমাজে আর তাহার প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা রাজদরবার হইতে আরম্ভ করিয়া সাধুসন্ন্যাসীর মঠ মিশন পর্য্যন্ত থাকে সর্ব্বত্র অব্যাহত।

এমন কি আমাদিগের বর্ত্তমান পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধ পর্য্যন্ত আজ নিরূপিত হইতেছে ঐ টাকা আনা পাই-এর মাপকাঠিতে। সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক বৃত্তি, সুতরাং যে সভ্যতায় ঐ আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা নির্ভর করে একমাত্র ব্যাঙ্কব্যালেন্সের উপরে, সেখানে মানুষ যে ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে যে কোন প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ক্রয়-শক্তি বাড়াইয়া তুলিবার জন্য প্রলুব্ধ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

এখন একদিকে সভ্য হওয়ার এমন 'মেইড ইজির' (made-easy) সন্ধান পাইয়া এবং অপরদিকে যন্ত্র ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাত্রার মানদণ্ড উচ্চ হইতে উচ্চতর হওয়ার ফলে মানুষ যেমন হইয়া উঠিতেছে দুর্নীতিপরায়ণ তেমনই হইতেছে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর ও হৃদয়হীন।

বর্ত্তমান যন্ত্রসভ্যতার পীঠস্থান আমেরিকা। সেখানে এমন অনেক কোটীপতি সুতরাং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি আছে, যাহারা বড় বড় দস্যু বা তস্কর দলের সর্দ্দার বলিয়া জানা গিয়াছে। ইয়াঙ্কী সরকার আইনের পর আইন করিয়া, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র কোটী ডলার দুর্নীতি দমন বিভাগে ব্যয় করিয়াও দুর্নীতি দমন করিতে পারিতেছেন না বরং দুর্নীতি দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবশ্য দুর্নীতি প্রসারে সিনেমাও কম সাহায্য করিতেছে না। দেখা গিয়াছে আমেরিকার তরুণ তরুণীদিগের মধ্যে দুর্নীতির অপরাধে যাহাদের সাজা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪৬টি যুবক এবং ৬৬টি যুবতী দুর্নীতির প্রেরণা লাভ করিয়াছে ঐ সিনেমা দেখিয়া।

তারপর আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে সাধারণতন্ত্রের (socialismএর) ভিত্তিতে গড়া আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থাও ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নি, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীর সঙ্গে যে শ্রদ্ধা ভক্তি, স্নেহ ভালবাসা ও দয়া মায়ার সম্বন্ধ ছিল, তাহা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়া সকল সম্বন্ধ একটি মাত্র সম্বন্ধে আসিয়া পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে এবং ঐ সম্বন্ধটি হইতেছে 'আমি আর তুমি' অর্থাৎ স্বামী আর স্ত্রী। কেবল কি তাহাই ? এই সভ্যতা জীবনযাত্রার মানদণ্ড আজ এমন এক স্তরে আনিয়া ফেলিয়াছে, যে যন্ত্রে

আণবিক শক্তি প্রযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই 'ফ্যামিল প্ল্যানিং'-এর ধুম পরিয়া গিয়াছে দেশে দেশে। বলি, এই সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্ল্যানিংই বা কোথায় গিয়া একদিন শেষ হইবে তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? এই প্ল্যানিং শেষ হইবে সেই আদিম যুগের বর্ব্বরতায়, যখন পরিবার বন্ধন তো দূরের কথা, বিবাহ বন্ধনও আর থাকিবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য, মানবতাই যদি সমূলে উৎপাটিত হইতে চলিল, মানুষের সূক্ষ্মানুভূতি সকল লোপ পাইতে বসিল, তবে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের এত উৎকর্ষতার নিদর্শন হওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার স্বার্থকতা কোথায়?

ভাবনার ছিটেফোটা

প্রশান্তকুমার বসু

ধাক্কা খাচ্ছি অহর্নিশ
 চিন্তা রাশির আঘাতে
উঠ্ছে যেটা প্রতিক্ষণেই
 পাত্‌লা মোটা কায়াতে,

এপাশ থেকে ওপাশ হতে
 সামনে কিংবা পিছনে
মাথার ওপর পায়ের তলে
 চিন্তা ঠেলছে সমানে,

চিন্তা ঘোরে পথে ঘাটে
 গ্রামে কিংবা সহরে
উঠতে বসতে দিবারাত্র
 হাটায় কিংবা মোটরে।

সুখের চিন্তা দুঃখের চিন্তা
কালের কিংবা আজেরি
মনটা যেন ছিন্ন হাওয়ায়
ধুন্‌চে তুলো ধুনুরী ॥

তার মাঝেতে কতক থাকে
কতক মিলায় শূন্যে
কতকের হয় রূপরূপান্তর
পাপে কিংবা পুণ্যে।

ঠেলার পরে ঠেলা খেয়েও
লাভ দেখ্‌ছি একটা
লাট্টু ঘোরার ঘূর্ণী খেয়েও
ছেড়ে আস্‌ছি পিছ্‌টা ॥

হাল একটা ধরাই আছে
প্রকাশ্যে কি গোপনে
ধ্রুবতারা জ্বলেই থাকে
পাল দোলা খায় পবনে।

নইলে এমন আঁধার সাগর
পার হয়ে যাই কি ভাবে
একটা আছেই পথের হদিস্
অদৃষ্টে কি স্বভাবে।

মারুক ঠেলা চিন্তা রাশি
যত ইচ্ছা আঘাতে
ফুলুক ভাবনা-মহাসাগর
যত ইচ্ছা দোলাতে

ছেড়ে দিয়ে হালেরি দায়
বুদ্ধি শেষের বন্দরে
প্রণাম করি অচিন্ত্যে আর
প্রণাম করি চিন্তারে।

কাশ্মীরের বুড়ো শিব

পূর্ণচন্দ্র রায়

[সংহতি—আশ্বিন, ১৩৬০ হইতে লওয়া হইয়াছে। উঃ ভাঃ সম্পাদক]

কাশ্মীর সরকারের কোন কর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া ১৯২৪-২৬ সন পর্য্যন্ত আমাকে একাধিকবার কাশ্মীর যাইতে হইয়াছিল। সেখানে অবস্থানকালে জানিতে পারিলাম, শ্রীনগর হইতে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে জঙ্গলের ভিতর একটী শিবলিঙ্গ আছে। এত বড় শিবলিঙ্গ আর কোথাও নাই। একটি ছুটির দিনে কয়েকজন কাশ্মীরের ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া এই শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে রওনা হইলাম। ১২।১৪ মাইল ঘোড়ার গাড়ীতে যাইয়া বাকী রাস্তা বনজঙ্গলের পাহাড়ের উপর দিয়া একটি গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। গ্রামের ভিতর একটি মুসলমানের বাড়ী সংলগ্ন মাঠে এই শিবলিঙ্গ রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ইহা ছয় সাত ফিট উঁচু হইবে। শিবলিঙ্গের নীচের বেড় প্রায় ১২।১৩ ফুট হইবে, এই শিবলিঙ্গের সর্ব্বত্র সিন্দুর ও চন্দনের ফোঁটা রহিয়াছে দেখিলাম। নিকটেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু ফুল রহিয়াছে, ইহার চারিদিকে মোরগ কি খুঁটিয়া খাইতেছে। মনে হইল, পুজার অবশিষ্ট কোন দ্রব্য ইহারা পাইয়াছে। আমরা সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র গ্রামবাসীরা সকলে আসিয়া আমাদের পাশে দাঁড়াইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বিগ্রহের কে পুজা করে? গ্রামে তো একটিও হিন্দু নাই। তাহারা উত্তরে বলিল, ইহার পুজা আমরাই করিয়া থাকি। ইহার পর একটি বৃদ্ধ এই বিগ্রহের ইতিহাস বলিতে লাগিল :

বহুকাল পুর্ব্বে এই শিবের স্থান প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে একটি পাহাড়ের উপর ছিল। সেখানে একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল, তখন আমাদের পুর্ব্বপুরুষরা এই বিগ্রহের পুজা করিতেন। অনেকদিন পুর্ব্বে একদল পাঠান আসিয়া মন্দিরের যাবতীয় ধন-রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া মন্দিরটি ধূলিসাৎ করে। তাহার পর এই বিগ্রহ ভাঙ্গিবার বহু চেষ্টা করে। তাহাদের হাতুড়ির দাগ চারিদিকে রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম কিন্তু বিগ্রহ ভাঙ্গিতে পারে নাই। একটি গরু বধ করিয়া সকলের গায়ে তাহার রক্ত ছিটাইয়া দিয়া বলিয়া গেল, আজ হইতে তোরা মুসলমান হইলি। সেই হইতে কাশ্মীরের অন্যান্য হিন্দুরা আমাদিগকে বর্জ্জন করিল এবং আমাদের পুজাদি ক্রিয়াকর্ম্ম লোপ পাইল। এই শিব

বহুকাল আমাদের খাওয়াইয়া বাঁচাইয়াছিলেন, আমরা উঁহাকে ত্যাগ করিলাম না; আমরা ইঁহাকে অভুক্ত রাখিয়া অন্নগ্রহণ করিতে পারি না। তাই আমরা আমাদের সাধ্যমত ফুল-চন্দন দিয়া প্রণাম করিয়া থাকি! ইঁহার রীতিমত পূজা হইতেছেনা। তাই আমাদের দুঃখ দৈন্য বাড়িয়া যাইতেছে। একবার আমাদের গ্রামের সকলে মিলিয়া কাশ্মীরের তৎকালীন মহারাজ রণবীর সিং-এর নিকট যাইয়া এই বিগ্রহের দুরবস্থার কথা সমস্ত বলিলাম। আমরা চাহিলাম, হয় এই বিগ্রহের পূজা করিবার অধিকার আমাদিগকে দিন অথবা কোন স্থানে লইয়া যাইয়া ইঁহার পূজাদির রীতিমত ব্যবস্থা করুন। মহারাজ ইঁহাকে অন্যত্র লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। ইঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য দুটি হাতি পাঠাইলেন; হাতি বিগ্রহকে সরাইতে পারিল না। ইহার কিছুদিন পর এই বিগ্রহ আমাদিগকে স্বপ্নে বলিলেন—মহারাজা নিজে অথবা রাজপুত্রদের কেহ বিগ্রহ টানিলে বিগ্রহ যাইবেন। আমরা আবার মহারাজ রণবীর সিংকে তাহা বলিলাম। তিনি একটি রাজপুত্রকে আমাদের সঙ্গে দিলেন। এই রাজপুত্র এবং আমরা গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া বিগ্রহকে টানিয়া এই পর্যান্ত লইয়া আসিয়াছি। বিগ্রহ আমাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহিলেন না। সেই হইতে আজ বহুকাল এখানেই আছেন। গত মহারাজা প্রতাপসিংহের নিকট আমরা যাইয়া আবার দরবার করিলাম, এই বিগ্রহের রীতিমত পূজার ব্যবস্থা করিতে অথবা আমাদিগের পূজা করিবার অধিকার চাহিলাম। অনেক অনুরোধে মহারাজা নিজে এখানে আসিলেন। তিনি আমাদিগকে ১০০ শত টাকা দিলেন। আমরা সেই টাকা ফেরৎ দিয়া পূজার অধিকার চাহিলাম। মহারাজ বলিলেন, তিনি শ্রীনগর যাইয়া তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য জানাইবেন। আজ পর্য্যন্ত মহারাজার কোন হুকুম আসে নাই। তাই এই মহাবিগ্রহ লইয়া আমরা দূরবস্থায় পড়িয়াছি। আর আমাদের সাধ্যমত ইঁহাকে পূজা ভক্তি করিতেছি।

আমি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী, মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং আরো অনেকের সঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'যাহা এত দিন হয় নাই, আর হইবে না। এই বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন হইলেই পাঞ্জাব হইতে হাজার হাজার মুসলমান আসিয়া কাশ্মীরে অরাজকতা সৃষ্টি করিবে। এই বিষয়ে কোন আলোচনা না করাই ভাল'।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

(পুনরাবৃত্তি)

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।

যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ৮।২০

(সাংখ্যের অব্যক্তা প্রকৃতি ও বেদান্তের অব্যক্ত ব্রহ্ম যে পুরুষোত্তম দর্শনে সমন্বিত, তাহাই দেখাইতেছেন। পরঃ [সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত প্রকৃতির সহিত সমকক্ষত্ব বজায় রাখিয়া যুক্ত, পরকীয়] তু [কিন্তু] তস্মাৎ [পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত হইতে] ভাবঃ [অক্ষরাখ্য ব্রহ্ম সত্তা] অন্যঃ [বিলক্ষণধর্ম্মযুক্ত ; কেননা, অব্যক্ত ব্রহ্মের সঙ্গে নিরবদ্য সংযোগে যুক্ত] অব্যক্তঃ [অব্যক্ত ব্রহ্ম ; অব্যক্ত ব্রহ্ম ও অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে পরস্পর সমকক্ষতাময় উপাধিবিধুর সহজ সম্বন্ধ ; এখানেই ইহার পরত্ব ও অন্যত্ব ; যিনি অপরের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিয়া নিজে স্বতন্ত্র থাকিতে পারেন, তিনি পর) (কাহা হইতে এই অব্যক্ত পর ?) অব্যক্তাৎ [পূর্ব্বোক্ত ভূতগ্রাম-বীজভূত, অবিদ্যালক্ষণ অব্যক্ত হইতে] সনাতনঃ [চিরপুরাতন, চিরনবীন] যঃ [যিনি] সঃ [সেইভাব] সর্ব্বেষু ভূতেষু] নশ্যৎসু [বিনষ্ট হইলেও] ন বিনশ্যতি [বিনষ্ট হন না] (স্থিতি-গতি-সমন্বয় রূপে তিনি সর্ব্বভূত-পরিণামের ভিতর দিয়া জীবনরূপে অনাদি অনন্তকাল চলিয়াছেন, তাঁহার কোনই সীমারেখা আঁকা চলে না ; চঞ্চলতার বুকে অচঞ্চলের এই নিত্যবিলাস সনাতন অব্যক্ত)।

সেই অব্যক্ত হইতে পর যে অব্যক্ত সনাতন সত্তা রহিয়াছে, তাহা এই সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও নষ্ট হন না। ৮।২৫

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৮।২১

অব্যক্তঃ [সেই অব্যক্তই] অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ [অক্ষর শব্দ দ্বারা উক্ত হন] তম্ [সেই অক্ষরসংজ্ঞক অব্যক্তকেই] আহুঃ [শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন] পরমাং গতিং [পরমা গতি বলিয়া] যং [যে ভাবকে] প্রাপ্য [প্রাপ্ত হইয়া] ন নিবর্ত্তন্তে [যাওয়া-আসার ধাঁধায় পুনরাবর্ত্তন করে না] তৎ ধাম [সেই

জ্যোতিঃই] পরমং [পরম] মম [সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পুরুষোত্তম আমির; শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—"ব্রহ্মণঃ হি প্রতিষ্ঠাহম্"—আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম, আত্মা-অনাত্মা সমন্বিত ব্রহ্ম বস্তু। পুরুষোত্তমের জ্যোতিঃই তাঁহার স্বধাম।]

সেই অব্যক্তই অক্ষর বলিয়া উক্ত হন ; তাঁহাকে পরমাগতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাকে লাভ করিয়া যাতায়াতের ধাঁধায় পড়িতে হয় না, সেই অব্যক্ত ব্রহ্মই আমার পরম ধাম। ২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ৮।২২

(তাঁহার প্রাপ্তির উপায় বলা হইতেছে) পুরুষঃ [পুরি শয়নহেতু অথবা পূর্ণত্বহেতু পুরুষ, অব্যক্ত, কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্ম] সঃ [তিনি] পরঃ [পরা অব্যক্তা প্রকৃতির সঙ্গে সম ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে, পরকীয়ভাবেযুক্ত, পরকীয়। পরে শ্রীভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন : দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতাণি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে] তু [কিন্তু] ভক্ত্যা লভ্যঃ [ভক্তি দ্বারা লভ্য] (কিরূপ ভক্তি দ্বারা ?) অনন্যয়া [অনন্যা, কেবলা, পরা ; 'শিবের প্রতি জীবের অদ্বৈততা বোধ হইলে শিবের প্রতি জীবের যে ভক্তি, আমাদের বিবেচনায় তাহাকেই পরা ভক্তি বলা যাইতে পারে'—শ্রীনিত্যগোপাল] যস্য [যে পুরুষের] অন্তঃস্থানি [অন্তর বাহির ব্যবধান রহিত ভাবে ; সমব্যাপ্তিতে অন্তঃস্থিত] ভূতানি [ভূত সমূহ] যেন [যে পুরুষ দ্বারা] সর্ব্ব ইদম্ [এই সব] ততম্ (সমব্যাপ্তিযোগে ব্যাপ্ত)।

হে পার্থ, ভূতসমূহ বাহ্যান্তর-রহিত যাহার অন্তরে স্থিত, যিনি এই সর্ব্বতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেই সব পর পুরুষ অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লভ্য। ৮।২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ৮২৩

(প্রণবে ও ব্রহ্মে, ভক্ত ও ভগবানে ভেদদৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃ যাহারা পর পুরুষের পথ অবলম্বন করেন, তাঁহারা উত্তর মার্গের পথিক হইয়া ব্রহ্মার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম গ্রহণ করেন, আবার অব্যক্তে বিলীন হন, এবং কল্পান্তরে মুক্ত হন ; আর যাহারা ভেদদৃষ্টি ও অভিমান বশতঃ সৎকর্ম্মের অনুশীলন করেন, তাহারা পিতৃধামে গমন করেন। ইহারই সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত বলিতেছেন।—

তত্র ব্রহ্মলোকগতানাং প্রাণিনাং ত্রিবিধা গতিঃ। যে পুণ্যোৎকর্ষেণ গতাঃ তে কল্পান্তরে পুণ্যতারতম্যোনাধিকারিণো ভবন্তি। যে তু হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসনা

বলেন গতাঃ তে ব্রহ্মণা সহমুচ্যন্তে। যে তু ভগবদুপাসকাঃ তে হ স্বেচ্ছয়া ব্রহ্মাণ্ডংভিত্বা বৈষ্ণবং পদং আরোহন্তি। ভাগবতে শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা।)

তু [পক্ষান্তরে যাহারা অনন্যাভক্তি-পথ পরিত্যাগ করিয়া ভেদের পথ কর্তৃত্বাভিমানের পথ বহিয়া চলিতেছেন] যত্র কালে [যে কালে ; যাত্রা পথে প্রকৃতি-ক্ষোভক যে-কালের বুকে, কাল গতির যে যে দিক্‌-ধরিয়া যাত্রা সুরু করিলে। কাল-পুরুষের সমন্বয়মূর্ত্তি সমগ্র পুরুষোত্তম-জীবনের বাহিরে অন্ত-বুদ্ধিময় প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলেন পুরুষোত্তমের যে শক্তি, সেই শক্তিই কাল] অনাবৃত্তিম্‌ [এই লোকে জন্মিবার জন্য ফিরিয়া না আসা] আবৃত্তিং চ এব [এবং মরণের পর ফিরিয়া আসাই] যোগিনঃ [যোগিগণ ও কর্ম্মিগণ] প্রযাতাঃ [মৃত্যু লাভ করিয়া] যান্তি [প্রাপ্ত হয়] তং কালং [ক্ষোভক কালের সেই গতির দিক্‌ নির্ণয়] বক্ষ্যামি (বলিব) হে ভরতর্ষভ।

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, যোগিগণ যে যে কালে মৃত্যু লাভ করিলে পুনরাবৃত্তি হয় না এবং পুনরাবৃত্তি লাভ করে আমি কালের সেই দিক নির্ণয় করিব। ৮।২৩

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্‌।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ৮।২৪

(প্রকৃতি ক্ষোভক কালের দিক্‌ নির্ণয় করিতেছেন) অগ্নিঃ [যাত্রা পথের আরম্ভ হয় অগ্নি হইতে) কেননা প্রথমে অগ্নিতেই মৃতদেহের হোম করা হয়) জ্যোতিঃ [জ্যোতিঃ ; অর্থাৎ ধূমহীন অগ্নি দেবতার পথ, আলোর পথ] অহঃ [দিন দেবতা] শুক্লঃ [ব্যাপকতর আলোময় শুক্লপক্ষ দেবতা] ষণ্মাসাঃ [ব্যাপকতর আলোকের ষণ্মাস দেবতাগণ] উত্তরায়ণম্‌ [উত্তর গতিযুক্ত ব্যাপকতর আলোময় পথ] তত্র [এই আলোর পথ ধরিয়া] প্রযাতাঃ [মৃত ব্যক্তিগণ] গচ্ছন্তি [ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হন ; এ পথে সাক্ষাৎ, সদ্যোমুক্তি হয় না। সমগ্র দৃষ্টিসম্পন্ন অনন্য ভক্ত কিন্তু হন ব্রহ্মভূত। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি।"] ব্রহ্ম [ব্রহ্মবস্তুকে] ব্রহ্মবিদঃ [ব্রহ্মবিৎ] জনাঃ [জনগণ]।

ভেদ-দৃষ্টি ও অভিমান বজায় রাখিয়া সগুণ ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ যথাক্রমে অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্ল, ষণ্মাস ও উত্তরায়ণ পথ ধরিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ৮।২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্‌।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ৮।২৫

ধূমঃ [যাত্রাপথের সুরুতে ধূমযুক্ত অগ্নি পথ ধরিয়া, আঁধারের পথ ধরিয়া যেখানে সবকিছু অস্পষ্ট, আবছায়া] রাত্রিঃ [ব্যাপকতর রাত্রি-দেবতার

অস্পষ্ট পথ] কৃষ্ণঃ [ব্যাপকতর আঁধারময় কৃষ্ণপক্ষ-দেবতার পথ] ষন্মাসাঃ [ব্যাপকতর ষন্মাস-দেবতার অপ্রকাশময় পথ] দক্ষিণায়নম্ [অখণ্ড জীবনী-শক্তির বহিঃপ্রকাশ-নিরোধময় পথ] তত্র [সেই আঁধারের পথে] চান্দ্রমসং [চন্দ্রলোকোদ্ভব] জ্যোতিঃ [একান্ত কর্ম্মের পথে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগের জ্যোতিঃ] যোগী ভোগের [কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত কর্ম্মপর যোগী] প্রাপ্য [লাভ করিয়া (সেই কর্ম্মফল পরে) নিবর্ত্ততে (ফিরিয়া আসে)।

ধূম্র দেবতা, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, ষন্মাসা ও দক্ষিণায়ন-দেবতার পক্ষে ভেদদৃষ্টি ও অভিমান যুক্ত কর্ম্মপর যোগী চন্দ্রলোকের ভোগ অনুভব করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। ৮।২৫

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ৮।২৬

শুক্লকৃষ্ণে [শুক্ল (light) এবং কৃষ্ণ (shade) ; একান্ত আলোই, একান্ত জ্ঞানই শুক্লপক্ষের নির্দ্দেশক চিহ্ন ; একান্ত আঁধারই, একান্ত কর্ম্মই কৃষ্ণপক্ষের নির্দ্দেশক চিহ্ন] গতী [একই সমগ্রের মধ্যে দুইটি পরস্পর-বিপরীত গতিপথ] হি [নিশ্চয়ই] এতে [এই দুইটী] জগতঃ [জগতের অর্থাৎ পুরুষোত্তম জগতের বুক খণ্ডিত করিয়া] শাশ্বতে [নিত্য] মতে [অভিপ্রেত]। [সেই সমগ্রের মধ্যে] একয়া (শুক্ল পথ দ্বারা] যাতি [প্রাপ্ত হয়] অনাবৃত্তিং অন্যয়া [কৃষ্ণপথ দ্বারা] আবর্ত্ততে [ফিরিয়া আসে]।

জগতের বুকে এই শুক্লকৃষ্ণ দ্বিবিধ গতিপথ চিরন্তন বলিয়া অভিপ্রেত, একটী দ্বারা অনাবৃত্তি লাভ করা যায়, অপরটী দ্বারা পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়। ৮।২৬

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ৮।২৭

(শ্রীভগবান্ এই দুইটী পথের সমন্বয়ে নিজ ব্রহ্মপথের—যে পথ বিশ্বের সর্ব্বদিক্ সমন্বয়ে সর্ব্ব অণু-পরমাণুর ভিতর দিয়া বাহিয়া চলিয়াছে—উপদেশ দিতেছেন ; ইহাই কি বিজ্ঞানের 'World-line' ?) এতে সৃতী [পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বমোহ-সমাকীর্ণ এই পথ দুইটী] হে পার্থ জানন্ [অবগত হইয়া ; ইহাদের মধ্যে একান্ত বিরুদ্ধতা থাকিলে কোনও একটীই যে পুরুষোত্তম-প্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়—ইহা যুক্তিযুক্তভাবে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া] যোগী [সত্য বাস্তব পূর্ণ যোগী] ন মুহ্যতি (শুক্ল-কৃষ্ণমার্গের দ্বন্দ্বমোহে আচ্ছন্ন হন না ; কোন একটী কেহ একমাত্র সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকিবার মত মোহগ্রস্ত

হন না) কশ্চন (কোনও, যেহেতু শুক্ল কালগতি বা কৃষ্ণ কালগতির কোনও পথেই সদ্যঃ পুরুষোত্তম-প্রাপ্তি হয় না) তস্মাৎ [সেইহেতু] সর্ব্বেষু কালেষু [শুক্ল কৃষ্ণ কালভেদের মধ্যে আটকাইয়া না গিয়া সর্ব্বকালে] যোগযুক্তঃ [কালগতি ও পুরুষগতির সমন্বয়রূপ পূর্ণযোগের দ্বারা যুক্ত] ভব [হও] হে অর্জ্জুন।

হে পার্থ, কোন যোগীই এই দ্বন্দ্বমোহ-সমাকীর্ণ দুইটী পথের বিষয় অবগত হইয়া দ্বন্দ্বমোহে মুগ্ধ হন না। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্বকালে পূর্ণ পুরুষোত্তমযোগে যুক্ত হও। ৮।২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতিচাদ্যম্ ॥৮।২৮
অক্ষরব্রহ্ম যোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

(সর্ব্বপথ-সমন্বিত এই ব্রজপথে যে সর্ব্বপথের ফল-সমন্বয় রহিয়াছে, তাহাই বলিতেছেন) বেদেষু [সম্যগধীত বেদসমূহে] যজ্ঞেষু [সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাবে সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে] তপঃসু চ এব [এবং সকল প্রকার তপস্যার অনুষ্ঠানে] দানেষু [সকল প্রকারের দান যথাবিধি অনুষ্ঠানের ফলে] যৎ [যে] পুণ্যফলম্ [পুণ্যের ফল] প্রদিষ্টম্ [শাস্ত্র কর্ত্তৃক প্রদিষ্ট হইয়াছে] অত্যেতি [সর্ব্বফল-সমন্বয় মূর্ত্তি পুরুষোত্তম-ফল প্রাপ্তি হেতু বিশেষ বিশেষ ফল সমূহকে অতিক্রম করেন] তৎ সর্ব্বং [সেই সব বিশিষ্ট বিশিষ্ট ফল] ইদং [সর্ব্বপথ সমন্বয় ব্রজপথে বিচরণ ও তাহার ফল] বিদিত্বা [জানিয়া] যোগী [কাল-পুরুষ-সমন্বিত পুরুষোত্তম-যোগী] পরং স্থানং [সর্ব্ব স্থান সমন্বয় রূপ পর স্থান অর্থাৎ ব্রজধাম] উপৈতি চ [এবং প্রাপ্ত হন] আদ্যম্ [আদিতে ভব অর্থাৎ পুরুষোত্তম-শ্রীক্ষেত্র, যাহারই দ্বিধা বিকাশ হইতেছে ঐ ব্রহ্মলোক ও চন্দ্রলোক]।

(শ্রীভগবান্ ভক্ত উদ্ধবের কাছে বলিতেছেন, যৎ কর্ম্মভিঃ যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তঃ লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি ॥)।

সমুদয় বেদ পাঠ, সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান, সর্ব্ব তপস্যার অনুষ্ঠান ও যথাবিধি দানে যে যে পুণ্যফল শাস্ত্রে প্রদিষ্ট হইয়াছে, এই পূর্ব্বোক্ত ব্রজপথের বিষয় জানিয়া যোগী বিশেষ বিশেষ ফলপ্রসূ সেই সমুদয়ই অতিক্রম করেন এবং আদ্য পর স্থান প্রাপ্ত হন। ৮।২৮

অষ্টম অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সন্ধানী

শোভাদেবী

চারিদিকে ঘন অন্ধকার
কোথায় দেবতা তব মন্দির তোমার,
রক্তের সাগর হয়ে পার
পাব কিগো তোমার দুয়ার ?

হিংসায় সর্পিল কাঁটা ভরা
ক্লেদেতে পিচ্ছিল পথখানি
সন্দেহের শত ঘূর্ণিপাকে
পাহারায় শতেক নাগিণী,

শতভয় হাজার সংশয়
এরা আজ ভিড় করে
অন্ধসম সারি সারি পথে
চলিব কি মতে—
তুমি যদি হয়ে ধ্রুবতারা
আমার অন্তর মাঝে
উজলিয়া ওঠো
তুমি যদি আঁখি তারকায়
অন্তরের উৎস হয়ে ছোটো
হে করুণাময়
যদি মোরে দাও হে অভয়
তবে মোর সুনিশ্চিত জয়॥

———

অস্পৃশ্যতা

রেণুমিত্র

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আছে :—'অস্পৃশ্যতা নামক মানবতাবিরোধী এবং সামাজিক ঐক্য ও শান্তির হানিকর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু এই কুসংস্কার উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রচার কার্যের উপর খুব বেশী নির্ভর করার কোন অর্থ হয় না। ভোপালের এক সংবাদে দেখিতেছি, ভোপাল রাজ্য সরকার অস্পৃশ্যতাবিরোধী প্রচারকার্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক পরিকল্পনা দাখিল করিয়া দুই লক্ষ টাকা চাহিয়াছেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হাটে বাজারে ও মেলায় ছবি ও পুস্তকাদির সাহায্যে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য করা হইবে। এই ধরণের প্রচার-পদ্ধতি নিতান্তই খেলো ব্যাপার এবং কোটি কোটি টাকার ছবি ও পুস্তক ছাপিয়া প্রচার কার্য করিলে অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হইবে না। বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে ভারতের কোন্ মনীষী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রকাশ না করিয়াছেন? প্রচারকার্যই বা কি কম হইয়াছে? সংবিধানের মৌলিক নীতিতে এবং আইনেও অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও দেওঘরের বৈদ্যনাথের মন্দিরদ্বারে হরিজনের মন্দির প্রবেশের সমর্থক আচার্য বিনোবাকে আক্রান্ত হইতে হয় এবং এখনো ভারতে বহু রাজ্যের অনেক অঞ্চলে বিদ্যালয়ের এবং জলকূপের সান্নিধ্যে আসিলে হরিজনদিগকে নিগৃহীত হইতে হয়। অনগ্রসর শ্রেণী সমূহের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য নিযুক্ত কমিশনার শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত কর্তৃক প্রদত্ত দুই বৎসরের রিপোর্টই সাক্ষ্য দিতেছে যে, ভারতের বহু অঞ্চলের সামাজিক জীবনে অস্পৃশ্যতা এখনও বেশ সচল রহিয়াছে। কঠোর ব্যবস্থার দ্বারাই এই কঠোর পাপ উচ্ছেদ করিতে হইবে, মৃদু পন্থায় কিছু হইবে না।'

সত্যই মৃদু পন্থায় কিছু হওয়ার নয়—কঠোর ব্যবস্থার দরকার। কিন্তু সে কঠোর ব্যবস্থাটা কি? ইহা শুধু প্রচারের কাজ নয়, তাও-ও সত্যি—কিন্তু মানুষ অস্পৃশ্যতা বর্জন করবে কেন, সে সম্বন্ধে কিছু তো একটা প্রচার করতেই হবে। অস্পৃশ্যতার জন্ম হয়েছিল আমাদের সমাজে কেমন করে?

কোন্ দৃঢ় ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত বলে এত দিনের এত ধাক্কাধাক্কিতে আজও সে সমাজের গোড়ায় টিঁকে আছে ভাল করেই? শুধু কি বিগত এক শতাব্দী থেকেই এর বিরুদ্ধে প্রচার কার্য আরম্ভ হয়েছে? বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার এই উচ্চনীচ ভেদবাদের বিরুদ্ধে সহস্রাধিক বৎসর আগে সেই ভগবান বুদ্ধ থেকে একে অস্বীকার করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতিকে তিনি যখন আশ্রয় দিয়েছিলেন, তখন প্রতিবাদের প্লাবন উঠেছিল। নাপিত, গোয়ালা, পুকস, ক্ষেত্রপাল এবং সর্বোপরি নটী—সমাজের মধ্যে যারা-চির-দিন অনাদৃত, অবজ্ঞাত জীবন যাপন করে এসেছে, অথচ যারাই সমাজের মেরুদণ্ড, পিলসুজের মত জাতির প্রদীপকে যারা চিরদিন বহন করে আসছে, বুদ্ধের সেই ব্যাপকতর ধর্মের মর্ত্যে গঙ্গাবতরণে সেই তারা সব প্রাণ পেল, মান পেল, সজীব হল। কিন্তু সনাতন ধর্মের রুদ্র কঠিন আঘাত বন্ধ হল না। এদেশে মুসলমানের আগমনের পরও যখন সমাজের উপর আঘাত এসে পড়তে লাগল, তখনও নানক কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষেরা সমাজদেহে সেটাকে অঙ্গীভূত করে নেবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা করে গেছেন। তারও পরে মহাপ্রভু আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করে মুচী হাড়ী ডোমের ঘরেও তুলসী মঞ্চকে প্রবেশের অধিকার দিয়ে গেছেন। এর পরে পাশ্চাত্যের প্রবল আঘাত—মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখবার নূতন খবর আর সেই সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষায় সকলের প্রবেশাধিকার। ভারতীয়ত্বের সঙ্গে নবাগত চিন্তাধারার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রচেষ্টাও সেদিন কম হয় নি। তারপরে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের আন্দোলন। তবু আজও বিনোবাকে মার খেতে হয়। এবং আজও এ অস্পৃশ্যতা যে কেবল মন্দিরেই বা বিদ্যালয় বা জলকূপের চারিপাশেই সীমাবদ্ধ আছে, তা নয়, আমাদের মনের আনাচে কানাচে এই ছোঁয়াছুঁয়ির বোধ এমন শক্ত করে বাসা বেঁধে আছে যে, আমরা তা বুঝতেও পারি না। প্রয়োজন হলে সবই করতে হয় বা প্রবাসে নিয়মঃ নাস্তি ইত্যাদি সূত্রদ্বারা যে ব্যাপকতার আচরণ—সে রকম আচরণ দ্বারা সত্যিকরে অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হয় না। সহরে এসে কিংবা চাকুরী বা কর্মব্যপদেশে যারা আজ সকলের সঙ্গেই বসে খাচ্ছেন, তাঁরা বাড়ী গিয়ে পুজোতে বসবার আগে বাইরেতে যে অশুচি কাজ করে এসেছেন, সেজন্যে গঙ্গাস্নান করতে ভুলে যান না কখনও। এই মনোবৃত্তিই তো অস্পৃশ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখছে। পুজোর জল আনতে গিয়ে ভুঁইমালী যদি আমায় ছুঁয়ে দেয়, তবে সে জল কি

আমরা আজও ফেলে দেই না? এই ফেলে দেওয়া কোন্ মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়?—আমার ঠাকুর পূজায় ভুঁইমালীর স্থান নেই। আমার ঠাকুর পূজাতে যদি না থাকে, পুরীর মন্দিরে বা বৈদ্যনাথের মন্দিরে থাকবে কেমন করে? আমার রান্নাঘরের দুয়ার, আমার ঠাকুর ঘরের দুয়ার হরিজনের কাছে খুলে দিতে ঘরে ঘরে তো আর পুলিশ পাহারা রাখা চলে না! বৈদ্যনাথের মন্দিরে এ্যাসেম্বলীর আইন চলতে পারে, কিন্তু মানুষের রান্নাঘরের শত শত দুয়ার খুলবে কে? যে জমাদার আমার পায়খানা পরিষ্কার করে দেয় বলে আমার জীবনধারণ সহজ ও সম্ভব হয়, সে যদি স্নানাদি সেরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েও আসে, তাকে কি আমার রান্নাঘরে আমি ঢুকতে দেব? তা দেবার মত মনোবৃত্তি আজও সৃষ্টি হয় নি। কেউ বলবেন, হ্যাঁ, এমন কত ঘটনাই ঘটছে, আজকাল অনেকেই দিচ্ছে। তারও পরে কথা আছে। যদি স্বীকার করেও নেই যে ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই আজ তা পারছে, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় আমাদের সামাজিক ক্রিয়াকর্মে আমরা কি তা প্রচলন করতে পেরেছি? আমার পিতামাতার শ্রাদ্ধে বা আমার ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশনে বা বিয়েতে আমরা কি বিভিন্ন বর্ণের সবাইকে একত্র বসিয়ে গ্রামের বাড়ীতে আহার করাতে পারব? আজও পারছি না—এ সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া ভাল। বর্ণ বৈষম্যের যে ভেদব্যবস্থা এই অস্পৃশ্যতা প্রবর্তন করেছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের উচ্চনীচ মনোবৃত্তিকে সে কি রকম পাকা-পোক্ত করে ফেলেছে, অত্যন্ত ছোট্ট একটা দৃষ্টান্তের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

কলকাতার ফ্ল্যাটের বাড়ী—এক বাড়ীর নিঃশ্বাস আর এক বাড়ী থেকে শোনা যায়, কথাবার্তার তো কথাই নেই। বাড়ীর গিন্নি বলছেন—'হুঁ! আজকালকার দিনে কেউ আবার ব্রাহ্মণ আছে না কি? বাটার দোকানে কত মুখার্জী ব্যানার্জী কাজ করে—যে লোক আসে তার পায়েই হাত দিয়ে জুতো পরিয়ে দেয়—তার কি আর ব্রাহ্মণত্ব কিছু আছে?' পুরুষের গলায় কেউ জবাব দিলে—'টাকার দরকার, যে করেই হোক'। গিন্নী বেশ জোর দিয়েই বললেন, 'টাকা না থাকে, বনে চলে যাক, তাই বলে এমন করে ব্রাহ্মণত্বের অপমান!' এবারে বাড়ীর কর্তা বললেন, 'আজকালকার দিনে ওসব আর চলবে না।' অনেক কথার মধ্যে কর্তা বোঝাতে চেষ্টা করলেন ব্রাহ্মণ বলেই পূজ্য হবে এমন কথা নেই। কত নীচজাতীয় মানুষও আজ মানুষের মত মানুষ হয়ে কত শত মানুষের পূজা পাচ্ছে ইত্যাদি। গৃহিণী

কতটুকু বুঝলেন জানি না—কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের কৌলীন্যবোধ আজও কত তীব্র তার পরিচয় পাওয়া গেল। আগেই বলেছি, সুবিধার জন্য যে ব্যাপকতার আচরণ, তার মূল্য কিছু নেই—তাতে অস্পৃশ্যতা দূর হয় না। আর অনেকগুলি ঘটনা ঘটলে তাতেও সামাজিকভাবে অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হয় না।

এই অস্পৃশ্যতা যে হিন্দুসমাজকে কোন্ অতলে কেমন করে নিয়ে গেছে, আমরা তার খোঁজও রাখি না। পাকিস্থান হয়েছে বলে রাজনীতিকে আমরা এর জন্য দায়ী করে আসছি, অথচ এ যে আমাদের প্রচলিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সহজ ও স্বাভাবিক করোলারী—এ কথা আজও আমরা কয়জন বুঝি? অথচ 'গোরা' উপন্যাস লিখতে বসে প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যৎ বাণী করে রেখেছিলেন, তার মধ্যে রাজনীতি ছিল না। দেখবার মত চোখ রবীন্দ্রনাথের ছিল—সমাজ-ব্যবস্থা যে কেমন করে পাকিস্থানকে সৃষ্টি করে তুলছে দীর্ঘকাল ধরে তিলে তিলে, তা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি 'গোরাতে' লিখেছেন, '...সমাজের ক্ষয় বুঝতে সময় লাগে। ইতিপূর্বে হিন্দু-সমাজের খিড়কির দরজা খোলা ছিল। তখন এদেশের অনার্য জাতি হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে একটা গৌরব বোধ করত। এদিকে মুসলমানের আমলে দেশের প্রায় সর্বত্রই হিন্দু রাজা ও জমিদারের প্রভাব যথেষ্ট ছিল; এইজন্যে সমাজ থেকে কারও সহজে বেরিয়ে যাবার বিরুদ্ধে শাসন ও বাধার সীমা ছিল না। এখন ইংরেজ অধিকারে সকলকেই আইনের দ্বারা রক্ষা করছে, সে রকম কৃত্রিম উপায়ে সমাজের দ্বার আগলে থাকবার জো এখন আর তেমন নেই—সেইজন্য কিছুকাল থেকে কেবলই দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে—এ রকমভাবে চললে ক্রমে এদেশ মুসলমানপ্রধান হয়ে উঠবে—তখন একে হিন্দুস্থান বলাই অন্যায় হবে।' ...'রক্ষা পাবার জন্য একটা জাগতিক নিয়ম আছে—সেই স্বভাবের নিয়মকে যে পরিত্যাগ করে, সকলেই তাকে স্বভাবতঃই পরিত্যাগ করে। হিন্দুসমাজ মানুষকে অপমান করে বর্জন করে; এইজন্যে এখনকার দিনে আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠছে। কেন না, এখন তো আর সে আড়ালে বসে থাকতে পারবে না—এখন পৃথিবীর চারদিকের রাস্তা খুলে গেছে, চারদিক থেকে মানুষ তার উপরে এসে পড়ছে—এখন শাস্ত্র সংহিতা দিয়ে বাঁধ বেঁধে, প্রাচীর তুলে সে আপনাকে সকলের সংস্রব থেকে কোনমতে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হিন্দুসমাজ এখনো যদি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার শক্তি না

জাগায়, ক্ষয় রোগকেই প্রশ্রয় দেয়, তাহলে বাহিরের মানুষের এই অবাধ সংস্রব তার পক্ষে একটা সাংঘাতিক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।'

তাই এখনও ভাববার সময় আছে যে, পাকিস্থান সৃষ্টি রাজনীতির একমাত্র ফল নয়। সমাজ থেকে বেরিয়ে যাবার খোলা মুখকে বন্ধ করা নয় কেবল, সমাজের মধ্যে সহজভাবে ও সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করবার মত উদারতা যত দিন না হবে—ততদিন পাকিস্থান হওয়াকে ঠেকাবে কেমন করে? আরও পাকিস্থান বন্ধ করতে হলে সমাজ থেকে মানুষের বেরিয়ে যাওয়াকে বন্ধ করতে হবে—অর্থাৎ অস্পৃশ্যতাকে মূল থেকে দূর করতে হবে।

অস্পৃশ্যতা একটা মনোবৃত্তি—এর পেছনে আছে একটা চিন্তাধারা। সে মনোবৃত্তিটি দীর্ঘদিন হল জাতির রক্তের মধ্যে আছে। বর্ণবিভাগ করতে গিয়ে আমরা উচ্চ নীচ ভেদবিভাগ করে বসে আছি এবং সেটাকে খুব শক্ত করে বিশ্বাস করেও আসছি। ব্রাহ্মণ বড় আর শূদ্র ছোট—এ বিকৃতি শাস্ত্রের মধ্য দিয়েই ঘটেছে। ব্রাহ্মণ বড়, কেননা সাত্ত্বিকতা গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—আর ব্রাহ্মণ সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন। সত্ত্ব গুণ থেকে এক ধাপ নীচে রজোগুণ—ক্ষত্রিয় রজোগুণী, সেই জন্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ থেকে এক ধাপ নীচে। বৈশ্য রজঃপ্রধান ও শূদ্র তমঃপ্রধান। তারা আরও এক ধাপ করে নীচে পড়ে আছে।—এ ব্যবস্থাটাকেই আজ বাতিল করে দিতে হবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের বড়-ছোটর এই ভেদব্যবস্থাকে আমরা কিছুতেই বিলোপ করে দিতে পারব না, যদি না গুণের ক্ষেত্রের বড়-ছোটর কৌলীন্যকে আগে আমরা দূর করে নেই। এ ব্যবস্থা মৃতের সমাজের, জীবন্ত মানুষের সমাজের নয়। কোন গুণই একান্তভাবে চিরদিন ধরে বড় ও পূজ্য, আর কোন গুণ সর্ব দেশকালপাত্রেই ছোট বা হেয়—অস্পৃশ্যতার পেছনের এই তত্ত্বটাকেই উলটে দিতে হবে। আজকের দিনে এ-কথাটা মেনে নিতেই হবে যে, সর্ব দেশকালপাত্রে কোন কিছুই একান্তভাবে সত্য নয়। কোন কিছুই মার্কা-মারা সাত্ত্বিক রাজস বা তামস নয়। কিন্তু এইটেই আমরা করে বসে আছি। আমরা মুখস্থ করেছি দুধ সাত্ত্বিক আহার—অথচ এ বিচার করতে ভুলে গেছি যে, পেটের রোগের পক্ষে দুধ সাত্ত্বিক আহার নয়। এমনি কত জিনিষকে আমরা অপ্রয়োজনীয় নোংরা বলে ফেলে দিয়েছিলাম, আজ দেখা যাচ্ছে সেগুলিকে রকমফের করে বহু কাজে লাগানো যেতে পারে। মার্কা দিয়ে কোন কিছুকে চিরদিনের জন্য এক রকমের রূপ দিয়ে দেওয়া যায় না। জপ ধ্যান স্বাধ্যায় ইত্যাদি সাত্ত্বিকতা এবং তা সব সময়ে সকল ক্ষেত্রে সকলের পক্ষেই বড়—এই চিন্তাধারাই সকল অনিষ্টের মূল। জীবনটা একটা সমগ্র জীবন্ত জিনিষ—তার মধ্যে সাত্ত্বিকতার স্থান যতখানি, রজোগুণের স্থান ততখানি, তমোগুণের স্থানও ঠিক ততখানিই। এরা একে অপরকে দাবিয়ে যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠা খোঁজে—সেটা সুস্থ জীবন

নয়। তিনটি গুণ মিলে মিশে প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্থান মর্যাদা ও মূল্য দিয়ে চলে যখন, তখনই জীবন সুস্থ সার্থক ও সমগ্র! উচ্চ নীচ বড় ছোটর কোন স্থান এ বিশ্বে নেই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্থানে অনন্য ও অপরিহার্য এবং জীবনের উচ্চতম অবস্থা বা ব্রহ্মের সঙ্গে প্রতি গুণের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তমো গুণ থেকে রজো গুণে যেতে হবে, রাজগুণ থেকে সত্ত্বগুণে, এবং সত্ত্বগুণী হলেই মানুষের মুক্তির সম্ভাবনা—জীবনতত্ত্বের কাছে এ সিঁড়িতান্ত্রিক ব্যবস্থা অচল।

নিজের বিচ্ছিন্ন বিকৃত অহংকে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে মানুষ যে-কোন কাজ করে, তাই-ই শ্রীকৃষ্ণের সেবা, তাই-ই তিনি গ্রহণ করেন, তাই-ই মুক্তি এনে দিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন নি যে, তাঁকে সাত্ত্বিক কর্ম দিতে হবে, রাজস বা তামস কর্ম নয়। প্রয়োজন মানুষের অহংকারের বিচ্ছিন্নতাকে বিনষ্ট করা—কোন কর্ম বা গুণকেই উচ্চ নীচ বা ভালমন্দের মার্কা মেরে দেওয়া নয়। গুণের ক্ষেত্রে এই কৌলীন্য ব্যবস্থা ছিল বলেই গুণের অধিকারীর মধ্যে কৌলীন্য বা উচ্চনীচ-ভেদবিভাগ সহজভাবেই কায়েম হয়েছে: চিন্তাধারার এই গোড়াতে পরিবর্তন আনতে পারলেই অস্পৃশ্যতা বিদূরিত হবার সম্ভাবনা। প্রতি গুণ ও বর্ণকে আজ সম মূল্যে প্রস্থাপন করে ব্রহ্ম বা শ্রেষ্ঠ অবস্থার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধকে স্বীকার করে নিতে হবে। মুচী জুতো সেলাই করেও ব্রহ্ম লাভ করতে পারে যদি সে কাজ সে বিশ্বকল্যাণ বুদ্ধিতে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা বুদ্ধিতে করে। আর ব্রাহ্মণ তার জপতপ স্বাধ্যায় দিয়েও ব্রহ্ম পায় না যখন সেটা সেবা বুদ্ধিতে কৃত নয়। কোন কর্ম বা অবস্থাই সকল সময়ে সকল দেশে সকলের পক্ষে একমাত্র নয়। এ চিন্তাধারাটা সমাজ দেহে প্রবেশ করলে কারোরই একচেটিয়া অধিকার বা অনধিকার থাকে না। মানুষের মুক্তি সেইখানে।

তাই কোন গুণই বিশেষ ভাবে কুলীন নয়। জীবিত মানুষের পক্ষে প্রতিটিরই সমান মূল্য ও স্থান রয়েছে—এ কথাটা প্রচার করতে হবে। অস্পৃশ্যতা মানবতাবিরোধী অতএব সর্ব্বথা পরিত্যজ্য—এ কথা বলে অস্পৃশ্যতা দূর করবার কোন সম্ভাবনা নেই। শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখেছি তমোগুণের কাজ যে করে, সত্ত্বগুণীর কাছে সে পরিত্যজ্য—কেমন করে তাকে মানুষ হিসেবে দেখতে পারব? তমোগুণ পরিত্যজ্য নয়—এ জানাকে ছড়িয়ে দিতে পারলেই আইনকে পালন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে। আইনের কিছু প্রয়োজন অপরিহার্য ভাবে সত্য, কিন্তু যেখানে আইন পৌঁছায় না, সেই চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করতে হবে নূতন জ্ঞান দিয়ে। নূতন জ্ঞানের এই চিন্তাধারা দর্শন সাহিত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মনুষ্যসমাজের কাছে উপস্থিত করার প্রয়োজন আজ খুব বেশী।

সাময়িকী

কলিকাতার দুর্গোৎসব : যে মহাশক্তিকে একদিন 'brute nature' মনে করিয়া তাহার ভয়ে মানুষ কাঁপিত, যাহার কাছে মাথা নোয়াইয়া তাহার মার খাওয়া ছাড়া মানুষের পক্ষে আর কিছু করণীয় ছিল না, সেই মহাশক্তিকে বাঙ্গালী করুণাময়ী মাতৃরূপে নিজ সাধনায় পাইয়াছে এবং পরবর্তী কালের সাধক বাঙ্গালী আরও গভীর ভাবে, ঘনতম ভাবে, সেই মা'কে নিজ দেহ-প্রাণমন নিংড়াইয়া কন্যারূপে পাইয়াছে, রামপ্রসাদ তাঁহাকে দিয়া 'বেড়ার বাঁধ' দেওয়াইয়াছেন। যে মহাশক্তি ছিলেন, মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে, বাঙ্গালী তাহাকে ধরিয়াছে, ছুঁইয়াছে, 'উমা যতই কাঁদে বলি সর সর, আমি অভাগিনী ততই বলি সর্ সর্, শেষে সর্ সর্ বলি ঠেলিলাম ফেলি।' বলিয়া কত রকম করিয়াই না কন্যারূপিনী মহাশক্তিকে আদর করিয়াছে, সোহাগ করিয়াছে! বাঙ্গালীর শ্রীদুর্গা স্বপ্নে দেখা দিয়া মা মেনকাকে বলিলেন, 'মা, আমাকে তোমার ওখানে নিয়া যাও।' মেনকা কাঁদিয়া হিমালয়কে বলিলেন, 'ওগো গিরিরাজ, উমা আসিতে চাহিয়াছে আমার এখানে। তুমি তাহাকে আমার কোলে আনিয়া দেও।' বাঙ্গালীর মেয়ে উমা তাই আজ বাঙ্গালী বাবা-মায়ের কোলে আসিয়াছেন। বাঙ্গালী মা-বাবা উমাকে তাই ষোড়শোপচারে আদর করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই কন্যা-মহাশক্তিকে আদরে সোহাগে ভরিয়া দিবার জন্য, তিন দিন ব্যাপিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি ভেদের সাধনা করিয়া বাবা-মা হইবার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য বসিয়াছে। কন্যা উমাই সপ্তমীর দিনে মধুকৈটভ নাশিনী মহাকালী, অষ্টমীর দিনে মহিষাসুরমর্দ্দিনী মহালক্ষ্মী, আবার নবমীর দিনে তিনিই শুম্ভনিশুম্ভ বধ-বিধায়িনী মহাসরস্বতী। এই মহাশক্তিকে কন্যা-রূপে সৃষ্টি করিবার এবং তাঁহাকে সৃষ্টি করিবার সঙ্গে বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার প্রাক্কালে মধুকৈটভরূপী অতীতের সু ও কুসংস্কার স্রষ্টার (ব্রহ্মার) নবীন সৃষ্টির পথে বাধা জন্মায়। বিপ্লবময়ী মহাকালী তাঁহার বিপ্লবময় জীবনের আঘাতে অতীত সুসংস্কার ও কুসংস্কার চূর্ণ করিয়া নবীন সৃষ্টির উপযোগী দিব্য সহজ জীবন প্রদান করেন। অষ্টমীর দিনে মহালক্ষ্মীরূপে সেই উমাই বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ করিয়া কেবল সহজ জীবন

গুলিকে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করিবার উপযোগী সঙ্ঘরূপে গড়িয়া তোলেন। এই মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তিই বাঙ্গালীর পুজা মণ্ডপে পুজিতা হন। ইনি সমষ্টিরূপিণী 'সর্ব্বদেবশরীরজা'—সকল দেবশক্তি মন্থন করিয়াই ইহার জন্ম। নবমীর দিনে পুজিতা মহা-সরস্বতী রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া সঙ্ঘের চালকের সঙ্ঘকে নিজ-ভোগে লাগাইবার অহঙ্কারকে মুছিয়া ফেলেন, যাহার ফলে সঙ্ঘনেতা হন সঙ্ঘসেবক। তাহার পরই পাই আমরা উমার বিজয়ারূপের সাক্ষাৎকার। চারিদিন ধরিয়া বাঙ্গালী এই সাধনা গ্রহণ করিয়াছিল বিশ্ব-শক্তিকে, বিশ্বমানবকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্য লইয়া, ইহারই ফলে এই বিশ্ব 'এক বিশ্বে' গড়িয়া উঠিবার পথ পাইবে।

এই দুর্গা বাঙ্গালীর কাছে শুধুই অধ্যাত্মক্ষেত্রের শক্তি নন। ইনি বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত জীবনের—পিতৃত্ব-মাতৃত্বের আশা-আকাঙ্ক্ষার চরম পরি-ণতি। ইনি সমাজের সংগঠন-শক্তি, বিশ্বাত্মিকা। ইনি 'সর্ব্বভূতেষু চেতনা ইতি অভিধীয়তে'। ইনিই 'সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেন সংস্থিতা'—সর্ব্বভূতেষু পুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা'—'সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা'। বাঙ্গালী যদি ইহাকে ধরিয়া থাকিতে পারিত, তবে সর্ব্বজাতি সমন্বয় করিতে পারিত, বিশ্বব্যাপিনী ক্ষুধার অন্ন যোগাইতে পারিত, বিশ্বপুষ্টি আনয়ন করিতে পারিত, বিশ্বচেতনার সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করিয়া সর্ব্বসচেতন, বিশ্বনাগরিক হইতে পারিত। বাঙ্গলার দুর্গোৎসবের মধ্যে বেদ-পুরাণ-তন্ত্রের, কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তি-মার্গের, সর্ব্বাশ্রমের, সর্ব্ববর্ণের, সমাজের সর্ব্বস্তরের—নর-নারী, শিশু-যুবক-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র, সাধক-সিদ্ধ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শূদ্রের সম্মিলিত হইবার সুযোগ রহিয়াছে। এত বড় উৎসব দ্বিতীয়টী নাই। প্রত্যেকেই যে যাহার বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা লইয়া এই উৎসবে যোগদান করিবার অধিকারী। শ্রীদুর্গা যে আমার অন্নদা, মোক্ষদা, তাঁহার শ্রীচরণতলে 'অন্ন' ও মোক্ষ সমন্বিত। তাই ইহা সত্যই আনন্দময়ীর পুজা। দুর্গোৎসব একাধারে উৎসব, অধ্যাত্মসাধনা ও সামাজিক মিলনের প্রেরণা জাগাইয়া তোলে। তাই ইহা সার্ব্বজনীন, সর্ব্বা-ঙ্গীন, সার্ব্বভৌমিক।

কিন্তু কলিকাতার দুর্গাপুজা আজ কোন্ পথে? ইহার মধ্যে মূল উপাসনার গন্ধ অতি অল্পই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কেহ কি এই দিকে প্রচেষ্টাও করেণ বুঝাইবার জন্য চণ্ডীর ভিতর কি মহারহস্য নিহিত রহিয়াছে? 'সার্ব্বজনীন' বলিয়া আখ্যাত পুজাগুলি যদি সত্যই সার্ব্বজনীন হইত, তবে একই

পাড়ায় ৫।৭টী পূজা মণ্ডপ রচিত হইত কি? এক ফার্লং এর মধ্যে যেখানে ৫।৭টী পূজা, সেখানে পারস্পরিক মিলন বলিয়া কিছু আছে কি? মা আসিয়াছেন, আজ ভাই ভাই মিলিতে হইবে—এই প্রয়োজন বোধটুকুও কি একই পাড়ার মানুষদের মধ্যে জাগ্রত হইতেছে, সমগ্র কলিকাতার কথা বরং ছাড়িয়াই দিলাম? ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা কি প্রমাণ করে না যে, এক ভাইয়ের লক্ষ্মী অপর ঘরের লক্ষ্মী নহে. এ কি লক্ষ্মী পূজা না অলক্ষ্মীর পূজা? পাড়ায় পাড়ায় দুর্গাপূজা, একই পাড়ায় ৫।৭।১০টী দুর্গাপূজা পূজার প্রহসন ছাড়া আর কিছুই না। পূজার পূর্ব্বে আগমনী গান শুনিয়া কয়জনের হৃদয় 'মা আসিতেছেন' বলিয়া নাচিয়া উঠিতেছে? আবার বিসর্জ্জনের সময়েই বা কয়জনের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হয়? মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা, যেদিন বিসর্জ্জনের সময় কি আকুল ভাবেই না কাঁদিতাম? দশমীর আগের দিন 'মা যেন কাঁদিতেছেন' কল্পনা করিয়া আমরাও বেদনাতুর হইতাম। যন্ত্রযুগে আজ সবই যান্ত্রিক। মায়ের আসা-যাওয়া যাহাদের জীবনে কোনও আলোড়ন জাগায় না, তাহারা পূজা মণ্ডপে অনায়াসেই উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিচরণ করিতে পারে। পূজার সময়ে যে ভাবে মায়ের চতুর্দ্দিকে বিজলী বাতি, মাইক, মণ্ডপ-নির্ম্মাতাদের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ছড়ানো থাকে, তাহাতে মায়ের পূজা অতি নগন্য ব্যাপার হইয়াই দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার আবহাওয়ার মধ্যে এমন একটা হিংসাপ্রবণতার বিষ প্রবেশ করিয়াছে, যাহা দুভিক্ষ-প্রতিরোধ, পূজা বোনাস আদায় হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসবের মধ্যে পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে। জনসাধারণকে এ জন্য অবহিত এখন হইতেই হইতে হইবে। আনন্দবাজার পত্রিকা ৪ঠা কার্ত্তিক বুধবার তাহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন: 'সহরের দুর্গাপূজা এবার মোটামুটি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলেও দুইটী ঘটনা আমাদিগকে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন করিয়াছে। ঘটনা দুইটি বিচ্ছিন্ন হইলেও মূলত: একই প্রকৃতির—পূজার উৎসবের মধ্যে বোমার আবির্ভাব এবং এমন বোমার আবির্ভাব যাহাতে মানুষ মরে। যে উৎসবে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিরুদ্বেগে যোগ দেয়, এমন কি অন্তঃপুরিকাগণ পর্য্যন্ত দলে দলে পথে বাহির হইয়া পড়েন এবং যাহাতে সহস্র সহস্র লোকের অল্প স্থানের মধ্যে সমাবেশ ঘটে, তাহাতে যদি মারাত্মক বোমা ছোড়াছুড়ির ব্যাপার চলিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক ব্যক্তির এবং প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে ইহা নিদারুণ ত্রাসের বিষয় হইয়া

দাঁড়ায়।...কিন্তু এবারকার পূজায় বিডন স্কোয়ারের নিকট শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য সমবেত জনতার মধ্যে নিতাই নামে একটি বালক যে ভাবে বোমায় নিহত হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক অভিভাবককে উদ্বিগ্ন না করিয়া পারিবে না। বোমার ব্যবহারের দ্বিতীয় ঘটনা গৌরীবাটির পূজা মণ্ডপ। সেখানে দুই দলের সংঘর্ষে ব্যবহৃত বোমার সংখ্যাও যথেষ্ট।' উক্ত পত্রিকার ৩রা কার্ত্তিকের সংবাদে প্রকাশ, 'গৌরী বেড়িয়ার সার্ব্বজনীন দুর্গাপ্রতিমা রবিবার নিরঞ্জন না করিয়া সোমবার নিরঞ্জন করার সিদ্ধান্ত হয়। এ জন্য সেদিন সায়ংকালে উক্ত পূজা-মণ্ডপে প্রতিমার সম্মুখে আরতি আরম্ভ হয়। বহু নরনারী আরতি দেখিবার জন্য পূজা মণ্ডপে সমবেত হয়। রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় অকস্মাৎ পূজামণ্ডপের অদূরে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শ্রুত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আরতি-দর্শনার্থী নরনারী ও বালকদের মধ্যে ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হয়—এবং ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া সকলে নিরাপদ স্থানে যাইবার জন্য ঠেলাঠেলি আরম্ভ করে। ফলে ভিড়ের চাপে কেহ কেহ আহত হয়। ইতি মধ্যে অদূরে পর পর আরও অনেকগুলি বোমা ও পটকা বিস্ফোরণ হয়।'

'রবিবার প্রতিমা নিরঞ্জন শোভা-যাত্রা পরিচালনা-পথে নিমতলা ঘাটের অদূরে ভিড়ের মধ্যে দুইটী সার্ব্বজনীন প্রতিমার লরী দুইটির কোন্‌টী আগে যাইবে তাহা লইয়া অত্যুৎসাহী সমর্থক দল দুইটীর মধ্যে প্রথমে বচসা সুরু হয়। তারপর তাহা মরিপিটে পরিণত হয়। উহাতে ৫।৭ জন আহত হয়।'

'এইদিন প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রার সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ঘটনা হয় বিডন স্কোয়ারের নিকট। এই ঘটনার একটি প্রতিমার অনুগামী একদল উৎকট উল্লাসকারীর হঠকারিতার ফলে নিতাই চক্রবর্তী নামক কিশোর বাজীর বোমায় অকালে প্রাণ হারায়। বালকটী তাহার বিধবা মাতার একমাত্র পুত্রসন্তান। মাত্র একমাস পূর্ব্বে তাহার পিতা মারা গিয়াছেন। বালকটীর নাম নিতাইচন্দ্র চক্রবর্তী (১১)। নিতাইর মাতা ও বৃদ্ধা দিদিমা ৫।১২ সি পাথুরিয়া ঘাটার এক বাড়ীতে থাকিত। নিতাইর মাতা ও দিদিমা ঠোঙ্গা বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। নিতাই তাহাদের ঐ কাজে সহায়তা করিত। সে তাহার বিধবা মাতার একমাত্র আশা ও ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল ছিল।'

এই বোমা ইউনিভারসিটি পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রগণ এক সামাজিক অনুষ্ঠানে ইউনিভারসিটি গৃহে মিলিত হয়।

কলেজের ছাত্র নিমন্ত্রিত ছাত্র সহ প্রায় চারি হাজার লোক সেখানে সমবেত হয়। তাহার মধ্যে কোন বিষয় লইয়া সহসা মতভেদ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফাটিল। বিনিময় রায় নামে একটি নিমন্ত্রিত ছাত্রের হাত উড়িয়া গেল এবং ১০।১২ জন আহত হইল, উৎসব অনুষ্ঠানটী পণ্ড হইল। বিনিময় রায়কে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে সে পরে মারা যায়।

পূজামণ্ডপের সন্নিকটে, ইউনিভারসিটি হলে বোমা ফাটিল, মানুষ মরিল। ইহা একান্তই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কলিকাতার আবহাওয়ায় যে হিংসা-বিষ ছড়াইয়া রহিয়াছে, ইহা তাহারই পরিচয় মাত্র। মতভেদ হইলেই 'বোমা' পড়িবে, অপমানের চূড়ান্ত হইবে, ইহা তো কলিকাতায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পূজায় অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারেও কি কম জুলুম হয়? একই পাড়ায় পাঁচটী পূজায় পাঁচ বার চাঁদা দিতেই হইবে, দরিদ্র গৃহস্থ দিতে সক্ষম হউক বা না হউক। দৈহিক শক্তি আজ মানুষের মনুষ্যত্বকে, মানুষের স্বাধীন মতকে পদদলিত করিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যত। আজ সর্ব্বক্ষেত্রকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিণত করিবার একটী সার্ব্বজনীন প্রচেষ্টা রহিয়াছে। শক্তির চাপ দিয়া আদায় করার দুর্নীতি আজ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অশ্রদ্ধা, পূজ্যাপূজ্যব্যতিক্রম আজ বাঙ্গালার আকাশে বাতাসে। অথচ এই শ্রদ্ধার উপর এদেশের প্রাচীনেরা কত বড় মূল্যই দিয়েছিলেন? শ্রদ্ধা অর্থ দাসভাব নয়। গুরুজনের 'মত' আলোচনা করিতে শ্রদ্ধা বাধা দেয় না; শ্রদ্ধা দাবী করে গুরুজনের যথেষ্ট মর্য্যাদা দিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার মনোবৃত্তি। শ্রদ্ধাহীন জাতি বাঁচিবে না, বাঁচিতে পারে না।

বিধবা মাতার 'ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসাস্থল' নিতাই চক্রবর্ত্তী যে মারা গেল, সে জন্য দায়ী কে? যে সার্ব্বজনীন পূজাকমিটির শোভাযাত্রার বোমায় নিতাই মারা গেল, তাহাদের কি উচিত নয় যে, নিতাইর স্থলাভিষিক্ত হইয়া তাহারা নিতাইর মায়ের সেবা করে? সেবা না করুক তাঁহার সারা জীবনের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে? এই সম্বন্ধে সেই পূজাকমিটি কি করিলেন, তাহা জনসাধারণ জানিতে চায়। কলিকাতার সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা কোন্ স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কি নিতাইর মৃত্যু পূজাকমিটিগুলির পরিচালকদের চক্ষু খুলিয়া দিবে?

বাঙ্গলার জনসাধারণ এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে বিক্ষিপ্ত ঘটনা করিয়া লঘু

করিয়া দেখিলে সমাজ উৎসন্ন যাইবে, সব ঘটনা একটী সংক্রামক ব্যাধিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সময় থাকিতে এখন শিক্ষিত সমাজনেতাগণ অবহিত হউন।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে-ভাবে দুর্গোৎসবের সময় মণ্ডপ-সজ্জা, আলোর ঘটা ও লরীর নিয়োগের ব্যাপারে অপব্যয় হয়, তাহা কি দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বাঙ্গলার পক্ষে খুব শোভন না যুক্তিযুক্ত? যাহারা 'ভুখা মিছিল' করেন, তাহাদের দৃষ্টি এই অপব্যয়ের দিকে আকৃষ্ট হউক, তাহারা এই জাতীয় অপব্যয় বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউক, ইহা আমরা অন্নক্লিষ্ট জনসমাজের পক্ষ হইতে দাবী করিতেছি। এই সব অপব্যয় বন্ধ করিলে দুর্গাপূজার গৌরব তো কমিবেই না, বরং এই অর্থদ্বারা অন্নহীনের অন্ন সংস্থানের পথ সুগম হইলে জগন্মাতা অধিকতর তৃপ্ত হইবেন। কলিকাতার দুর্গাপূজা যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে না ইহা শাস্ত্রসম্মত হইতেছে, না ইহা বাঙ্গলার জনসাধারণের জীবনযাপনের মানের সঙ্গে শোভন হইতেছে। বিসর্জ্জনের সময় যখন প্রতিমা লইয়া শোভাযাত্রা হয়, সে সময় প্রতিমার সামনে আরতি করা কোন্ শাস্ত্রসম্মত, তাহা আমরা জানি না। প্রতিমাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরই আরতি হয় এবং বিসর্জ্জনের পর আর প্রতিমার সামনে আরতি চলে না। অথচ শোভাযাত্রা বা বিসর্জ্জনের মন্ত্রোচ্চারণের পর ইহা খুব বেশীই হইয়া থাকে। আমরা ইহা বুঝিতে পারি না। শোভাযাত্রায় যে নাচানাচি হয়—বিসর্জ্জনের করুণ মুহূর্ত্তে তাহারও কোন যৌক্তিকতা আমরা দেখিতে পাই না। আর অপব্যয়ের রাজসিকতাও অন্নহীন বাঙ্গলার বুকে যে কতবড় অশোভন, ইহা যাহারা ভুখামিছিল করেন, তাঁহারা কি দেখিতে পান না? আমাদের মনে হয় আলো, মাইক, মণ্ডপ, বিসর্জ্জনের মিছিল, বাজনা ইত্যাদির অপচয় কমাইয়া সংগৃহীত অর্থের অর্দ্ধেক পরিমাণ ফুটপাতের ধারে যাহারা গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহাদের মধ্যে বিতরণের জন্ম ব্যয় করা উচিত। ইহা একটী গঠনাত্মক কর্ম্মও বটে। অন্নহীনের দেশে পূজার নামে এই রাজসিকতা অপরাধ। মায়ের অর্চ্চনা বাঙ্গালী তাহার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। বন্দেমাতরম্

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বল ভারত

৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

নারীর মুক্তি

রেণু মিত্র

'মুক্তি' রবীন্দ্রনাথের পলাতকা কাব্যের একটী কবিতা। একজন নারীর জীবনের কাহিনী নিয়ে লেখা। এ কোনো একজন নারীর কাহিনী নয়—এ সমস্যা সাধারণভাবে হিন্দুর ঘরের মেয়ের।

ন'বছরের মেয়ে বিয়ে হয়ে এসেছিল সংসারে। তারপরে বাইশ বছর ধরে দশের ইচ্ছা বোঝাই করা জীবনটাকে টেনে চলার পর আজ সেই সংসার চক্রের থেকে মুক্তি দিল তাকে রোগ। সেই বাইশ বছরের জীবনটা কেমন ছিল ?

এইটে ভালো, ঐটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে
নামিয়ে চক্ষু, মাথার ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।

ন' বছরের মেয়ে এই বাইশ বছর ধরে কি করেছে, কি জেনেছে ?—

আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা,'—

এমনি করেই কাটত জীবন 'আরো বাঁচলে পরে'।

বাইশ বছর ধরে—
মনে ছিল বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।
দুঃখ তবু ছিল না তার তরে,
অসাড় মনে দিন কেটেছে, আরো কাটত আরো বাঁচলে পরে।

কিন্তু এতে লাভ হয়েছে তো অনেক। যদিও

সুখের দুখের কথা

একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা।

এই জীবনটা ভালো কিংবা মন্দ, কিংবা যাহোক একটা কিছু—

সে কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগু-পিছু।

যদিও

জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা

কী অর্থে যে ভরা।

শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী

মহাকালের বীণায় বাজে।

তবু লাভ হয়েছে তো অনেক—

তাই তো ঘরে পরে,

সবাই আমায় বললে লক্ষ্মী সতী,

ভালো মানুষ অতি।

... ...

যেথায় যত জ্ঞাতি

লক্ষ্মী বলে ক'রে আমার খ্যাতি ;

এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা

ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা।

কিন্তু জীবন তো এতে ভরল না। নারীকে মুক্তি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর দরজায় এনে। সংসারের প্রতিদিনের রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা যখন দেহেতে আর কুলোল না, মৃত্যু যখন ডাক দিল দুয়ার খুলে, মুক্তি মিলল সেইদিন। সেইদিন কয়টা দিনের অবসরে নারী দেখলে বাইশ বছর তার জীবনটা যেমন গেছে, তাতে তার বুকটা তৃপ্ত হয় নি। এতদিন তো ভেবে দেখবার সময় পাওয়া যায়নি। বসন্তকাল যে আসে বনের আঙিনায়, মানুষের জীবনকেও যে সে দুলিয়ে দিয়ে যায়—বলে যে 'খোলরে দুয়ার খোল'—এ সব তো কিছুই জানা ছিল না। আজ মনে হয় বসন্ত সেদিন

হয়তো মনের মাঝে

সংগোপনে দিত নাড়া ; হয়ত ঘরের কাজে

আচম্বিতে ভুল ঘটাতো ; হয়তো বাজত বুকে

জন্মান্তরের ব্যথা, কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে

হয়তো পরাণ রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে
বিহ্বল ফাল্গুনে।
সেদিন তো বুঝি নি, কিন্তু এতদিন পরে আজ
প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
এতদিন পরে আজ উপলব্ধি করি
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হোত সন্ধ্যা-তারা ওঠা,
মিথ্যা হোত কাননে ফুল-ফোটা।

—এই যে উপলব্ধি, নারীর জীবনে এ এক নূতন অধ্যায়। নারী কেবল রাঁধার পরে খাওয়ান আবার খাওয়ার পরে আবার রাঁধার জন্য নয়, নারী মহীয়সী, তার সুরে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রা-বিহীন শশী সুর বেঁধেছে, সে নইলে সন্ধ্যা-তারা ওঠা আর কাননে ফুল ফোটা সবই মিথ্যা হোত—এই যে উপলব্ধি, বিরাটের সঙ্গে নিজেকে এমন সংগ্রথিত করে দেখা—নারীর জীবনে এ নূতন। রবীন্দ্রনাথ নারীর এ উপলব্ধি আনলেন তাকে মৃত্যুর সীমায় এনে। তবু তিনি বলে গেলেন নারীব পক্ষে এ উপলব্ধি সত্য।

আমাদের প্রশ্ন এই যে, মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী, আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে, বিশ্ব জগৎ আমার কাছে তাই চায়—এ কথা মৃত্যুর পারে না দাঁড়িয়ে নারী কি বলতে পারে না? তার জীবন কি তার সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এমন ভাবে সংগ্রথিত করা যায় না যেখানে রাঁধাবাড়া করেও সে যে মহীয়সী, তার সুরে যে বিশ্বভুবনের সুর বাঁধা—এ কথা সে উপলব্ধি করতে পারে? দুটোই যখন, নারীর জীবনে সত্য, তখন দুটোকে না মেলাতে পারলে চলবে কেমন করে? রাঁধা-বাড়া নারীকে করতেই হবে—কিন্তু ঐ-ই তার একমাত্র কাজ—রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা—এই-ই তার একমাত্র জীবন হওয়া তো উচিত নয়। একটা পরিবারের সে একজন নিশ্চয়ই, কিন্তু তার নিজস্ব কোন সত্তা থাকবে না, নামিয়ে চক্ষু মাথায় ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা শুনে লক্ষ্মী বৌ বিশেষণ সংগ্রহ

করাই তার চরিতার্থতার একমাত্র লক্ষ্য হবে—এ-ও তো সত্যি হতে পারে না।

হিন্দুর ঘরের নারীর—তথা সমগ্র সমাজের—সামনে আজকের প্রশ্ন তাই বড় জটিল হয়েছে। নারীর স্বাতন্ত্র্য বিলোপ করা এতদিনকার ব্যবস্থা ভেঙে গেছে অথচ আজ সে যা হয়েছে, তা যেমন সুন্দরও নয়, তেমনি কল্যাণকরও নয়। যে-ব্যবস্থাটা ভেঙেছে সেটা সমাজপতিরা অসম্পূর্ণ মনে করে যে ভেঙে দিয়েছেন, তা নয়—কালের ধাক্কায় সেটা ধ্বসে পড়েছে। কিন্তু সেখানে নূতন কোন্ আদর্শ নিয়ে নারীর জীবন গড়ে উঠবে, তেমন কথা কেউ তো নারীর সামনে তুলে ধরে নি। যা সে ছিল, ঠিক তার বিপরীত একটা ঢেউ তাকে ঘরের কোণ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে। তাই স্বাতন্ত্র্যের নামে তার আজকের ব্যক্তিগত ভোগ-চরিতার্থ করবার দেহমনের বিলাসও একটু যারা ভেবে দেখবার শক্তি আজও রাখেন, তাঁদেরকে ভাবিয়ে তুলছে।

গোড়া থেকে আজ সমস্যাটাকে ভেবে দেখতে হবে। নারীর কি ছিল না, ঠিক কি সে চায়, কি তাকে হতে হবে—এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার সং‍েগর আগে। সবটা কথাকে সংক্ষেপে এই ভাষায় দেওয়া যেতে পারে—হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অনেক কিছুই ছিল বা আছে, শ্রদ্ধা সে পায়, সম্মান পায়, পুজাও পায়; কিন্তু যা পায় না সে হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য। বাল্যে সে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের। এই স্বাতন্ত্র্যহীনতাই বাস্তবতার ক্ষেত্রে তাকে সব অবস্থাতেই বোঝা করে তোলে। পিতার ঘরে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গিয়ে বিয়ে না হলে সে যে কী রকম বোঝা হয়ে ওঠে, সেই কথা আজই কি আমরা ভুলে গেছি? যদি যাই তারই জন্য শরৎচন্দ্র অবিবাহিতা নারীর মর্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী রেখে গেছেন তাঁর জ্ঞানদার চরিত্রচিত্রণে। যৌবনে স্বামীর ইচ্ছা এবং স্বেচ্ছাচার সব কিছুকেই পালন করেও স্বামীর কাছে স্ত্রীলোক মাত্রই যে বোঝা, এ বিশেষণ শুনতে হয় না, এমন নারী হিন্দুর ঘরে খুব কমই আছে; আর স্বামী যার অকালে মারা গেল, তেমন মেয়ে নিজের কাছে ও পরিবারের কাছে কি রকম বোঝা হয়ে ওঠে, এ কথা জানেনা এমন কেউ কি আছে? বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এই বোঝার জীবন টেনেই তাকে চলতে হয়। এই রকম জীবনেরই প্রতিবাদে ও প্রতিক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের ঢেউ আমাদের ভাসিয়ে নিতে পারল।

কিন্তু স্থিতিলাভ তো নারীর হল না। আজ তাই নারীকে তার স্বরূপ

চিনতে হবে। তাকে বুঝতে হবে বিশ্বস্রষ্টার সে একটী স্বতন্ত্র সৃষ্টি, যেমন একটী স্বতন্ত্র সৃষ্টি নর। এতদিন নর-নিরপেক্ষ তার কোন পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হতো না। কিন্তু আজ এ সত্য স্বীকার করতেই হবে যে, নরের যেমন নারী-নিরপেক্ষ একটা সত্তা আছে, তেমনি নারীরও নর-নিরপেক্ষ সত্তা রয়েছে অর্থাৎ সে আগে মানুষ, তার পরে নারী ; এবং তারও পরের কথা হচ্ছে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিরপেক্ষ অনধীন হয়েই প্রত্যেকে প্রত্যেকের অপেক্ষাধীন, অধীন। দুইটি স্বতন্ত্র সত্তার মিলন হবে, একজন অধীনের সঙ্গে আর একজন প্রভুর মিলন নয়। দুইজনই স্বাধীন, স্বতন্ত্র, কেবল সত্তা—অথচ এই দুইজন মিলে মিশেই পরিবার সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সংসার রচনা করে তুলবে—গোড়াতে এইটিকে মেনে নিতে হবে। এইটিই নারীর স্বরূপ। বিশ্বস্রষ্টার আর সকল সৃষ্টির সঙ্গে একই আনন্দের অংশ নিয়ে তার জন্ম, সেই আনন্দধারাকে অব্যাহত রাখাটাই তার কাজ—সেইখানে মহীয়সী নারী বলতে পারে—

> আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী
> আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যা-তারা ওঠা
> মিথ্যা হোত কাননে ফুল-ফোটা।

সত্যিই নারী ক্ষুদ্র নয়, সামান্য নয়—একটা বিশ্বজীবনের (cosmic life) খোঁচা দিয়ে সবটুকু তার গড়া—ঘরের মধ্যে যখন সে, তখনও সে বিরাট, যখন বাইরে এসে দাঁড়াতে হয় তখনও সে বিরাট। নারী বিরাটেরই অংশ বিরাট বলেই সে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, অনপেক্ষ আবার সেই সঙ্গে পরতন্ত্র অধীন অপেক্ষাধীন হতে পারে। নারীর এই স্বরূপই তার ধ্যানের বস্তু।

এরপরে নারীকে বুঝতে হবে সে একটী স্বতন্ত্র সত্তা এ দাবী যখনই সে করল, তখনই আগের চাইতেও অনেক বেশী সচেতন নিজের সম্বন্ধে তাকে হতে হবে। কেননা একজন দাসের দায়িত্ব আর একজন স্বাধীনের দায়িত্ব সমান নয়। অপরের দাস যে, অপরের আজ্ঞা বহন করে চলাই তার একমাত্র যোগ্যতা হলে চলে। কিন্তু যে স্বতন্ত্র স্বাধীন হলো, তার দায়িত্ব কত ? তাকে যে অনেক বড় যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে, অনেক বড় সংযমের অধিকারী হতে হবে—স্বাধীন হওয়ার সেই তো দায়! তাই মেয়েদের যোগ্য হতে হবে, শ্রদ্ধা দিয়ে নিজেকে গড়ে অপরের শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে। সে যে সেদিনও অবহেলার বা তুচ্ছতার বস্তু ছিল

না—movable lugguage বলে যে তার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে না বা স্ত্রীতৈলমাংস সম্ভোগ নিষেধ বলে পঞ্জিকায় মাংসতৈলের সঙ্গে একই পর্য্যায়ে স্ত্রীকে যে স্থান দেওয়া চলতে পারে না, আবার আজকেও যে সে ভোগের বস্তু নয়, বিলাসের সামগ্রী করে তাকে যে রাখা চলতে পারবে না—এর প্রমাণ নারীকে দিতেই হবে তার অন্তরস্বরূপকে ফুটিয়ে তুলে।

কিন্তু নারীর এই স্বরূপ ও সাধনার খবর এদেশ ওদেশ কোন দেশেরই দর্শনে ও সমাজ জীবনে স্বীকৃত ছিল না। এ দেশে প্রকৃতি তথা নারীর স্বতন্ত্র স্বীকৃতি ছিল না—সে কথা আগে বলেছি; ওদেশে কুমারী মেরীর গর্ভে যীশুখ্রীষ্ট জন্ম নেবার পুর্ব পর্যন্ত নারীকে কোন সম্মানের আসন দেওয়া হয় নি। Woman is a necessary evil—এ তারাও বলেছে। ভার্জিন মেরীকে পেয়েই তারা নারীকে সম্মান করতে শিখেছে—'For the first time woman was elevated to her rightful position. and the sanctity of weakness was recognised as well as the sanctity of sorrow. No longer the slave or toy of man, no longer associated only with the ideas of degradation and of sensuality, woman rose, in the person of the Virgin Mother into a new sphere, and became the object of a reverential homage of which antiquity had no conception.'

তাই নারীর সম্বন্ধে এই মর্যাদাপূর্ণ ধারণা এক সময়ে কোথাও ছিল না—এটা ঠিক। তারপরে ক্রমে সে ধারণা বদলাতে আরম্ভ করল বটে কিন্তু নারী সম্বন্ধে ঐরকম ধারণার পেছনে একটা দার্শনিক চিন্তাধারা থাকায় সেটাকে বদলে না দেওয়াতে পরিবর্তিত চিন্তাধারাটি কোন স্থায়ী বা সুদূরপ্রসারী অবস্থায় আসতে পারে নি। আজ দরকার নারী বা প্রকৃতি সম্বন্ধে এই দার্শনিক কাঠামোটি বদলে দেওয়ার। দার্শনিক ভাবে যদি প্রকৃতিকে, শক্তিকে স্বতন্ত্র মর্যাদাপূর্ণ, পুরুষ বা ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ একটা স্বাধীনভর্তৃকা রূপ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়, যেখানে শক্তি-শক্তিমান, পুরুষ-প্রকৃতি বা ব্রহ্ম-জগৎ পরস্পর অনপেক্ষ হয়েও পরস্পর অপেক্ষাধীন, তাহলেই শুধু ব্যবহারিক জগতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক দুটো স্বাধীন সত্তার মিলন রূপে দাঁড়াতে পারে। সমস্ত বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে সার্থক করতে আজ এই একটা কাজ বাকী আছে—গোড়ার কাঠামোকে—

দার্শনিক কাঠামোকে—বদলে দেওয়া। গোড়ার কাঠামোকে যেমন তেমন রেখে পরিবর্তিত চিন্তাধারাকে কিছুতেই সমগ্র সমাজে প্রয়োগ করা যাবে না। ব্যাপক ভাবে যদি একে সফল করতে হয়, যদি কবির প্রাণের নারীর স্বরূপ-উপলব্ধিকে রূপ দিতে হয়, যদি রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা—নারীর জন্য এ ব্যবস্থাকে একান্ত না করে রাঁধাবাড়া ঘরকন্না করেও তাকে বিশ্বভুবনের সুরে বাধা আনন্দের সহচরী করতে হয়,—আবার সেই সঙ্গেই যদি আজকের নারীর উচ্ছৃঙ্খল ভোগ বিলাস চরিতার্থপ্রয়াসী চিত্তবৃত্তিকে সংযত করতে হয়, তবে মূলে দার্শনিক কাঠামো বদলে নারীর স্বরূপকে সমাজের সামনে তুলে ধরা আজ একমাত্র প্রয়োজন।

প্রাণের মানুষ অশ্বিনীকুমার

দুর্গামোহন সেন

আজি হইতে ৩০ বৎসর পূর্বে প্রাণের মানুষ অশ্বিনীকুমার দত্ত কলিকাতার কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁহার দেহরক্ষা করিয়াছেন। আর যতই দিন যাইতেছে ততই বুঝিতেছি এমন মানুষ তো এদেশে দ্বিতীয়টি ছিলেন না এবং আজিও নাই। কলিকাতার তুলনায় বরিশাল একটি পল্লীগ্রাম। সেই পল্লীগ্রামে জীবন যাপন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কর্মখ্যাতি কেহ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। রাজধানীতে নামকরা সহজ, এখানে ভাল বক্তৃতা দিতে পারিলে বড় বড় পত্রিকা সমূহে তাহা প্রকাশিত হইয়া দুইদিনেই নেতৃত্বের গৌরব লাভ করা যায়। পল্লীগ্রামে মফঃস্বলের জিলায় সে সুযোগ নাই। তাই সেখানে বড় হইতে হয় বহু সাধনা দ্বারা।

অশ্বিনীকুমার ছিলেন প্রাণের সাধক, তাঁহার ছিল সাধনায় প্রাণ। ধর্মের মূল বীজ লইয়াই তিনি দেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পনর বৎসর বয়সেই তিনি মিথ্যা বয়স লিখিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিবার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন জীবনের শ্রেষ্ঠ দুই বৎসর অনধ্যায়ে কাটাইয়া। আজ কথাটা এক নিঃশ্বাসে

আরামের সহিত বলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু সুদূর বাল্য বয়সের এই সত্যাগ্রহ আজও আমাদিগকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। সেই সত্যনিষ্ঠ বালক যৌবনে মিথ্যার ভয়ে উজ্জ্বল অর্থকরী ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়া ওকালতি ব্যবসায় ত্যাগ করিলেন দ্বিতীয়বার। তিনি ধনবান ছিলেন না। এই ত্যাগের জন্য লোক-গঞ্জনাও তাঁহার কম সহিতে হয় নাই! তাঁহার চক্ষে ভাসিয়া উঠিল দেশের ভবিষ্যৎ যুবকদিগের চিন্তা। অজ্ঞান আঁধার-ঘেরা দেশবাসীর প্রাণে মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তুলতে হইবে। তিনি প্রাণে প্রাণে ইহাই বুঝিলেন,

অন্ধকার নাহি ঘুচে বিবাদ করিলে
মানে না সে বাহুর আক্রমণ।
একটি আলোক শিখা সম্মুখে ধরিলে
নীরবে সে করে পলায়ন॥

তিনি ব্রজমোহন স্কুল স্থাপন করিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে পাইলেন এমন শিক্ষকদল যাহারা সর্বান্তঃকরণেই তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত। আর ছাত্রগণ হইল তাঁহার ক্ষেত্র—তাহাদের প্রাণের উপরে তিনি করিলেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা। কেমন করিয়া? তাহাদের প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাবধি, সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত তাঁহার জীবনদ্বার রহিল তাহাদের জন্য মুক্ত। তিনি বলিতেন—যাহাকে দেখিলে, যাহার সহিত প্রাণের সব কথা বলিতে লোক ভয় পায়, সে কেমন বড় লোক? তিনি স্কুলের ছাত্রদের জন্য প্রাত্যহিক জীবন যাপন প্রণালীর একখানি নির্দেশ পত্রিকা মুদ্রিত করাইয়া প্রত্যেক ছাত্রের শিরোভাগে টানাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রত্যেককেই ডায়েরী লিখিবার জন্য আদেশ দিলেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আদর্শে চার্ট করিয়া দিলেন—ষড়রিপুর আক্রমণ কতবার দিনে রাত্রে ঘটিয়াছে তাহা পুরণ চিহ্ন দিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। আর জনসেবায় উৎসাহিত করিতে ব্রজমোহন সঙ্গীত রচনা করিলেন।—

সত্যের নিশান তুলিয়া গগনে
পবিত্রতামৃত পুরিয়া পরাণে
প্রেম-ডোরে বাঁধি ভাই বন্ধুগণে
চল পূর্ণ হইবে যত মনস্কাম।

এমনি করিয়া যে যুবকদল তিনি গড়িলেন, তাহাদের সুকৃতকর্ম দিকে দিকে যশঃ-সৌরভ বহিয়া আনিল। আমার মনে হয় তাঁহার জীবনী রচিত হয়

নাই। কেমন পোষাক তিনি পরিতেন—কেমন ভাবে শয়ন করিতেন—কেমন ভাবে তাঁহার প্রাণের মধু ঢালিয়া তিনি আপামরসাধারণের সহিত কথা বলিতেন, পরদুঃখে কেমন করিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত—কেমন করিয়া অমানীকে তিনি মান দিতেন, কেমন করিয়া মানুষের শতদোষ ভুলিয়া শুধু গুণের আদর করিতেন—এসব কথা তাঁহার জীবনীতে লিখিত হয় নাই। হইলে আজিকার লোক আরও বিশেষভাবে বুঝিতে পারিত কি অপূর্ব্ব মানুষ ছিলেন তিনি, কেমন করিয়া তিনি জাতিধর্মনিবিশেষে সকল লোকের হৃদয়ের সম্রাট হইয়াছিলেন। ব্রজমোহন সঙ্গীতে ছিল—

অগ্নিদাহে কেহ সর্বস্ব খোয়ায়
দাঁড়ায়ে না রব পুতুলের প্রায়
রোগীর শিয়রে মৃত্যুর শয্যায়
জাগিব গাহিব তাঁহারি নাম।

অশ্বিনীবাবুর শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদল দুর্ভিক্ষের সময় জিলাময় হিন্দুমুসলমানের বাড়ীতে চাউল পৌছাইয়া দিয়াছে, তাহারাই অহিংস বয়কট চালাইয়া ইংরেজকে দেশছাড়া করিয়াছে। আর সেই অশ্বিনীকুমারের নির্বাসনে বরিশালের উচ্চ অশ্বত্থবৃক্ষারূঢ় বাদুরগণ বরিশাল ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। তাঁহার নির্বাসনদাতা স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার তাই এদেশ ত্যাগ করিবার পুর্বে লিখিয়াছিলেন—You have not rendered only lip-service to your country. তাঁহার ছাত্রেরা পরীক্ষায় নকল করিত না। বরিশালের মুচি ৬০০ শত টাকার তোড়া পাইয়া তাঁহারই নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল। তিনিই গোপাল মেথরকে কোল দিতেন।

রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি ছিলেন চরমপন্থী। লোকমান্য, দেশবন্ধু, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দিতেন। সুরেন্দ্রনাথের মডারেট নীতির সমর্থক তিনি ছিলেন না। অথচ রাজনীতিতে মিথ্যার প্রশ্রয়ও তিনি দিতেন না, সেই জন্যই বরিশালে বারীন ঘোষ প্রভৃতি সফলকাম হইতে পারেন নাই। বারীনবাবু বলিয়াছিলেন—বরিশালে অশ্বিনীবাবুর উপর কাহারও কর্তৃত্ব করিবার শক্তি নাই।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি স্বদেশী ও সালিশী বোর্ড গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রচারক পাঠাইয়াছেন। জিলার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ ও প্রচার করিতেন। হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে তাই তাঁহাকে

ভক্তি করিত। তাঁহার গৃহ ছিল সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য অবারিত দ্বার। সারা ভারত ও ভারতের বাহির হইতে যত ভ্রমণকারী আসিতেন, তাঁহারা তাঁহার নিকটই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। আমেরিকার ফেলপ সাহেব বহুদিন তাঁহার সহিত আসন পাতিয়া অন্ন গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। আর্য্য-সমাজের লালা কাহনচাঁদ মাসাধিককাল তাঁহার সহিত কাটাইয়া গিয়াছেন। বাংলার নেতৃবর্গের উল্লেখ অনাবশ্যক। অশ্বিনীকুমার বহু ভাষা জানিতেন। উর্দ্দু, ফারসী ও নির্বাসন কালে তিনি গুরুমুখী শিখিয়া মূল গ্রন্থসাহেব পাঠ করিয়াছেন। তিনি সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। লক্ষ্ণৌ জেলের রচিত গান স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। মধু সংগীত চিরমধু ক্ষরণ করিতেছে।

তাঁহার বহু গোপন দান ছিল। বিপিনচন্দ্র, কান্ত-কবি রজনীকান্ত তাঁহার দান পাইয়াছেন। আর পাইয়াছে চিরবিক্ষুব্ধ ইল্‌শানদীতে নৌকা-ডুবিতে বিপন্নদিগের উদ্ধারকর্ত্তা মুসলমান যুবক। বহু দরিদ্র ছাত্রও তাঁহার আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে।

বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁহার সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি ছিলেন পাকা জহুরী। তাই তিনি কাজের লোক চিনিতেন সহজে।

প্রকাশ

সন্তোষকুমার অধিকারী

জীবনকে সব তুচ্ছতা ভয় লোভ আর ক্ষোভ থেকে
বিমুক্ত করো দেখি,
শান্তির নাম মুখে নিলে, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র রেখে
—জীবনই তোমার মেকি।
ক্ষমতার জ্বালা তীক্ষ্ণ সায়রে মৃত্যু যাদের দিলে
তাহাদের নিঃশ্বাসে
বিষ ভেসে ওঠে সে বিষে বিশ্ব মুমূর্ষু তিলে তিলে
নামিছে সর্ব্বনাশে।

মানুষের মনে আত্মার আলো তুমি দেখেছো কি কভু
শুনেছো কি তার বাণী ?
জেনেছো কি কেন বেদনার বুকে মানুষ নিয়েছে তবু
হিংসার হানাহানি ?
মানুষের শুভবুদ্ধি যে শুধু মিলায় সর্ব্বনাশে
ধ্বংসে মৃত্যুতেই,
বৈরাগ্যের কষ্টিপাথরে অহংকার যে নাশে,
সে বৈরাগ্য নেই।

জীবনে তোমার ত্যাগ কই প্রিয়, সন্ন্যাস কেন নেই ?
হৃদয়ের বেদনায়,
মানুষকে তুমি দেখোনি বিমল আত্মার আলোতেই,
হৃদয় তব কোথায় ?
নির্য্যাতনের যন্ত্রণা কভু হেনেছো আপন বুকে,
শোণিতে পূর্ণ করে ?
পেয়েছো বেদনা ? ভালোবাসা দিয়ে জেনেছো কি মৃত্যুকে,
প্রেমময় নির্ভরে ?

জীবনকে তবে বিমুক্ত করো হিংসার ক্ষোভ থেকে,
সংশয়ে করো জয়,
বিশ্বের ব্যথা বুকে নিয়ে তার হৃদয়কে তোলো ডেকে,
হৃদয়ে করো অভয়।
মুক্তির মানে—মানুষের মাঝে ব্যবধান হোক ক্ষয়,
—মানুষ চির-অমর ;
মর্ত্যজীবনে চিরজীবনের হউক সমন্বয়—
সত্য ও সুন্দর ॥

ধন্যোঽহম্ শিষ্টাচার-পদ্ধতি

সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর

তখন শান্তিনিকেতনে কাজ করি; কলাভবনের আচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় কাশী থেকে আমায় নিয়ে নবপ্রবর্তিত কুারেটর (নিরীক্ষক) পদে বহাল করে কলাভবনে কাজ দেন।

একটি পাঠচক্র গড়ে উঠেছিল; মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর তার বৈঠক বসত। কলাভবনের শিক্ষা-বিভাগের কক্ষ-চতুষ্টয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাতে যোগদান করত। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রধানতঃ চারু ও কারু-কলা বিষয়ক নিবন্ধাদি, তত্তদ্ বিষয়ের গ্রন্থ ও প্রতিবেদন প্রভৃতি পঠিত ও আলোচিত হ'ত। কখনো-বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের বক্তৃতাও হ'ত।

একদিন আলোচনা উঠল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার প্রচলিত রীতিটি আসলে ইংরাজী শিষ্টাচার (এটিকেট) সম্মত thanks কথার অনুকরণ মাত্র। 'ধন্যবাদ' দেওয়ার ভাবটি কিন্তু ঠিক ঠিক প্রাচ্য আচার-ব্যবহারের অনুকূল নয়। যাঁর কাছে উপকৃত হলেম, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাবটি ধন্যবাদ (thanks) কথায় প্রকাশ পায় না; বরং কার্যের বিনিময়ে নগদ-বিদায় গোছের একটা কিছু দেওয়ার অপচেষ্টা হয় মাত্র। ভারতীয় দৃষ্টিতে, তাতে কার্যটির মহত্ত্ব ম্লান হয়ে যায়। প্রাচ্য ভাব-ধারায় 'ধন্যবাদ' বা ঐরূপ অপর কিছু দেওয়ার ধৃষ্টতা থাকতে পারে না। তবে কী ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাবে?

স্থির হ'ল, ছেলেরা বলবে 'ধন্যোঽহম্—সংক্ষেপে ধন্যোঽহম্ এবং মেয়েরা 'ধন্যাঽহম্'। কার্যতঃ কথায় লিঙ্গ-ভেদ বড়-একটা আর থাকল না, মেয়েরাও সাধারণতঃ 'ধন্যোঽহম্'ই বলতে লাগল। 'ধন্যোঽহম্' প্রসঙ্গটি বন্ধুবর ডক্টর শ্রীহজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী এবং পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয়দ্বয়ের গোচরে আনা হ'লে, তাঁরা সানন্দে স্বীকৃতি দেন। দ্বিবেদী মহাশয় তো একটু বৈয়াকরণিক মীমাংসাও করে দেন; 'ধন্যাবয়ম্' বললে মেয়ে-পুরুষ কারুর পক্ষেই আর লিঙ্গগত ব্যবধান করতে হয় না; অধিকন্তু বহুল-প্রচলিত বহুবচন প্রয়োগের গৌরবও তাতে এসে যায়। তদবধি কেহ কেহ ধন্যাবয়ম বলতে থাকে, কিন্তু বেশির ভাগ ছেলে-মেয়ে ধন্যোঽহম্ বলতেই অভ্যস্ত হয়ে

যায়। ক্রমে প্রথাটি কলাভবনের বাইরে অন্যান্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যেও কিছু কিছু প্রচলিত হতে থাকে। আমি ১৯৪৮ এ অবসর গ্রহণ করে কাশীবাসী হয়েছি পরও দেখেছি কেহ কেহ 'ধন্যোঽহম্' শব্দটির প্রয়োগ করছে, তবে কিছু কম।

কিছুকাল পরে (১৯৪৯-৫০ খৃঃ হবে) প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ জৈন সাধু ডক্টর 'মুনি কান্তি সাগর' কাশীতে কএক মাস থাকেন; তার পুর্বে শান্তিনিকেতনে কিছু দিন কাটিয়ে এসেছিলেন। আমি কাশীতে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রি। তিনি আমার কথা পুর্বে শুনেছিলেন এবং মৎপ্রবর্তিত 'ইণ্ডিয়ানা' পল্লী-পত্রিকা দেখে সেটার আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আমার সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে পল্লী-পরিষদের কার্যে তিনি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করায়, বিদায় কালে আমি 'ধন্যোঽহম্' বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। 'ধন্যোহম্' কথাটি শুনবামাত্র তিনি বললেন:

"হাঁ, আপনি তো শান্তিনিকেতনের কি না! সেখানে ঐ কথাটি চলে দেখে এলাম। কলাভবনের দুইটি গুজরাটী ছাত্রী শান্তিনিকেতনে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে, বিদায়-কালে প্রণতি জানাবার সঙ্গে 'ধন্যোঽহম্' কথাটি বলে; মেয়ের পক্ষে উচিত 'ধন্যাঽম্' শব্দের প্রয়োগও একটিতে করে থাকবে। মেয়ে দুইটির নাম বোধ হয় জয়ন্তী দেশাই ও সুশীলা পারিখ বা ঐরূপ কিছু হবে। 'ধন্যোঽহম্' শব্দটি শুনে আমার মন গভীর ভাবে আপ্লুত হয়। ভাবলাম, কী সুন্দর শিষ্টাচার-সম্মত ভাবধারা এই ক্ষুদ্র শব্দটি ব্যক্ত করে। শান্তিনিকেতনে গুরুদেব (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) অনেক কিছু প্রবর্তন ক'রে ভারতবর্ষে এক মহান্ আদর্শ দৃষ্টান্তসহ স্থাপন করে গেছেন। প্রথমেই গিয়ে দেখলাম, সেখানকার নানাবিধ এবং অজস্র সভা-সমিতির অপুর্ব শৃঙ্খলা। পাঁচ-সাত বছরের ছোট-ছোট শিশুরা পর্যন্ত নিজেদের সম্মেলনের সকল ব্যবস্থা প্রধানতঃ নিজেরাই করে, আবশ্যক মত বড়দের সহায়তা লয় মাত্র। অবশ্য তাদের ভারগ্রাহী শিক্ষকদের তত্ত্বাবধান, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সহায়তা সর্বদা থাকে। শিশুরা নিজেরাই সব পুষ্পমালা, স্তবক, ধুপদীপ দিয়ে সাজগোছের ব্যবস্থা করে; সঙ্গীত, নাট্যাভিনয়, নৃত্য, আবৃত্তি, চিত্র-প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা অনেকটা নিজেরাই করে। যে কোনো আগন্তুক তাদের এইরূপ সুশৃঙ্খল কর্মপ্রণালী দেখে আকৃষ্ট হবেন।

"সভা-সমিতিতে করতালি নাই, এবং সঙ্গীতাদির সঙ্গে হার্মোনিয়ম্ যন্ত্রের

সহযোগ নাই। এই দুইটিই শান্তিনিকেতনের বিশেষত্ব। বিশেষ স্থলে বিশেষ বাহবা দেওয়ার জন্য কেহ কেহ 'সাধু সাধু' এইরূপ বাক্যোচ্চারণ করেন মাত্র। পুরাণাদিতে সভাসমিতির বিবরণের মধ্যে "সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ" কথাটি আমরা পেয়ে থাকি—মনে হয় যেন কোন্ সেই নৈমিষারণ্যে এসে গেছি। হার্মোনিয়ম্ স্থলে বেশির ভাগ তারের যন্ত্র এস্রাজ-সেতার প্রভৃতির ব্যবহার হয়। হার্মোনিয়ম-যুক্ত কণ্ঠসংগীত ওর তুলনায় খেলো বলে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা রায় দিয়েছেন—সাধারণ গোলা-লোকেও তারের যন্ত্র-সঙ্গীতের মর্মস্পর্শিতায় মুগ্ধ হয়। যাক্, এটি তো সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞের বিচার্য বিষয়।

"আমরা অনেক সময় দেখেছি, উদ্দণ্ড এবং বহুস্থায়ী করতালি বিষয়বস্তুর ধারণাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, তাছাড়া অনর্থ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও ঘন ঘন এবং বহুক্ষণস্থায়ী করতালির হট্টগোল বাধিয়ে দুষ্ট বা বিরোধী লোকে সভার কর্মকে পণ্ড ক'রে অশিষ্ট আচরণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকে। এমত অবস্থায় করতালির স্থলে সেই সনাতন 'সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ' আবির্ভূত হলে, এই প্রথার প্রশংসা করতে হয়।

ঘণ্টা পড়েছে, বৈতালিক গান আরম্ভ হবে, সকলে ছুটে এসে যথাস্থানে সমবেত হচ্ছে। অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে কি, সব ছুটাছুটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। যে যে-পর্যন্ত এসে গেছে, সে সেখানেই দাঁড়িয়ে গিয়ে মনে মনে বৈতালিকে যোগদান করল। এগিয়ে এসে সমবেত হওয়ার হট্টগোল তাতে বাধে না।

"ধন্যোঽহম্ শিষ্টাচারও এবংবিধ আর একটি আচরণ।" ইত্যাদি।

সত্যের অনুরোধে আমায় মুনি-মহারাজকে জানিয়ে দিতে হ'ল যে, 'ধন্যোঽহম্' কথাটি গুরুদেবের তিরোধানের পর, হালেই কলাভবন-পাঠচক্রে স্থিরীকৃত হয়। তা শুনে মুনিজী আরো উৎসাহের সঙ্গে জ্ঞাপন করলেন যে, গুরুদেবের ভৌতিক শরীর এখন নেই, তা সত্ত্বেও তাঁর ভাবধারা যে চলছে এবং চিরকাল চলবে, তা বুঝতে পারা যায় এই সব নব-নব প্রবর্তনের যে প্রাণবন্ত আদর্শ তিনি স্থাপন করে গেছেন, তার ক্ষয় নাই, ববং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে, সাধু সাধু!

তলিয়ে দেখতে গেলে বুঝতে পারা যায়, আমাদের প্রাচ্য শিষ্টাচার পদ্ধতির প্রাণ এই 'ধন্যোঽহম্' শব্দটির মধ্যে নিহিত রয়েছে। আমি তৃষ্ণার্ত হওয়ায় তুমি পানীয় জলদানে আমার তৃষ্ণা নিবারণ করলে, আমি তৃপ্ত হলেম।

তখন কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে ধন্যবাদ দিব, না ধন্যোঽহম্ বলব? শাস্ত্রে আছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কত কথা—"ধন্যোঽহম্ কৃতকৃত্যোঽহম্ সফলং জীবনং মম" ইত্যাদি কথা শ্লোকাদিতে পেয়ে থাকি।

যাঁর কাছে 'ধন্যোঽহম্' বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হ'ল, তাঁর তখন কী বলে শিষ্টাচার প্রদর্শন করতে হবে? তিনি বলতে পারেন "অহমেব"! কী আপনি বলছেন, ধন্য হলেন? আসলে তো আমাকেই ধন্য করলেন, এতটুকু সেবার অধিকার দিয়ে! আমিই ধন্য হলেম।

প্রার্থনার শ্লোকে আছে—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥

তুমিই মাতা, পিতাও তুমিই, তুমিই বন্ধু, সখাও তুমিই; তুমিই বিদ্যা, তুমিই সম্পদ্—তুমিই আমার সব, হে মোর দেবদেব!

ঐভাবে বলা যায়, 'অহমেব'—আমাকেই ধন্য করলেন সেবাধিকার দিয়ে।

অতএব, আমাদের প্রাজ্ঞ শিষ্টাচারকে 'ধন্যোঽহম্ শিষ্টাচার পদ্ধতি' বলা অযৌক্তিক হবে না।

'তুফানের মাঝখানে নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি
টানিয়া রাখিতে হবে পাল
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যদ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১

(অষ্টমাধ্যায়ে ব্রহ্ম-অধ্যাত্মাদি ষট্পাদের (six dimensions) প্রতিপাদ্য সর্ব্বপথ-সমন্বিত ব্রজপথ, এবং সেই পথের গম্যস্থল সর্ব্বক্ষেত্র-সমন্বিত পুরুষোত্তম শ্রীক্ষেত্রের আনুপূর্ব্বিক পরিচয় ও রচনাকৌশলের খবর পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান নবম অধ্যায় বলিতেছেন। পরম্ স্থানম্ উপৈতিচাদ্যম্—এই আদ্য-স্থানের বিশিষ্ট পরিচয়, তাহার রচনাকৌশল ও তাহার প্রাপ্তির উপায় বিশেষভাবে বলাই এই অধ্যায়ের প্রয়োজনীয়তা) ইদম্ [এই পুরুষোত্তম দর্শন—যাহা পূর্ব্বা-ধ্যায়ে এই মাত্র বলা হইয়াছে এবং পরে এইমাত্র যাহা বিস্তারিত ভাবে বলা হইবে] তু [কিন্তু ; বর্ত্তমান ভজনাময় বলিয়াই ইহার অপূর্ব্বত্ব] তে [তোমাকে] গুহ্যতমম্ [সর্ব্বগুহ্যদের মধ্যে গুহ্য, গোপনীয় সব কিছুর মধ্যে গোপনীয় সর্ব্ব-গুহ্যতম ; 'সর্ব্বপ্রকর্ষে তমপ্'। ব্রহ্মজ্ঞান হইতেছে গুহ্যজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান গুহ্যতর এবং পুরুষোত্তম শ্রীভগবৎজ্ঞানই গুহ্যতম] প্রবক্ষ্যামি [প্রাণ খুলিয়া বলিব] অনসূয়বে [গুণে দোষের আবিষ্কার করা-রূপ অসূয়া রহিত প্রকৃতিতে দোষদৃষ্টি রহিত তোমাকে] জ্ঞানম্ [একত্বজ্ঞান] বিজ্ঞানসহিতং [বিজ্ঞানের সহিত ; বিচিত্র জ্ঞান, বিপরীত-জ্ঞান, বহুজ্ঞানই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞানের ক্ষেত্র হইতেছে পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়িয়া তোলা পচা গলা এই মাটীর জগৎ, দেব পথ-পিতৃ পথের সমন্বয়ে গন্তব্যস্থল ব্রহ্মলোক ও চন্দ্রলোকের সমন্বয়-রূপ এই ব্রজধাম। দেবযান পথ যোগায় আলো আদর্শ ; পিতৃযান পথ যোগায় সৃষ্টি-করার যোগ্যতা ; আদর্শ ও সৃষ্টির সমন্বয়ে গড়িয়া উঠে শ্রীক্ষেত্র, ব্রজলীলা ক্ষেত্র) ব্রজধামের সব-কিছুই জ্ঞান-বিজ্ঞান সহিত] যৎ [সবিজ্ঞান জ্ঞান] জ্ঞাত্বা [জানিয়া] মোক্ষ্যসে [মুক্ত হইবে] অশুভাৎ [অশুভ হইতে, বাস্তবতাহীন একান্ত আদর্শের অশুভ এবং আদর্শহীন একান্ত সৃষ্টির অশুভ

হইতে। পুরুষোত্তম দর্শন দুই দিকের সমন্বয় স্থাপন করিয়া একান্ত জ্ঞান ও একান্ত বিজ্ঞানের অশুভ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে]।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—অসূয়াশূন্য তোমাকে গুহ্যতম বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান বলিব, যাহা জানিয়া তুমি অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। ১।৯

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২

(এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান) রাজবিদ্যা [বিদ্যাসমূহের রাজা ; কেননা ইহার অখণ্ড জ্যোতির অংশ লইয়াই দেবযান ও পিতৃযানের জ্যোতি। কিম্বা রাজাদের বিদ্যা ; যত যতবার এই বিদ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, রাজাদের নিকটই প্রদত্ত হইয়াছে। গীতায় এই ভাগবত ধর্ম্ম বলা হইতেছে ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনের কাছে ; ভাগবত বলা হইয়াছে পরিক্ষিতের কাছে ; ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন নব-যোগেন্দ্রর প্রথম যোগেন্দ্র হরি মহারাজ নিমির সভায় ; নারদ বলিয়াছিলেন রাজা বসুদেবের কাছে] রাজগুহ্যং [গুহ্য সমূহের, গোপ্য সমূহের মধ্যে রাজা ; হৃদয় দিয়া যাহা দিতে হয়, হৃদয় দিয়া যাহা নিতে হয়, হৃদয় ছাড়া যাহার দেওয়া নেওয়ার আর কোন পথ নাই, তাহাই সকলের গোপনের চরম গোপন ; সেই পথই জীবনের গোপন পথ, সেই জ্ঞানই গোপন জ্ঞান] উত্তমম্ পবিত্রম্ [সব অপবিত্রকে পবিত্র করিয়া পুরুষোত্তম-জ্ঞান দিতে সক্ষম বলিয়াই ইহা উত্তম পবিত্র] ইদম্ [ইহা] প্রত্যক্ষাবগমং [প্রত্যক্ষের মত অবগম, প্রাপ্তি যাহার ; যিনি আদর্শের জমাট বাঁধা, ঘনরূপ ধারণ করিয়া জীবের সামনে প্রত্যক্ষ-অনুমান-উপমান-শব্দের দাবী সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের, সব সুখ দুঃখ, হাসি-খেলার গোচর হইলেন, তিনিই প্রত্যক্ষাবগম। প্রত্যক্ষ ও শব্দের দ্বন্দ্ব, ব্যবহারিক পারমার্থিকের ঝগড়া পুরুষোত্তমে মীমাংসিত। পুরুষোত্তম শব্দগম্য, প্রত্যক্ষগম্য ; তিনিই অব্যভিচারী প্রত্যক্ষ] ধর্ম্ম্যং ('অন্যত্র ধর্ম্মাৎ, অন্যত্রাধর্ম্মাৎ' অথচ আত্ম-ধর্ম্ম-অনাত্ম-ধর্ম্ম সমন্বিত, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বিত বলিয়া ধর্ম্মানপেত] সুসুখং কর্ত্তুম্ [করিতে আরাম, পুরুষোত্ত-মার্পিত সহজ বৃত্তি দ্বারা গম্য বলিয়াই তাঁহাকে আরামে পাওয়া যায় ; সহজ বৃত্তিকে চাপিয়া বুদ্ধির সহায়ে পাইবার চেষ্টায় জীবন রক্তারক্তিতে অপবিত্র হয়। জীবনে বুদ্ধির চেয়ে রক্তের টানই প্রবল। কয়জন সত্যবাদী পিতা আছেন, যাহারা সত্যের অনুরোধে হত্যাকারী পুত্রকে ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া দিতে পারেন ? রক্তের টানে যে-পুত্রের জন্য মানুষ অনেক কিছু দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে,

সেই পুত্র হইয়া যদি শ্রীভগবান আসেন, এই রক্তের টান যদি শ্রীভগবানে হয়, আদর্শ ও রক্তের টান যদি পুত্র-ভগবানে অর্পিত হয়, তবে তাহা 'কর্তুম্ সুসুখম্' হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নন্দ-যশোদা রক্তের টানে ভগবানের বর্ত্তমান ভজন পাইয়াছিলেন, মাতা দেবহূতি রক্তের টান দিয়াই কপিলের উপাসনা করিয়াছিলেন। রক্তের মূল্য ও আদর্শের মূল্য এক করিয়া যদি শ্রীভগবান আসেন, তবে সে টান সামলাইবে কে?] অব্যয়ম্ [কিছুরই ব্যয় হয় না যাহার প্রসাদে ; জীবনের সব-কিছুকে বিশ্বরূপের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া, ব্যয় করিয়া, কোন-কিছুর উপর চাপ না দিয়া, জীবনের কোন বৃত্তির ক্ষয়, ব্যয় না করিয়া অক্ষত, অখণ্ড, পূর্ণ। দেহপ্রাণ মনবুদ্ধি অহঙ্কারকে যে-জ্ঞান ভাগবতী তনুতে গড়িতে পারে, তাহাই 'অব্যয়']।

এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান রাজাদের বিদ্যা কিম্বা বিদ্যার রাজা, রাজগুহ্য, উত্তম পবিত্র, প্রত্যক্ষাবগম, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়, করিতে আরাম ও অব্যয়। ২।৯

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩

(কোন্ পুরুষ তোমার 'কর্ত্তুম্ সুসুখম্' এই ধর্ম্ম অবলম্বন না করিবে?) (যাহারা কিন্তু) অশ্রদ্দধানাঃ [আদর্শ ও রক্তের টান সমন্বিত, প্রত্যক্ষাবগম, 'কর্ত্তুম্ সুসুখম্' অব্যয়, উত্তম পবিত্র ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীনঃ অশুচি মলিন রক্তের টান ইহার সহিত সমন্বিত বলিয়া ভাবুকের দল এই ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন ; চার্ব্বাক দলও ইহার উপর শ্রদ্ধাহীন, কেননা ইহার মধ্যে আদর্শ জমিয়া উঠিয়াছে। উভয়দলই শ্রদ্ধাহীন] পুরুষাঃ [একান্ত প্রত্যক্ষবাদী, একান্ত আদর্শবাদী পুরুষ-গণ] ধর্ম্মস্য অস্য [আমি যে ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত, সেই ধর্ম্মের] হে পরন্তপ, অপ্রাপ্য [না পাইয়া] মাং [সমগ্র আমাকে] নিবর্ত্তন্তে [নিশ্চিন্তরূপে বর্ত্তমান থাকে, প্রত্যাবর্ত্তন করে] মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি [মৃত্যুময় সংসার পথে, আদর্শ-বাস্তবের নানা দর্শনে মরণেরও মরণ তাহারা প্রাপ্ত হয় ; য ইহ নানেব পশ্যতি স মৃত্যোঃ মৃত্যুমাপ্নোতি ; বাস্তবের স্পর্শ হারাইয়া একান্ত আদর্শও আনে ক্লৈব্য, আদর্শ হারাইয়া একান্ত বাস্তবও আনে মৃত্যু]।

হে পরন্তপ, এই ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন পুরুষগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসার পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ৩।৯

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪

(পুরুষোত্তম জ্ঞানের প্রশংসা পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে তাঁহার গুহ্যতম তত্ত্ব শুনিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া বলিতেছেন) ময়া [পুরুষোত্তম আমার দ্বারা] তত্তম্ [ব্যাপ্ত] ইদং সর্ব্বং জগৎ [এই সকল জগৎ] অব্যক্তমূর্ত্তিনা [অব্যক্ত মূর্ত্তি যাহার সেই আমার পরমাত্মমূর্ত্তি দ্বারা] মৎস্থানি [পরমাত্মা আমাতে স্থিত] সর্ব্বভূতানি [ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত, সর্ব্বভূত ; আমার পুরুষোত্তম আমির মাঝে স্থিত থাকিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে জগতের অনন্ত 'আমি গুলি', ইহাই আমার পরমাত্মস্বরূপ বিভূতি। (আমিই যখন তাহাদের পরম 'আমি' তখন সেই অনন্ত 'আমি' গুলির মাঝে আমার 'আমি' সম ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবে স্থিত—পাছে এইরূপ ভ্রম কাহারও উপস্থিত হয়, তাই বলিতেছেন] ন চ অহম্ [আমি কিন্তু নাই] তেষু [তোমাদের মধ্যে] অবস্থিত [ব্যাপ্যভাবে অবস্থিত ; সর্ব্বভূত আমার বুকের ধনরূপে আমার মধ্যে আছে, কিন্তু তাহারা তো আমাকে সংঘবদ্ধ হইয়া বুকে রাখিল না ; আমি তাহাদের পাইয়াছি, কিন্তু তাহারা তো আমায় পাইল না। একতরফা পাওয়ায় পাওয়ার তৃপ্তি আংশিক মিটিতে পারে মাত্র ; তাই তো আমার বুকভরা বেদনা ! সমব্যাপ্য ব্যাপকভাব অর্থাৎ উপাধিবিধুর সহজ সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠে ভজনের মাঝে—'যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'। ভজনের মধ্যে ভগবান থাকেন ভক্তে, ভক্ত থাকেন ভগবানে। কিন্তু সমব্যাপ্তিময় ভজনের স্তরে না পৌঁছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমের বিভূতির দিকই, ঐশ্বর্য্যের দিকই থাকে প্রধান ; সেই ঐশ্বর্য্যের স্তরে সর্ব্বভূত থাকে আত্মার আধারে, কিন্তু আত্মার আধার সর্ব্বভূত নয়। সর্ব্বভূত বিচ্ছিন্ন, পরস্পর বিপরীত স্বভাবযুক্ত হওয়ার ফলে সকলেরই একএকটী বিশিষ্ট 'অহম্' গড়িয়া উঠিয়াছে ; এই বিচ্ছিন্ন 'অহম্' গুলির অতীত নিশ্চয়ই পুরুষোত্তম-পরমাত্মার দ্রষ্টা 'অহম্'। এই বিচ্ছিন্ন অহম্‌গুলি ভক্তির সাধনায় সংঘবদ্ধ হইবার অবসর পায় ; এই অহম্‌গুলি সংঘবদ্ধ হইলে সেখানে আত্মা-সর্ব্বভূতের সামানাধিকরণ্য ফুটিয়া উঠে ; তাহাই ভগবানের ক্ষেত্র]।

অব্যক্তমূর্ত্তি পরমাত্মা-আমি দ্বারা এই সর্ব্ব জগৎ আমাতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ; সর্ব্বভূত আমাতে স্থিত, অথচ আমি তাহাতে স্থিত নই। ৪।৯

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫

(তোমাতে সর্ব্বভূত রহিয়াছে, তবে কি সর্ব্বভূতের সহিত তোমার সঙ্গ দোষ রহিয়া যাইতেছে না ? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—আমার সঙ্গে

সর্ব্বভূত পরকীয় সম্বন্ধে, বিশ্বকে মাঝখানে রাখিয়া অনন্ত ব্যবধানে ও উপাধি-বিধুর সহজ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ আছে বলিয়াই) ন চ মৎস্থানি ভূতানি [ভূত সমূহ আমাতে স্থিতও নয়] পশ্য [দেখ] মে [আমার] যোগং [ঘটনা] ঐশ্বরং [ঈশ্বর-পরমাত্মার ইহা ; ঐশ্বর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য জনিত যথার্থ ঘটনা শ্রুতিও বলিয়াছেন : 'অসঙ্গো ন হি সজ্জতে'] (আর একটি আশ্চর্য্য দেখ) ভূতভৃৎ [অসঙ্গ হইয়াও ভূতসমূহ ভরণ করি] (অথচ) নচ ভূতস্থঃ [পুর্ব্বোক্ত কৌশলে ভূতের মধ্যে স্থিত নহি] মম আত্মা [আমার অংশ-বিভূতি এই আত্মা] ভূতভাবনঃ [ভূত সমূহের সঙ্গে উপাধিবিধুর সহজ সম্বন্ধে অচ্যুত থাকিয়া তাহাদিগকে স্বরূপে পরিণত করিয়া তাহাদের স্ব-কেই উৎপাদন করে, বাড়াইয়া তোলে ; উৎপাদন করা, বাড়াইয়া তোলাই 'ভাবনা') ।

ভূত সমূহ আমাতে আছে ইহা নহে ; আমার ঐশ্বর ঘটন দেখ ; আমি ভূতভৃৎ হইয়াও ভূতস্থ নহি ; আমার আত্মা ভূতসমূহের উৎপাদক ও বর্দ্ধক । ৫।৯

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্ ।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬

(পুর্ব্বোক্ত শ্লোক দ্বয়ে যে ভাবে পরমার্থবস্তুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এখন সেই ভাবেই দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিয়া তাহাকে বিষদ ভাবে বুঝানো যাইতেছে) যথা [যেমন] আকাশস্থিতঃ [ছিদ্রদানকারী, অন্তর বাহির পুর্ণ করিয়া অবস্থিত আকাশে স্থিত] নিত্যং [সদা] বায়ুঃ [বায়ু] সর্ব্বত্রগঃ [সর্ব্বত্র গমন করে] মহান্ [মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট] তথা [সেইরূপ] সর্ব্বাণি ভূতানি [সর্ব্বভূত] মৎস্থানি [ছিদ্রদানকারী আকাশবৎ আমাতে স্থিত ; ভগবান্ প্রতি ভূতকে স্বয়ংমূল্য দিয়া, প্রত্যেকের অস্তিত্ব, জন্ম ও বৃদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্ব পরিণামের মধ্যে অনন্ত 'ছিদ্র' রাখিয়া, সেই ছিদ্র স্থলে নিজকে ও বিশ্বকে স্থাপন করিয়া, এবং নিজেই তাহাদিগকে 'কণ্ঠে গৃহীত্বা' বিশ্ব রাসচক্র রচনা করিয়া বিদ্যমান আছেন] ইতি [এইরূপে] উপধারয় [অবধারণ কর] ।

যেমন সর্ব্বত্র বিচরণশীল মহান বায়ু সর্ব্বদা আকাশে স্থিত, তেমনি সর্ব্বভূত আমাতে স্থিত রহিয়াছে—এইরূপ অবধারণ কর ।

(ক্রমশঃ)

সুখের খেয়াল

শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

সুখের খেয়াল দেখিস্ শুধু
মনরে তুই অবুঝ কাঁচা
চাস্ যদি সুখ পাবিরে দুখ্
সংসারের এ আজব ধাঁধা।
আলো এলেই আসবে আঁধার
কালো যে রয় সাথেই সাদার
সুখ হলে শেষ দুখের দেখা
সবই কেবল আগা পাছা।
জগৎটা যে চলছে কেবল
কান্না হাসির ভেলায় ভেসে
জীবন স্রোতে উঠছেরে ঢেউ
একের পরে একটা এসে।
বিশ্বপিতার কঠোর বিধান
ফাঁক নেইরে তিল পরিমাণ
ঘুরছে কালের চাকায় বাঁধা
অন্তহীন এই মরা বাঁচা!
সুখের যদি পিয়াস রাখিস্
দুখেরে নে না বরণ করে
মন্দভালর হিসাব নিকাশ
হৃদয় হতে যাকনা সরে।
গুরুর চরণ স্মরণ করি
ভাসিয়ে দে তোর জীবন তরী
জাগবে বিবেক, চেতন পাবি
ঘুচবে তুফান মাঝে নাচা।

শুচিতার বাস্তব রূপ

প্রতিভা রায়

করমাবাঈ নামে মাড়োয়ার দেশীয় ভক্তিমতী এক মহিলা ছিলেন। তাঁহার জগন্নাথ দেবের প্রতি ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। তিনি ছিলেন সহজ প্রাণধর্ম্মের উপাসিকা, ব্যবহারিক জগতের সকল শুচি অশুচির সংস্কার-মুক্ত। জগন্নাথদেবের প্রেমে প্লাবিত ছিল তাঁহার হৃদয়, মুক্ত বিহঙ্গের মত তাই তিনি জটিল কুটিল সংসারের সকল সংস্কারের উর্দ্ধে বিচরণ করিতেন।

বাঈজী প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বাল্যভোগ দেরী হইবে বলিয়া হাতমুখ না ধুইয়াই তাঁহার প্রিয়তম জগন্নাথদেবের জন্য খিচুরী রান্না করিতে লাগিয়া যাইতেন। নানা মসলা সহ বহু ঘৃত দ্বারা যত্নসহকারে অতি উপাদেয় করিয়া খিচুরী তৈরী করিতেন। বাঈজীর জীবনের ধ্যান জ্ঞান সব কিছু সাধনা ছিল প্রাতঃকালে প্রিয়তমকে খিচুরী ভোগ দেওয়ার ভিতর। শুচি অশুচির কথা ভাবিবার অবসর তাঁহার মনে ছিল না, প্রাণের স্বতঃসিদ্ধ উৎসারিত প্রেম লইয়া তিনি জগন্নাথদেবের সেবা করিতেন আর ভক্তবৎসল ভাবগ্রাহী জগন্নাথদেব বাঈজীর এই প্রেমে মাখা নিবেদিত খিচুরী পরম আনন্দে ভোজন করিতেন। এইরূপে প্রতিদিন নিভৃতে ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে মধুর প্রাণের লীলা আস্বাদিত হইতেছিল।

এমন সময় একদিন এক সাধু বাঈজীর ভবনে অতিথি রূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তিমতী করমাবাঈকে দেখিয়া তাঁহার সরলতা পূর্ণ সহজ সরল প্রাণের ব্যবহারে সাধু আনন্দিত হইলেন। কিন্তু শুচিতাহীন অবস্থায় অর্থাৎ হাতমুখ না ধুইয়া গৃহ এবং উনুন আদি পরিষ্কার না করিয়াই জগন্নাথদেবের ভোগ দেওয়া দেখিয়া মনে মনে দুঃখ বোধ করিলেন। তিনি করমাবাঈকে বলিলেন, দেবি, তোমার ব্যবহারে এবং তোমার ভক্তিতে আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম, কিন্তু তোমার একটী কার্য্য দেখিয়া ব্যথিত হইলাম। বাঈজী ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধুজী, বলুন আমার কোন্ ব্যবহারে আপনি ব্যথিত হইলেন? সাধুজী বলিলেন, দেবি! মনে বেদনা পাইও না। তোমার কল্যাণ কামনায় তোমার কার্য্যের

ক্রটী দেখাইতেছি। শ্রীভগবানকে যে তুমি সেবা কর তাহাতে আমি আনন্দিত; তবুও বলিতেছি ভগবানের সেবা অতি শুদ্ধাচারে করিতে হয় নতুবা তিনি তাহা গ্রহণ করেন না, বরং অশুচি অবস্থায় সেবা করিলে অপরাধ হয়। প্রাতঃকালে উঠিয়া গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া হাতমুখ প্রক্ষালন ও স্নান করিয়া তবে ঠাকুর ভোগ রান্না করিতে হয়। ইহা শুনিয়া বাঈজী বলিলেন, আমি অল্পবুদ্ধি নারী, এই সমস্ত বিধি নিয়মের কোন খবরই রাখি না, প্রাণ যাহা চায় তাহাই করি। আপনি দয়া করিয়া আজ এই উপদেশ দান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন, আপনার নির্দ্দেশ মত আমি এখন হইতে শুচিতা সহকারেই জগন্নাথদেবের ভোগ লাগাইব। অতিথি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকালে অতিথির নির্দ্দেশ মত বাঈজী শুচিতা পূর্ব্বক জগন্নাথদেবকে ভোগ লাগাইবার কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। শুচিতার আড়ম্বরে বেলা দুই প্রহর হইল। বাঈজী শুচিতার দুয়ারে প্রাণের বলি দিয়া অন্তর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণের প্রশ্ন শুচিতাই কি শ্রেষ্ঠ? না প্রাণের ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ? আমি তো এতদিন শুচি অশুচির দ্বন্দ্ব ভুলিয়া প্রাণের সহজ আনন্দে আমার প্রাণের দেবতার সেবা করিতাম, সে আনন্দ তো আজ আর পাইতেছি না, এত বেলায় দেবতার ভোগ? ঠাকুর যে আমার ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছেন, ইহা ভাবিতে যে প্রাণ আমার বেদনাতুর হইয়া উঠিতেছে। হায় জগন্নাথ! অতিথিরূপে কে আসিয়া আমার সংস্কার-মুক্ত প্রাণে প্রাণহীন শুচিতার বীজ বপন করিয়া গেল। আমার স্বতঃ প্রবাহিত প্রেমের পথে এই সংস্কারের পাথর আসিয়া কেন এমন করিয়া আমার গতিপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, আমি এখন কি করিব? এইরূপ অনুশোচনা করিতে করিতে ভক্তিমতী করমাবাঈ বেলা দুই প্রহরে জগন্নাথদেবকে ভোগ লাগাইলেন।

এদিকে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে দুই প্রহরের ভোগ সাজাইয়া সেবকগণ প্রভুর ভোগ নিবেদন করিয়া ভোজনের আহ্বান করিলেন। তখন জগন্নাথদেব দুইদিকের টানে পড়িলেন মহা ফাঁপরে। সবে মাত্র বাঈজীর আহ্বানে তাহার নিবেদিত খিচুরী খাইতে বসিয়াছেন, তাঁহার ভক্তি পূর্ব্বক নিবেদিত খিচুরী ফেলিয়া তো যাইতে পারেন না, তাড়াতাড়ি খিচুরী গ্রহণ করিয়া হাতে মুখে খিচুরী মাখিয়াই শ্রীমন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে মুখে

খিচুরী দেখিয়া সেবকগণ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু কোথায় খিচুরী খাইতে গিয়াছিলেন, এমন ভাগ্যবান কে ? জগন্নাথদেব সেবকগণের প্রতি আদেশ করিলেন আমি প্রতিদিনই করমাবাঈয়ের নিকট যাই, বাঈজী প্রণয় পুর্ব্বক অপুর্ব্ব স্বাদযুক্ত খিচুরী রান্না করিয়া অতি সমাদরে প্রত্যহ আমাকে ভোজন করাইয়া থাকে। আমি তাহাতে বড়ই তৃপ্তি পাই। কিন্তু এক সাধু আসিয়া বাঈজীকে কুযুক্তি দিয়া শুদ্ধাচারে ভোগ লাগাইবার নীতি শিখাইয়া গিয়াছে, শুচিতা সহকারে ভোগ দিতে যাইয়া বাঈজী আজ বেলা দুই প্রহর করিয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্য আজ আমাকে দুই স্থানে ছুটাছুটি করিয়া হয়রাণ হইতে হইল। তোমরা যাইয়া বাঈজীকে জানাও অত বেলায় ভোগ দিলে আমার বড় কষ্ট হয়, তাঁহার ঐ প্রকারের প্রাণহীন শুদ্ধাচারের কোনও প্রয়োজন নাই। পুর্ব্বে যে প্রকারে ভোগ লাগাইত তাহাতেই আমি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতাম। বাঈজী যে প্রীতির অধিকারী হইয়াছে তাহা জগতে দুর্লভ, তাহার শুচিতার কোন প্রয়োজন করে না, প্রীতি কোন বিধির অধীন নয়।

সেবকগণ যাইয়া বাঈজীকে জগন্নাথদেবের এই আদেশ জানাইলেন। বাঈজী তাঁহার প্রাণের দেবতার বাণী শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সে আজ অন্তর দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল। প্রাণের ঠাকুর বাঈজীর প্রাণের বেদনা বুঝিতে পারিয়া তাহার এই বাহির হইতে চাপানো কুসংস্কার হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন, প্রাণের জয় হইল, রাগাত্মিকা ভক্তির স্রোতে শুদ্ধাচার ভাসিয়া গেল। আজও সেই ভক্তিমতী করমাবাঈয়ের নামে সোণার থালায় করিয়া জগন্নাথ দেবের খিচুরী ভোগ হইয়া থাকে।

এই ছোট্ট ঘটনাটীর ভিতর দিয়া আমাদের নিকট কোন্ কথা প্রকাশিত হইল তাহাই ভাবিবার বিষয়। যে শুচিতা ভগবৎ সেবায় বাধা দান করে তাহাই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভগবৎ সেবায় যাহা অনুকূল তাহা গ্রহণ ও যাহা প্রতিকূল তাহা বর্জ্জন করিবার কথা শাস্ত্রেও লিখিত আছে। শুচি অশুচির বিচার হইবে ভগবৎ সেবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। প্রাণহীন শুদ্ধাচার যাহা বর্ত্তমান জগতে সমাজের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যাহার ফলে মানুষের জীবন শুষ্ক ও শূন্যতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহা শুচিতা নহে। যে কুসংস্কারের বোঝা মানুষের সহজ চলমান জীবনের কাছে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া তাহার জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দেয়, তাহাকে শুচিতা বলা যায় না। এই

কুসংস্কারই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রভৃতি অন্যান্য জীবনের আন্দোলনকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। ঠাকুর পুজার ব্যর্থ আড়ম্বরের অভাব নাই, নাই শুধু মন্দিরে মন্দিরের দেবতা। জগন্নাথে যাহার প্রেম হইয়াছে তাহার হৃদয়ই গঙ্গাতুল্য সুপবিত্র। জগৎ এবং নাথ এই দুই মিলিয়াই জগন্নাথ। জড় জগৎ এবং আদর্শ নাথ, এই জড়বাদ ও আদর্শ বাদের সমন্বয় ক্ষেত্র হইতেছে প্রাণ। প্রাণের স্বরূপ ভালবাসা। সেই সমগ্রের দেবতা প্রাণপুরুষ জগন্নাথদেবকে যে ভালবাসিল, সেই তো শুচির প্লাবনে ভাসিয়া গেল, অশুচি আর থাকিল কোথায়? প্রাণের ক্ষুদ্রতাই অশুচি, প্রাণের ব্যাপকতাই শুচিতা। আজ বিশ্ব জোড়া এই অশুচি, এই সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করিতে হইলে প্রাণের সাধনা গ্রহণ করিতে হইবে, প্রাণধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রাণের শরণাগতি ছাড়া, প্রাণ-প্লাবনে বিশ্বের এই অশুচিতাকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া হৃদয় মন্দিরে বিশ্বেশ্বরের আসন স্থাপন ছাড়া আর অন্য পথ নাই। প্রাণহীন শুচিতাই অশুচিতায় পরিণত হয়। একমাত্র প্রাণই সকল অশুচিতাকে শুচিতায় গড়িয়া তুলিতে পারে; তখন প্রাণের মূল্যেই শুচিতার মূল্য হয়। প্রাণের জয়ই সর্ব্বত্র।

'কর্ম্মসু অসঙ্গমঃ শৌচম্'

—শ্রীউদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণ

—কর্ম্মসমূহে জড়াইয়া না পড়াই শুচিতা।—

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালজন্ম-শতবার্ষিকী

স্মৃতিপূজার প্রস্তুতি

(৯)

শ্রীনিত্যগোপালজন্মের ইতিবৃত্ত

জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥

—হে অর্জ্জুন, আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগও করেন না, পুনর্জ্জন্মও প্রাপ্ত হন না, আমাকেই প্রাপ্ত হন। (কিন্তু প্রচলিত ভাষ্য টীকায় দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে—'দেহত্যাগ করার পর পুনর্জ্জন্ম সে লাভ করে না'। এই ব্যাখ্যা যুক্তিসহ নয়। দেহত্যাগ করার পর পুনর্জ্জন্ম না হওয়া রূপ ফল একান্ত অদ্বৈত সাধনায়ও মিলিতে পারে। তবে আর শ্রীভগবানের জন্ম-কর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞানের 'অপূর্ব্বত্ব' রহিল কোথায়? ব্যাকরণের দিক হইতেও দেখা যায় যে আমরা যখন বলি যে, 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি' তখন ইহার অর্থ কি এই যে, বৃন্দাবন পরিত্যাগ করার পর এক পা-ও অগ্রসর হই না? ইহার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, বৃন্দাবনও পরিত্যাগ করি না, এক পা'-ও যাই না।)

পুরুষোত্তম-জন্ম ও পুরুষোত্তম-লীলাকর্ম্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, তাঁহার দেহত্যাগ হয় না। কাজেই পুনর্জ্জন্মও হয় না। তাঁহার জীবনে আত্মা-দেহ গলিয়া গিয়া এক পুরুষোত্তম-জীবনে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আত্মা নিত্য সত্য, দেহও নিত্য সত্য, যেমন স্বয়ং ভগবান ঐতিহাসিক পুরুষোত্তমের। বর্ত্তমান যুগ আত্মার অমরত্বে যেমন বিশ্বাসী, তেমনি সে একটী দৈহিক অমরত্বের (physical immortality) খোঁজও পাইয়াছে। ইহাই ভক্তের ভাগবতী তনু—'ভক্তের দেহ চিদানন্দময়।' আত্মস্বরূপের মত ভক্ত ও ভগবানের দেহেরও একটী স্বতঃসিদ্ধ নিত্যতা আছে, যাহা পাইবার জন্য জীব অনন্তকাল ধরিয়া বিশ্বদেহ হইতে মাধুকরী করিয়া 'ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য' এই ভাগবতী তনুর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। 'ন তস্য রোগো ন জরো ন মৃত্যুঃ।'

এই ভাগবতী তনুই জীবের স্বতঃসিদ্ধ দেহ। ইহাই শ্রীনিত্যগোপাল মতে নিত্যাকার, চিদাকার। পুরুষোত্তম নিত্যাকার, চিদাকার। জীবও স্বরূপতঃ নিত্যাকার, চিদাকার ; সকল বিশ্ব মন্থন করিয়া তাহাকে এই স্বরূপসিদ্ধ দেহের আস্বাদন করিতে হইবে।

আজ আমরা শ্রীনিত্যগোপালজন্ম-লীলা 'তত্ত্বতঃ' জানিবার প্রয়াস পাইব, যাহা জানিলে আমরা অনন্ত জন্মের ভিতর নিত্যগোপাল-জন্মে জন্ম লাভ করিব, জন্মের সত্য বাস্তব রস আস্বাদন করিব, জন্ম-ভয় হইতে মুক্ত হইব, তাঁহার দিব্য জন্মে জন্ম লাভ করিয়া তাঁহাকে সকল দেহ প্রাণ মনে পাইয়া 'মাম্ এতি' বাক্য সার্থক করিব।

তত্ত্বদৃষ্টিতে শ্রীনিত্যগোপাল নিত্যানিত্য সমন্বয় মূর্ত্তি, আত্মানাত্ম-সমন্বয় মূর্ত্তি, জ্ঞানাজ্ঞান-সমন্বয় মূর্ত্তি, চৈতন্যাচৈতন্য-সমন্বয়মূর্ত্তি, সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মবস্তু। প্রকাশ-ক্ষেত্র তাঁহার বিশ্বের প্রজ্ঞাচুম্বিত প্রাণস্তরে। তিনি কোনও বিশেষ মতবাদের নন, বিশেষ কোন জাতির নন। তাঁহার জীবনে সর্ব্ব দর্শন, সর্ব্ব মতবাদ, সর্ব্ব গুণ, সর্ব্ব কর্ম্ম সর্ব্ব জাতি হাত ধরাধরি করিয়া অন্যোন্যমিলনের ভিতর দিয়া এক রাস চক্র গড়িয়া তুলিবে। তাই তিনি শ্রীমুখে বলিতেন, I am a cosmopolitan'—'আমি বিশ্ব-নাগরিক'। তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে নরত্ব ও নারায়ণত্বের সমন্বয়ে ; তিনি তাই নর-নারায়ণ। নরের দাবী ও নারায়ণের দাবীর স্বয়ং-মূল্য দিয়া পরস্পরকে পরস্পরের মাঝে সৃষ্টি করিবার 'যোগ' (কৌশল) তিনি শিখাইয়া গিয়াছেন ; তাই তিনি পরবর্ত্তী জীবনে 'যোগাচার্য্য'। তিনি সর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত ; তাই তিনি চতুর্থ আশ্রমে 'অবধূত'। তিনিই সফল করিয়াছেন মনীষী Whitehead-এর বাণী—'It is as true to say that God transcends the world as that the world transcends God. It is as true to say that God is immanent in the world as that the world is immanent in God.'

কিন্তু শ্রীনিত্যগোপালকে এই তত্ত্ব দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিতে হইলে পুরুষোত্তমতত্ত্ব কোন্ 'ইতিহাসের' ধারা ধরিয়া ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া শ্রীনিত্য-গোপাল রূপে আসিয়া ঘন হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। যে-ধর্ম্ম ইতিহাসকে স্বীকার না করিয়া মানুষের কাছে আসে, তাহা মানুষের বাস্তব জীবনকে তৃপ্ত করিতে পারে না। Religion without history is a

misnomer. মানুষ যে-ইতিহাসের ধারা বুকে লইয়া জন্মিতেছে, বাড়িতেছে, তাহার পিছনে সামনে রহিয়াছে বিরাট বিশ্ব ও তাহার বিরাট ইতিহাস। আমার নারায়ণ যদি আমার ইতিহাস; আমার আবেষ্টন ও আমার কুসংস্কারময় জীবনের সামনে আমারই ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে ধরা না দেন, তেমন নারায়ণ যত বড়ই হউক না কেন, ঐতিহাসিক মানুষের তিনি কেউ নন। ভগবান পদের অর্থ তো এই যে, তিনি কালকে গায়ে মাখিয়া যুগের উপযোগী আদর্শ লইয়া যুগের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন। তবে না তিনি হইবেন 'আমার'? 'আমি তাঁহার' ইহা সত্যের এক দিক। যতদিন 'তিনি আমারই' না হইতেছেন, ততদিন 'আমি তাঁহার' হওয়াটা হয় দাসত্ব। তিনি আমাকে দাস করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। ভগবান যখন ইতিহাসের বুকে ঐতিহাসিক সকল সমস্যার সমাধান-মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়ান, তখনই তাঁহার বিশেষণ দেওয়া হয় 'পুরুষোত্তম'।

ইতিহাসের বুকে আমরা পুরুষোত্তমকে পাই সর্ব্বরসকদম্বমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণরূপে, যিনি সর্ব্বপ্রথমে নিজেকে পুরুষোত্তম বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের ঠাকুর নারায়ণের শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামরূপের ক্রমবিবর্ত্তনের চরম ও পরম ফল হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। বৈকুণ্ঠের ঠাকুর প্রথমে হইলেন নৃসিংহ, পরে শ্রীরাম, সর্ব্বশেষ রূপে হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। সকল কুণ্ঠার অতীত বৈকুণ্ঠই আজ সকল কুণ্ঠার আবাস এই ধরার ধূলিতে ঘন। অনাত্মা-প্রকৃতির অতীত নারায়ণ আজ বিশ্বপ্রকৃতির শ্রীচরণতলে প্রকৃতি-অতীত্বকে আস্বাদন করিবার জন্য 'দেহি মে পাদপল্লবমুদারম্' বলিয়া শরণাগত। তিনিই লোকে বেদে প্রথিত পুরুষোত্তম। প্রকৃতির অতীত ব্রহ্ম একান্ত-অতীত থাকার ফলস্বরূপ 'স্মর-গরল' খণ্ডন করিবার জন্যই বলিলেন, 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি মে পাদপল্লবমুদারম্।' নিরাকার নির্গুণ আজ পুরুষোত্তম জীবনে সাকার সগুণের চরণ তলে, রাজা প্রজার চরণ তলে। অতীত থাকার কৌলীন্য আজ যখন বিশ্বেশ্বরেরই নাই, তখন তাহা রাজারও থাকিবেনা, ব্রাহ্মণেরও থাকিবেনা, সন্ন্যাসীরও টিকিবেনা, ধনিকেরও টিকিবেনা, পণ্ডিতেরও থাকিবেনা, কুলীনেরও টিকিবেনা।

এই তত্ত্বকে সর্ব্বক্ষেত্রে রূপায়িত করিবার দৃষ্টান্ত স্থাপন-লালসাতেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামের পরা প্রকৃতির অনন্তরূপিনী ব্রজগোপীজনকে পরিধিতে রাখিয়া, প্রত্যেক অংশের স্বয়ংপূর্ণত্ব বিধান করিয়া প্রতি দুইটী গোপীর

মাঝখানে নিজে দাঁড়াইয়া, প্রতি দুইটীকে অন্যোন্যবদ্ধবাহু করিয়া এবং নিজে তাহাদের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া, কণ্ঠে কণ্ঠে যোগ বিধান করিয়া রাসচক্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি প্রতিটী অংশের অতীত থাকিয়া প্রতিটী অংশকে সার্থক আস্বাদন করিতেছেন, এবং এই আস্বাদনকে জমাইয়া তুলিবার জন্য আবার তাহাদিগকে স্ব স্ব মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ও তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের মাঝে ঘনতর আত্মাস্বাদন করিতেছেন। এই ঘনতর আস্বাদন আরও ঘনতম হইয়া উঠিতেছে, তখনই, যখন তিনি সঙ্ঘের কাছে ধরা দিয়াও অধর হইয়া রহিতেছেন অনন্ত মিলনের মাঝে অনন্ত বিরহের সামঞ্জস্য বিধান করিতেছেন। ইতিহাসের বুকে বিশ্বসংগঠনের এই মূল রহস্য সর্ব্বপ্রথম আস্বাদিত হইয়াছে ব্রজধামে। আজ তাহাই রূপবান হইতে চাহিতেছে 'U. N. O.' প্রভৃতির মাধ্যমে। কিন্তু অতীত-অনুগের (transcendence-immanence) সমন্বয় না বুঝিলে বিশ্বসঙ্ঘ রচনা কল্পনা মাত্র। ইতিহাসের ক্ষেত্রে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বাতীত, সর্ব্বানুগ; বিশ্বসংগঠন সার্থক করিতে হইলে তাঁহার জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিতেই হইবে। এই পুরুষোত্তম-দর্শন ও সংগঠন-কৌশলকে বিশ্বের বুকে দার্শনিক ভাবে প্রচার করিবার গূঢ় প্রয়োজন লইয়াই শ্রীনিত্যগোপাল আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যগোপালের মধ্যে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ পাইব। শ্রীকৃষ্ণলীলাকে আস্বাদন করিতে হইলে আধুনিক যুগের আইনষ্টিনের 'Law of Relativity', ফ্রয়েডের 'Libido', প্লাঙ্কের 'Quantum theory', হাইসেনবার্গের 'Principle of Indeterminism' এবং মার্ক্সের 'Materialistic interpretation of history' বুঝিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদের সারমর্ম্ম দিব্য দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করিয়া দিব্যজীবন দ্বারা আস্বাদন করিয়া পুরুষোত্তম জীবনকে ধরার মাটীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আসিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর ইহার পথ সুগম করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতেছেন:

> 'পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
> কৌমার পৌগণ্ড আর কিশোর অতি মর্ম্ম॥
> কৈশোর-বয়স, কাম, জগৎ সকল।
> রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল॥'

'হরিরেষ ন চেদবতরিষ্য-
ন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টিঃ,
মর্করাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র॥ বিদগ্ধমাধব

—হে মধুরনয়না বৃন্দে, যদি এই কৃষ্ণ ও রাধা মথুরায় অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে এই বিশ্বসৃষ্টি, বিশেষতঃ কামের সৃষ্টি বিফল হইয়া যাইত।'

সত্যই রাধাকৃষ্ণলীলা বিশ্বের বুকে প্রবর্ত্তিত না হইলে কেন পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, নরনারী, দেবদেবী কামের আকর্ষণে এমন উন্মাদের মত ছুটিয়াছে, এই উন্মাদনার মূলে ভগবদাস্বাদন নিহিত রহিয়াছে কি না, ইহার কোনও পারমার্থিক মূল্য আছে কি না, তাহা কি কেহ উপলব্ধি করিতে পারিত? মদনের যে একটী ভাগবত রূপ রহিয়াছে, এবং জীবজগতের মনস্তরে স্বরূপগত এই ভাগবত কাম অন্তর্নিহিত আছে বলিয়াই যে সে-ইহাকে আস্বাদন করিবার জন্য বিশ্বময় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত এই নবীন মদনের খোঁজ না পাওয়া পর্য্যন্ত যে কামের পরমার্থ রূপ উদ্ভাসিত হইবে না, এবং এই পরমার্থ রূপ আস্বাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাকে নিগৃহীত করিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করিলেও যে সে নিগৃহীত হইবে না, কালের সুযোগ পাইলেই যে সে আবার অধিকতর প্রতিহিংসা লইয়া সাধককে বিব্রত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবে, ইহা আজ বিশ্বের সামনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। মদনের পরমার্থ রূপ না বুঝিবার ও তাহাকে চাপা দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ব আজ মদনানলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তাহার সূচনা আজ বিশ্বময় সর্ব্বত্র। এই মদনানলকে নির্ব্বাপিত করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়া ছিল শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হওয়ার। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া আসিয়াছিলেন যুগযুগান্তেব নিগৃহীত (repressed) কামকে বিশ্বসভ্যতার উপযোগীরূপে প্রবর্ত্তন করিয়া বিশ্বকে সুস্থ করিবার এবং শোষণহীন বিশ্বসঙ্ঘ রচনা করিবার গুরু দায়িত্ব লইয়া।

কিন্তু এই গুরুদায়িত্ব পালন করিবার পথে মনস্তত্ত্বের যে যে দাবী পুরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধাকে পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া সম্ভবপর হয় এবং সেই পাওয়ার ভিতর কোন কামগন্ধ না থাকে, এবং যাহার অনুসরণ করিয়া বিশ্বের নর-নারীবৃন্দ নির্ম্মল কামগন্ধশূন্য মিলন-রস আস্বাদন করিতে পারে, সেই সেই দাবী পুরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তিনটী বাঞ্ছা করিলেন।

'এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস-নির্য্যাস চর্ব্বণ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন॥
তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিবে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥

এতদিনকার প্রচলিত শাস্ত্রসিদ্ধান্তে 'চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব' ছিলেন absolute, তাহার মধ্যে এমন কিছু থাকিতেই পারে না, যাহাকে রাধার প্রেম উন্মত্ত করিতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এমনই এক পূর্ণ-ব্রহ্ম, যাহার ভিতর রাধাপ্রেমে উন্মত্ততা সম্ভব হয়,' প্রেমবিহ্বলতা জাগিয়া উঠে, রাধাপ্রেমে নানা নৃত্য সম্ভব হয়। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতার এই নবরূপ আস্বাদন করিবার বাঞ্ছা করিলেন :—

'সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥

*   *   *

কভু যদি হই এই প্রেমার আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥'

এতদিনকার একান্ত নিস্তরঙ্গ, অপরিণামী, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মবস্তুকে যিনি তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিতেছেন, অনন্ত পরিণামের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন, তাঁহার মধ্যে গুণ-ক্রিয়ার স্পন্দন ফুটাইয়া তুলিতেছেন, সেই পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মময়ী শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা বুঝিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জীবনে **'প্রথম বাঞ্ছা'** উদ্গত হইল। এতদিন ব্রহ্ম নিজের স্বরূপে স্থিত থাকিয়া 'মায়াকে' বুঝিয়াছেন, আজ ব্রহ্ম মায়া-স্বরূপ, রাধা-স্বরূপ হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে মায়ার মানে (measure) মায়াকে বুঝিতে চাহিতেছেন, নিজ অক্ষরত্বের ঊর্দ্ধে উঠিয়া মায়া-ভাবদ্যুতি-সুবলিত হইয়া মায়া মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য লালসাবান হইলেন।

'এই এক গুণ আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার

অদ্ভুত অনন্তপুর্ণ মোর মাধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥

*　　　*　　　*

মন্মাধুর্য্য রাধার দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥

*　　　*　　　*

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥

ব্রহ্মবস্তু এতদিন নিজের কাছে নিজে ছিলেন পুর্ণ, অনন্ত। কিন্তু ব্রহ্মের এই আত্ম-উপলব্ধি তো একান্ত subjective; যতদিন ব্রহ্ম রাধা-স্বরূপ না হইতেছেন, ততদিন ব্রহ্মের কোনও objectivity (বাস্তবিকতা) সিদ্ধ হইতেছে না, ততদিন ব্রহ্মকে মায়া ধরিতে পারেন না, এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মায়া আর থাকেন না। কিন্তু পুরুষোত্তম দর্শনে ব্রহ্ম ও মায়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও কেহ কাহাকেও ফুরাইয়া ফেলিতে পারিতেছেন না। 'ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি।' এতদিনকার মায়া ব্রহ্মের কাছে হারিয়াই আছেন, কাজেই ব্রহ্ম ছিলেন অনন্ত, আর প্রকৃতি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানে বিনাশশীলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণজীবনে ব্রহ্মের মত মায়াও অনাদি অনন্ত। শ্রীকৃষ্ণ নিজে নিজ নিত্য নব নব ব্রহ্ম-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য রাধাস্বরূপ হইলেন। এই ভাবে তিনি **'দ্বিতীয় বাঞ্ছা'** পুরণ করিলেন।

'এই দ্বিতীয় হেতু করিল বিচরণ।
তৃতীয় হেতুর এতে শুণই লক্ষণ॥

*　　　*　　　*

গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পুর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণে তারে ভজে তৈছে॥

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহার প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখবচনে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছাপূর্ণ এই গোপীপ্রেমের কাছে 'ন পারয়েঽহম্' বাক্যদ্বারা ঋণ স্বীকার করিলেন। ইহারই ফলস্বরূপ গোপীগণ আত্মবান্ হইলেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিরই ঘন-আস্বাদনরূপ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-রস আস্বাদন করিলেন।

'তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো তো কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগসাধন ॥

আজ গোপী নিজ দেহের মার্জ্জন ও ভূষণ করিয়া কৃষ্ণদেহেরই সেবা করিতেছেন। গোপী-সাধনায় জড় আজ চৈতন্যরসবিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করিল, জড় ও অজড় গলিয়া এক হইল, আত্মারই ঘন-আস্বাদনরূপে দেহ গৌরব লাভ করিল।

'গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥

পুরুষ-প্রকৃতির, ব্রহ্ম-মায়ার পারস্পরিক স্বয়ংমূল্য স্বীকার করার ফলে কেমন করিয়া সেখানে কাম-দোষ স্পর্শ করিতে পারেনা, এবং বিশ্বের নরনারী কোন্ কৌশলে কামদোষ-নির্ম্মুক্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধ আস্বাদন করিতে পারে, তাহারই দৃষ্টান্ত হইতেছেন বৃন্দাবনে গোপীকৃষ্ণ।

'আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥
* * *
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা ক্রোধে ॥'

কৃষ্ণসেবা-জনিত আনন্দ যদি দেহ-যন্ত্রকে এমন বিহ্বল করিয়া দেয় যে তাহাতে কৃষ্ণসেবাই বাধিত হয়, তবে সে আনন্দও ভক্ত চাহেন না। ভক্ত সেরূপ আস্বাদনকে সেবা-পরিপন্থী বলিয়াই মনে করেন। প্রেমের 'ভাবুকতা'

গোপীপ্রেমে নাই। প্রেম এইবার বাস্তবের দেশে বাস্তব সেবা-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

'সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥
সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নামপ্রেম কৈল পরচার॥'

ব্রজের প্রেম এইবার ধরার ধূলকে স্পর্শ করিল, শ্রীকৃষ্ণের **'তৃতীয় বাঞ্ছা'** পূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন ব্রজের নির্ম্মল প্রেমকে ধরার মাটীতে ছড়াইয়া তাহাকে বৃন্দাবনে গড়িয়া তুলিবার জন্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একাধারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণ উপরি উক্ত 'তিন বাঞ্ছা' পূরণের জন্য রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত হইয়া গৌর হইলেন। ব্রজে যতই রাধার স্বমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হউক, তবুও শ্রীকৃষ্ণ নিজের দৃষ্টিকোণেই সেখানে নিজকে দেখিতেন, রাধাকে দেখিতেন, এবং সেই দৃষ্টির ছাঁচে এই জগৎকেও দেখিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার পুর্ণ স্বরূপের পুর্ণ আস্বাদন না মিলিবার জন্য এইবার গৌররূপে শ্রীরাধার দৃষ্টিকোণে নিজকে দেখিলেন, রাধাকে দেখিলেন এবং বিশ্বকে দেখিলেন। Sree Krishna assimilated in Sree Radha is Sree Gauranga. Sree Krishna explained in terms of Sree Radha is Sree Gauranga. শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: 'চৈতন্য অবতারে রাধাকৃষ্ণ একীভূত হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাতে প্রকৃতি রাধার স্বভাব ও পুরুষ কৃষ্ণের স্বভাব ছিল। সেইজন্য তিনি পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই ছিলেন'।—নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা পৃঃ ১৯৬। এই মৈথুনের (unification) ভিতর দিয়া এই বিশ্ব আজ বৃন্দাবনে গড়িয়া উঠিবে। আজ ধরার ধূলি হইবে ব্রজধূলি, ধরার মানুষ হইবে ব্রজমানুষ।

'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতো কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥'

—শ্রীমতী রাধিকার প্রেমমহিমা কিরূপ, শ্রীমতী প্রেম সহকারে যাহা আস্বাদন করেন, মদীয় সেই অদ্ভুত মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং মদীয় অনুভব বশতঃ শ্রীমতী যে আনন্দ অনুভব করেন, সেই আনন্দই বা কি প্রকার, এই

তিনটী লোভের বশবর্ত্তী হইয়া শচীগর্ভরূপ সমুদ্রে রাধাভাবাঢ্য হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র সার্থক জন্ম লাভ করিলেন।'

রাধাভাবাঢ্য হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবের প্রতি চোর-চম্পটের মত স্পৃহাবশতঃই গৌর হইলেন। সমন্বয়তত্ত্ব প্রচারে সমুজ্জ্বল ব্রহ্মসূত্র এই সর্ব্বগুহ্যতম রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া বলিলেন,

'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাভ্যাম্‌॥'

'অভিধ্যোপদেশাচ্চ॥'

—'ব্রহ্ম প্রকৃতিও হইলেন ; কেননা এই প্রকৃতি-হওয়ার পিছনে প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুপরোধ রহিয়াছে, পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞার উপদেশ থাকার জন্যও ব্রহ্ম প্রকৃতি হইলেন।' 'অভিধ্যা' পদের অর্থ শুধুই ধ্যান নয়, যাহা এতদিনকার ভাষ্যকারগণ দিয়াছেন। চোর-লম্পটের যেমন পরের বিষয়ে স্পৃহা ও ধ্যান, সেইরূপ ধ্যানকেই অমরকোষ 'অভিধ্যা' বলিয়াছে। 'অভিধ্যা পরস্ববিষয়ে স্পৃহা'—অমরকোষ। ইহার পাঠান্তর হইতেছে 'পরস্য বিষয়ে স্পৃহা।' ইহার টীকায় টীকাকার ভানুজী দীক্ষিত লিখিয়াছেন—'চোর লম্পটের মত স্পৃহাই অভিধ্যা। ঠিক এই স্পৃহার কথাই 'স্তবমালা'য় বর্ণিত হইয়াছে :—

'অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্‌
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিঃ অতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥'

—'যে কৌতুকী কৃষ্ণ কোন প্রণয়িজনবৃন্দের অপার অনির্ব্বচনীয় রসসমূহ অপহরণ পুর্ব্বক উপভোগ বাসনায় নিজ রূপ আবরণ করিয়া রাধার কান্তি প্রকট করিলেন, চৈতন্যাকৃতি সেই দেবতা আমাদিগকে অধিকতর কৃপা করুন।'

শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধার সম্বন্ধ পরকীয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীনভর্তৃকা রাধার ভাব চুরি করিবার জন্য লালসাবান হইলেন। রাধা-কৃষ্ণের সম্বন্ধ 'স্বকীয়' হইলে এই অপহরণের প্রসঙ্গই উঠিত না। কেননা প্রকৃতিকে ভোগ করা পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ অধিকার। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ বিশ্বের আদি কারণ পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির সম্বন্ধ যে 'পরকীয়', তাহার বীজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছেন। 'মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।

যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।' ব্রহ্ম-মায়ার সম্বন্ধ স্বকীয় নয়, উহা নিছক পরকীয় বলিয়াই আজিকার দর্শনে ব্রহ্ম-মায়ার সমন্বয়ের প্রশ্ন উঠিয়াছে। স্বতন্ত্র পুরুষ ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির সম্বন্ধের উপরই বিশ্বসৃষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধা পরকীয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার স্মরগরলখণ্ডন পাদপল্লব নিজ শিরোভূষণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সম্বন্ধ স্বকীয় হইলে শ্রীরাধার কোনও স্বাধীন শ্রীকৃষ্ণ-নিরপেক্ষ সত্তার সম্ভাবনা থাকিত না, পা ধরার কোনও প্রয়োজন বা প্রসঙ্গই উঠিত না। শ্রীকৃষ্ণও কেবল, শ্রীরাধাও কেবল। বিশ্ব এই কেবল কেবলার অন্যোন্যমৈথুনের ফলেই উদ্ভূত হইয়াছে। তাহারা দুইই independent এবং interdependent. প্রকৃতি পুরুষের এই পরকীয় রসলীলা প্রচার করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বিতীয় দার্শনিক ধন্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একাধারে রাধা-কৃষ্ণ, ব্রহ্ম-মায়া সমন্বয় মূর্তি বলিয়াই তিনি 'ভুবি বৃন্দাবন' স্থাপন করিবার জন্য উন্মাদ। তিনি মায়াবাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বলিয়াছিলেন :

'মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী। ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য বলে নিরবধি ॥'

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

যাহারা প্রকৃতির অনন্তত্ব স্বীকার না করিয়া একান্ত ব্রহ্ম, একান্ত আত্মা বা একান্ত চৈতন্যকে অনাদি ও অনন্ত বলেন, যাহারা বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে বা ভগবদ্ভক্তি লাভ হইলে প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ নিঃশেষে মুছিয়া যায়, তাঁহারাই মায়াবাদী এবং তাঁহারা সত্যই কৃষ্ণ-অপরাধী। কেননা কৃষ্ণ যে নিজে ব্রহ্ম-মায়া-সমন্বিত, আত্মানাত্ম সমন্বিত, চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বিত। যিনি আসিলেন শ্রীগৌরসুন্দর রূপে পরস্পরবিরুদ্ধ ব্রহ্ম-মায়া সমন্বয়ঘন, রাধা-কৃষ্ণ সমন্বয়ঘন সমগ্র জীবন লইয়া, তিনি কি প্রকৃতির ও-পারের ব্রহ্মকে বা ভগবানকে একান্তভাবে স্থাপন করিতে পারেন? পারেন না। কিন্তু তাহাই তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত করিতে হইয়াছে। তিনি 'সন্ন্যাসী' হইয়া 'মায়াবাদী'র দর্শনকেই প্রকারান্তরে স্বীকার করিলেন। তিনি 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' বলিয়া বারম্বার ইহার বিরুদ্ধে নিজের সম্বন্ধে কতবার বিরূপ মন্তব্য স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়াছেন। 'অতএব মুঞি করিমু সন্ন্যাস।' তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়াই তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইতে হইয়াছিল; তাই বলিলেন 'অতএব'। তাঁহার সন্ন্যাস 'অতএব' (therefore)-এর সন্ন্যাস। মা'কে তিনিই বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন :

'কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।
যবে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥'

মায়ের জন্য এত বেদনা একজন নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসীর পক্ষে কি সঙ্গত না শোভন? তিনি কাহাদের জন্য জগন্নাথের প্রসাদ লাল শাড়ী ও সাদা কাপড় পাঠাইতেন? অনুমান করা যুক্তিযুক্ত যে, ঐ কাপড় নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও মাতা শচীর জন্য। আসল কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসিয়াছিলেন সহজ জীবন লইয়া, প্রেমধন লইয়া, যাহার মধ্যে গার্হস্থ্য-সন্ন্যাসের কোনও প্রশ্নেরই স্থান নাই। প্রেম যাহার নিজ ধন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতির ভিতরে থাকা বা প্রকৃতির ওপারে থাকা দুই-ই সমান। প্রেমে পরম পুরুষ ও পরা প্রকৃতির গলিয়া গিয়া এক হওয়ার মূর্ত্তিই তো তিনি। কিন্তু মায়াবাদ-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে তাঁহাকে প্রেম প্রচার করিবার জন্য মায়াবাদের আশ্রয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও লইতে হইয়াছিল। মায়াবাদকে একান্ত ভাবে বাধা দিলে উহা আরও শক্ত হইত বলিয়া নিজে মায়াবাদকে যেন-মানিয়া, কোনও রকমে স্বীকার করিয়া নিজের প্রচারে আগাইয়া গেলেন। তাই মহাপ্রভু মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাইয়াছিলেন, তাহা তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মায়াবাদ-বিরোধিতার অভিযান অসমাপ্তই রহিয়া গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই 'অতএব'-এর সন্ন্যাস গ্রহণের ফলেই তাঁহার জীবনকে আশ্রয় করিয়া দুইটী পরস্পরবিরোধী ধারা প্রবর্ত্তিত হইতে পারিয়াছে। একটী হইতেছে প্রচলিত বর্ণাশ্রমধারা এবং বিধিমার্গ, অপর ধারাটী হইতেছে সহজিয়া ধারা ও রাগমার্গ। বর্ণাশ্রম জোর দেয় জীবনের আত্মাংশের উপর, চৈতন্যাংশের উপর, ভাবের উপর, নিবৃত্তিমার্গের উপর; আর সহজিয়ারা জোর দেয় মায়ার দাবীর উপর, রক্তের দাবীর উপর, জীবনের সহজাত প্রবৃত্তির উপর। অথচ মহাপ্রভু ছিলেন 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ'। কিন্তু রস-ভাব সমন্বিত এমন সমগ্র জীবনকে আশ্রয় করিয়াই ভাব-উপাসনা ও রস-উপাসনা সম্পূর্ণ পৃথক্ ধারায় চলিল। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত গোস্বামিগণ বর্ণাশ্রম ধারাকেই মুখ্যতঃ পুষ্ট করিয়া গেলেন; তাহারই পাশাপাশি সহজ ভজনের সূত্র ধরিয়া 'বিবর্ত্তবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইল এবং তদনুযায়ী সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিল। মহাপ্রভুর সহজ সমগ্র জীবন দ্বিধা বিভক্ত হইল। তাঁহার আশ্রিত পণ্ডিতগণ বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার অনুকূল দর্শন প্রচার করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই রাধাকৃষ্ণের 'পরকীয়' সম্বন্ধকে 'স্বকীয়' করিবার জন্য যুক্তিজাল

বিস্তার করিলেন; আর রাগমার্গীয় অপণ্ডিত সহজিয়ারা সহজ জীবন ধারা ধরিয়া রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধকে 'পরকীয়' করিয়া রাখিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ছিলেন রাগমার্গের দার্শনিক ব্যাখ্যাতা। বৃন্দাবনে এইরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমসাময়িক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সভাপতি শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকে প্রথমে অস্বীকারই করিয়াছিলেন। অথচ পরে ভগবানের অদ্ভুত বিধানে তাহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গোস্বামিপাদগণের দর্শন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে সমন্বিত করিয়া আস্বাদন করিতে পারিলেই আমরা মহাপ্রভুর দর্শনকে পরিপুর্ণভাবে বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু এ যাবৎ তাহা হয় নাই।

যে-গৌরসুন্দর 'পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান' বলিয়া তাঁহাদিগকে একরূপ এড়াইয়া চলিতে চাহিতেন, তিনিই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পণ্ডিত-কুলীন-ধনীর চক্রে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে দিক্‌পাল সদৃশ পণ্ডিত-কুলীন-ধনিগণ এক একটী স্তম্ভস্বরূপ দাঁড়াইয়া ছিলেন। সেই সময়ের জন্য তাঁহাদের উপর ভর করিয়া তিনি চলিয়াছিলেন বেশ; কিন্তু বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়াইয়া আমরা বলিতে পারি যে, তাঁহাদের দ্বারা তিনি বিড়ম্বিতও কম হন নাই। সেই সময়েই যে তিনি পণ্ডিত-কুলীন-ধনীদের নিয়া বিব্রত হইতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীমৎ নিত্যানন্দ অবধূতকে অপণ্ডিত-অকুলীন-নির্দ্ধনদের মধ্যে প্রেম-প্রচারণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার অর্পণের ভিতর দিয়া। বর্ণাশ্রম-পরিবেষ্টিত মহাপ্রভু অবর্ণী, অনাশ্রমী, শুচি-অশুচি-বিচার বর্জ্জিত নিত্যানন্দ ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে কিছুতেই ছড়াইয়া পড়িতে পারিতেন না। একই সহজ জীবনের দ্বিধা বিভক্ত বিকাশ শ্রীগৌর-নিতাই।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় বর্ণাশ্রম ও সহজিয়া ভেদে দ্বিধা বিভক্ত হইল। অবধূত নিত্যানন্দকে পরিপাক করিতে সেই সময়কার বৈষ্ণবসমাজকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর বিরুদ্ধে বেশ একদল বৈষ্ণব ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, যে জন্য মহাপ্রভু বিশেষ উদ্বিগ্ন হইতেন, এবং নিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে কেহ কোনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু তাহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিতেন। নিত্যানন্দ প্রভু 'অনাচারী' বলিয়া একদল বৈষ্ণব তাঁহাকে ছোট করিয়া দেখিতে চাহিতেন। অথচ মহাপ্রভু ছিলেন তাঁহার পরিপুর্ণ সমর্থক। নিত্যানন্দ প্রভুকে সামনে রাখিয়াই

সেদিন মহাপ্রভু বাঙ্গালার বুকে নাম মহিমা ও প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মায়াবাদ স্বীকৃতির ফলে নিশ্চয়ই প্রকৃতি সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে এবং বৈষ্ণব সঙ্ঘকেও সে দিকে প্রেরণা দিতে হইয়াছিল। কার্য্যতঃ ছোট হরিদাস বর্জ্জন এবং 'দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন' প্রভৃতি উক্তিদ্বারা তিনি প্রমাণিত করিয়া ছিলেন যে, তিনি সত্যই একজন নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ভেকধারী বৈষ্ণবগণ কি মহাপ্রভুর উক্তির এতটুকুও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছেন, না পারিবার কোনও সম্ভাবনা আছে? বর্ত্তমান ভেকধারী বৈষ্ণবদের দেখিলে চিনিতেই পারা যাইবে না যে, ইহারা মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের। যে যুগের লক্ষ লক্ষ নারী ঘরের বাহির হইয়া পুরুষ-সমাজের ভিতর আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে একত্র মিলিত হইয়াছেন, সেখানে আজ নারী হইতে দূরে থাকিবার ও নারীকে দূরে রাখিয়া সাধন করিবার সব সুযোগ লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই দিক দিয়া মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন, অথচ মহাপ্রভুকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী এক অভিনব পন্থার আবিষ্কার করিতেও হইবে

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার সম্প্রদায় যে যে বাধার সম্মুখীন হইয়া আর অগ্রগতি লাভ করিতে পারিতেছেন না, শ্রীনিত্যগোপাল সেই সেই স্থানে বাধা পরিপাক করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার সম্প্রদায়কে আবার নির্ম্মল অনাবিল ধারায় প্রবাহিত করিবার জন্য অবতীর্ণ। শ্রীগৌরসুন্দর মাতা শচীদেবীর কাছে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'আমি আরও দু বার আসিব।' তিনি নিজে না আসিলে তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই নূতন জীবন-দর্শন ও জীবন্ত প্রেম-সম্প্রদায়কে কে পুনরুজ্জীবিত করিবে? শ্রীগৌরসুন্দরের পর শ্রীনিত্যগোপাল ছাড়া দ্বিতীয় আর কাহাকেও বর্ত্তমান যুগে দেখিতেছি না, যিনি মহাপ্রভুর জীবন ও দর্শনের ক্রমবিবর্ত্তিত রূপ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ক্রমবিবর্ত্তিত রূপই নিঃসন্দেহে শ্রীনিত্যগোপাল। বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে যাহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, যাহারা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা দেখিবেন বর্ত্তমান যুগোপযোগী যে-দর্শনের বীজ মহাপ্রভুর জীবনে ছিল, একমাত্র নিত্যগোপালেই তাহা রূপায়িত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মায়াবাদ-বিরোধিতা যে স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে, শ্রীনিত্যগোপাল সেই স্থান হইতে রওয়ানা হইয়া 'মায়া' পরিপাক

করিলেন, ব্রহ্মের সঙ্গে তাহার সমন্বয় স্থাপন করিলেন, মায়াবাদের চরম নিরোধ আনয়ন করিলেন। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন: 'যে অহঙ্কারের প্রভাবে আত্মার ও আত্মজ্ঞানের পর্যন্ত অস্তিত্ব-বোধ হয়, তাহাকে তুমি অসত্য বলিতে পার না। তোমার তাহাকে নিত্য-সত্যই বলা উচিত। তাহা নিত্য-সত্য বলিলে, তাহা যে-মায়ার অংশ, সে মায়াকেও নিত্য সত্য বলিতে হয়।'—সিদ্ধান্তদর্শন, ২য় সিদ্ধান্ত। শ্রীনিত্যগোপাল ঐ গ্রন্থেরই ৩য় সিদ্ধান্তে লিখিতেছেন, 'যাহার কারণ নাই তাহা নিত্য। যাহার কারণ নাই, তাহার উৎপত্তিও হয় নাই। উৎপত্তি যাহার হয় নাই, তাহার বিনাশও নাই। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্মবিবেকানুসারে অবিদ্যারও উৎপত্তির কারণ নাই। সে মতে অবিদ্যার উৎপত্তির কারণ নাই বলিয়া অবিদ্যাও অজ। সে মতে অবিদ্যা অজ বলিয়া অবিদ্যা অমরও বটে। সে মতে অবিদ্যা অজ-অমর বলিয়াই অবিদ্যাও নিত্য। সুতরাং সেই মতানুসারে অবিদ্যা ও ব্রহ্ম অভেদ বলিতে হয়, কারণ সে মতে ব্রহ্মও অজ, অমর ও নিত্য। সে মতে ব্রহ্মকে অনাদি এবং অবিদ্যাকেও অনাদ্যা বলা হইয়াছে। যাঁহার আদি কেহ নাই, তিনিই অনাদি। যাঁহার আদি কেহ নাই, তাঁহার উৎপত্তিও হয় নাই। উৎপত্তি যাঁহার হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুও নাই। অবিদ্যা অনাদ্যা, সুতরাং অবিদ্যারও কেহ আদি নাই। অবিদ্যার আদি নাই বলিয়া অবিদ্যারও ঐ ব্রহ্মের ন্যায় জন্ম মৃত্যু নাই। সেই জন্য ব্রহ্মের ন্যায় ঐ অবিদ্যাও নিত্য।'

—মায়া ও অবিদ্যা সম্বন্ধে এতবড় বিপ্লবাত্মক ঘোষণা করিতে বিশ্বে কোনও Idealist দার্শনিক কি আজ পর্য্যন্ত সাহসী হইয়াছেন? মার্কসের সমস্ত দর্শন স্ফুরিত হইয়াছে জড়াশ্রয়ে, সেখানে চৈতন্যের স্থান গৌণ, জড়েরই creation হইতেছে চৈতন্য; পক্ষান্তরে হেগেলের দর্শনে চৈতন্যই মুখ্য স্থান লাভ করিয়াছে। জড় সেখানে গৌণ। হেগেল-মার্কসের এই দ্বন্দ্ব কে মীমাংসা করিবে শ্রীনিত্যগোপাল ব্যতীত, যিনি জড়-দর্শন ও অজড়-দর্শনকে সমমূল্যে গৌরবান্বিত করিয়া পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্যের ভিত্তিতে বিশ্বসত্য রচনার এক অভিনব কৌশলের খোঁজ দিয়া গিয়াছেন? আইডিয়ালিষ্টদের কাছে অজড়ের মূল্য প্রতিপাদক বেদান্ত বাক্যসমূহ বাচ্যার্থে (in its literal meaning) সত্য, পক্ষান্তরে রিয়ালিষ্টদের কাছে বেদান্তের জড়ের মূল্য-প্রতিপাদক মন্ত্রসমূহ বাচ্যার্থে সত্য। উপনিষদের মন্ত্র লইয়া এই অর্থান্তর, মনান্তর, সর্ব্ব শেষে মতান্তরের হাত হইতে কে রক্ষা করিত যদি না শ্রীনিত্য-

গোপাল আসিতেন? তাই নিত্যগোপাল এক দৃষ্টিকোণে অদ্বৈতবাদের সমর্থন করেন, আর অন্য দৃষ্টিকোণে অদ্বৈতবাদের খণ্ডনও করেন। বর্ত্তমান যুগের আপেক্ষিকবাদ ইহার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। উপনিষৎ এক নিঃশ্বাসে বলেন—'তৎ এজতি তৎ ন এজতি।' শঙ্কর বলেন: 'ন এজতি' (ব্রহ্ম কাঁপেন না)—ইহা বাচ্যার্থে সত্য। ভক্ত দার্শনিকগণ বলেন, 'তৎ এজতি' (তিনি কাঁপেন)—ইহাই বাচ্যার্থে সত্য। শ্রীনিত্যগোপাল বলিলেন: সমগ্র জীবনের এক অবস্থায় (যেমন নিদ্রিতাবস্থায়) 'তৎ ন এজতি'—ইহাই সত্য, আবার সেই জীবনের জাগ্রদবস্থায় 'তৎ এজতি'ই সত্য। জাগ্রৎ যদি না থাকিত, সুষুপ্তির অস্তিত্বই কি বোধ হইত? ঘুমের পর জাগি বলিয়াই না বুঝি যে 'ঘুম' বলিয়া কিছু ছিল। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন: 'জাগরণে আমি সগুণ-সক্রিয় হই। আমি সুষুপ্তি অবস্থায় যে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকি, তাহা জাগরণেই বুঝিয়া থাকি।......আমি ব্রহ্মাত্মা সময়ে সময়ে যে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় হই, তাহা আমি ব্রহ্ম-আত্মা সগুণ সক্রিয় অবস্থাতেই বুঝি।'—নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা। চিরনিদ্রিত যে, তাহার কাছে সুষুপ্তি নাই, তেমনি সগুণ ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই নির্গুণ ব্রহ্ম আছেন বোধ হয়; একান্ত নির্গুণ নিজকে নির্গুণ বলিয়াও জানেন না। ব্রহ্ম যদি নির্গুণ, তবে তিনি সগুণও, কেননা দুই-ই আপেক্ষিক। হয় দুই-ই আছে, নয় দুই-ই নাই।

শ্রীনিত্যগোপাল 'মায়া' সম্বন্ধে কাশীধামে সত্যানন্দ পরমহংস নামক কোনও অদ্বৈতবাদীর উদ্দেশ্যে বলিতেছেন: 'মিথ্যা যাহা, তাহা নাই। তোমার মতে মায়া মিথ্যা, সুতরাং তাহাও নাই। সুতরাং তাহা কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারে না। (১)। যদি বল মায়া আছে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই সত্য। মায়া সত্য স্বীকৃত হইলে মায়ার প্রত্যেক কার্য্যও সত্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে মায়ার প্রত্যেক কার্য্যের প্রত্যেক ফলও স্বীকার করিতে হয়। (২)। মায়া সত্য স্বীকার করিলে মায়াকে অনিত্যও বলা যায় না, কারণ সত্য কখনও অনিত্য হইতে পারে না। বেদান্ত এবং নানা উপনিষদে ব্রহ্মকে সত্য বলা হইয়াছে, সেইজন্য ঐ সকল গ্রন্থমতে ব্রহ্মও নিত্য। ব্রহ্মের নিত্যতার ন্যায় মায়ারও নিত্যতা স্বীকার করিলে ঐ উভয়ের সমতাও স্বীকার করিতে হয়। (৩)।—সিদ্ধান্ত দর্শন, প্রথম সিদ্ধান্ত। মায়াকে একান্ত 'মিথ্যা' বলিলে তাহা 'কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারে না', এবং 'সত্য' স্বীকার করিলে যে 'মায়ার প্রত্যেক কার্য্যও সত্য স্বীকার করিতে হয়'—

তাহা আচার্য্য শঙ্কর ভালভাবেই জানিতেন বলিয়া মায়াকে সৎ বা অসৎ কিছুই না বলিয়া 'সদসদ্ভ্যাং অনির্ব্বচনীয়' বলিয়া প্রশ্নটীকে এড়াইয়া গেলেন, চাপা দিয়া গেলেন। মায়াকে আছেও বলিতে হয়; কেননা 'নাই' বলিলে তাহাকে নিয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না, সাধনার কোনও প্রশ্নই উঠে না। আবার 'আছে' বলিলেও কোন্ কৌশলে ব্রহ্মের সঙ্গে তাহার 'সমতা' প্রতিপন্ন করা যায়, তাহাও তাঁহার যুগে কাহারও জানা ছিল না। সে যুগ ছিল 'নির্ম্মধ্যম' নীতি'র (Law of Excluded Middle) যুগ। সে যুগে হয় কিছু থাকিবে, নয় তো থাকিবে না; হয় ব্রহ্ম 'সৎ', নয় 'অসৎ'।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন—আলো-আঁধার যেমন একত্র থাকিতে পারে না, তেমনি সগুণ নির্গুণও একত্র থাকিতে পারে না। কিন্তু এই নীতিকে তিনি মায়াকে 'সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়া' বলার সময় মানিয়া চলেন নাই। তাঁহার দ্বারা অনুসৃত নির্ম্মধ্যম নীতিতে 'হয় মায়া সৎ হইবে, নয় অসৎ হইবে—ইহাই হওয়া উচিত ছিল। তিনি কোন্ নীতির অনুসরণ করিয়া মায়াকে 'সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়া' বলিলেন? ঐরূপ বলার মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোন যুক্তি ছিলনা। অথচ পরক্ষণেই আবার তিনি নির্ম্মধ্যম নীতির আশ্রয় লইয়া ব্রহ্মকে 'সৎ' বলিয়া ধরিয়া লইলেন, যেমন উপনিষৎ স্পষ্টভাবে শুনাইয়া ছিলেন 'অসৎ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ'। ব্রহ্মকেও তাহা হইলে 'সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়' বলাই তাঁহার উচিত ছিল। তিনি মায়ার ক্ষেত্রে যে 'Law of Excluded Middle'-এর ঊর্দ্ধে চলিয়া গেলেন, ব্রহ্মের সম্বন্ধেও তাহা করিলে যুক্তিযুক্ত হইত। কিন্তু ব্রহ্মকে সগুণ-নির্গুণের দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলিয়া এবং ব্রহ্মকে একান্ত নির্গুণের পর্য্যায়ে ফেলিয়া তিনি আবার সেই Law of Excluded Middleকেই মানিয়া লইতেছেন। মায়া যদি সৎও বটেন, অসৎও বটেন, তবে ব্রহ্মেরই বা সৎ হওয়া ও অসৎ হওয়ার কি আপত্তি থাকিতে পারে? তিনি 'মায়া'র তত্ত্ব নির্দ্ধারণে যে সৎ-অসৎ সমন্বয় প্রকারান্তরে মানিতেছেন, শ্রীনিত্যগোপালের বিবেচনায় ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেই সমন্বয় মানা উচিত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সমন্বয়ের ইঙ্গিত করিয়াই বলিয়া ছিলেন, মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।

শ্রীগৌরসুন্দর এই প্রতিজ্ঞা পুরণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। শ্রীনিত্য-গোপাল সিদ্ধান্তদর্শনের উপসংহারে লিখিতেছেন, 'সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা-

অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে এবং এক ও বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে।' এই উক্তি নিঃসন্দেহে মহাপ্রভুর পরে মায়াবাদ-নিরসনের কিম্বা মায়াবাদ পরিপাক করিয়া একান্ত মায়াবাদের কবল হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিবার পরবর্ত্তী ধাপ। মায়াবাদকে একান্ত খণ্ডন করিলে সেই মায়াবাদই আবারপ্রবর্ত্তিত হইত। সেইজন্যই তিনি লিখিতেছেন, 'শ্রুতিতে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়, প্রতিবাদ এবং অপ্রতিবাদকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়।' একান্ত প্রতিবাদও মায়াবাদ, একান্ত অপ্রতিবাদও মায়াবাদ। প্রতিবাদ-অপ্রতিবাদের সমন্বয় যাহা তাহাই সত্য বাস্তব জীবনবাদ বা যোগমায়াবাদ। শ্রীকৃষ্ণ এই যোগমায়া-সমাবৃত হইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ব্রহ্ম-মায়া সমন্বিত ব্রহ্মবস্তু, আত্মা-অনাত্মা সমন্বিত আত্মবস্তু, চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বিত শ্রীচৈতন্য, তাঁহাকে মায়াস্বরূপ, অনাত্মস্বরূপ, অচৈতন্য-স্বরূপ বলিলেও ঠিক মানাইবে। শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াবাদের মূর্ত্তিমান আস্বাদন, শ্রীনিত্যগোপাল সেই আস্বাদনেরই মূর্ত্তিমান দর্শন। যিনি ছিলেন বৃন্দাবনে যে-তত্ত্বের আস্বাদন মূর্ত্তি, তিনিই হইলেন সেই-তত্ত্বের বর্ত্তমান যুগপ্রয়োজনে দর্শনমূর্ত্তি। আস্বাদন-দর্শন এইবার শ্রীনিত্যগোপালে মিথুনীভূত। যোগমায়া হইতেছেন অঙ্কশাস্ত্রের ল, সা, গু,-এর (L. C. M.) মত শক্তি, যে-শক্তি সর্ব্ব বিশেষকে সমন্বয় করিয়া সর্ব্ব বিশেষত্ব সমন্বিত এক নির্ব্বিশেষকে স্থাপন করে। যেমন ৩ ও ৫-এর ল. সা, গু হইল ১৫, তিনের তিনত্ব-রূপ বিশেষত্ব এবং পাঁচের পাঁচত্বরূপ বিশেষত্ব সমন্বিত যে-এক, তাহাই ল, সা, গু। ঠিক তেমনি সর্ব্ব গুণের বিশেষত্ব সমন্বিত যে এক তাহাই সর্ব্ব গুণ সমন্বিত নির্গুণ এক, সর্ব্ব বিশেষ-ক্রিয়া সমন্বিত যে-এক, তাহাই সর্ব্ব ক্রিয়া সমন্বিত নিষ্ক্রিয় এক। ব্রহ্মের সঙ্গে সমন্বয়যোগে যুক্তা নামরূপাত্মিকা মায়াই যোগমায়া। পক্ষান্তরে 'মায়া' হইতেছে গ, সা, গু-র শক্তি, যেমন ৩ এবং ৫ এর গ, সা, গু ১, যাহার মধ্যে তিন নিজের তিনত্ব এবং পাঁচ তাহার পাঁচত্বরূপ বিশেষত্ব হারাইয়া সর্ব্ব বিশেষত্ববর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ এক হইয়াছে। যোগমায়ার ঠাকুর ভগবান, আর মায়াবাদের ইষ্ট ব্রহ্ম। আর্য্যদর্শনে মায়া ও যোগমায়া একার্থবাচক নয়, ব্রহ্মই গ, সা, গু, ; ভগবান পুরুষোত্তম ল, সা, গু। শ্রীগৌরসুন্দর মায়ার (mechanism) স্থানে যোগমায়া (organism) স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর রূপে তিনি ইহার বিরুদ্ধে অভিযান

করিয়াছেন মাত্র, নিত্যগোপালরূপে ইহার দর্শন ও তদনুযায়ী জীবন রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনকে আশ্রয় করিয়া মায়াবাদেরই যে দুই ধারা বর্ণাশ্রমধারা ও সহজিয়া-কর্ত্তাভজা-পঞ্চরসিক ধারা একান্ত পৃথকভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, শ্রীনিত্যগোপাল তাহারও সমন্বয় বিধান করিলেন। বর্ণাশ্রম স্থাপন করিয়াছে নারায়ণের মহিমা, যাহার ফলে এই জগৎ মিথ্যাত্বে পরিণত হইতে বাধ্য ; পক্ষান্তরে সহজিয়া-কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় স্থাপন করিতে চায় নরের মহিমা। 'সবার উপরে মানুষ সত্য', 'এই মানুষে সেই মানুষ', 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহারই স্বরূপ'—প্রভৃতি নরের মহিমা প্রতিপাদক বাক্যগুলি সহজ মতেরই প্রবর্ত্তন করিয়াছে। মার্ক্সীয় দর্শনেও 'man is the measure of all things' প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। একান্ত নারায়ণের উপাসনা মাটীর মানুষের রক্তের দাবীর মূল্য দিতে পারে নাই ; পক্ষান্তরে একান্ত নরের উপাসনাও চিৎকণ চেতন-মানুষের চৈতন্যের দাবী পূরণ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুগ এই দুই দাবীর সঙ্ঘর্ষের যুগ। শ্রীনিত্যগোপাল এই দুই দাবীর সমন্বয় বিধান করিবার জন্যই জড়-অজড় সমন্বয়, চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়ের বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল তাই নর-নারায়ণ। বর্ত্তমান যুগ নর-নারায়ণের যুগ ; একান্ত নরেরও নয়, একান্ত নারায়ণেরও নয়। নর-হীন একান্ত নারায়ণ ডিক্টেটর (dictator) ; নারায়ণহীন একান্ত নর বিশ্বসঙ্ঘাতে পঙ্গু, humbled. শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে মনীষী Whitehead-এর 'It is as true to say that God creates the world as that the world creates Gcd'—এই বাক্য সার্থক হইয়াছে। নর-নারায়ণ পরস্পর পরস্পরকে সৃষ্টি করিয়া এক দিব্য বিশ্বসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবেন।

বর্ণাশ্রম জোর দেয় উচ্চ-নীচ বিভাগের (hierarchy) উপর ; আর সহজিয়ারা এই উচ্চ-নীচ বিভাগ মানেন না। উচ্চ-নীচ বিভাগ একান্তভাবে অস্বীকৃত হইলে জাতির মধ্যে কাহারও একত্র আগাইয়া যাওয়া সম্ভব হয় না। সকলকে নিয়া সমান ভাবে সমান তালে আগাইতে গেলে কেহই তেমন ভাবে খুব বেশী আগাইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের ডিমোক্রাসী (democracy) প্রকারান্তরে এই সহজিয়া মতবাদই। ডিমোক্রাসীর শেষ পর্য্যন্ত মবোক্রাসীতে (mobocracy) পরিণত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। গণতন্ত্রকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে প্রচলিত বর্ণ বিভাগ ও আশ্রম বিভাগ।

এই উচ্চ-নীচ বিভাগই রাজনীতিতে bureaucracy, আমলাতন্ত্র। বুরোক্রাসী না থাকিলে নেতৃত্ব করিবার জন্য যোগ্য ব্যক্তি গড়িয়াই উঠিবে না। পক্ষান্তরে এই আমলাতন্ত্র বা উচ্চ-নীচ বিভাগের মধ্যে জনসাধারণের মূল্য ও মর্য্যাদা পদদলিত হয়। বুরোক্রাসীর পক্ষে ও বিপক্ষে যেমন কথা আছে, গণতন্ত্রের পক্ষে-বিপক্ষেও তেমনি কথা আছে। বর্ণাশ্রমীরা বুরোক্রাটিক, সহজিয়ারা ডিমোক্রাটিক। দুই-ই যখন একান্ত, তখন কেহই সমাজের স্থায়ী কল্যাণ আনিতে পারে না। চাই দুইয়ের সমন্বয়। শ্রীনিত্যগোপাল এই সমন্বয়কে সমাজের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিতে চান। বর্ণাশ্রম উচ্চ-নীচ ক্রমে যতগুলি 'বিভাগ' স্থাপন করিয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটী বিভাগের সঙ্গে যদি সমগ্র জীবনের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তবে দুই-ই নির্দ্দোষভাবে থাকে। তখন দুই দুই থাকিয়াই এক হইতে পারে। বর্ণাশ্রম জোর দেয় যোগ্যতার উপর, সহজিয়া ধারা জোর দেয় সমাজে রাষ্ট্রে প্রতি অংশেরই জন্মগত অধিকারের উপর। এই সার্ব্বজনীন জন্মগত অধিকার ও যোগ্যতার সমন্বয় বিধান ব্যতীত কোনও জাতি সমগ্রভাবে আগাইতে পারে না। নিত্যগোপাল বর্ণাশ্রম ধারা ও সহজিয়া ধারার সমন্বয়মূর্ত্তি। বর্ত্তমান বর্ণাশ্রম যে শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম নহে, সে সম্বন্ধে নিত্যগোপাল লিখিয়াছেন, 'আধুনিক চতুর্ব্বর্ণ শাস্ত্রীয় চতুর্ব্বর্ণ নহেন। শাস্ত্রীয় চতুর্ব্বর্ণ অদ্যাপি নাই। শাস্ত্রীয় চতুর্ব্বর্ণের বিরুদ্ধে আমার কোন কথাই বলিবার নাই।' আধুনিক চতুর্ব্বর্ণ সহজিয়া মতবাদকে পরিপাক করিতে পারে না; পক্ষান্তরে শাস্ত্রীয় চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে সহজিয়া মতবাদের ভাবধারা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। উহা সমাজে প্রচলিত থাকিলে বর্ণাশ্রম ও সহজিয়ার মধ্যে কোন বিরোধ থাকিত না। বর্ণাশ্রমধারা ও সহজিয়া ধারা দুই দুইয়ের পরিপূরক। শ্রীনিত্যগোপাল এই শাস্ত্রীয় চতুর্ব্বর্ণকেই প্রস্থাপন করিতে আসিয়াছেন।

বর্ণাশ্রম পুরুষ-স্বাতন্ত্র্য ও নারী-পারতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীগৌরসুন্দর ইহারই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। তাই তিনি ছিলেন নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসনিষ্ঠা বর্ত্তমান যুগে অচল। নর-নারী সমস্যা আজ তীব্র হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধান কল্পে শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন, 'সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ এবং গার্হস্থ্য হেয়—এ বোধও বন্ধন, 'মহাসিদ্ধাবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এক বলিয়া মনে হয়।' তিনি নিজ জীবনেও ইহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন 'অবধূত'। অবধূত আশ্রমে গৃহী ও সন্ন্যাসী

দুইয়ের তুল্য মূল্য রহিয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল যখন তাঁহার শ্রীগুরুদেব পরমহংসাচার্য্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট কালীঘাটের ত্রিকোণেশ্বর মন্দিরে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, 'আপনি আদেশ করুন, আমার যখন যে বেশ পরিবার প্রয়োজন হইবে, তাহা যেন আমি গ্রহণ করিতে পারি।' তাঁহার শ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন, 'তোমার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা রহিল।' শ্রীনিত্যগোপাল প্রয়োজনমত ধুতিচাদরও পরিতেন, গৈরিকও পরিতেন। তিনি তাঁহার শেষ উইলে নিজকে 'নিত্যগোপাল বসু, জন্মদাতা পিতা জনমেজয় বসু' বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম তাঁহার যোগাচার্য্য জ্ঞানানন্দ অবধূত, আর সংসার-আশ্রমের মাতামহীর দেওয়া নাম হইতেছে শ্রীনিত্যগোপাল। দুইই তাঁহার জীবনে গৌরবমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। বরং তাঁহার 'নিত্যগোপাল' নামই জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছে। যিনি নিজ গর্ভধারিণীর নাম করিতে করিতে সমাধিস্থ হইতেন, তাঁহাকে সংসারী বলিব না সন্ন্যাসী বলিব? তাঁহার জীবনে সংসার-সন্ন্যাস গলিয়া গিয়া একাকার হইয়াছিল। সংসারও তাঁহার জীবনে উপাধি, সন্ন্যাসও উপাধি। তিনি ছিলেন সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত অবধূত সহজ মানুষ শ্রীনিত্য-গোপাল। তিনি কত কুলবধূকে আশ্রয় দিয়াছেন, কত বারবণিতা তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন। নারী-স্পর্শ বিমুখ শ্রীগৌরসুন্দরই যে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী তনু লইয়া শ্রীনিত্যগোপাল হইয়াছেন, তাহা আর বুঝিতে দেরী হয় না। নারী-স্পর্শ-বিধুরতা থাকিলে বর্ত্তমান ঘর-ছাড়া নারীকুল কাহার আশ্রয় পাইয়া ধন্য হইবে? তাই তাঁহার মঠে নারীদের স্থান দিয়া ভারতীয় সন্ন্যাসীদের কাছে এক মহাবিপ্লবের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আজ কোন্ কৌশলে বর্ত্তমান যুগের পথে-বাহির হওয়া মেয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পুরুষগণ ব্রহ্মচর্য্যব্রত অটুট রাখিতে পারেন, তাঁহার কৌশল তিনি নিজ জীবন-দর্শন দ্বারা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বক্ষেত্রের সর্ব্ব সমস্যার সমাধানকর্ত্তা সমাধি-মূর্ত্তিমান শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন পণ্ডিত কুলীন ধনী পরিবেষ্টিত হইয়া। পণ্ডিতেরা তাঁহার শাস্ত্র লিখিলেন, ধনীরা তাঁহার সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনের অর্থ যোগাইলেন, কুলীনেরা তাঁহাদের কুল-গৌরব দিয়া তাঁহার সেবা করিলেন। আর এইবার শ্রীনিত্যগোপাল রূপে তিনি আসিলেন অপণ্ডিত, অকুলীন,

অধনীদের লইয়া। আগরতলার মহারাজা তাঁহার আশ্রয় চাহিয়াও আশ্রয় পান নাই। কত অকুলীন, এমন কি 'জারজ' বলিয়া ধিক্কৃত কত মানুষ তাঁহার আশ্রয় পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার আশ্রিতদের মধ্যে রূপ-সনাতনকে খুঁজিয়াও পাওয়া যাইবে না। তিনি পণ্ডিত-সঙ্গ, কুলীন-সঙ্গ, ধনিক-সঙ্গ এড়াইয়াই চলিতেন। তিনি যতদিন প্রকট ছিলেন, ততদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন যত যত বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ; তাঁহাদের সঙ্গও নিত্যগোপাল পরিহার করিয়া চলিয়াছিলেন, অথচ তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শশধর তর্কচূড়ামণি, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি মহাশয়গণ সকলেই তাঁহাকে জানিতেন, চিনিতেন। কিন্তু কাহারও কাছেই তিনি ধরা দেন নাই। সঙ্গ করিয়া গিয়াছেন সমাজের কতকগুলি অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষের সঙ্গে। তিনি কোনও পণ্ডিতের উপরে তাঁহার দর্শন, তাঁহার বক্তব্যবিষয় বলিয়া যাইবার ভার রাখিয়া যান নাই। পণ্ডিতেরা নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের দ্বারা অবতারদের জীবন ও দর্শনকে কিরূপ বাঁকা অর্থ করিয়া (twist) থাকেন, তাহা তিনি জানিতেন। একই বেদকে আশ্রয় করিয়া পণ্ডিতগণ কিরূপ বিবদমান ভাষ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা তিনি জানিতেন। নিজের শাস্ত্র যতদূর সম্ভব নিজে লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে 'শিক্ষাষ্টক' লিখিয়া চলিয়া গেলেন, শ্রীনিত্যগোপাল সেখানে ভূরি ভূরি গ্রন্থ শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত লইয়া পণ্ডিতগণ টানা-বুনা না করিতে পারেন, যথাযথ তাঁহার মতটী প্রচারিত হয়, সে দিকেই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রেও তাঁহার বুদ্ধি অতুলনীয়। তাঁহার মতবাদকে বাঁকা অর্থ করিয়া নিজ প্রয়োজনে লাগাইবার দুঃসাহস যাহাতে কাহারও না হইতে পারে, সে দিকে তাঁহার যথেষ্ট দূরদর্শিতা ছিল; শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে ঠিকই বলিয়াছিলেন: 'ট্যাকে টাকা ও সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব,' 'নিত্যগোপালের ভাব মহাভাব হয় অথচ কোমরের কাপড় খসে না।' সমাধিস্থ হন অথচ কোমরের কাপড় খসে না—ইহার মধ্যেই রহিয়াছে আদর্শবাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়। আদর্শ-বাস্তব সমন্বয়মূর্ত্তি গণ-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক নিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন।

বন্দেমাতরম্

তারা

নবশঙ্কর

হেথা হতে বহুদূরে ঐ নীল তারা
আমারে যোগায়ে চলে অক্লান্ত প্রেরণা।
অনন্ত আঁধার মাঝে যখনি গিয়াছি ডুবে
চেতনা পেয়েছি পুনঃ ক্ষীণ আলো হতে।

সীমাহীন ব্যর্থতায় বারে বারে জাল বুনে,
ক্লান্ত হয়ে বসেছিনু যাত্রা ভঙ্গ করে।
কোথা হতে এতটুকু ভরসা মাখানো আলো
মরিচীকা হয়ে বলে মোর পিছে এসো।

হতাশায় ক্ষুব্ধ হয়ে দুয়ার রুদ্ধ করে
আলোরে দিয়াছি আমি বহুবার ফিরায়ে
তবু হায়! ছিদ্রপথে সরু এক আলো
করুণায় গলে বলে এই আমি দেখো।

জীবন বালুকাতটে বাসনা ভাঙ্গিয়া পরে
পুনরায় জেগে উঠে আলোর পরশ পেয়ে।

সাময়িকী

নীলকণ্ঠ গুরু নানক : গুরু নানকের জন্মদিন রাসপূর্ণিমা দিনে। তাঁহার আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক।

হিন্দু ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের সম্পর্ক হইতে উৎপন্ন হলাহল যখন হিন্দু-মুসলমান দুইকেই জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন গুরু নানক সেই বিষ পান করিয়াছিলেন, তাহাকে সেবা ও প্রেমে রূপায়িত করিয়া আর একবার সেই কোন্ অতীত যুগের নীলকণ্ঠের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার হৃদয়ের গভীরতা ও ব্যাপকতার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুইকে পরিপাক করিয়া তাহাদিগকে শিখরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। রাগদ্বেষ তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। যে-যে আচার বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে হিন্দু-মুসলমান একান্ত পৃথক্ জাতিরূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছিল, তিনি সেই সব আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান তুলিয়া দিয়া এক মহান সার্ব্বভৌম আচার অনুষ্ঠানের উপর দাঁড় করাইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় লইয়া আমরা যদি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার বিচার করিতাম, তবে হিন্দু-মুসলমানের সঙ্ঘর্ষ থামিয়া যাইত। কিন্তু আমরা গুরু নানককে নেই নাই, যাহারা যাহারা হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ে সুষ্ঠু সমাধানের পথ—হৃদয়ের পথ—প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, সেই বাঙ্গলার শ্রীগৌরাঙ্গ, কবির প্রভৃতিকেও বরণ করিতে পারি নাই। হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় পীড়িত এই দেশ কি প্রাণ খুলিয়া একবার গুরু নানককে তাহাদের গুরু বলিয়া মনে করিবে? গুরু নানক শুধু শিখদের গুরু নন; তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই গুরু। ভারতে একজাতীয়তার মন্ত্রদাতা গুরু নানক ভারতীয় জীবনে জয়যুক্ত হউন।

নরনারায়ণ আশ্রম : বিশ্বকল্যাণের জন্য ভারতের মাটীতে আজও তপস্যারত নর নারায়ণদেবকে বুকে লইয়া নরনারায়ণ আশ্রম রাসপূর্ণিমা তিথিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। একান্ত নর কিংবা একান্ত নারায়ণ কেহই বর্ত্তমান যুগীয় বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। আকাশের নারায়ণ এবং মাটীর নর 'সযুজা সখায়া', সহযোগী সখা না হইলে যে বিশ্বসমস্যা অসমাহিত অবস্থায়ই থাকিয়া যাইবে, তাহা আজ স্পষ্ট হইয়া

উঠিয়াছে। বর্ত্তমান যুগ আকাশ-মাটীর, আদর্শ-বাস্তবের সমন্বয়ের যুগ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'— ইহা যেমন সত্যের এক দিক, আবার 'নর সমূহের অয়ন' রূপ আরও একটী মহাশক্তির অস্তিত্ব আছে—ইহাও তেমনি তুল্যমূল্য অপর দিক। কোন্ কৌশলে, কোন্ 'psychological line of development' অনুসরণ করিলে নর-নারায়ণ এক হইতে পারেন, দুই একতন্ত্র হইয়া বিশ্বসঙ্ঘ রচনা করিতে পারেন, তাহারই খোঁজ দিবার জন্য নর-নারায়ণ আশ্রমের সব কিছু প্রচেষ্টা। উজ্জ্বলভারত তাহারই বাহন। উজ্জ্বলভারত নর-নারায়ণের সমন্বিত দর্শন দিয়া চলিয়াছে এবং তাহারই ছাঁচে সমাজ-রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার উপযোগী কৌশলের আলোচনা করিয়া যাইতেছে। বিশ্বজীবনে নর-নারায়ণদেব জয়যুক্ত হউন।

ঐশ্লামিক রিপাবলিকঃ ভারত বিভাগের অতি অল্পদিনের মধ্যেই কায়দে আজম জিন্না পাকিস্থান গণপরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনের সভাপতিরূপে যে ভাষণ দিয়াছিলেন, আজ আবার তাহা স্মরণ করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন: 'আপনারা যে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের লোক হইতে পারেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের কোনরূপ সম্পর্কই নাই। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি যে, আমরা সকলেই এক রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সমান নাগরিক। এই মূলনীতি বা আদর্শকে লক্ষ্য স্বরূপ রাখিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং কালক্রমে আমরা দেখিতে পাইব যে, হিন্দু আর হিন্দু নয়, মুসলমান আর মুসলমান নয়। অবশ্য কথাটা ধর্ম্ম সম্বন্ধে নহে, কারণ ধর্ম্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কথাটী রাজনৈতিক অর্থে রাষ্ট্রের নাগরিক সম্পর্কে।'—কিন্তু আজ আমরা কি দেখিতেছি? সেদিন পাক গণপরিষদে মূল নীতি নির্দ্ধারণ কমিটির যে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি যে, কোন অ-মুসলমানই পাকিস্থানের রাষ্ট্রপ্রধান হইতে পারিবে না। ইহা কি কায়েদে আজমের ঘোষিত বাণীর সঙ্গে লেশ মাত্রও সঙ্গতি রক্ষা করে?

পশ্চিমে তুরস্ক এবং পূর্ব্বে ইন্দোনেশিয়া এই দুইটী শক্তিশালী মুসলমান রাষ্ট্র পাকিস্থানে 'ইসলাম রিপাবলিক'-এর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন। তুরস্কের বক্তব্য এই যে, পাঁচ শত বৎসর পরীক্ষা ও চেষ্টার পর যাহা পরিত্যাগ করিতে তুরস্ক বাধ্য হইয়াছে, পাকিস্থান আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যক্ষণে

সেই ধর্ম্মীয় রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্নে বিভোর। কাজেই ধর্ম্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্থানের বর্ত্তমান জগতে কোনও স্থানই থাকিতে পারে না। তাঁহারা এই পরামর্শও দিয়াছেন যে, ইসলাম ও কোরাণের স্থান মসজিদে, সেই স্থানেই তাহাকে রাখা উচিত। কোরাণের বিধান সমূহ প্রবর্ত্তিত হইলে কি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ব্যবসায়ের কোনও স্থান থাকে, যেখানে সুদে টাকা খাটানো হয়?

আজ পাকিস্থান কালের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে। যেখানে আজ এক-জগৎ গড়িয়া তুলিবার জন্য মানুষ উৎগ্রীব, সেখানে কোথায় থাকে মুসলিম রাষ্ট্র, হিন্দু রাষ্ট্রের পরিকল্পনা? সমগ্র মানুষের রাষ্ট্র আজ গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে, আর সেখানে পাকিস্থান চাহিতেছে 'ইসলামী রাষ্ট্র' গড়িতে? ইহাকেই বলে মধ্যযুগীয় কল্পনা। যে ধর্ম্ম বা রাষ্ট্র কালের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে না, সে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র মহাকালের বিচারে ধ্বংস হইতে বাধ্য। 'শেষ কথা' বলিয়া বিশ্বে কিছু নাই। 'শেষ অবতার'ও নাই, 'শেষ শাস্ত্র'ও নাই। শাস্ত্র ও ভগবান দুই-ই কাল-পরিণামকে পরিপাক করিয়া কালোপযোগী রূপ ধরিয়া নিত্য নবীন রূপে প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছেন। কাল অনন্ত। সেই অনন্ত কালকে যে-ধর্ম্ম বা যে-রাষ্ট্র কোন বিশেষ কালের ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রের মধ্যে পুরিয়া রাখিতে চায়, তাহারা কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কতদিন টিকিয়া থাকিবে? ইসলামী রিপাবলিকে মুসলমানদের অধিকার রহিয়াছে সর্ব্ব ক্ষেত্রে প্রসারিত, আর অমুসলমানদের অধিকার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। এক-নাগরিকত্বকে এই ভাবে দ্বিধা বিভাগ করিলে রাষ্ট্রই যে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। একই রাষ্ট্রের দুই অঙ্গ যদি পরস্পরকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখে, পরস্পরের মধ্যে অধিকারগত বৈষম্য কায়েম হইয়া থাকে, তবে সে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন। পাকিস্থান কালের গতি লক্ষ্য করিয়া এখনও নিজ স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অবহিত হউন। বিলাতের ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানও তাঁহাদের এই ব্যবস্থায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকাখানি লিখিয়াছেন—'সমালোচক পণ্ডিত নেহরুর অভিমতে এই শাসনতন্ত্রে দুই শ্রেণী বা দুই স্তরের নাগরিক সৃষ্টি করা হইয়াছে; একটী অধিক অধিকার ভোগ করিবে, অপরটী অল্প অধিকার পাইবে। তাহাদের ব্যাপারে পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্য পাকিস্থানের নিকট বেয়াদবী হইতে পারে, কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর এই সমালোচনা কি যথার্থই সত্য নয়?' ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান তো পাকিস্থানের বন্ধু, বন্ধুর পরামর্শ পাকিস্থানের আজও গ্রহণ করা উচিত।

তাহা না হইলে পাক-ভারত সম্পর্ক তিক্ততর হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। পাকিস্থানে 'ইসলামী রিপাবলিক' হইলে ভারত ইউনিয়নের সাম্প্রদায়িকতাবাদী একদল হিন্দুও দাবী করিবে, এখানে হিন্দু রিপাবলিক গড়িয়া তুলিবার জন্য। কিন্তু 'ভারত ইউনিয়নের সংবিধান' কখনও তাহা অনুমোদন করিবে না, সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িকতার কণ্ঠ দৃঢ়মুষ্টিতে রোধ করিবার জন্য এদেশের সরকার সংকল্পবদ্ধ। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় এই বিষয়ে সময় থাকিতেই অবহিত হউন। তাঁহারা স্পষ্টভাষায় পাকিস্থানকে এই পথে বেশী দূর অগ্রসর না হইবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করুন। এই দিকে ভারতের মুসলমানদের দায়িত্ব খুব বেশী।

শিক্ষা ও ছাত্রসমাজ : লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ধর্ম্মঘট চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল তার কাটা, পোষ্টাফিস পোড়ানো, রাস্তার বাতি ভাঙ্গা, বাস-লরী পোড়ানো, ফতেপুর জেলার একটী রেলষ্টেশনে কলিকাতা-দিল্লী মেল ট্রেন আটক করিয়া ট্রেনের বারজন ব্যক্তিকে আহত করা, ব্যারিকেড দিয়া পুলিসের সঙ্গে লড়াই করা, শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষের প্রধানের কুশপুত্তলিকা দাহন প্রভৃতি নাশকতামূলক কার্য্যের ভিতর। ইহার পর ঐ ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হইয়াছে বটে। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও রেল আটক করা প্রভৃতি চলিতেছিল। এই ঘটনার সমালোচনা করিতে গিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা তাহার ১লা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবারের সংখ্যায় লিখিয়াছেন : 'দেশের দুর্ভাগ্য, পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিবর্গও দলীয় উদ্দেশ্য হিসাবে অশান্তিকর কাজে দেশের তরুণ ছাত্রদিগকে প্ররোচিত করিয়া থাকেন। দেশের ছাত্রগণের পক্ষেও এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হইবার কর্ত্তব্য দেখা দিয়াছে। শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ন্যায়সঙ্গত সুযোগ ও অধিকার আদায় করিতে ছাত্রদিগের মধ্যে কর্ত্তব্য-তৎপরতার অভাব থাকা যেমন উচিত নহে, তেমনি যাহারা ব্যক্তিগত ও দলগত উদ্দেশ্য সাধনে ছাত্রদিগকে অশান্তিকর আন্দোলনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহে, তাহাদিগের প্রতিও পূর্ণ অসহযোগিতার মনোভাব রক্ষায় ছাত্রদিগের পক্ষে সর্ব্বদা সচেতন ও তৎপর থাকিতে হইবে।' ভারতের মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ চলিতে থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।

ছাত্রসমাজ আজ শিক্ষাক্ষেত্রকে রাজনীতিক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। কে তাহাদের রক্ষা করিবে? যাহাদের তরুণ বয়সে

রাজনীতির মূল সূত্র, রাজনৈতিক ধারা ও মতবাদসমূহের গূঢ় তাৎপর্য্য শিখিবারই কথা ছিল, তাহা না করিয়া তাহাদিগকে অকালপক্ক রাজনৈতিক করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন যাহারা, তাঁহারা যে ছাত্রসমাজের কত বড় অকল্যাণ করিতেছেন, তাহা কি এখনও ভাবিয়া দেখিবেন ? সুকুমারতা ছাত্রদের নাই, সুশীলতার বালাই তো আজ আর নাই-ই, তাহারা বয়স্কদের যাহা কিছু বলিতে পারে, ব্যবহার করিতে পারে। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্, অথচ আজ একটী 'শ্রদ্ধাহীন' ছাত্রসমাজ সৃষ্ট হইতেছে, যাহাদের নিজ দেশের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, নিজ গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, যাহাদের নিজ কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, নিজ বয়সের প্রতিও শ্রদ্ধা নাই। ইহারা নিজেদের সুস্থ সহজ পরিণতি (organic development) ভুলিয়া গিয়াছে। এত অল্প বয়সে বিশেষ কোন ism-এ আটকাইয়া গেলে কি দুর্গতি যে ইহাদের হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখনও অভিভাবক, স্কুল, কলেজের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষকে ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা নাই, নিজ কর্ত্তব্য ইহারা ভুলিয়া গিয়াছে, পরীক্ষায় নকল ধরা পড়িলে ধর্ম্মঘটের হুমকি দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যার আলয় যেখানে, তাহাই তো বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে 'সমগ্র' বিদ্যাই শিখিতে হয়। রাজনীতিরও তো সমগ্র জ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন হয়, পরবর্ত্তী সংসার জীবনে উহার কার্য্যাত্মক প্রয়োগ করিবার জন্য। ছাত্র সমাজ কি বিশ্বের সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক মতবাদগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য জানিয়াছে ? কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে ভারতীয় যাহা কিছু তাহারই প্রতি 'অশ্রদ্ধা' জন্মাইবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চারিদিকে চলিতেছে। না হইলে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি কেন ছাত্র সমাজকে সঙ্গে লইয়া পরিষদ ভবন ঘেরাও করিতে চায় ? দুর্ভিক্ষের জন্য কোনও দরদ কি শিক্ষা সঙ্কট প্রতিরোধ কমিটির ছাত্রদের আছে, না থাকাই সম্ভব ? ছাত্রদিগকে এইভাবে টানিয়া লম্বা করিবার প্রচেষ্টা যে ছাত্র-প্রকৃতির উপর কত বড় জুলুম, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ছাত্রগণ organically কোন্ কৌশলে ছাত্রজীবন হইতে যাত্রা করার পর পরিণত বয়সে সুসংযত পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন যাপন করিয়া দেশকে আগাইয়া নিতে পারে, সেই শিক্ষার কথাই আজ ভাবিতে হইবে। শ্রদ্ধাহীন জাতি, পূজ্যপূজা-ব্যতিক্রমকারী জাতি বাঁচিতে পারে না। স্কুলের সুকুমার ছাত্রবৃন্দ যে ভাবে দেশের বরেণ্য নেতাদের সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাহা

শুনিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। শিক্ষার প্রণালীও বদলাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের গুরু-গৃহের পরিকল্পনাকে কিছু-না-কিছু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে স্থান দিতেই হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষাক্ষেত্র একটী ব্যবসায় ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষাদান একটী 'অর্থকরী' চাকুরী ছাড়া বেশী কিছু কি? তাই সেখানেও ধর্ম্মঘট প্রবেশ করিয়াছে। অতীতের গুরু-শিষ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষক-ছাত্র সকলেই বীতস্পৃহ। বরিশালের জনক অশ্বিনী কুমারের স্কুল কলেজের শিক্ষক-ছাত্র অতীতের গুরু-শিষ্যের আদর্শকে অনেকটা অনুসরণ করিয়া চলিত। অথচ অশ্বিনীকুমার এ যুগেরই মানুষ। প্রাণপণ প্রচেষ্টা করিলে ইহাকে যে আজিও কার্য্যে রূপ দেওয়া চলে, অশ্বিনীকুমার তাহার প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। আজ শিক্ষাবিভাগকে সব দিক বিচার করিয়া পথ স্থির করিতে হইবে। শিক্ষাকে আদৌ অর্থকরী করা উচিত কি না, তাহা আজ ভাবিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে। বন্দে মাতরম্

'জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাপ্ত হইবে, কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে এবং সৌন্দর্যবোধের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার আনন্দ ব্যক্ত হইবে, মনুষ্যত্বের ইহাই লক্ষ্য। অর্থাৎ জগৎকে জ্ঞানরূপে পাওয়া, শক্তিরূপে পাওয়া ও আনন্দরূপে পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।'

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

(মাসিক পত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ)

উজ্জ্বলভারতের বার্ষিক মূল্য ৪৲। প্রতি সংখ্যা ।৵০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। মাঘ থেকে উজ্জ্বলভারতের বর্ষারম্ভ। ছ' মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। রচনা নকল রেখে পাঠানো বিধেয়। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার।

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের হারের জন্য পত্র লিখুন। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৪½"×৭"।

উজ্জ্বলভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অসম্বন্ধ সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের মধ্যে একটি জীবনের সমগ্রতায় যুগ-দর্শনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—**উজ্জ্বলভারত**
৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা ২৬

শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দদেব

(শ্রীনিত্যগোপাল)

বিরচিত

১।	সিদ্ধান্তদর্শন	২৲
২।	ভক্তিযোগদর্শন	৸৹
৩।	সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার	১৷৹
৪।	জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন	
	(বাঁধা)	৩৲
	(অবাঁধা)	২৷৹
৫।	নিত্যগীতি (১ম ভাগ)	১৲
৬।	নিত্যগীতি (২য় ভাগ) ও	
	গীতাবলী	২৲
৭।	আশ্রয়চতুষ্টয়	১৷৹
৮।	নিত্যউপাসনাবিধি	।৵৹
৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও	
	সাধকসুহৃদ্	১।৹
১০।	পূজা	৷৵৹
১১।	প্রভাবতী (দৃশ্যকাব্য)	১৲
১২।	যোগদর্শন	৷৵৹
১৩।	দিব্যদর্শন	৷৵৹
১৪।	যবন বৈরাগী ও অপরাধ-	
	ভঞ্জন (দৃশ্যকাব্য)	৷৹
১৫।	কবিতাকুসুমমালা	১৲
১৬।	বিবিধতত্ত্ব	২৲
১৭।	স্তবরত্নাকর ও	
	কুসুমাঞ্জলী	১৵৹
১৮।	পদ্যাবলী	২৲
১৯।	প্রার্থনাগীতা	
	১ম ভাগ	৷৵৹
২০।	ঐ (২য় ও ৩য় ভাগ)	৸৹
২১।	অধ্যাত্মতত্ত্ববোধ	৷৹
২২।	সাধনা ও মুক্তি	।৵৹
২৩।	সিদ্ধান্তসার	।৹
২৪।	সাধক সহচর	৷৹
২৫।	পাতঞ্জলদর্শন ও	
	মণিরত্নমালা	৷৹

প্রাপ্তিস্থান ঃ

মহানির্ব্বাণ মঠ

১১৩, রাসবিহারী এভেনিউ

কলিকাতা ২৯

উজ্জ্বলভারত

৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

পৌষ ১৩৬০

নূতন কথা

রেণু মিত্র

'The old physics showed us a universe which looked more like a prison than a dwelling-place. The new physics shows us a universe which looks as though it might conceivably form a suitable dwelling-place for free men, and not a mere shelter for brutes—a home in which it may at least be possible for us to mould events to our desires and live lives of endeavour and achievement.'—Physics and Philosophy—James Jeans. জেমস্ জিনস্ তাঁর ফিজিকস্ এণ্ড ফিলসফি বইয়ে লিখলেন যে পুরণো পদার্থবিদ্যা আমাদের যে-বিশ্বের খবর দিয়েছে, সে বিশ্বটা বসবাস করার স্থান নয়, সেটাকে কারাগার বললেই বেশী সত্য বলা হয়। নূতন পদার্থ-বিদ্যা আমাদের কাছে যে বিশ্বের খবর নিয়ে এল, দেখে মনে হচ্ছে সেটা বন্য পশুদের কেবল আশ্রয়স্থল নয়, সেটাকে স্বাধীন মানুষের বাস করবার স্থান করে তৈরী করে নেওয়া যায়। এটা একটা তেমন থাকবার স্থান যেখানে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী ঘটনাকে পরিবর্তিত করে নেওয়া চলে এবং যেখানে আমরা প্রচেষ্টা ও কৃতিত্ব নিয়ে জীবন যাপন করতে পারি। বৈজ্ঞানিক বস্তুজগতের এই পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছে। নিউটনীয় যুগের মত জড়জগৎকে dead, inert, block—মৃত জড়বৎ—মনে না করে একে আজ তারা নমনধর্ম্মনশীল বলে দেখতে পারছে।

বিজ্ঞানে চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই। নূতন সত্যকে যখনই তারা জানতে পারে, সাদরে তাকে তারা বরণ করে নিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু

এ মনোবৃত্তি দার্শনিকের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের দার্শনিকের, নেই। সত্যকে তারা কেবল সেই রূপেই জানে যে-রূপে লক্ষ বৎসর আগেও সে যেমনটি ছিল, আজও সে তেমনটিই থাকবে। ব্যবহার জগতে এসে যখন তার ব্যত্যয় দেখে, তখন সে বলে এটা ব্যবহারিক জগতের জন্য, আসলে অধ্যাত্মজগতে সত্যের কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই তাদেরকে যদি বলা হয় যে, জড়জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান থাকার দরুণ একদিন দর্শনের জগতে যে সিদ্ধান্ত সম্ভব হয়েছিল, আজ জড়জগৎ সম্বন্ধে নূতন খবর জানা গেছে, আগের সিদ্ধান্ত আজ বদলে নিতে হবে, তবে সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। অধ্যাত্ম জগতের সিদ্ধান্ত কালের প্রবাহে পরিবর্তিত হতে পারে, এ কথা ভেবে উঠতে অনেকেই পারেন না। আমাদের আজকের জীবনে তাই বড় অসঙ্গতি। জড়-বিজ্ঞানের নূতন সিদ্ধান্ত দিয়ে অজড় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বদলে নেব—এ আমরা পারছিনা।

অথচ জিনস সেই বইতেই বলেছেন, 'The philosophy of any period is always largely interwoven with the science of the period' so that any fundamental change in science must produce reactions in philosophy. This is especially so in the present case, where the changes in physics itself are of a distinctly philosophical hue,.........' জড় জগৎটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যেদিন এটাকে কারাগার বলে মনে করা হতো, মনে করা হতো যে এটা শুধু কিছু-দিনের জন্য আশ্রয় নেবার অতিথিশালা মাত্র, সেদিন আজ আর নেই। অথচ ঐ ভাবে ভাবতে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে আমাদের সাহিত্য-সঙ্গীত প্রভৃতি তারই চিন্তাধারা আজও বহন করে আসছে। 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে' এ আমরা আজও তো ঘরে ঘরে গাই! বিশ্বস্রষ্টা জগৎ জুড়ে একটা জাল ফেলে রেখেছেন আমাদের মাছের মত বা পাখীর মত ধরা পড়বার জন্য—এ কল্পনাও তো আজও আমরা করি!— —'জগৎ জোড়া জাল ফেলেছিস মা'—এ গান তো আমরা সবাই জানি। 'ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত'—সংসার ক্লিষ্ট মন আমাদের এ গান তো গেয়ে ওঠে!

আজকে দেখতে পাচ্ছি ঐ সিদ্ধান্তটা ঐকান্তিক ছিল না, ওটা আপেক্ষিক। আরও একটা সিদ্ধান্ত এই করা চলে যে, জড়জগৎটা নমনধর্মশীল, আমি তাকে বদলে বাসযোগ্য করে নিতে পারি। কোন্ মনোবৃত্তিতে বা কোন্

আবেষ্টনে জড় জগৎটা মিথ্যে হয়ে কারাগারে পরিণত হয়, আর কোন্ মনোবৃত্তিতেই বা এটাকে ভাগবৎ আবাসস্থলে গড়ে তোলা যায়, এইটে আজকে বুঝতে হবে। জগৎটা যখন কারাগার, আমি তো তখন সেটার মধ্যে বন্দী, তখন সেটা থেকে পালিয়ে যাবার প্রচেষ্টা করা ছাড়া আমার তো আর কিছু করণীয় থাকে না। তখন আমি সম্পূর্ণরূপে আমার কর্মের, আমার নিয়তির অধীন। কিন্তু এটা যদি স্বাধীন মানুষের আবাসস্থল হয়, তাহলে আমার কর্ম, আমার প্রচেষ্টাদ্বারা এটাকে বদলানোর জন্য আমার তো একটা কাজ থাকে। তখন বলতে পারি 'কপালের ওপর গোপাল'। তখন নিয়তি বলে, কর্মফলের অলজ্ঘ্য বিধান বলে আমার জন্য কিছু চিরনির্দিষ্ট হয়ে থাকে না। এতে মানুষের দায় বাড়ে, কাজ বাড়ে—নিজেদের করণীয় থাকাতে নিজেদের প্রত্যেকটী করা সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। কিন্তু এই তো মানুষের কথা—এই তো মানুষের মর্যাদা ও সম্মানের কথা। বিশ্বস্রষ্টা আলোবাতাস গাছপালা পশুপাখী দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করে তার নানাবিধ চিত্তবৃত্তি দিয়ে এই যে আমাকে এরই মধ্যে অংশ নিতে পাঠালেন, এখানে তাঁর ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে আমারও কিছু করণীয় আছে। এ বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে আমি তাঁর দাস হয়ে তাঁর জগতে আসিনি, এসেছি বন্ধু হয়ে। এই সৃষ্টি কাজে খানিকটা অংশ তাঁর, আর পরবর্তী খানিকটা অংশ আমার—তিনি আমি মিলে এ জগতের স্রষ্টা।

আমি বলতে কোন একজন আমি নই—তাঁর বাইরে এই যে আমরা—এই আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ একটী ইউনিটই আমি। আমরা যখন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটী আমিতে পরিণত হই নি—তখন সেই বিচ্ছিন্ন আমি তাঁর বন্ধু নই, তখন তাঁর এই সৃষ্টি কাজে আমার অংশ নেই, তখন তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস মাত্র। কিন্তু এই ভাগ্য দিয়ে মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেন নি। মানুষকে যে মর্য্যাদা ও সম্মানের আসন তিনি দিয়েছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ বলেছে

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত চাহ তুমি করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্ব ছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি,—
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,—
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
(—প্রতিসৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ)

তাঁর ও আমার পরস্পরের স্থান ও মর্যাদা যখন এই, তখন কিন্তু আমি তাঁর হাতের অচেতন যন্ত্রী নই, তখন তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অর্গানিক, জীবনগত। সম্বন্ধ অর্গানিক না হলে প্রতিসৃষ্টি সম্ভব হতো না, তাঁর সূর্যের আলো আমার মধ্যে এসে আটকা পড়ে যেত, মধুরতর হয়ে ফিরে যেতে পথ পেতো না। আর যখনই পরস্পরের সম্পর্ক অর্গানিক, তখনই কেউ কারো একান্ত অধীনও নয়, একান্ত অনধীনও নয়। জীবন্ত দেহযন্ত্র এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই সম্পর্কই তাঁর সাথেও আমার, আবার সমাজের বা রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরেরও। তাই জগৎটা আজ আর কারাগার নয়। আমি আর তাঁর এই কারাগারের ক্ষুব্ধ বন্দী নই। তখন আমি বলি,

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া ;
এ পার হতে ওপার বেয়ে
বয়নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেড়া হাওয়া।
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার ফাগুন ভরা আনন্দ,
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।
আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,
আমার মুখে ঘোমটা পড়ে রয়,—
দেখতে তোমায় বাধে বলে পড়ে চোখের জল
ওগো আমার প্রভু
জানি আমি তবু
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে তো এই সূর্য্যতারা সকলি নিষ্ফল॥

—এমনি করে বিশ্বেশ্বরের সাথে আর বিশ্বের অপর প্রত্যেকের সাথে যখন পারস্পরিক সম্পর্ক, তখনই 'ভুবন হয় মধুময়।' ভুবনকে মধুর করে তুলতে আমাদের নূতন করে ভাবতে হবে, আচরণ করতে হবে। চর্ম চক্ষে চারদিকে যা কিছু দেখছি, তাই-ই যে সুন্দর, তাই-ই যে গ্রহণীয়, তা নয়; তাকে সুন্দর ও গ্রহণীয় করে তোলা যায়, তেমন নমনধর্মশীলতা তার আছে, তাকে একান্তভাবে ছেড়ে যাবার বা বাদ দেবার দরকার নেই—এই নূতন কথাটা আজ বিশ্বের দুয়ারে এসে পৌঁছেছে। সেই নূতন কথাটাকে আমরা যেন আমাদের নূতন জীবন দিয়ে বরণ করে নেই, আমাদের বর্ষ শেষের ক্ষণে এই নূতনের ধ্যানকে নিয়ে আমরা নূতন যাত্রা আরম্ভ করবার সংকল্প গ্রহণ করি।

বাঙালীর কালীপূজা

অধ্যাপক নগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পিতৃতন্ত্র সমাজে ভগবান্‌কে পুরুষরূপে কল্পনা করাই স্বাভাবিক। এই জন্যই বৈদিক হিন্দু, য়িহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে ঈশ্বর সাধারণতঃ পুরুষভাবেই প্রকীর্ত্তিত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতি সমন্বয় সাধন করিয়া প্রগতির পথে চলিয়াছে। বৈদিক ধর্ম্ম ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পূর্ব্বে ভারত দ্রাবিড় জাতি ও সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। দ্রাবিড় সমাজ মাতৃতন্ত্র প্রধান। বেদে স্থানে স্থানে যে ব্রহ্মকে নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা দ্রাবিড় সংস্পর্শের ফলেও হইতে পারে। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে পরব্রহ্মকে শক্তিরূপে আরাধনা করা ভারতে উদ্ভূত ধর্ম্মের বিশেষত্ব। শক্তিবাদের পরিণতি ভারতেই ঘটিয়াছে। খৃষ্টানদিগের মধ্যে রোমান ক্যাথলিকগণ মেরীর উপাসনা করিলেও তাঁহাদের পদ্ধতি হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের শক্তি সাধনার পর্য্যায়ে উন্নীত হয় নাই।

ভারতে শক্তিপূজা বহুকালাগত। প্রাক্‌-বৈদিক যুগেও ইহা ভারতে দ্রাবিড়গণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে শক্তিপূজা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যগণ সম্ভবতঃ প্রাক্তন প্রথাকেই নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্ত দেবীমাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি যে অভেদ এই শাক্ত সিদ্ধান্তটির মূল সামবেদের কেনোপনিষৎ-এর একটি উপাখ্যান। বৌদ্ধযুগে তন্ত্র বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। বাঙ্‌লার কালী ও সরস্বতীকে আমরা বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই পাইয়াছি।

সর্ব্বকারণকারণকে মাতৃভাবে ধ্যান করা ভারতীয় সভ্যতারই এক অনন্য-সাধারণ প্রকাশ এবং এই শক্তিবাদ বাঙ্‌লাদেশেই বেশী করিয়া প্রসারলাভ করিয়াছে। তন্ত্রোপাসনার পীঠস্থান বাঙলাদেশ। ইহা 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা'। দেবীর ৫১ পীঠস্থানের অনেকগুলি বাঙ্‌লাদেশেই অবস্থিত। চণ্ডীমণ্ডপ সম্পন্ন বাঙালীহিন্দুর ভদ্রাসনের অপরিহার্য্য অঙ্গ এবং গ্রামের প্রধান

মিলনকেন্দ্র। বাঙলার অনেক অঞ্চলে শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকের নির্দ্দেশানুসারে কালীপূজা করিয়া প্রত্যেক শুভকর্ম্ম আরম্ভ হয়। চণ্ডীমঙ্গল মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লাসাহিত্যের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্য বাঙ্‌লাসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ্‌। রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ কালীর উপাসক—তাঁহারা অতীতে অতি প্রচলিত তান্ত্রিকোপাসনার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

গতরাজ্য সুরথ ও স্বজনসন্তক্ত বৈশ্য সমাধি মেধাঋষির নিকট সর্ব্বার্থসাধক চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট লাভ করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে "যৈস্তু ভক্ত্যা স্মৃতা নিত্যং তেষামৃদ্ধিঃ প্রজায়তেঃ।" দেবী "দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ" আয়ুধ ধারণ করেন। নববাহনা চামুণ্ডা আমাদিগকে দশদিকের বিপদ হইতে রক্ষা করেন। ভুস্তরভয়হারিণী দেবী মধুকৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভনিশুম্ভ প্রভৃতি অসুর সংহার করিয়া পৃথিবী পরিপালন করেন। প্রপন্নার্ত্তিহরা অলজ্ঘ্যবীর্য্যা দেবী "বিশ্বস্য বীজম্‌।" গীতার শ্রীকৃষ্ণের মতই তাঁহার অভয় বচন :—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্‌॥

দেবী বহুরূপধারিণী! শক্তি আমাদের দেশে নানা মূর্ত্তিতে পূজিতা—লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী ইত্যাদি। ইহারা এক দেবীর বহু ভাবে প্রকাশ—চণ্ডীতে এ সত্য পুনঃ পুনঃ বিঘোষিত হইয়াছে। "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" মহিষাসুরের দ্বারা পরাজিত দেবগণের ক্রোধসঞ্জাত কেন্দ্রীভূত শক্তিই দুর্গা। সিংহোপরিস্থিতা দশভূজা দুর্গাদেবীর পূজাই বাঙ্‌লাদেশের প্রধান উৎসব। পণ্ডিতেরা বলেন, কুল্লুক ভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ বাঙ্‌লাদেশে দুর্গাপূজা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। বাঙালীর দুর্গোৎসবে মহিমা ও ঐশ্বর্য্যেরই দিকই সমধিক অভিব্যক্ত। দেবী রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিশ্বের আর্ত্তিহরণ ও অভ্যুদয় সাধন করেন। বাঙালীর চরিত্রের প্রধান উপাদান কোমলতা। তাই বাঙালী রুদ্রের মধ্যে যে কল্যাণতম রূপ রহিয়াছে, তাহাকেই একান্ত করিয়া দেখিয়াছে। দুর্গাপূজা বাঙালীর সৌন্দর্য্যোপাসনার মূর্ত্ত প্রতীক। কালক্রমে বাঙালীর প্রতিভা এই মহাঘোরা মহারৌদ্রা দেবীকে করুণাবিগলিতা মাতা ও অশেষ স্নেহপাত্রী কন্যায় রূপান্তরিতা করিয়াছে।

দুর্গাদেবীরই অনুরূপ চণ্ডী ও কালী দেবী। শুম্ভনিশুম্ভাসুর কর্তৃক পরাজিত দেবগণের স্তুতিতে প্রসন্না হইয়া পার্ব্বতী তাঁহাদের নিকট আবির্ভূতা হন। পার্ব্বতীর দেহকোষ হইতে অম্বিকা এবং পরে কৃষ্ণবর্ণা কালিকাদেবী রূপ পরিগ্রহণ করেন। চণ্ডীতে অন্যত্র বর্ণিত আছে শুম্ভ নিশুম্ভাসুচর চণ্ডমুণ্ড বধের প্রাক্কালে অম্বিকাদেবী শত্রুগণের প্রতি কোপপূর্ণা হইলেন—তখন তাঁহার ভ্রূকুটীকুটিল ললাটফলক হইতে করালবদনা কালী অতি দ্রুত বিনিষ্ক্রান্তা হইলেন। মোটের উপর অম্বিকাললাটোদ্ভবা দেবীই কালী। এই বিচিত্র—খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা। অতি বিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতা দিঙ্‌মুখা॥—দেবীকে অমাবস্যার মহানিশায় কালীরূপে পূজা করি। বাঙ্‌লাদেশে কখন হইতে কালীপূজা প্রচলিত হইয়াছে তাহার কোন ঐতিহাসিক আলোচনা আমরা অবগত নহি। তবে কালীপূজার এক বিশেষ তাৎপর্য্য আছে ইহা অনুমান করি।

শক্তিপূজায় পরব্রহ্মকে নারীরূপিনী মহামায়াভাবে কল্পনা করা হইয়াছে। তন্ত্রমতে ব্রহ্ম ও মহামায়া অভিন্ন। উচ্চাধিকারিগণ দুর্গা ও কালীকে সমস্ত জগতাং হেতু রূপে আরাধনা করিয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণের নিকট দুর্গাপূজায় এই নিঃশেষদেবগণসমূহমূর্ত্তির সৌম্যাতি-সৌম্যরূপই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে আমরা "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" (চতুঃষষ্টি কলাযুক্ত সমস্ত নারীই তাঁহার বিগ্রহ) বলিয়া কল্পনা করি—তাঁহার অতি রুদ্র রূপ মনে জাগে না। জাতির জীবনে শক্তি ও সৌন্দর্য্য উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে। শক্তি ও সৌন্দর্য্য পরস্পরের পরিপুরক। সুস্থ ও সংহত জাতি গঠনে শক্তি ও সৌন্দর্য্য উভয়কেই অতন্দ্রিতভাবে অনুশীলন করিতে হইবে। দুর্গাপূজায় আমরা সৌন্দর্য্যের উপাসনা করি আর কালীপূজায় আমরা শক্তির আরাধনা করি। এই দুই পূজা চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করে। লোকশিক্ষকেরা দুর্গাপূজার অল্প ব্যবধানে কালীপূজার বিধান করিয়া এই সত্যেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাঙালী শক্তির উপাসক হইয়াও কখনও কখনও বীর্য্যহীন বলিয়া উপহসিত হয়। শক্তিবাদকে আমরা যথাযথরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই বলিয়াই এমন হইতেছে। তন্ত্রোক্ত মহামায়াতত্ত্ব যদি আমাদের জীবনে অনুস্যূত হয়—যদি আমরা প্রত্যেক নারীতে মাতৃবুদ্ধি ও প্রত্যেক মাতায় দেবীবুদ্ধি লাভ করিতে পারি, যদি

আমরা সর্ব্বভূতে এবং নিজের মধ্যে দেবীর সংস্থিতি অনুভব করিতে পারি, তবেই কালীপূজা সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃতি সহায়ক হইয়া আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে।

নিরীক্ষণ

সুধা দেবজা

ঘুম-ভাঙা চোখে
প্রথম দৃষ্টি আকাশের পানে মেলে
কী দেখিলে তুমি ?
আগতে দিনের আরম্ভখানি
স্পষ্ট দেখিতে পেলে ?

দেখিতে পেয়েছ
স্নিগ্ধ সজল আলোর তলায়
গোপন প্রখর তাপ ?
অথবা মৃদুল বায়ুর আড়ালে
ঝঞ্ঝার অভিশাপ ?

পড়েছে নয়নে ?
কিশোর অরুণ সরল হাসির তলে
ক্রুদ্ধ সে পণ
শ্যামা ধরণীরে শোষণের লাগি
লুকায়ে রেখেছে ছলে ?

শুনেছ কি তুমি
ভোরের পাখীর কাকলি ছন্দে
দুঃসময়ের বাণী
পড়েছ শুভ্রমেঘের পাখায়
অলিখিত কথাখানি ?

নৈবেদ্যের রবীন্দ্রনাথ

রাইহরণ চক্রবর্ত্তী

কবির নিজের অন্তরে একটি মানব প্রকৃতির বিশ্বরূপ আছে এবং বাইরের সমাজের আর একটি বিশ্ব প্রকৃতির ছাপ রেখাপাত করছে। অভিজ্ঞতা সূত্রে এবং প্রীতি সূত্রে অন্তরের এবং বাহিরের মিলন হয়। এই সম্মিলনের ফলে কবির "বুদ্ধি এবং হৃদয়, বাসনা এবং অভিজ্ঞতা গলে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্য লাভ করে"। 'নৈবেদ্য' তখনই মানব জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে। উহা কবির আত্মপ্রকাশ এবং সমগ্র বিশ্বচেতনার বিচিত্র বিকাশ। আত্মার বিকাশই কবিত্বের লক্ষ্য, মানব এবং প্রকৃতি উপলক্ষ্য মাত্র। 'নৈবেদ্য' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট কবিত্বশক্তির ভিত্তিটাকে শক্ত করে ধারণ করেছে। উহা যাহা কিছু ধারণ করেছে এবং আকৃতি দান করেছে তাহা এক হাতে দিয়েছে সংযম আর এক হাতে অন্যায়ের সংহার। "সৌন্দর্যকে পুরামাত্রায় ভোগ করবার জন্য" যে সংযমের প্রয়োজন, সংযমকে সত্যের কঠিন ভাঙনে এবং গড়নে যে বিচার, বল, ত্যাগ এবং দৃঢ়তা দরকার, তার বিরাট অস্তিত্ব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বন্ধনমুক্তিতে প্রকাশিত রয়েছে। নৈবেদ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা রয়েছে তা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাহিরের প্রকাশ মাত্র, উহা যে সমৃদ্ধ ক্ষেত্রীর মত লাঙল দিয়ে মাটি বিদীর্ণ করেছে, মই দিয়ে ঢেলা দলে গুঁড়ো করে সমস্ত ক্ষেত নিড়ানি দিয়েছে আর সমস্ত ঘাস ও গুল্ম উপড়ে নিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রকে একেবারে শূন্য করে বীজ ফল ফুল বিকাশের, বিস্তারের এবং প্রকাশের প্রস্তুতি দান করেছে। যথার্থ ভাবে কাব্যরস গ্রহণের অধিকারী হবার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় কঠিন চাষ দিতে বাধ্য হয়েছেন। সমস্ত বিপদ এড়িয়ে তিনি পূর্ণতা লাভ করবার জন্যে প্রয়োজনহীন সঞ্চয়ের এবং পরিণামহীন পুরস্কার লোভের পথ বর্জন করেছেন। সৌন্দর্য সৃষ্টি অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নয়। 'নৈবেদ্য' তাই নিন্দা প্রশংসার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে দুর্দিনের ঘন অন্ধকারেও প্রিয়তমের প্রেম মাধুর্যে মগ্ন রয়েছে আর কবি ধারণা অতীত অব্যক্ত অনন্তের সংগীত থেকে "অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ" লাভ করেছেন।

এই কাব্যে তিনি প্রবৃত্তিকে মাতলামির ক্ষণিক উত্তেজনায় উন্মত্ত করে রাখেন নি। সাহিত্য গ্রন্থের 'সৌন্দর্যবোধ প্রবন্ধে' নৈবেদ্যের আদর্শটির মূলসুরটি অন্যসুরে প্রকাশ করেছেন। উহা শুধু কাব্যক্ষেত্র নয়, জীবনের সবক্ষেত্রেই সত্য। "প্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পুরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই, তবে যে-সৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন, তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে, ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ধুলায় লুটাইয়া দেয়।" ক্ষুধিত প্রবৃত্তির মধ্যে 'নৈবেদ্য' এমন একটি অমৃত দিয়েছে যা পান করে মানুষ ক্ষুধার রূঢ়তাকে, জড়তাকে ও তীব্রতাকে সব সময় জয় করে চলে। 'নৈবেদ্য' অসীম অনন্ত সত্যের একটি সংযত অবদান এবং অসত্যের তীব্র প্রতিবাদ।

"তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে অর্পণ করেছ নিজে।
ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গসম
আমার ইঙ্গিতে।"

নৈবেদ্যে ভারতের বিচিত্র ভাব ও রূপ রূপায়িত রয়েছে। ভারতের বিচিত্র মূর্তির মধ্যে ভারতের স্বাধীন আত্মা "সেই একান্ত নির্ভয় অনন্ত অমৃতবার্তা, সে মহা-আনন্দ মন্ত্র, সে সঞ্জীবনী উদাত্তবাণী" লাভ করবার জন্যে আঁধারের পারে জ্যোতির্ময় মহান্তপুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। মৃত্যুকে জয় করবার পথ ভারতের উপনিষদ সত্যময় রূপে, চিন্ময় ভাবে এবং শিবময় বৈরাগ্যে আবিষ্কার করেছে। তাই কবি গৌরবে গেয়েছেন,—

…"তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।"

সেই মৃত্যুঞ্জয় ভারত 'পতিত ভারতে' পরিণত হয়েছে। আজ ভারতবাসী বিশ্ব সমাজের পরিত্যক্ত, আপন ঘরের ভাগকরা সম্প্রদায় দ্বারা নিন্দিত এবং লাঞ্ছিত। ভারত যতই পারিবারিক এবং আরণ্যক হয়ে উঠেছিল ততই সে বিশ্ব ব্যবহারের অযোগ্য হয়েছে। অপর দিকে প্রথম যুদ্ধের হিংসার উৎসব গেল, দ্বিতীয় যুদ্ধের হিংসার ও দুর্ভিক্ষের মহামারি গেল, এখন তৃতীয় মহাযুদ্ধের "শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি"

চারদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ‘‘নৈবিদ্যে’র পবিত্র আয়োজনে শেষ প্রশ্ন জেগেছে—“কী তাহার কাজ, কী তাহার শক্তি, কোন্ পথ তাহার পথ” ? কবি উত্তর দিচ্ছেন :—

“তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে অর্পণ করেছ নিজে। প্রত্যেকের পরে দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ।” “একদিকে আমাদের দেশীয়তা, অপরদিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে আবশ্যক।” ভারতকে রক্ষা করতে হলে ভারতের পক্ষে যাহা স্থায়ী, যাহা সারবান, যাহা গভীর, যাহা ভারতের ঐক্যবন্ধনের উপায় সেই পথ আমরা খুঁজে পাচ্ছিনা কেন ? পথকে রক্ষা করবার জন্য যে সব বেড়া দিয়েছি সে সব বেড়াই সবাইকে গ্রাস করছে। আমরা কেবল নীতির বেড়া, ধর্মের বেড়া, শাসনের বেড়া, সংযমের বেড়া দিয়েই বাগান রক্ষার কথা জোর গলায় চীৎকার করছি। আমাদের প্রেমের কোমলতার মধ্যে ন্যায়ের কঠোরতা নেই—অর্থাৎ শক্ত হাড়ের উপর আমাদের নরম শরীরের পত্তন হয় নি। কাজেই স্বাধীনতা পাবার পর আমরা জড়পিণ্ড ভিত্তিহীন হয়ে পড়েছি।

“অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।”

আমাদের সমাজে কেহ গরু বধ করলে সমাজের নিকট কঠোর নির্যাতন সহ্য করবে কিন্তু কোন ধনী ধনের উন্মাদনায় শত শত প্রতিবাসীর ভিটামাটি উচ্ছন্ন করলে, শত শত দরিদ্রকে ও আশ্রয়হীনকে নিরন্ন বুভুক্ষুর দলে পরিণত করলে তার কোন পাপও হয় না, প্রায়শ্চিত্তও হয় না। অর্থের বলে, ক্ষমতার অহংকারে ভারতের নীতিরক্ষাকারিগণ প্রতিদিন রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, মিথ্যাচরণে ধর্মনীতির, সমাজনীতির ও শাসননীতির ভিত্তিমূল জীর্ণ করে জাতিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, সম্বলহীন করে পথে বসিয়ে দিচ্ছেন তাদের কোন দোষ নেই, তাদের কোন ভুল নেই, তাদের কোন কৈফিয়ৎ নেই, তাদের শোচনীয় পতনের দুর্গতির দিকে লক্ষ্য করে ভারতের ঋষি কবি স্বাধীনতালাভের বহুপূর্বে উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন :—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর

* * *

পৌরুষেরে করে নি শতধা—নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

বাংলার ঋষিকবি তাই ভারতকে এবং বিশ্বকে খণ্ড খণ্ড করে ভাবেননি। 'নৈবেদ্যের' দিগন্ত প্রসার ক্ষেত্রে কবি রেখেছেন মুক্ত নীলাম্বরের আলোক, বৈরাগ্যের ভৈরবী গান, নদীর তরল কল্লোলরোল, তরুচ্ছায়াপুর্ণ স্নিগ্ধপল্লীগৃহ এবং বাংলার আকাশে বাতাসে অসীম আনন্দ, স্নিগ্ধ সন্তোষ কলুষমুক্ত কল্যাণ এবং মৃত্যুঞ্জয় প্রেম। বিশ্বকবি কখনও বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন অন্নহীন ভারতের কথা কল্পনা করেন নি, ভোগবিলাসপ্রমত্ত উচ্ছৃঙ্খল যুবসমাজের কথাও হৃদয়ে স্থান দিয়ে যান নি। কবি স্বাধীন ভারতের কল্যাণী হৃদয়লক্ষ্মীর এবং পুর্ণপ্রস্ফুটিতরূপা মাতৃভাষার ধ্যান করে গিয়েছেন, সেই মঙ্গলের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। তাই তিনি গেয়েছেন—"তখনি তোমার কার্যে আনন্দিত মনে সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।" দেশের প্রাচুর্য্য সম্পদের সম্ভাবনায় কবি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছেন :—

"এ নদীর কলধ্বনি যেথায় বাজে না
মাতৃ কলকণ্ঠসম, যেথায় সাজে না
কোমলা উর্বরা ভূমি নব নবোৎসবে
নবীন বরণ বস্ত্রে যৌবন গৌরবে
বসন্তে শরতে বরষায়, রুদ্ধাকাশ
দিবসরাত্রিরে যেথা করে না প্রকাশ
　　　　যেথা মাতৃভাষা
চিত্ত অন্তঃপুরে নাহি করে যাওয়া-আসা
কল্যাণী হৃদয় লক্ষ্মী, যেথা নিশিদিন
কল্পনা ফিরিয়া আসে পরিচয় হীন
পরগৃহদ্বার হতে পথের মাঝারে—
সেখানেও যাই যদি, মন যেন পারে
সহজে টানিয়া নিতে অন্তহীন স্রোতে
তব সদানন্দ ধারা সর্ব ঠাঁই হতে।

নৈবেদ্যের অনেক কবিতায় উপনিষদের মূলসুরটি অন্তর্নিহিত রয়েছে। কবি যেন বিশ্বমানবের ও বিশ্বপ্রকৃতির অসীম রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। উপনিষদের মন্ত্রে মন্ত্রে যে শান্তিময় জ্যোতির্ময় রূপ রূপায়িত, স্বর্গমর্ত্যে যে শান্তিময়ী প্রীতি অব্যক্ত ও অবিচ্ছিন্ন, যেই তেজোরূপী, বীর্যরূপী, বলরূপী, ওজোরূপী আদিত্যদেবের জীবনপ্রবাহ মূর্ত, সেই সত্যের স্বরূপ কবির প্রত্যেকটি রূপে রসে শব্দে, গন্ধে, স্পর্শে যেন প্রকাশিত। পবিত্রতার মহিমায়, শান্তির সৌরভে এবং দীপ্তির প্রভায় 'নৈবেদ্য' যেন ভারতের ধ্যানের উপলব্ধি প্রসূত জীবন সত্যকে চিরগতিশীল এবং বিকাশশীল করে অতুলনীয় গৌরবের সম্পদ হয়ে রয়েছে। অনন্তের উপাসনায় কবি তাই গেয়েছেন :—

হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা-অতীত
সেথা হতে আনন্দের অব্যক্ত সংগীত
ঝরিয়া পড়িছে নামি—অদৃশ্য অগম
হিমাদ্রি শিখর হতে জাহ্নবীর সম।

* * *

চিত্তবাতায়ন মম
সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রিদিন
রাখিব উন্মুক্ত করি হে অন্তবিহীন।

বিশ্বকবির শিল্প চাতুর্যের সৌন্দর্য এবং রসোপলব্ধি এই অন্তবিহীন অনন্তের ধ্যানে নয়। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন অসীম আকাশকে সসীম নীড়ের সংগে বন্ধনের গৌরব দিয়ে। দিগন্ত সুদূরের মহাবিস্তৃত অসীমায় 'সীমাবদ্ধ আমিকে' অভিন্নরূপের যোগসূত্র দিয়ে, জীবনের ভালোবাসার নিশ্চিত প্রত্যয়ের সংগে মৃত্যুর ভালোবাসার মিলন সমাধি রচনা করে। নৈবেদ্যের অপূর্ব পরিচয় সসীমের অন্তরে অসীমের বন্দনায়, মৃত্যুর পারে অমৃতের আরাধনায়—দূর হতে দূরে যা জ্যোতির্ময়রূপে, নিকট হতে অতি নিকটে তা' অন্তরের ও বাহিরের মহানন্দময় মুক্তির আস্বাদে। কবির বিচিত্র আনন্দের সুর প্রকাশিত হয়েছে বিচিত্র চিত্রে :—

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়,

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চার ক্ষেত্র, সেথা শুভ্রভাস ;
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জন-প্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই—নাই, নাই বাণী।

এখন সব চেয়ে বড় প্রশ্ন এই, বিশ্বকবি অসীমের উপলব্ধি কি ভাবে করেছেন! এমন ত 'বৈরাগ্য সাধন সম্পদ' তাঁর ছিল না, এমন ত যোগবল বা তপস্যাবল ছিল না যে "সীমার মাঝে অসীমের আনন্দ" লাভ করবেন। তবে এই অনন্তশক্তির প্রবাহ, অসীম সৌন্দর্য্যের প্রকাশ এল কোন্ পথে? যেই পথ অত্যন্ত সহজ এবং সুন্দর সেই পথটি ধরে বিশ্বকবি 'নৈবেদ্যে অসীমের প্রেম' আস্বাদ করেছেন। ভাবে ভাবে, হৃদয়ে হৃদয়ে, সুদূরে ও নিকটে এই প্রেমসত্য অবলম্বন করে সব সত্য লাভ করা যায়। এই সহজ ও মধুর পবিত্র প্রেম লাভ করবার জন্য সাধন ভজনের আয়োজন দরকার হয় না, ঘরে বসেই সব দেখা যায়, জানা যায়, লাভ করা যায় এবং বিলি করা যায়। তাই কবি নৈবেদ্যে গেয়েছেন—"তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে, প্রিয়তম, তবু শুধু মাধুর্য মাঝারে চাহি না নিমগ্ন করে রাখিতে হৃদয়। আপনি যেথায় ধরা দিলে, স্নেহময়, বিচিত্র সৌন্দর্যডোরে, কত স্নেহে প্রেমে কত রূপে—সেথা আমি রহিব না থেমে তোমার প্রণয় অভিমানে।" এই অসীম প্রেমের পবিত্র সসীম পথ প্রেমিক কবীরও উপলব্ধি করেছেন। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রেমহীন পিপাসী মূর্খ জল পান করে না, আপন ঘটের মর্ম না জেনে জলের জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং কেঁদে মরে, অন্ধ হয়ে ঘরে ঘরে যে দীপক জলে তাও সে দেখে না। তাই বিশ্বকবির ন্যায় কবীরও গেয়েছিলেন :—

বিনা প্রীতকে মানু বা
কহিঁ ঠৌর না পাবৈ।
নাম সনেহ জব মিলে
তবহী সচ পাবৈ।
অজর অমর ঘরলে চলৈ
ভব জল নহিঁ আবৈ।

উহার অর্থ খুব স্পষ্ট। প্রেম বিনা মানুষ কোথাও ঠাঁই প্রাপ্ত হয় না। প্রেমনামে যখন প্রীতি হয়, তখনই সেই সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রীতি তখন অজর অমর সত্যের ঘরে নিয়ে যায়, আর ভবজলে আসতে হয় না।

অপনে ঘটকে মরম না জানৈ
করে কৌন জলকৈ আশা।

আপন প্রেমঘটের মর্ম্ম সে জানে না, তাই কোন্ জলের কামনা সে করে। দূরের মাঝে বিশ্বকবি নিজেকে পেয়েছেন, নিকটের মাঝেও আপনাকে জেনেছেন। প্রেমের অস্তিত্ব সর্বত্র বিরাজমান। আপনপর ভেদের কোন বালাই নেই।

হে দূর হইতে দূর, হে নিকটতম,
যেথায় নিকটে তুমি সেথা তুমি মম;
যেথায় সুদূরে তুমি সেথা আমি তব।
কাছে তুমি নানাভাবে নিত্য নবনব
সুখে দুঃখে জনমে মরণে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বন্ধনের মধ্যে মুক্তির আস্বাদন করেই তৃপ্ত হন নি, অতৃপ্ত রয়েছেন মহাতৃপ্তির ও মহানন্দের আশায়। "নৈবেদ্যের ছত্রে ছত্রে" ভগবৎ প্রেমের ও ভগবৎশক্তির সান্নিধ্যের বিরাট ক্রিয়াশীলতা রয়েছে। এই শক্তির সাধনায়, এই সেবার নিষ্ঠায় কবি শুধু ধ্যানে জেনেছেন—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু,
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হ'লে ত সুখদুঃখ, সম্পদ বিপদ, জয় পরাজয় সমভাবে দেখা যায়।

যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্
তারা তো পারেনা জানিতে
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয় খানিতে।

'নৈবেদ্য' ভারতের অন্তরাত্মার উজ্জ্বল প্রদীপ। কোথায় সন্তানের সেবা ও সাধনা, কোথায় সীমা ও অসীমের আশ্চর্য্য মিলন? 'সাহিত্য' ও 'সভ্যতার' সৌন্দর্য ও সাধনার এমন সমাবেশ কোথায়?

নৈবেদ্য! তোমার নিবেদন নব নব অংকুরের নব নব জীবন দান করে বর্তমান ভারতকে আনন্দনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত করুক।

রত্না

অনিলকুমার সমজদার

পরিচয়

রত্না	...	তুলসীদাসের পত্নী।
ছন্দা	.	রত্নার ছোট বোন।
তুলসীদাস	...	রত্নার স্বামী।

স্থান :—রত্নার পিত্রালয়ের একটি কক্ষ। সময় :—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

[একখানি সাধারণ ঘর। ঘরের এক পাশে একখানা পালঙ্ক, তার পাশে এক দরজা, পাশের ঘরে তা' দিয়ে যাওয়া আসা যায়। ডানদিকে এক গরাদহীন খোলা জান্‌লা। এক কোণে একটি প্রদীপ জলছে। বাইরে ভীষণ দুর্য্যোগ—ঝড়-ঝঞ্ঝা চলছে; মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। ঝড়ের প্রচণ্ডতায় মাঝে মাঝে জানালার কপাট ঝন্‌ঝনিয়ে উঠছে। দম্‌কা হাওয়ায় ঘরের প্রদীপটি মাঝে মাঝে কম্পিত হচ্ছে। পালঙ্কের ওপর রত্না শায়িতা। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হলেও তার চোখে ঘুম আসছে না। তীব্র অস্থিরতায় মাঝে মাঝে এ-পাশ ও-পাশ করছে। সহসা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে কোথায় যেন বজ্রপাত হ'ল। বিদ্যুতের আলোতে সমস্ত ঘরটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ক্ষণিকের জন্য। রত্না চম্‌কে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো। কি ভেবে সে খোলা জানালাটির কাছে এগিয়ে গেল—তারপর খানিকক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। জলের ঝাপ্‌টায় তার মুখমণ্ডল ও কেশের অনেকটা ভিজে গেল। খানিকক্ষণ ঐভাবে থেকে সন্তর্পণে পুনরায় বিছানাতে এসে গা এলিয়ে দিল। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো নিষ্পলক ভাবে। মাঝের খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘর হতে ধীরে ধীরে ছন্দা এ ঘরে প্রবেশ করলো]

ছন্দা—[বিস্মিতভাবে] তুমি এখনও শোওনি দিদি!

রত্না—[চম্‌কে] কে? ওঃ ছন্দা! কী করবো বোন? ঘুম যে আসছে না। তুইও তো এখনো জেগে রয়েছিস্—

ছন্দা—(হেসে) আমি তো এই সবে জাগলুম ঘুম হতে—বাজ পড়ার তীব্র শব্দ শুনে। তোমার জানলাটা খোলা ছিলো—তাই তা বন্ধ করতে এলুম

(জানালার কাছে এগুতে এগুতে) ওঃ ! কী ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে দিদি ! হাড়ে হাড়ে কাঁপুনী লাগছে।

রত্না—জানলাটাকে খোলাই থাকতে দে ছন্দা !

ছন্দা—কেন ? কোন অসুখে পড়বার মতলবে আছো বুঝি তুমি ?

রত্না—(শুক্‌নো হাসি হেসে) শীতল পবনের মাদকতাতে কখনো কী কেউ অসুখে পড়ে রে পাগলী ? আয় ছন্দা ! আমার কাছটাতে একটু বোস্ !

ছন্দা—(জানালা বন্ধের উপক্রম করে) একে তুমি শীতল পবন বলছো দিদি ! আজ যে ধরার উণপঞ্চাশ পবন একত্র হয়ে বিরাট মত্ততায় মেতেছে।

রত্না—(কঠোর স্বরে) যদি তুই সত্যিই জানলা বন্ধ করিস ছন্দা, তবে আমি যে দম্ আট্‌কে মরে যাবো। আমার প্রতি শিরা-উপশিরাগুলো যেন জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে।

ছন্দা—(বিস্মিত ভাবে ঘুরে রত্নার দিকে এগুতে এগুতে) কী বলছো দিদি ? আমি যে একবর্ণও বুঝতে পারছি না।

রত্না—আমি ঠিক কথাই বলছি। আয় তুই, আমার কাছে এসে বোস্ ছন্দা।

ছন্দা—(রত্নার কোলের কাছে বসে তার নাড়ী দেখতে দেখতে) দেখি দিদি তোমার জ্বর হয়নি তো ?

রত্না—(হেসে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) না রে পাগলী, না ! যে তাপে আমি দগ্ধ হচ্ছি, সে তাপ তুই নাড়ীতে পাবিনা রে ! আমার এই বুকের ওপর হাত রেখে দেখতো বোন। প্রায়শ্চিত্তের অনলে আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা তিল তিল করে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে।

ছন্দা—কীসের প্রায়শ্চিত্ত দিদি ?

রত্না—ছন্দা ! আমার নিজের অজ্ঞাতেই এক মহাপাপ করে ফেলেছি—সেই পাপ এখন সহস্র বৃশ্চিক দংশন জালার ন্যায় জ্বালিয়ে মারছে। নরকের নিদারুণ যন্ত্রণাও এ ব্যথার সাথে তুলনা হতে পারে না।

ছন্দা—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না দিদি ! তুমি এমন কোন পাপ করেছো যা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

রত্না—কেন ? এখানে আসাটা কী পাপ নয় ?

ছন্দা—(দৃঢ়স্বরে) না, পিত্রালয়ে আসা মোটেই পাপ নয়।

রত্না—নিশ্চয়ই পাপ! স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিনা অনুমতিতে হঠাৎ স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ী চলে আসা কী উচিত?

(ছন্দা কোনই উত্তর না দিয়ে—জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো)

তুইও তো মায়ের কাছে এসেছিস্ ছন্দা! তুই কী তোর স্বামীর বিনা অনুমতিতেই আর তার উপস্থিত বিনাই তার ঘর দোর ছেড়ে চলে এসেছিস্? কী, উত্তর দিচ্ছিস্ না যে!

ছন্দা—[ধীরে] না দিদি, না! আমি যে তাঁর অনুমতি নিয়েই এখানে এসেছি।

রত্না—তবে তুই আমার প্রাণের জ্বালা-যন্ত্রণা বুঝতে পারবিনা। আমি হঠাৎ এখানে এসেই যে বড্ড পাপ করে ফেলেছি ছন্দা! যখন তিনি ঘরে ফিরে আসবেন...আমাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে কত কী ভাববেন বলতো! কী দশা তাঁর হবে? কী করে তিনি খাবেন বাসি অন্নগুলো? কী করে আসবে ওঁর ঘুম? কী ভাবে ··· (প্রবল আবেগে রত্নার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে বেড়িয়ে আসে)।

ছন্দা—(সান্ত্বনার স্বরে) দিদি! তোমার ভাবুকতা এখনো যায়নি দেখছি—পুরুষ মানুষ অত কোমল হয়না যতটা তুমি······

রত্না—(বাধা দিয়ে) তুই তা হলে পুরুষের বাইরের রূপটাই দেখেছিস ছন্দা! ওঁদের অন্তরাত্মাটা আর দেখিস নি। ওরা বাইরে যতটা কঠোর ভিতরে ততই কোমল। তার ওপর উনি···উনি তো দেবতা ছন্দা! দেবতা! নিজের প্রাণের চাইতেও আমায় ভালবাসেন বেশী। আমার এক পলকের বিয়োগ ব্যথা যে ওঁর সহ্য হয় না ছন্দা! আমি জানি ছন্দা—আমি জানি—উনি যে আমার বিরহ ব্যথায় জেগে জেগে রাত কাটাচ্ছেন—ঘরের প্রদীপও তিনি জ্বালেন নি। অন্ধকারে··· গহন অন্ধকারে বিছানায় পড়ে পড়ে তিনি যে কেবলই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন...ওঁর আর্ত্ত দীর্ঘশ্বাস আমি যে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ছন্দা!

ছন্দা—কী যে বলছো তুমি দিদি! ও ঘরে মা শুয়ে আছেন। শুনতে পেলে কী ভাববেন বলতো? সন্ধ্যাবেলা তুমি ক্ষিধে নেই বলে খাওনি মোটেই আর এখন যদি মা সত্যি কথা সব বুঝতে পারেন তবে···তুমি কান্না থামাও দিদি!

রত্না—(সংযতস্বরে) জানি ছন্দা, মা কী ভাববেন। হয়তো বলবেন—“বিয়ে দেবার পর মেয়ের ওপর কী মায়ের কোন অধিকারই নেই?” তার উত্তরও আমি মায়ের ভাষাতেই দেব ছন্দা। বিদায়ের সময় মা মেয়েকে এই বলেই আশীর্ব্বাদ করেন—“পতির অনুগামিনী হও—আজ হতে পতির ঘরই তোমার ঘর বৎসে।” তোর মনে পড়ে কী ছন্দা মায়ের সে কথা? তোকেও তো মা এই বলেই বিদায়ক্ষণে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন।

ছন্দা—সব কথাই মনে আছে দিদি। তা বলে এখন কেঁদে কী লাভ বল? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তিনি সংবাদও পেয়েছেন নিশ্চয়ই যে তুমি এখানে এসেছো।

রত্না—পাশের বাড়ীর একটি মেয়েকে বলে এসেছিলাম—আসবার সময়। ওঁকে বলেছে কিনা কে জানে!

ছন্দা—কেন বলবে না—তুমি অনর্থক ভাবছো তাঁর জন্য। তুমি এখন একটু ঘুমোয় তো দিদি!

রত্না—আমার যে কিছুতেই ঘুম আসছে না ছন্দা! আচ্ছা ছন্দা! যদি আমি কাঞ্চনদাদার বিয়েতে না যাই—তবে মামা তো রাগ করবেন না?

ছন্দা—রাগ করবেন না কেন? কিন্তু তুমি একথা কেন জিজ্ঞাসা করছো? বুঝতে পারছি না। কাল সকালেই তো আমরা সবাই মামার ওখানে যাচ্ছি।

রত্না—তোরা যাস্ ছন্দা! আমার যাওয়া হবে না।

ছন্দা—(আশ্চর্য্য স্বরে) যার জন্য এতদূর এসেছো···আর সেখানেই যাবে না? মাও তো যাচ্ছেন আমাদের সাথে।

রত্না—সূর্য্যোদয় হবার সাথে সাথেই আমি রাজপুর চলে যাবো। ওঁর বিরহ বেদনা আমার নিতান্তই অসহ্য লাগবে ছন্দা—আমি তা সইতে পারবো না।

ছন্দা—(হেসে) ওঃ এই কথা! সকাল হতে এখনো ঢের বাকী। আমার কথা শোন দিদি, তুমি এখনই রাজপুর চলে যাও! মাকে জাগিয়ে যাত্রার আয়োজন করিগে।

রত্না—আমি সত্য কথাই বলছি ছন্দা! আর তুই করছিস্ উপহাস! সত্যি তুই যদি এরূপ বিদ্রূপ করবি ছন্দা—তবে আমি ডাক ছেড়ে কাঁদবো—

ছন্দা—না দিদি না! কেঁদো না লক্ষ্মীটি! আমি পরিহাস আর করবো না। এবার যদি করি তবে আমায় যে সাজা হয় দিও। সত্যি, প্রভাতেই যদি তুমি রাজপুর যাও তাতে কেউ বাধা দেবে না। এখন তো রাত অনেক বাকী আছে—তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। আর রাতটা যে বিশ্রামের জন্যই সে কথাও তোমার অজানা নয় দিদি।

রত্না—মাকে সব কথা বলতে লজ্জা করবে ছন্দা! তুই মাকে সব কথা বলিস্।

ছন্দা—বেশ—বলবো।

রত্না—কথা দে!

ছন্দা—বলছিতো—বলবো—বলবো—বলবো! ব্যস্ এবার তো বিশ্বাস হল? এখন চুপটি করে ঘুমোয় দেখি!

রত্না—ত্যাখ্ কথার যেন খেলাপ না হয় ছন্দা, তিন সত্য করেছিস্! ভুলিস্ না যেন!

ছন্দা—ভুলবো না—ভুলবো না ভুলবো না—সকাল হবার সাথে সাথেই আমি সব ঠিক্ করে দেবো 'খন।

(ছন্দা বিছানা হতে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যায়)

রত্না—ত্যাখ্ ছন্দা! তোর কথার যদি খেলাপ্ হয়—তা'হলে আমি কিছু খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করবো কিন্তু—

ছন্দা—(ঘুরে—রত্নার হাত নিজের হাতে নিয়ে) এ কী কথা তুমি বলছো দিদি! আমার মাথার দিব্যি রইলো—ফের যদি তুমি ওমনি কথা বলবে······। আমার ওপর......তোমার ছন্দার ওপর এটুকু বিশ্বাস রেখো দিদি।

রত্না—(ছন্দাকে বুকে জড়িয়ে) আমার প্রাণের ছন্দা! এবার আমার বুকের পাথর নাম্‌লো তোর কথাতে ছন্দা। যা শো গে যা! আমিও ঘুমোবার চেষ্টা করবো।

[ছন্দার প্রস্থান। রত্না পালঙ্কে শুয়ে পড়ে। বাইরে তখনও ঝড়ের তাণ্ডব নর্ত্তন চলছে। জানলা পথে তুলসীদাসের প্রবেশ। তাঁর পরিধান-বস্ত্র ভিজে একাকার—কাঁপছেন শীতে ঠক্ ঠক্ করে—চুলগুলো মুখের ওপর এসে পড়েছে—সতর্ক দৃষ্টিতে চার দিকে চোখ বুলিয়ে—রত্নাকে পালঙ্কে দেখে তৃপ্তির হাসিতে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন রত্নার কাছে। তার কাণের কাছে মুখ নামিয়ে খুবই ধীর ও সংযত স্বরে—]

তুলসীদাস—রত্না ! রত্না !

রত্না—(চমকে উঠে) কে ? চো…র ।

তুলসী—(নিজের হাত দিয়ে রত্নার মুখ চেপে ধরে) আমি…তুলসী, রত্না ! আমার প্রাণের রত্না ! চেয়ে দেখো…আমি ! তুলসী !

(রত্না চিনতে পারলো প্রদীপের জ্যোতিতে ! তুলসীদাস রত্নার মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল)

রত্না—(দাঁড়িয়ে) তু-মি ? এ সময়…… ? এখানে…… ?

তুলসী—(পুলকিত স্বরে) হ্যাঁ প্রিয়ে ! তোমার বিরহ বেদনা সইতে না পেরে। তুমি আমায় একলা ছেড়ে কেন চলে এসেছো রত্না ! তুমি কী ভাবতে পারলে না যে বিরহ বেদনা শুধু নারীর হৃদয়েই থাকে না, সে ব্যথার আগুন পুরুষের হৃদয়কেও জ্বালিয়ে খাক্ করে দেয় ।

রত্না—(বিছানার চাদরখানা তুলসীদাসকে দিয়ে) তোমার পরিধেয় বস্ত্র সব ভিজে গেছে ; আগে এটা জড়িয়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে নাও তো !

তুলসী—(চাদর নিয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করলো) তোমার মত রত্ন পেয়ে আমার সব দুঃখের অবসান হয়ে গেছে রত্না—না চাদরের না আগুনের প্রয়োজন, (পালঙ্কের ওপর বসে পড়ে) এসো রত্না ! আমার কোলে মাথা রেখে কথা দাও যে আর কখনোও আমায় না বলে তুমি কোথাও যাবে না !

রত্না—(কাছে এসে) আমার চলে আসাতে তোমার খুবই কষ্ট হয়েছে…না ?

তুলসী—কষ্ট ! রত্না ! নিষ্প্রাণ দেহে সাংসারিক কোন কষ্ট অনুভব হয় না, আমার চেতনা, আমার প্রেরণা, আমার শক্তি-সাহস কে যেন যাদু মন্ত্রে ছিনিয়ে নিয়েছিলো। তাই আমার পা' দু খানা এদিক পানেই—স্বয়ং চলে এসেছে। আর……

রত্না—(বাধা দিয়ে) আর তুমি এই ভয়ানক দুর্য্যোগময়ী রাত, প্রবল ঝঞ্ঝা আর বারিপাত ভীষণ প্রভঞ্জনকে উপেক্ষা করেই রওনা হয়ে চলে এলে ?

তুলসী—আমার চোখের বর্ষা আর হৃদয়ের প্রভঞ্জন এর তুলনায় বাইরের এই ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভঞ্জনের কী তুলনা হতে পারে রত্না ? প্রতিটি বারি-বিন্দুই যে আমায় জোগাচ্ছিল প্রেরণা। পবনের দীর্ঘ শ্বাস আমার বুক ফাটা হাহাকারের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছিলো। মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের

অগ্নি-শিখাইতো আমার পথের প্রদীপ হয়ে যাত্রা পথের সহায়ক হয়েছিল।

রত্না—(তুলসীর পদ প্রান্তে মাথা রেখে) তোমায় পেয়ে আমি সত্য সত্যই ধন্যা হয়েছি নাথ! তবু…তবুও আমার মত এক অতি সাধারণ নারীর জন্য এত কষ্ট আর নিজের অমূল্য জীবন উপেক্ষা করা তোমার মতন জ্ঞানীর কী উচিত হয়েছে প্রভু!

তুলসী—(রত্নাকে উঠিয়ে পাশে বসিয়ে) তুমিই যে আমার হৃদয়ের শক্তি রত্না! তুমি তো সাধারণ স্ত্রী নও রত্না। জীবনের খোঁজে যদি জীবন চলে তাতে দুঃখের কী আছে? এই তো জীবনের সার্থকতা!

রত্না—জীবনটা যে এক অমূল্য সম্পদ প্রভু! তুমি কী জান না, নাথ, তা নিয়ে ছেলে-খেলা করা কত বড় অন্যায়! তুমি এখানে এসে মোটেই ভালো কাজ করোনি!

তুলসী—(ক্ষুণ্ণ মনে) আমি এখানে আসাতে তুমি সুখী নও রত্না?

রত্না—নিজের আরাধ্য দেবতাকে পেলে কে না সুখী হয় প্রভু? কিন্তু তুমি আর আমি উভয়েই যে সমাজে বাস করি। তাই সমাজে থেকে সমাজের অনুশাসন মেনে চলাই যে মানুষের সব চাইতে বড় কর্ত্তব্য নাথ!

তুলসী—স্বামী স্ত্রীর মিলন সামাজিক পাপ নয় রত্না—তা যেখানেই হোক। তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী। অগ্নি সাক্ষী করে নারায়ণ শিলা সাক্ষী রেখে তোমায় আমি গ্রহণ করেছিলেম রত্না। তাই এখানে এসে আমি না সামাজিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছি—না কোন অপরাধ করেছি!

রত্না—তুমি যে পুরুষ! তুমি তো আমার কথা মোটে বুঝতে পারছো না। লোক-লাজ মেয়েলোকের চিরদিন রাখতেই হয়। যদি মা বা ছন্দা হঠাৎ এখানে এসে পড়ে—তবে কী ভাববে বল দিকি? সবাই যে তোমায় পরিহাস করবে—

তুলসী—(দৃঢ় স্বরে) সমাজের পরিহাসের চিন্তা আমি করি না রত্না। আমার সমাজ আমার সংসার আমার জীবন সবই যে তুমি রত্না। বিশ্বের আর সব কিছুই আমার কাছে জড় পদার্থ—চেতন কেবল আমি আর তুমি।

রত্না—তোমার প্রগাঢ় প্রেম দেখে আমার নিজের উপরেই নিজের হিংসে হয়। তুমি যে মহান্! তোমার ঐ শ্রীচরণপদ্মের ধূলীকণা হবারও যোগ্যা আমি নই।

তুলসী—(ভাবাবেশে) তুমি যে আমার হৃদয়েশ্বরী রত্না! তুমি যে আমার শ্রেষ্ঠ রত্ন। তোমায় পেয়ে আমি কৃতার্থ। (তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললো)

রত্না—তুমি আমায় লজ্জায় ফেলো না নাথ! তোমার পথে পড়ি! আমার মধ্যে এমন কি আছে—যার জন্য তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এত স্থান দিয়েছো প্রভো?

তুসলী—কেন? তোমার ঐ শ্যামঘন কুঞ্চিত কেশদাম···চাঁদ নিঙ্‌ড়ানো কমনীয় মুখশ্রী, তিলফুলনিন্দিত সুউচ্চ নাসিকা···

রত্না—(পালঙ্ক হতে উঠে বাধা দিয়ে) থাক্ থাক্·····বাস্ সবই বুঝেছি নাথ! তোমার প্রয়োজন আমাকে নয়—আমার রূপ, আমার সৌন্দর্য্যটুকুই। এই ক্ষণনশ্বর দেহ-সৌন্দর্য্যের প্রতি তোমার এই প্রবল মোহ দেখে আমার যার পর নাই দুঃখ বোধ হচ্ছে।

তুলসী—(উঠে রত্নার দিকে অগ্রসর হয়) আজকের এই রাতটুকু দুঃখ অভিমানের জন্য নয় রত্না। মান-অভিমান অন্য দিনও তো করতে অবসর পাবে রত্না। প্রভাত হতে আর বেশী দেরী নেই। এসো······দুদণ্ড আমরা প্রাণ ভরে দুটি কথা কই।

[তুলসীদাস রত্নাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে এগিয়ে গেল—রত্না দু পা পিছিয়ে গেল এবং রত্নার মুখে চোখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠলো।]

রত্না—(বিরক্ত ও বিদ্রূপের স্বরে) তোমার ভালো বাসার সীমারেখা কী এই পর্য্যন্তই নাকি!

তুলসী—(কাতরস্বরে) কেন অভিমান করছো রত্না? বেশী বাকী নেই সূর্য্যোদয় হতে। তুমিই তো আমার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহ নিয়ে সমস্ত রাত অনিদ্রায় কাটাচ্ছিলে। আর এখন, যখন আমি নিজে তোমার সমুখে উপস্থিত, তখন কেন তুমি আমার প্রাণে কষ্ট দিচ্ছ?

রত্না—(বিস্মিত ভাবে) আমি তোমার আগমনের প্রতীক্ষায় বিনিদ্র-রজনী যাপন করছিলাম? আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি যে এই দুর্য্যোগময়ী রাতের গহন আঁধারে তুমি এখানে আসবে।

তুলসী—তবে......তবে কেন জেগে রত্না···তোমার বাতায়নদ্বার উন্মুক্ত রেখে—

[সহসা একটি বজ্রপাত হল, সামনের বড় তাল গাছটার মাথায় বিদ্যুতের লেলিহান বহ্নি শিখায় চোখ ঝলসে গেল, তুলসী কেঁপে উঠলো] তোমার প্রেম আমায় অন্ধ করেছিল রত্না।

রত্না—জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করেছেন। না হলে যদি ঐ বজ্র……থাক্! তুমি ভুল বলছো নাথ! প্রেম আর আসক্তিতে যে অনেক প্রভেদ। তুমি প্রেমের নামে কেন মিথ্যা কলঙ্ক কালিমা লাগাচ্ছো? প্রেম তোমায় অন্ধ করেনি……করেছিলো রত্নার আসক্তি আর তোমার দেহের ক্ষুধাটাই। আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবন…আমার দেহ…আমার রূপের মোহ……

তুলসী—(বাধা দিয়ে) এ কথা তুমি তোমার মুখ দিয়েও উচ্চারণ করতে দ্বিধা করলে না রত্না! ••

রত্না—সত্য যে সব সময়েই কটু হয় নাথ! তুমি যে শারীরিক মিলনকেই সত্য মিলন মনে করছো, ইন্দ্রিয়ের বাহ্যিক সুখকেই সত্যিকারের সুখ বলে মনে করছো……

তুলসী—(আবেগে) রত্না!

রত্না—(আগের কথার সুরেই) তোমার কাছে হৃদয়ের মিলটার কোনই অর্থ হয় না—তুমি জানো না কাকে বলে আত্মার পবিত্রতম সঙ্গম……

তুলসী—(এগিয়ে এসে) আমার ব্যথিত হৃদয়টাকে এই শব্দ-শরে আহত করোনা রত্না! তোমার ঐ মৃণাল ভুজে আমাকে বেঁধে—আমাকে একটু তৃপ্তি দাও রত্না……

রত্না—এসব কথা বলে তুমি আমায় অযথা লজ্জায় ফেলছো নাথ! আর তুমি তোমার অজ্ঞানতার পরিচয় নিজেই দিচ্ছ। সত্যি সত্যিই যদি তোমার এখন অবলম্বনের প্রয়োজন হয়—সে আশ্রয় তাঁর কাছেই চাও যিনি এই বিরাট বিশ্বের পালনকর্ত্তা, তোমাকে আমাকে আর কত জীবকেই যিনি তাঁর শীতল কোমল ছায়াতে স্থান দিতে পারেন। তাঁকেই স্মরণ করো, যিনি আজ তোমার অমূল্য জীবনকে বাঁচিয়েছেন। আমি নারী—নিজেই দুর্ব্বলতার কেন্দ্র-বিন্দু! যাকে তুমি সৌন্দর্য্যের সাকার প্রতিমা মনে করছো, তা যে কুরূপ হতেও কদর্য্যতর। তার সত্য রূপ দেখে তুমি নিজেই গ্লানি আর ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।

তুলসী—এমন কথা বলোনা রত্না!

রত্না—আমি ঠিকই বলছি নাথ। বিশ্বস্রষ্টার স্পর্শ না থাকলে মানুষের দেহ তো শুধুই হাড় মাংস মেদ আর মজ্জা! যাকে জলের শীতল-ধারা মনে করে তুমি তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করতে চাইছো—তা যে শুধুমাত্র

মরীচিকা! এই সুন্দরতম গৌর নিটোল চামড়ার নীচেই যে হাড়ের বীভৎস কাঠামো। তার জন্য এত মোহ কেন নাথ! এত আসক্তি কেন?

তুলসী—(আবেগে) থামো, রত্না থামো। তোমার সত্যরূপ আমি দেখতে পেয়েছি। ওঃ.........কত বীভৎস সে দৃশ্য.........

[তুলসী চোখ বুজলো]

রত্না—আমি সত্য সত্যই আজ ধন্য হলেম, সত্য প্রেম তো একেই বলে, যে প্রেম নর-নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমলে অর্পিত হয়। সত্য আসক্তি তো একেই বলে, এই তো সত্য বিমল আর চির অক্ষয় আনন্দ। এই তো সত্য তৃপ্তি...আঃ—[তৃপ্তিপূর্ণ নিঃশ্বাস]।

তুলসী—(চোখ খুলে) তুমি ঠিকই বলেছো রত্না, আমি অন্ধ ছিলাম; তুমি আমায় চোখ দিলে আজ—আজ আমায় অজ্ঞানের গাঢ়-অন্ধকার হতে বের করে জ্ঞানের নির্মল অক্ষয় আলোক রশ্মিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছো! আমি এর জন্য তোমার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো রত্না!

রত্না—আমায় তুমি এসব কথা বলে লজ্জিত করো না নাথ!

তুলসী—নাথ? না—নাথ নয়! তুমি আমার গুরু। আমি অবোধ শিষ্য! অজ্ঞানের মূঢ়তায় না জানি কত অপরাধ করেছি। ক্ষমা চাইছি—দেবী! আজ আমি তোমার রূপের মধ্যেই জগৎ-জননী জগদ্ধাত্রী মাকে দেখতে পাচ্ছি......এই অবোধ জ্ঞানহীনের প্রণাম গ্রহণ করো দেবী! [তুলসী দাস মাথা অবনত করে জানলার দিকে এগিয়ে যায়। রত্না ব্যাকুল হয়ে ওঠে]

রত্না—(ব্যাকুল স্বরে) প্রভু! সূর্য্যোদয়ের পরে যেও।

তুলসী—আমায় বাধা দান অসম্ভব দেবী! ঐ শোন—দূরে...বহু দূরে কারা যেন আমায় ডাকছে। ঐ দেখো—দেবী! অযোধ্যার রাজা রাজ-সাজ ফেলে অযোধ্যাপুরীর কুলবধু সীতামাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে বনপথে; পেছনে চলেছে বীর চূড়ামণি লক্ষ্মণ ভাই......আমাকে যে যেতেই হবে......ঐ সাথে.........

"বন চলে রামরঘু রাই—
সঙ্গমে জানকী মাঈ...

লছমণ যেই সা ভাই...
অবোধপুরীকে নর নারীনে আঁসুনদী বহাই...
মাতা কৌশল্যা রো—রহী হ্যায় যেই সা বাছ্ রে বিন্ গাই।
রাম বিনু মেরী শূনি অযোধ্যা—লছমন বিনু ঠাকুরাই
সীতা বিনু মেরী শুনি রসুঈ কৌণ করে চতুরাই
বন চলে রাম-রঘু-রাই"—

[গাইতে গাইতে জানলা পথে তুলসীদাস চলে যায়]

রত্না—(তুলসীর যাত্রাপথে তাকিয়ে) চলে গেলে প্রভু—আমার ওপর অভিমান করে—[রত্না দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পালঙ্কের ওপর শুয়ে পড়লো, ঝড়ের এক দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে প্রদীপটিকে নিভিয়ে দেয়—ঘর-গাঢ় অন্ধকারে ভরে যায়···আকাশে বাতাসে তুলসীদাসের সুরের মূর্চ্ছনা গুঞ্জরিত হতে থাকে।]

পৌষালি

গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায়

এখন তো মিঠে রোদে মাঠে কাটে কাটুনীরা ধান
ঠুন্ ঠুন্ বেলোয়ারী চুড়ী বাজে—কাস্তের গান।
শিশিরেতে ভেজা ধানে শপ্ শপ্ আওয়াজ কেমন
স্নান-সারা ভিজে-গায়ে মেয়েদের শাড়ীর মতন।
শাদা বক উড়ে উড়ে দূরে বসে, জমায় শিকার—
চড়াই-বাবুই-ঘুঘু-কবুতর-শালিকের ঝাঁক
ধান-কাটা ক্ষেতে বসে, সকলের মিলিত চীৎকার
রোদের স্বপন বুনে : কিছুক্ষণ মনের খোরাক।
সরষে মটর ক্ষেতে পাড়-দেয়া সরু নদীজল
চিক্ চিকে সরু বালি—জরী-দেয়া শাড়ীর আঁচল।
উর্বর মাটির বুকে শস্যের শিশুর করতালি
এখানে দাঁড়িয়ে দেখো, সোনা হয়ে উঠবে সকলই।
মাটির বুকের রঙ্ মনে লেগে যাবে জেনো ঠিক—
প্রেম হবে আরো গাঢ়, কিছুতেই হারাবেনা দিক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নবমোঽধ্যায়ঃ

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৯।৭

(পূর্ব্বের সৃষ্টিকল্পনাকে যথাযথরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়া, এবং সেই সৃষ্টিকে পুরুষোত্তম নিজ ছাঁচে ঢালিয়া এই দিব্য অভিনব পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের পরিচয় দিতেছেন) সর্ব্বভূতানি [স্থিতিকালে ছিদ্রদাতা আকাশের কোলে স্থিত আকাশধর্ম্মী ভূতসমূহ] হে কুন্তীনন্দন প্রকৃতিং ['স্বগুণৈর্নির্গুণ্যম্' এবং অন্যোন্য-মৈথুনরত, ত্রিগুণাত্মিকা, স্বার্থ-পরার্থ রহিত, স্বাধীনভর্ত্তৃকা, কেবলা প্রকৃতিকে] যান্তি [প্রাপ্ত হয়] মামিকাং [পুরুষোত্তমমহিষী পরকীয়া] কল্পক্ষয়ে [কল্পের ক্ষয়ে, প্রলয়কালে]; পুনঃ [পুনরায়] তানি [তাহাদিগকে] কল্পাদৌ [কল্পের আদিতে, উৎপত্তি কালে] বিসৃজামি [বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়া, আত্মহোম করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকি] অহম্ [সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মধ্যে পুরুষোত্তম-অহম্ এর কৌশল হইতেছে বিশ্বসহিত নিজকে, বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞানকে ভূতসমূহের সন্ধিস্থলে, ফাঁকে ফাঁকে রাখিয়া, প্রত্যেককে স্বয়ম্পূর্ণ করিয়া, স্বয়ম্পূর্ণ প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্বন্ধকে সত্য বাস্তব উপাধিবিধুর সম্বন্ধে গড়িয়া তুলিয়া এক রসলীলা-ঘন প্রবাহের প্রবর্ত্তনা করা]।

হে কুন্তীনন্দন, ভূতসমূহ প্রলয়কালে মদীয় প্রকৃতিতে বিলীন হয়, পুনরায় সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৯।৭

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৯।৮

(এইরূপ স্বাধীনভর্ত্তৃকা) প্রকৃতিং স্বাং [স্বপ্রকৃতিকে ; যে প্রকৃতি পুরুষোত্তমের 'স্ব'—স্বীয় নন্। একান্তই নিজ, সেই স্বা পরা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা, কেবলা প্রকৃতিকে] অবষ্টভ্য [ভজনের দ্বারা বশীভূত করিয়া—'রাধারে ভজিয়া রাধা-বল্লভ নাম পেয়েছি অনেক আশে'] বিসৃজামি [নিজকে প্রকৃতির মাঝে বিসর্জ্জন করিয়া, হোম করিয়া লীলারসাবেশে সৃষ্টি করি] পুনঃ পুনঃ [নিত্য

নব নব রসাস্বাদনের জন্য বার বার] ভূতগ্রামং [ভূত নিচয়] ইমম্ [বর্তমান, এই] কৃৎস্নম্ [সমগ্র] অবশম্ ['কর্ত্তা-আমি'—এইরূপ মনে করার ফলস্বরূপ মিথ্যা জ্ঞান-প্রসূত দোষাদিদ্বারা পরবশীকৃত অস্বতন্ত্র] প্রকৃতেঃ [প্রকৃতির] বশাৎ [বশে] (পুরুষোত্তম-প্রকৃতিকে একান্তভাবে ভোগ্য করিবার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে প্রকৃতির রুদ্রাণীরূপের টানের মাঝে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে হারাইয়া ফেলা, প্রকৃতির খেলাতে পুতুল হইয়া থাকা) ।

নিজ স্বরূপা প্রকৃতিকে ভজনের দ্বারা বশীভূত করিয়া প্রকৃতির বশে স্থিত, অবশ এই ভূতসমূহকে বার বার সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৯।৮

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯।৯

(এই বিষম ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিতে বসিয়া তবে কি সৃষ্টির নিমিত্তকারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হইয়া যাইতেছে ? ইহারই উত্তর দিতেছেন) মাং [ঈশ্বর-পরমাত্মা-পুরুষোত্তম আমাকে] তানি কর্ম্মানি [বিষম বিসর্গ-নিমিত্ত কর্ম্মনিচয়] ন নিবধ্নন্তি [নিশ্চিতরূপে, নিশ্চিন্তরূপে বাঁধিতে পারে না, কেননা বন্ধনও পুরুষোত্তম আমির জীবনে রস] হে ধনঞ্জয় ; (সেই কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ না হওয়ার কারণ বলিতেছেন) উদাসীনবৎ [অর্থাৎ রাগদ্বেষ স্তরের ঊর্দ্ধে, পুরুষোত্তমস্তরে আসীন পুরুষের মত] (এখানে 'উদাসীন' শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই উপেক্ষক (indifferent) নয় ; ভগবান নন্দ মহারাজের নিকট বলিতেছেন, "উদাসীনঃ অরিবৎ বর্জ্জ্যঃ"—উদাসীন অরিবৎ পরিত্যাজ্য। 'উদাসীনের' বিশেষণ উজ্জ্বল-নীলমণি দিতেছে 'বিপক্ষসুহৃৎপক্ষ'। উদাসীন বিপক্ষেরই সুহৃৎপক্ষাশ্রিত। ঔদাসীন্যের মাঝে রহিয়াছে প্রচ্ছন্নভাবে বিপক্ষকে সাহায্য করার মনোবৃত্তি। একটি দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ যদি কোনও অপকর্ম্ম করিবার উপক্রম করে, সে ক্ষেত্রে উদাসীন হওয়ার অর্থ প্রকারান্তরে তাহার ঐ কার্য্যকে সমর্থন করাই। সত্য বাস্তব উদাসীন এই উদাসীনের মত কতকটা বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিতে ; অথচ অন্যায়কারীর হাত চাপিয়া ধরার মত শক্তিশালী ক্ষেত্র, আবেষ্টন সৃষ্টি করাও সত্য বাস্তব উদাসীনের ধর্ম্ম। তাই উদাসীন অর্থ 'ঊর্দ্ধে, পুরুষোত্তমস্তরে আসীন পুরুষ' আমরা দিয়াছি) আসীনম্ [আসীন] অসক্তম্ [সঙ্গে রাখিয়াও সঙ্গরহিত, অসক্ত] তেষু [সেই সব] কর্ম্মসু [কর্ম্মসমূহে] ।

হে ধনঞ্জয়, সেই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত, উদাসীনের ন্যায় আসীন আমাকে কর্ম্মসমূহ বাঁধিতে পারে না। ৯।৯

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে ॥ ৯।১০

('আমি উদাসীনবৎ আসীন হইয়া এই ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিতেছি'—আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরুদ্ধ এই বাক্যের মীমাংসা দিবার জন্য বলিতেছেন) ময়া [সর্ব্বতঃ নমন-ধর্ম্মশীল (flexible) দৃশিমাত্র স্বরূপ, অবিক্রিয়াত্ম, কেবল] ময়া [আমাদ্বারা] অধ্যক্ষেণ [প্রেরণাঘন অধিষ্ঠাতা] প্রকৃতিঃ [কেবলা, ত্রিগুণের সামঞ্জস্যময়ী দৃশ্যা প্রকৃতি] সূয়তে [উৎপাদন করেন ; সৃষ্টির আদিতে আমি আমার অনুপ্রবেশ দ্বারা যোগাই পিতারূপে, দৃক্‌স্বরূপে আদর্শ-প্রেরণা ; আর স্বাধীনভর্ত্তৃকা প্রকৃতি যোগান আদর্শকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপবান করিবার উপযুক্ত কাঠাম (organic constitution)। দুইয়ের উপাধিবিধুর অন্যোন্য-মৈথুনে সৃষ্টির পর সৃষ্টি চলিয়াছে] সচরাচরম্ [জগৎ] (একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলঃ নির্গুণশ্চঃ ॥' ; কেবল-কেবলার সমন্বয়ই এই জগৎ। সাংখ্যের স্বাধীনা প্রকৃতি ও বেদান্তের স্বতন্ত্র পুরুষ দুই-ই পুরুষোত্তমে গলিয়া. জমিয়া এক) হেতু ন অনেন [এই অধ্যক্ষতারূপ নিমিত্তের জন্যই ; বিকলাঙ্গ অন্ধ ও পঙ্গুর ন্যায়ের অবতারণা করিয়া সাংখ্য যোগের যে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই সার্থক হইয়াছে সকলাঙ্গ পুরুষ ও সকলাঙ্গী প্রকৃতির নির্ম্মল সংযোগে] হে কৌন্তেয়, জগৎ বিপরিবর্ত্ততে [সচরাচর, ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ তত্ত্বতঃ অন্যথা ভাব প্রাপ্ত না হইয়া, বিবর্ত্তিত হইয়া, বিবর্ত্তবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বিশেষের ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তিত পরিণত হইতেছে ; বিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তের সমন্বয়ই বিপরিবর্ত্ত ; এই জগৎ-বিপরিবর্ত্তের চরম পরিণতি হইতেছে ভোক্তা পুরুষ 'আমি' ও ভোগ্যা প্রকৃতির অন্যোন্যমৈথুনের ফলস্বরূপ সর্ব্বাঙ্গের নিংড়ানো রস ফল নন্দনরূপে সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তম-মানুষ] (নাসদীয় সূক্ত বলিতেছেন—'কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আয়াতা কুতোহয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্ব্বান্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাস্য কো বেদ যত আবভুব। ইয়ং বিসৃষ্টি র্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।'—'এই বিসর্গ কাহা হইতে, বা কোথা হইতে আসিল, প্র অর্থ বিস্তার পূর্ব্বক এখানে কে বলিবে ? কে ইহা নিশ্চিত জানে ? দেবতারা এই বিসর্গের পরে হইল ; আবার উহা যেখান হইতে আসিল, কে জানিবে ? এই বিসর্গ যেখান হইতে আসিয়াছে কিম্বা সৃষ্টি হইয়াছে, বা হয় নাই, তাহা

তিনি জানেন যিনি পরম আকাশে অবস্থিত এই জগতের অধ্যক্ষঃ (হিরণ্যগর্ভ) কিম্বা না জানিতেও পারেন।' প্রকৃতির স্বাধীনভর্তৃকারূপ পারমার্থিক বলিয়াই সৃষ্টি তত্ত্ব এত প্রহেলিকাময়, আশ্চর্য্য। যে সৃষ্টির সম্বন্ধে স্বয়ং স্রষ্টা 'জানেন অথবা জানেন না'—এই দুইটীই পরমার্থ ভাবে সত্য, তেমন একজন স্রষ্টা ও তাঁহার সেই সৃষ্টির খবরই শ্রীভগবান্ গীতায় পৌছাইয়াছেন। শ্রীভগবান্ এমনই একজন স্রষ্টা।)

প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় সচরাচর জগৎ প্রসব করেন ; হে কৌন্তেয় এই হেতুতেই জগৎ বিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ৯।১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১

(পরম পুরুষ ও পরাপ্রকৃতির সকল অঙ্গের নিংড়ানো রসঘন 'নন্দন' মানুষ পুরুষোত্তম আমাকে কিন্তু) অবজানন্তি [অবজ্ঞা করে, পরাভব করে, ব্যর্থ করে] মাং [মানুষ আমাকে] মূঢ়াঃ [আত্মা-অনাত্মার, চৈতন্য-অচৈতন্যের জ্ঞ ও অজ্ঞের, দ্বন্দ্বমোহে মূঢ়গণ] (কিরূপ আমাকে ?) মানুষীং তনুম্ [মানুষী তনু] আশ্রিতম্ [প্রকৃতি ভজনের ফলে প্রকৃতির আশ্রিত-রূপে প্রাপ্ত তনু ; কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাঁহারই স্বরূপ', 'সবার উপরে মানুষ সত্য'] (কেন অবজ্ঞা করে) পরং ভাবং [আত্মা-অনাত্মার মধ্যস্থিত পরভাব অর্থাৎ স্বার্থ-পরার্থ শূন্য, পরস্পরের সমকক্ষতাময়, উপাধি-বিধুর সহজ ভাব] অজানন্তঃ [উপলব্ধি করিতে না পারিয়া] মম [আমার] ভূতমহেশ্বরম্ [সর্ব্বভূতের মাঝে আমাকে এবং আমার মাঝে সর্ব্বভূতের হোমদ্বারা শাসিত ভূতের দেহ-প্রাণ-মন নিংড়াইয়া নন্দনরূপে, শাসিতেরও শাসিতরূপে, ভূতমহেশ্বররূপে প্রকট ; শাসক ঈশ্বর যখন শাসিতের দ্বারা শাসিত হন, তখনই তিনি মহেশ্বর]।

আমার ভূতমহেশ্বর পর ভাব না জানিয়া মূঢ়গণ মানুষী তনুর আশ্রিত আমাকে অবজ্ঞা করে। ৯১১

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ৯।১২

(মানুষী তনুর অবজ্ঞাকারীদের শোচনীয় পরিণতি বলিতেছেন) মোঘাশাঃ [মোঘ, নিষ্ফল আশা যাহাদের ; যাহারা বিশ্বরূপ-আমার জীবনের বাহিরে আশা আকাঙ্ক্ষা পুরণের জন্যে রাজসী আসুরী প্রকৃতির শরণ লইল, তাহারা

বিশ্বরূপের সঙ্গে সঙ্কটে পতিত হইয়া নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থই করিবে, নিজেরাই তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিবে; আর যাহারা আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অশুচি মনে করিয়া তাহার গলা টিপিয়া মারিবার জন্য তামসী-রাক্ষসী প্রকৃতির শরণ লইল, তাহারাও ব্যর্থ হইল; কামরূপিনী আশার ছলনার হাত হইতে তাহাদের রক্ষা নাই। পুরুষোত্তম জীবনের বাহিরে আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত লড়িতে গিয়া উহার অনুবন্ধ কোথায়, উহাদ্বারা প্রকৃতির কতখানি ক্ষয়, কতটা হিংসা হয়, আশা আকাঙ্ক্ষার শক্তি কতখানি, ইহা না জানার জন্যই এই প্রচেষ্টা তামসী। 'অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং অনপেক্ষ্য চ পৌরুষং। মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম তত্তামসমুদাহৃতম্।'—যাহা পরে হইবে তাহার পূর্ব্বসূচনারূপে অনুবন্ধ, ক্ষয়, হিংসা এবং নিজের ও প্রতিপক্ষের সামর্থ্য অপেক্ষা না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়, সেই কর্ম্ম তামস] মোঘকর্ম্মাণিঃ [মোঘ কর্ম্ম যাহাদের; পুরুষোত্তম জীবনের বাহিরে যাহারা কর্ম্মকেই একমাত্র সত্য বলিয়া কর্ম্ম করিবার জন্য রাজসিকতা লইয়া ছুটিল, তাহাদের কর্ম্ম ও বিশ্বকর্ম্মের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ার ফলে তাহা ব্যর্থতায় পরিণত হইতে বেশীদূর যাইতে হইবে না; যাহারা পুরুষোত্তম জীবনের বাহিরে কর্ম্মের উপর নারাজ হইয়া, একান্ত কর্ম্ম না-করার উপর মূল্য আরোপ করিয়া তামসিকতার আশ্রয় নিল, তাহাদের কর্ম্মে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি তো আনিবেই না, বরং কর্ম্ম-ছাড়ার মোহে অভ্যুদয়ক্ষেত্রেও তাহারা পরাজয় স্বীকার করিবে, ক্লৈব্যে ডুবিয়া যাইবে] মোঘজ্ঞানাঃ [মোঘ জ্ঞান যাহাদের; যাহারা পুরুষোত্তম জীবনের বাহিরে স্বরূপের জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া রাজসী প্রকৃতির আশ্রয়ে একান্ত বিশ্বরূপ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজয় লাভের জন্য ছুটিল, তাহাদের বিজ্ঞান জ্ঞান-সহিত না হওয়ায় তাহাদের বিজ্ঞান মূর্ত্ত অজ্ঞান রূপে জগতের শোষণকর, ধ্বংসকর অবস্থার সৃষ্টি করিবে; যাহারা পক্ষান্তরে পুরুষোত্তম জীবনের বাহিরে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে ছাড়িয়া একান্ত স্বরূপের ক্ষেত্রে জ্ঞান পাইবার তামসিক নেশায় ছুটিল, তাহাদের সে জ্ঞান-প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইবে] (অতএব) বিচেতসঃ [বিক্ষিপ্ত চিত্ত] (সর্ব্বত্র হেতু প্রদর্শন করিতেছেন) রাক্ষসীং [হিংসাদি-প্রচুর তামসী] মোহিনীং [বুদ্ধিভ্রংশকারী] শ্রিতাঃ [অভিসন্ধি লইয়া আশ্রয় করে]।

উহারা নিষ্ফল আশাবিশিষ্ট, নিষ্ফল কর্ম্মা, ব্যর্থ জ্ঞানযুক্ত, সুতরাং বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া বুদ্ধিভ্রংশকারী রাক্ষসী (তামসী) ও আসুরী (রাজসী) প্রকৃতির আশ্রয় করিয়া থাকে। ৯।১২

—ক্রমশঃ—

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালজন্ম-শতবার্ষিকী

স্মৃতিপূজার প্রস্তুতি

আদিলীলা

'শ্রীনিত্যগোপাল পরম রূপবান চম্পক এবং গলিত সুবর্ণের ন্যায় তাঁহার সুন্দর কান্তি। তাঁহার মুখপদ্ম হইতে আনন্দ স্ফুরিত হইতেছে। তাঁহার মুখমণ্ডলে কোটি কোটি প্রভাকর-বিনিন্দিত তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য। তাঁহার নিরুপম মহাভাবের তুলনা নাই। তিনি জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানানন্দ। সমস্ত দিব্যভাবই তাঁহা হইতে বিকশিত হইয়া থাকে। তাঁহার নবীন নয়নদ্বয়ে কত কমনীয় জ্যোতিঃ বিলসিত রহিয়াছে। তিনিই মহানির্ব্বাণের কারণ। তাঁহার কৃপায় কত পতিত জীবও পরম ভক্ত হইয়াছে। তাঁহার দিব্য বিভূতি নিচয়ের মধ্যে পরাভক্তিও একটী বিভূতি। তিনি যে পরম প্রেমিক, সর্ব্ব জীবে তাঁহার প্রেম আছে। তিনি পরম দয়াল। তাঁহার অহৈতুকী দয়া। তিনি নিত্যানন্দ ব্রহ্ম সনাতন। সমস্ত বিধিনিষেধ তাঁহার কিঙ্করস্বরূপ। তিনি সর্ব্ব শক্তিমান। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁহার চিন্ময়ী মূর্ত্তি ধ্যান করি।'—শ্রীনিত্যগোপালের শ্রীহস্ত লিখিত আত্মধ্যান। এতদিন পর্য্যন্ত জড়াজড় সমন্বয়ের যে অভিনব তত্ত্ব আমরা আস্বাদন করিয়াছি, সেই অপূর্ব্ব সমন্বয়ের অপূর্ব্ব তত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীনিত্য-গোপাল তাঁহার অপরূপ রূপকে নিজেই নিজে আস্বাদন করিতেছেন।

এই অপরূপ মানুষটির সব কিছুই ছিল মধুর, সব কিছুই ছিল তাঁহার একই সঙ্গে অনুগ হওয়া ও অতীত থাকার সমন্বয় তত্ত্ব দিয়া মাখান। তাই যাহারা তাঁহাকে শিশুরূপে বুকের মধ্যে পাইয়াছিলেন, যাহারা তাঁহার প্রকাশ ও বিকাশকে আলোবাতাসের জগতে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছেও পরম আপন হইয়াও সেই শিশুকাল হইতেই তিনি অধর ছিলেন। তাই তাঁহার এত আদরের, এত শ্রদ্ধার মাতামহী—দাদা—তাঁহাকে প্রায়ই বলিতেন, 'গোপাল, তুই তো আর আমাদের ছেলে নস, তোকে যে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি।' ঠিক এই কথাই সেই কত কাল আগে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে

উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছিলাম ব্রজগোপীগণকে—'ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্'—তুমি নিশ্চয়ই শুধু গোপিকানন্দন নহ। শ্রীনিত্যগোপাল একান্তভাবে তাঁহার পিতৃকুলের নহেন, একান্তভাবে মাতৃকুলেরও নহেন—তিনি বিশ্বশূনু—তিনি বিশ্ব-মানবের।

সত্যই মাতামহীরা নিত্যগোপালকে কুড়াইয়াই পাইয়াছিলেন। এ বিশ্বে এ দেশে ও দেশে এ কালে সে কালে বিশ্বমানব হইয়া যাহারা আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবন বুঝিতে-না-পারা কতকগুলি অলৌকিক ঘটনাদ্বারা আবৃত থাকে। অবশ্য সাধারণ মানুষেরও জীবনে অভাবিত ঘটনা বা অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তের দেখা অহোরহই পাওয়া যায়। এই বিশ্বটাই লৌকিক অলৌকিকের মিলনে আশ্চর্য্যবৎ হইয়া আছে। তথাপি যাহাদের জীবন যত বেশী ব্যাপক ও গভীর, তাঁহাদের লৌকিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক ঘটনা ততবেশী ওতপ্রোত হইয়া জড়াইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, বুদ্ধদেব, মেরীর গর্ভে যীশু—ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই কতই না অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাই। ইহারা লৌকিক জগতে অলৌকিক জগতের প্রকাশকে বহন করিয়াই আসেন, সীমাবদ্ধ মানুষের মধ্যের অসীমকে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাদের কাছে দিব্য জীবনের খোঁজ পৌছান। শ্রীনিত্যগোপালের মধুময় লৌকিক জীবনের ঘটনাবলীর পাশে পাশে আকীর্ণ হইয়া আছে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা। যিনি আসিয়াছিলেন লৌকিক-অলৌকিক, বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান, সায়ান্স-মেটাফিজিক্স্, immanence-transcendence-এর দাবীর সমন্বয় করিতে, তাঁহার জীবনের ঘটনাসমূহে যে নরত্ব ও নারায়ণত্বের লক্ষণগুলির সমন্বয় সাধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ফিজিক্স্ আজ মেটাফিজিক্স্-এর সঙ্গে, দর্শনের সঙ্গে একীভূত হইবার জন্য আকুলিবিকুলি করিতেছে। জীবনটা তো শুধু বুদ্ধিগম্য নহে এবং বর্ত্তমান বুদ্ধিগম্যও নহে। যে-তত্ত্ব নিউটনের যুগে ধরা পড়ে নাই, আইনস্টিন-হাইসেনবার্গের কালে তাহা কতই না সহজ হইয়া গিয়াছে। মনের অতল সমুদ্রের যে কথা আজ মনঃসমীক্ষণবিদ্ ফ্রয়েডের কাছে ধরা পড়িল, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্দের কাছে এই সেদিনও অবিজ্ঞাত ছিল। তাই আমাদের এই বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে যে ঘটনা অলৌকিক, সেই বুদ্ধিকেই সামগ্রিক করিতে পারিলে অনেক ঘটনাই বোধগম্য হইতে পারে, লৌকিক বুদ্ধিতে ধরা পড়িতে পারে। বুদ্ধিমান মানুষের কাছে যাহা অর্থহীন, প্রাণের আলোতে তাই-ই মাধুর্য্যের

সত্য লইয়া প্রোজ্জ্বল। শ্রীনিত্যগোপাল পরস্পরবিরুদ্ধ এই দুইয়ের যোগসূত্ররূপে দাঁড়াইয়া আছেন; তাই তাঁহার জীবনে লৌকিক ঘটনার সাথে সাথে অলৌকিক ঘটনার সাক্ষাৎ প্রচুর পাওয়া যাইবে।

নিত্যগোপালকে মাতামহীরা কুড়াইয়াই পাইয়াছিলেন। পিতা জনমেজয়ের ঔরসে ও মাতা গৌরী দেবীর গর্ভে পর পর দুইটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেন, প্রথমা কৃষ্ণকামিনী, দ্বিতীয়া নিত্যকালী। শুধু কন্যা হওয়ায় মাতামহীর সাধ মিটিল না, একটী দৌহিত্র লাভের বাসনা তাঁহার প্রবল হইল। এরূপ শাস্ত্রপ্রবন্ধ প্রচলিত আছে যে, কাশীতে বীরেশ্বরের পূজা করিলে অপুত্রক পুত্র লাভ করে। ইহাতে বিশ্বাসী হইয়া মাতামহী গৌরীমণি সহ একমাস কাশীতে থাকিয়া প্রত্যহ স্বর্ণবিল্বদলে বীরেশ্বরের পূজা দিতে লাগিলেন গৌরীমণি অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাঁহার এই ভক্তি-বিনম্র পূজায় বীরেশ্বর খুশী হইলেন, প্রসাদ মিলিল। এক মাস পর পূজাসমাপনান্তে তাঁহারা মন্দির হইতে ফিরিতেছেন, এমন সময় দিব্যজ্যোতিঃ সম্পন্ন এক দীর্ঘকায় পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। আনন্দময়ীকে উদ্দেশ্য করিয়া সেই যতিবর বলিলেন, 'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। তোমার কন্যা এক পুত্ররত্ন লাভ করিবেন। এই পুত্রকে কাহারো উচ্ছিষ্ট খাওয়াইবে না এবং কখনও বাম হস্তে তাড়না করিবে না।' এই কথা বলিয়া যতিবর অন্তর্হিত হইলেন।

ভবিষ্যৎ কল্পনায় পুলকিত মাতামহী ও গৌরী দেবী কলিকাতায় ফিরিলেন কন্যাকে তাঁহার শ্বশুরালয়ে রাখিয়া মাতামহী পানিহাটীতে নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরেই গৌরীদেবীর গর্ভ সঞ্চার হইল এবং তিনিও পানিহাটীতে মায়ের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে আটমাস কাটিয়া গেল। পুত্র-সম্পদ লাভ-বাসনায় উৎফুল্ল গৌরী দেবী এই কয় মাস ধরিয়া দেহে মনে পবিত্র জীবন যাপন করিলেন, বীরেশ্বরের ধ্যানে দিন কাটাইলেন। তিনি ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করিতেন। গর্ভের অষ্টম মাস চলিতেছে। সেদিন সন্ধ্যায় আকাশে মেঘ করিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। পুণ্যশীলা গৌরীদেবী তাঁহার নিয়মিত সন্ধ্যাস্নানে আসিয়া গঙ্গার সমীপবর্ত্তী তাঁহার সখী দোলনকালী মন্দিরের পূজারীর স্ত্রীর নিকট বসিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া স্নানে গেলেন। বহুক্ষণ চলিয়া যায় অথচ গৌরীদেবী ফিরেন না দেখিয়া সখী চিন্তিত হইলেন, পুত্রকে

গৌরীদেবীর সন্ধানে পাঠাইলেন। পুত্র আসিয়া দেখেন নদীতীর জনশূন্য, গঙ্গায় বান ডাকিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার, টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিবার পর তিনি দেখিলেন মাঝগঙ্গায় যেন চুল ভাসিতেছে। ঝাপাইয়া পড়িলেন, কেশ ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া দেখেন সত্যই তাঁহার সই-মা। সই-মা বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। গৌরীদেবী গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিয়া গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন। এমন সময় গঙ্গায় বান ডাকিয়াছিল এবং গৌরীদেবীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

সেইদিন রাত্রিতেই গৌরীদেবীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। সেদিনটী ছিল চৈত্রমাসের বাসন্তী অষ্টমী তিথি। কিন্তু প্রচুর রক্তস্রাবের পরও প্রথমে ধাত্রী সন্তানাদি কিছু খুঁজিয়া পাইল না। পরে দেখা গেল কিছু একটা নড়িতেছে। মাতামহী দেখিলেন পুত্র নহে, কন্যা। বীরেশ্বরের সাধনা ব্যর্থ হইল দেখিয়া মাতামহী আকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রকাশ পাইল কন্যা নহে—অপরূপ লাবণ্যময় এক পুত্র সন্তান।

সেদিন বিশ্বের অবচেতন সত্তা পুলকিত হইয়াছিল, শিহরিয়া উঠিয়াছিল। চেতন-অচেতন, জড়-অজড় সকলকেই যিনি ভালবাসিতে পারেন, সকলেরই গৌরব যিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহারই আগমনে সেদিন বিশ্বের চেতন-অচেতন সত্তা আনন্দ শিহরণে কম্পিত হইয়াছিল। আর যাহারা কাছে ছিল, সেই ঘরের লোক, পাড়ার লোক, গ্রামের লোক বিস্ময়ে, পরম আনন্দে, পরম সোহাগ ভরে একটী অনিন্দ্যসুন্দর শিশুকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল।

শিশু বাড়িতে লাগিলেন, যেমন করিয়া বিশ্বের ঘরে ঘরে আপন জনকে মোহিত করিয়া, পাড়াপ্রতিবাসীকে পুলকিত করিয়া বহুআকাঙ্ক্ষিত শিশু সকলের নয়নমনপ্রাণ তৃপ্ত করিয়া বাড়িতে থাকে, আমাদের নিত্যগোপালও তেমনই সকলের মনপ্রাণ তৃপ্ত করিয়া বাড়িতে লাগিলেন। সে যে কী আনন্দ, কী মধুর তাহা প্রতি পিতামাতাই কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তথাপি নিত্যগোপাল আর দশজন শিশুর মতই ছিলেন না। আর দশজনের মত তিনিও হাসিতেন, নাচিতেন, তাঁহার মাতাঁমাতামহীর পাড়াপ্রতিবেশীর আনন্দমুগ্ধ ক্ষণগুলিও অপরূপ হইয়া ফুটিয়া থাকিত, তথাপি নিত্যগোপাল আর দশজন শিশুর মত নহেন—অন্তরের মনোবৃত্তিতেও নহে, বাঁহিরের ঘটনাতেও নহে।

নিত্যগোপালের শিশুজীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায় যে, তিনি যতক্ষণ এই জগতের মধ্যে আছেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রতিটী ঘটনায় প্রেমের ঔদার্য্য, জ্ঞানের বিরাটত্ব, কর্ম্মের নৈপুণ্য, চরিত্রের বিস্তার প্রকাশ পায়; আবার তিনি প্রায়শঃই নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইয়া সমস্ত চেতন সত্তার বাহিরে চলিয়া যান। আড়াই বৎসর বয়স হইতেই নিত্যগোপালের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইত এবং দেহরক্ষা পর্য্যন্ত তিনি যে কত লক্ষ বার সমাধিস্থ হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। নিত্যগোপাল যখন আড়াই বৎসরের শিশু, তখন একদিন তাঁহার দেহ খুব উষ্ণ হইয়া স্পন্দনহীন হইয়া গেল—হাত পা ঠাণ্ডা—সমস্ত দেহ নিঃসাড়। মাতা-মাতামহী পাড়াপ্রতিবেশী গোপালের মৃত্যু হইয়াছে বুঝিয়া শোকে আকুল হইলেন। দীর্ঘ সময় পর্য্যন্তও যখন দেহে চেতনা ফিরিয়া আসিল না, তখন দেহ সংকার করাই স্থির হইল। এমন সময় আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এক সন্ন্যাসী। তিনি জানাইলেন যে শিশুর এ মৃত্যু নয়—এ নির্ব্বিকল্প সমাধি। তাঁহারা যেন দেহ সংকার না করেন। শুনিয়া আত্মীয়স্বজন দেহে প্রাণ পাইলেন। তাঁহারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিন দিন পর আবার ধীরে ধীরে দেহে স্পন্দন ফিরিয়া আসিল, শিশু স্বাভাবিক হইলেন। এইভাবে শিশু বয়স হইতেই মুহূর্মুহুঃ নিত্যগোপাল এই জড় জগতের ওপারে চলিয়া যাইতেন। এই-ই যাহার জীবন, মহানির্ব্বাণের যিনি কারণ, নিজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া যিনি লিখিয়া গিয়াছেন, '......উদার (এই) মহাপুরুষ-সমুদ্রতুল্য। তিনি (ই-নি) কেবল আর্য্যের নহেন। এই সেই মহাপুরুষ সমুদ্রে পৃথিবীর সমস্ত মতরূপ নদ-নদীই সম্মিলিত হইয়াছে। এই সেই মহাপুরুষই সমস্ত সংশয় ভঙ্গের নিদান। এই সেই মহাপুরুষ যে হরিচৈতন্যের বিকাশ। এই মহাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই বেদে অয়মাত্মা ব্রহ্ম বলা হইয়াছে' —নিজের এই স্বরূপকে যিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মস্বরূপ সেই নিত্যগোপালের সমগ্র জীবনের উহা একদিক, অপরদিকে তাঁহার বাস্তব প্রত্যক্ষ জীবনের ঘটনাগুলিও সামগ্রিকতার পবিত্র সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া অ-সাধারণ অভাবিতপূর্ব্ব ও অপরূপ হইয়া আছে। নিত্যগোপালের শিশুকালের কয়েকটি অলৌকিক ঘটনায় আমরা দেখিব কেমন করিয়া দশজনের মত হইয়াও তিনি দশজনের মত নহেন, ক্ষণে ক্ষণে আর একটা ব্যাপকতর জগতের আহ্বান কেমন করিয়া ভাসিয়া আসে, আর যখন হইতে শিশুর মনের

বিকাশ হইয়াছে, তখন হইতে মনোবৃত্তিতে কেমন করিয়া তাঁহার সামগ্রিক জীবনের (integral life) অসাধারণ সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহাও আমরা দেখিব।

ছোট্ট শিশু একদিন দোলনা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন—কিছুক্ষণের জন্য শিশুকে পাওয়া গেল না—সকলে শোকে মূহ্যমান হইলেন। ইহার পরেই আবার দেখা গেল শিশু দোলনাতেই আছেন।—বুদ্ধি মোহিত হইল !

আর একদিন দোলনায় শায়িত শিশুর মুখে রৌদ্র আসিয়া পড়ায় দেখা গেল এক সাপ আসিয়া ফণা ধরিয়া রোদ আটকাইতেছে। অপর একদিন এক হনুমান আসিয়া শিশুকে কোলে লইয়া গাছে উঠিল—পরে দুধকলা পাইয়া শিশুকে দোলনায় শোয়াইয়া দিল।—বুদ্ধি এখানেও স্তব্ধ হইল !

দিদিমা কোলে করিয়া পায়চারী করিতেছিলেন, শিশু গোপাল তাঁহার কাণে দিদিমার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। দিদিমা সচকিত হইলেন, ভক্তি বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া তিনি গোপালকে কোল হইতে নামাইলেন—বাৎসল্যভাব ভুলিয়া গোপালকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দিদিমার অন্তরে বাৎসল্যভাব আবার ফিরিয়া আসিল, গোপালকে স্নেহভরে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন।—বুদ্ধি থেই হারাইল !

অষ্টম মাসের শিশুর অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত। মাতামহী কাশীতে যাইয়া বহু সাধু সন্ন্যাসীকে খাওয়াইয়া বীরেশ্বরের প্রসাদ শিশুর মুখে দিয়া তাঁহার অন্নপ্রাশন করাইলেন। ইহার পর পানিহাটীতে ফিরিয়া কুলপ্রথানুযায়ী বিশেষ আড়ম্বর সহ তিনি আবার সে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। শিশুর বিভিন্ন নামকরণ হইল। মাতা গৌরী দেবী নাম রাখিলেন কালীকুমার, অপর নাম হইল বীরেশ্বর, প্রসন্নকুমার, বলভদ্র; আর মাতামহী নাম রাখিলেন নিত্যগোপাল। এই নাম আজও চলিতেছে। ইহার পর একটী পাত্রে গীতা, ভাগবত, ধান্য, মৃত্তিকা, স্বর্ণ প্রভৃতি লইয়া শিশুর সম্মুখে ধরা হইল। শিশু নিত্যগোপাল একবারেই গীতাখানি তুলিয়া লইলেন। ইহাতে সকলেই শিশুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পুলকিত হইলেন। পরবর্ত্তীকালে নিত্য-গোপাল লিখিয়াছেন, 'গীতা আমার সারাৎসার। গীতা কি সামান্য পুঁথি ? গীতার টীকা পরম জ্ঞান, পরম জ্ঞান গীতার মহা ভাষ্য। মাগো ! গীতা কি সকলে বুঝিতে পারে ? তুমি যে মা নিজে গীতা।'

ইহা ছাড়াও অতি অল্প বয়সেই কত অলৌকিক ঘটনাই যে তাঁহার জীবনে আছে। দুধের বাটীতে কালী দর্শন করিয়া ছিলেন, হরি বাসরে উপস্থিত মহিলাগণকে বাল গোপাল মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন, মাতাকে ব্রহ্মচর্য্য উপদেশ দিয়াছিলেন ইত্যাদি বহু বহু ঘটনার উল্লেখ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সম্ভব নহে। এইটুকুই আমরা জানিয়া রাখিলাম যে, বাস্তব এই প্রত্যক্ষ জগৎটাকে যিনি পরম মূল্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং সেইভাবে আচরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষের অতীত আর একটা জগৎ ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিয়া যাইত। তিনি যে দুই জগতের সমন্বয় করিতেই আসিয়াছিলেন, তাই দুই জগতেই তিনি সমানভাবে বিচরণ করিবার যোগ্যতা রাখিতেন।

শিশু গোপালের পিতৃরিষ্টি আছে—দৈবজ্ঞ বলিয়াছিলেন। তাই মাতামহী এতদিন পর্য্যন্ত শিশুকে তাঁহার পিতৃ সকাশে যাওয়া হইতে বিরত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরীদেবী ইহা জানিতেন না। একদিন তিনি কলিকাতায় মাতুলালয়ে অবস্থানকালে ধাত্রীকোলে শিশুকে সাজাইয়া আহিরীটোলায় পাঠাইয়া দিলেন। পিতা জনমেজয় শিশুকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাঁহাকে কোলে লইয়া আদর করিলেন. নাম রাখিলেন সেজোবাবু; ধাত্রীকে পুরস্কৃত করিলেন। ইহার পরেই পিতৃদেব গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া দেহরক্ষা করিলেন।

নিত্যগোপাল এখন অনেকটা বড় হইয়াছেন, এখন তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হইয়াছে। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ছিল তাঁহার অসাধারণ এবং তাহা শিশুকাল হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। বালক দেখিলেন তাঁহার মাতার সংসারে ঔদাসীন্যের সুযোগ লইয়াই পিতার বিপুল সম্পত্তি হইতে দেওয়ান তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন। একটা স্বভাবসিদ্ধ তেজবীর্য্য সেই বালক বয়সেই দেখা গিয়াছিল। দেওয়ানকে শাসাইয়া রোষকশায়িত লোচনে একদিন তিনি বলিলেন, 'দেখ, কেউটে সাপের বাচ্চা ক্ষুদ্র হলেও তার বিষ আছে।' —এইভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ তিনি সেই বালক বয়সেই করিতে পারিতেন। তাঁহার বিরাটত্বের মধ্যে অপরের দ্বারা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হওয়ার দুর্ব্বলতার স্থান ছিল না।

পাঁচ বৎসরের বালক একদিন সঙ্গীদের সঙ্গে খেলিতে খেলিতে দূরে গিয়াছেন, গলায় তাঁহার এক গ'ছা মোটা সোনার হার। এক চোর ছেলেকে আদর করিয়া এ কথা সে কথা বলিয়া কোলে করিয়া লইয়া চলিল। একটু

দূর যাইতে এক পাহারাওয়ালাকে দেখিতে পাইয়া নিত্যগোপাল তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাহারাওয়ালা, ও পাহারাওয়ালা, এই চোর আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।' চোরটি বিস্মিত হইল। ছোট হইলেও শিশুটি আদরের কথায় ভুলেন নাই, ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল।

একজন সুস্থ মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের যে সকল গুণ থাকিতে পারে অথচ সাধারণতঃ যাহা মানুষের মধ্যে দেখা যায় না, তেমন সমস্ত গুণই নিত্যগোপালের ছিল। মানুষের দুঃখ দেখিলে সেই শিশুবয়স হইতেই তিনি বেদনা বোধ করিতেন—নিজের গায়ের জামাকাপড় ভিখারীকে দিয়া একেবারে উলঙ্গ হইয়া শিশু নিত্যগোপাল বাড়ী ফিরিয়াছেন, এমনও হইয়াছে। আবার ক্ষুধার্ত্ত একদল মানুষকে রাত্রি দ্বিপ্রহরেও খাওয়াইবার জন্য শিশু মাতাকে প্ররোচিত করিয়াছেন।

নিত্যগোপালের মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবধারার সম্মিলন সেই শিশুকাল হইতেই পাওয়া যাইবে। ঐ অল্প বয়সেই যেমন তাঁহার সমাধি হইত, বীরাসনে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যাইতেন তেমনি চঞ্চলও ছিলেন খুব। নিত্যগোপালের স্মৃতিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ ছিল—পাঠশালা হইতেই একবার যাহা পড়িতেন, তাহাই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। শ্রেণীতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন, আবার চঞ্চলতাতেও ছিলেন প্রথম। আর খেলাধূলাতে তাঁহার আগ্রহ ও যোগ্যতা ছিল খুব। চপল বালকের বিদ্যালয় হইতে পলায়নের স্বভাবও ছিল। শিক্ষকমহাশয় ক্রুদ্ধ হইতেন, অপর বালকদের তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে পাঠাইতেন, কিন্তু তাহারা যখন নিত্যগোপালকে ধরিয়া আনিয়া শিক্ষকের নিকট উপস্থিত করিত, তখন নিত্যগোপালের অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা দেখিয়া আর তাঁহাকে শাস্তি দিতে পারিতেন না—এমনই একটী মাদকতা নিত্যগোপালের চেহারায় ও স্বভাবে ছিল।

নিত্যগোপাল প্রত্যহ পাঠশালা হইতে আসিয়া গঙ্গা স্নান করিতেন। নিকটেই এক বাবাজী থাকিতেন, তিনিও স্নানে আসিতেন। একদিন বাবাজী স্নানরত নিত্যগোপালকে গৌররূপে দর্শন করিলেন। বাবাজী দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে তাঁহার সাধনার ধন, তাঁহার জীবনদেবতা। বাবাজীর জীবন ধন্য হইয়া গেল। নিত্যগোপালকে তাঁহার কুটীরে লইয়া

গিয়া বাবাজী তাঁহার ভিক্ষালব্ধ বস্তুদ্বারা নিত্যগোপালের ভোগ লাগাইলেন। বাবাজীর প্রাণভরা অনুরোধে প্রাণের ঠাকুর নিত্যগোপাল ইহার পর হইতে প্রত্যহই বাবাজীর কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেন।

উত্তরকালে যে নিত্যগোপাল তাঁহার জাতিদর্পণ নামক পুস্তকে একই ব্রহ্মার সন্তান হইয়া চতুর্ব্বর্ণ যে পরস্পর পরস্পরের নিকট অস্পৃশ্য হইতে পারে না, এ তত্ত্ব দার্শনিকভাবে প্রমাণ করিয়া ছিলেন, সেই নিত্যগোপাল শিশুকালে নীচকুলসম্ভূতা তাঁহার ধাত্রীমাতার অন্ন গ্রহণ করিয়া ঐ তত্ত্বের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধাত্রীমাতা নিত্যগোপালকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, কিন্তু নীচ জাতীয়া বলিয়া নিত্যগোপালকে কিছু খাওয়াইয়া প্রাণের সাধ মিটাইতে পারিতেন না। প্রাণবল্লভ নিত্যগোপাল প্রাণের এ দুঃখ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। একদিন ধাত্রীমাতা দরিদ্রের অমৃত শাকান্ন খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় কোথা হইতে নিত্যগোপাল আসিয়া খুব স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন, 'ধাইমা, বড় খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।' ধাত্রীমাতা উভয়সঙ্কটে পড়িলেন। কিন্তু নিত্যগোপাল আর সময় না দিয়া ঐ শাকান্ন খাইবার জন্যই আব্দার জানাইতে লাগিলেন। ধাত্রীমাতা অগত্যা বুকভরা আনন্দ লইয়া চোখের জলে নিত্যগোপালকে শাকান্ন খাইতে দিয়া তৃপ্ত হইলেন, নিজকে ধন্য মনে করিলেন।

পানিহাটীতে নিত্যগোপালের দিনগুলি হাসি খেলার মধ্য দিয়া মাতামহীর কোলে অতি আনন্দেই কাটিতেছিল। কিন্তু এইবার পট পরিবর্ত্তন হইতে চলিল। মাতা গৌরী দেবী একদিন কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহরক্ষা করিলেন। অষ্টম বৎসরের বালক নিত্যগোপাল সমস্ত চপলতা ভুলিয়া মায়ের কাছে সারাক্ষণ বসিয়া ছিলেন। মায়ের শোকে নিত্যগোপাল আকুল হইয়া পড়িলেন, মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সংসারে আর দশজন সন্তান যেমন করিয়া মায়ের জন্য আকুল হয়, নিত্যগোপাল বুঝি মায়ের জন্য তাহা হইতেও অধিকতর আকুল হইলেন। এই আকুলতাও তাঁহার সমন্বয় তত্ত্বকেই প্রকাশ করিতেছে। ব্রহ্ম বলিয়াই, এত বড় বলিয়াই মায়ের জন্য প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারিলেন, আবার ধ্যানস্থ হইতেও তাঁহার দেরী হয় না। পুণ্যশীলা গৌরীমণির শেষ সময়ে তাঁহার সম্মুখে তাঁহার ইষ্টদেবী কালী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দেবীর আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া ঐ শোকের

মধ্যেও নিত্যগোপাল ধ্যানস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কতখানি ব্যাপকতা থাকিলে একই সময়ে অন্তর্মুখীনতা ও বহির্মুখীনতা সম্ভব হয়—ভাবিলে বিস্ময় লাগে! এই মায়ের কথা বলিতে বলিতে উত্তরকালে তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, এমনও হইয়াছে।

যাহাহউক, মায়ের দেহরক্ষার পর পানিহাটীর আনন্দহাট ভাঙ্গিয়া গেল এবং নিত্যগোপাল নিজেও যেন খানিকটা বদলাইয়া গেলেন। পূর্ব্বের চাঞ্চল্য অনেকটা স্থির হইয়া আসিল, অনেক সময়ই তিনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। কন্যার শোকে মাতামহী আর পানিহাটীতে থাকিতে না পারিয়া কাশীবাসী হইলেন আর নিত্যগোপাল কলিকাতায় তাঁহার মেশোমহাশয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নিকটে থাকিয়া জেনারেল এসেম্ব্লী ইনস্‌টিটিউসনে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পড়াশুনায় তাঁহার মন ছিল বটে কিন্তু একটা প্রবল অন্তর্মুখীনতা তাঁহাকে মাঝে মাঝেই স্তব্ধ করিয়া দিত। একদিন স্কুলের টিফিনের সময় নিত্যগোপাল স্কুলের একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া এরূপভাবে ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন যে, কখন ক্লাসে যাইবার ঘণ্টা পড়িয়াছে তাহা তিনি শুনিতেই পাইলেন না। তাঁহার মুদিত চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতেছিল। স্কুলের ইংরেজ অধ্যক্ষ সমস্ত ছেলেরা ঠিকমত ক্লাশে গিয়াছে কি না দেখিতে আসিয়া নিত্য-গোপালকে ঐ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিত্যগোপাল চোখ মেলিয়া তাকাইলেন। অধ্যক্ষ নিত্যগোপালের নিকট তাঁহার এরূপ ভাবে ধ্যানস্থ হইবার বিষয় জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন যে দেশে এতটুকু ছেলে এরূপ ভাবে আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইতে পারে, সে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসা নিতান্তই মূর্খতা।

বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা পাঠ দীর্ঘকাল চালাইয়া যাওয়া নিত্যগোপালের পক্ষে সম্ভব হইল না। তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকায় তিনি নিজেই বহু বিষয় পড়িয়া লইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে বহু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সে সকল শাস্ত্র একবার পড়িয়াই এমনভাবে তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাদের অংশ বিশেষ পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে বিদ্যালয়ের পাঠ ছাড়িয়া তিনি ঢাকাতে গভর্ণমেণ্ট অফিসের কোনো বিভাগে কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। একটা অন্তর্মুখীনতা নিত্যগোপালকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ

করিলেও তাঁহার করণীয় কাজটুকু সর্ব্বদাই তিনি বিশেষ যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে করিতেন। এজন্য সর্ব্বত্র তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

নিত্যগোপালের নবনীত কোমল দেহ শুধু কোমল ছিল না, তাহা বিশেষ শক্তির আধারও ছিল। এমন সুন্দর, এমন নরম, এমন লাবণ্যময় যে দেহ, সে দেহে যে আবার মল্লযোদ্ধার মত শক্তি থাকিতে পারে, একথা আশ্চর্য্য শোনায়। কিন্তু এ কথা সত্য। ঢাকায় চাকুরী করা কালীন একদিন নিত্যগোপাল অফিস হইতে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিবার সময় ঘটনাক্রমে সঙ্গে কিছু টাকা লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর এক পুলের উপর এক গুণ্ডা তাঁহাকে আক্রমণ করে। দুইজনের মধ্যে বহুক্ষণ শক্তি পরীক্ষা হয়। নিত্যগোপাল গুণ্ডাটীকে ঘুষির পর ঘুষি দিয়া কাবু করিয়া বাড়ী চলিয়া আসেন। পরের দিন সেই গুণ্ডা নিত্যগোপালের বাসায় আসিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া বলে যে, আজ হইতে নিত্যগোপাল তাহার দোস্ত হইলেন। একজন ভদ্র কিশোরের দেহে এত বল থাকিতে পারে, গুণ্ডা তাহা ধারণা করিতে পারে নাই।

অনেক কর্ম্মনৈপুণ্যের মত ভোজন করিতে ও রন্ধন করিতেও নিত্যগোপাল বিশেষ নিপুণ ছিলেন। একদিন তিনি রান্না করিতেছেন, এমন সময় একদল গোরা সৈন্য তাঁহাদের বাসায় ঢুকিয়া পড়ে। কয়েকটী মেয়ে বাড়ীতে ছিলেন, তাঁহাদের প্রতিই গোরা সৈন্যদের মনোযোগ নিবদ্ধ হইল। রন্ধনরত নিত্যগোপাল একটী জ্বলন্ত কাঠ হাতে লইয়া গোরাসৈন্যদের তাড়া করেন। এরূপভাবে আক্রান্ত হইয়া তাহারা যে সভয়ে পলাইয়া গেল, তাহা বলাই বাহুল্য। নিত্যগোপাল ঘোড়ায় চড়িতেও পারিতেন। অর্থাৎ যতদিন সংসারের দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মগুলি করিবার মত অবস্থা তাঁহার ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত একটা সামগ্রিকতা আর একটা প্রাণস্পর্শ তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল—একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এই সময়ে নিজের সম্পত্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে মেশোমহাশয়ের আহ্বানে নিত্যগোপাল কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাইরা তাঁহার ন্যায্য অংশ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতেছিলেন। আদালতের সাহায্যে নিত্যগোপাল সে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিলেন।

একবার কর্ম্মত্যাগ করার পর চেষ্টা করিয়াও নিত্যগোপাল আর কর্ম্মে মন দিতে পারিলেন না। শিশুকালের খেলা হইতে বিদ্যাভ্যাস এবং কিছুদিনের

জন্ম কর্ম্ম পর্য্যন্ত করিয়া নিত্যগোপাল প্রতি ক্ষেত্রেরই সম্মান রক্ষা করিলেন, সেই সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহার সামগ্রিক সমন্বয়তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁহার অন্য কাজও ছিল, আজ তাহারই আহ্বান আসিয়া গিয়াছে। এতদিনের নিত্যগোপাল আর আজিকার নিত্যগোপাল ঠিক যেন একই মানুষ নহেন। একটী সদা উৎফুল্ল চপল বালক আজ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ যুবকে পরিণত হইয়াছেন। এখন তাঁহার সর্ব্বদাই আত্মভোলা অবস্থা, বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় নাই বলিলেই চলে। অল্প বয়সে যখন ধ্যানস্থ হইতেন, তখন সে সময়টা ছাড়া সাধারণতঃ তিনি সদা উৎফুল্ল ছিলেন। কিন্তু এখন সর্ব্বদার জন্যই একটা আত্মভোলা অবস্থা। প্রতিদিনই তিনি কালীঘাটের নিকটবর্ত্তী ত্রিকোণেশ্বরের শিব-মন্দিরে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। এইখানেই ১২৭৭ সনে একদিন পরমহংসাচার্য্য শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজ নিত্যগোপালকে দেখিয়া ডাকিলেন, 'বাচ্চা, ইধর আও।' নিত্যগোপাল কাছে আসিতে বলিলেন, 'আস্নান্ করকে আও, তুমহারী চিজ লে যাও।' স্নান করিয়া আসিতে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহাকে ষোল বৎসর বয়সে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেই নিত্যগোপাল সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নিত্যগোপাল স্বীয় গুরুদেবের নিকট তাঁহার যখন যে বেশ পরিবার প্রয়োজন হইবে, তখন তাহা পরিবেন, এই অনুমতি চাহিয়া রাখিয়াছিলেন। গুরুদেব বলিয়াছিলেন, 'তোমার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই রহিল।' যে-নূতন জীবনের আভাস এতদিন নিত্যগোপালের জীবনে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছিল, দীক্ষা গ্রহণের পর তাহা স্পষ্ট রূপ লইতে চলিল।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বাঙ্গালী ছিলেন। দীর্ঘকাল হইল বেলুচিস্থানের অন্তর্গত 'হিঙ্গুলা'য় আশ্রম করিয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি অবধূত সম্প্রদায়ের কেবলানন্দ শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 'ভাগবতোক্ত অষ্টমাবতার ভগবান ঋষভদেব এই সম্প্রদায়ের কেবলানন্দ শাখার আদি পুরুষ। অবধূত সম্প্রদায় ভারতের প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ঋষভদেবের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম কেবলানন্দ। ঋষভদেবই আবার জৈন সম্প্রদায়ের আদি তীর্থঙ্কর। এই কেবলানন্দেরই সন্ন্যাসী-শিষ্যপরম্পরার সূত্র ধরিয়া সমন্বয়মূর্ত্তি যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের আবির্ভাব। শ্রীনিত্যগোপালই অবধূত সম্প্রদায়ের চরম পরিণতিরূপে এই সম্প্রদায়কে উজ্জীবিত করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যৎ বিশ্বের গঠনোপযোগী একটী সমন্বয় দর্শন দিয়া গিয়াছেন এবং সমন্বয়ঘন

জীবনও আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান ঋষভদেবের জীবনে বেদান্তের একত্ববাদ ও জৈনদের বহুত্ববাদের সমন্বয়ের যে বীজ নিহিত ছিল, যাহার জন্যই বেদান্তবাদী ও জৈন সম্প্রদায় যে যাহার মত স্ব স্ব ইষ্টদেবরূপে তাঁহাকে লইতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই বীজেরই মূর্ত্তিমান মহীরুহ হইতেছেন শ্রীনিত্যগোপাল।

অব পূর্ব্বক ক্ত প্রত্যয়ান্ত ধূ ধাতু হইতে অবধূত শব্দ নিষ্পন্ন। ধুনরী তুলা ধুনিয়া তাহাকে নির্ম্মল করে, সেইরূপ যিনি নিজ জীবনের সকল সংস্কারকে ধুত, নির্ম্মল করিয়াছেন, শুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই অবধূত শ্রীনিত্যগোপাল মহানির্ব্বাণতন্ত্রের শ্লোক উদ্ধার করিয়া অবধূতের লক্ষণ দিতেছেন

ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী।
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ॥
ন শৈবো ন শাক্তো ন বা বৈষ্ণবশ্চ।
রাজতেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ॥

'অবধূত যোগীর ন্যায় যোগনিয়মের বশীভূত নহেন, বিষয়ীর ন্যায় ভোগপরায়ণ নহেন, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নহেন, তিনি বীরের ন্যায় বল প্রকাশক নহেন, ধীরের ন্যায় সংযমাভ্যাসী নহেন, জপজপাদি সাধনকারী মন্ত্রসাধকও নহেন। তিনি শৈব নহেন, শাক্ত নহেন, বৈষ্ণব ও নহেন। তিনি কোন উপাসক সম্প্রদায়ের নিয়ম নিষেধের অনুগামী বা বিদ্বেষ্টা নহেন; তিনি পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করেন। শ্রীনিত্যগোপালের সন্ন্যাস আশ্রমের পরিচয়: সম্প্রদায়—অবধূত; শাখা কেবলানন্দ; পন্থী—ঋষভ; মঠ—মহানির্ব্বাণ; ক্ষেত্র—কাশীধাম; তীর্থ—উত্তরবাহিনী গঙ্গা; বেদ—সামবেদ: মহাবাক্য—তত্ত্বমসি; দেব—সদাশিব, দেবী—আদ্যাকালী; গুরু—ঋষভাবতার পরমহংসাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত ব্রহ্মানন্দ দেব; যোগপট্ট—যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব।

সর্ব্ব মতবাদ, সর্ব্ব বৃত্তি, সর্ব্ব গুণ ক্রিয়া অর্থাৎ সর্ব্ব বিশেষের সমন্বয়ে এই যে নির্ব্বিশেষ সমন্বয়তত্ত্ব, এই তত্ত্বকে বর্ত্তমান বিশ্বের কাছে জীবন ও দর্শনের মধ্য দিয়া প্রাণের স্তরে স্থাপন করিতে শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব। এ তত্ত্ব তর্কের বিষয়ীভূত নহে, ইহা জীবন দিয়া উপলব্ধি করিবার বিষয়। স্থিতি থাকিলেই গতি থাকিবে, আলো থাকিলেই অন্ধকার থাকিবে, নির্গুণ থাকিলেই সগুণ থাকিবে, সুষুপ্তি থাকিলেই জাগ্রৎ থাকিবে, ব্রহ্ম থাকিলেই মায়া থাকিবে—এই সহজ তত্ত্বটীকে সমগ্র জীবনের আলোকে নিত্যগোপাল মিলাইয়া দিতে

আসিয়াছেন। প্রাণস্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াই এবার তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। বৈপরীত্যের এই সূক্ষ্মতম সমন্বয় তত্ত্বের ও বুদ্ধিপ্রধান ঐকদেশিক সভ্যতায় কাছে প্রাণধারার প্রবর্ত্তক শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন। বন্দেমাতরম্

পুত্রদায়

ফুল্লরা রায়

(বিদেশী গল্পের অনুবাদ)

তুষার ঝরা এক শীতের সকালে নরওয়ের এক গণ্ড গ্রামের গীর্জ্জায় থড্ ওভারেস্ এসে প্রবেশ করল। পাদ্রি মহাশয় তাঁর পড়ার ঘরে বসে ছিলেন—সম্পন্ন চাষী ভক্তকে দেখে হেসে মুখ তুলে তাকালেন।

বুক উঁচিয়ে লম্বা চওড়া জোয়ান থড্ চেঁচিয়ে বলল আনন্দে—

"আমার একটি ছেলে হয়েছে, তার নামকরণের দিন ঠিক করে দিন্।"

"কি নাম দিতে চাও?" পাদ্রী বল্লেন।

"আমার বাবার নাম অনুসারে দিতে চাই ফিন্।"

"কে ধর্ম্মবাপ হবে?" পাদ্রী প্রশ্ন করলেন।

তারও নাম বলা হোল। থড়ের আরও কি বলার আছে মনে করে পাদ্রীসাহেব আবার প্রশ্ন করলেন্-"আর কিছু বল্‌বে?" "আমি নিজেই তাকে দীক্ষা দিতে চাই।" "বেশ আগামী শনিবার বেলা দশটার সময় তাকে নিয়ে এস।" থড্ যাবার উপক্রম করে আবার ফিরে এসে টেবিলের ওপর কয়েকটা টাকা রেখে বলল,—"আপনি তাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" পাদ্রী উঠে দাঁড়িয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন্—

"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,—এ ছেলে তোমার মনে শান্তি এনে দেবে, তোমাকে সুখী করবে।"

* * *

ষোলো বছর পরে হেমন্তের আর এক সকালে থড্ এসে ঢুকল পাদ্রী সাহেবের ঘরে। পাদ্রী তাকে দেখে তখনি চিন্‌তে পেরে বললেন্—"এই যে থড্, তুমি দেখ্‌ছি মোটেই বদলাওনি, একই রকম চেহারা রয়েছে।"

থড্ বল্‌ল হেসে—"তার কারণ আমার মনে পুর্ণ শান্তি রয়েছে।" পাদ্রী প্রশ্ন করলেন—"আজ কি মনে করে?"

থড্ বল্‌ল—"আমার ছেলেকে আপনার গীর্জায় পড়াশুনার জন্য দিতে চাই—তাকে নাগরিকের সম্মান দিয়ে যীশুর নামে উৎসর্গ কর্‌ব।" পাদ্রী হেসে বল্‌লেন,—"বেশ কথা, কালই তাকে এখানে ভর্ত্তি করে দিও।"

থড্ বল্‌ল,—"তাকে কিন্তু একটু যত্ন করে দেখ্‌বেন।"

পাদ্রী উঠে দাঁড়িয়ে তার গায়ে স্নেহভরে হাত দিয়ে বললেন, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—তার অনাদর হবে না।" থড্ একটু ইতস্তত: করে দশটা টাকা টেবিলের ওপর রেঁখে বল্‌ল—"এটা আমার প্রণামী।"

*　　　　*　　　　*

আরো আট বছর কেটে গেছে। আর একদিন বসন্তের রৌদ্র-প্লাবিত আনন্দ-মুখরিত সকালে থড্ একদল চাষীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরে এসে ঢুকল—পাদ্রী হেসে তাঁদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন,—"আজ দেখি দলবল্ নিয়েই এসেছ!"

থড্ একটু লজ্জিত ভাবে বল্‌ল "আজ্ঞে হ্যাঁ,—ঠিক কর্‌লাম ছেলেকে সংসারী কর্‌ব। তার একটা বিয়ে ঠিক করেছি পাশের গ্রামের মোড়লের মেয়ের সঙ্গে; আপনি তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিন্।"

পাদ্রী সাহেব একটু চিন্তিত ভাবে বসে রইলেন, তারপর তার খাতা বের করে তার নাম ধাম লিখে নিয়ে বল্‌লেন—"আচ্ছা আগামী রবিবার সকাল বেলায় বিয়ে দিয়ে দেবো।"

থড্ হেসে কয়েকটি টাকা বে'র করে টেবিলের ওপর রেখে বল্‌ল,—"আজ্ঞে হাঁ, আমার একমাত্র ছেলে—তার বিয়েতে একটু ধুম্‌ধাম্ করতে চাই।" পাদ্রী সাহেব একটু হেসে বল্‌লেন,—"এবার নিয়ে তুমি তিনবার তোমার ছেলের জন্যে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌লে"!

*　　　　*　　　　*

বিয়ের একমাস পরে বাপও ছেলে যাচ্ছিল হ্রদে নৌকা চালিয়ে নতুন কুটুম বাড়ী ভোজের নেমন্তন্নে। শান্ত নিস্তরঙ্গ হ্রদে নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ ছেলে বল্‌ল,—"দেখেছ বাবা, পেছনের বস্‌বার আসনটা আল্‌গা হয়ে রয়েছে।' এই বলে হাল্‌টা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে আর অমনি কি ভাবে জলে পড়ে গেল। বাপ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল-"ধর্ ধর্, বৈঠাটা ধর্"—এই বলে

বৈঠাটা আগিয়ে দিল, কিন্তু কি বিচিত্র ভাবেই না ছেলেটা জলে ডুবে গেল, আর উঠ্‌লনা।

থড্‌ যেন বিশ্বাসই কর্‌তে পাচ্ছিল না—সে নৌকাটা থামিয়ে যেখানে ছেলেটা ডুবে গেছে সেখানে মুখ নামিয়ে দেখ্‌তে লাগল, ভাব্‌ল সে বুঝি এখনই উঠবে। একটা বুদ্‌বুদ উঠ্‌ল, তারপর আর একটা, তারপর খুব জোর জলের একটা আলোড়ন এলো—তারপর হ্রদের জল আগের মতই শান্ত ভাবে বয়ে যেতে লাগ্‌ল।

স্থানীয় লোকেরা তিনদিন ধরে থড্‌কে সেই জায়গাটাতে নৌকা নিয়ে চুপ করে বসে থাক্‌তে দেখেছিল। তারপর তৃতীয় দিনে জেলেরা মৃতদেহটা উদ্ধার করে নিয়ে এলো।

* * *

আরো এক বছর পরে শীতের শিশির ঝরা এক সকালে পাদ্রী তাঁর ঘরের সামনে কিসের একটা আওয়াজ শুনে মুখ তুলে চাইলেন—দেখ্‌লেন নিঃশব্দে পা টিপে টিপে থড্‌ ঢুকছে। পাদ্রী দেখ্‌লেন থড্‌ আর সে রকম নেই, কুঁজো হয়ে গেছে, চুল পেকে গেছে—বুড়ো হয়ে গেছে।

পাদ্রী তাকে হাত ধরে ঘরে এনে বসালেন; বল্‌লেন—"থড্‌ তুমি বদলে গেছ!" তারপর অনেক ক্ষণ দুজনে চুপ্‌চাপ বসে রইলেন। অনেকক্ষণ পর থড্‌ আস্তে আস্তে বল্‌ল—"আমার ছেলের নামে দরিদ্র সেবায় কিছু আপনার হাতে দিতে চাই"—এই বলে এক থলি টাকা তাঁর পায়ের কাছে রাখ্‌ল। পাদ্রী বললেন—"এ যে অনেক টাকা!" থড্‌ বল্‌ল—"আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে যা' পেয়েছি তারই অর্দ্ধেক।" থড্‌ মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল, আর পাদ্রী সাহেব তাঁর মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। "তুমি কি করবে?" ধীরে ধীরে বল্‌লেন। "যাহোক্‌ আর কিছু ভালো কাজ।"

পাদ্রী সাহেব ধীরে ধীরে বল্‌লেন—"তোমার ছেলে শেষ পর্য্যন্ত তোমার মনে শান্তি এনে দিল—"।

"বোধ হয়"—থডের দুচোখ বেয়ে জল ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

সাময়িকী

বাংলা দেশে উপনির্ব্বাচন: ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের মৃত্যুতে লোকসভায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব কলিকাতা ও নবদ্বীপ কেন্দ্রে যে দুইটী সদস্যপদ শূন্য হইয়াছিল, তাহার উপনির্ব্বাচনে কয়েকটী দল হইতে প্রার্থী দাঁড় করান হইয়াছিল। ভোটে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কলিকাতা কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন কম্যুনিষ্ট প্রার্থী শ্রীযুক্ত সাধন গুপ্ত এবং নবদ্বীপ কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব কলিকাতা কেন্দ্রে ভোট গণনার ফল নীচে দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত সাধন গুপ্ত (কম্যুনিষ্ট) ৫৮,২১১, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল (কংগ্রেস) ৩৬,৩১৯, শ্রীযুক্ত জে, পি, মিত্র (জনসঙ্ঘ) ৫,৪৩১, ডাঃ ভূপাল বসু (সংযুক্ত বামপন্থী) ৫,৪১৫। মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা হইয়াছে ১,০৫,৩৭৬। শেষোক্ত দুইজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

নবদ্বীপ কেন্দ্রের ভোটগণনার ফল এইরূপ। শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী (কংগ্রেস) ৬৯, ৬০৬; শ্রীসুশীল চ্যাটার্জ্জী (কম্যুনিষ্ট) ২৭,৪৫৫; শ্রীমিহিরলাল চ্যাটার্জ্জী (প্রজা-সমাজতন্ত্রী) ১৯,৮০২ ভোট এবং শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (স্বতন্ত্র) ৭,৩৬৫ ভোট পাইয়াছেন। শ্রীমিহির লাল চ্যাটার্জ্জী ও শ্রীযতীন্দ্র নাথ বিশ্বাসের জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

আজ সর্ব্বসাধারণের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুইটী মাত্র দল—কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট। অন্য সব দল লুপ্ত হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। এই মহাসত্যটী অনেক দিন পূর্ব্বে অকংগ্রেসী ও অকম্যুনিষ্ট দল সমূহের কাছে ধরা পড়িলে দেশের মঙ্গল হইত। কংগ্রেসের একটী ঐতিহ্য আছে, ভারতীয় সাধনার একটী মূর্ত্ত প্রকাশের ইতিহাস আছে। লক্ষ লক্ষ লোকের ত্যাগ স্বীকার ও রক্তদানের ফলস্বরূপ কংগ্রেস তাই আছে, থাকিবেও। দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠান থাকিলেই ত্রুটি বিচ্যুতি গলদ থাকে, যেমন হিন্দুসমাজের গলদের অন্ত নাই। যুগে যুগে সংস্কারক দল আসিয়া যেমন হিন্দুসমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, কংগ্রেসও তেমনি বহু সংস্কারের ভিতর দিয়া আজিকার কংগ্রেসে পরিণত হইয়াছে। এখনও তাহাতে বহু গলদ রহিয়া গিয়াছে। কোন্ পথে এই গলদগুলির সংস্কার হইবে? হিন্দুসমাজের মধ্যে বসিয়া যাহারা হিন্দুসমাজের সংস্কার করিলেন, তাঁহারাই সার্থক সংস্কারক। হিন্দু অ-হিন্দু হইয়া, হিন্দুত্বের

foreign হইয়া হিন্দুর কি কল্যাণ করিবে ? তাহারা হিন্দুবিরোধীদের দলই পুষ্ট করিয়াছে, হিন্দুসমাজকে বিপন্ন করিয়াছে। হিন্দুর সংস্কার করিতে হইলে বৈপ্লবিক হিন্দু হইয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকিয়া আঘাত করিতে থাকিলেই হিন্দুসমাজ সংস্কার সম্ভবপর হয়। . এই মন্তব্য কংগ্রেস-সংস্কার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। শাসন-ক্ষমতা ব্রিটিশের হাত হইতে কংগ্রেসের হাতে আসার পরে সে ঠিক তাহাকে পরিপাক করিতে পারে নাই। এই শাসনের জন্য কংগ্রেস প্রস্তুত ছিল না। বিশ্বব্যবস্থা ও মহাত্মাজীর সাধনার ফলে একরূপ হঠাৎই যেন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কবল হইতে মুক্ত হইল। ব্রিটিশ যত-সব কু-ব্যবস্থা ও কু-মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও কংগ্রেস পাইল। এই সব ব্যবস্থা পরিপাক করিতে কংগ্রেসকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। তবে কংগ্রেসের অন্তর্নিহিত প্রায় ষাট বৎসরের জীবন-সাধনা জয়যুক্ত হইবেই। যতই সে আজ নানা সমস্যা লইয়া বিব্রত হউক না কেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সে পরিপাক করিতে পারিবে বলিয়াই বিশ্বাস করি।

যাহারা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া কংগ্রেসের ত্রুটিবিচ্যুতিকে সম্বল করিয়া নিজ নিজ দলকে জিয়াইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, তাহারা 'একে একে নিভিছে দেউটী'। তাহাদের এমন কোনো প্রোগ্রাম নাই, যাহাতে কংগ্রেস হইতে পৃথক বলিয়া তাহাদিগকে চেনা সম্ভবপর হয়। তাহারা অকংগ্রেসী, ইহাই তাহাদের পরিচয়। কংগ্রেসী শাসনকে 'দুঃশাসন' রূপে চিত্রিত করা ছাড়া আর কোন positive কিছু তাহাদের আছে কি ? কংগ্রেস-ত্যাগী অকংগ্রেসীরা 'অহিংসা' মানেন, গান্ধীজী ও গান্ধীজীর প্রোগ্রামের উপর শ্রদ্ধা পোষণ করেন, অথচ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে ইহাদের line of demarcation কোথায় ? যে-টুকু পার্থক্য ইহারা দেখাইতে চান, তাহা এত সূক্ষ্ম ও পরিচালনাগত যে, সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে পারে না। এই হিসাবে কম্যুনিষ্টদের কথা অতি স্পষ্ট, সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ-যোগ্য। তাহাদের দর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই, তাহাদের 'সত্য' যদি ব্যবহারিক জগতের অভ্যুদয় না আনিতে পারে, তবে তাহা সত্যপদবাচ্য নয়। নর-নারীর অবাধ মিলনের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন অনুশাসন নাই, শ্রেণী-সংগ্রাম তাহাদের দর্শনে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, ধনিকের রক্তে শ্রমিকের তর্পণ সেখানে স্বীকৃত। সাধারণ মানুষ অন্নবস্ত্র নিয়া এত বিব্রত,

আদর্শবাদ থাকা সত্ত্বেও এদেশের সাধারণ মানুষ বাস্তবের চাপে এমনই উত্যক্ত যে, কম্যুনিজম তাহাদের ভাল লাগে। অকংগ্রেসীরা তাহাদের প্রচার দ্বারা কংগ্রেসকে হেয় করিয়াছে, কম্যুনিষ্টকে পুষ্ট করিয়াছে। কংগ্রেস-বিদ্বেষ প্রচার দ্বারা অকংগ্রেসী অকম্যুনিষ্টদের কোনই লাভ হয় নাই; লাভ হইয়াছে কম্যুনিষ্টদের। আজ তাহারা নিজেরা মুছিয়া যাইবার পথে। আজ তাহারা হয় কংগ্রেস নয় তো কম্যুনিষ্টদের দলে ভিড়িতে বাধ্য হইবে, মাঝখানে কোন পথ নাই। ইহারা এত শক্তিশালী নয় যে, কোনও একটী দলের সঙ্গে একাত্ম না হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। ইহারা প্রকারান্তরে দেশকে কম্যুনিষ্টদের হাতেই তুলিয়া দিতেছে। আজ ইহাদের নিজেদের সম্বন্ধে গভীর ভাবে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। তাহাদিগকে হয় আবার কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে হইবে, নয় কম্যুনিষ্টদের দলে ভিড়িতে হইবে, নয়তো রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইবে। কম্যুনিষ্টদের দল একান্তভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী; তাই তাহাকে কোনও কংগ্রেসদল-ত্যাগী অ-কংগ্রেসীও সমর্থন করে না। কাজেই তাঁহারা সে দিকের পথ মাড়াইতে পারিবেন না, যদি তাঁহাদের creed বলিয়া কিছু থাকে। এখন তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, কংগ্রেসদলে থাকিয়া তাহার সংস্কারের জন্য প্রাণপণ করিবেন, না রাজনীতি হইতে চিরবিদায় লইবেন। আচার্য কৃপালনীর ও অন্যান্যের বৈরাগ্যোদয়ের কথা সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। যাহারা কংগ্রেস বা কম্যুনিষ্ট কোন দলের সঙ্গেই যুক্ত হইতে না চায়, আজ তাঁহাদের গোটা পরিস্থিতিটা গভীর ভাবে ভাবিবার দিন আসিয়াছে। কম্যুনিজম যখন তাঁহারা নিতে পারিবেন না, কম্যুনিষ্টরাও যখন তাহাদিগকে কংগ্রেস-ঘেষা বলিয়া বিশ্বাস করে না, কংগ্রেস বা কম্যুনিষ্ট দুই দলের মাঝখানে থাকিবার সম্ভাবনাও যখন নাই, তখন আর যেন তাঁহারা কংগ্রেসকে হেয় চিত্রিত করিয়া নিজেদের পথকে আরও অস্পষ্ট করিয়া না তোলেন, এবং কম্যুনিষ্টের হাতে এ দেশকে তুলিয়া দিবার মত কাজে লিপ্ত না হয়। কংগ্রেসকে সংস্কার করিবার সুযোগ আজিও আছে; তাহাকে সংশোধন করিবার মত দুর্জ্জয় সাহস লইয়া তাঁহারা আবার কংগ্রেসে যোগ দিন। কংগ্রেসের বাহিরে দাঁড়াইয়া, দরদশূন্য হইয়া কংগ্রেসের সংস্কার হইবে না, যে-প্রতিষ্ঠান এতদিন তাঁহাদের দেশসেবার সুযোগ দিয়াছিল, তাহার শত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাহাকে কম্যুনিষ্টদের হাতে লাঞ্ছিত হইবার মত কোনও সুযোগ যেন তাঁহারা না দেন।

উজ্জ্বলভারত

(মাসিক পত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ)

উজ্জ্বলভারতের বার্ষিক মূল্য ৪৲। প্রতি সংখ্যা ।/০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। মাঘ থেকে উজ্জ্বলভারতের বর্ষারম্ভ। ছ' মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। রচনা নকল রেখে পাঠানো বিধেয়। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার।

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের হারের জন্য পত্র লিখুন। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৪½"×৭"। উজ্জ্বলভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অসম্বন্ধ সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের মধ্যে একটি জীবনের সমগ্রতার যুগ-দর্শনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—উজ্জ্বলভারত
৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা ২৬